শারদীয়া

শুকতারা

শারদীয়া

শুকতারা

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
ছোটোদের সেরা মাসিক পত্রিকা

আশ্বিন ১৪২৯ ◆ সেপ্টেম্বর ২০২২

সূচিপত্র

৬টি সম্পূর্ণ উপন্যাস

বড়ো গল্প

গল্প

অন্য লেখা

ভ্রমণ

ক্রীড়াঙ্গন

কবিতা ও ছড়া

ছবিতে গল্প

বিভাগীয় লেখা

প্রচ্ছদ
রঞ্জন দত্ত
বিন্যাস ও কারিগরি সহায়তা
মেগাবাইট

প্রধান উপদেষ্টা • রাজিকা মজুমদার

সম্পাদক • রূপা মজুমদার

ফেসবুক পেজ
Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.

মুদ্রক • বরুণচন্দ্র মজুমদার
এ. টি. দেব প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশক • রাজর্ষি মজুমদার

দেব সাহিত্য কুটীর
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯
(033) 2350 4294 / 95 / 7887
E-mail : dev_sahitya@rediffmail.com

শুকতারা
(033) 2350 0270, (033) 2360 1655

Online Payment

Indian Bank
61, M. G. Road, Kolkata-9, College Square Branch
A/c No. : 20808472955, IFS Code : IDIB000C638

State Bank of India
1B, Mahendra Sreemani Street, Kolkata-9
Amherst Street Branch
Current A/c No. : 10597067084
IFS Code : SBIN0001800
Branch Code : 01800 Amherst.

Punjab National Bank
College Street Branch
A/c No. : 0083050402569, IFS Code : PUNB0008320

চেক অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা পাঠালে শুধুমাত্র DEV SAHITYA KUTIR PRIVATE LIMITED এই নাম লিখবেন।
এখন যে কোনো মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক হওয়ার জন্য গ্রাহক মূল্য Indian Bank এবং Punjab National Bank-এ পাঠাবেন।
বার্ষিক মূল্য হাতে নিলে ৩৫০ টাকা
বুকপোস্টে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ৩৮৫ টাকা
রেজিঃ ডাকে এক বছরের গ্রাহক মূল্য ৫৭৫ টাকা
(কোনো কারণে বুকপোস্টের মাধ্যমে বই না পেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়)
R.N.I. Registration No. 2621

Approved by the Directorate of
Public Instruction West Bengal
as Children's Monthly Magazine
Vide Memo No. 456(17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

মূল্য ১৪০ টাকা

ঘোৎনার কারসাজি
কাহিনিসুত্র: অরুণ দে
মাস্টারমশাই ও কঙ্কাল
লজ্জা করে না! একই পরীক্ষায় তিন তিনবার ফেল, এদিকেবড়ো বড়ো কথার শক্তিশেল!
দেব নাকি একখান চাপাটি কানে?
মারবেন না স্যার! কান গেলে জ্ঞান আপনার শুনবো কেমনে?
বেশ! প্রথম দিন... ছেড়ে দিলাম তাই। কিন্তু সন্ধে:বলা পড়া না পাড়লেই রামধোলাই।
খুব শিগগিরি তোমার একটা ব্যবস্থা করা চাই।
বাবলু আমায় বাঁচা। এক মাস্টারের জ্বালায় আমার ঘনিয়ে এসেছে মরণ।
MATHEMATICS
বলিস কি! স্কুলের মাস্টারদের কাছে তো আমরাই যম!
স্কুল নয়, বাড়িতে নতুন মাস্টার রেখেছে মামা। সে চিলেকোঠায় থাকে, ঘষে দিচ্ছে ঝামা!
শোন তবে..... ফিস...ফিস ফিস ফিস... ফিস ফিস!
বাহ্! খাসা বুদ্ধিটা দিয়েছিস!
সেদিন সন্ধ্যাবেলা
মাস্টারমশাই! এ ছেলে পড়বে কেমন করে! বলছে—পেটে যে দারুণ ব্যাথা!
আমার তো মনে হয় ওর কিছুই হয়নি। সব ভাঁওতা!
মামী গো! মরে গেলুম!
দয়া করে একজন ডাক্তার ডাকুন!
ভয়ের কিছু নেই। হয়ত মিষ্টি বেশি খেয়েছে, তাই পেট কামড়িয়েছে।
জানতুম! ফন্দি এঁটেছিল ছোঁড়া! কাল হবে এর দাওয়াই কড়া।

পরদিন সকালে
গতকাল সন্ধেবেলা পড়তে এলে না কেন?
মিথ্যে বললেই পিঠে বেতের বাড়ি জেনো।
আসলে কি জানেন স্যার, সন্ধ্যের পর এই চিলেকোঠায় আমার বড্ড ভূতের ভয়।
অ্যাঁ! বলো কি!
আপনি কোনো শব্দ শুনতে পান না! নাকি?
গভীর রাতে মনে হয় চালে ইট পড়ে টুকিটাকি!
সব্বনাশ! ঠিক রাত্তিরবেলা, ভূতে মারে ঢ্যালা!
অ্যায়ই! কই যাও? এদিকে শোনো!
না না! এ আপনার সেফটির প্রশ্ন!
বুঝে দেখুন! এ ভূত চায় না আপনি এখানে থাকুন!
গতবছরে, চিলেকোঠার এই ঘরে, রামনিধি ঝুলে মরে।
কে রামনিধি?
এ বাড়ির চাকর...'ছিল'
পরে একদিন তার ভূত এসে আমায় দেখা দিল।
স্বচক্ষে দেখেছি এই খাটে!
বটে! যতসব গাঁজাখুরি গপ্পের প্লট! যাও এখুনি পড়তে বসো ঝটপট।
শোনো খোকা! ভূত বলে কিছু নেই। বিজ্ঞান বই তোলো, মনের জানালা খোলো।

কিছুক্ষণ পর

আচ্ছা বৌদি! এখানে কি কেউ আত্মহত্যা করেছিল?

হ্যাঁ! রামনিধি। খুব ভালো কাজের লোক ছিল। এই ঘরেই থাকত।

কেন বলুন তো?

না না! কিছু না। ঘোৎনা বলছিল...ত-তাই!

বুকে আয় ভাই! এত ভালো নিশানা তোর হল কী করে?

ভাগ্যিস গুলতিটা ছিল কাকার এই পড়ার ঘরে!

ইট গুলো ঠিকঠাক পড়েছিল চালে।

তোর স্যার শেষমেশ ভয় পেল তাহলে!

সমাপ্ত

চিত্রনাট্য ও ছবি: সুমন্ত গুহ

গল্প

অলৌকিক কাহিনি

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ছবি : স্মৃতিশ মণ্ডল

বৈষ্ণবতীর্থ কৈয়ড়ের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পরিবারের মেয়ে ছিলেন আমার ঠাকুরমা সিন্ধুবালা দেবী। আমাদের গ্রাম বর্ধমান জেলার রায়নার কাছে নাড়ুগ্রাম। ঠাকুরমাকে সবাই বালা বলেই ডাকতেন। বাবার যখন চার বছরই বয়স ঠাকুরমা তখন হঠাৎ করেই দেহরক্ষা করেন। সে কারণে সজ্ঞানে কৈয়ড় গ্রামের সঙ্গে বাবার কোনো যোগাযোগ ছিল না। বাবা তাই মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে আমাকে বলতেন, 'তুই তো হুটহাট করে যখন-তখনই এদিক- সেদিকে চলে যাস। তা কখনো সময় পেলে একবার কৈয়ড় গ্রামে গিয়ে ওখানকার মাটিতে মাথাটা ছুঁইয়ে আসিস।'

আমি বলি, 'বেশ তো যাব। তা তুমিও চলো না আমার সঙ্গে।'

বাবা বলেন, 'আমি যাব না! ওখানে গেলে আমি আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারব না।' বলে ঘরেই কেঁদে ভাসাতে থাকেন।' বলেন, 'মায়ের মুখটাও যে আমার মনে নেই বাবা।'

আর কথা বাড়াই না। এরপর থেকে একা কখনো গ্রামে গেলে আমি সগরাইয়ে মোড় হয়ে চলে যাই সেয়ারা বাজারে। সেখান থেকে হাঁটাপথে কৈয়ড়। ওখানকার মাটিতে পা দিয়ে মাথা ঠেকিয়ে দেহ-মন পবিত্র করি। আনন্দে মন আমার ভরে ওঠে। ওখানকার চৈতন্যশাখা ও নিত্যানন্দশাখার—কোন শাখার মেয়ে ছিলেন আমার ঠাকুরমা তা জানি না। তবে দুই শাখারই মন্দিরে বিগ্রহের প্রসাদ পাই।

এবার এই প্রসঙ্গ থেকে একটু সরে আসা যাক। আজ থেকে ঠিক ষাট বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা বলি। সেবার খুব সম্ভবত আমাদের গ্রামের বারোয়ারি পুজোর সময় কয়েকদিনের জন্য গ্রামে গেছি।

ওই সময় হঠাৎই একদিন আমাদের দারুণ পরিচিত রতন বাগ এসে বলল, 'ক-দিনের জন্য এসেছ গো?'

বললাম, 'ভাবছি আরো দু-একটা দিন থেকে যাব।'

'তবে তো ভালোই হল। তুমি কখনো বোঁয়াইচণ্ডী গেছ?'

'না। শুনেছি উনি খুব জাগ্রতা দেবী। কিন্তু সে তো অনেক দূরের পথ।'

'তাতে কী? পুবপাড়ার দুজন মহিলা কাল ওখানে পুজো দিতে যাবেন। আমি একটা গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। এই সুযোগে তোমারও দর্শন হয়ে যাবে।'

কথায় বলে, হ্যাংলা ভাত খাবি? না, পাত পেড়ে বসে আছি। এমন সুযোগ আমি হাতছাড়া করি কখনো? তাই বললাম, 'খুব ভালো হয় তাহলে। আমি নিশ্চয়ই যাব তোমাদের সঙ্গে।'

'তাহলে তৈরি থেকো। ভোর ভোর যাব কিন্তু।'

পরের দিন ভোরের আলো ফুটে উঠতেই রতন গাড়ি নিয়ে আমাদের ঘরের কাছে এল। আমাদের অবশ্য ঘর বলতে কিছু নেই। জ্ঞাতি কাকারা এদিক-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকেন। এরই মধ্যে রবিকাকার বাড়িতেই আমরা এলে থাকি। এবারে আমি একা এসেছি। রতন গাড়ি নিয়ে এলে আমি ওর গাড়িতে বসে পুবপাড়ার দিকে চললাম। ছই-আঁটা গরুর গাড়িতে খড়ের গদিতে বসে যাত্রা করার আনন্দই আলাদা। নাড়ুগ্রাম পার হয়ে সগরাইয়ের মোড়ে বাঁক নিয়ে চললাম সেয়ারা বাজারের দিকে। ভালোই হল। আর একবার কৈয়ড় গ্রামের মাটি ছুঁয়ে আসা যাবে।

যখনকার কথা বলছি তখন এ পথে বাস চলাচল শুরু হয়নি। সেই সময় পালকি ও গরুর গাড়িই ছিল ভরসা। রতনের তেজি বলদ দুটো ক্যাঁকোর কোঁকর রব তুলে আমাদের টেনে নিয়ে চলল সেয়ারা বাজারের দিকে। সেখান থেকে কৈয়ড় বেশি দূরের পথ নয়।

যাই হোক, এক সময় আমরা বোঁয়াই পৌঁছে বোঁয়াইচণ্ডী দর্শন করলাম। পুবপাড়ার যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বললেন, 'এই গ্রামে আমাদের এক আত্মীয়র বাড়িতে দু-একদিন থাকব আমরা। তাই তোমরা ফিরে যেতে পারো।'

অতএব আমরা আর আমাদের সময় নষ্ট করতে চাইলাম না। সোজা চলে এলাম কৈয়ড় গ্রামে। ওই গ্রামের উভয় শাখার সঙ্গেই পরিচয় পর্ব আগে থেকেই ছিল আমার। তাই সেখানেই পুকুরে স্নান সেরে দুজনে তৃপ্তি করে বিগ্রহের অন্ন প্রসাদ খেলাম পেট ভরে। তারপর আর দেরি না করে আবার গো-খানে রওনা দিলাম আমাদের গ্রামের দিকে।

সেয়ারা বাজার থেকে সগরাই-এর পথে দুটি নামকরা দিঘি আছে।

একটি হল আম্‌লের দিঘি, অপরটি শিপ্‌টের দিঘি বা দাওয়ান দিঘি। এই দুটি দিঘিই নানারকম উদ্ভট কাহিনিতে ভরা। অনেক অলৌকিক কাহিনি শোনা যায় এই দিঘি দুটিকে ঘিরে। স্থানীয়রা কিন্তু এখানকার এই সব কাহিনিকে বিশ্বাসও করেন।

যখনকার কথা বলছি তখন ফাগুন মাসের শেষ। আমরা অনেকক্ষণ গাড়িতে এসে একটু ক্লান্ত হয়ে আম্‌লের দিঘির পাশে আমিলা বাজারে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসলাম। জায়গাটা বেশ জমজমাট। তাই দুজনের জন্য দু-ভাঁড় চা কিনে এনে তৃপ্তি করে খেতে লাগলাম।

চা খাওয়া শেষ হলে রতন গাড়ির মধ্যে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আমি এদিকে-ওদিকে পায়চারি করে বনময় প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

হঠাৎই কানে এল কে যেন নাম ধরে ডাকল আমার। পরিচিত কণ্ঠস্বর। তাকিয়ে দেখি আমার আর এক দূরসম্পর্কের কাকা। সঙ্গে ছোটো ছোটো ভাইদের নিয়ে কাকিমাও ছিলেন।

আমি দুজনকেই প্রণাম করলে কাকাবাবু বললেন, 'তুই এখানে?'

গাড়িতে শুয়ে থাকা রতনকে দেখিয়ে বললাম, 'ওর গাড়িতে বোঁয়াইচণ্ডী গিয়েছিলাম।' বলে সব বললাম। তারপর বললাম, 'কাকিমাকে নিয়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আম্‌লেতেই এসেছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি। এবার তোদের গ্রামেই যাচ্ছি আমরা। দু-একদিন থাকব। তুইও একদিন আয় না আমাদের রামকৃষ্ণপুরে।'

'যাব যাব, নিশ্চয়ই যাব।'

রামকৃষ্ণপুর এখানকারই একটি গ্রাম। নাড়ুগ্রাম থেকে খুব বেশি দূরের পথ নয়। ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা।

কাকাবাবু বললেন, 'খাওয়াদাওয়া হয়েছে তোদের?'

'কৈয়ড়ে ভরপেট প্রসাদ খেয়েছি আমরা।'

'ঠিক আছে। রতনকে ডাক, এখানকার উপাদেয় মিষ্টি একটু মুখে দে।' বলেই একটি মিষ্টির দোকান থেকে দুজনের জন্য বেশ কিছুটা পরিমাণ সীতাভোগ ও মিহিদানা এনে দিলেন। সেই সঙ্গে দুটো করে রসগোল্লা। বললেন, 'ধীরে-সুস্থে খেয়ে নিস তোরা। দোকানের পয়সা মেটানো আছে। খাওয়া হলে বাড়ি চলে যা। আমরা একটা জিপের ব্যবস্থা করেছি তাতেই চলে যাচ্ছি।'

আমরা মনের আনন্দে খাওয়ায় মন দিলাম।

কাকাবাবু সবাইকে নিয়ে বিদায় নিলেন।

খেতে খেতে রতন বলল, 'আম্‌লেতে তোর কাকাবাবু সীতাভোগ-মিহিদানা কোথায় পেলেন? এখানে তো এ জিনিস কখনো দেখিনি।'

আমি বললাম, 'এতে এত অবাক হবার কী আছে? হয়তো বিক্রির জন্য আনিয়েছেন কাউকে দিয়ে। বর্ধমান আর এখান থেকে কতদূর?'

'তাই হবে হয়তো।'

যাই হোক, আমরা এখানকার একটি কলে পেট ভরে জল খেয়ে গ্রামের দিকে রওনা হলাম। ঠিক সন্ধের মুখে পৌঁছে গেলাম আমরা। ঘরে গিয়ে দেখি বাড়ি ফাঁকা। এ বাড়ির মানুষজনরাই যা আছেন। রামকৃষ্ণপুরের ওঁরা তো কেউ নেই।

রবিকাকাকে বললাম সে কথা। উনিও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন, 'দ্যাখ, হয়তো পথে কোথাও দেরি হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'পথ নির্জন। তা ছাড়া ওই একই রাস্তায় আমরাও তো এলাম।'

অতএব ওঁদের আসার আশা ছেড়েই দিলাম।

সে রাত তো গেল। পরেও দুটো দিন পার হল কিন্তু কাকাবাবুরা এলেন না। কেন যে এলেন না তা কে জানে? এমনও হতে পারে হয়তো এখানে আসার পথে হঠাৎ করেই কারো কোনো শরীর খারাপ হয়েছে। না হলে এমনই বা হবে কেন?

তিন দিনের দিন এক সকালে রতনকে নিয়ে আমি চললাম রামকৃষ্ণপুরের দিকে। আমাদের গ্রামের বাঁধা রাস্তা ছাড়িয়ে ধান- কাটা মাঠের আলপথ ধরে পথ সংক্ষেপ করলাম। রতন রাস্তা চেনে। তাই ও সহজেই আমাকে নিয়ে যেতে পারল রামকৃষ্ণপুর গ্রামে।

আমরা যেতেই বাড়িতে যেন আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। কাকাবাবু-কাকিমা দুজনেই আমাকে জড়িয়ে ধরে কী আদরটাই না করলেন। বললেন, 'কতদিন বাদে দেখছি তোকে। সেই কবে দেখেছিলাম, এখন তো বেশ একটু মাথা চাড়া দিয়েছিস। আয়-আয় বোস। নারকেল-মুড়ি খা। দোকান থেকে তেলেভাজা আনাই। লেটেকে বলে দিই পুকুর থেকে বড়ো দেখে একটা মাছ ধরে আনতে। চান-খাওয়া করে বিকেলে যাবি।'

রতন ও আমার দুজনেরই চোখে বিস্ময়।

আমি বললাম, 'সে সব তো হবে। কিন্তু সেদিন তোমরা গেলে না কেন?'

কাকাবাবু-কাকিমা দুজনেই অবাক চোখে তাকালেন, 'ওই দিন! কোথায় যেতাম?'

'সে কী! আম্‌লে থেকে আমাদের আগে তোমরা জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলে। যাবার আগে আমাদের দুজনকে সীতাভোগ-মিহিদানা-রসগোল্লা খাওয়ালে—!'

কাকাবাবু বললেন, 'কী বলছিস তুই! আম্‌লেতে সীতাভোগ-মিহিদানা? ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখিসনি তো?'

আমার কথায় সায় দিয়ে রতনও একই কথা বলল।

আমি তখন আগাগোড়া সব খুলে বললাম ওঁদের।

শুনে কাকাবাবুর চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, 'বিশ্বাস কর, বিগত তিনমাসের মধ্যে কেউ আমরা গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাইনি। তার ওপর এই গ্রামে জিপগাড়িই বা কোথায় পেতাম! যা দেখেছিস সবই অলৌকিক! রাতদুপুরে এসব কাণ্ড হয়তো হতে পারে। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে! অসম্ভব।'

আমি বললাম, 'যা হয়েছে তা প্রকাশ্য দিবালোকে। ভর দুপুরে। তাও আমি একা নই রতনও সঙ্গে ছিল।'

কাকিমা বললেন, 'এই সমস্ত জায়গায় এমন অলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার আরও অনেকবার হয়েছে। তবে এমন দিনদুপুরে কখনো হয়নি। যা হয়েছে তা রাতবিরেতে। যাক, ঘটনাটা ভুলে যাবার চেষ্টা কর। এসব গল্পও কারো কাছে করিস না।'

ততক্ষণে আমাদের জলখাবার এসে গেছে। আমরা ঘাড় হেঁট করে খাওয়ার দিকে মন দিলাম। ভূত-প্রেত এসব বিশ্বাস করা না করা যার যার মনের ব্যাপার। কিন্তু এমন অলৌকিকত্ব? যা কিনা স্বচক্ষে দেখলেও মনকে বড়ো বেশি ভাবিয়ে তোলে। ❖

গল্প

বিরিয়ানি-স্যার

পবিত্র সরকার
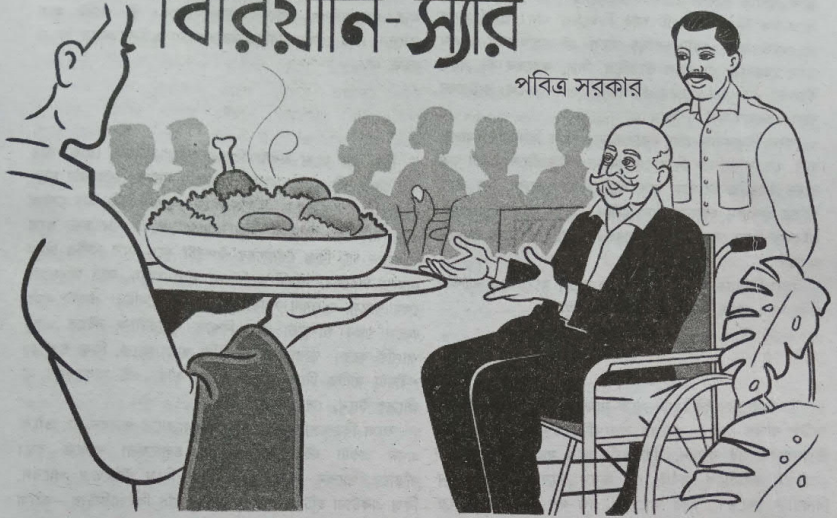
ছবি : শৈবাল দত্ত

নাতি-নাতনি বয়সের ছেলেমেয়েরা বলে 'বিরিয়ানি-দাদু'। আমরাও আড়ালে কথাটার দাদু ছেঁটে স্যার লাগিয়ে একটু-আধটু যে বলি না তা নয়। না, তোমরা যা ভাবছ তা নয়। ইনি পাড়ার কোনো বিরিয়ানি স্টলের মালিক নন যে নাতি-নাতনিরা মাঝে মাঝে তাঁর দোকান থেকে 'শখ হলে বিরিয়ানি এনে খায়। এরকম দোকান এখন কলকাতায় হাজার হাজার। সামনে একটা বিশাল অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচি থাকে, তার ওপরটা লাল শালু কাপড়ে মোড়া, যেন একটা লাল টি-শার্ট পরানো আছে। মুখে ঢাকনা। গেলেই তোমাকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ডুবিয়ে বিরিয়ানি তুলে দেয়, একখণ্ড মাংস সমেত, একখানা সেদ্ধ আলু। হাঁড়িতে জাফরান রঙের ভাত, আলু আর মাংসের টুকরো কীভাবে সাজানো থাকে তা আমি কখনো উঁকি দিয়ে দেখিনি অবশ্য। তোমরা জানলে আমাকে জানিয়ো। তার পরে পাশের একটা ছোটো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে খোসা-ছাড়ানো সেদ্ধ ডিম একটা। কাগজের বাক্সের মতো প্যাকেট সাজানোই থাকে, তাতে খপাত করে ভরে দিয়ে, তোমার হাতে দেবেন তাঁরা, ব্যাস, কম্মো শেষ।

না, ইনি, সে রকম কেউ নন। তবু ইনি বিরিয়ানি-দাদু বা বিরিয়ানি-স্যার।

তাঁর নাম আসলে কর্নেল বিক্রম সিংহ। ইনি একজন রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার, আমাদের পাড়ার ক্লাবের সভাপতি। বয়েস প্রায় নব্বুইয়ের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও শরীরটা দিব্যি খাড়া, মাথায় টাক, কিন্তু নাকের নীচে পাকানো বিশাল গোঁফ। নাকের নীচে টাক পড়বার কোনো প্রশ্নই নেই। রোজ সকালে ঘণ্টাখানেক মর্নিং ওয়াক করেন। আমি তাঁর সঙ্গী, ভোরবেলা তাঁর সঙ্গে হাঁটি। এক পাল্লা হেঁটে এসে পাটুলি মোড়ের কাছে অনন্তর দোকানে বসে ভাঁড়ে চা খাই, তখন তাঁর সঙ্গে নানা রকমের গল্প হয়। চিনের সঙ্গে যুদ্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, তার ওপর একাত্তরের বাংলাদেশের যুদ্ধ, সব ক-টায় তিনি ছিলেন, তার নানা গল্প। কিন্তু যুদ্ধের গল্প আমার তত ভালো লাগে না বলে তার মধ্যে যাচ্ছি না।

বুড়ো হলে লোকের খাবার ইচ্ছে কমে যায় শুনেছি। কিন্তু বিক্রমস্যারের এ ব্যাপারে উৎসাহ একেবারেই কমেনি। সকালে অনিত্যর দোকানে বসে তিনি তিন পিস মাখন মাখানো

পাঁউরুটি আর দুটো ডিমসেদ্ধ খান। আর কিছু বিস্কুট কিনে ওই দোকানে আসা রাস্তার কুকুরগুলোকে দেন। কিছু চড়াইপাখি আর শালিক আসে, তাদেরও বিস্কুটের টুকরো দেন। একই সঙ্গে মন দিয়ে ওই রুটি আর ডিমসেদ্ধ খান। প্রথম দিকে চা খেতে আসা একটা চ্যাংড়া ছেলে এই দেখে প্রায় অজ্ঞান হবার জোগাড়, সে বলে উঠেছিল, 'দাদু, করছেন কী, বাকি জীবনটা কি আলিপুরের মিলিটারি হাসপাতালে কাটাবেন বলে ভেবেছেন?'

শুনে বিক্রমস্যার রাগ করলেন না। যাকে মিলিটারি মেজাজ বলে, সে সবের ধার দিয়ে গেলেন না। পাঁউরুটিতে একটা মস্ত কামড় দিয়ে একটা ডিম মুখে পুরে তিনি বললেন, 'না বাছা, আমার সেরকম কোনো প্ল্যান নেই। আমি বাড়িতেই থাকব, এইরকম খেয়ে-দেয়ে। অন্তত আরও দশ বছর। তোমার আপত্তি আছে?'

ছেলেটি আর কথা বলতে সাহস করল না। শুধু নাটকীয় ভঙ্গি করে বলল, 'দিন, পায়ের ধুলো দিন।'

২

বিক্রমস্যারের বিরিয়ানি-স্যার নামকরণের পেছনে কোনো জটিল কারণ নেই। ক্লাবের সভাপতি তিনি, কোনো একটা উপলক্ষ হলেই বলেন, 'বিরিয়ানি হয়ে যাক।' পোচ্চোন্ডো ('প্রচণ্ড' কথাটাকে সবাই যে ভাবে বলে) ভালোবাসেন বিরিয়ানি খেতে। আর দ্যাখো, গত দশ- পনেরো বছরে তাঁকে খুশি করবার জন্যে কলকাতায় হাজার হাজার বিরিয়ানির স্টল তৈরি হয়েছে, সকলেই একটা বিশাল অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির চারপাশে লাল শালু কাপড় জড়িয়ে বিরিয়ানির দোকান খুলে বসেছে। আগে আমরা আমিনিয়া, আরসালান, সাবির, কোহিনুর—এই রকম কয়েকটা বিরিয়ানির দোকানের নাম জানতাম। বিরিয়ানি খাবে তো ওখানে যাও। কিন্তু এখন কলকাতার অলিতে-গলিতে এত বিরিয়ানির দোকান হয়ে গেছে যে মনে হয় এখন শহরের প্রধান কুটির শিল্প এই বিরিয়ানি।

আর বিক্রমস্যার বলেন, 'আমি তো কোনো তফাত পাই না বড়ো আর ছোটো দোকানের বিরিয়ানির মধ্যে। আমাকে প্যাকেট করে দাও, ভেতরে একটা ভদ্র সাইজের আলু আর ডিমসেদ্ধ আর একটা মুরগির আস্ত পা বসিয়ে দাও, আমি প্যাকেট চেটেপুটে খালি করে দোব, আর সঙ্গে কিছু দরকার নেই। ওই বিরিয়ানির গন্ধই আমার কাছে যথেষ্ট।'

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসে, গলার স্বর গাঢ় হয়। জুড়ে দেন, 'বিরিয়ানির ওই গন্ধই এখন আমার বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা। অনুপ্রেরণাও বলতে পার।'

আমাকে আগে কেউ কেউ অনিত্যর দোকানে বসে কানে কানে ফিসফিস করে বলত, 'ওঁর বাড়ির লোকেরা কিছু বলে না?'

আমি তাদের বোঝাতাম, বাড়ির লোক মানে তো উনিই, আর এক চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক। স্ত্রী কবেই মারা গেছেন। তার পেছনে বিরিয়ানির কোনো ভূমিকা আছে কি না জানি না।

৩

কিন্তু এর মধ্যে একটা বিপত্তি ঘটল। বয়স হোক, আর যাই হোক, কী একটা কারণে বিরিয়ানি-স্যারের কোমরটা হঠাৎ বেঁকে গেল এক রাত্রে, উঠতে গিয়ে দেখেন তিনি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। সোজা হতে পারছেন, হলে লাগছেও না, কিন্তু কোমরের ওপরটা নুয়ে নুয়ে মাটির দিকে নামতে চাইছে। এমনিতে বিশাল লম্বা মানুষ, লম্বা মানুষদের শেষ বয়সে এ রকম সমস্যা হয় বলে শুনেছি। একটা সময় আসে যখন পা-দুটো অত বিশাল শরীরটাকে বইতে একটু আপত্তি করে। তারা নিজেরা দিব্যি খাড়া থাকে, কিন্তু ওপরের শরীরটা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়, ওই মাধ্যাকর্ষণ না কীসের টানে, সে তোমরা জানো।

ফলে বিক্রমস্যার আর হাঁটতে বেরোতে পারেন না, তাঁকে এখন একটা হুইলচেয়ারে বসে চলাফেরা করতে হয়। দাঁড়াতে পারেন, দু-এক পা সিঁড়ি দিয়ে উঠতেও পারেন, কিন্তু একটানা হাঁটতে পারেন না দু-পাঁচ কিলোমিটার—আগে যা তাঁর কাছে ছিল ডালভাত। কোথাও জরুরি কাজে বাইরে বেরোতে হলে গাড়িতে যান, গাড়ির ডিকিতে হুইলচেয়ারটা ভাঁজ করা থাকে। হাতে বালা লাগানো একটা স্টিলের লাঠি আছে, সেটাতে ভর দিয়ে চলতে হয়। হরিরাম বলে একজন এখন সঙ্গে যায়।

তবে এখনও, এই কাণ্ডের পরেও, তাঁর নেমন্তন্নে বা পার্টিতে যাওয়ার উৎসাহ কমেনি। বিরিয়ানি খাওয়ারও না। বিয়েবাড়ি হোক, প্রাক্তন সৈন্যদের কোনো পার্টি হোক—সব জায়গায় তাঁর যাওয়া চাই, বিরিয়ানির লোভে লোভে। বিয়েবাড়িতে সাজানো গেটের সামনে নীল আলোর নীচে তাঁর মস্তবড়ো তোয়োতা গাড়ি গিয়ে দাঁড়ায়, কখনো ড্রাইভার, কখনো হরিরাম ছুটে এসে দরজা খুলে দেয়, তারপর ডিকি থেকে তাঁর ভাঁজ করা হুইলচেয়ারটা বার করে ফিট করে দ্যায়। বিক্রমস্যার গাড়ি থেকে দরজা ধরে নেমে চেয়ারে বসেন, হরিরাম চেয়ার ঠেলে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। একটু-আধটু সিঁড়ি থাকলে সমস্যা নেই, হাতের লাঠি নিয়ে, বা অন্যের ওপর ভর দিয়ে তিনি উঠতে পারেন কয়েকটা ধাপ। তিনি ঢুকলেই অতিথি-অভ্যাগত মহলে একটা ফিসফিস শুরু হয়ে যায়, ''ওই দ্যাখ্ রে, বিরিয়ানি-স্যার এসে গেছেন!'

অন্য বুড়োবুড়িরা যারা প্রায় না খেয়ে বাড়ি ফেরে (তাদের পুরো নেমন্তন্ন খাওয়া ডাক্তাররা পইপই করে বারণ করে দিয়েছেন), কেউ কেউ না খেয়েই, তাদের মনের কষ্ট তোমরা বুঝতেই পারো। বিয়েবাড়িতে উপহার নিয়ে যেতে হচ্ছে, অথচ থরে থরে খাবার সাজানো টেবিলের দিকে যাওয়ার উপায় নেই, তাঁদের সঙ্গের লোকজন কড়া পাহারায় রাখে তাঁদের। হয়তো একটু স্যালাড, অর্থাৎ শশার চাকা, পেঁয়াজের চাকা আর টোম্যাটোর চাকা খেয়ে তাঁদের উঠে আসতে হয়। আর চিনি-ছাড়া চা বা কফি। কিন্তু বিরিয়ানি-স্যার ওই লাইনেই নেই। নেমন্তন্ন-বাড়ি গেছি, পুরোদস্তুর নেমন্তন্ন না খেয়ে ফিরব কেন? আর তাঁকে তো উঠে টেবিলে যেতেও হয় না। বিয়েবাড়ির লোকেরাই ভর্তি প্লেট সাজিয়ে তাঁকে হুইলচেয়ারে এনে সাপ্লাই করে। তিনি মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, শব্দ করে আঙুল চুষে সব খান, বোঝাই যায় যে, খেতে তাঁর খুবই তৃপ্তি, খাওয়া ব্যাপারটাকে পৃথিবীর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ বলে মনে করেন। প্লেট ফুরিয়ে গেলে তিনি উদাসীনভাবে সেটা একদিকে বাড়িয়ে দেন। লোকজন পাশে খাড়াই থাকে, শশব্যস্তে প্লেট নিয়ে গিয়ে আবার তা বোঝাই করে এনে দেয়। এই করে বিরিয়ানি থেকে দই, মিষ্টি—এমনকি জল পর্যন্ত। স্যারকে কুটোটি পর্যন্ত নাড়তে হয় না।

বিরিয়ানি-ভর্তি পেটে উদ্গার তুলে খেয়েদেয়ে তিনি তৃপ্ত চিত্তে বাড়ি ফিরে যান।

৪

এইভাবে দিব্যি চলছিল। হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড ঘটল। কাণ্ড তো ঘটতেই হবে, বলো—কাণ্ড না ঘটলে গল্প হবে কী করে? গল্প তো আর নীরস ইতিহাস নয়।

বাইপাসের ধারে কী একটা পাঁচতারা না সাততারা হোটেলে নেমন্তন্ন। এই সব হোটেলেও তাঁর বিরিয়ানির প্রত্যাশা থাকে, এবং হোটেলগুলো তাঁকে হতাশ করে না। কারণ আমাদের বাঙালিদের ধারণাই হয়ে গেছে যে, আপ্যায়নের চরম হল বিরিয়ানি, ফলে যারাই হোটেলে কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তারাই হোটেলকে বলে দেয় বিরিয়ানি করবেন ভাই। হোটেলওয়ালারাও, যত তারাই হোক, কোমর বেঁকিয়ে জাপানিদের মতো অভিবাদন জানিয়ে বলে, 'সে আর বলতে স্যার!'

এই রকম সেই হোটেলে তিনি গেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে, হরিরামকে সঙ্গে নিয়ে। গিয়ে বসেছেন, লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন, বক্তৃতা শুনেছেন, কী সব তথ্যচিত্র দ্যাখানোর ছিল তাও দেখেছেন। তার পর খাওয়ার সময়ে হলের বাইরে যে সব সারি সারি ট্রে সাজানো ছিল তার দিকে হরিরামকে পাঠিয়েছেন, যা প্লেট ভর্তি করে নিয়ে আয়।

হরিরাম ফিরে এসে সেই মারাত্মক বিস্ফোরক সংবাদ দিয়েছে যে এখানে বিরিয়ানি হয়নি। ঘরে যেন বজ্রপাত হয়েছে। বিরিয়ানি-স্যার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না কিছুক্ষণ।

'তবে কী ছাতা হয়েছে রে?' প্রায় তর্জন করে জিজ্ঞেস করলেন।

হরিরাম বলল, 'এইটা মাউরাগো ব্যাপার, কী সব চপ-ফপ বানাইসে, মাছ-মাংসের কোনো কথাই নাই।' মানে, হরিরামের ভাষায়, অবাঙালিদের ব্যাপার, কোনো আমিষ হয়নি।

পৃথিবী কাঁপিয়ে দেওয়া এই সংবাদে বিরিয়ানি-স্যার খানিকক্ষণ গুম্ মেরে বসে রইলেন, তারপর ভারী কষ্টের গলায় বললেন, 'ওই সব চপ-ফপ চুলোয় যাক। আর কী আছে?'

হরিরাম গিয়ে একটি সাদা জামা আর কালো স্কার্ট-পরা মেয়েকে ডেকে আনল। সে একটা থালা ন্যাপকিনে ঘষতে ঘষতে এসে বলল, কী খাবেন স্যার বলুন, ভেজ না নন-ভেজ?

বিরিয়ানি-স্যার হরিরামের দিকে রক্তচক্ষু নিয়ে তাকালেন। ও কেন বলল নিরিমিষ, এই তো নন-ভেজ আছে বলেছে। জিজ্ঞেস করলেন, বিরিয়ানি নেই?

মেয়েটি বলল, না স্যার, খুব দুঃখিত, বিরিয়ানির অর্ডার ছিল না। ফিশ চপ আছে, আর চিকেন ক্রিম সুপ আছে। দেব আপনাকে?

বিরিয়ানি-স্যার ভরপেট হতাশা নিয়ে বললেন, আর কী আছে?

মেয়েটি বলল, আর স্টার্টার হিসেবে একটা দারুণ জিনিস আছে স্যার। মশলামুড়ি, ধনেপাতা আর স্যার কাজুবাদাম দিয়ে। পার্টি চেয়েছিল। আজকাল বড়ো হোটেলে এটা হচ্ছে স্যার। মশলামুড়ি চাইছে। দেব?

বিরিয়ানি-সার অতি দুর্বল, ক্ষীণ গলায় বললেন, তাই দাও। আর এককাপ কফি দিয়ো।

মেয়েটি ছুট্টে গিয়ে বেশ বড়ো আইসক্রিম 'কোন'-এর মতো এক ঠোঙা মশলা-মুড়ি নিয়ে এল।

বিরিয়ানি-স্যার অনেকক্ষণ ধরে সেই মশলামুড়ি খেলেন। ফাইভ স্টার না সেভেন স্টার যাই হোক, মশলামুড়িটা মন্দ করেনি। তার পর ধীরে ধীরে কফিটা শেষ করলেন। করে হরিরামকে বললেন, 'চল্!'

বাড়ি ফেরার পথে হরিরামের সঙ্গে তাঁর আর-একটু কথা হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হ্যাঁ রে, হরি, মশলামুড়িটা আমিষ না নিরিমিষ রে? ভেজ না নন-ভেজ!'

হরিরাম বলেছিল, 'কইতে পারলাম না স্যার!'

তারপর বলেছিল, 'মন খারাপ কইরেন না, পাড়ার নান্টুর বিরিয়ানির স্টল অহনও খোলা আসে!' ❖

গল্প

হিরের নেকলেস উধাও

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি : শৈবাল দত্ত

।। এক ।।

—আসুন মেঘনাদবাবু। পথে কোনো অসুবিধে হয়নি তো?

—না। ধন্যবাদ। এখন চলুন, চুরিটা কোথায় হয়েছে দেখি।

নীহার সেন আমাদের নিয়ে ঢুকলেন বাড়ির একতলার একটা ঘরে।

ব্যাপারটা একটু গোড়া থেকে বলতে হয়।

আজই সকালে মেঘনাদকে ফোন করেছিলেন নীহার সেন। ভদ্রলোকের বাড়ি সোদপুর। বিপত্নীক। একটিমাত্র ছেলে থাকে চাকরিসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে। এই সোদপুরের বাড়িতে নীহারবাবু কাজের লোকজন নিয়ে একাই থাকেন। দিন দশেক বাদে ওঁর ছেলের বিয়ে। ব্যাঙ্গালোরেই। পাত্রী ছেলের সঙ্গে একই অফিসে চাকরি করে। এক্ষেত্রে নীহারবাবুর দায় বলতে ওদের বিয়েতে গিয়ে সাক্ষী হওয়া। আর সে কারণেই তিনি পুত্রবধূকে উপহার দেবার জন্য ওঁর পূর্বপুরুষের একটি বহুমূল্য হিরের নেকলেস ব্যাঙ্কের লকার থেকে গতকালই বার করে এনে ঘরে রেখে ছিলেন। ইদানীং তিনি একতলার ঘরেই থাকেন। আজকাল আর খুব বেশি সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে পারেন না।

গতকালই হিরের নেকলেসটা ঘরে এনে নীহারবাবু বিখ্যাত জহুরি সুলেমান শেখকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নেকলেসটা পরিষ্কার করার জন্য।

সেই মতো সুলেমান শেখ গত রাতে নীহারবাবুর বাড়িতে এসে ওঠে। রাতের বেলা সে হিরের নেকলেস পালিশ করেছে।

আজ সকালবেলা সুলেমান শেখ যখন একতলায় এসে নেকলেসটা নীহারবাবুকে দিয়েছে, তখন নীহার সেন প্রতিদিনের মতো মর্নিং ওয়ার্কে বেরুচ্ছেন। তিনি তাড়াতাড়িতে মনের ভুলে নেকলেসটা ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপরই রেখে ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে যান। কিন্তু মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে ঘরের তালা খুলে দেখেন হিরের নেকলেস উধাও।

সঙ্গে সঙ্গে উনি ফোন করেছেন রহস্যভেদী মেঘনাদ ভরদ্বাজকে।

একতলায় নীহার সেনের বেডরুমটা বেশ বড়ো। সুন্দরভাবে সাজানো। খাট, ড্রেসিং টেবিল, সোফাসেট। ঘরের একদিকে বড়ো বড়ো দুটো জানলা। নীহারবাবু ঘরে ঢুকে জানলা দুটো খুলে দিলেন। ওপাশে বাগান। একটা জানলার ওপরে সিলিং-এর কাছাকাছি একটা ফুটখানেক ব্যাসার্ধের খোলা ফোকর।

নীহারবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, হিরের নেকলেসটা তাড়াহুড়ো করে ওই ড্রেসিং টেবিলটার ওপর রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে যেতে ভুলিনি।

আমি সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললাম—ফোকরটা তো খোলা ছিল।

নীহারবাবু বললেন,—ওই ফোকর দিয়ে মানুষ কেন, কোনো বাঁদরও গলবে না। আসলে ওখানে আমার একজস্ট ফ্যানটা বসানো ছিল। সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, সারাতে দিয়েছি।

—ম্যাঁ...ও...।

ফিরে তাকালাম। একটা মোটাসোটা হুলো বেড়াল ঘরে এসে ঢুকেছে। তারপর কেউ কিছু বলার আগেই নীহার সেনের কাছে এসে আদুরে ডাক ডাকতে ডাকতে ওঁর পায়ে গা ঘষতে শুরু করেছে।

নীহারবাবু ওকে তুলে নিয়ে বললেন,—এ আমার খুব ন্যাওটা। কিছুক্ষণ আমায় না দেখে থাকতে পারে না।

—খগেন! খগেন! বলতে বলতে এক বুড়ি বিধবা ঘরের দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। বলল,—কত্তাবাবু, আপনি আর খগেনকে প্রশ্রয় দেবেন না। ও আজ কী করেছে জানেন? রান্নাঘরে ঢুকে ঢাকা সরিয়ে একটা মাছের টুকরো নিয়ে পালিয়েছে।

—বলো কী সুধাদি, তার মানে নিশ্চয়ই আজকাল ওকে ঠিক মতো খেতে দিচ্ছ না। বলতে বলতে বেড়ালটাকে ওই বৃদ্ধার কোলে দিয়ে নীহার সেন বললেন,—যাও সুধাদি, এখন একে নিয়ে যাও। আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।

বেড়ালটা কি নীহারবাবুর ভাষা বুঝতে পারল? দিব্যি সুধাদির কোলে চড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেঘনাদ বলল,—বাঃ! বেড়ালটাকে বেশ ভালোই পোষ মানিয়েছেন।

—এদের নিয়েই তো আছি। নীহার সেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—পাঁচ বছর আগে স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেটাও সারা বছর বাইরে থাকে।

—হুঁ! মেঘনাদ বলল,—এখন যে কারণে আজ এখানে এসেছি, সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

মেঘনাদ ইতিমধ্যে সারা ঘরটা তন্ন তন্ন করে দেখছিল। হঠাৎ দেখলাম, মেঝে থেকে কিছু একটা তুলে ওর সাইড ব্যাগে ভরল।

জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এ সময়ে ট্রেতে চা আর কিছু স্ন্যাকস নিয়ে একজন ভৃত্য স্থানীয় কেউ ঘরে ঢুকল।

নীহারবাবু তাকে বললেন,—টিপয়ের ওপর ওগুলো রেখে যাও দিবাকর।

দিবাকর তাই করে পিছু ফিরে চলে যাচ্ছিল, মেঘনাদ পিছু ডাকল,—একটু দাঁড়াও।

দিবাকর থমকে ফিরে তাকাল।

মেঘনাদ নীহারবাবুকে বলল,—নীহারবাবু আপনার বাড়িতে ক-জন লোক?

—মোট তিনজন। এই দিবাকর, রান্নাঘর সামলায় সুধাদি। এছাড়া বাগান পরিচর্যা করে পূর্ণিয়া।

—হুঁ। আমি সকলের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তবে আর একজনের কথা আপনি বললেন না।

—কার কথা বলছেন?

—কেন, গতকাল রাত থেকে যে আপনার বাড়িতে এসে রয়েছে। জহুরি সুলেমান শেখ।

—ও হ্যাঁ। কিন্তু সে তো আমার বাড়ির কেউ নয়।

—সে এখন কোথায়? মেঘনাদ জিজ্ঞেস করে।

—সে এখনও এখানে আছে। দোতলার ঘরে। এইসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তার পেমেন্ট এখনও দিতে পারিনি।

—ভালোই হয়েছে। তার জবানবন্দি থেকেই শুরু করব। মেঘনাদ বলল।

।। দুই।।

কিন্তু জবানবন্দি পর্ব থেকে কিছুই বোঝা গেল না। বাড়ির কাজের লোকেরা সবাই পুরোনো। তাছাড়া রাতারাতি ঘরের বন্ধ তালা খুলে ঘরে ঢুকে আবার তালা লাগিয়ে যাওয়ার মতো মুরোদ কারুর নেই। তাছাড়া রাতারাতি ডুপ্লিকেট চাবিই বা তারা পাবে কী করে?

এবার আসা যাক জহুরি সুলেমান শেখের কথায়।

নামকরা জহুরি। মণি-মুক্তো যাচাই করা ছাড়াও হিরে-জহরত পালিশ করাও তার পেশা।

মেঘনাদ দোতলার একটা ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করল। সঙ্গে তার হিরে-জহরত পালিশ করার যন্ত্রপাতির একটা বড়ো ব্যাগ ছিল। তার মধ্যে সে রাতের খাবারও নিয়ে এসেছিল। আসলে এ সময়ে তার রোজা চলছে। তাই বাইরে জল পর্যন্ত খাওয়ার উপায় নেই তার। মেঘনাদ তার সেই ব্যাগটাও খুলে দেখল। সেখানে ভুক্তাবশেষ কিছু মটর-ছোলা দানা পড়ে ছিল। সুলেমান কাষ্ঠহাসি হেসে বলল,—জানেনই তো হুজুর, রোজার উপবাস শেষে সন্ধের পর শুধু ফলপাকুড় ছোলা দানা ছাড়া আর কিছু খাওয়া যায় না।

—হুঁ! মেঘনাদ বলল। তারপর আমরা নীচে নেমে এলাম।

নীহার সেন নীচের তলায় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন,—সুলেমানের সঙ্গে কথা হল?

মেঘনাদ বলল, —হ্যাঁ, চলুন। এবার বরং আপনার বাগানটায় একবার চক্কর দিয়ে আসি।

বাউন্ডারি ঘেরা বাগান। বাগানটা সত্যিই চমৎকার। নিয়মিত পরিচর্যা হয়। বাগানের মালি পূর্ণিয়াও আমাদের সঙ্গী হয়েছিল।

নীহারবাবু বললেন,—সারাদিনের অনেকটা সময় আমার বাগানেই কাটে।

পূর্ণিয়া হাত কচলে বলল,—হেঃ হেঃ...কত্তাবাবু গাছ ফুল পাখি খুব ভালোবাসেন। পাখিদের রোজ নিজের হাতে খাওয়ান।

মেঘনাদ কোনো কথা বলছিল না। কিন্তু ও যে সব

শুনছে, সেটা ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা নীহারবাবুর একতলা বেডরুমের পেছনটায় এলাম।

হঠাৎ নজর পড়ল নীহার সেনের ঘরের জানলার ধারে একটা বাঁশের মই দাঁড় করানো রয়েছে। ঠিক ঘরের দেয়ালের সেই ফোকরটার নীচে।

মেঘনাদ থমকে দাঁড়াল। পূর্ণিয়াকে জিজ্ঞেস করল, এখানে মই কে রেখেছে?

নীহারবাবুও অবাক হলেন। পূর্ণিয়া আমতা আমতা করতে লাগল।

সুলেমান শেখ এবার রিভলবারটা বাগিয়ে ধরেই এক পা এক পা করে পিছু হাঁটতে লাগল।

মেঘনাদ ততক্ষণে সেই মইটার নীচে খুঁজে পেয়েছে খুব সরু একটা লম্বা নাইলন সুতো।

মেঘনাদ সেই সুতোটা নাকের কাছে এনে বারকয়েক শুঁকল, তারপর দেয়ালের ফোকরটার দিকে তাকিয়ে কী ভাবল। তারপর নীহারবাবুকে বলল,—চলুন, আপনার ঘরটা আর একবার দেখব। আর যতক্ষণ না এ রহস্য উদ্ধার হয় কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়।

নীহারবাবু অবাক হয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মেঘনাদ ততক্ষণে বাড়ির ভেতরে পা বাড়িয়েছে।

মেঘনাদ ওর মোবাইল ফোনে অনেকক্ষণ কার সঙ্গে যেন কথা বলল।

ইতিমধ্যে ঘণ্টা দুই কেটে গেছে। নীহারবাবু আমাদের জন্য মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করেছেন।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন না করে পারলাম না,—হ্যাঁরে মেঘনাদ, এতক্ষণ কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলিস?

—ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্র।

অবাক হলাম। বললাম,---তুই কি রঙ্গদাকে এখানে আসতে বলেছিস?

মেঘনাদ বলল,—একটু অপেক্ষা কর অর্ণব, সব জানতে পারবি।

—রঙ্গদার কাছে কী জানতে চেয়েছিস, সেটা কি জানতে পারি?

—পুলিশের ক্রিমিনাল গ্যালারি থেকে কোনো এক অপরাধীর ক্রাইম রেকর্ড।

—কে সে?

—যে নীহার সেনের মহামূল্যবান হিরের নেকলেসটা বদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে উধাও করে দিয়েছে।

—তুই জেনেছিস, সে কে?

মেঘনাদ ওর মোবাইল ফোনের গ্যালারি থেকে একজনের ছবি দেখাল। কিন্তু চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, —এ কে?

মেঘনাদ বলল,—একটু অপেক্ষা কর বন্ধু। আজ দুপুরের খাওয়ার পর বাড়িতে উপস্থিত প্রতিটি মানুষকে নীহারবাবুর একতলার বেডরুমে হাজির থাকতে বলেছি। সেখানেই অপরাধীর মুখোশ খুলব।

।। তিন ।।

সেদিন বিকেল চারটে। নীহার সেনের একতলার বেডরুমে সবাই জড়ো হয়েছে।

একপ্রস্থ চা-পানের পর মেঘনাদ বলতে শুরু করল

জানলা-দরজা বন্ধ একটা ঘর। তালা-চাবি দেওয়া। সেই ঘরের মধ্যে থেকে দামি হিরের নেকলেস উধাও হল। কীভাবে সম্ভব!

স্বাভাবিক কারণেই নজরটা পড়ল সিলিং-এর কাছাকাছি ফোকরটার দিকে। কিন্তু ফোকর এতই ছোটো, কোনো মানুষ দূরের কথা জন্তুও ঢুকতে পারে না। তাহলে?

ঘরের মধ্যে দেখতে দেখতে গোটা দুয়েক পাখির পালক পেলাম। পায়রার পালক। নীহার সেন প্রতিদিন সকালে চড়াই-শালিকদের খাওয়ান, কিন্তু জিজ্ঞেস করে জানলাম ঘরে পায়রা ঢোকে না। তাহলে পায়রার পালক এল কেমন করে?

তারপর বাগানে গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল বাগানের দিকে ফোকরের কাছ পর্যন্ত একটা মই লাগানো রয়েছে। মই-এর নীচে লম্বা একটা বেশ শক্ত সরু নাইলনের সুতো। তখনই সন্দেহটা আরও দৃঢ় হল। এ সময়ে মনে পড়ল একজনের নাম। হীরালাল জালান। এক সময়ে সার্কাসে পাখির খেলা দেখাত। পরে সার্কাস ছেড়ে অন্য পেশায় ঢোকে। পুলিশের ক্রিমিনাল লিস্টে নাম ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্রকে। তিনি তৎপরতার সঙ্গে পুলিশের ক্রিমিনাল গ্যালারি থেকে হীরালাল জালানের ফটো বার করে পাঠিয়ে দিলেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ-এ। দেখুন তো নীহারবাবু, এই লোকটির ফটো দেখে চিনতে পারেন কি না?

বলতে বলতে মেঘনাদ তার ফোনের পিকচার গ্যালারি থেকে একজনের ফটো বার করে নীহারবাবুকে দেখাল। আমিও দেখলাম।

বছর চল্লিশ বয়সি এক ব্যক্তির ছবি। মাথায় টাক। দাড়ি-গোঁফ কামানো। নাঃ! একে তো এখানে কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে না।

নীহার সেনও সেই কথাই বললেন। আরও বললেন,—আমার হিরের নেকলেস চুরির সঙ্গে এই লোকের কী সম্পর্ক তো বুঝতে পারছি না।

—সম্পর্ক এটাই যে এই ব্যক্তিই আপনার বন্ধ ঘর থেকে পোষা পায়রার সাহায্যে আপনার হিরের নেকলেস চুরি করেছে।

—পোষা পায়রার সাহায্যে! আমারও মেঘনাদের কথাটা কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়।

মেঘনাদ বলে,—কেন? ইতিহাসে পড়িসনি, অতীতে পোষা পায়রার সাহায্যে গুপ্ত চিঠি আদানপ্রদান করা হত?

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নীহারবাবুকে বেশ বিভ্রান্ত মনে হল।

—তাহলে শুনুন। মেঘনাদ আবার বলতে শুরু করল আপনি আজ সকালে হিরের নেকলেসটা মনের ভুলে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রেখে ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে চলে গেলেন। তখন চোর বাগানের বাঁশের মইটা আপনার ঘরের পেছনে সিলিং-এর ফোকরটার সামনে রাখল। তারপর মইতে উঠে সে তার পোষা পায়রার গলায় সরু নাইলনের সুতোটা পরিয়ে ফোকরের মধ্যে দিয়ে ঘরে চালান করে দিল। সুতোর কনট্রোল রইল তার হাতে। সেই ট্রেনড পোষা পায়রা এরপর চোরের সুতোর সংকেত মতো ঘরের ড্রেসিং টেবিলের কাছে পৌঁছায় এবং হিরের নেকলেসটা ঠোঁটে তুলে নিয়ে চলে আসে ফোকরের বাইরে। চোর তখন তার ঠোঁট থেকে নেকলেস নিয়ে তাকে উড়িয়ে দেয়। পোষা পায়রা উড়ে যায় তার ডেরায়।

নীহার সেন বললেন,—কিন্তু আমি বুঝছি না, আমি বাড়ি থেকে বেরুবার পর চোর বাউন্ডারি পাঁচিল ডিঙিয়ে এল কী করে?

মেঘনাদ বলল,—চোর তো পাঁচিল ডিঙিয়ে আসেনি।

—তার মানে?

—তার মানে হীরালাল জালানকে আপনি না চিনতে পারলেও আমি এক্ষুনি আপনাদের চিনিয়ে দিচ্ছি আমার মোবাইলের ফটোশপের সাহায্যে।

বলতে বলতে মেঘনাদ তার মোবাইল ফোনের পিকচার গ্যালারি থেকে হীরালাল জালানের টাকমাথা দাড়ি-গোঁফহীন ছবিটা বার করে একটু কারিকুরি করতেই যে মুখটা বেরিয়ে এল তার চোখে চশমা, একমাথা কালো চুল আর দাড়ি-গোঁফ।

—আরে! এ তো সুলেমান শেখ! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি আর নীহার সেন।

—হ্যাঁ আমি। কিন্তু এরপর আপনারা নড়বার চেষ্টা করলেই আপনাদের মাথাগুলো ফুটো করে দেব। বলতে বলতে এবার উঠে দাঁড়াল সুলেমান শেখ। ওর হাতে লোডেড রিভলবার। দু-চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি।

সুলেমান শেখ এবার রিভলবারটা বাগিয়ে ধরেই এক পা এক পা করে পিছু হাঁটতে লাগল। এইভাবেই ও বেরিয়ে যেতে চায় আমাদের কবল থেকে। আশ্চর্য! মেঘনাদ কিছু বলছে না কেন? ওর মুখে রহস্যময় হাসি।

ওর এই হাসির অর্থটা বুঝলাম কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। দরজার কাছে পৌঁছেই সুলেমান শেখ ওরফে হীরালাল জালান আবার সামনের দিকে হেঁটে আসতে শুরু করল। এখন ওর হাত থেকে রিভলবার খসে পড়েছে। ওর দু-হাত ওপরে। আর ওর মাথার পেছনে রিভলবারের ধাতব নলটা ঠেকিয়ে যে মানুষটা এক পা এক পা করে ঘরে ঢুকছে, সে আমাদের সকলের প্রিয় ইনসপেকটর রঙ্গলাল তলাপাত্র ছাড়া আর কে?

মেঘনাদ হেঁকে বলল,—সাবাশ মিঃ তলাপাত্র, আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন।

উত্তরে রঙ্গদা অভ্যাস মতো নাক থেকে ফড়াৎ আওয়াজটা বার করে বললেন,—আয়্যাম অলওয়েজ পাংচুয়াল মেঘনাদবাবু। এ প্রমাণ তো আগেও পেয়েছেন।

বলতে বলতে সুলেমান শেখ ওরফে হীরালাল জালানকে ঘুরে দাঁড় করিয়ে তার হাতে খট্ করে ধাতব হাতকড়াটা পরিয়ে দিলেন। ❖

গল্প

বাপি ফিল্মস্টার

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

ছবি : শৈবাল দত্ত

'অ্যাকশন' বলতেই দৌড়ে গিয়ে উঁচু পাড় থেকে নদীতে ঝাঁপ দিল বাপি। ক্যামেরাটা ওর সঙ্গেই ট্রলি করে নদী পর্যন্ত গেল। বর্ষার নদী। খুব টান। বাপি মাথা উঁচু করে তার মধ্যেই সাঁতার কেটে চলেছে। একটু অপেক্ষা করে চিৎকার করল পরিচালক রাতুল বসু, 'কাট'। শব্দটা বাপির কানে পৌঁছল না। স্বাভাবিক। বাপি তখন অনেকদূরে চলে গেছে। তবে 'কাট' হতেই গ্রামের এক দঙ্গল বাচ্চা কাট-কাট-কাট বলতে-বলতে নদীর পাড় ধরেই দৌড়ে চলল। এক সময় ওদের দেখতে পেল বাপি। স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাড়ে চলে এল। সে প্রায় আধ মাইল তো হবেই! বীরচন্দ্রপুরের ঘাটে। মাটিতে পা দিয়েই বুঝতে পারল, তার গামছাটা আর কোমরে নেই। এই কথা বলতেই সেই বাচ্চাদের দল 'গামছা গামছা গামছা' বলে ফের উজানে ছুটল নিজেদের গ্রাম চাঁদপাড়ার দিকে। বাপি আর কী করে, নদীর পাড় ধরে-ধরে হাঁটতে লাগল। তবে বেশিক্ষণ নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বাচ্চারা ফিরে এল গামছা, প্যান্ট সব নিয়ে। বাপি এখন এই গ্রামের হিরো। বাপির জন্য সব করতে পারে ওরা।

জল থেকে গামছা পরে উঠে, হাফ-প্যান্টটা গলিয়ে নিল বাপি। শুটিং স্পটে এল। পরিচালক রাতুলদা বলল, 'বাপি, এখন আমরা লাঞ্চব্রেক দেব। খাব। কিন্তু তুই খাবি না। কেন বল তো?' বাপি তাকিয়ে থাকল রাতুলদার দিকে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ওর। সকালে একটু মুড়ি খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটার শুটিংটা ওকে দুবার করতে হয়েছে। একবার ক্যামেরাটা নীচে ছিল। আর একবার পাড়ের ওপরে। দশ ফুট ওপর থেকে ঝাঁপ, তারপর অতখানি সাঁতার! খিদে পাবে না! রাতুল পকেট থেকে একটা লজেন্স বের করে বাপিকে দিয়ে বলল, 'লাঞ্চের পরই আমরা আলপথ দিয়ে তোর দৌড়ে যাবার সিনটা তুলব। তার আগে যদি তুই খাস, তাহলে পেটটা ফুলে যাবে। ওদিকে সিনটায় কী লেখা আছে, যে অমল দু-দিন কিছু খায়নি। পেট-পিঠ এক হয়ে গেছে। তাই না! তোকে দেবাশিসকাকু স্ক্রিপ্টটা শুনিয়েছে তো! বল!' বাপি ঘাড় নাড়ল। 'তুই আর একটা লজেন্স নে। ওদিকটা গিয়ে বস। আমরা চট করে খেয়ে নিই।' বাপি নদীর পাড়ে গিয়ে বসল। ওর বন্ধুরা সবাই বাড়িতে খেতে চলে গেছে। বাপি লজেন্স দুটো চিবিয়ে খেয়ে নদীতে নেমে আঁজলা করে জল খেয়ে নিল। ওদের খাবারের গন্ধে আরও খিদে পাচ্ছে। একটু দূরে গিয়ে বসল বাপি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ডাক পড়ল। ওকে গাড়িতে তুলে ধুধুলিয়ার মাঠে গেল রাতুলদা। আগে থেকেই দেখে রেখেছিল মাঠটা। মাঠের শেষ কোথায় জানে না বাপি। শুটিংয়ের লোকরা দরগার সামনে থাকল। ক্যামেরা নিয়ে দেবাশিসকাকু, রাতুলদা, বাপ্পাদা খালের ব্রিজের ওপারে মনিরুলকাকার খেতের ওপর গেল। ক্যামেরা ওখানেই বসাল। খিদেয় বমি পাচ্ছে বাপির। পেটে মোচড় দিচ্ছে। সূর্যটা অস্ত যাওয়ার সময় শুটিং হবে। এখনও কিছুটা সময় বাকি। বাপিকে ডেকে রাতুলদা বুঝিয়ে দিল শটটা। খেতের এই আলপথটা দিয়ে দৌড়ে চলে যাবে বাপি। যতক্ষণ দেখা যাবে। বাপি বলল,

'কতদূর যেতে হবে?' রাতুলদা বলল, 'তুই যেতেই থাকবি। কক্ষনো পিছনে তাকাবি না। আমি চেঁচিয়ে কাট বললে তখন থামবি।'

'চা রেডি। চলে আসুন সবাই।' চেঁচিয়ে ডাকল পলাশদা। এই দাদাটা সবাইকে খাবার-চা-জল দিচ্ছে? বাপি গিয়ে বলল, 'আমাকে একটা বিস্কুট দেবে পলাশদা, খিদেয় গা বমি-বমি করছে।', ধমকে উঠল পলাশ। 'তুই কি পাগল! শুনলি না রাতুলদা কী বলল! শটটা দিয়ে নে, তারপর খাবার পাবি।' সবাই চা-বিস্কুট খেতে লাগল। বাপি গিয়ে ব্রিজের ওপর বসল। সূর্যটা এখনও তালগাছের অনেক ওপরে। মানে, আরও আধঘন্টা তো বটেই!

পুরো ইউনিট যেখানে বসে চা খাচ্ছে, সেখানে এই গ্রামের কিছু মুরুব্বিও আছেন। জগাকাকা তো আছেই। এই জগাকাকাই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে শুটিং পার্টিকে। থাকা-খাওয়া-শোওয়া থেকে শুরু করে কোথায় শুটিং করবে সে সব ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখানো, সব জগাকাকা করছে। শুটিং পার্টি একদিন জগাকাকাকে বলেছিল, ওদের সঙ্গে খাওয়ার কথা। জগাকাকা রাজি হয়নি। কাকা শুধু চা খায়। তো কাকা বলল, 'রাতুলবাবু, ছেলেটা সকাল থেকে না খেয়ে আছে। একটু কিছু দিলে হয় না! কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা।' রাতুল বসু পরিচালক। জগাকাকার দিকে চেয়ে বলল, 'সিনেমাটা না ভাবনার, চিন্তার বিষয়! একটা চরিত্র তৈরি করতে গেলে অনেক পরিশ্রম, বুদ্ধির দরকার হয়।' জগাকাকা চুপ করে থাকল। পাশেই বসেছিলেন দুর্গাদাদু। বললেন, 'তা তুমি ঠিকই বলেছ। সবটাই ভাবনার চিত্রায়ণ। তবু, বাপি তো বাচ্চা, খিদে পায়, তাই বলছিল জগা।' রাতুলদা চা খেয়ে গ্লাসটা নীচে রাখল। আকাশের দিকে একবার তাকাল। ক্যামেরাম্যান বাপ্পাকে বলল, 'ক্যামেরা রেডি কর। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শটটা নেব।' তারপর দুর্গাদাদুর দিকে ঘুরে বলল, 'দাদু, ওয়ার্ল্ড সিনেমার ভাষা পাল্টে গেছে। আপনারা এই ব্যাপারটা বুঝবেন না।'

রাতুল বসু অ্যাকশন বলতেই ছুটতে শুরু করল বাপি। খেতের ওপর ক্যামেরা বসানো হয়েছে। বাপি এঁকেবেঁকে আলপথ ধরে চলেছে। ক্যামেরা ওকে ধরছে। তালগাছের নীচে চলে এসেছে সূর্যটা। বাপি ছায়ার মতো তারই ভিতর দিয়ে যেন চলে যাচ্ছে। আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে বাপি, দিকচক্রবালে। ক্যামেরা ওকে ধরে আছে। ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ল দিগন্তবিস্তৃত খেত, দূরে বহুদূরে জঙ্গলের সারি, অস্তমিত সূর্যের কুসুম-কুসুম রঙে ভেসে যাওয়া ছোলা খেতের কচি পাতা। কাট। ক্যামেরাম্যান বাপ্পার চুলটা ঘেঁটে দিল রাতুল। বলল, 'মারাত্মক শট। যদি ঠিকঠাক হয়, তাহলে তোকে ট্রিট দেব।' বাপ্পা বলল, 'মনে তো হচ্ছে ঠিকঠাকই গেছে। চলো ক্যাম্পে ফিরে দেখবে।'

ওরা মাঠ থেকে ব্রিজ পেরিয়ে দরগার সামনে এল। গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়ি ধুলো উড়িয়ে স্কুলবাড়ির দিকে চলে গেল। বাপির কথা কারওর মনে পড়ল না। বাপি তখনও হেঁটে চলেছে। একসময় ঢলে পড়ল খেতের মধ্যেই।

গত দিন পনেরো আগে এই গ্রামে হঠাৎ এসে হাজির একটা বিশাল দল। সিনেমার লোকজন। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে নাকি আগেই কথা হয়েছিল। করোনার জন্য স্কুল বন্ধ। সিনেমার লোকজন সেই স্কুলেই থাকছে। টেবিল-বেঞ্চ সরিয়ে তোফা ব্যবস্থা করে দিয়েছে জগাকাকা। গণেশ ঠাকুর দু-বেলা রাঁধছে। বারোয়ারিতলায় প্রথম যেদিন মিটিং হয়েছিল, গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছিল। এই চাঁদপাড়া গ্রামের একটা আক্ষেপ ছিল, এখানে কখনো সিনেমার শুটিং হয়নি। পাশাপাশি একটা-দুটো গ্রামে শুটিং হয়েছে। সিনেমায় সেই গ্রামের অধিবাসীদের নামও লেখা হয়েছে। কিন্তু চাঁদপাড়ায় সব কিছু থাকতেও কোনো এক অজানা কারণে কোনো সিনেমা পার্টি আসেনি। যে-গ্রামে দুর্গাদাদুর মতো মানুষ আছে, যাকে পাঁচগাঁয়ের লোক এক ডাকে চেনে, সেই গ্রামে শুটিং না হওয়াটা খুবই লজ্জার! সেই কবে, আজ থেকে একশো দশ বছর আগে, রামেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ব্রিটিশ সরকার এই গ্রামে ডেটিনিউ করে রেখেছিল। রামেন্দ্রসুন্দরবাবু দশ বছর আন্দামানের জেলে ছিলেন। তখন এই চাঁদপাড়ার নাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর থেকে ফাঁকা। আর কিছু নেই। স্টেশনের পাশে ভোজপুর গ্রামে গত বছর সিবিআই এসেছিল, কাকে একটা ধরতে। তা নিয়ে গ্রামবাসীদের সে কী গর্ব, আদিখ্যেতা! সিবিআই এসেছে, নাকি নেতাজি সুভাস বোস এসেছে বোঝা দায়!

বারোয়ারিতলায় শুটিং পার্টির ডিরেক্টর রাতুল বোস আর জনা পাঁচেক লোক এসেছিল। একটা বাচ্চা ছেলেও ছিল। তন্ময়। ওই নাকি হিরো। এছাড়া দু-চারজন পরিচিত অভিনেতা আছেন এই শুটিংয়ে। তন্ময়কে সবাই চিনতে পারল। অনেক সিরিয়ালে অভিনয় করে। দাদাগিরিতেও এসেছিল একবার।

সিনেমার নাম 'শহর থেকে একটু দূরে'। তা ভালো। কিন্তু কোনো হিরো-হিরোইন নেই শুনে গ্রামের অর্ধেক লোক ফাঁকা হয়ে গেল। পরের দিন থেকে মহা সমারোহে শুটিংয়ের তোড়জোড় শুরু হল। কোথায়-কোথায় শুটিং হবে তা দেখতে গাড়ি, ভ্যানরিকশা করে সবাই চলল। গ্রামের বাচ্চারা পিছন-পিছন ট্যা-ট্যা করে ছুটল।

বাপি তখনও যায়নি। ডোবায় পাট পচেছে। ফ্যাসা ফাঁসাতে হচ্ছে। মহাজন তাগাদা দিয়ে গেছে। সামনের মাসের প্রথম হাটে ডেলিভারি নেবে। তবে মন পড়ে আছে শুটিংয়ের ওখানেই। কিন্তু উপায় নেই, কাজটা তুলতেই হবে।

তারও দিন দুয়েকের মধ্যে হইহই করে শুটিং শুরু হয়ে গেল। দু-দিন যেতে না যেতেই মারাত্মক এক সমস্যা হাজির হল। ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া ছেলে খালি পায়ে হাঁটতেই পারে না! কাদায় নামতে পারে না! এঁটেল মাটি হলে একরকম, বালি মাটি হলে অন্যরকম ভাবে হাঁটতে হয়, না হলেই ধপাস। কে শেখাবে ওকে কায়দা! সাঁতার কাটে সুইমিং পুলে। নদীতে নামার কথা শুনে ভয়ে দিশাহারা! গাছে উঠতে গিয়ে হাঁটুর ছালচামড়া তুলে ফেলেছে। তার ওপর আবার কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়েছে! সর্বনাশের যেটা বাকি ছিল, একদিন বৃষ্টিতে শুটিং করে ধুম জ্বর এল। তার বাবা-মা একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেলেন। এমন করতে লাগলেন যেন এই গ্রামে কারওর কোনোদিন জ্বরজারি হয়নি! অসুখবিসুখ হয়নি। ডাক্তার বদ্যি নেই! গণ্ডগ্রাম! পরিচালক জেনেবুঝে তাঁদের ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। সামনে কত শুটিং। কত সিরিয়াল। এই ফালতু সিনেমার জন্য জীবনটা না চলে যায়! ওরে বাবা!

সন্ধেবেলায় লাইব্রেরিতে এল পরিচালক রাতুল বসু। দুর্গাদাদুকে

বলল, 'তন্ময়কে তো তার বাবা-মা নিয়ে চলে গেল। কী করি বলুন তো!' দুর্গাদাদু বললেন, 'আমরা গ্রামের লোক। সিনেমার ব্যাপারে কীই বা জানি! তোমরা সাহায্য চেয়েছিলে। যথাসাধ্য করেছি। তাছাড়া এখন তো ওয়ার্ল্ড সিনেমার ভাষাটাও বদলে গেছে।' সবাই চুপ। জগাকাকা মনে-মনে ফুঁসছে। দুর্গাদা যোগ্য জবাব দিয়েছে! দুর্গাদাদু বললেন, 'দেখো, ওয়ার্ল্ড সিনেমার ব্যাপারে তো কিছু করতে পারব না। তবে, যদি দিশি ছবি বানাতে চাও, ভাবনা অনুযায়ী শেকড়ের সন্ধান করতে চাও, তাহলে চেষ্টা করতে পারি।' বিশ্ব পরিচালক রাতুল বসু প্রায় পায়ে পড়ে আর কী। দুর্গাদাদু বললেন, 'এই কেউ যা তো রে, হারানের ছেলে বাপিকে ডেকে নিয়ে আয়। বল আমি ডাকছি। হারানকেও আসতে বলবি।'

বাপিকে দেখেই ক্যামেরাম্যান বাপ্পা বলে উঠল, 'আশ্চর্য, অদ্ভুত মিল! শুধু রংটা একটু চাপা!'

পরের দিন থেকেই শুটিং চালু হয়ে গেল। বাপি এখন হিরো। সিনেমার শুটিং হচ্ছে বলে গর্বে চাঁদপাড়ার লোকেদের চালচলন একটু পাল্টেছিল। এবার বাপি হিরো হওয়ার জন্য মাটিতে আর পা পড়ে না। গ্রামেরই একটা দিকে রেডিমেড মাটির বাড়ি করেছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় সত্যি বাড়ি। ভেতরে ফাঁকা! বাপি প্রচণ্ড খাটছে। দুর্দান্ত অভিনয় করছে। ওর মা যে হয়েছে, সে টিভিতে খুব সিরিয়াল করে। বাপির বাবা তো সিনেমায় একবার হিরো দেবের বাবা হয়েছিল! দুর্গাদাদুকে আলাদাই খাতির করছে সিনেমার লোকজন। শুটিংয়ের ফাঁকে-ফাঁকে ওরা, বিশেষ করে ক্যামেরাম্যান বাপ্পা টুকটুক করে কথা বলছে দাদুর সঙ্গে। চা আসছে বারবার। দাদুও ধামায় করে মুড়ি-মুড়কি, খেত থেকে কিলোখানেক শশা দিয়েছে দু-তিনদিন। দারুণ মজা।

দিন পনেরো পর সারা গ্রামকে কাঁদিয়ে শুটিং পার্টির শেষ গাড়িটাও চলে গেল। যাওয়ার আগে দুর্গাদাদু ক্যামেরাম্যান বাপ্পার হাতটা ধরে বললেন, 'আমাদের গ্রামের নাম আর মানটা রেখো। অসম্মান যেন না হয়।'

পেটে ভাত নেই। সামর্থ্য নেই। একটা নতুন জামা কেনার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এই কুড়ি-পঁচিশ দিনে শুটিং পার্টি বাপির মাথার মধ্যে একরাশ স্বপ্ন বুনে দিয়ে গেল। এতদিন কাজ করিয়ে মাত্র দু-হাজার টাকা দিয়েছে বাপির বাবাকে। জগাকাকার মোবাইল নাম্বার নিয়ে গেছে। বলেছে ব্যাংকে নাকি কী করে যেন টাকা ঢুকিয়ে দেবে পরে।

বাপি সেলেব্রিটি হয়ে গেল। ভিন্নভিন্ন গ্রামের লোকজন আসছে ওর কাছে শুটিংয়ের গল্প শুনতে। কত ছেলে আসছে জগাকাকার কাছে, ওই শুটিংয়ের লোকেদের নম্বরের জন্য। হাটখোলার পল্টুর কম্পিউটারের দোকানে কত শত ছেলেমেয়ে টিভিতে নাচ, গানের প্রোগ্রামে যোগদানের ফর্ম জোগাড় করার জন্য ঘুরে-ঘুরে পায়ে ফোস্কা ফেলে দিল।

দেখতে-দেখতে বছর পেরিয়ে গেল।

করোনার প্রকোপ কিছুটা কমেছে। স্কুল কখনো খুলছে, আবার কিছুদিন পরে বন্ধ হচ্ছে। শুটিংয়ের আর কোনো চিহ্নই নেই এই গ্রামে। মাঠের শেষে যে মাটির বাড়িটা তৈরি হয়েছিল, তার ওপর দিয়ে ট্রাকটর চলে গেছে। দেড়ফুট দু-ফুট ধান লকলক করছে। গণেশকাকার জমি। বাপিদের ডোবায় ফের পাট পচেছে। বাপি দু-বেলা আঁশ ছাড়াচ্ছে। এবার ওর ক্লাস এইট। আগেরবার খুব খারাপ রেজাল্ট হয়েছে। হঠাৎ সাধন, ফয়জল, লাল্টু ছুটতে-ছুটতে এল। 'বাপি শিগগির চল। দুর্গাদাদু তোকে ডাকতেছে।' বাপি বলল, 'পাটের আঁশ পাকিয়েছি হাতে। কী করে যাব!' ফয়জল বলল, 'তুই আমারে দে। দু-জনে হাত লাগালি চট করে হয়ে যাবে নে।' সাত-দশ মিনিটের মধ্যে ফ্যাঁসা গুটিয়ে রেখে ওরা ছুটল দুর্গাদাদুর বাড়ি।

সাপুড়ের ঝাড়ফুঁক সব ভক্কিবাজি, এখন জানে সবাই। বাপি তবু শট দিয়েছিল।

দুর্গাদাদু দাওয়ায় বসেছিলেন। বাপিরা আসতেই বললেন, 'আরে তোর ফিল্ম রিলিজ করছে। কলকাতা যেতে হবে। হাটখোলার মাখনকে বলা আছে, ওর দোকান থেকে ফুলপ্যান্ট আর জামা নিয়ে আয়। পাদুকালয় থেকে হাওয়াই চটিও নিস। সবাইকে বলা আছে।' বাপি যতখানি লাফাল, তার থেকেও বেশি লাফাল ওর বন্ধুরা। সিনেমা রিলিজ করছে! সঙ্গে সঙ্গে ফয়জল দৌড় লাগাল। 'বাপির সিনেমা সিনেমা সিনেমা।' ওর সঙ্গে ছুটল গোটা গ্রামের বাচ্চারা। হইহই চইচই হট্টগোল। ধুন্ধুমার কাণ্ড।

এক বছরের আগের পরিবেশ ফিরে এল। গোটা গ্রাম মেতে উঠল সিনেমাতে। বাপি আগে কখনো ফুলপ্যান্ট পরেনি। চটিও

পরেনি। এই গ্রামে কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়েই চটি-জুতো পরে না। শুটিং করতে এসে সিনেমার লোকরা হাসাহাসি করছিল এটা নিয়ে। অবশ্য দুর্গাদাদুর মতো কিছু কিছু বড়োরা পরে। আর যারা স্টেশন বা কলকাতায় যায়, তারা তো পরেই। বাপির জন্য হাওয়াই চটিও কেনা হল। দাদু বললেন, মহালয়ার দিন ছবি রিলিজ করবে। কলকাতায় খোঁজ নিয়ে জেনেছে। চায়ের দোকানের শিবনাথ জ্যাঠার মেয়ে কলকাতার কলেজে পড়ে। ও ব্যাপারটা কনফার্ম করেছে, ফেসবুক দেখে। তারপর এখানেও অনেকে ফেসবুকে দেখেছে ট্রেলারটা। বাপির মুখটা ভালো করে দেখা যায়নি। তবে, নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে। আলপথ দিয়ে দৌড়চ্ছে। তালগাছের ওপর থেকে পুকুরে লাফাচ্ছে। বৃষ্টির মধ্যে কচুপাতা মাথায় যেতে গিয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। হাতের খলুই থেকে জ্যান্ত মাছ পথে পড়ে ছটফট করছে। সঙ্গে হেভি মিউজিক বাজছে। সবথেকে ভয়ংকর, যে-দৃশ্যটা করতে গিয়ে বাপি মরতে-মরতে বেঁচে গেছিল, সেই সাপের ছোবলটা একেবারে শেষে রেখেছে। সত্যি, সেদিন একটা অঘটন হতেই পারত! বাপি বলে সামলে নিয়েছে। গোলাম সাপুড়েকে বলা হয়েছিল, দাঁত-ভাঙা গোখরো আনতে। গোলামের কাছে তখন গোখরো ছিল না। লকডাউন। ট্রেন বন্ধ। ব্যবসা নেই। গোখরো মরে গেছে। গোলাম গোপন করেছিল। হাজার টাকার লোভে জঙ্গল থেকে সদ্য গোখরো ধরে ঝাঁপিতে পুরে নিয়ে এসেছে। লেজে কালো সুতলি বেঁধে শুটিংয়ে লাগিয়েছে। বাপি দেখেই বলেছিল, 'ও চাচা, এর তো বিষদাঁত আছে গো, ভাঙোনি যে বড়ো!' গোলাম বলেছিল, 'কাল রেতে ধরেছি। সাবধানে খেলে দে না। তোকে নয় দশটা ট্যাকা দেব। কাউরে বলিস না। ত্যালে আমার ট্যাকা মার যাবে।' বাপি করেছিল। সাপ ছোবল মেরেছিল। মুহূর্তে বাপি হাত সরিয়ে নিয়েছিল। একটু এদিক-ওদিক হলে মৃত্যু কেউ আটকাতে পারত না। সাপুড়ের ঝাড়ফুঁক সব ভক্কিবাজি, এখন জানে সবাই। বাপি তবু শট দিয়েছিল। শুধু গোলামচাচা টাকা পাবে বলে। শুটিংয়ের পর গোলামচাচা ধাঁ। তবে, এসব নিয়ে ভাবছে না বাপি। দুর্গাদাদু বলেছেন, সিনেমার ওরা নাকি বারবার বলে গেছিল, বাপি প্রচুর টাকা পাবে। হাজার পঞ্চাশ তো বটেই। বাপির বাবা এতদিন ঘরের চালটা গোঁজা দিয়ে আসছিল। এবার পুরো খড় ফেলে ছাইবে। তারপরেও প্রচুর টাকা থাকবে। তাতে ধান পালিশের একটা মেশিন কেনার কথাও ভেবেছে।

সেদিন ভোর তিনটের সময় দুর্গাদাদু তর্পণ সেরে নিলেন। দুর্গাদাদুর সঙ্গে বহু মুরুব্বিও তর্পণ করলেন। এই গ্রামের সংস্কারে পুণ্যতোয়া এই নদী। আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে এই ধুধুলিয়া গ্রাম ছিল না। এটা ছিল সাতক্ষীরার মধ্যে। তখন গোবরডাঙা দিয়ে ইছামতীর একটা ধারা উল্টোডাঙা হয়ে গঙ্গায় মিশত। সেই জল-পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। তখনকার এক জমিদার রমানাথ রায় ধুধু জঙ্গলের এই এলাকা ইজারা নেয়। তিনি গঙ্গা-ইছামতীর সেই ধারা থেকে নদী কেটে নিয়ে আসেন এই গ্রামের ভিতর দিয়ে। নাম হয় কাটি গঙ্গা। আশপাশের কত নদী হেজেমজে গেছে। কিন্তু এই কাটি গঙ্গায় এখনও জোয়ারভাটা খেলে। বাপিকে জোর করে ঘুম থেকে তুলে নদীতে নিয়ে এল বন্ধুরা। বাপি তিন ডুব দিল। গ্রামের সবাই প্রায় উঠে পড়েছে। আজ মহা পুণ্যের দিন। আনন্দেরও। বাপির সিনেমা আজ মুক্তি পাচ্ছে। গ্রামের কত গর্ব! বাপি বাড়ি গিয়ে জামাপ্যান্ট পরে নিল। বারোয়ারিতলার মাটি কপালে ঠেকিয়ে দুর্গাদাদুর সঙ্গে ভ্যানে চাপল। কাঁধের ঝোলায় চিঁড়ে, আখের গুড়, বাতাসা। একখানা হাফপ্যান্ট, গামছা।

ট্রেন-বাস সামলে বিকেলে কলকাতার ভবানীপুরে এসে নামল ওরা। দাদু দেখালেন, 'দ্যাখ, এই হচ্ছে বিজলী সিনেমা হল। কত বিখ্যাত-বিখ্যাত সিনেমা রিলিজ করেছে। উত্তমকুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস। কত পরিচালক, সত্যজিৎ রায়, তরুণ মজুমদার, রাজেন তরফদার, অজয় কর। আজ তোর ছবি রিলিজ করবে। আমার হাতটা ধরে দেখ বাপি, কীরকম কাঁটা দিচ্ছে! কত ছবির প্রথম দিন এখানে এসেছি। কত শিল্পী, কত আলো। আজ সব আলো তোর ওপর পড়বে। দেখবি তোকে নিয়ে কেমন হইচই হয়! তার আগে চল, একটা বিখ্যাত দোকান থেকে তোকে কচুরি ছোলার ডাল খাইয়ে নিয়ে আসি।'

ওরা কচুরি খেয়ে যখন এল, তখন সিনেমা হলের সামনে বেজায় ভিড়। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ। ক্যামেরা হাতে কতগুলো লোক সামনে জটলা করছে। পুলিশ ওদের সরাচ্ছে। ওরা সরবে না। ঝগড়া চলছে। দাদু বললেন, 'কী বুঝছিস বাপি! এরা সব প্রেসের লোক। সাংবাদিক। এত পুলিশ যখন, তখন নিশ্চয়ই মন্ত্রীফন্ত্রী আসবে। এবার দেখ, কী কাণ্ডটাই না হয়! আয় আমার সঙ্গে।' বাপি শক্ত করে দুর্গাদাদুর হাতটা ধরল। ওর ছোট্ট বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছে। দাদু বলেছেন, ওরা নিশ্চয়ই আজকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে। বাবা অপেক্ষা করে আছে। বোরো ধান উঠেছে। চাল পালিশের একটা ছোটো মেশিন কিনবে ভাবছে। হাজার বিশেক টাকা লাগবে। দাদুর হাত ধরে বাপি ভিড়ের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করল। পুলিশ বাধা দিল। দাদু বললেন, 'এর নাম বাপি। এই ছবির শিল্পী। ঢুকতে দিন আমাদের।' পুলিশ বলল, 'কার্ড আছে?' দাদু বললেন, 'কার্ড কী হবে? আর্টিস্টের আবার কার্ড লাগে নাকি!' পুলিশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'কেন আপনি প্রসেনজিৎ নাকি! কার্ড ছাড়া কেউ অ্যালাউ নেই। রাস্তার ওধারে গিয়ে দাঁড়ান। এক্ষুনি মন্ত্রী আসবে। তখন কিন্তু ঠেলা খাবেন। যান।'

ওরা ভিড় থেকে বেরিয়ে এল। দাদু পকেট থেকে মোবাইল বের করে নাম্বার খুঁজতে লাগলেন। ক্যামেরাম্যান বাপ্পাদা ওর নাম্বারটা দাদুকে দিয়েছিল। ডায়াল করলেন। বেজেই গেল বেজেই গেল বেজেই গেল। হঠাৎ বেজায় হই-হট্টগোল। নীল বাতির গাড়িতে কারা সব এলেন। মন্ত্রী হবেন নিশ্চয়ই। প্যাঁপুঁ শব্দ। পুলিশের লাফালাফি। প্রেসের লোকদের হুড়োহুড়ি। একজন নেমে ক্যামেরার সামনে কী যেন বললেন। দাদু বারবার করে এগোতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিছুতেই পারছেন না। তখনই দেখতে পেলেন রাতুল বসুকে। দাদু চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'রাতুলবাবু, এই যে আমরা এখানে। রাতুলবাবু, আমি বাপিকে নিয়ে এসেছি। রাতুলবাবু।' রাতুল বসু মোবাইলে কার সঙ্গে যেন উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে-বলতে ভিতরে ঢুকে গেল। তারপরেই দেখা গেল বাপ্পাকে। দাদু নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, যাক বাবা, এতক্ষণে একটা হিল্লে হল। 'বাপ্পা, এই বাপ্পা। বাপ্পাবাবু!' বাপ্পা তাকাল।

দাদু বললেন, 'কেমন আছেন? বাপিকে নিয়ে এলাম। এরা ঢুকতে দিচ্ছে না!' বাপ্পা বিগলিত হাসল। বলল, 'ভালো আছেন?' দাদু বললেন, 'এরা ঢুকতে দিচ্ছে না। বলছে নাকি কার্ড লাগবে! কী যন্ত্রণা বলুন তো ভাই! বলছি আর্টিস্ট! শুনছে না।' বাপ্পা বলল, 'হ্যাঁ, মন্ত্রী এসেছে তো, দিনকাল খারাপ। খুব কড়াকড়ি।' দাদু বললেন, 'বাপ্পা আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। চাঁদপাড়া গ্রাম। এই যে বাপি! এই ছবির হিরো! চিনতে পারছেন না!'

ঠিক তখনই আর একটা গাড়ি এল। দরজা খুলে নামল সেই ছেলেটা, তন্ময়। যে কাদায় হাঁটতে পারছিল না। নদীতে নামতে ভয় পাচ্ছিল। যার একদিন বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর এসেছিল! চলে গেছিল শুটিং না করে। সেই ছেলেটা। সঙ্গে তার বাবা-মা। পিছনের গাড়িতে আর একজন নামলেন। সারা গায়ে গয়না ঝকমক করছে। তন্ময়কে জড়িয়ে রাখলেন। প্রেসের লোকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভদ্রমহিলা বললেন, 'কী যে কষ্ট করে শুটিং করেছে তন্ময় তা আপনারা ভাবতেও পারবেন না। বর্ষার নদীতে সাঁতার কাটা, যখন-তখন অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত। ওই কাদায় হাঁটা! কাঁটা ফুটতে পারত! পয়জেনাস সাপ ধরা! সাপ ছোবল মারতে পারত! তবুও করেছে। সাংঘাতিক কষ্ট করেছে। এবার ওর ইন্টারভিউ নিন। ভালো করে দেখাবেন টিভিতে। বুঝতেই তো পারছেন, কানেকশনটা কী!' টিভির লোকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তন্ময়ের ওপর।

দাদু চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করলেন, মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে। সব করেছে এই ছেলেটা, বাপি। ছবির সেভেন্টি পার্সেন্ট আউটডোর শুটিংয়ে ও অভিনয় করেছে। নিশ্চয়ই স্টুডিয়োতে সেট ফেলে বাকি শুটিং হয়েছে ওই তন্ময়ের। শুনুন আমার কথা, শুনুন। আমি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য। পাঁচ ছয় সাত দশকে পঞ্চাশের বেশি ছবির প্রচার সচিব। তিরিশটা ছবির সহকারী চিত্রনাট্যকার। আশুতোষ কলেজের প্রাক্তন প্রফেসার। আমার কথা শুনুন। কালকের খবরের কাগজে জায়গা পাওয়া উচিত বাপির। শুনুন শুনুন দয়া করে।

প্যাঁপু-প্যাঁপু করে আর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। দেব এসেছে। লোকজন হামলে পড়ল। পুলিশ সরাতে লাগল সবাইকে। বিরাট গণ্ডগোল। শেষ পর্যন্ত ধাক্কা দিতে লাগল। সেই ধাক্কায় রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল বাপি। দাদুর চোখ থেকে চশমা ছিটকে গেল।

ভয় পেয়ে বাপি চিৎকার করে উঠল, 'তন্ময়য়য়য়!'

ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে গেটে ঢুকছিল তন্ময়। বাপির ডাক কানে গেল। মুহূর্তে ফিরে তাকাল। সবাইকে সরিয়ে ছুটে এল। বাপিকে তুলল। 'তুই এসেছিস! চল আমার সঙ্গে।' বাপি হাত বাড়িয়ে দাদুকে আঁকড়ে ধরল।

এই প্রথম বাপি সিনেমা হলে ঢুকল। কী ঠান্ডা ভেতরটা! ছবি শুরু হল। বাপি অবাক! একবারও ওকে দেখা যাচ্ছে না! সব কিছু করছে ও। সামনে ফিরলেই তন্ময়ের মুখ। আধঘণ্টা পর বাপি ফিসফিস করে দুর্গাদাদুকে বলল, 'দাদু, সিনেমাতে তো আমি থেকেও নেই!' দাদু বললেন, 'তাই তো দেখছি! গ্রামের কত মানুষ ছিল, তারাও নেই!' বাপি বলল, 'দাদু, তাহলে চলো। এখানে থেকে আর কাজ নেই। রাতেই গাঁয়ে ফিরে যাই। এত শব্দ, ধোঁয়া সহ্যি হচ্ছে না বলো। দম বন্ধ হয়ে আসতেছে।' দুর্গাদাদু বললেন, 'যাবি! তাহলে চল, এখনই পালাই।'

বাপি হল থেকে বেরোবার আগেই কে যেন ওর হাতটা ধরল। পিছন ফিরে দেখল তন্ময় দাঁড়িয়ে আছে। বাপি বলল, 'কী রে তুই!' তন্ময় বলল, 'এই সিনেমায় তো আমি পুরোটা নেই! আদ্ধেক তুই আদ্ধেক আমি! আমাকে নিয়ে যাবি তোর সঙ্গে!'

হল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সন্ধে নেমে গেছে। বাপি বলল, 'এখানে তোর এত শুটিং, এত কাজ, তুই যাবি আমাদের সঙ্গে, কেন!' তন্ময় বলল, 'আমার তো কাজ না! বাবা-মায়ের কাজ। তাদের ইচ্ছে। আমার না। আমি শুটিং করি, ফাংশন করি, গান করি, নাচ করি, হাসি-কাঁদি সব বাবা-মায়ের পছন্দের জন্য! আমি তো পড়তে চেয়েছিলাম। কাদা মাঠে ফুটবল খেলতে চেয়েছিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে লেকে সাঁতার কাটতে চেয়েছিলাম। সেদিনও তোর মতো নদীতে ঝাঁপাতে চেয়েছিলাম। বাবা-মা চায়নি। আমাকে নিয়ে চল না রে! আমি আর পারছি না।'

সকাল সাতটা।

নৌকাটা দুলে-দুলে নিজেই বয়ে চলেছে। পাটাতনে শুয়ে আছে বাপি আর তন্ময়। কাল রাতের ট্রেনেই ওরা ফিরে এসেছে গ্রামে। তন্ময়ের হাসি আর থামে না। বলল, 'কলকাতায় এখন যা হচ্ছে না, হেভি ব্যাপার! বাবা-মা যে কত নেতা-মন্ত্রীকে ফোন করে ফেলেছে সারারাত ধরে! পুলিশ-ফুলিশ একাকার! মা আবার কথায়-কথায় প্রেসের লোকদের ফোন করে। তারজন্য কত মেক-আপ করে!' শুয়ে শুয়েই নদী থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে চোখমুখে ছেটাল তন্ময়। আর এক আঁজলা নিয়ে খেল। বলল, 'জানিস, আমি করোনার দ্বিতীয় বছর পরীক্ষাই দিতে পারিনি। ভুবনেশ্বরে শুটিং করতে গিয়েছিলাম। অনলাইন পরীক্ষা ছিল। কিন্তু শুটিংয়ের লোকরা ছাড়েনি। বাবা-মা-ও চায়নি! হ্যাঁ রে বাপি, নৌকা থেকে নদীতে ঝাঁপ দেব?' বাপি বলল, 'তুই সাঁতার জানিস তো!' তন্ময় বলল, 'হ্যাঁ, জানব না কেন? একটা সিনেমার জন্য শিখতে হয়েছিল। ভালোই কাটতে পারি।' বলেই তন্ময় দাঁড়িয়ে উঠে ঝাঁপ দিল নদীতে। নৌকার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার কাটতে লাগল। চেঁচিয়ে বলল, 'বাপি, তুইও আয়।' বাপি দাঁড়টা নৌকায় রেখে লাফ দিল। দুজনে সাঁতরে চলল। খানিক পরে নৌকার ওপর উঠে হাঁপাতে লাগল তন্ময়। বাপিও উঠে পড়েছে। তন্ময় হেসে বলল, 'বাপি, তুই চল আমার সঙ্গে। ডিরেক্টরদের সঙ্গে কথা বলে তোকে ফিল্মে চান্স পাইয়ে দেব।' বাপি বলল, 'ওরে বাবা, আমি পারব না ওই গাড়ির শব্দ, ধুলো-ধোঁয়ার মধ্যে থাকতে।' তন্ময় বলল, 'আমিও সব ছেড়েছুড়ে এখানে চলে আসতে পারব না। আমি যে সোনার ডিম পাড়া হাঁস। বাবা-মা এই এল বলে পুলিশ নিয়ে!

'তবে আমি বাপি হয়ে গেলাম, একদিনের জন্য হলেও।' বাপি বলল, 'শুধু আমার আর ফিল্মস্টার হওয়া হল না।' তন্ময় বলল, 'তাহলে চল পাল্টাপাল্টি করে ফেলি জীবনটা!'

ওরা দুজনেই হাসতে লাগল। বলল, 'ধুস, তাই আবার হয় নাকি!' নৌকা দুলে-দুলে বয়ে চলল। নদী কত কথা বলে ফেলল। কত গান গেয়ে উঠল। ওরা হেসেই চলল। ওদের ছোট্ট জীবনটা ভেসেই চলল। ❖

তারিকের পাহাড়

শ্যামলী আচার্য

ছবি : শৈবাল দত্ত

"চটপট সব বন্ধ করো সিগেরিকো। শহরে গোলমাল শুরু হয়েছে।"

মনোযোগ দিয়ে একটি সোনার মুকুটে রত্ন বসানোর কাজ করছিল সিগেরিকো। রাজধানী টলেডো শহরের নামী স্বর্ণকার সে, তার হাতের কাজের প্রশংসা সর্বত্র। দূর-দূরান্ত থেকে তার কাছে অলঙ্কারের জন্য খরিদ্দার আসে। অনেকেই তারা নামী-দামি মানুষ।

সিগেরিকো নিজের হাতের কাজ থেকে চোখ সরায় না। আলতিফ এইরকমই। বড্ড ছটফটে। অল্প বয়স হলে যা হয়।

"গোলমাল তো কতদিন ধরে লেগেই আছে। তুমি স্থির হও একটু।"

প্রাপ্তবয়স্ক সিগেরিকোর কথায় আলতিফ থামে না।

"আঃ, বিপদ একেবারে দোরগোড়ায়। আমাদের রাজা উইতিজা আর নেই। শহরে বলাবলি চলছে, রাজপুত্র রোডেরিক নাকি তাঁর বাবাকে হত্যা করেছেন।"

সিগেরিকো চোখ তুলে তাকায়।

"এত ছটফট কোরো না আলতিফ। আমাদের রাজা উইতিজার কত বয়স হয়েছিল জানো তো। বয়সের কারণে এমনিই তাঁর মৃত্যু হত। একজন বৃদ্ধ পিতাকে মেরে রাজপুত্রের কী লাভ বলতে পারো?"

"অতশত জানি না। তুমি বাড়ির মধ্যে চলে যাও। তোমার মূল্যবান জিনিসপত্র সামলে রাখো। লুঠপাঠ শুরু হল বলে।"

সিগেরিকো হাসে। প্রশান্ত সে হাসি।

"আলতিফ, মনে রেখো, রাজা আসে রাজা যায়। কিন্তু যিনিই প্রশাসনে আসেন, তাঁর দায় থাকে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার। রাজপুত্র রোডেরিক শাসনভার নিলে অবশ্যই তিনি কড়া হাতে নৈরাজ্য দমন করবেন। আমার ভরসা আছে প্রশাসনের ওপর। তবে হ্যাঁ, বিদেশি শক্তি আক্রমণ করলে তখন চিন্তার বিষয় বইকি।"

"বেশ, তবে তুমি যা ভালো বোঝো করো। আমি চললাম", চলে যেতে যেতে একেবার ঘুরে দাঁড়ায় আলতিফ, "শুধু জানিয়ে যাই, দুই রাজপুত্রের মধ্যে সিংহাসনের দখল নিয়ে লড়াই শুরু হল বলে। রোডেরিক আর আকিলা দুজনের কেউই কি রাজত্বের অধিকার ছাড়তে চাইবে?"

সিগেরিকো সাড়া দেয় না। এই তথ্য নতুন কিছু নয়। ভিসিগথদের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন উইতিজা। অসুস্থ হয়ে পড়ার পরেও তাঁর বিশ্বস্ত অমাত্যরা রাজ্যশাসন করেন যথাযোগ্য মর্যাদায়। যথাসময়ে রাজার দুটি সুযোগ্য পুত্র রাজ্যের দুই প্রান্তের শাসনের দায়িত্ব পেয়েছে। হিস্পানিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশের শাসক তাঁর এক পুত্র আকিলা আর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের বাইটিকা অঞ্চলের শাসনভার এতদিন ছিল রোডেরিকের হাতে। কিন্তু,

ক্ষমতার নিয়মই এই। নেশাগ্রস্ত হয়ে একাই সবটা কুক্ষিগত করতে চায়। কাজেই রোডেরিক আর আকিলা এখন নিজেদের শিবিরের লোকজন নিয়ে পুরো আইবেরিয়ান উপদ্বীপ অঞ্চলে একচ্ছত্র অধিপতি হতে চাইবে, এ আর নতুন কথা কী!

সিগেরিকো এই হিস্পানিয়া প্রদেশের একজন খাঁটি ভিসিগথ। রোমান রক্ত নেই তার শরীরে। বরং বংশপরম্পরায় এরা খুব শান্তিপ্রিয় জাতি। ঠাকুর্দার কাছে ছেলেবেলায় সিগেরিকো গল্প শুনেছে, কেমন করে অত্যাচারী রোমান শাসকদের হারিয়ে ভিসিগথরা সমস্ত হিস্পানিয়া প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন শুরু করেছিল। গ্রাম থেকে শহরে এসে খুব অল্প বয়সে সিগেরিকোর ঠাকুর্দা স্বর্ণকারের কাজ শুরু করেন। শুধু অলংকারে পাথর বসিয়ে কারুকাজ নয়, সিগেরিকোর ঠাকুর্দা বিশেষ রত্ন চিনে তার প্রয়োগ করতে জানতেন। সিগেরিকোর বাবা তত দক্ষ কারিগর ছিলেন না। কিন্তু খুব ছেলেবেলা থেকেই রত্ন চেনা আর অপূর্ব হাতের কাজে অলংকার তৈরির দুর্লভ ক্ষমতা ছিল সিগেরিকোর। তার ঠাকুর্দা সুস্থ শরীরে বেঁচে ছিলেন প্রায় ছিয়ানব্বই বছর। আর মৃত্যুর আগের দিনও সিগেরিকোকে শিখিয়ে গেছেন বিভিন্ন রঙের আর আকারের রত্নের সঠিক ব্যবহার।

অনেকেই বলে, গভীর রাতে সিগেরিকোর ঘরে আসা-যাওয়া করেন বহু অমাত্য, সামন্ত, বণিক সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁরা শুধু অলংকার খরিদ করতে আসেন না, কোন রত্ন কখন কোথায় ধারণ করলে সিদ্ধিলাভ সম্ভব, তার হদিস নেন। আঙুলে, গলায়, মাথার মুকুটে তাঁদের জন্য রত্নখচিত অলংকার তৈরি করে সিগেরিকো।

আলতিফ দ্রুত পায়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে ভাবে, সে বৃথাই সিগেরিকোকে সাবধান করতে এসেছিল। তার কত বড়ো মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা। সে তার নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবে।

সিগেরিকো উনুনের আগুন নেভায়। গরম লোহার পাত আর যন্ত্রপাতি ধীরে ধীরে ঠান্ডা হোক। তার কোনো তাড়া নেই।

রাত্রি প্রথম প্রহর। হিস্পানিয়ার রাজধানী টলেডোর সাধারণ নাগরিক নিদ্রাচ্ছন্ন। শুধু কিছু মানুষ জেগে। রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তরিত হতে চলেছে, অতএব ক্ষমতাসীন দল দ্বিধাবিভক্ত। দুই পক্ষই তাদের গুটি সাজিয়ে নিচ্ছে।

সিগেরিকোর চোখে ঘুম নেই। তার স্থির বিশ্বাস রাজার কোনো অনুচর একবার অন্তত আসবেই তার কাছে। আজ বা কাল। যেদিনই হোক। রাজধানীতে ইতিমধ্যেই রটে গেছে রাজপুত্র রোডেরিক হত্যা করেছেন তাঁর পিতাকে। যদি খবরটি সত্যি হয়, তার অর্থ হিস্পানিয়া রাজ্যের সুদূর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে ইতিমধ্যেই তিনি এসে পৌঁছেছেন রাজধানীর কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে। টলেডো দখল করতে না পারলে তিনি নিজেকে শাসক হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারবেন না। যত দ্রুত সম্ভব তিনি সিংহাসনের দাবি করবেন। কিন্তু দুশো বছরের ভিসিগথ সাম্রাজ্যের দুর্দিন আসন্ন। সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে, সমুদ্র পেরিয়ে এবার বিদেশিদের রাজ্যদখলের চেষ্টা শুরু হবে।

সিগেরিকোর অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণ করে গভীর রাতে এক রাজপুরুষ এসে দাঁড়ালেন সিগেরিকোর বাড়ির দরজায়। দ্রুত চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দরজায় আওয়াজ করলেন। এই সংকেতময় শব্দ সিগেরিকোর অতি পরিচিত।

"এসো বালাজুরি। কী সংবাদ এনেছ বলো।"

"সংবাদ খুব স্বস্তিদায়ক নয় সিগেরিকো।"

সদ্যপ্রয়াত রাজা উইতিজার একজন খাস অমাত্যের সহচর বালাজুরি। কারও পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কী অস্বাভাবিক সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি ধরেন এই মানুষটি। গোটা হিস্পানিয়া রাজ্য তাঁর নখদর্পণে। রাজ্য জুড়ে অসংখ্য বিশ্বস্ত গুপ্তচর তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন সুকৌশলে। সিগেরিকোর মতো কিছু মানুষ নিয়মিত বালাজুরির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন।

"সিগেরিকো, রোডেরিক আর আকিলা যদি এখন নিজেদের মধ্যে রাজ্যদখলের লড়াই শুরু করে, তবে কিন্তু এই হিস্পানিয়ার সামনে চরম সংকটের দিন উপস্থিত। সংবাদ পেয়েছি, উমেদ খলিফার বাহিনী কিন্তু প্রস্তুত। বহুদিন ধরেই তারা নজর রেখেছে এইদিকে। মুসা ইবান নুসাইরকে মনে আছে তো? সেই সামন্ত রাজা। উমেদ খলিফার ডানহাত সে। তাকেই উমেদ তাঁর সদ্য দখল করা কিছু অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। মুসা অত্যন্ত সুযোগসন্ধানী। হিস্পানিয়ার রাজার মৃত্যুর পর দুই রাজপুত্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের খবর তাদের কানেও ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। সে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেই। ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি, নৌবাহিনী নিয়ে সে জলপথে এই দেশ দখল করতে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে। উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আসার সেই একটাই রাস্তা। দুই সমুদ্রের মাঝে সরু এক খাঁড়ি। নাবিকেরা তাদের এই গোপন রাস্তার খবর দিয়েছে।"

আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে নোনা জলের স্রোতের আনাগোনা অবিরত। আফ্রিকা আর ইউরোপের মাঝামাঝি এই সংকীর্ণ জলপথটির একদিকে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ। হিস্পানিয়া সাম্রাজ্য।

"কিন্তু ওদিকের ভূখণ্ডের মরক্কো থেকে আইবেরিয়ার বন্দরে প্রায়ই আসছে মালবাহী জাহাজ। কী করে সেখানে নজরদারি চালানো সম্ভব?"

"সম্ভব বা অসম্ভব কিছুই ভাবছি না। শুধু ভাবছি তারিক ইবান জিয়াদের কথা। সে আগে ছিল মুসার ক্রীতদাস। মুসা তাকে মুক্তি দেয়। মুসার বিশ্বস্ত অনুচর সে। ছায়াসঙ্গী। তার বীরত্বের খ্যাতি সর্বত্র। শুনছি, উমেদ খলিফার সাত হাজার সেনা নিয়ে আসছে

সে। মরক্কোর উত্তর উপকূল থেকে এগোচ্ছে। আর হাজার পাঁচেক সৈন্য পাঠাচ্ছে মুসা। এই সৈন্যের প্রায় সকলেই উত্তর আফ্রিকার বার্বার উপজাতির সদস্য। প্রচণ্ড সাহসী, যুদ্ধে রীতিমতো পারদর্শী। রণতরী নিয়ে তারা এসে নামছে আলগাসিরাস বন্দরে।"

"মাত্র সাত হাজার? এত সামান্য সেনা নিয়ে..."

সিগেরিকোর মন্তব্যে অধৈর্য হয়ে পড়েন বালাজুরি।

"আঃ সিগেরিকো, যুদ্ধে সৈন্যসংখ্যা কিচ্ছু নির্ধারণ করতে পারে না। সেখানে রণনীতিই শেষ কথা...সমস্ত ফলাফল লুকিয়ে থাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সঠিক নীতির আড়ালে। আর তাছাড়া, এই যুদ্ধ তো প্রথম থেকেই অসম যুদ্ধ..."

"অসম যুদ্ধ? কী বলতে চাও তুমি?"

উত্তেজিত হয়ে পড়ে সিগেরিকো।

"কাউন্ট জুলিয়ানের কথা ভুলে গেলে?"

ঠিক। কাউন্ট জুলিয়ান। এক মুহূর্তে মনে পড়ে সিগেরিকোর। শাসক রোডেরিকের ঘোষিত শত্রু সে! রোডেরিককে ধ্বংস করার আক্রোশে সে যে কোনো মূল্যে ভিসিগথ সাম্রাজ্যকে বিক্রি করে দিতে পারে আরব শাসকদের কাছে। কিন্তু কাউন্ট জুলিয়ানকে আটকানোর কোনো রাস্তা জানা নেই সিগেরিকোর। গুপ্তঘাতক সম্বন্ধে সতর্ক থাকা যায়, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক কোনদিক থেকে তার কুবুদ্ধি প্রযোগ করবে, আগাম বোঝা মুশকিল। বালাজুরি নিজেও জানেন,. কাউন্ট জুলিয়ান আর রোডেরিকের ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে বলি হয়ে যেতে পারে একটা স্বাধীন দেশ।

"হুম। বুঝেছি। কিন্তু বালাজুরি, তুমি আমাকে কী করতে বলো?"

"লুঠপাট হবেই সিগেরিকো। গণহত্যা হবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনুমান করতে পারছি না। শুধু বুঝতে পারছি হিস্পানিয়ার শাসক রোডেরিককে বাঁচাতেই হবে ভিসিগথদের স্বার্থে। আরব শাসকদের হাতে এই দেশের মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠবে সিগেরিকো", বালাজুরি এক মুহূর্ত থেমে বলেন, "সৈন্য আমাদের প্রচুর আছে। কিন্তু আমরা চাই, রাজার রথ, ঘোড়া আর তার নিজের সমস্ত সজ্জা তৈরি করবে তুমি নিজে। যা যা রত্ন তুমি জানো, যে রত্ন রাজাকে সুরক্ষা দেয়, বিজয়ী করে, সেই সমস্ত রত্ন ব্যবহার করো সিগেরিকো। তোমার গণনার এই প্রকৃষ্ট সময়। রাজার ভাগ্যে নির্ধারিত হবে প্রজার ভাগ্য। তাঁকে সুরক্ষিত করার এই দায়িত্ব তোমায় নিতেই হবে। ধরে নাও আমি রাজার আদেশ নিয়েই এসেছি। খুব দ্রুত কাজ শুরু কোরো সিগেরিকো। আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই।"

বালাজুরি আবার মিশে যান রাতের অন্ধকারে।

সিগেরিকো চুপ করে বসে থাকে। তার মন দ্বিধাবিভক্ত। রণনীতি, পুরুষকার আর সাহসের কাছে কি সত্যিই তার এই পাথরের কোনো মূল্য আছে?

যোদ্ধাদের নিয়ে উপকূলে নেমেই প্রচণ্ড লুঠপাট আর বর্বরতা শুরু করল তারিক। যে জাহাজে তারা উপকূলে এসে নেমেছিল, সেই চারটি রণতরী আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তারিকের নির্দেশে।

তারিক তার সৈন্যদের স্পষ্ট বলে, "সেনাপতি হিসেবে আমি থাকব সকলের সামনে। মনে রেখো, আমরা ফিরে যাবার জন্য আসিনি। আমাদের পিছনে সমুদ্র, সামনে শত্রু। লক্ষ্য একটাই, হয় জিতব, না হয় বীরের মতো মৃত্যুবরণ করব।"

সামনেই দেখা যায় এক পাহাড়। ভীত অধিবাসীরা তারিককে জানালেন, এই অনামী পাহাড় পেরোলেই আলবেরিয়া উপদ্বীপ। পাহাড় থেকে একটি পাথর কুড়িয়ে নেয় তারিক। স্মৃতিচিহ্ন।

আলগাসিরাস বন্দরে রইল তারিকের কিছু প্রশিক্ষিত অশ্বারোহী কিছু সশস্ত্র মুর যোদ্ধা। উলটোদিকে রোডেরিক জড়ো করলেন প্রায় একলক্ষ সেনা। সেডোনিয়া শহরের কাছে গুয়াডালেখ নদীর ধারে ঘাঁটি গেড়ে বসে রইল আরব সেনারা। রোডেরিক যুদ্ধের প্রাঙ্গণে পৌঁছলেন হাতির দাঁতের কারুকাজ করা রত্নখচিত রথে। তাঁর ঘোড়াটির বেশভূষাতেও বহু রত্নের সমাহার। সিগেরিকোর সারাজীবনের অধীত বিদ্যার ফসল। হাতে গোনা কিছু মুর যোদ্ধা জীবনপণ করে যুদ্ধ শুরু করে, আর তাদের অলক্ষে সাহায্য করে চলে রোডেরিকের শত্রু জুলিয়ান। জুলিয়ানের সঙ্গে আরও বেশ কিছু কাউন্ট যোগ দিয়েছিলেন এই বিশ্বাসঘাতকতায়।

রত্নে মোড়া রথ থেকে একসময় পড়ে যান রোডেরিক। তারিক নিজের হাতে হত্যা করেছিল হিস্পানিয়ার শাসককে। বিধাতা বোধহয় অলক্ষে হেসেছিলেন একবার। মানুষের জয়-পরাজয় উত্থান-পতন নির্ধারণ করবে সামান্য কিছু পাথর? তা-ও কি হয়? সিগেরিকো কি নিজেও জানত না, বাহুবল আর বুদ্ধিবল বারে বারে নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের ভাগ্যকে!

সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে এই মুর যোদ্ধাদের হাতেই পতন হয়েছিল ভিসিগথ সাম্রাজ্যের। স্পেনে আরবদের একটানা সাড়ে সাতশো বছরের শাসনের সেই সূচনা।

এক বিদেশি সৈন্যের হাতে মৃত্যুর আগে সিগেরিকা জানতে পারেনি সেই অনামী পর্বতের নাম হয়েছে যোদ্ধা তারিকের নামে—জাবাল-আত-তারিক। যার অর্থ তারিকের পাহাড়। নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে তৈরি করা এক সেনাপতি আজও অমর হয়ে রয়েছেন তাঁর অসমসাহসিকতার জন্য। ভিসিগথের সঞ্চিত রত্ন লুঠ করে নিয়ে যায় আরব সৈন্যদল। যদিও তারিক যত্নে রেখেছিলেন সেই পাহাড় থেকে কুড়িয়ে আনা অতি তুচ্ছ পাথরটিকে।

উচ্চারণের অপভ্রংশের ফলে জাবাল-আত-তারিক পরবর্তীকালে জিব্রালটার নামেই পরিচিত হয়। ❖

এখানে শালিক পাখিরা দল বেঁধে এক্কা-দোক্কা খেলে। এখানে ময়ূরেরা পেখম তুলে কত্থক নাচ দেখায় পর্যটকদের। এখানে হরিণ হঠাৎ হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ায় পথের পাশে। দু-চোখে অসাধারণ সারল্য নিয়ে তাকিয়ে থাকে হুশ হুশ করে ছুটে যেতে থাকা গাড়ির পর গাড়িকে। গাড়ি দেখে কী ভাবে তা তারাই জানে।

আবার তরাইয়ে রেঞ্জারমামা

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি : ইন্দ্রনীল ঘোষ
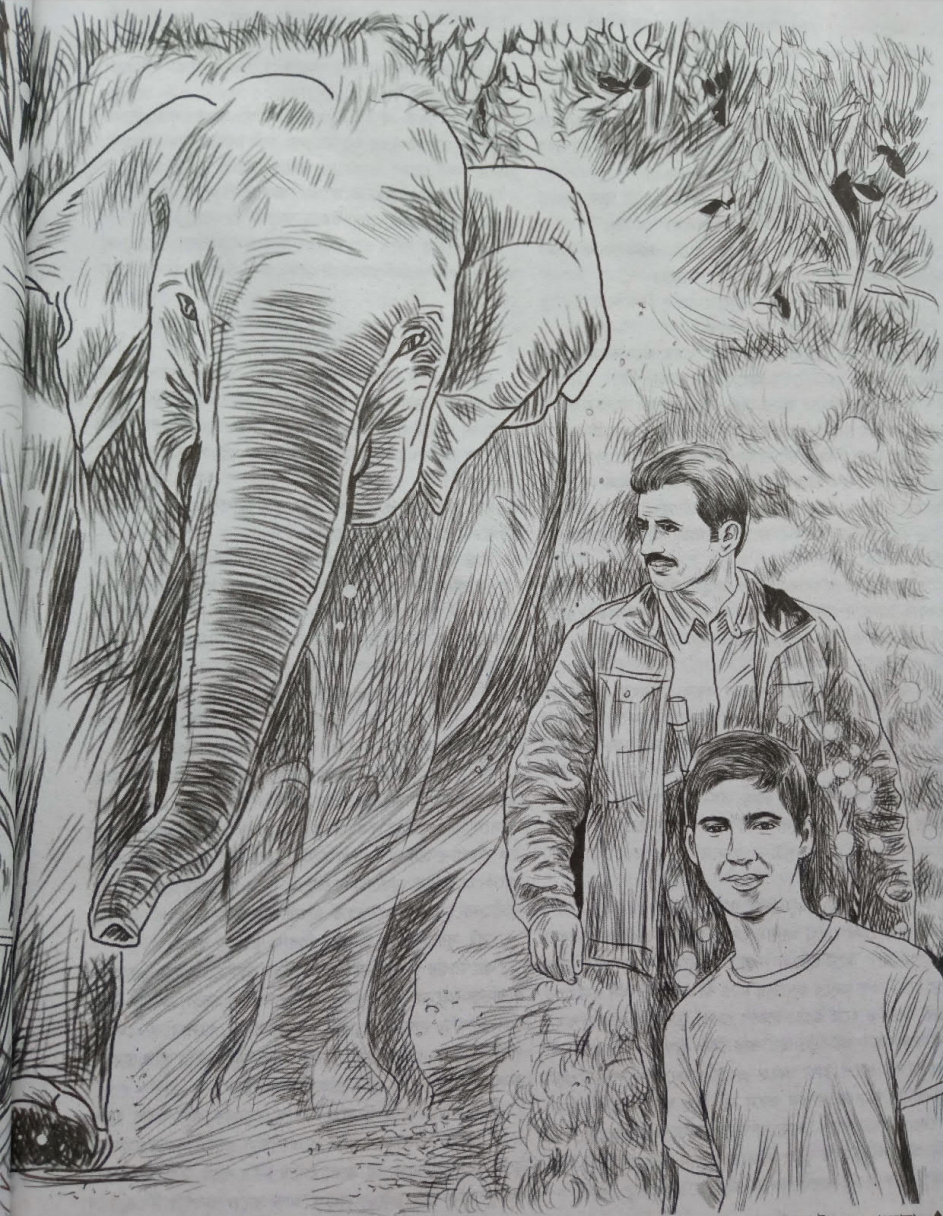
এখানে রাস্তার বাঁকে বাঁকে ফুটে থাকে লাল-হলুদ-মেরুন রঙের বনতুলসী। কখনো নানা রঙের কলাবতী। হঠাৎ একটা জবা গাছ লালে লাল। এখানে আকাশছোঁয়া প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে শাল-সেগুন-মেহগনি গাছ। এখানে অজস্র রকমের সবুজের কত শেডের মস ও ফার্ন গাছের গুঁড়ি ও কাণ্ড আঁকড়ে ঝুলে থাকে অনাদিঅনন্তকাল। এখানে মূর্তি নদীর স্রোত দু-হাতে নুড়িপাথর সরাতে সরাতে অবিশ্রান্ত ছুটে যায় কলস্বরে।

হঠাৎ একটা রাতচরা পাখি ট্যাঁ—ও টুই ট্যাঁ—ও টুই শব্দে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল মূর্তি নদীর উপর দিয়ে।

পাপান বিড়বিড় করল, এখানে নাম-না-জানা পাখি রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে উড়ে যায় কোথায় না কোথায়।

আবার ডুয়ার্সে পাপান। মূর্তি বাংলোয় দু-তিনদিন।

ডুয়ার্স মানেই সবুজের ধারা শ্রাবণ।

সেই ডুয়ার্সের রাত যদি পূর্ণিমার চাঁদের হয়, তবে আকাশ থেকে জ্যোৎস্নার ঝুরি বেয়ে নেমে আসে অসংখ্য হুরিপরি।

কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে মূর্তি নদীর কিনারে বসে জলে পা ডুবিয়ে পাপান দেখছিল আকাশে মস্ত চাঁদের অসামান্য মহিমা। কিছু সাদা মেঘ টহল দিচ্ছিল চাঁদের আশপাশ দিয়ে। মেঘগুলোর ইচ্ছে হচ্ছিল ছুঁয়ে দেখে চাঁদের শরীর, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না পাছে জ্যোৎস্নার রুপো জড়িয়ে যায় মেঘের শরীরে।

—রেঞ্জারমামা, পূর্ণিমার রাতে জ্যোৎস্নায় আপাদমস্তক ভেজাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

রেঞ্জারমামা তখন জলের ভিতর আঙুল ডুবিয়ে তুলে আনছিলেন চমৎকার গোল, গোল নুড়ি। নানা আকারের, নানা রঙের। হেসে বললেন, ভালো-লাগা মন্দ-লাগা প্রত্যেক মানুষের আলাদা। যার জিন যেরকম।

সে-কথায় কান না দিয়ে পাপান বলল, জ্যোৎস্না রাতে মূর্তি নদীর মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে থাকলে স্বর্গবাসের আরাম। তুমি মামিকে সঙ্গে নিয়ে এলে ভালো করতে। এরকম অভিজ্ঞতা সারা জীবনের সঞ্চয়।

—আনলে ভালোই হত, কিন্তু তখন কিছুতেই আমাদের এই মধ্যরাত পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্যে নদীর জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকাটা অনুমোদন পেত না। রাত দশটা না-বাজতে তাড়া দিত, চলো চলো, ঘুম পাচ্ছে, শুয়ে পড়ি।

—তা ঠিক। মামি একটু ভিতু টাইপের।

কবজিতে চোখ রেখে পাপান দেখল রাত্রি একটা। তার অবশ্য ঘুম পাচ্ছে না। মনে হচ্ছিল সারা রাত ঘুরে বেড়ায় মূর্তি নদীর কিনার ধরে। কিন্তু অদূরে জঙ্গলের মধ্যে কী একটা খসখস শব্দ হতে দুজনেই সচকিত হয়ে ওঠে। হাজার হোক, ডুয়ার্সের জঙ্গল, কখন কোন জন্তু হঠাৎ আবির্ভূত হয় তার ঠিক কী?

পাপানের পাশে রাখা আছে একটা শক্তপোক্ত লাঠি। সেটা কতটা কাজে আসবে পাপান জানে না, কিন্তু লাঠি একটা সাহস। তবে রেঞ্জারমামার পাশে শোয়ানো আছে একটা আধুনিক রাইফেল, তক্ষুনি রাইফেলটা হাতে তুলে নিয়ে তাকালেন জঙ্গলের সেই দিকে যেখান থেকে একটু আগে শব্দটা এল।

উঠেও পড়লেন রাইফেলটা বাগিয়ে। দেখাদেখি পাপানও লাঠি হাতে।

রেঞ্জারমামা বললেন, কাল সকালে তোকে নিয়ে ঘুরতে বেরোব। চল একটু ঘুমিয়ে নিই।

দুজনে সতর্ক হয়ে এগোতে লাগল বনবাংলোর দিকে। দুজনেরই চোখ উপরের ঘন জঙ্গলের দিকে। রেঞ্জারমামা বললেন, দিনের বেলা তেমন ভয়ের না হলেও রাতকে বিশ্বাস নেই।

নদীর কিনারে যতটাই চাঁদের আলোর বিচ্ছুরণ, উপরে ঘন জঙ্গলের ছায়ায় জ্যোৎস্নার উল্লাস ততটাই ম্রিয়মাণ।

বনবাংলোয় ফিরে এক গেলাস জল ঢকঢক করে খেয়ে সাদা ধবধবে চাদর পাতা বিছানায় গা ঠেকাতে না ঠেকাতে ঘুমের অতল দেশে।

২

ঘড়িতে এখন সকাল আটটা পনেরো। পুজোর পরের ডুয়ার্সে অতি মনোরম আবহাওয়া। পুজোর ছুটি কাটাতে এসে প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে পাপান। রেঞ্জারমামার সঙ্গে তার ভাবনার একটা সমীকরণ আছে। রেঞ্জারমামার চাকরিটা একই সঙ্গে সুন্দর এবং ভয়ংকর। তিনি সেরকমই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে জঙ্গলকে আবিষ্কার করতে পছন্দ করেন, আবার বেশ ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রয়োজন মতো।

কিন্তু জঙ্গলকে আবিষ্কার করতে হলে মনের মতো সঙ্গীও তো চাই। রেঞ্জারমামার সেই সঙ্গী পাপান। দুজন যেন দুজনের পরিপূরক। গতকাল সন্ধের পর দুজনে এসে পৌঁছেছে মূর্তি নদীর পাশের এই বনবাংলোয়। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছে মূর্তি নদীর নুড়িপাথরে ভর্তি জলে পা ডুবিয়ে। সে এক মনোরম অভিজ্ঞতা।

মূর্তি নদীর ধারে মন-জুড়োনো বনবংলোর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রেঞ্জারমামার সঙ্গে গল্পে মত্ত পাপান। পাশের টেবিলে দুজনের জন্য চায়ের সঙ্গে রোস্টেড চিকেন।

পাপানের বরাতটা নেহাতই ভালো, তার একজন রেঞ্জারমামা আছেন। রেঞ্জারমামা তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জার হিসেবে, তার পর ধাপে ধাপে অনেক উঁচুতে উঠছেন, বদলি হচ্ছেন এক জেলা থেকে আর এক জেলায়, বা বলা ভালো এক জঙ্গল থেকে আর এক জঙ্গলে। যতবারই নতুন জায়গায় পোস্টিং হয়, পাপানের সেখানেই বেড়াতে যাওয়ার আমন্ত্রণ।

সেই সুবাদে তার আরও একবার ডুয়ার্সে আসা।

আগেরবার যখন পোস্টিং হয়েছিল ডুয়ার্সে, পাপান এসেছিল, হয়েছিল অনেক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতাও। এবার আবার যখন জলপাইগুড়ি বদলি হলেন রেঞ্জারমামা, পাপানকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন, আবার চলে আয়, পাপান। মূর্তি নদীর ধারে চমৎকার বনবাংলো আছে, দু-তিন রাত কাটিয়ে যা।

মূর্তি নদীর নাম শুনেছে অনেক, আগের বারে আসা হয়নি। এবার রাতের খাওয়া সেরে চলে এসেছিল দুজনে, সমস্ত প্রেক্ষাপট বুকের গভীরে বরাবরের মতো গেঁথে নিয়ে যাবে বলে। কাল রাতে যেটুকু বাকি রয়ে গেছে, সেটুকু আজ রাতে অবশ্যই নিয়ে যাবে।

চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার ফুরসতে রেঞ্জারমামা মোবাইল খুলে খুটখাট করছিলেন—নিশ্চয় হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসছে। পাপান কাল একবার মোবাইল খুলে দেখেছিল, কিন্তু নেট তেমন কাজ করছিল না বলে আর খোলেনি। শহর থেকে এত দূরে, জঙ্গলের মধ্যে নেট না-পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

অতএব কয়েকদিন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ না-রেখে বিন্দাস কাটিয়ে দেওয়াই সাব্যস্ত করেছে।

ঠিক সেসময় মোবাইলটা বেজে উঠল রেঞ্জারমামার, মোবাইল অন করে কানে দিয়ে কিছুক্ষণ শুনলেন মন দিয়ে, সচকিত হয়ে বললেন, তাই নাকি, কোথায় ঘটেছে?

ওদিকের উত্তর শুনে নড়েচড়ে বসে বললেন, ঠিক আছে, আমি এখনই যাচ্ছি।

তক্ষুনি উঠে বসে বললেন, পাপান, আমাদের নিশ্চিন্ত বাসের এখানেই ইতি। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিই। ওখানে গিয়ে দেখি কী হচ্ছে।

পাপান অনুমান করছিল কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে, সেও উঠে প্রস্তুত হতে হতে বলল, কী হল, মামা?

—গরুমারা ফরেস্টে একটা বাচ্চা হাতি হঠাৎ মারা গেছে।

—কী করে?

—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জঙ্গলের মধ্যে চোরাশিকারিরা সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করে। গরুমারার বিট অফিসার অনুমান করছেন নিশ্চয় কোনো চোরাশিকারি একটা বড়ো হাতিকে মারতে গিয়ে তার বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে।

—ইসসস, পাপান আপশোশ করল।

—কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে সাংঘাতিক। ওই এলাকার সমস্ত হাতি একজোট হয়ে ঘিরে ফেলেছে গরুমারার ভিতর ফরেস্ট বাংলোটি।

—আরিব্বাস!

—ঘটনাক্রমে বিট অফিসার সকালে উঠে জঙ্গলের ভিতর সাইকেলে করে টহল দিচ্ছিলেন, তিনিই প্রথমে আবিষ্কার করেছিলেন মৃত বাচ্চাটিকে। সাইকেল থেকে নেমে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলেন কীভাবে মারা গেল, সেসময় মা-হাতিটা দূর থেকে তাঁকে দেখে ছুটে আসতে থাকে তাঁর দিকে। বিট অফিসার দ্রুত সাইকেলে উঠে পড়ি কি মরি করে এসে লুকিয়েছেন ফরেস্ট বাংলোর মধ্যে। ভাগ্যিস বাংলোয় ঢোকার পরিখার উপর পাটাতনটা ফেলা ছিল।

পাপান বুঝে উঠতে পারেনি পরিখার ব্যাপারটা।

রেঞ্জারমামা ততক্ষণে প্রস্তুত হচ্ছেন দ্রুত, পাপানের মনোভাব বুঝে বললেন, গরুমারা ফরেস্টে বন্যজন্তুর বসবাস তুলনায় বেশি। প্রচুর হাতি তো আছেই, বাইসনের সংখ্যাও অনেক। হাতি সাধারণত কারও ক্ষতি করে না। তবে বাইসন খুব ডেঞ্জারাস। তাদের হাত থেকে রেহাই পেতে বাংলোর চারপাশে গভীর পরিখা কাটা আছে যাতে পরিখা পেরিয়ে কোনো বন্যজন্তু ভিতরে না ঢুকতে পারে।

—তা হলে মানুষ ঢুকবে কী করে?

—রাস্তাটা যেখানে গিয়ে বাংলোয় মিশেছে, সেখানে একটা কাঠের পাটাতন আছে, সেই পাটাতন সারাদিন তোলা থাকে, শুধু কেউ গাড়ি নিয়ে এলে পাটাতন পেতে দেওয়া হয়, গাড়ি ভিতরে ঢুকে গেলেই তুলে নেওয়া হয় পাটাতন। শুধু একটা সরু কাঠ সারাদিন পেতে রাখা হয় যাতে কেউ পায়ে হেঁটে এলে বা সাইকেলে গেলে চট করে ঢুকে পড়তে পারে। সেই কাঠের উপর দিয়ে হাতি বা বাইসন ঢুকতে পারবে না।

পাপান ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছে ব্যাগ। রেঞ্জারমামাও ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরোতে বেরোতে বললেন, এ ক্ষেত্রে বাচ্চা মারা গেছে বলে তার মা-ই শুধু খেপে যায়নি, সমস্ত হাতিরা উন্মত্ত হয়ে ঘেরাও করেছ বনবাংলো।

মূর্তি বাংলোর বাইরে কম্পাউন্ডের লাগোয়া জায়গায় গাড়ি গ্যারাজ করা ছিল, রেঞ্জারমামা নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন, তিনি গাড়ি স্টার্ট দিতেই তাঁর পাশের সিটে পাপান।

রেঞ্জারমামা বাঁই করে গাড়ি ঘুরিয়ে উঠে পড়লেন খোয়া-বিছোনো রাস্তায়, সেখান থেকে হাইওয়ে। একত্রিশ নম্বর হাইওয়ে চলে গেছে গরুমারা অভয়ারণ্যের ভিতর দিয়ে। মূর্তি থেকে বেরিয়ে বাতাবাড়ি হয়ে গরুমারা পৌঁছোতে মিনিট কুড়ি লাগল রেঞ্জারমামার। রেলিং দিয়ে ঘেরা গরুমারা জাতীয় পার্কের প্রবেশ পথে স্বাগত জানাচ্ছে একটি বিশাল কৃত্রিম গন্ডার। তার পাশেই কাঠের তৈরি একটি ছোট্ট অফিসঘর যেখানে বাংলোয় ঢোকার পাশ চেকিং হয়।

পাপানও স্তম্ভিত হয়ে দেখল কাঠের অফিসঘরটি এই মুহূর্তে ধূলিসাৎ। তার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে এক তরুণ কর্মী, চোয়ালে হালকা দাড়ির প্রলেপ, রেঞ্জারমামাকে দেখে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, স্যার, একটুর জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি। একটা প্রকাণ্ড হাতি এসে এমন ঢুঁ দিল যে, এক নিমেষে ঘরটা চুরমার হয়ে গেল। আমি এক দৌড়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যেতে পেরেছিলাম বলে বেঁচে আছি এখনও।

রেঞ্জারমামা গাড়ি নিয়ে গেটের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছেন, তরুণটি বলল, স্যার, আগে জিজ্ঞেস করে নিন, হাতিগুলো এখনও বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কি না?

রেঞ্জারমামা পকেট থেকে মোবাইল বার করে ধরলেন বিট অফিসারকে, কিছুক্ষণ কথা বলার পর জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে এখন উপায়?

কিছু শুনে নিয়ে মোবাইল অফ করে বললেন, হাতিগুলো একটু আগেই ফিরে গেছে তাদের ডেরায়। শুধু একটা হাতি এখনও তর্জন-গর্জন করে গেটের দিকে আসছে। সম্ভবত এই হাতিটার বাচ্চাই মারা গেছে। বিট অফিসার বললেন গেটের সামনে না-থাকতে।

বলেই পাপানকে বলেন, পাপান, গাড়িতে উঠে বোস।

পাপান উঠতেই রেঞ্জারমামা তরুণটিকে বললেন, কী নাম তোমার?

—বিনয় রাভা।

—কোথায় তোমার বাড়ি?

বিনয় রাভা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে রেঞ্জারমামা বললেন, তুমিও উঠে বোসো। এখন এখানে থাকা একেবারেই

নিরাপদ নয়। তুমি এখন বাড়িতে যাও, আমি নামিয়ে দিচ্ছি। তারপর হাতিদের রাগ কমলে আবার এখানে এসো। আমি বিট ফিসারকে বলে দিচ্ছি যাতে এই অফিসঘর ঠিকঠাক মেরামতি করে দেন।

৩

বিনয় রাভা পিছনে উঠে বসতেই রেঞ্জারমামা আবার ফিরে চললেন মূর্তি নদীর দিকে, বললেন, হাতিদের খুব অপত্যস্নেহ। যার বাচ্চা মারা গেছে, সেই হাতিটা এখন কয়েকদিন উন্মত্তের মতো আচরণ করতে পারে। তার দিকে এখন নজর রাখতে হবে। আশেপাশের এলাকায় জানিয়ে দিতে হবে তারা যেন সাবধানে থাকে কয়েকদিন। মূর্তির বাংলোটা গরুমারার কাছে। আমি আজ ওখানে থেকে নজর রাখি হাতিটা শান্ত হচ্ছে কি না।

বাংলোয় ফিরে রেঞ্জারমামা প্রথমেই কাছাকাছি এলাকার সমস্ত ফরেস্ট রেঞ্জার, বিট অফিসারকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানিয়ে দিলেন তাঁদের এলাকায় নজরদারি চালাতে। লিখলেন হাতিটা তার সন্তান হারিয়ে এখন উন্মাদ, কখন কোন এলাকায় হানা দেবে তার ঠিক নেই, এখনই সমস্ত লোকালয়ে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে হাতির হানাদারি সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হোক।

প্রাথমিক খবর জানিয়ে এবার এক-একজনকে ফোন করে বললেন ঘটনাটির সম্ভাব্য পরিণতি। কখন কী যে ঘটবে তার ঠিক নেই।

তাঁর ফোন তখন মধ্যপথে, সেসময় খবর এল হাতিটা ঢুকে পড়েছে কাছের এক লোকালয়ে। একটা কাঠের বাড়ি মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। হাতিটিকে দেখে সেই বাড়ির লোকজন আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, ফলে হতাহতের কোনো খবর এখনও নেই।

তাঁর ফোনের মধ্যেই মূর্তি বনবাংলোয় গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন এখানকার রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগী। হন্তদন্ত হয়ে এসে বললেন, স্যার, বিট অফিসারদের বলেছি এলাকায়-এলাকায় ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে খবরটা প্রচার করতে। তবে যা খবর পেলাম হাতিটা ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, রাস্তায় কাউকে দেখলেই তেড়ে যাচ্ছে তার দিকে।

—লোকজন নিশ্চয় ঘরের মধ্যে লুকিয়েছে?

—বিট অফিসার যা বললেন তাতে লোকজন রাস্তায় নেই, তবে হাতিটা এক জায়গায় নেই, ছুটে চলেছে এক এলাকা থেকে আর এক এলাকায়।

—তা হলে আমাদের আর বসে থাকলে চলবে না, হাতিটাকে ধরতে হবে।

ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, স্যার, ঘুমপাড়ানি গুলি দিয়ে ধরতে হবে। আপনি এখনই ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টারে ফোন করুন।

—আমি এখনই ফোন করছি। শুনলাম দি গ্রেট দত্তরায় এখন জলপাইগুড়িতে আছে। দেখছি তাকে পাওয়া যায় কি না?

সঙ্গে সঙ্গে রেঞ্জারমামা কাউকে ফোন করলেন জলপাইগুড়িতে, বললেন, খবর পেলাম দি গ্রেট দত্তরায় এখন জলপাইগুড়িতে আছে। বলবেন রঞ্জন রায় তাঁকে স্মরণ করেছেন। তিনি যেন এখনই ট্রাঙ্কুলাইজিং বন্দুক সহ চলে আসেন মূর্তি বাংলোয়।

ফোন রেখে ফরেস্ট রেঞ্জারকে বললেন, নিয়োগী, তুমি এখন খবর নিতে শুরু করো হাতিটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না?

তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে দীপেশ নিয়োগীর মোবাইলে ফোন এল, কিছুক্ষণ কথাবার্তা পর ফোন রেখে বললেন, স্যার, মনে হচ্ছে হাতিটা কাছেই কোনো জঙ্গলে গেছে। লোকালয়ে এই মুহূর্তে তাকে দেখা যাচ্ছে না। আমি ওদিকেই যাচ্ছি। কোনো খবর হলে আপনাকে জানাচ্ছি।

দীপেশ নিয়োগী গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলে রেঞ্জারমামা বললেন, বুঝলি, সেই পুরোনো প্রবচন আবার সত্যি হল, ম্যান প্রেপোজেস অ্যান্ড গড ডিসপোজেস।

পাপান হেসে বলল, এ ক্ষেত্রে গড হলেন ওই হাতিটি।

রেঞ্জারমামা বললেন, হাতিটিকে আমি দোষ দিচ্ছি না। হাতির অপত্যস্নেহ প্রবাদপ্রতিম। সন্তান হারানোর বেদনা তাকে পাগল করে তুলবেই। দোষী আসলে সেই পোচাররা যারা এক-একটা হাতি মেরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে চায়। তাদের খোঁজে এবার উইচ-হান্টিং করতে হবে। আমাদের চাকরির চার্মটা নষ্ট করে দিচ্ছে বদমাইশগুলো।

পাপানের মনে উসকে উঠছিল কৌতূহল, বলল, দি গ্রেট দত্তরায় বললে কেন?

রেঞ্জারমামা হা হা করে হেসে উঠে বললেন, রক্তিম দত্তরায় এলেই তুই বুঝবি কেন বললাম।

বেলা দুপুর হতে চলল, সকালে কোনো রকমে সামান্য ব্রেকফাস্ট খেয়ে দুজনে বেরিয়েছিল, এখন বেলা একটা বাজে। কখন যে এতগুলো ঘণ্টা বেরিয়ে গেল তা এখন স্মরণেই নেই।

রেঞ্জারমামা সঙ্গে সঙ্গে খবর দিলেন এখানকার কুককে, বললেন, রাবণদাস, আমরা দশ মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে নিচ্ছি, তার মধ্যে আমাদের লাঞ্চ সাজিয়ে ফেল।

রাবণদাস নামটি শুনতে যত ভারিক্কি ধরনের, তাঁর চেহারা ততটাই ছোটোখাটো। আদেশ শুনে ত্রস্ত হয়ে চলে যেতে রেঞ্জারমামা বললেন, পাপান, একটাই বাথরুম, তুই আগে স্নানে যা, তারপর আমি। কখন যে কী খবর আসে তার ঠিক নেই।

পাপান অবশ্য রেঞ্জারমামার জটিল সিডিউলের সঙ্গে দীর্ঘদিন পরিচিত, বলল, শিওর, মামা। তবু তো স্নান-খাওয়ার সময় পাচ্ছি এই ঢের।

সেদিন দুপুরের খাওয়াটা অবশ্য ভালোই হল। সরু কাঁটার মতো ধবধবে সাদা ভাতের সঙ্গে মুগের ডাল আর চিকেনের ঝোল। শেষ পাতে জলপাইয়ের চাটনি।

খেয়ে উঠে রেঞ্জারমামা বললেন, যতক্ষণ না কোনো ফোন আসছে, একটু গড়িয়ে নিতে পারিস। কাল রাতে পুরো ঘুম হয়নি আমাদের।

পাপান বলল, গড়িয়ে নিতে পারি, তবে এখন ঘুমোনোর কোনো

সিন নেই। কখন যে কোথা থেকে হাতিটার দৌরাত্ম্যের খবর আসে তার ঠিক কী?

বিছানায় গা এলিয়ে পাপান শুনছিল তাদের জানালার বাইরে একটা অচেনা পাখির ডাক। জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল পাখিটাকে দেখা যায় কি না। তাদের জানালার পাশেই একটা বাচ্চা সেগুন গাছ। বাচ্চা—কেননা বড়ো জোর দশ-এগারো ফুট উচ্চতার। বিশাল-বিশাল ঘন সবুজ পাতার কোন আড়ালে পাখিটা বসে ডেকেই চলেছে একমনে।

তার মধ্যে রেঞ্জারমামার ফোন বেজে উঠতে উৎকর্ণ হল পাপান। নিশ্চয় হাতিটা বেরিয়ে পড়েছে আবার। এখনই প্রস্তুত হয়ে ছুটতে হবে তাদের।

রেঞ্জারমামা তখন বলছেন, দত্তরায়, রঞ্জন ইজ হেয়ার। তুমি রাইফেল নিয়ে এসেছি। তুমি ট্রাঙ্কুলাইজার ড্রাগ ভর্তি বন্দুক নিয়ে এসো। আমার জন্যও একটা নিয়ে এসো যাতে আমিও তোমাকে অ্যাসিস্ট করতে পারি।

ফোন রেখে রেঞ্জারমামা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে।

পাপান ব্যস্ত হয়ে পড়ে জানালার বাইরে প্রবহমান জঙ্গল, জীবনের খোঁজখবর নিতে। চারপাশে ঘন জঙ্গল, তার মধ্যে বনবিভাগের কয়েকটা কটেজ ট্যুরিস্টদের জন্য। পুজোর ছুটি ও তার পরের কয়েকটা দিন ভর্তি থাকে পর্যটকে। এই মুহূর্তে কোনো কটেজে পর্যটক নেই, তাই জঙ্গলের নৈঃশব্দ্য বেশি করে অনুভূত হচ্ছে তাদের।

পাপান অবশ্য এরকম অসীম নির্জনতাই পছন্দ করে বেশি। যেন গোটা জঙ্গল এখন তার আর রেঞ্জারমামার হেপাজতে।
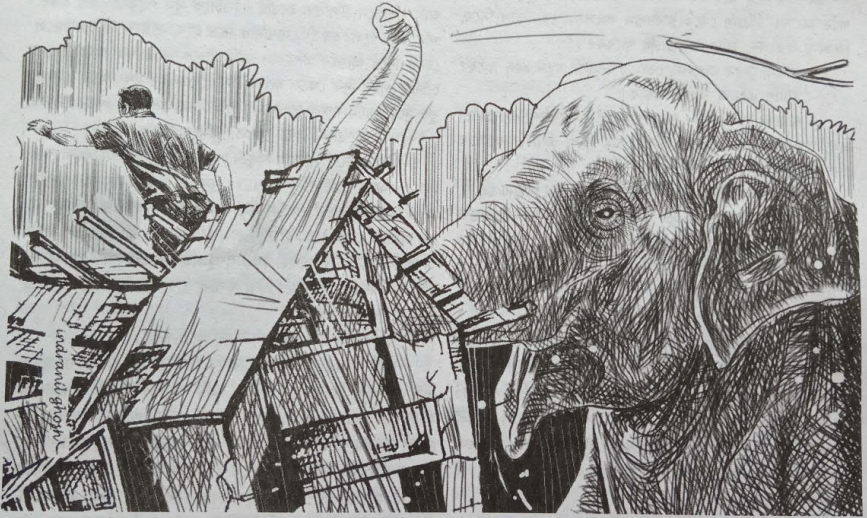
একটা কাঠের বাড়ি মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে।

জলপাইগুড়িতে এসেছ কানে এসেছে, কিন্তু দেখা করতে যাওয়ার সময় পাইনি। মূর্তি বাংলোয় স্টেশন করে আছি, কতগুলো টুকটাক কাজ ছিল। আমি তো জানতাম না ট্যুরে এসে এমন বিপদের সম্মুখীন হব, তাই সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি।

ওপাশের লাইনে কিছু শুনলেন, তারপর বললেন, তুমি অন্তত দিনদুয়েক থাকার প্রস্তুতি নিয়ে এসো। এখানে একটি কটেজে তোমার থাকার ব্যবস্থা করছি। আর হ্যাঁ—

বলে কিছু মনে পড়তে বললেন, এখানে আসার সময় আমি

জানালার বাইরে চোখ রেখে দেখছে এক অচেনা জগৎ। চারপাশে শুধু সবুজ আর সবুজ। অচেনা পখির ডাক যেমন উপভোগ করছে, তেমনই দু-চোখ ভরে দেখছে অজস্র মহীরুহের জাগ্রত উপস্থিতি। সে যেমন জঙ্গলকে দেখছে, জঙ্গলও তাকে। বারবার মনে হচ্ছিল ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ছে যে-সব পাখি, তাদের সঙ্গে ভাব জমায়। বহুকাল ধরে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে যে-সব আকাশ-ছোঁয়া গাছ, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসা করে কেমন লাগে এরকম বছরের পর বছর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে।

পাপান শুনেছে তরাই জঙ্গলে অনেক বিচিত্র ধরনের পাখি আছে, ধনেশ, শ্যামা, বুলবুলি। এখনও একটাও চোখে পড়েনি।

তার ভাবনার ফুরসতে রেঞ্জারমামার মোবাইলে ফোন, অন করতেই ওপাশের গলা শুনে উল্লসিত হয়ে বললেন, তুমি আসছ, দত্তরায়, কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলো তো...হ্যাঁ, রওনা দিয়েছ? ঠিক আছে, এখনও হাতিটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কোনো জঙ্গলে ঢুকেছে, হয়তো চুরমার করছে বড়ো বড়ো গাছগুলো ...কী বলছ? ওর রাগ এখন গাছেদের উপর নয়, মানুষের উপর পড়বে? হ্যাঁ, সেই আশঙ্কাই তো করছি। দেখি কোনো বিট অফিসার খবর দেয় কি না।

রেঞ্জারমামা ওদিকে কথা বলছেন, আর পাপান মোবাইলে টুকটাক ফটো তুলছে। একটা বড়োসড়ো রংদার পাখির ছবি তুলে পাঠিয়ে দিল কলকাতায় মায়ের কাছে, লিখল, এর পরিচয় এখনও পাইনি। মামার কাছে জেনে নিয়ে বলব।

জঙ্গলের সঙ্গে তার এই ভাব-ভালোবাসার মধ্যে দুপুরের রোদ পড়ে আসে। কিচেন থেকে রাবণদাস আসেন চায়ের কাপ নিয়ে, জিজ্ঞাসা করলেন, স্যার, রাতে কী খাবেন?

রেঞ্জারমামা হেসে বললেন, তোমার ভাঁড়ারে নতুন কিছু আছে?

—স্কোয়াশ এনেছি বাজার থেকে।

—স্কোয়াশ! তাই হোক। স্কোয়াশ আগে উত্তরবঙ্গের একচেটিয়া ছিল, তখন স্কোয়াশ খাওয়ার একটা চার্ম ছিল, এখন কলকাতায় ঢের-ঢের পাওয়া যায়...ঠিক আছে—

রাবণদাস চলে যাওয়ার পর রেঞ্জারমামা উঠলেন বিছানা ছেড়ে, বললেন, দি গ্রেট দত্তরায় একটু পরেই এসে যাবে। আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি, হয়তো দত্তরায়ও এল, তখনই বিট অফিসারদের কারও ফোন এল, তক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাবে।

৪

রেঞ্জারমামর কথা আংশিক ঠিক হল, তাদের রেডি হওয়ার মধ্যে বাইরে একটা ঝকঝকে জিপ এসে দাঁড়ায়। জিপ থেকে যিনি নেমে পাপানদের ঘরে এসে ঢুকলেন, তাঁকে দেখে চমকে উঠল পাপান। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা দত্তরায় নামের শিকারির। ঘরে ঢুকেই জড়িয়ে ধরলেন রেঞ্জারমামাকে, বললেন, সেই কবে ঝাড়গ্রামে এক পাগলা হাতিকে ঘুম পাড়ানোর সময় তোমার আমার দেখা। তারপর এতদিন পরে আবার।

রেঞ্জারমামা বললেন, দেখো, এই হল আমার ভাগনে পাপান। জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চার করাই ওর নেশা। আমার অনেক ডেঞ্জারাস অপারেশনের সঙ্গী। আর পাপান, বলছিলাম না, দি গেট দত্তরায়, ইনিই বিখ্যাত হাতিশিকারি। তবে শিকারি বলা ঠিক হবে না, টেকনিকাল ভাষায়, মোস্ট প্রলিফিক নেম ইন দি কেমিকাল ইমোবিলাইজেশন অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস।

—উরিব্বাস, দত্তরায় আঙ্কেল হা হা করে হেসে উঠলেন, ঘর কাঁপিয়ে, পাপনকে বললেন, ব্যাপারটা কিছুই না, হাতিকে ঘুম পাড়াই, ব্যস।

রেঞ্জারমামা হাঁক দিয়ে ডাকলেন কুক রাবণদাসকে, শিগগির চা নিয়ে এসো।

চা আসার মধ্যে রেঞ্জারমামা বললেন, তোমাকে কেন দি গ্রেট দত্তরায় বলা হয় তা শুনতে চাইছে পাপান। তোমার নিজের মুখ থেকে আমরা শুনি।

ইতিমধ্যে তিন কাপ চায়ের দ্রুত হাতে প্রবেশ। চায়ে চুমুক দিয়ে দত্তরায় আঙ্কেল বলতে শুরু করলেন, সে এক রোমহর্ষক কাণ্ড। বলা যায় মৃত্যুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ফিরেছি। বছর পাঁচেক আগের কথা। হঠাৎ বীরভূম থেকে খবর এল একটা দাঁতাল হাতি এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে ওখানকার লোকালয়। দুজন লোককে শূন্যে তুলে আছাড় মেরেছে। কিন্তু কপালগুণে তারা কেউ ওপারে যায়নি, তবে আমার প্রায় ওপারে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

রেঞ্জারমামা বললেন, হ্যাঁ, সেটাই তো শুনতে চাইছি।

—হাতিটার বয়স কিন্তু বেশি ছিল না, বছর বারো-তেরো হবে, পুরুষ হাতি বলতে যা বোঝায় তখনো তেমন বড়ো হয়নি। স্থানীয় লোকর্জন তার অত্যাচারে হিমশিম খয়ে যাচ্ছে। তার আগে ঝাড়খণ্ডে বেশ কয়েকজন লোককে মেরে এসেছে, তাতেও তার রাগ কমেনি। আমি সেখানে উপস্থিত হয়েছি হাতিটাকে ঘুম পাড়িয়ে তার একটা গতি করব বলে। হয় চিড়িয়াখানায় দিতে হবে, না হলে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে প্রশাসন। আমি বন্দুক নিয়ে খুব কাছে যেতে চাইছি, পিছন দিক থেকে যাওয়াই সুবিধেজনক। যখন মাত্র ছ-সাত ফুট দূরে, আমি বন্দুক চালালাম। গুলিটা লাগল তার পিছন দিকে।

পাপান উত্তেজিত হয়ে বলল, ঘুমিয়ে পড়ল অমনি?

—পিছন দিকে লাগলে কিছুটা সময় লাগে। হাতিটা বুঝল তার পিছন থেকে কেউ কিছু করেছে। দুম করে পিছন ফিরে দেখল আমাকে বন্দুক হাতে। আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলাম। জানতাম ওর ঘুম আসতে দেরি হবে। হাতিটা তখন আমাকে তাড়া করেছে। আমি প্রাণপণে দৌড়োচ্ছি, একটা আড়াল খুঁজছি, কোনো বাড়ি বা নিদেন কোনো একটা বড়ো গাছ। কিন্তু কপাল খারাপ, হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে।

—ইসস, পাপান প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

—তার পরের ঘটনা সাংঘাতিক। হাতিটা তার একটা পা তুলে দিল আমার কোমরের উপর। অমি শুনতে পাচ্ছি কোমরের হাড়গুলো ভাঙছে মড়মড় শব্দে। অন্য একটা পায়ের সামান্য অংশ পড়ল আমার বাঁ-হাতের চেটোয়। সেই হাড়ও ভাঙল। আমি তখন নিঃশব্দে পড়ে আছি এমনভাবে যেন আমি মরে গেছি। হাতিটা তখনো আমার পাশে দাঁড়িয়ে। যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, কিন্তু মুখে একটু শব্দও বার করছি না। হাতিটা কিছুক্ষণ আমাকে দেখে চলে গেল এগিয়ে।

পাপান রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

—একটু এগিয়েই ধপাস করে শুয়ে পড়ল হাতিটা। ততক্ষণে ঘুমের ইঞ্জেকশন কাজ শুরু করে দিয়েছে। ব্যাস, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তখন হাতিটার পাগুলো বেঁধে অনেক দূরের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার আয়োজন শুরু করল।

—আর আপনার কী হল? পাপান তখনো চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে।

—আমার আবার কী হবে? হাসপাতালে। অপারেশনের পর

অপারেশন। সেই ভাঙা কোমর জোড়া লাগাতে দীর্ঘ ছ-মাস বিছানায় শুয়ে।

পাপান অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল, তারপরও আপনি আবার হাতিকে ঘুম পাড়ানোর কাজে চলে এসেছেন?

দত্তরায় আঙ্কেল হা হা করে হেসে বললেন, এটাই তো আমার কাজ। সেদিন হাতিটাকে ঘুম না পাড়ালে আরও কত মানুষের ক্ষতি হত কে জানে! তবে অনেকদিন কাজে যোগ দিতে পারিনি। এখনও কোমরে মাঝেমধ্যে ব্যথা চাগাড় দিয়ে ওঠে। তখন পেইন-কিলার খেয়ে সামাল দিই।

কথায় কথায় সন্ধে পেরিয়ে যায়। রেঞ্জারমামা ব্যস্ত হয়ে বললেন, কেউ তো আর কোনো খবর দিচ্ছে না। তা হলে কি হাতিটা অন্য কোনো জঙ্গলে ফিরে গেল?

দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, মনে হয় না। হাতিদের স্মৃতি যেমন প্রখর, প্রতিশোধস্পৃহাও সাংঘাতিক। নিশ্চয় গোটা এলাকার লোকজন ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে লুকিয়ে আছে—তাই শোধ নিতে পারছে না।

রেঞ্জারমামা বললেন, তা হলে এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করণীয় নেই। যতক্ষণ না তার অবির্ভাব ঘটে, এখানেই অপেক্ষা করি। তবে রক্তিম, আমি তো এখানে এসেছিলাম রুটিন ইনস্পেকশনে। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছি, কিন্তু হাতিকে ঘুম পাড়ানোর কাজে যদি যেতে হয়, তুমি ড্রাইভার এনেছ, তোমার গাড়িতেই যেতে হবে আমাদের।

—নো প্রব্লেম, রঞ্জন, এখন কি আর এক কাপ চা হবে নাকি?

—ও, শিওর।

বলে রাবণদাস কুককে ডেকে চায়ের সঙ্গে চিকেন পকোড়ার কথাও বললেন।

জানালার বাইরে জঙ্গলে তখন ঘোর নির্জনতা। শুধু রকমারকম পাখির ডাক আর অদূরের মূর্তি নদীর অবিশ্রান্ত বয়ে চলার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

পকোড়ায় দাঁত বসিয়ে, চায়ে চমুক দিয়ে দত্তরায় আঙ্কেল তখন বলছেন, হাতির প্রতিশোধস্পৃহার একটি গল্প বলি। এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির একটি পোষা হাতি ছিল। লোকটি বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে গেল কোনো কাজে। যাওয়ার সময় হাতিটাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দিয়ে গেল এক বন্ধুর জিম্মায়। যথেষ্ট টাকাও দিয়ে গেল যাতে হাতির খাওয়ার কোনো অসুবিধে না হয়। সেই বন্ধু কিন্তু হাতিটাকে ঠিক মতো দেখাশুনো করত না, খাওয়াতেও কার্পণ্য দেখাত। অনেক কাল পরে যখন মালিক ফিরে এসে হাতিটাকে নিতে এল, বন্ধু যেই হাতিটার পায়ের বাঁধন খুলেছে, হাতিটা বন্ধুকে শুঁড়ে তুলে এক আছাড়ে মেরে ফেলল, শুধু তাই নয়, মালিককেও শুঁড়ে তুলে ছুড়ে দিল দূরে। মালিক বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু বাকি জীবন শয্যাশায়ী।

—বাপ্ রে! হাতি সম্পর্কে পাপানের জি. কে. ক্রমবর্ধমান। ভীতিও।

দত্তরায় আঙ্কেল তখনো বলে চলেছেন, সার্কাসের প্রয়োজনে একটি হাতি ধরে এনে খেলা দেখানো হত নিয়মিত। প্রায় দু-বছর পরে হঠাৎ কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় সার্কাসটি। সার্কাসের মালিক সেই হাতিটিকে নিয়ে রেখে আসেন সেই জঙ্গলে যেখান থেকে তাকে ধরে এনেছিলেন। অন্য হাতিরা বেশ কিছুক্ষণ নতুন হাতিটাকে দেখল, তারপর চিনতে পারল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এসে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিল সবাই মিলে। শুঁড়ে শুঁড় ঠেকিয়ে, গালে গাল ঠেকিয়ে তাকে দারুণ অভ্যর্থনা দিয়ে নিয়ে নিল তাদের মধ্যে।

তাঁর গল্প বলার মধ্যে হঠাৎ বেজে উঠল রেঞ্জারমামার মোবাইল, অন করতেই শুনলেন কিছু, বললেন, ঠিক আছে, আজ রাতে কি অপরেশন করা যাবে? স্ট্রিটলাইট যখন উপড়ে ফেলেছে, চারদিক অন্ধকার। এলাকায় আলো না-থাকলে হাতিটাকে টার্গেট করতেও পারব না। বরং গ্রামবাসীকে বলো, সবাই যেন দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমোয়। কাল ভোরে উঠে অপারেশন শুরু করব।

ফোন রেখে বললেন, হঠাৎ কেউ পথের মোড়ের প্রধান স্ট্রিটলাইট উপড়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন সারা গাঁ অন্ধকার। গ্রামবাসী সন্দেহ করছে হাতিটাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এই অনিষ্ট করে আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। হঠাৎ কাউকে সামনে পেলে আরও প্রতিশোধ নেবে।

দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, তা হতে পারে। হাতিটা কোনো বড়ো ক্ষতি না করে রেহাই দেবে না।

—ঠিক আছে, তা হলে রাত দশটার মধ্যে ডিনার সেরে ঘুমিয়ে নিই। কাল ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়তে হবে। পাপান, ভোর চারটেয় অ্যালার্ম দিয়ে রাখ। চা খেয়ে পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব।

৫

অক্টোবরের ভোর চারটে মানে জঙ্গলের পক্ষে মধ্যরাত্রি। পাখিরাও এখনও ঘুম ভেঙে উঠে শুরু করেনি তাদের দৈনন্দিন কিচিরমিচির। হয়তো কোনো বাচ্চাপাখি চোখ মেলেছিল, খাই, খাই করছিল, তার মা-পাখি এক ধমক দিয়ে যেই বলল, 'এখনও অনেক রাত, ঘুমো শিগগির, নইলে দেখছিস তো অনেক মানুষ এসেছে, তাদের কাছে তোকে দিয়ে আসব, তোকে নিয়ে কলকাতা চলে যাবে'—বলতেই সে অমনি গভীর ঘুমে।

পাপানের চোখেও খুব ঘুম, কিন্তু আপাতত তারা সবাই টেনশনে, খেপি হাতিটা কোথায় কখন কী কাণ্ড করবে তার ঠিক নেই।

ঘরের মধ্যে শীত-শীতও করছে, পাপান এখনও বুঝে উঠতে পারছে না এখন বেরোলে তারা আবার বাংলোয় কখন ফিরতে পারবে, বা আদৌ এ-বেলা ফিরতে পারবে কি না। তা হলে স্নানটা করে বেরোলেই ভালো। কিন্তু এই ভোরে না পাওয়া যাবে গরম জল, না যাবে ঠান্ডা জলে স্নান করা।

রেঞ্জারমামা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছেন পাপানের সংশয়, ব্রাশ করতে করতে বললেন, এখন স্নান করা যাবে না, ওখানে গিয়ে দেখি আমাদের রেঞ্জার কী ব্যবস্থা করেছেন, জায়গাটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়, জিপে মিনিট দশেকের পথ।

ছ-টার কিছু আগেই বেরোতে পারল তিনজনে। জিপের সামনে দত্তরায় আঙ্কেল, পিছনে সে আর রেঞ্জারমামা। ড্রাইভারের নাম রমেশ। বেশ হাসিখুশি যুবক। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে বরাবর কিছুটা গিয়ে জিপ ঢুকে পড়ল হাইওয়ের ওপাশের খোয়া-ফেলা রাস্তায়। আরও কিছুটা জঙ্গলে পথ পেরিয়ে একটা ছোটো বসতি। এই সাতসকালে সব বাড়িরই দরজা খোলা, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সমস্ত বাসিন্দা বসতির এক প্রান্তে একটি বিশাল সেগুন গাছের নীচের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখছে ।

বসতির ভিতরে ঢোকার আগেই তাদের জিপের পথ আটকালেন ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগী, এখন ভিতরে যাবেন না, স্যার, এই ক্লাবঘরে আপাতত আমরা অপেক্ষা করছি।

জিপটা দাঁড়িয়েছে একটা ক্লাবঘরের পাশে। গ্রামের নাম বাদামগুড়ি, ক্লাবের নাম 'বাদামগুড়ি জাগৃতি সমিতি'। ক্লাবঘরের সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। তিনজনে নামতে ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, স্যার, জিপটা ক্লাবঘরের পিছনে থাকুক। জিপ দেখলে হাতিটা আগে জিপটা উল্টে দেওয়ার কথা ভাববে। আপনারা ক্লাবের মধ্যে চলে আসুন।

রেঞ্জারমামা বললেন, রমেশ, জিপটা পিছনে রেখে তুমিও ক্লাবের মধ্যে এসো।

ক্লাবঘরে ঢুকে রেঞ্জারমামা বললেন, কী অবস্থা, দীপেশ?

—স্যার, মোটেই ভালো না। হাতিটা কাল রাতে অনেকগুলো শালগাছ উপড়ে ফেলেছে। একটা ছোট্ট দোকান ছিল, পা দিয়ে ঠেলে উল্টে দিয়েছে চালাঘরটা।

—মাই গড! আর কিছু?

—গ্রামের মানুষ কেউ বাইরে বেরোচ্ছে না। সেগুন গাছের পিছনে একটা টালির বাড়ি আছে, তাকে শান্ত করার জন্য একজন সাহস করে একটা কলাগাছ কেটে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে গিয়ে কোনো রকমে দিয়ে এসেছে ওর সামনে। কলাগাছটা খাচ্ছে বলে এখন শান্ত হয়ে আছে। কিন্তু তার পর কী করবে এখনই বোঝা যাচ্ছে না।

বিষয়টা বুঝে নিয়ে রেঞ্জারমামা বললনে, দীপেশ, ইনি রক্তিম দত্তরায়, বিখ্যাত হান্টার, তুমি তো জানোই উনি জলপাইগুড়ি এসেছিলেন ব্যক্তিগত কাজে, কাল ফোন করে বলেছিলাম আসতে। উনি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে এসেছেন। এখন দেখি কী করা যায়।

ক্লাবঘরের ভিতরটা খুব প্রশস্ত নয়। একটা টেবিলের ওপাশে একটি চেয়ার, এপাশে তিনটি। সবাই মিলে বসতে গ্রামের একজন কাঁচা-পাকা চুলের মধ্যবয়সি মানুষ ঢুকে বললেন, স্যার, আমার নাম মাধবচন্দ্র রায়। দেখুন দিকি আমরা এখন কী ঝামেলার মধ্যে আছি, আপনাদের চা-ও খাওয়াতেই পারছি না।

ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগী বললেন, আমরা তো চা খেতে আসিনি। এই যে মানুষটাকে দেখছেন, বিখ্যাত শিকারি, ইনি এসেছেন হাতিটাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলতে। এখন কীভাবে হাতিটার কাছাকাছি যাওয়া যায় তার একটা পরিকল্পনা করতে হবে।

মাধববাবু বললেন, স্যার, এখন হাতিটার ধারেকাছে যাওয়া যাবে না। মানুষ দেখলেই খেপে যাচ্ছে। আমার বাড়ি ক্লাবের পিছনেই বলে আমি সাহস করে বেরিয়েছি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব বলে।

রেঞ্জারমামা বললেন, আমরা সঙ্গে বিখ্যাত শিকারি নিয়ে এসেছি, ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব বলে। কিন্তু হাতিটার কিছুটা কাছে যেতে হবে। এত দূর থেকে বন্দুকের রেঞ্জে পাব না। পাকাবাড়ি থাকলে তার ছাদে গিয়ে গুলি ছোড়া যেত। কিন্তু হাতিটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাছাকাছি যে-কটা বাড়ি দেখছি সবই টিনের চালের, আমাদর পক্ষে ওঠা সম্ভব না। ভাবছি কী করণীয়।

মাধব রায় বললেন, স্যার, কাল থেকে একটাও গরু বা ছাগল গোয়ালের বাইরে আনতে পারছি না।

ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, স্বাভাবিক।

—কাল বিকেলে কয়েকটা হাঁস-মুরগি বেরিয়েছিল চরবে বলে। তাদের দেখেও তেড়ে এসেছিল, হাঁস-মুরগিরও প্রাণের ভয় আছে, তারা সেই যে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে গেছে আর বেরোয়নি।

রেঞ্জারমামা বললেন, আমরা এসেছি যখন, যাহোক একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু সমস্যা হল হাতিটার কাছাকাছি কী করে যাওয়া যাবে?

—ক্লাবঘরটা তো পাকাবাড়ি। তবে সিঁড়ি নেই। একটা মই আছে, মই বেয়ে ছাদে চড়তে পারবেন?

ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, চড়তে পারি। কিন্তু সেগুন গাছটা এখান থেকে অনেকটাই দূরে, বন্দুকের রেঞ্জে আসবে না।

হাতিটা তখনো কলাগাছ চিবিয়ে চলেছে, হয়তো এখনই তার খাওয়া শেষ হবে। উদরপূর্তি হলে কি তার মাথা ঠান্ডা হবে কে জানে?

একটু একটু করে বেলা বাড়ছে, কোনো বাড়ি থেকে কেউ বেরোতে পারছে না, সব বাড়ি থেকে মানুষজন দরজা একটু ফাঁক করে বুঝতে চাইছে পরিস্থিতি।

পাপান দূর থেকে দেখছে হাতিটার বিশাল অবয়ব। বিপুলাকার আয়তন বলে তার শরীরের জোরও সাংঘাতিক। এত দূর থেকেও হাতিটার পা-গুলো দেখাচ্ছে রাজবাড়ির থামের মতো।

হাতিটার খাওয়া তখন শেষ হয়েছে কি হয়নি, একজন বয়স্ক মানুষ, গায়ে গেঞ্জি, পরনে হঁটুসোর ধুতি, তাঁর বাড়ি নিশ্চয় এ-গাঁয়ে নয়, জানেনও না এখানকার পরিস্থিতি, হন হন করে যাচ্ছেন মেটে পথ দিয়ে, তাঁকে নিবৃত্ত করতে বেশ কয়েকটা বাড়ি থেকে হইহই করে চেঁচিয়ে বলা হল, ওদিকে যাবেন না, যাবেন না, হাতি বেরিয়েছে।

বয়স্ক লোকটি কানে কম শোনেন নিশ্চয়, এত চেঁচমেচিতেও ভ্রূক্ষেপ না করে যেমন চলছিলেন, তেমনই এগিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর নির্দিষ্ট গতিপথে।

ফরেস্ট রেঞ্জার উত্তেজিত হয়ে ক্লাবঘর থেকে কিছুটা বেরিয়ে বললেন, এই যে কাকা, যাবেন না, যাবেন না—

কিন্তু উনি নিশ্চয়ই কানে খুবই কম শোনেন, আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন হাতিটিকে, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে যে-মহূর্তে পিছু হটতে যাবেন, হাতিটার চোখে পড়ল লোকটিকে, অমনি খাওয়া ফেলে বিশাল শরীর দুলিয়ে ছুটে এল

তাঁর দিকে, চোখের নিমেষ তাঁর শরীরটা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে ছুঁড়ে দিল উপরদিকে। লোকটির শরীর অনেকটা উপরে উঠে সপাটে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

তার মুখ দিয়ে আঁক করে একটা শব্দ বেরোল শুধু, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল গেঞ্জি-পরা শরীরটা।

হাতিটা তখনো অনেকটাই দূরে, হান্টার দত্তরায় আঙ্কেল দুর্দান্ত সাহসী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন ক্লাবঘর থেকে, হাতে উদ্যত বন্দুক, একটু বেরিয়ে হাতিটাকে তাক করে গুলি ছুড়লেন, ফট করে শব্দ হল একটা। হাতিটা তখন ফিরে যাচ্ছিল তার আগের জায়গায়, শব্দ শুনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, রাগত মুখে দেখল শব্দটার উৎস।

শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে ছুড়ে দিল উপরদিকে।

দত্তরায় আঙ্কেল তখন বুঝে ফেলেছেন সম্ভাব্য বিপদ, দ্রুত ঘুরে ছুটতে ছুটতে আবার ক্লাবঘরের মধ্যে। পট করে ক্লাবঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন মাধববাবু।

ঘরের ভিতর ঢুকে দত্তরায় অঙ্কেল তখন আপশোশ করছেন, গুলিটা হাতির শরীর পর্যন্ত পৌঁছোতে না-পারায়। আর পনেরো ফুট কাছে হলেই গুলিটা লাগত, আর একটু সামনে যেতে পারলেই... রেঞ্জারমামা বললেন, না। না। এমনিতেই তুমি অনেকটাই ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়েছিলে।

হাতিটা তখনো দাঁড়িয়ে, ক্লাবঘরের দিকে তার চোখ, পরক্ষণে তাকাল নিথর হয়ে পড়ে থাকা বয়স্ক লোকটির দিকে।

পাপানরা দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে হাতিটা তাদের দিকে ছুটে আসে কি না! দরজা বন্ধ কিন্তু তার পাশের জানালাটা নিতান্তই পলকা।

পাপান রেঞ্জারমামার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, হাতিটা যদি ছুটে এসে জানালায় ধাক্কা মারে?

রেঞ্জারমামা তখন ঘুমপাড়ানি বন্দুক তাক করে আছেন জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে, বললেন, তা হলে ভালোই হয়। হাতিটাকে আমরা রেঞ্জের মধ্যে পাব। আমরা দুজন মিলে গুলি ছুড়লে একটা না একটা লাগবেই ওর গায়ে।

গোটা গ্রামের মানুষ তখন স্তব্ধ হয়ে আছে সদ্য ঘটে যাওয়া মৃত্যু দেখে। মাধববাবু বললেন, ইনি আমাদের গ্রামের কেউ নন। নিশ্চয়ই কারও কাছে কোনো কাজে এসেছিলেন। তিনি কী করে জানবেন এখানে একটা যমদূত অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য?

সেই যমদূত এখন ফিরে গেছে সেই সেগুন গাছের নীচে। সম্ভবত তার খাদ্য তখনো অনিঃশেষিত। যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে আবার মনোনিবেশ করেছে তার খাওয়ায়।

ক্লাবঘরের ভিতর তখন এক অসহনীয় পরিস্থিতি। বনবিভাগের এতজন আধিকারিক এখানে উপস্থিত, তাঁদের চোখের সামনে ঘটে গেল একটা মৃত্যু, এই মর্মন্তুদ ঘটনা নিয়ে নিশ্চয় তোলপাড় হবে উপরমহলে। কিন্তু কীভাবে হাতিটাকে ঘুম পাড়িয়ে বশ করা যাবে তা দিশে করতে পারছেন না কেউ।

তাঁদের এই দিশেহারা অবস্থার মধ্যে বাইরে থেকে ছুটে এল তেইশ-চব্বিশ বছরের একজন যুবক, ক্লাবঘরের দরজায় ধাঁই ধাঁই করে ধাক্কা দিয়ে বলল, শিগগির খুলুন—

মাধববাবু চট করে দরজা খুলে তাকে ঘরে ঢুকিয়ে বললেন, কী হয়েছে, অজিত?

—আমি রতন রাভার সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। উনি এখনই আসছেন। কুড়ি বছর ধরে হাতির মাহুত। বলছেন 'কত রকম হাতির পিঠে চড়েছি তা নিজেই জানি না। বুনো হাতিকে কী করে বশ মানাতে হয় তা ভালোই জানি।'

বলে চেয়ারে বসে থাকা বনবিভাগের আধিকারিকেদের দিকে তাকায়।

তার কথার মধ্যে কি একটু ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে? সরকারি বড়ো অফিসাররা ভেবে পাচ্ছেন না কী করে বনের ক্রুদ্ধ হাতিকে ঘুম পাড়াবেন?

রেঞ্জারমামা এক পলক তাকালেন দত্তরায় আঙ্কেলের দিকে।

কিছুক্ষণ এরকম অস্বস্তিকর পরিবেশে কাটলে অজিত নামের যুবক জানালার বাইরে কী যেন দেখে লাফিয়ে উঠে বলল, ওই তো রতন রাভা এসে গেছেন। আমি দেখি—

দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, অজিতবাবু, হাতিটা কিন্তু বেশ খেপে আছে। এখন ওর কাছে যাওয়া খুব ঝুঁকির।

অজিত বলল, ওঁর প্রচণ্ড সাহস। কিছু হবে না।

রতন রাভার চেহারাটা বেঁটেখাটো, কিন্তু গুঁট গড়ন, চোখের দৃষ্টি বেশ প্রখর। ক্লাবের বারান্দায় উঠে এসে অজিতের সঙ্গে কী সব কথা বললেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে, আমি ওই টিনের চালের ঘরের পিছন দিক দিয়ে সেগুন গাছে উঠব। তারপর এক লাফ দিয়ে—

পাপানের মনে হল লোকটি সত্যিই দুঃসাহসী—

ক্লাবঘরের সবাই তখন কৌতূহলী হয়ে দেখছেন রতন রাভার সাহসিকতা। আধিকারিকরা কেউই চেনেন না রতন রাভাকে। স্তম্ভিত হয়ে দেখছেন তাঁর কাণ্ড।

রতন রাভা তখন নিজেকে মুড়ে নিয়েছেন এমন একটা কালো পোশাকে যে, তাঁকে মানুষ বলে চেনাই যচ্ছে না। তারপর উবু হয়ে বসলেন, এবার এগোতে লাগলেন নিঃশব্দে। চারদিকে একজন লোকও নেই। রতন রাভা খুব চুপিচুপি এগোতে লাগলেন তাঁর লক্ষ্যে। প্রায় গুঁড়ি মেরে চলেছেন ক্লাবের সামনের প্রশস্ত জায়গটার বাঁদিক দিয়ে। পাপানের মনে হচ্ছে একটা ভালুক এগোচ্ছে থপ থপ করে।

পাপান অবাক হচ্ছিল। রতন রাভা ভেবেছেন তো বেশ। হাতিটার যত রাগ মানুষের উপর। জঙ্গলের ভালুকের সঙ্গে তার কোনো অবনিবনা নেই। তাই ভালুক সেজে রতন রাভা এগোচ্ছেন হেলেদুলে। তবু খ্যাপা হাতিকে বিশ্বাস নেই। তিনি বেশ ঘুরপথে গিয়ে পৌঁছোলেন টিনের চালের ঘরের পিছনে। কিছুক্ষণ তাঁকে আর দেখা গেল না।

একটু পরে তাঁকে দেখা গেল টিনের চালের উপর। ঢালু টিনের চাল বেয়ে নামছেন সেগুন গাছের দিকে। ক্লাবঘেরর ভিতর বেশ রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। টিনের চাল এত ঢালু যে, যে কোনো মুহূর্তে পা পিছলে পড়ে যেতে পারেন। পড়ে গেলে হাত-পা তো ভাঙতেই পারে, তার উপর পড়বেন হাতিটার পায়ের কাছে।

তার পর যে কী হবে ভেবে শিউরে উঠেছে পাপান।

শুধু পাপানই তো নয়, ক্লাবঘরের ভিতর যতজন আছেন সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছেন।

রতন রাভা তখন টিনের চাল বেয়ে-বেয়ে পৌঁছে গেছেন সেগুন গাছের কাছে। টিনের চালের একেবারে কিনারে সেগুন গাছের একটা ডাল। সেই ডালের একটা জায়গা ধরে ফেললেন বেশ কায়দা করে। একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে উঠলেন ডালটার উপর। এমন কিছু মোটা ডাল নয় যে খুব নিরাপদ, তবু টুক টুক করে গিয়ে পৌঁছোলেন সেই জায়গায় যার নীচে দাঁড়িয়ে আছে হাতিটা। তখনো খেয়ে চলেছে কলাগাছের অবশিষ্ট অংশ।

রতন রাভাকে তখন প্রায় দেখাই যাচ্ছে না, তাঁর শরীরটা বড়ো বড়ো সেগুন পাতার আড়ালে। কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ। তারপর হঠাৎ ঝপাং করে একটা শব্দ।

সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছেন রতন রাভা এক লাফ দিয়ে হাতিটার পিঠে।

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের বাড়ি থেকে যারা নিঃশব্দে লক্ষ করছিল গোটা ঘটনাটা, একসঙ্গে হাততলি দিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল মাহুতের।

ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগী বললেন, খুব ঝুঁকি নিয়েছেন রতন।

দত্তরায় আঙ্কেলও বললেন, একজ্যাক্টলি।

হাতিটা এক মুহূর্ত হকচকিয়ে গেল তার পিঠের উপর কিছু একটা পড়েছে অনুভব করে। একবার শরীরে ঝটকা দিল পিঠের উপরের বস্তুটাকে ফেলে দিতে।

রতন রাভা তখন বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে আছেন হাতিটার পিঠ। মাহুত হিসেবে তাঁর অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পিঠের উপর বসে ডান হাত দিয়ে চাপড় মারছেন হাতিটার দাবনায়, আর মুখে এক অদ্ভুত শব্দ করছেন—আ হা হা হা—

মুখের শব্দের সঙ্গে দাবনায় চাপড়। বুনো হাতিটাকে পোষ মানানোর চেষ্টা করছেন। গ্রামবাসী দু-তিনজনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেদিকে। তাঁদের ধারণা হচ্ছিল হাতিটা নিশ্চয় এবার বশ মানবে। তার পর যে-ঘটনা ঘটল তা আরও অদ্ভুত।

হাতিটা হঠাৎ রতন রাভাকে নিয়ে উল্টোদিকে ফিরে দাঁড়ায়। মাহুত তখনো মুখে শব্দ করে, হাতিটার দুই দাবনায় ক্রমাগত চাপড় মেরে, গলার নীচে হাত বুলিয়ে চেষ্টা করছেন তাকে বাগে আনার।

হাতিট কী বুঝল কে জানে। হঠাৎ তাকে পিঠে নিয়ে দৌড় দিল উল্টোদিকে।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ ছুটে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

হাতিটা দৃষ্টির অন্তরালে যেতে গ্রামের লোকজন বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। ঘটনার আকস্মিকতায়, পরবর্তী সময়ে কী হবে রতন রাভার সেই আশঙ্কায় বহুক্ষণ কেউ কথা বলতেই পারছিল না।

ক্লাবঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এসেছিলেন বাইরে। সেই অজিত নামের যুবক দীপেশ আঙ্কেলের কাছে এসে বলল, এখন কী হবে, স্যার?

ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, রতনবাবু একটু বেশিই ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছেন। হাতিটার ভিতরে একটা মস্ত শোক রয়েছে। তাকে এভাবে বাগ মানানো সহজ নয়। এখানে দুজন বড়ো বিশেষজ্ঞ বসে আছেন যাঁরা ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশন বন্দুকে ভরে অপেক্ষা করছেন কখন হাতিটকে কাছাকাছি পেয়ে সেই গুলি ছুড়বেন।

অজিতকে খুব অসহায় লাগছে, বলল, স্যার, কী হবে এখন? আমিই তো ওঁকে ফোন করে ডেকে আনলাম। উনিও বললেন, এর আগে বহু বুনো হাতিকে কব্জা করেছেন।

রেঞ্জারমামা বললেন, এখন আমাদের সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে, হাতিটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে রতন রাভা এখানে ফিরে আসেন কি না।

এলাকার কিছু লোক হাতির ভয় ভুলে এসে জড়ো হয়েছে ক্লাবের সামনে। সবাই হা-হুতাশ করছে রতন রাভার কথা ভেবে।

ক্লাবঘরের অদূরে সেই প্রৌঢ়ের মৃতদেহ তখনো পড়ে। গ্রামের একজন বৃদ্ধ, খালি গায়ে লুঙ্গি পরে এসে তাড়া দিয়ে বললেন, এই ছেলেরা, যে এখনও মরেনি, মরতে গেছে, তার কথা ভেবে সময়

নষ্ট না করে, যে-মরেছে তাকে নিয়ে ভাবতে লাগ। লেকটা কে, কার বাড়িতে আসছিল, খোঁজ নিয়ে তার বাড়িতে খবর দে।

কথায় কথায় বেলা বেড়ে যায়। পাপান ঘড়িতে চোখ রাখে, এগারোটা দশ।

কখন যে এতটা সময় পার হয়ে গেল বুঝতেই পারেনি কেউ।

বাদামগুড়ির মানুষ তখন মৃতদহ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, স্যার, আমি আর বিট অফিসার এখানেই থাকছি। আপনারা বরং বনবাংলোয় গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে নিন। কোনো খবর হলে আপনাদের জানিয়ে দেব, আপনারা আবার চলে আসবেন।

রেঞ্জারমামা বললেন, ঠিকই বলেছ, দীপেশ। কিন্তু তোমাদের স্নান-খাওয়া কী করে হবে?

পাশেই বসেছিলেন বিট অফিসার পঞ্চানন রায়, বললেন, একদিন স্নান না হলে কিছু যায় আসে না। খাবারটা কাছকাছি গঞ্জে গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।

সেইমতো পাপানরা ফিরে এল মূর্তি বাংলোয়।

পাপানের মনে হচ্ছিল একটা দুঃস্বপ্ন দেখে এল এতক্ষণ। বুনো হাতির গল্প শুনেছে অনেক। সেই বুনো হাতি যদি হিংস্র হয়ে ওঠে, তা হলে যে কী ভয়ংকর হতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত চাক্ষুস করল ওরা।

৬

সকাল থেকে এক টানটান টেনশনের মধ্যে কাটিয়ে এতটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল পাপান, স্নানঘরে ঢুকে উপুড়-ঝুপুড় স্নান করে বেশ টাটকা হয়ে নিল। এবার দরকার দুপুরের খাওয়া। সেই যে সকালে সামান্য কিছু খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে শুধু হরিমটর।

পেটের ভিতর যেন বুনো হাতিটাই ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে।

টেবিলের তিনপাশে তিনজন বসে ডিশের অপেক্ষায়। খিদের চোটে কেউ কথাই বলছিলেন না। কুক রাবণদাস হয়তো আন্দাজ করেছেন আজকের তিন অতিথিই প্রবল ক্ষুধার্ত।

টেবিলে দ্রুত সাজিয়ে দিলেন ধবধবে সাদা তিনটে প্লেটে তেমনই ধবধবে সাদা ভাতের সঙ্গে ডাল-আলুভাতে আর চিকেনকারি।

মুগের ডালের স্বাদ তো অপূর্ব, টাকনা হিসেবে আলুভাতের সঙ্গে ভাজা পেঁয়াজ মাখা। খিদের মাথায় মনে হচ্ছিল অমৃত খাচ্ছে। কয়েক গ্রাস খাওয়ার পর মুখে কথা ফুটল রেঞ্জারমামার, বললেন, একটু আগে একটা অদ্ভুত মেসেজ পেলাম গরুমারা ফরেস্ট থেকে।

দত্তরায় আঙ্কেলের মুখেও এতক্ষণে কথা ফুটেছে, জানতে চাইলেন, কী মেসেজ?

—কাল রাতে বোধ হয় পোচাররা আবার হানা দিতে এসেছিল।

—সে কী!

—হ্যাঁ, আগের দিন বাচ্চা-হাতিটাকে মেরেও কোনো লাভ হয়নি তাদের।

—হ্যাঁ, তাই তো।

—তারা কাল রাতে আবার এসেছিল হাতি মারতে।

—সে কী! নিশ্চয় তাদের কানে গিয়েছে সন্তান হারা হাতিটা কী কাণ্ড করেছে তার পর থেকে?

—নিশ্চয় শুনেছে। তার পরেও তারা এসেছিল, এতটাই তাদের লোভ।

—এদের ধরে চরম শাস্তি দেওয়া উচিত।

—আমাদের আর শাস্তি দিতে হবে না। হাতিরাই চরম শাস্তি দিয়েছে। যে-হাতিটা সন্তান শোকে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সমব্যথী হয়ে অন্য হাতিরা দল বেঁধে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে ছড়িয়ে দিয়েছে সারা জঙ্গলে।

পাপানের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, ঠিক করেছে।

আজকের খাওয়াটা বেশ জম্পেশ হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও এক নিষ্ঠুর আনন্দ হল পোচারের মৃত্যুসংবাদে। সন্তানহারা হাতিটার উন্মত্ততা দেখে পাপান অনুভব করছিল তার শোকের প্রাবল্য। সেও চাইছিল পোচারদের যেন উপযুক্ত শাস্তি হয়। কিন্তু বনবিভাগের শাস্তির জন্য অপেক্ষা করেনি হাতিরা। তারা নিজেরাই হাতে তুলে নিয়েছে আইন।

বেসিনে মুখ ধুয়ে তোয়ালেয় হাত মুছতে মুছতে দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, হাতিদের নিয়ে আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। হাতিরা মানুষের মতো কথা বলতে পারে না, কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা আছে, সেই ভাষায় তারা তাদের বক্তব্য, অনুভূতি বিনিময় করে।

পাপান বলল, আঙ্কেল, আমি একবার এলিফ্যান্ট সাফারি করেছিলাম। বারবার এখানে-ওখানে হাতির পিঠ থেকে নামছিলাম, আবার উঠছিলাম। হাতিটার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে ভাব করে নিয়েছিলাম। এক জায়গায় দ্রষ্টব্য দেখে আমার ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, গাইড খেয়াল করেননি আমি তখনো ফিরিনি, তিনি মাহুতকে বললেন পরের দ্রষ্টব্যে যেতে, কিন্তু হাতিটা অবাধ্যের মতো আচরণ করছিল, নড়ছিল না। যেই আমি ফিরে হাতিটার পিঠে চড়েছি, অমনি বাধ্য ছেলের মতো চলতে শুরু করল।

—একজ্যাক্টলি, দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, হাতির মৃত্যুবোধ প্রবল। একবার সিংহের কামড়ে একটি হাতির মৃত্যু হয়েছিল। হাতিটাকে খেয়ে শুধু হাড় ক-খানা ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল সিংহটা। সিংহ চলে গেলে হাতিরা দল বেঁধে এসে বহুক্ষণ সেই হাড়গুলো শুঁকছিল, তারা পরস্পরের শুঁড় জড়িয়ে শোকপ্রকাশ করছিল, শেষে সেই জায়গায় মাটি খুঁড়ে হাড়গুলো মাটির নীচে চাপা দিয়ে রেখে চলে গেল।

পাপান হাঁ করে শুনে বলল, কী দারুণ!

—হাতির অপত্যস্নেহও প্রবল। ওদের যখন কোনো সন্তান হয়, তাকে ঘিরে থাকে প্রথমে যার সন্তান হয়েছে সেই মাদিহাতি। তারপর চলে আসে মাদিহাতিটার মা। তারপর চলে আসে দ্বিতীয় মাদিহাতিটার মা। সে এক অদ্ভুত জননীকেন্দ্রিক প্রতিপালন দৃশ্য।

রেঞ্জারমামা বললেন, পোচারগুলোর কী সাহস! আগের দিন এত বড়ো একটা ঘটনা ঘটল, পরের দিন রাতে আবার হানা দিয়েছে? মানুষের লোভের সীমা-পরিসীমা নেই...

পাপান বলল, আর তার ফলভোগ করতে হচ্ছে একটা গোটা এলাকার মানুষকে।

রেঞ্জারমামা বললেন, এখন আরও কটা প্রাণ যায় তার ঠিক কী?

কথা বলছিলেন রেঞ্জারমামা আর দেখছিলেন হোয়াটসঅ্যাপের পাতা। বললেন, এখনও হাতিটার কোনো পাত্তা নেই।

—আর রতন রাভার?

—না, তিনিও ফেরেননি এখনও। কতবার বললাম এরকম ঝুঁকি নেবেন না।

বলেই রেঞ্জারমামা হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ দেখে বললেন, রক্তিম, আমদের এখনই একবার গরুমারা ফরেস্টে যেতে হবে।

রক্তিম আঙ্কেল বললেন, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। কোনো মেসেজ এসেছে?

—হ্যাঁ ওখানে দীপেশ নিয়োগী এসেছে, বিট অফিসার বেণু ঈশ্বরারি আছে। থানা থেকে এসডিপিও এসেছেন। দীপেশ বলল, আপনি যখন কাছেই আছেন, একবার ঘুরে গেলে ভালো হয়।

—রাইট। আমাদেরও তো এই মুহূর্তে কোনো জরুরি কাজ নেই, চলো—

দত্তরায় আঙ্কেল যে-জিপে এসেছেন, সেই জিপ নিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত হল। মূর্তি বাংলো থেকে বেরিয়ে রেঞ্জারমামা বললেন, হাতির খবরটা সব কাগজে খুব প্রায়োরিটি দিয়ে ছাপা হয়েছে, যার ফলে বড়ো সাহেবরা সবাই খুব খোঁজখবর নিচ্ছেন। গরুমারা এখন কাগজের স্কুপ খবর।

রাস্তার উপর এক জায়গায় অনেকগুলি শিলাখণ্ড পর পর সাজানো, শিলাগুলির প্রতিটির উপর সিঁদুরলেপা, তার পাশে পাশে কঞ্চির ডগায় লাল শালু বাঁধা পতাকার মতো একটা ত্রিশূল, তার মাথায় ঝুলছে কঞ্চির উপর টাঙানো মাটির কলসি।

পাপান জিজ্ঞাসা করার আগে দত্তরায় আঙ্কেল জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী?

রেঞ্জারমামা হেসে বললেন, এখানে পরিচিত মহাকাল নামে।

—মহাকাল?

—হাতিকে এতদঞ্চলে বলে মাহাকাল। এই পথ হল হাতি চলাচলের করিডোর। স্থানীয় বাসিন্দারা মহাকালকে পুজো করে। পথচারীরা আসা-যাওয়ার পথে মহাকাল থানের সামনে এলে দু-হাত তুলে প্রণাম জানায়।

জিপ তখন চলেছে গরুমারা রিজার্ভ ফরেস্টের দিকে।

যেতে যেতে পাপান হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মামা, গরুমারা নাম হল কেন?

—রাইট কোয়েশ্চেন, গরুমারা ফরেস্টে যে-ই আসে, প্রথম প্রশ্ন নামকরণ নিয়ে। এ-বিষয়ে আমিও খুব জানি তা নয়, যেটুকু লোকমুখে প্রচারিত তা হল, আরও আগে এ সব এলাকায় অনেক বেশি বন্যপ্রাণী ছিল। যারা গরু-মহিষের ব্যবসা করত, তারা গরু-মহিষের দল নিয়ে বড়ো রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করত। পথে রাত হয়ে গেলে এই জায়গায় রাত্রিবাস করত। এখানে গাছের উপরে মাচা বাঁধা থাকত। মানুষগুলো থাকত গাছের উপর মাচায়, গরু-মহিষ থাকত নীচে বাঁধা। সকাল উঠে দেখা যেত একটা কি দুটো গরু টেনে নিয়ে গেছে বাঘে বা চিতায়। সেই থেকে জায়গাটার নামই হয়ে গেছে গরুমারা।

গল্পটা মানানসই মনে হল পাপানের। সারা দেশে কত-কত গ্রাম, তাদের কত-কত নাম। সব নামেরই কি কোনো উৎস থাকে?

গতকাল গরুমারাকে যতটা বিধ্বস্ত লাগছিল, আজ কিছুটা স্বাভাবিক। চেকপোস্টটা মুখ থুবড়ে পড়েছিল কাল, আজ কোনো ভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে বিট অফিসারের চেষ্টায়।

পাপান বলল, এ সব দিকে কিছু বাড়ি আছে কাঠের তৈরি, তাই খুব সুবিধা।

রেঞ্জারমামা হো হো করে হেসে বললেন, ভাঙতেও সুবিধে, গড়তেও সুবিধে।

দত্তরায় অঙ্কেল বললেন, হাতিদের রাগের কথা ভেবেই বোধ হয় কাঠের বাড়ি করার কথা ভেবেছিলেন তখনকার কর্তৃপক্ষ।

রেঞ্জারমামা বললেন, হাতিদের রাগের আরও একটা দৃষ্টান্ত ভিতরে গেলেই দেখতে পাবে।

জিপ ততক্ষণে পৌঁছে গেছে চেকপোস্ট পেরিয়ে গরুমারা বাংলোর কাছে। পাপান কাল শুনেছিল বাংলোটির ব্যতিক্রমী গঠন। আজ স্বচক্ষে দেখল বাংলোর চারদিকে একটা গভীর পরিখা। বাংলোয় ঢোকার মুখে পরিখার উপর একটা পাটাতন ফেলা। পাটাতন পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখা গেল আরও দুটো গাড়ি। একটি পুলিশের, অন্যটি ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগীর।

তারা ভিতর ঢুকতেই পাটাতন উঠে গেল আবার।

চোখে পড়ল একপাশে ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা স্তূপ হয়ে আছে কিছু একটা। তার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন ফরেস্ট গার্ড। ওর মধ্যে কী আছে জিজ্ঞাসা করতে, একজন বেঁটে ফরেস্ট গার্ড বলল, ডেডবডি, স্যার। সকালে আমি আর বৃন্দাবন ঘুরে ঘুরে টুকরোগুলো জোগাড় করেছি। কোথাও পড়ে ছিল হাত, কোথাও পা, কোথাও মুন্ডু।

—বুঝেছি, রেঞ্জারমামা ঘাড় নেড়ে বললেন, ওয়েল ডান।

তারপর বললেন, কেউ এসে এখনও মৃতদহ দাবি করেনি?

দুজনেই একযোগে ঘাড় নাড়ে, না।

কথোপকথনের পর দুই আধিকারিক চলে গেলেন ভিতরে, পাপান এখনই যাবে না, আগে রেঞ্জারমামাদের অফিসিয়াল কথা শেষ হোক।

তার চোখ এখন গরুমারা ফরেস্টের ভিতরকার চেহারার দিকে।

জিপটা ভিতের আসার পর-পরই পাটাতনটা তুলে নেওয়া হয়েছে যাতে কোনো বন্যজন্তু ভিতরে না-চলে আসতে পারে। পাপান চাইল দুই ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে কথা বলতে, জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি এই বাংলো-এলাকায় থাকেন?

বৃন্দাবন নামের ফরেস্ট গার্ড বলল, আমি এই বাংলোর গার্ড, বাংলোর গার্ডরুমে থাকি। আর বাদল থাকে বাইরে, নিজের বাড়িতে। রোজ সকালে উঠে চলে আসে। মাঝেমাঝে আমরা ডিউটি বদল করে নিই। তখন বাদল বাংলোর গার্ড, আমি বাড়ি থেকে যাতায়াত করি।

—এই জঙ্গলে এত হাতি, জঙ্গলের মধ্যে আপনারা চলাফেরা করেন, ভয় করে না?

বাদল হাসে, বলল, প্রথম-প্রথম ভয় করত, কিন্তু আস্তে আস্তে হাতিরা আমাদের চিনে ফেলেছে। এখন ওদের আসতে দেখলে আমরা ওদের অনেকটা দূর দিয়ে চলে যাই, কিছু বলে না।

পাপান তো গত দু-দিন হাতিদের রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে আছে। বলল, কখনো হাতিদের মুখোমুখি পড়ে যান না?

বৃন্দাবন বলল, হ্যাঁ, তাও হয়। হয়তো আমি ডিউটিতে আসছি, গেট পেরিয়ে আসছি সাইকেলে, বেশ জোরেই চালাচ্ছিলাম, অন্যমনস্ক ছিলাম, পাশে তিন-চারটে সেগুনগাছ ছিল গা-জড়াজড়ি করে, হঠাৎ তার পিছন থেকে একসঙ্গে তিনটে হাতি চলে এল রাস্তার উপর। বুকের ভিতরটা ঢিবঢিব করছে, কিন্তু এমন ভাব দেখালাম আমি ভয় পাইনি, আমি সাইকেল থেকে নেমে রাস্তার পাশে সরে দাঁড়ালাম। ওরা যেমন চলছিল, হেঁটে চলে গেল আমার পাশ দিয়ে। মাত্র তিন ফুট দূর দিয়ে।

—কিছু বলল না?

—ওরা আমার দিকে তাকালই না। বিট অফিসারকে বলতে তিনি বললেন, তোদের গায়ে খাকি পোশাক তো, ওরা চিনে গেছে তোদের। জানে এরা জঙ্গল পাহারা দেয়।

বলে হাসতে লাগল বৃন্দাবন।

কিছু সময় পরে বাংলোর ভিতরের সব অফিসার একসঙ্গে বেরিয়ে এলেন বাইরে। এসডিপিও তাঁর গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলেন অফিসের দিকে।

ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ আঙ্কেলও বললেন, স্যার, আমি ওদিকটা দেখি। সব বিট অফিসারকে বলা আছে, হাতিটার কোনো খবর হলেই আমাকে জানিয়ে দেবে। আমিও আপনাদের জানিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, বলতেই ফরেস্ট রেঞ্জার বেরিয়ে গেলেন হাইওয়ের দিকে।

পাপানদের জিপ পাটাতন পেরিয়ে চলে গেলেই পাটাতন অমনি উঠে গেল উপরে। বেশ গভীর পরিখা, কোনো জীবজন্তু বড়ো লাফ দিয়েও পেরোতে পারবে কি না সন্দেহ। তবু পাপান জিজ্ঞাসা করল, মামা, চিতা কিন্তু এক লাফে অনেকটা পার হতে পারে। এই পরিখাটা পার হতে পারবে না?

—সে হিসাব বনবিভাগের আছে। তবে তরাইতে এখন কেউ আর চিতা দেখেনি অনেক দিন। চিতার লাফ নিশ্চয় হিসেবের মধ্যে ধরেনি কেউ।

বাইরে বেরিয়ে রেঞ্জারমামা বললেন, আমরা এখন জিপে যাব না। চল পাপান, তোকে এখানকার ওয়াচ টাওয়ারটা দেখিয়ে নিয়ে যাই। একেবারে পাশেই।

কিছুটা পায়ে হেঁটে ওরা পৌঁছোল উঁচু ওয়াচ টাওয়ারের কাছে। উঁচু সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে জঙ্গলের অনেকখানি দেখা যায়।

ওয়াচ টাওয়ারের নাম যাত্রাপ্রসাদ।

—যাত্রাপ্রসাদ ভারী অদ্ভুত নাম।

—হ্যাঁ, তারও একটা গল্প আছে। এই ওয়াচ টাওয়রটা তৈরি হয়েছে অনেক পরে। তার আগে একটি ওয়াচ টাওয়ার ছিল, সেটা তৈরি হওয়ার পর তার নাম কী হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়। শেষে ঠিক হয় নাম হবে 'যাত্রাপ্রসাদ'। এখানে ছিল একটা কুনকে হাতি। বিশাল চেহারার, আর ভারী বিশ্বস্ত। তার নাম রাখা হয়েছিল যাত্রাপ্রসাদ। সেই হাতিটা মারা যাওয়ার পর তার স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গিত হয়েছিল আগের ওয়াচ টাওয়ারটা। তার নীচে একটা অবয়ব তৈরি করা হয়েছিল যাত্রাপ্রসাদের আদলে।

পাপানও বুঝে উঠতে পারল না হাতিটা ঠিক কত দূরে, শুধু কি সাইকেলটাই নিয়ে এসে ভাঙচুর করছে, তা হলে সেই ছেলেটার কী হল?

—বাহ্! পাপান উৎসাহ দেখায়।

—কিন্তু জঙ্গলের হাতিরা সেটা পছন্দ করেনি। তারা যাত্রাপ্রসাদকে চিনতে পারে। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে গুঁড়িয়ে দেয় সেই অবয়ব।

—তাই নাকি! সত্যিই খুব রাগ হাতিদের?

দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, আসলে আমরা হাতিদের বোঝার চেষ্টা করি তার অবয়বকে কেন্দ্র করে। পৃথুল শরীর, বিশাল দুটি কান, বিশাল দুটি দাঁত, লম্বা একটি শুঁড়, অথচ ক্ষুদ্রতম চোখ—এরকম একটি প্রাণীকে নিয়ে হাসাহাসি করে মানুষ। তার যে একটা মন থাকতে পারে, তারও ভিতরে সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকতে পারে, তা বেশির ভাগ মানুষের ভাবনায় আসে না। শুধু তার মূল্যবান দুটি দাঁতের প্রতি মানুষের বরাবরের লোভ।

রেঞ্জারমামা বললেন, হ্যাঁ। মানুষ তার লোভের জন্য কত যে বিপদ বাধিয়ে ফেলে।

—কিন্তু যারা হাতিদের কাছাকাছি এসেছে, হাতির মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছে, তারাই জানে হাতি কতটা সেনসিটিভ।

ওয়াচ টাওয়ারের উপর উঠে পাপান তখন দেখছে জঙ্গলের এক অন্য চেহারা। চারপাশে সবুজে সবুজ। সবুজের কত রকমের শেড।

রেঞ্জারমামা তখন দেখাচ্ছেন—দূরে দেখা যাচ্ছে একটা বিশাল খাদ, সেই খাদে একটা ঢিপি আছে, সেখানে নিয়মিত আসে বাইসনের দল, তাদের জন্য বনবিভাগ থেকে প্রতিদিন রেখে আসা হয় এক বস্তা করে নুন, সেই নুন ভারী প্রিয় বাইসনদের।

পাপানের মনে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন, কারা রেখে আসে ওই নুনের বস্তা?

—এই বাংলোয় যে সব ফরেস্ট গার্ড ডিউটিতে থাকে, তারাই।

—বাইসন তো খুব ভয়ংকর প্রাণী, ওদের শিংদুটো দিয়ে আক্রমণ করলে সাংঘাতিক কাণ্ড হবে।

—তা হতেই পারে। বনবিভাগে যাঁরাই কাজ করেন, প্রত্যেককেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। তবে ফরেস্ট গার্ডরা নুনের বস্তা নিয়ে যায় সকালের দিকে, যখন বাইসনরা অনেক দূরের জঙ্গলে থাকে। বাইসনরা নুন খেতে আসে সাধারণত রাতের বেলা। তখন ওদের চোখদুটো জ্বলতে থাকে দুটো পেনসিল টর্চের মতো। বাংলোর পিছনে একটা ভিউ পয়েন্ট আছে, রাত নটা-দশটা নাগাদ ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে দেখা যায় সার দিয়ে বাইসনরা আসছে নুন খেতে।

পাপান আপশোশ করল, তা হলে তো রাতের বেলা এলেই হত এখানে।

—তাই তো প্ল্যান করে রেখেছিলাম। হঠাৎ এই এমার্জেন্সিটা এসে যেতে আগের সব প্ল্যান বাতিল।

ওয়াচ টাওয়ার থেকে নেমে এবার ওদের মূর্তি বাংলোয় ফেরা।

জিপে উঠে রেঞ্জারমামা ফোন করলেন ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগীকে, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে মোবাইল অফ করে বললেন, সেই হাতিটার এখনও দেখা নেই।

—আর সেই মাহুত রতন রাভার?

—না, তারও কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ততক্ষণে জিপ ঢুকে পড়েছে মূর্তি বাংলোর কম্পাউন্ডে।

বিকেল গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে জঙ্গলের মধ্যে। পাখিরা এ সময় ডানা নাড়িয়ে ফিরে আসছে দূর-দূরান্তর থেকে। সেই ডানা মুড়ে সেঁধিয়ে যাচ্ছে মহীরুহের ডালে-ডালে।

পাপানের মনে অদ্ভুত সব ভাবনার তোলপাড়। আচ্ছা, হাজার হাজার পাখি, নানারকমের পাখি, জঙ্গলে হাজার হাজার মহীরুহ, কোন পাখি কোন গাছের ডালে রাতের আশ্রয় নেবে তা কি সব নির্দিষ্ট? তাদের কি সব মনে থাকে কোন গাছের কোন ডাল থেকে উড়ে গিয়েছিল, দূর থেকে ডানা ভাসিয়ে যখন এসে সাঁ করে ঢুকে যায় ডালের ভিতর, কখনো কি ঠিকানা ভুল হয় না? সেখানে কি তার বউ, ছেলে-মেয়েরাও থাকে? তারা কি অপেক্ষা করে কখন তাদের বাড়ির কর্তা কাজ মিটিয়ে ফিরে আসবে নীড়ের আশ্রয়ে?

বাংলোয় ঢুকে রেঞ্জরমামা হাঁক পাড়লেন রাবণদাস, চা—

রাবণদাস নামেই রাবণ, তার ছোট্টখাট্টো চেহারা বড়োই বেমানান নামের সঙ্গে, তবে তাঁর দশটা মাথা না-হলেও দশটা হাত নিশ্চয়। সবগুলো বাংলো ভর্তি থাকলে তাঁকে দশ হাতে রান্না করতে হয়।

রাবণদাস উঁকি মেরেই বললেন, স্যার, পাঁচ মিনিট।

উঁকি দেওয়ার অর্থ ঘরে কতজন আছে, ক-কাপ চা করতে হবে?

ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিন কাপ চা-ই শুধু নয়, এক প্লেট ভর্তি চিকেন পকোড়া।

এই জঙ্গলে এর চেয়ে ভালো উদ্দীপক আর কী হতে পারে?

তবে রেঞ্জারমামাকে বেশ অস্থির দেখাচ্ছিল।

দত্তরায় আঙ্কেলও চুপচাপ। হঠাৎ বললেন, হাতিটা কোন গ্রামে ঢুকে কী অত্যাচার করছে বুঝে ওঠা যাচ্ছে না।

রেঞ্জারমামা বললেন, সবাইকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি। ফরেস্ট রেঞ্জার নিজে ঘুরছেন এলাকায়। বিট অফিসাররা ড্রাম পিটিয়ে ঘোষণা করছেন—হাতি সম্পর্কে সবাই যেন সচেতন থাকে। কারও চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের জানিয়ে দেয়।

—হ্যাঁ। অলরেডি অনেক ক্ষতি করে ফেলেছে, আরও কী ক্ষতি করছে কে জানে।

চা-পানের পর রেঞ্জারমামা বললেন, ঘরে বসে থাকলে আরও টেনশন বাড়বে। রক্তিম, চলো, বাইরে থেকে ঘুরে আসি। চল, পাপান, তোকে জঙ্গল চেনাই। বারবার তো আর পড়া ছেড়ে কলকাতা থেকে আসতে পারবি না।

পাপান অমনি লাফ দিয়ে প্রস্তুত। বলল, জঙ্গল চিনতেই তো এসেছি। মাঝখান থেকে কিছু পোচার নষ্ট করে দিল এখানকার দৈনন্দিন জীবন।

দত্তরায় আঙ্কেলও বললেন, চলো, জঙ্গলটা ঘুরেঘেরে দেখি আমরা।

তিনজনে বেরিয়ে পড়ল বাংলো থেকে। ঘোর বিকেলবেলা। সন্ধে পৌঁছে যাবে একটু পরেই। তরাই এলাকায় এর মধ্যে কিঞ্চিৎ শীতের ছোঁয়া। চারপাশে বড়ো বড়ো গাছ, অসীম নির্জনতা, তার মধ্যে অলস পায়ে হাঁটতে খুব আরাম। নানা ধরনের পাখি এদিক-ওদিক ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ। কাল একটা অদ্ভুত ধরনের বুলবুলি পাখি দেখে পাপান মোহিত ছিল, আজ আবার দেখা যায় কি না তার খোঁজে চোখ চালাচ্ছিল গাছের ডালগুলোয়।

রেঞ্জারমামা বললেন, এখানে খুব শ্যামা পাখি দেখা যায়। এবার কেন যে চোখে পড়ছে না! ধনেশ পাখিও খুব দুর্লভ, এখানে মাঝেমধ্যে চোখে পড়েছে, এবার দেখছি না।

চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ, কোনো কোনো পাতা হলুদ রঙের। কোনো পাতার রং সোনালি। সেই রঙিন পটভূমিতে গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে নানা আকারের রোদ্দুরের অলস মেজাজে পড়ে থাকা। তার মধ্যে পাখিদের হুটোপুটি।

সোনালি-সবুজে ঘেরা এক আশ্চর্য পৃথিবীর মধ্যে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটল ওরা। একসময় পৌঁছোল মূর্তি নদীর ধারে। এদিকটায় নদীর চেহারা আবার অন্যরকম।

রকমারি পাখির ডাক উপচে কানে আসছে জলস্রোতের একটানা শব্দ। সারা দিন সারা রাত বয়েই চলেছে মূর্তি নদীর জল। তার কোনো বিরাম নেই, অথচ প্রতি মুহূর্তে বৈচিত্র আছে।

সন্ধে নেমে আসে ক্রমে। আকাশের গোল চাঁদে ক্রমে সঞ্চার হয় রুপোলি আলোর। জ্যোৎস্নার ঝুরি নেমে আসতে থাকে জঙ্গলের মধ্যে। কীরকম কুয়াশার মতো চারদিক। রুপোরঙের ঝুরি মিশে যেতে থাকে জলস্রোতের সঙ্গে। জলের রুপোলি ফেনার সঙ্গে জ্যোৎস্নার লুকোচুরি চলতে থাকে সারাক্ষণ।

তিনজনে কিছুক্ষণ বসল নদীর কিনারে। আজ দুই বনাধিকারিকের মন ভালো নেই। সেরকমই কথার সুর রেঞ্জারমামার, বললেন, শুধু মনে হচ্ছে কী জানি কোথায় কী ঘটে যাচ্ছে আমরা জানতেও পারছি না।

দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, এই রেঞ্জের জঙ্গল এলাকা তো কম নয়। তার উপর খুবই ঘন জঙ্গল। কোথায় তিনি লুকিয়ে থাকবেন, হঠাৎ কোথায় উদিত হয়ে লণ্ডভণ্ড করবেন তার হদিশ পাওয়া খুব দুরূহ কাজ।

—তবু ওপরওয়ালারা কোনো ওজর শুনতে রাজি নন।

—ঠিক আছে, কাল সকালে আমরা একবার টহল দেব গোটা এলাকা।

রাত্রি দশটা নাগাদ রেঞ্জারমামা বললেন, তাই হোক। আমরা আজ সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে নিই। তারপর কাল সকালে একবার গোটা এলাকা ঘুরব।

রাতে পাপান ভালোই ঘুমোল, কিন্তু সকালে উঠে রেঞ্জারমামা বললেন, ভালো ঘুম হয়নি, কেমন ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন দেখেছি।

—ছেঁড়া-ছেঁড়া! পাপান মামার কথাটা বুঝতে চাইল।

—হ্যাঁ, একসঙ্গে দশ-বিশটা দৃশ্যপটের ভিতর ঘুরছি যেন। এই মনে হচ্ছে ঘন জঙ্গলের ভিতর পথ হরিয়ে ফেলেছি, পরক্ষণে দেখছি পিচরাস্তা ধরে ছুটছি হু হু করে, কোথায় যাচ্ছি তার গন্তব্য জানি না।

দত্তরায় আঙ্কেল শুনে বললেন, মনের ভিতর খুব টেনশন থাকলে এরকম অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখে মানুষ। নিরাপত্তাহীনতার এক অন্য চিহ্ন ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন। তুমি বড়ো বেশি দুশ্চিন্তা করছ।

রেঞ্জারমামা বললেন, ঠিক তাই।

বলেই হাঁক দিলেন, রাবণদাস, রাবণদাস—

রাবণদালের ছোট্ট চেহারা উঁকি দেয়, স্যার—

—আমরা এখন চায়ের সঙ্গে শুধু বিস্কুট। তারপর দশটার মধ্যে ভাত খেয়ে বেরোব।

রাবণদাস মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির।

অতঃপর তিনজনের প্রস্তুতি। হালকা ঠান্ডা পড়েছে এখানে। ঠান্ডা-গরম মিশিয়ে ঈষদুষ্ণ জলে ভালো করে স্নান করে তৈরি হয়ে নিল সবাই। তার মধ্যেই রেঞ্জারমামা একবার হোয়াটসঅ্যাপ দেখছেন, কখনো ফোন করে খবর নিচ্ছেন কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না হাতিটাকে?

একবার ফোন রেখে বললেন, হাতিটা মনে হচ্ছে চালসার দিকে চলে গেছে।

—চালসা তো কাছেই, দত্তরায় আঙ্কেল বললেন।

—হ্যাঁ, গরুমারা ফরেস্টের হাতি। খুব বেশি দূর যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ফরেস্ট অফিসার, বিট অফিসার, বেশ কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড নিয়ে পৌঁছে গেছেন।

খাওয়া সেরে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল হাইওয়ের দিকে। হঠাৎ পথের উপর একজোড়া ময়ূর দেখে জিপ থামিয়ে দিলেন ড্রাইভার রমেশ। ময়ূর দুটো রাস্তা থেকে তো নড়লই না, বরং রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যেন এখনই কোনো বাস এলে তাতে উঠে পড়বে।

রেঞ্জারমামা তাদের উদ্দেশে হাত নেড়ে বললেন, তোমাদের নাচ পরে একদিন দেখব—আমরা আজ খুব ব্যস্ত।

ড্রাইভার রমেশ তক্ষুনি গাড়ি চালিয়ে দিলেন চালসার উদ্দেশে।

মূর্তি থেকে চালসা মাত্র কয়েক মিনিটের রাস্তা। চালসায় পৌঁছে বেশ অবক হল পাপান। খুব জমজমাটি এলাকা। শহর বলা না-গেলেও এদিককার একটি জনবহুল গঞ্জ। রাস্তার দু-ধারে বহু দোকানপাট। তবে ঝুপড়ি দোকানই বেশি। কিছু একতলা কিছু দোতলা। তবে সব দোকানেই লোকজন কেনাকাটায় ব্যস্ত।

হঠাৎ একজন ফরেস্ট গার্ড হাতে একটি চোঙা-মাইক নিয়ে বলতে বলতে এলেন, সবাই মন দিয়ে শুনুন। গরুমরা থেকে একটি পাগলা হাতি গত পরশু বেরিয়ে পড়েছে। গতকাল বাদামগুড়িতে খুব দৌরাত্ম্য করেছে। একজন পথচারীকে নৃশংসভাবে আছাড় দিয়ে মৃত্যু ঘটিয়েছে। একজন মাহুত তাকে পোষ মানাতে উঠে বসেছিলেন তার পিঠে। সেই মাহুতসুদ্ধ হাতিটা কোথায় চলে গেছে আর খবর পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার আক্রমণে।

এই পর্যন্ত শুনেই যাঁরা দোকানে ভিড় করে কেনাকাটা করছিলেন, সবাই বেরিয়ে এলেন দোকানের বাইরে।

ফরেস্ট গার্ড তখন বলছেন, খবর পাওয়া গেছে হাতিটা চালসার দিকে আসছে। আপনারা এই মুহূর্তে যে যার ঘরে ফিরে যান।

শুনেই গঞ্জের সমস্ত লোকজন যে যে-অবস্থায় আছে, হাতের ব্যাগ সামলে, কেউ হেঁটে, কেউ সাইকেলে, কেউ বাইকে উঠে রওনা দিল বাড়ির দিকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গঞ্জ শুনশান। একের পর এক দোকানে ঝাঁপ ফেলার শব্দ।

তার মধ্যেই ফরেস্ট রেঞ্জার এসে পৌঁছোলেন গাড়িতে। তাঁর সঙ্গে বিট অফিসার ও দুজন ফরেস্ট গার্ড। নেমে বললেন, স্যার, হাতিটাকে মেটেলির দিকে দেখা গেছে শুনে ওদিকেই চলে গিয়েছিলাম। ওখানে একটা অ্যাজবেস্টসের চালের দোকানঘর একদম ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। ভিতরে স্টেশনারি মাল ছিল, সব ভেঙে রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

—তারপর?

—হাতিটা নাকি ছুটতে ছুটতে চালসার দিকে আসছে এই খবর পেয়ে আপনাকে মেসেজ করেছিলাম। কিন্তু আমি তো মেটেলি থেকে এদিকে ফিরলাম, কোথাও দেখতে পাইনি।

রেঞ্জারমামা বললেন, এখানে কোথাও একটা শেলটার পাওয়া যাবে?

—এখানে একটা লজ আছে, সেখানে একটা ঘর বলে রেখেছি। চলুন যাই। এরকম রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। হাতিটা যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে।

বিন্দু হাতিটার শুঁড়ে হাত বোলাচ্ছে...

নিতে বাকি রয়ে গেল বিট অফিসারের কাপ। বিট অফিসার হরিশ তামাং তখনো বারান্দায় ছটফট করছেন। তাঁকে ডাকতে তিনি সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, স্যার, আমি চা খেতে শুরু করব, তখন যদি হাতিটা এসে যায়!

চা-দিতে-আসা মহিলা বেরিয়ে যেতে দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে একটি আট-ন বছরের বালিকা। তার কৌতূহলী চোখ জরিপ করছে বাইরে থেকে আসা মানুষ গুলিকে।

পাপান হাত নেড়ে তাকে ডাকতেই সে অকুতোভয়ে ঢুকে এল ঘরে। কাছে আসতে পাপান জিজ্ঞাসা করল, কী নাম তোমার?

—বিন্দু, বিন্দু রায়।

—কোন ক্লাসে পড়ো?

—ক্লাস থ্রি।

পাপান অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বিন্দু জিজ্ঞাসা করল, তোমরা হাতি ধরতে এসেছ?

পাপান বলল, হ্যাঁ। তুমি শুনেছ নিশ্চয় একটা পাগলা হাতি এসেছে জঙ্গল থেকে।
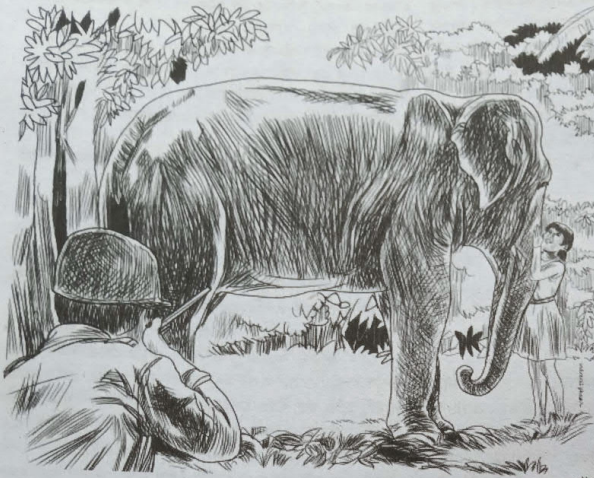
দুটো গাড়িই চলে এল শিবানী লজের সামনে। ছোট্ট লজ, খুব পরিচ্ছন্ন তা নয়, তবু ঘরের ভিতরে কয়েকটা চেয়ার ঢুকিয়ে দিলেন হোটেলের মালিক রবীন রায়। বললেন, চা এনে দি, স্যার?

রেঞ্জারমামা বললেন, এখনই চা না হলেও চলবে। আগে দেখি, হাতিটাকে পাওয়া যায় কি না।

ফরেস্ট রেঞ্জার দীপেশ নিয়োগী বললেন, দুজন ফরেস্ট গার্ড গঞ্জের দু-দিকে রেখেছি। হাতিটা যদি মেইন রোড দিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলে অ্যালার্ট করে দেবে।

বিট অফিসার হোটেলের বারান্দায় ছটফট করে পায়চারি করছেন, আর এক-একবার রাস্তায় নেমে দেখে আসছেন কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না হাতিটাকে।

তাঁদের কথোপকথনের মধ্যে কালোপেড়ে সাদা শাড়ি পরা মহিলা পাঁচ কাপ চা নিয়ে এলেন, তাঁর পিছনে হোটেল মালিক রবীন রায়। বললেন, আপনারা আমার অতিথি, শুধু মুখে থাকবেন তা কি হয়?

দত্তরায় আঙ্কেল একটা কাপ তুলে নিয়ে বললেন, চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা মুশকিল।

রেঞ্জারমামাও বললেন, বরং টেনশনের মুহূর্তে এক কাপ চা উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করে, বলে তিনিও তুলে নিলেন কাপ।

অতএব ঘরের বাকি দুজন—পাপান আর ফরেস্ট রেঞ্জার দু-কাপ

বিন্দু অমনি বলল, কখন হাতিটা আসবে? আমি হাতি দেখব।

পাপন তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে, বলে, উঁহু, এই হাতিটা খুব ভয়ংকর। না-দেখাই ভালো।

—কেন, এই হাতিটা ভয়ংকর কেন? হাতিরা তো খুব ভালো হয়। এখানে একদিন একটা হাতি এসেছিল, আমি তার শুঁড়ে হাত বুলিয়েছিলাম। কিছু বলেনি। শুঁড় দিয়ে আমাকে আদর করেছিল।

পাপান চমৎকৃত হচ্ছিল, বলল, এই হাতিটার বাচ্চাকে কিছু দুষ্টু লোক গুলি করে মেরেছে। তাই খেপে গিয়েছে। যাকে সামনে পাচ্ছে, তাকে মেরে ফেলছে।

বিন্দু বেশ জোরের সঙ্গে বলল, আমি এই হাতিটাই দেখব। আমাকে কিছু বলবে না।

পাপান জোর জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, উঁহু, হাতি দেখতে হলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখো। না হলে কাছেই মাদারিহাটে অনেক হাতি আছে। মাদারিহাটে হাতি সাফারি হয়। ওখানে গিয়ে দেখো।

—না, আমি এখানেই দেখব। হাতিকে আমার ভয় করে না। বলে একছুটে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

ঠিক এই সময় একটি প্যান্ট-শার্ট-পরা তরুণ চোখে সানগ্লাস পরে, একটি ঝকঝকে সাইকেলে চড়ে রাস্তা দিয়ে চলে গেল তারস্বরে গান গাইতে গাইতে।

বিট অফিসার চমকে উঠে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে বললেন, যাবেন না, যাবেন না, হাতি বেরিয়েছে। হাতি বেরিয়েছে—

কিন্তু কে শোনে কার কথা।

তরুণটি ধাঁ করে বেরিয়ে যেতেই অন্য দিক থেকে ছুটে এলেন একজন ফরেস্ট গার্ড, বললেন, আমিও বারণ করলাম ওদিকে না-যেতে। শুনলই না—

হঠাৎ ফরেস্ট রেঞ্জারের মোবাইলে রিং হতেই দ্রুত অন করে বললেন, হ্যালো—

ওপাশে কারও কথা শুনলেন, শুনতে শুনতে বেশ উত্তেজিত, বললেন, কতক্ষণ আগে দেখেছেন?

আরও কিছু শুনে বললেন, ঠিক আছে, আমরা অ্যালার্ট আছি।

মোবাইল অফ করে বললেন, স্যার, মেটেলি থেকে একজন ফরেস্ট গার্ড ফোন করে বলল, হাতিটা মেটেলির দুটো দোকান তছনছ করে এখন চালসার দিতে ছুটে আসছে।

—তাই নাকি! দুই বনাধিকারিক উঠে দাঁড়ালেন হাতের বন্দুক প্রস্তুত করে।

রেঞ্জাররমামা হোটেল-মালিককে বললেন, দোতলার বারান্দায় আমরা উঠতে পারি? উপর থেকে ফায়ার করা সুবিধেজনক।

রবীন রায় তৎক্ষণাৎ বললেন, আসুন, স্যার, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লজের ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দত্তরায় আঙ্কেলকে সঙ্গে নিয়ে রেঞ্জারমামা উপরে ওঠার সময় ফরেস্ট রেঞ্জারকে বললেন, দীপেশ, তুমি বিট অফিসারকে নিয়ে নীচে থাকো। আমরা উপরে দাঁড়িয়ে পজিশন নিচ্ছি। কোনো কিছু ঘটলে চেঁচিয়ে বলে দিও—

পাপানকে বলে গেলেন, পাপান, তুই নীচেই থাক। কোনোক্রমেই যেন বাইরে বেরোস না।

দুই আধিকারিক উপরে উঠে যাওয়ার একটু পরেই একজন ফরেস্ট গার্ড বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, হাতিটাকে দেখা যায় কি না?

পাপানের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাইরে গিয়ে দেখে আসে দৃশ্যটা, কিন্তু রেঞ্জারমামার নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। আবার ঘরের মধ্যে একরাশ টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করাটাও অসম্ভব।

ফরেস্ট রেঞ্জার আর বিট অফিসার দাঁড়িয়ে দরজার সামনে, সেখানে পাপান তো আর দাঁড়াতে পারে না। তাঁদের দুজনেরই লম্বাচওড়া চেহারা, তাঁদের পিছনে ডিঙি মেরে যেটুকু দেখা যায়।

এখন প্রতিটি মিনিটই এক-এক ঘণ্টার মতো দীর্ঘ সময়ের। রাস্তার ওপাশে কয়েকটা দোকানের ভিতর ঘাপটি মেরে আছে কিছু কৌতূহলী মানুষ। তারাও দরজা ফাঁক করে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে রাস্তার ওদিকে।

সেই মুহূর্তে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা ফরেস্ট গার্ডটি ছুটে চলে এলেন লজের ভিতর, উত্তেজিত হয়ে বললেন, আসছে, আসছে।

উপর থেকে রেঞ্জারমামার গলা শোনা গেল, আমরা রেডি। কেউ যেন রাস্তার দিকে না যায়।

ফরেস্ট গার্ডটি ভয়ার্ত গলায় বললেন, কী সর্বনাশ! হাতিটার শুঁড়ে সাইকেলটা!

—মানে? ফরেস্ট রেঞ্জার চমকে উঠলেন।

একটু আগে যে-ছেলেটা কালো চশমা পরে সাইকেলে চড়ে গান গাইতে গাইতে গেল, সেই সাইকেলটা এখন হাতিটার শুঁড়ে।

—সে কী! ফরেস্ট রেঞ্জার আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে দরজা খুলে রাস্তায় বেরোতে চাইলেন, কিন্তু তাঁকে বাধা দিয়ে ফরেস্ট গার্ড বললেন, না, স্যার, একদম যাবেন না। হাতিটা সাইকেলটা ভেঙে চুরচুর করছে।

—আর সেই ছেলেটার কী হল?

—তার কী হল এখনই বলা যাবে না, স্যার।

উপর থেকে রেঞ্জারমামার গলা শোনা গেল, দীপেশ, হাতিটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু রেঞ্জের বাইরে। আর একটু অপেক্ষা করি। নিশ্চয় এদিকে আসবে।

পরের কয়েকটি মুহূর্ত খুব উত্তেজনার। পাপানও বুঝে উঠতে পারল না হাতিটা ঠিক কত দূরে, শুধু কি সাইকেলটাই নিয়ে এসে ভাঙচুর করছে, তা হলে সেই ছেলেটার কী হল?

তার খুব ইচ্ছে হচ্ছে বাইরে গিয়ে এক ঝলক দেখে আসে হাতিটার অবস্থান। হাতিটাকে এদিকে আসতে দেখলেই একছুট্টে চলে আসবে লজের ঘরে।

কিন্তু সে জানে রেঞ্জারমামা খুবই অসন্তুষ্ট হবেন তার উপর।

আরও কিছু উত্তেজিত মুহূর্ত অতিক্রান্ত হল, রাস্তার ওদিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই উপলব্ধি করা যাচ্ছে না নীচের ঘর থেকে। উপর থেকে শোনা যাচ্ছে রেঞ্জারমামার গলা, কী করা যায় বলো দেখি, দীপেশ? এত কাছে এসেছে, আর পঞ্চাশ গজ কাছে এলেই আমরা শুট করতে পারি।

হঠাৎ চারদিক থেকে রব উঠল, গেল গেল। ওকে কে রাস্তায় বেরোতে দিল?

চমকে উঠে সবাই দেখল, বিন্দু নামের বালিকাটি কৌতূহল মেটাতে সবার অলক্ষে চলে গেছে রাস্তার মাঝখানে। কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই, এক-পা এক-পা করে এগোচ্ছে হাতিটার দিকে।

উপর থেকে রেঞ্জারমামা শিউরে উঠে বললেন, এ কী কাণ্ড! মেয়েটাকে আটকাও শিগগির! হাতিটা যে ওর দিকেই আসছে!

শুনে পাশের ঘরে গোঁ গোঁ শব্দ উঠল, বিট অফিসার উঁকি দিয়ে বললেন, ওর মা অজ্ঞান হয়ে গেছে। শিগগির কেউ চোখে জলের ঝাপটা দাও।

তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কয়েকজন।

হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে এক ভয়ংকর পরিস্থিতি।

ফরেস্ট গার্ড বার-দুই ডাকলেন—বিন্দু, পালিয়ে এসো। বিন্দু, পালিয়ে এসো।

বিন্দু তাকাচ্ছেই না।

ফরেস্ট গার্ড তাকালেন ফরেস্ট রেঞ্জারের দিকে, বললেন, আমি গিয়ে তুলে নিয়ে আসব?

ফরেস্ট রেঞ্জার ইতস্তত করে কী বলবেন বুঝে পেলেন না।

পাপানও বুঝল সেক্ষেত্রে হাতিটা হয় বিন্দুকে নেবে, না হলে ফরেস্ট গার্ডকে। ফরেস্ট রেঞ্জারের পক্ষে কঠিন সিদ্ধান্ত। উনি বললেন, চলো, আমিও যাই। মেয়েটাকে বাঁচাতেই হবে।

ফরেস্ট রেঞ্জারের হাতে ঝকঝকে রাইফেল, এই আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে হাতি মারা যায়, ঘুম পাড়ানো যায় না। তিনি উঠে বেরোচ্ছেন, হঠাৎ ফরেস্ট গার্ড চেঁচিয়ে উঠলেন, স্যার, হাতিটা বিন্দুকে ধরেছে। কী হবে স্যার, ওর মায়ের যে আর কেউ নেই।

—ধরেছে! শুধু পাপানের নয়, লজে উপস্থিত সবাইকার হৃৎপিণ্ড থেমে গেল কয়েক মুহূর্ত।

কিন্তু লজের ঘরে বসে কিছুই চোখে পড়ছে না। উত্তেজনায় সবাই লজের নিরাপদ ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এল,বিন্দুর কী পরিণতি হল দেখতে। বিন্দু তখন হাঁটতে হাঁটতে হাতিটার একেবারে কাছে পৌঁছে গেছে। হাতিটা বিন্দুর কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়, তার শুঁড় দোলাতে থাকে।

সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে আছেন, এখন আর বিন্দুকে ডাকতেও সাহস পাচ্ছেন না কেউ।

পাপানের বুকের ভিতরটা ধক ধক করছে। তার মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে বিন্দুকে টানতে টানতে নিয়ে আসে, তারপর যা হয় হবে।

বিন্দু তখন হাতিটার শুঁড়ে হাত বোলাচ্ছে, তার গালে হাত বোলাচ্ছে।

হাতিটাও বিন্দুর গালে শুঁড় বোলাচ্ছে।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সবাই হাঁ করে দেখছে বিন্দুর সঙ্গে হাতিটার ভাব-ভালোবাসা।

সেই মুহূর্তে একটা শব্দ হল—ফট। তার পরের মুহূর্তে দ্বিতীয় শব্দ—ফট।

হাতিটা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল তার পিঠে কিছু একটা ফুটেছে, কিন্তু তখনো উপলব্ধি করতে পারেনি কী ঠিক ঘটেছে।

পরক্ষণে আরও দুবার ফট ফট।

বিন্দুও বেশ থতমত, সে আবারও হাত বোলাতে থাকে হাতিটার শুঁড়ে।

একটু পরেই হাতিটা হঠাৎ হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে রাস্তার উপর। কীরকম চোখ-মুখ করে তাকায় উপর দিকে যেখান থেকে ছুটে এসেছে দুটো-দুটো চারটে ঘুমপাড়ানি গুলি।

হাতিটার তখন আর নড়ার শক্তি নেই, আরও দু-তিনবার শুঁড়টা তোলার চেষ্টা করেও পারল না। সে তখন প্রবল ঘুমের গভীরে।

খুব দ্রুত রেঞ্জারমামা আর দত্তরায় আঙ্কেল লজ থেকে নেমে এসে ছুটে গেলেন হাতিটার কাছে। হাতিটার গায়ে হাত দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন কতটা ঘুম তার শরীরে। আশেপাশে তখন জড়ো হয়েছেন ফরেস্ট রেঞ্জার, বিট অফিসার, অনেক ফরেস্ট গার্ড—সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, এক্ষুনি দড়িদড়া যা আছে নিয়ে এসো। এর ঘুম ভাঙার আগেই বেঁধে ফেলো। তারপর ট্রাকে তোলার আগে আরও কয়েকটা গুলি দিতে হবে যাতে পথে না ঘুম ভাঙে।

ততক্ষণে শুধু লজের মানুষজন নয়, আশেপাশে যত দোকানি বা ক্রেতারা এতক্ষণ লুকিয়ে ছিল, যখন বুঝেছে হাতিটা ঘুমিয়ে পড়েছে, সবাই ভিড় করে চলে এসেছে হাতিটাকে দেখতে।

রেঞ্জারমামা তখন পড়েছেন বিন্দুকে নিয়ে, বললেন, তুই যা করলি, তা ইতিহাসে লেখার মতো।

কথাটা বিন্দু বুঝল কি না কে জানে। সে তখনো তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত হাতিটার দিকে।

ইতিমধ্যে বিন্দুর মা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছেন বাইরে, বিন্দুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কী কান্না!

দীপেশ আঙ্কেল বললেন, তোর একটুও ভয় করল না হাতিটার কাছে যেতে?

বিন্দু জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, না তো। দুষ্টু লোকেরা ওর বাচ্চাকে মেরে ফেলেছে, আমি ভাবলাম আমি যদি কিছুক্ষণ ওর মেয়ে হয়ে যাই, তা হলে নিশ্চয় ওর কষ্ট কমবে।

—অসাধারণ ভাবনা, রেঞ্জারমামা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, তোর ভাবার কারণে আরও কিছু মানুষের প্রাণ বেঁচে গেল। অনেক মানুষের সম্পত্তিও।

বিন্দু তখন পাপানের দিকে আঙুল রেখে বলল, এই দাদাটাই তো আমাকে বলল, বাচ্চাটা মরে যাওয়ায় হাতিটার খুব দুঃখ। তাই আমি ওরকম ভাবলাম।

রেঞ্জরমামা বললেন, আমি তো দোতলার বারান্দা থেকে দেখছি তুই হাত নেড়ে হাতিটাকে ডাকছিস। আমি চেঁচাচ্ছিলাম তোকে ফিরে আসতে। কিন্তু তুই শুনিসনি। অবশ্য শুনিসনি বলেই হাতিটা তোর কাছে এল, আর আমরা হাতিটাকে পেয়ে গেলাম রেঞ্জের মধ্যে। তাই তো হাতিটা ধরা পড়ল। তবে থ্যাঙ্কস টু রক্তিম দত্তরায়, ওই প্রথম গুলি করে, আর একবারেই লক্ষ্যভেদ করে। তার পরের গুলিটা আমি।

দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ প্রাপ্য বিন্দুর। ওর সাহসিকতা, উপস্থিত বুদ্ধি, ভালোবাসার জন্যই সম্ভব হল এত সহজে।

ফরেস্ট রেঞ্জারও তখন বলছেন, বিন্দু ছিল বলেই আজ আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল।

রেঞ্জারমামা বললেন, তুমি সমস্ত ঘটনা লিখে একটা প্রস্তাব পাঠাও। বিন্দুকে একটা বড়ো পুরস্কার দিতে হবে।

ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারাও তখন হাত লাগিয়েছেন হাতিটাকে বেঁধে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে।

ফরেস্ট রেঞ্জার বললেন, হ্যাঁ, আমি আজ সন্ধের পর লিখে পাঠাচ্ছি। আর এখানকার বাকি কাজ আমরা করছি, আপনারা এখন মূর্তি বাংলোয় ফিরে যান। আমি কাজ সেরে আপনার সঙ্গে দেখা করছি।

জিপে ফেরার পথে দত্তরায় আঙ্কেল বললেন, এত বড়ো অপারেশনে পাপানের অবদানও কম নয়, বিন্দুর সঙ্গে আলাপ করতে করতে ওই তো বিন্দুর মনে বুদ্ধিটা জাগিয়ে তুলেছিল। ❖

স্বর্গছেঁড়া

কর্ণ শীল

ছবি : প্রণব হাজরা

।। এক ।।

'এই 'নাইটগাইড' আর তার পাশে 'ওনলি অ্যাসিস্ট্যান্স' কথার মানেটা বুঝলাম না', আমি অবাক হয়ে রুম সার্ভিসকে জিজ্ঞাসা করলাম।

ছোকরা ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলে। জাতে লেপচা হলেও শিলিগুড়িতে বছর দশেক কাজ করার সুবাদে কাজ চালানোর মতো বাংলাটা বলতে পারে। ঘন নীল কাপে গরম চা ঢালতে ঢালতে সে বলল, 'তা তো জানিনা সাব, ওইভাবেই ছাপা দেখে আসছি প্রথম থেকে।'

'রাতের দিকে ঘুরতে টুরতে নিয়ে যায়, না কি?'

'তেমনই তো জানি। তবে আমি কোনদিন নাইট শিফট করিনি, তাই বলতে পারব না।'

লা-চেন'র 'প্রি-মূলা' নামক হোটেলের ঘরে বসে ছিলাম। যেমন শীত, তেমন রোদ। ওক গাছের লালচে পাতায় রোদ, বহমান লাচেন নদীর জলে রোদ। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় ও নদীর খাতে যেন পাহাড়ী রোদই বয়ে যাচ্ছে। রুম সার্ভিসের ছেলেটা চায়ের সঙ্গে ট্রিপ স্কেজুলটা নিয়ে এসেছিল। চোপতা ভ্যালি—পনেরোশো টাকা, অ্যাপল অরচার্ড—আটশো, গুরুদ্রোংমার—আঠারোশো। নীল কালিতে ছাপা স্কেজুলের একেবারে নীচে সোনালি কালিতে ছাপা ছিল 'নাইটগাইড, ওনলি অ্যাসিস্ট্যান্স'। আলাদা করে টাকার পরিমাণ লেখা নেই তাতে। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম ছেলেটাকে, 'তুমি বলছ নাইট শিফট করে না, এ বিষয়ে কিছু জানো না, তাহলে কেউ রাতের ট্রিপে যেতে চাইলে যোগাযোগ করবে কার সঙ্গে?'

আমার হাতে চায়ের কাপটা তুলে দিয়ে ছেলেটা বলল, 'রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দেবে। তা ছাড়া পদ্ধতিটা আমিও জানি, সব স্টাফই জানে।'

'কীরকম! শুনি একটু?',

'লাশার ভ্যালি শুনেছ তো, যেখানে এই সময়ে ইয়াক রেস হয়?'

'হ্যাঁ জানি তো।'

'ওখানে পৌঁছোতে হবে। রেস শেষ হলে বসে থাকবে, তোমার সঙ্গে গাইড নিজে দেখা করে নেবে।'

'লাশার পৌঁছোতে তো থাংগু থেকে ট্রেক করতে হবে, তাহলে থাংগু পৌঁছোনোর ভাড়া আবার আলাদা?' চায়ে চুমুক দিয়ে আমি বললাম।

ছেলেটা মৃদু হাসল।

'তুমি নাইটট্রিপ কনফার্ম করলে হোটেলের এযাবৎ বিল পেমেন্ট করে দিতে হবে। তারপর থেকে তোমার বাকি সব খরচ হোটেল প্রিমূলা বহন করবে', নিরুত্তাপ নরম গলা ছোকরার।

আমার বিস্ময় আর আগ্রহ একসঙ্গে বাড়ছিল। কী আছে সেই রাত্রিভ্রমণে যে আবাসের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে যেতে হবে? তার উপর আমার যাত্রায় সব খরচ এরাই বহন করবে! বললাম, 'নিয়ে গিয়ে মেরে টেরে ফেলবে নাকি হে?'

ছেলেটা হাসল।

'এখানে তুমি একা। মেরে ফেলতে হলে ওই অত দূরে নিয়ে যাওয়ার কি দরকার বলো?

ছোকরার কথায় যুক্তি আছে বটে!

গেলাম দুম করে রাজি হয়ে। ছেলেটা কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর খুব নরম সুরে বলল, 'রিসেপশনে এসো। তোমার থাংগু পৌঁছোনোর গাড়ি তৈরি আছে। আজ থাংগুতে থাকবে, কাল সকালে লাশার ভ্যালি যাবে।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'পথ চিনি না যে!'

'অসুবিধা হবে না। দুপকা শেশি, মানে তোমার ওই ইয়াক রেসের দল তোমাকে নিয়ে যাবে লাশার ভ্যালিতে, তোমার ড্রাইভার তাদের বলে রাখবে। ওখানে রেস শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, গাইড দেখা করে নেবে তোমার সঙ্গে'।

'আর আমার লাগেজপত্র?'

'ট্রেকিংয়ের জিনিসপত্র নিয়ে যেও, আর কিছু লাগবে না'।

ছেলেটা কাপ প্লেট নিয়ে চলে গেল। আমার জানালার বাইরে রৌদ্র ক্রমে মধুবর্ণ হয়ে আসছে, নদীর বুকে কালচে ছোপ। পাহাড়ের ছোটো দিন শেষ হয়ে আসছে।

হোটেলের বাইরে এসে দেখলাম একটা পুরনো জোংগা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই ড্রাইভার হাসল, প্রাণখোলা হাসি। প্রিমূলার সব স্টাফ বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। রিসেপশনিস্ট বুড়ি আমার হাতে একটা নীল পপি ফুলের গোছা ধরিয়ে দিল। গাড়ি ছাড়ার পর রিয়ার মিররে দেখলাম হোটেলের সবাই আমার গাড়ির উদ্দেশ্যেই হাত নাড়ছে।

বুঝলাম তারা বিদায় জানাচ্ছে আমাকে।

ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে নীল পপির গুচ্ছটা চাইল। দিয়ে দিলাম।

*　　*　　*　　*

একটা লোহার ব্রিজ পড়ে থাংগু থেকে গুরুদ্রোংমার যাওয়ার পথে। সেখান থেকে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে যেতে হয় লাশারের উদ্দেশ্যে। চার হাজার মিটারের কাছাকাছি পৌঁছেও এ অঞ্চল আশ্চর্যরকমের সবুজ। আমার সঙ্গে যাচ্ছে চমরিদৌড়ের চমরি, চালক বাহক। তাদের সঙ্গে চলেছে বিভিন্ন রকমের শিঙা, ঢোল। এরা যতদূর জানি এগুলোকে সুশীরা আর অবন্ধ্য বলে। পথের এক পাশে হিমালয়ের নীল পপি ফুটে আছে। কাল বিকেলে লাচেন থেকে রওনা হওয়ার সময় এই ফুলের গোছা দিয়ে আমাকে সম্ভাষণ জানানো হয়েছিল। আমাকে বোধহয় আগামী পথের এক টুকরো হাতে তুলে দিতে চেয়েছিল মায়ের মতো দেখতে সে বুড়ি।

চার ঘন্টা পরে যখন লাশারে পৌঁছোলাম, আমার পা ভেঙে পড়তে চাইছে ক্লান্তিতে, কিন্তু চোখে অনাবিল আনন্দ। যতদূর চোখ যায় শুধু সবুজ সমতল, চারিদিকে উঁচু উঁচু পর্বতের চূড়া ধ্যানি শ্রমণের মতো ঝুঁকে পড়েছে। শিঙা, ঢোল বেজে উঠছে থেকে থেকে। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে।

ভিড় থেকে দূরে একটা উঁচু পাথরের উপরে বসে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। শুকনো ফল, আলুসিদ্ধ আর কালো কফি। চমরিগুলো ছুটতে ছুটতে মাঝে মাঝেই এ দিক ওদিক চলে আসে, ছুঁড়ে ফেলে দেয় আরোহীকে। ওর উপরে স্থির হয়ে বসে থাকাটাই প্রতিযোগিতা। যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে, সে অন্তিম বিজয়ী।

এই উচ্চতায় পৌঁছেই হয়তো আমার মনে একটা অদ্ভুত নির্লিপ্ত ভাবের জন্ম হয়েছিল। অতগুলো জন্তুর ছুটোছুটি, কান ঝালাপালা করা বাজনা, কিছুই আমার কানে আসছিল না, চোখে ধরা দিচ্ছিল না। পশ্চিমে ঢলে পড়তে থাকা রৌদ্রের সঙ্গে আমার মন দৃষ্টি সব হারিয়ে যাচ্ছিল। ঝাপসা পাইনবন, ঝাপসা পর্বতের সারি, আমি এ পৃথিবীতে থেকেও অন্য এক জগতের পথে যাত্রা করেছিলাম। ঘোর ভাঙল একটা নরম গলার ডাকে। চমকে উঠে দেখলাম ছুটোছুটি শেষ হয়েছে, যে বাদ্যযন্ত্রগুলো এতক্ষণ বাজছিল সেগুলোও ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন শুধু নিঃসঙ্গ উপত্যকার বুকে আট দশটি ঘর দাঁড়িয়ে আছে ঘুমন্ত পাথরের মতো, আকাশে পূর্ণচন্দ্র দুলে উঠছে পাহাড়ি

হাওয়ায়। সবাই কখন নেমে গেছে থাংগুর দিকে আমি টের পাইনি, তারাও ডাকেনি আমাকে। এই পাথরে বসে বসেই যেন আমি লুকিয়ে ছিলাম অন্য কোনো আড়ালে।

সামনে দাঁড়ানো ছেলেটা বলল, 'চলো, ওই দ্যাখো চাঁদ উঠে গেছে। জ্যোৎস্না পশ্চিমে ঢলে পড়লে কিন্তু রাস্তা আটকে দেবে, আর যাওয়া হবে না।'

নিজের অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'নাইটগাইড?' সে হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

'এসো, আর এই ট্রেকিংয়ের যন্ত্রগুলো রেখে দাও এখানে। ওগুলো আর লাগবে না'।

উপত্যকা পার হয়ে উৎরাইয়ে ত্রিকোণ ছুঁচলো গাছের ভিড়। পথের চিহ্ন দেখা যায় না, খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। পিছলে গেলেই গড়াতে গড়াতে কোনো গাছে ঠোক্কর খেতে হবে। আমার সঙ্গী ফিসফিস করে বলল, 'কেউ ডাকলে সাড়া দেবে না, কিচ্ছুতে ভয়ও পাবে না একদম।'

আমি একটুও অবাক হলাম না, আমি একবারও প্রশ্ন করলাম যে আমি তো ট্যুরিস্ট, বেড়াতে এসেছি, ভয় কেন পাব? কেউ ডাকলে সাড়া দেব নাই বা কেন? জিজ্ঞাসা করলাম না। আমার মনে হল, সে যা বলছে সে সবই স্বাভাবিক। এমনটাই এ পথের রীতি।

মাথা নীচু করে হাঁটছি, মাথা আর দেহ পিছন দিকে হেলানো বলে জ্যোৎস্নামাখা পথের অনেকটা দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি অনেক দূরের শব্দ।

হঠাৎ মনে হল মা ডাকছে আমাকে। দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গীও দাঁড়িয়ে পড়ে বলল হতাশার সুরে, 'ওই শুরু হল ডাকাডাকি, কান দিও না যেন।'

কিছুদূর এগোতেই আবার ডাক, এবার বাবার গলা। তারপরই একসঙ্গে একযোগে বাবা, মা, ছেলে, বউ, কাছের বন্ধুরা ডাকতে লাগল। প্রচণ্ড চিৎকারে আমার কানের পর্দা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার উপক্রম । আমি কান দিয়ে দু-হাত চেপে বসে পড়লাম মাটিতে। গাছপালার ভিতরে একটা প্রবল ঘূর্ণি হাওয়া ছুটে বেড়াতে লাগল। আমার মনে হল বিরাট বিরাট পা ফেলে আমার দিকে কে বা কারা যেন ছুটে আসছে। ভয়ে চোখ বন্ধ করার আগেই দেখলাম বিরাট বিরাট কয়েকটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে বনভূমির বাইরে খোলা প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় আর তাদের পিছনে ঝলমল করছে সোনালি রঙের একটা বিরাট দরজা। চোখ বুজে ফেলতেই একটা গম্ভীর উচ্চারণ আমার কানে এল, গাইডের গলা।

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'

আমার মনে একটা দুর্জয় সাহস এল, চোখ খুলে ফেললাম। আমার সঙ্গী এগিয়ে যাচ্ছে গাছের প্রাচীর যেদিকে শেষ, আমিও তার পিছু নিলাম। বনভূমি শেষ হতে আমরা বিশাল মূর্তিগুলির একেবারে সামনে এসে পড়লাম। তাদের চিৎকার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। হাতগুলো ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। পাথরের তৈরি বিরাট মূর্তির মতো তারা দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ।

হঠাৎ আমার মনে হল তারা কাঁদছে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে তারা। জ্বলজ্বলে চোখগুলো ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে ছায়ামূর্তিগুলোর, আর তাদের বুকের তীব্র ধুকপুক আমি শুনতে পাচ্ছি।

শেষ ছায়ামূর্তিটি পার হয়ে সোনালি দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মিহি তুষারপাত শুরু হল। ঠিক তখনই আমার বুকের মধ্যে একটা তীব্র মোচড় দেওয়া কষ্ট জেগে উঠল যেন, কথা বলতে গিয়ে দেখলাম আমার স্বর বন্ধ হয়ে গেছে প্রায়। অনেক কষ্টে ক্ষীণ গলায় বললাম, 'ওরা কারা গো, দাঁড়িয়ে আছে আমার পিছনে? কাঁদছে কেন?'

ঝলমল করে উঠল গাইডের দাঁত। সে বলল, 'বা রে! কাঁদবে না? তুমি চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছ, তোমার বাবা, মা, বউ, ছেলে কাঁদবে না?'

আমার বুক থেকে গলা পর্যন্ত একটা ঠান্ডা সাপ ছুটে গেল, কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'যাঃ, আমার বাবা, মা, বউ, ছেলে, অমন হতে যাবে কেন? বিরাট বিরাট আকাশছোঁয়া!'

গাইডের গলা গম্ভীর হল।

'ওরা অমন বিরাটই। ওদের স্নেহ, মায়া, পিছুটান পথের মাঝখানে অমন বড়ো বড়ো প্রাচীর তৈরি করে রাখে সব সময়।'

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

'তা তো করবেই, তা—ই তো সবাই চায়।'

'না, সবাই চায় না।'

রুখে দাঁড়ালাম।

'আমি ছেড়ে যাব না ওদের। যে যাবে যাক।'

গাইডের মুখটা করুণ হয়ে এল। ভাঙা গলায় সে বলল, 'এমন তো হয় না গো। সব ঋণ চুকিয়ে তুমি শেষ আবাস থেকে বেরিয়ে এসেছ, ফেলে এসেছ যা সঙ্গে ছিল তোমার, শেষ পারানির নীল পপি দিয়ে এলে সারথীর হাতে...আর তো ফেরা হয় না গো। ওই দেখ, সোনার দরজা খুলে যাচ্ছে, যেতেই হবে তোমাকে।'

আমি বুকফাটা চিৎকার করে ছায়ামূর্তিগুলোর দিকে ছুটলাম। একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল দু-হাত বাড়িয়ে, এবার চাঁদের আলোতে তার মুখ দেখতে পেলাম আমি।

আমার ছেলে, স্যমন্তক!

কিন্তু তার হাত ছোঁয়ার আগেই খোলা দরজা দিয়ে একটা বিশাল বরাভয় মুদ্রার হাত ছুটে এল আমার দিকে, স্যমন্তকের সামনে থেকে আমাকে তুলে নিয়ে গেল শূন্যে। কিছুক্ষণের জন্য সে হাতটি দাঁড়িয়ে রইল শূন্যে, আমি তুষারপাতে ভিজতে লাগলাম, ভিজতে লাগলাম জ্যোৎস্নাধারায়। আমার চোখের একবিন্দু জল ঝরে পড়ল স্যামন্তকের হাতে। তারপরই আমি শূন্য ছিঁড়ে ভেসে চললাম প্রচণ্ড বেগে। আমার চোখের সামনে থেকে পর্বত, বন, চাঁদ সব মুছে গিয়ে জেগে রইল এক বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত সোনার প্রাচীর।

শূন্য মনে আমি বসে রইলাম সোনার প্রাসাদটিতে আর কল্পনা করতে লাগলাম স্যমন্তক বসে আছে শূন্য প্রান্তরে আর তার হাতে চিকচিক করছে এক ফোঁটা নোনা জল, স্বর্গছেঁড়া একবিন্দু অশ্রু। ❖

গল্প

শল্য যখন সারথি

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্র : শেবাল দত্ত

'মহারাজ, দুই বন্ধুর ভাবগতিক ভালো ঠেকছে না।' দ্রৌপদী আঁচলে মুখ ঢেকে প্রবেশ করলেন।

'কে—? কে? ও তুমি।' কুরুক্ষেত্র থেকে ফিরে যুধিষ্ঠির স্নান করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, ঝপ করে উঠে বসলেন। বললেন, 'কেন? কেন? তুমি কি কৃষ্ণ-অর্জুনের কথা বলছ?'

'আজ্ঞে মহারাজ। সখাকে খুঁজতে তৃতীয় পাণ্ডবের শিবিরে গেছিলাম। আমি ঢুকতেই ওরা চুপ করে গেল। কথার শেষটুকু শুধু কানে এসেছিল, তবে তো চিন্তার বিষয়। নিশ্চয়ই সামনে বড়ো সমস্যা, যেটা ওরা আপনাকে জানাতে চাইছে না।'

'বলো কী ভদ্রে!' যুধিষ্ঠির পাশে রাখা ঘণ্টা বাজালেন। দৌবারিক আসতেই বললেন, 'চার ভাই এবং সখা কৃষ্ণকে সংবাদ পাঠাও।'

'আজ্ঞে মহারাজ।' সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। পিছন পিছন দ্রৌপদীও।

'বোসো।' কৃষ্ণ ও চার ভাই এসে বসলেন। যুধিষ্ঠির শান্তস্বরে বললেন, 'ছোটোবেলা থেকে ঠিক হয়েছিল, পঞ্চপাণ্ডব কারো কাছে কিছু লুকোব না। ভালোমন্দ যাই আসুক, সমান ভাগ করে নেব। ভাইদের কাছে আমি জানতে চাই, এই প্রতিজ্ঞা কি আমরা ভুলে গেছি? নাকি মানতে চাইছি না?'

'কেন দাদা?' ভীমসেন মুহূর্তে উত্তেজিত, 'কে শর্ত ভঙ্গ করেছে?'

অর্জুনের সঙ্গে চোখাচোখি হল কৃষ্ণের। তিনি হেসে বললেন, 'বুঝেছি মহারাজ। সখী আপনাকে জানিয়েছে। হ্যাঁ, ঠিকই, কৌরব শিবির থেকে পাওয়া সংবাদটা উদ্বেগজনক। অর্জুন তখনই আপনাকে জানাতে চাইছিল, আমিই ওকে থামিয়েছি।'

'এ আবার কী কথা কৃষ্ণ!' ভীমসেন রাগের সুরে বললেন, 'আমাদের জানাবে না?'

'নিশ্চয়ই জানাব দ্বিতীয় পাণ্ডব। তবে তার আগে আমরা দুজনে একটু শলা করছিলাম, কী উপায় বার করা যায়, তাই নিয়ে। তা ছাড়া—'

'তাছাড়া?'

'তাছাড়া সদ্য সদ্য গুরু দ্রোণাচার্য হত্যার পর থেকে ধর্মপুত্র বড়ো ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন। মনে হয়, মিথ্যে কথা বলার দুঃখ এখনও আত্মস্থ করে উঠতে পারেননি। তাই এখনই ওনাকে বিব্রত—'

'না না, যা পাপ করার করে ফেলেছি, গতস্য শোচনা নাস্তি।' যুধিষ্ঠির বললেন, 'তুমি বিলম্ব না করে কী শুনেছ, বলে দাও দেখি।'

'শুনুন মহারাজ!' কৃষ্ণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'সম্পর্কে সে আপনাদের মামা হতে পারে, কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, শল্য লোকটা মোটেই সুবিধের নয়—দাম্ভিক, লোভী এবং মিথ্যেবাদী।'

'আঃ!' যুধিষ্ঠির বেশ বিব্রত, একঝলক নকুল-সহদেবের দিকে তাকালেন, 'কী যে বলো! মাতুল শল্য আবার কী করলেন?'

'করেই তো যাচ্ছে। আগাগোড়া আমাদের উল্টোদিকে।' কৃষ্ণ গড়গড় করে বলতে থাকেন, 'লোকটা সারাটা জীবন ভুলভাল কাজ করে যাচ্ছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় ভীমসেনের হাতে কী মারটাই না খেল! তবু—'

'আহা, অত পুরোনো কথা তুলছ কেন?' ভীমও বেশ অপ্রস্তুত, 'এক-আধবার মানুষের ভুলভ্রান্তি হয়—!'

'এক-আধবার! হাসালে দ্বিতীয় পাণ্ডব! আসলে শল্য আমায়

মোটে সহ্য করতে পারে না। নিজেকে আমার চেয়ে অনেক বড়ো মনে করে। তোমার মনে নেই, জরাসন্ধ যখন তার দলবল নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেছিল, তখন সে ওর সঙ্গে ছিল! যেই দেখল, আমি তোমাদের পক্ষে আছি, অমনি সদলবলে যোগ দিল দুর্যোধনের পক্ষে।'

'না না—এটা ঠিক বলছ না।' যুধিষ্ঠির বলে ওঠেন, 'দুর্যোধন মাতুল শল্যকে বোকা বানিয়েছে। পাণ্ডব শিবির ভেবেই তিনি আসার পথে ওদের আতিথেয়তা নিয়েছিলেন।'

'ছাড়ুন তো মহারাজ! শল্য কি কচি খোকা! আপনিও যেমন, ওর কথা বিশ্বাস করেছেন!' কৃষ্ণ মুখ বিকৃত করলেন, 'শুনে রাখুন, আজ দুর্যোধনের অনুরোধে শল্য ক্ষত্রিয় রাজা হয়ে সূতপুত্র কর্ণের রথের সারথি হতে সম্মত হয়েছে। দুর্যোধনের এটা সাংঘাতিক চাল। কর্ণ যে বংশেরই হোক, সে মহারথী। আজ কীভাবে আমাদের হাজার হাজার সৈন্য সে ধ্বংস করেছে, কীভাবে আপনাকে পর্যুদস্ত করেছে, আপনি ভুক্তভোগী। নকুল, সহদেব, আপনি তিনজনে মিলেও ওর সামনে দাঁড়াতে পারছিলেন না। তার উপর কাল থেকে যদি শল্যর মতো ধুরন্ধর সেনাপতি কর্ণের রথ চালনা করে, কী অবস্থা ঘটবে, ভাবতে পারছেন! পাণ্ডব সেনা একেবারে কচুকাটা হয়ে যাবে।'

যুধিষ্ঠির গুম হয়ে গেলেন। আজ কুরুক্ষেত্রে যা ঘটেছে, বেশ লজ্জাজনক। একটু পরে আস্তে আস্তে বললেন, 'মাতুল শল্য কিন্তু আমাদের বলে গেছেন, কৌরবপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হলেও তিনি আমাদেরই সমর্থন করবেন।'

'বিশ্বাস করি না।' কৃষ্ণ বললেন, 'আমাদের সামনে একটাই পথ।'

পঞ্চপাণ্ডব জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছেন।

'নকুল-সহদেবকে পাঠিয়ে শল্যকে এখানে নিয়ে আসতে হবে। নিজের ভাগ্নেরা গেলে সে না করতে পারবে না। তখন ওকে দিয়ে মোক্ষম প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেব।'

'কী প্রতিজ্ঞা সখা?' অর্জুন বললেন।

'আছে আছে।'

'যদি শল্য তবুও সম্মত না হন?'

'তখন অন্য ওষুধ!' কৃষ্ণ মুখ টিপে হাসলেন।

* * *

'আসুন, আসুন মাতুল!' যুধিষ্ঠির এগিয়ে গিয়ে তাঁর রাজ কেদারায় শল্যকে বসালেন। তারপর পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁর বন্দনা করলেন, পিছনে চার ভাই ও দ্রৌপদী। শ্রীকৃষ্ণ নত হয়ে নমস্কার করলেন।

'বলো বড়ো ভাগ্নে, অকস্মাৎ এমন ধরে নিয়ে আসার কারণ কী?' শল্য সহাস্যে বললেন।

'মামা, আমরা খুবই বিপন্ন, আপনার শরণাপন্ন। আপনার উপদেশ ছাড়া আমাদের গতি নেই।' 'যুধিষ্ঠির বিমর্ষভাবে বললেন।

'কেন ভাগ্নে, কী হল? যুদ্ধ নিশ্চিত তোমাদের পক্ষেই যাবে বলে মনে হয়। কৌরবপক্ষের দুই মাথা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য অবসৃত, নিহত।'

'কেন, কর্ণ?' যুধিষ্ঠির করুণ কণ্ঠে বললেন, 'সে তো একাই দাবানল। পাণ্ডব বাহিনী ছারখার করে দিচ্ছে। তারপর এইমাত্র শুনলাম, দুর্যোধনের কথায় আপনি নাকি সম্মত হয়েছেন কর্ণের রথ চালনা করতে। তাহলে আর...'

'উপায় ছিল না ভাগ্নে! আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। দুর্যোধন আচম্বিতে মেঝেতে বসে পড়ল। আমার পা দুটো নিজের মাথায় রেখে বলল... মামা, আপনাকে কথা দিতেই হবে। নইলে আমি আত্মহত্যা করব। এরপর কী করি বলো!'

'যত্ত সব গালগল্প!' কৃষ্ণ খুব নীচুস্বরে বললেন।

'ক্-কী বললে তুমি? এটা গ-গল্প!—'

'তোমায় কিছু বলিনি মহান শল্য। স্বগতোক্তি মাত্র।'

'মামা, মামা!' অর্জুন ডুকরে উঠলেন, 'আপনি কিন্তু যুদ্ধের আগে বলে গেছিলেন, দুর্যোধনের পক্ষে থাকলেও আপনি নৈতিকভাবে...'

'আমাদের দিকে থাকবেন মামা।' যুধিষ্ঠির বলে ওঠেন।

'অশ্বডিম্ব থাকবে। ওর আবার নীতি? বিশ্বাসঘাতক।' আবার অস্ফুটে বললেন শ্রীকৃষ্ণ।

'খবরদার!' শল্য লাফ দিয়ে উঠলেন, 'তুমি নিজে কী, অ্যাঁ! তুমিই তো যুদ্ধটা করালে। সারা দেশে যেখানে যত বিবাদ, সবকিছুর মূলে তুমি! বাঁশি বাজিয়ে সকলকে খেপিয়ে তুলেছ!'

'আমি তো তোমাকে কিছু বলিনি শল্য। তুমি কেন অহেতুক রেগে যাচ্ছ? আসলে কী জানো, কেউ যখন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়, তার মনে হয় সকলে বুঝি তাকে টিটকিরি দিচ্ছে।... মহারাজ, আপনারা বৃথা ভস্মে ঘি ঢালছেন! শল্য সেই শ্রেণির মানুষ, যারা এক টুকরো মাংসের লোভে ল্যা ল্যা করে প্রভুর পাশে লেজ নাড়ে।'

'কী-ই! এতবড়ো স্পর্ধা! আমাকে কুকুর বললে!' শল্য একটানে কটিবন্ধ থেকে তরবারি বের করলেন, 'গোয়ালাপুত্র! সাহস থাকলে মুখোমুখি লড়ো।'

'আঃ কৃষ্ণ! এখন কি ঝগড়ার সময়!' যুধিষ্ঠির দুজনের মাঝে এসে দাঁড়ালেন, 'আমরা জানি, তোমার বুদ্ধির তুলনা নেই। এমন একটা উপায় বের করো, যাতে মাতুল তাঁর কথা রাখতে পারেন, আবার কৌরবদেরও সংকটে ফেলা যায়।'

'নিশ্চয়ই ফেলা যায়।' কৃষ্ণ দুষ্টু হেসে বললেন, 'কিন্তু মহামতি শল্য কি আমার উপদেশ নিতে প্রস্তুত?'

'না শুনে আমি কথা দিতে পারব না। বিশেষত যে পরামর্শ কৃষ্ণের মতো নিকৃষ্ট কূটজ্ঞ দেয়।' শল্য এখনও ক্রোধে কাঁপছেন।

'বেশ।' কৃষ্ণ উঠে দাঁড়িয়ে শল্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। দু-হাত দিয়ে ধরলেন তাঁর হাত, 'আমার সব কথা আমি তুলে নিচ্ছি মহারাজ। মার্জনা চাইছি।'

শল্য মুহূর্তে গলে জল। কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'আমিও আমার কটু কথা প্রত্যাহার করছি। বলো, বলো কৃষ্ণ। তুমি বুদ্ধিতে জ্ঞানে আমাদের সবার উপরে।'

'মহারাজ, তুমি দুর্যোধনকে কথা দিয়েছ কর্ণের যুদ্ধরথ চালাবে, এছাড়া আর কিছু বলোনি তো?'

'না। আমি বলেছি, কর্ণের রথের সারথি হয়ে তাকে কুরুক্ষেত্রে ঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাব।'

'বাঃ, বাঃ! তবে তো অতি সরল বিষয়। তুমি শুধু ভাগ্নেদের জন্য একটাই কাজ করবে। কর্ণ তোমার রথে উঠে বসার পর থেকে

তাকে তুমি পরপর বাক্যবাণে বিদ্ধ করে যাবে। এতে নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না।'

'বাক্যবাণ! ঠিক বুঝলাম না কৃষ্ণ।'

'এর অর্থ হল, রথ চালাতে চালাতে তুমি কটু কথা দিয়ে তাকে ক্রমাগত আঘাত করে যাবে। তাকে বিচলিত করে তুলবে, তার আত্মবিশ্বাস, একাগ্রতা নষ্ট করে দেবে। যেমন—বারবার তাকে বলবে, সে সূতপুত্র, নীচুজাতের সন্তান, দুর্যোধনের অনুগ্রহে রাজা হয়েছে, সে অযোগ্য...বলবে সে নিজেকে অর্জুনের চেয়ে বড়ো শস্ত্রবিদ মনে করে, প্রকৃতপক্ষে সে অর্জুনের নখের যোগ্য নয়, দুর্যোধনকে মিথ্যা বুঝিয়ে তার সর্বনাশ করাই তার উদ্দেশ্য...সে লোভী, সে দুরাচারী...'

'থামো থামো!' শল্যের চক্ষু বিস্ফারিত, বললেন, 'এই কথাগুলো তো পুরো সত্য নয়। আমি এই সব কদর্য কথা তাকে সজ্ঞানে বলব?'

'হ্যাঁ বলবে। তুমি জানো শল্য, যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু হয় না। যুদ্ধ মানেই ঘোর অন্যায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ। এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছে দুর্যোধন, সবচেয়ে বড়ো অন্যায়কারী সে, আর তাকে উত্তেজিত করেছে কর্ণ, পাণ্ডবদের বধ করে একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে...'

'কী বলছ কৃষ্ণ! ওরা অন্যায় করেছে বলে এত বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা আমি করব?'

'হ্যাঁ মদ্ররাজ, করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো পন্থা নেই।... মহারাজ যুধিষ্ঠির, আমার বুদ্ধিতে কর্ণকে হারাবার এটাই একমাত্র কৌশল। ওকে বিচলিত, বিভ্রান্ত না করতে পারলে পাণ্ডবপক্ষের পরাজয় নিশ্চিত।'

'মাতুল, মাতুল!' যুধিষ্ঠির অনুনয়ের সুরে বলে ওঠেন, 'আপনি দয়া করে আমাদের কথা একবার ভাবুন। এ এমন কিছু ব্যাপার নয়, শুধুমাত্র কিছু কথা! আপনি কর্ণকে—'

'থামো।' শল্য উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মুখ বর্ষার মেঘের মতো থমথমে। কঠিন স্বরে বললেন, 'আমার দ্বারা এই অপকর্ম সম্ভব নয়। আমি যাচ্ছি।'

শল্য গটগট করে এগিয়ে গেলেন শিবিরের দুয়ারের দিকে। কৃষ্ণ চোখের ইঙ্গিত করলেন অর্জুনকে। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তাঁর পথ আটকালেন, 'আর একবার অন্তত ভেবে দেখুন মাতুল শল্য। আমাদের কথা বাদ দিন, রক্তের সম্পর্কে আপনার দুটিই মাত্র ভাগনে, নকুল-সহদেব...ওরা কেউই বেঁচে থাকবে না।...ভাইরা, তোরা একটিবার বল রে।'

চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব সঙ্গে সঙ্গে এসে মামার পা জড়িয়ে ধরল।

'না না, তোরা আমায় এই অনুরোধ করিস না। নিজের বিবেক আমি বিসর্জন দিতে পারব না রে।' নকুল-সহদেবকে টেনে দাঁড় করালেন শল্য, 'শোন, আমি চেষ্টা করব, এই যুদ্ধ থেকে যত শীঘ্র সম্ভব সরে দাঁড়াতে। আমায় এখন যেতে দে।'

বাইরে সারি সারি বিবর্ণ হলুদ আলোর মশাল জ্বলছে। তাদের চারিপাশ জুড়ে ছায়া ছায়া অন্ধকার। শল্য এগিয়ে যাচ্ছেন শিবিকার দিকে। সহসা....

সহসা সেই অন্ধকারে কয়েকটি অস্ফুট শব্দ জেগে উঠল। পরক্ষণে নিথর নৈঃশব্দ্য।...

কয়েক মুহূর্ত। শল্যের দীর্ঘ ছায়ামূর্তি ধীর পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শিবিকার পাশে। মূর্তি গিয়ে বসল। শিবিকা বাহকরা চলতে শুরু করল কৌরব শিবিরের দিকে।

* * *

কিছু আগে সূর্যোদয় হয়েছে। আজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সপ্তদশ দিন। দিকবিদিক কাঁপিয়ে দুই পক্ষের শঙ্খ বেজে উঠল...কৌরব ও পাণ্ডব বাহিনী আবার পরস্পরের সম্মুখীন। আজ কর্ণ কৌরবপক্ষের মহা সেনাপতি, তাঁর রথের সারথি মদ্ররাজ শল্য। শল্য বসে আছেন চার ঘোড়ার রথে। কর্ণ এসে তাঁকে নত হয়ে নমস্কার করলেন। তারপর রথে উঠে বসলেন। বললেন, 'আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। চলুন মদ্ররাজ।'

'কোন দিকে যাব?'

'যেদিকে পাণ্ডব ভাইয়েরা আছে। আজ আর ওদের রেহাই নেই।'

'আহা রে, আহ্লাদ দেখে মরে যাই! ইঁদুর নাকি মারবে সিংহকে!'

এ আবার কী! কর্ণ হকচকিয়ে গেলেন, 'এসব কী বলছেন মদ্ররাজ? কালকেই তো আপনার সঙ্গে কথা হল, আপনি সম্মত হলেন...'

'তো? যা বাস্তব, তাই বলছি! তোমার মরবার সাধ হয়েছে সারথির পো। কোথায় বীরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবরা, কোথায় তুমি! অর্জুনের গাণ্ডীবের টংকার যখন শুনবে, তখন তো তুমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপবে। তারপর যখন দেখবে, ভীমের প্রকাণ্ড গদার ঘূর্ণিতে হাতিগুলো টপাটপ মরছে, তখন যে কী অবস্থা হবে তোমার, ভেবে আমারই চিন্তা হচ্ছে।'

'আরে!' দপ করে জ্বলে উঠলেন কর্ণ, 'এসব কী আবোল-তাবোল বকছ রাজা? পাণ্ডবরা যে বীরত্বে আমার তুলনায় বালখিল্য, তা কি তুমি জানো না?'

'তাই বুঝি! হাঃ হাঃ!' অট্টহাস্য করে উঠলেন শল্য, 'থামো, আর বোলচাল ঝেড়ো না! অজ্ঞাতবাসের সময় যখন একা অর্জুন তোমার বন্ধু দুর্যোধনের দলকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন কী করেছিলে, ভুলে গেছো? লেজ তুলে ওদের সঙ্গে ছুটে পালাচ্ছিলে কেন? যুদ্ধ করার মুরোদ ছিল না? কোথায় অর্জুন, কোথায় তুমি! বাঁশবনে খরগোশদের মধ্যে তুমি হলে গিয়ে শেয়াল রাজা! সিংহ সামনে এলে ভয়েই মরে যাবে।'

'যাও যাও!' কর্ণের সর্বাঙ্গ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখনই আমাকে অর্জুনের সামনে নিয়ে চলো, চলো চলো...।'

'যাচ্ছিই তো! তখন আবার পালাতে চাস না, সে সুযোগ পাবি না।'

'আমি পালাব? হা! অর্জুনের সঙ্গে আমার আসল যুদ্ধটাই তো হয়নি, আজ সেটা হবে। সারা পৃথিবী দেখবে। জন্মদাত্রীকে কথা দিয়ে এসেছি, হয় সে থাকবে, নয়তো আমি!'

'কথা! হুঃ! তোর মতো ছোটো জাতের লোকের কথার কি কোনো মূল্য আছে? তুই কি ক্ষত্রিয়? দুর্যোধনের উচ্ছিষ্ট খেয়ে বড়ো হয়েছিস, তোর কি লাজলজ্জা আছে!'

'থামো, থামো বলছি।' রাগে অপমানে কর্ণ দিশেহারা হয়ে গেছেন। রথের চারিপাশে যাকে দেখছেন, তাকেই ডেকে ডেকে বলছেন, 'এই যে শুনছ...যে আমাকে দেখিয়ে দেবে অর্জুন কোথায় আছে, আমি তাকে দেব একশো হাতি, একশো ঘোড়া, সোনাদানা, মণিরত্ন...'

'চুপ কর, চুপ কর সারথির ব্যাটা! আর লোক হাসাস না। অর্জুন আর কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে হিরের মতো ঝলমল করছে, ওদের হাজার ক্রোশ দূর থেকেই দেখা যায়...ওরা কি সাধারণ মানুষ নাকি রে! কাক আর হাঁসের গল্পটা জানিস? এখন তোর অবস্থা সেই পাতিকাকটার মতো, যে ওড়ার পাল্লা দিতে গেছিল মানস সরোবরের হাঁসের সঙ্গে! তারপর মাঝ সমুদ্রে কাক যখন আর উড়তে পারছে না, খাবি খাচ্ছে, এই বুঝি পড়ে যাবে জলে, তখন হাঁসই ওকে বাঁচাল। চল, চল—যুদ্ধে হেরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রাণভিক্ষা চাইবি অর্জুনের কাছে। মনে হয়, পেয়েও যাবি, কী বলিস!'

অসহ্য! অসহ্য! শল্যের প্রতিটা কথা শূলের মতো বিঁধে যাচ্ছে কর্ণের বুকের মধ্যে! মাথায় জ্বলছে দাউদাউ আগুন। রাগে উত্তেজনায় তিনি দরদর করে ঘামছেন। তাঁর ভদ্রতার বাঁধ ভেঙে গেল। হিসহিস করে উঠলেন, 'ছি ছি! তুমি ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতক। কৌরবপক্ষে যোগ দিয়ে তুমি পাণ্ডবদের গুপ্তচর হয়ে ঘৃণ্য অপরাধ করে চলেছ, তোমার কি এতটুকু পাপপুণ্য বোধ নেই? তুমি নাকি মহারাজা, মদ্রদেশের অধিপতি! তুমি নাকি প্রজাপালন করো!'

শল্য ঘোড়ার রশিতে টান দিতে দিতে খলখল করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'বলে যা, তোর যা ইচ্ছে বলে যা! এতদিন অনেক কুকর্ম করেছিস দুর্যোধনের আদেশে, এবার তোর শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। ইষ্টদেবতার নাম জপ করে নে!'

কর্ণ ক্রোধের চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন। তাঁর চৈতন্য বুদ্ধি বিচার সব লুপ্ত হয়ে এসেছে, চক্ষু ঝাপসা। তিনি থেমে থেমে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি তো এসব বলবেই। তুমি নিজে কোন দেশের মানুষ, হ্যাঁ? মদ্র হল অসভ্য, ইতরদের দেশ। ওদেশে ছেলেমেয়ে সবাই কাছা দিয়ে কাপড় পরে, বড়োদের সম্মান করতে জানে না, একসাথে কদর্য অঙ্গভঙ্গি করে নাচে গায়, সুরাপান করে, লাজলজ্জা কিছু নেই, পথেঘাটে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করে... মাসের পর মাস স্নান করে না, গায়ে দুর্গন্ধ! এই যে তুমি আমার থেকে এতটা দূরে বসেছ, তবুও তোমার গায়ের গন্ধে তিষ্ঠোতে পারছি না...'

শল্য কর্ণের একটা কথারও উত্তর দিচ্ছেন না, ওঁর কার্যসিদ্ধি হয়ে গেছে। ঝড়ের বেগে রথ চালনা করে তিনি চলে এসেছেন অর্জুন-কৃষ্ণের রথের সামনে।

কর্ণ এখন পুরোপুরি অপ্রকৃতিস্থ, তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, দেহ ক্রোধে কাঁপছে। যুদ্ধ করার মতো অবস্থায় তিনি নেই, তাঁর মানসিক শক্তি, একাগ্রতা ভেঙে চুরমার! রথের কোথায় কোন দিব্যাস্ত্র ধনুর্বাণ সাজিয়ে রেখেছেন, কিছুই মনে পড়ছে না। শল্য মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে কর্ণের অসহায় চেহারা দেখছেন, আর মৃদু মৃদু হাসছেন।...

এই অবধি বলে গোলদাদু জরাজীর্ণ খাতা বন্ধ করলেন। সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'এর পরের ঘটনা সবার জানা। ওইদিন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণের রথ মাটিতে আটকে গেল, অর্জুন তাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করল। কিন্তু আগের দিন রাতে শ্রীমান কৃষ্ণ যে সাংঘাতিক কুকর্মটা করেছিল, ব্যাসবুড়োকে পাকড়াও না করলে তা জানতেই পারতুম না।'

'ব্যাসবুড়ো!' কেলো অস্ফুটে বলল।

'হ্যাঁ রে সোনা, মহাভারতের লেখক মহাঋষি ব্যাসদেব! তপোবনের এক গুহায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কি অত সোজা!' মিটিমিটি হাসছেন গোলদাদু, 'ওনার কাছ থেকেই উদ্ধার করলুম এই খাতা, যেখানে নিজেই আসল ঘটনা লিখে রেখেছেন।'

পুরো নাম—গোলোকধাম ঢোল। রহস্যময় চরিত্র। কেলোর মা-র লতায় পাতায় গোলদাদু, জাহাজের মাস্তুলের শিকড়ের ছা গোছের সম্পর্ক। হঠাৎ কাল রাতে এসে হাজির। গোমুখ ভুজবাসায় নাকি তাঁর ডেরা আছে। সবই অবশ্য শোনা কথা।

'আসলে কী জানিস, আগাগোড়া পাণ্ডবদের দিকে টেনে লিখেছেন ব্যাস। তার জন্যে যখন যাকে দরকার, টেনে নামিয়েছেন। যেমন এই মদ্ররাজ শল্য, সোজা-সাপটা মানুষ, তার চরিত্রেও বেদম কালি ছিটিয়েছেন।'

'কালি ছিটিয়েছেন?'

'না তো কি? যে মানুষ দুর্যোধনের আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হয়ে বলে দেয়, তুমি কী চাও বলো, তার আবদারে নিজের ভাগ্নেদের ছেড়ে এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দেয়, সে কিনা যুদ্ধের সময়ে বেইমানি করবে, পাণ্ডবদের চর বৃত্তি করবে? এ কখনো হয়! নাটের গুরু হল গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ।'

'শ্রীকৃষ্ণ!'

'হ্যাঁ, কেষ্ট ঠাকুর। ব্যাসবুড়োকে চেপে ধরতেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল।'

'কিন্তু তুমি যা শোনালে দাদু, তাতে তো শল্য বিশ্বাসঘাতকতাই করেছেন। আগের রাতে তিনি বললেন, আমি পারব না...পরদিন সেই তিনি...'

'আরে বুদ্ধু!' জগাকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলেন গোলদাদু, 'কর্ণের সারথি কি শল্য ছিল নাকি? ছিল ভল্ল।'

'ভল্ল! সে কে?'

'শল্যের যমজ ভাই। একেই বলে কেষ্ট লীলা। শল্যকে সেই রাতে কৃষ্ণ বন্দি করেন, পালকিতে ওঠে ভল্ল। পরদিন পুরো যুদ্ধ প্রক্সি দিয়ে যায় ভল্ল, কর্ণ খুন হওয়া অব্দি।'

'কী করে এটা হয় দাদু?' কেলো বলে উঠল, 'পরে যে শল্য সেনাপতি হয়েছিলেন?'

'সে আরেক গল্প।' গোলদাদু উঠে পড়েছেন, 'একদিনে সব হয় নাকি রে?'

'কিন্তু ব্যাসদেব? তাঁকে পেলেন কী করে? এত হাজার বছর পরে তিনি বেঁচে আছেন?' জগা অবিশ্বাসী গলায় বলল।

'অবশ্যই আছেন। জানিস না, উনি অমর? সেই দ্বাপরযুগ থেকে নানা ভেক ধরে রয়ে গেছেন। এখন যেমন কচ্ছপের চেহারায় গুহার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন।' গোলদাদু হনহন করে হাঁটা দিলেন। বলা ভালো, সন্ধের কুয়াশার মধ্যে ঢুকে গেলেন।

কেলো ফের বিড়বিড় করে উঠল, 'ব্যাসবুড়ো!' ❖

গল্প

শবদাহের আগে

সঞ্জীবকুমার দে

ছবি : স্মৃতিশ দত্ত

রেজিস্টার খুলতে খুলতে বিরক্ত মুখে উষ্মা প্রকাশ করলেন ঘাটবাবু—'বডি নিয়ে আসার আর তোরা সময় পেলি না? ঘণ্টা দুই পরে এলে কী মহাভারতটা অশুদ্ধ হত?'

'এই দেখুন---' ডেথ সার্টিফিকেটটা বাড়িয়ে ধরে বললাম—'মৃত্যু হয়েছে দুপুর বারোটা পঞ্চান্ন মিনিটে, অলরেডি আট ঘণ্টা পার! আর দেরি করা যায়? বলুন না!'

সার্টিফিকেটটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এবার চেঁচালেন ভদ্রলোক—'ইলেকট্রিক চুল্লিতে কিন্তু দাহ হবে না! বন্ধ আছে। দুপুর থেকে মড়া নেই শ্মশানে। এখন চালু করলেও হিট হতে অনেক দেরি হবে। কাঠে পোড়াতে হবে!'

'বেশ তো!'

এবার যেন একটু নরম হলেন। প্রবীণ মানুষ। বহুদিন আছেন এই শ্মশানে। আমাদের নামে না চিনলেও মুখ দেখে চেনেন। বছরে অন্তত চার-পাঁচবার তো দেখা হয়েই যায়! হতেই থাকে।

রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে করতে ভদ্রলোকের চোখ বারবার লাফ দিয়ে সরে সরে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে, ভেতরে একটু উঁচুতে সেট করে রাখা টিভি-র পর্দায়। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের দিনরাতের সেমিফাইনাল ম্যাচ! তাও আবার ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান! ভারতের ২৬০ রানের জবাবে দ্বিতীয়ার্ধে ব্যাট করছে তারা। অনেকটা টক্কর দেওয়ার পর পটাপট তিনটি উইকেট খোয়া গেছে তাদের। ঘাত-প্রতিঘাতে জমজমাট ম্যাচের সেরা সময়!

টিভির সামনে জটলা বেশ কয়েকজনের। সকলেই শ্মশানের স্টাফ। ইনিও ছিলেন সেখানেই। কাউন্টারে, মানে জানালায়, আমাদের গলা পেয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে আসতে বাধ্য হয়েছেন। মেজাজ তো তিরিক্ষি হওয়ারই কথা!

ভদ্রলোকের চঞ্চলতা লক্ষ করে বলে বসল পিন্টু—'সাবধানে এন্ট্রি করুন, রেকর্ড ভুল হলে ডেথ সার্টিফিকেটেও ভুল হবে! কাটাকুটি, সংশোধন, শেষে আমাদেরই হ্যাপা!'

রাগে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন ঘাটবাবু, কিন্তু ঝুঁকে কত্তার মুখ দেখে চিনতে পেরে সামলে নিলেন।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে এন্ট্রি সেরে রেজিস্টারটা ঘুরিয়ে ঠেলে দিলেন আমাদের দিকে। পিন্টুর উদ্দেশে বললেন—'দ্যাখ, দেখে চেক করে নে। তারপর সই করে দে। ফ্যামিলির কেউ আছে'?

রেজিস্টারে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল পিন্টু—'রিলেশানের কেউ নেই। আমি প্রতিবেশী হিসাবে সই করে দিচ্ছি।'

তাই হল। ভদ্রলোক আনমনা। চোখ বারবার ওদিকেই ঘুরছে। এরমধ্যে একবার লাফিয়ে উঠলেন। আক্ষেপে চাপড় মারলেন টেবিলে। ভেতর থেকেও আওয়াজ উঠল। বোঝা গেল, আশিস নেহেরা নাকি ক্যাচ ফস্কেছেন!

একটু ধাতস্থ হয়ে এবার শুধোলেন—'কাঠ কতটা লিখব রে! নর্মাল যা দিই হয়ে যাবে, না এক্সট্রা লাগবে? বডি কেমন?'

আমি জানালাম—'বডি রোগাটে, মেদ কম, অতিবৃদ্ধ মানুষ, তবে ওজন আছে! মনে হয় হাড় শক্তই হবে। আধমণ বাড়িয়ে দিন।'

হিসাব করে বললেন—'ছশো পঁচিশ টাকা দে। ডোম, পুরোহিত সব একসঙ্গে ধরে নিলাম।'

ভাউচার কাটতে কাটতে মোলায়েম স্বরে বললেন—'কী করব বল, এমন ম্যাচ ছাড়া যায়?'

'আমরা তো ছেড়ে এসেছি!' পিন্টু বলল, 'কেউ মারা গেলে কী করা যাবে?'

ভাউচার কেটে হাতে দিলেন। বললেন—'ছোটো স্টোরের দরজা খোলাই আছে। ঘট, সরা, প্যাঁকাটি তোরাই বের করে নে। তবে কাঠের স্টোরে কেউ আছে কিনা জানি না। তালা বন্ধ দেখলে এদিক-ওদিক একটু কষ্ট করে খুঁজে নিস। তবে জানবি, নিশ্চয় খেলা দেখার জন্য কোথাও সেঁধিয়ে আছে! আর হ্যাঁ—'

চলে যাচ্ছিলাম, আবার ফিরলাম।

বললেন—'পুরোহিত এখানেই আছেন, ঘি-চন্দন এসব কাজ সব কমপ্লিট করে চিতা সাজিয়ে তারপর এসে ডেকে নিয়ে যাবি! সময় নষ্ট করাস না! তাহলে বিরক্ত হবে।'

এই বিরক্ত হওয়ার ব্যাপারটাই তো আজ ঘটে চলেছে বারেবারে!

সকাল থেকেই চারদিকে সাজো সাজো ব্যাপার। দোকান, বাজার, ডাক্তার-বদ্যি, কোচিং-জিম যাবতীয় কাজ সেরে সাতজলদি যে যার বাড়ি! স্কুলে, ব্যাংকে, পোস্ট অফিসে সর্বত্র যেন অঘোষিত ছুটি! বারোটা, সাড়ে বারোটা থেকেই পথঘাট ফাঁকা। ভারত বনাম পাকিস্তানের মুখোমুখি লড়াই। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল ম্যাচ। দিনরাতের ম্যাচ শুরু দুপুর আড়াইটায়, মোহালিতে। ভারত আবার বিশ্বকাপ জয়ের দোরগোড়ায়! শচীন-সেহবাগ-যুবরাজ-ধোনি সমৃদ্ধ চনমনে ভারতীয় দল!

ম্যাচ শুরুর কিছুক্ষণ পরেই খবর এল প্রতিবেশী ব্রজেন-জেঠু মারা গিয়েছেন। আশি ছুঁইছুঁই বয়স। গত সপ্তাহে দিন চারেক বেজায় অসুস্থ ছিলেন। দূরান্তের আত্মীয়স্বজনদের কয়েকজন খবর পেয়ে ছুটেও এসেছিলেন। গত দু-দিন শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে তাঁরা ফিরেও গিয়েছেন এক এক করে। বাড়িতে বৃদ্ধা জেঠাইমার কাছে থেকে গেছেন শুধু জেঠুর এক ভাগ্নি ও তাঁর বছর বারোর একটি ছোটো ছেলে। দুপুরে অবস্থার অবনতি দেখে সেই ভাগ্নিই ডাক্তারবাবুকে ডাকতে ছোটেন। ডাক্তারবাবু এসে দেখেন সব শেষ!

আমাদের চারটে বাড়ি পরেই ব্রজেন-জেঠুদের বাড়ি। বাবা-মা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন খবর শুনে। মনটা খুবই বিষণ্ণ হয়ে উঠল, যত না ব্রজেন-জেঠুর জন্য, তার চেয়েও বেশি খেলা দেখাটা মাটি হবে জেনে।

জানি, সৎকার কার্যের জন্য যেতে হবেই। নিজে থেকে না গেলেও ডাক আসবেই।

ঠিক এরপরেই ষষ্ঠ ওভারে ভারতের প্রথম উইকেট চলে গেল! বেশ চালিয়ে খেলছিলেন, ২৫ বলে ৩৮ রান করে আউট হয়ে গেলেন সেহবাগ। পাড়া থমথমে, চুপচাপ।

চোখ টিভির দিকে হলেও মন বসাতে পারছি না ঠিক। একটু একটু করে উইকেটে থিতু হচ্ছেন নতুন ব্যাটসম্যান গৌতম গম্ভীর, অন্যদিকে রয়েছেন শচীন। রান উঠছে। ম্যাচে ফিরছে ভারত।

এমন সময় বাবা ফিরলেন, সঙ্গে পাড়ার রসিককাকা। বাবা বললেন—'অঞ্জন, ব্রজেনদা-দের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কারও এসে পৌঁছবার তেমন সম্ভাবনা নেই। রাস্তাঘাটের গাড়িঘোড়ারও তো ওই পরিস্থিতি! পাড়ার লোকজনদের তেমন কাউকে গিয়ে দাঁড়াতে দেখছি না! যা করতে হবে—তোদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কী করা যায়, দেখ!'

'হ্যাঁ বাবা, দেখি!' বাড়ির পোশাক পালটে দ্রুত তৈরি হয়ে নিয়ে বেরোতে যাচ্ছি, এমন সময় পিন্টুও এসে গেল—'শুনেছিস?'

'হ্যাঁ, তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।'

'আজ যা পরিস্থিতি খুব হ্যাপা পোহাতে হবে!'

আমি মাথা দুলিয়ে সায় দিলাম।

'ব্রজেন-জেঠুদের বাড়ি গিয়েছিলাম, শুধু মহিলাদের ভিড়। পুরুষেরা কেউ ধারেকাছে ঘেঁষছে না।'

'না ঘেঁষুক, ছ-সাতজন হয়ে গেলেই তো কাজ মিটিয়ে ফিরে আসব। চল, আগে কাঞ্চন, অনিমেষ, বুবু, শম্ভুকে ডাকি।'

এই চারজন বন্ধু আমাদের আশেপাশের পাড়ায় থাকে, এদিক-ওদিক। কেউ স্কুলের একদা সহপাঠী, কেউ কলেজের, কেউ ফুটবল মাঠের। আশেপাশের পাড়ায় কেউ মারা গেলে, যদি খবর পাই আমরা এই ছ'জন সব শবযাত্রায়ই উপস্থিত থাকি।

কাঞ্চনকে পাওয়া গেল না। অনেক ডাকাডাকির পর বাড়ি থেকে জানাল—ওর নাকি খুব পেটের গণ্ডগোল!

অনিমেষের বাড়ি থেকে জানাল—সে নাকি কোন বন্ধুর বাড়ি গেছে একসঙ্গে খেলা দেখবে বলে! কোন বন্ধু, তা কেউ বলতে পারলেন না!

বুবু তার সাইকেল সারানোর দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার জন্য গোছগাছ করছিল। শুনে বলল—'একটু সময় দে ভাই, বাড়ি থেকে দুটো খেয়েই চলে আসব।'

পিন্টু বলল—'তবে তুই ফেরার পথে সামন্ত ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকে জেঠুর ডেথ সার্টিফিকেটটা কালেক্ট করে নিস।'

বুবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সাইকেল নিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

শম্ভু লেদমেশিনে কাজ করে। তাকে তার কারখানায়ই পাওয়া গেল। কাজ বন্ধ। কারখানা মালিকের অফিস ঘরে বসে সকলে

জমিয়ে খেলা দেখছিল। ডাকতেই উঠে এল। শুনে বলল—'শচীন এবার বেজায় পিটছে মাইরি! পাক বোলারদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে! যাক, ওসব থাক। মানুষের বিপদে তো গিয়ে দাঁড়াতে হবেই! চল।'

পিন্টু বলল—'যাক, চারজন তো কনফার্মড! আর কাউকে না পেলেও কুছ পরোয়া নেই।'

শম্ভু জানতে চাইল, চতুর্থজন কে?

শুনে বলল, কাঞ্চন, অনিমেষ যাবে না?

আমরা সব বললাম। শম্ভু রেগে গেল—'বাহানা ওসব! খেলা দেখছে! দাঁড়া, অনিমেষের মোবাইলে ফোন করি!' শম্ভু আর অনিমেষ, আমাদের ছ'জনের মধ্যে শুধু এই দু'জনেরই ফোন আছে। আর কারও নেই।

মিনিট পাঁচেক লাগাতার চেষ্টা চালাল শম্ভু—'ফোন ধরছে না! মনে হয় ইচ্ছে করেই ধরছে না, বুঝলি! মৃত্যুর খবর জানে।'

আমরা বললাম—'ছেড়ে দে, কাজ আটকাবে না।'

আটকাবে না, বললাম ঠিকই, কিন্তু পদে পদে বিঘ্ন ঘটতে লাগল।

লোক মোটে আমরা চারজন। অথচ শববহনের গাড়ি মিলল না। এই অঞ্চলে যাদের গাড়ি আছে তেমন এক ক্লাব জানাল তাদের আজ ড্রাইভার আসেনি। আর এক সংস্থা জানাল হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে একটি ডেডবডি দুর্গাপুরে পৌঁছতে গেছে তাদের গাড়ি। ফিরতে বেশ রাত হবে। ফিরে এলেও সেই গাড়ি আজ আর পাঠানো সম্ভব হবে না।

ব্রজেন-জেঠুর বাড়ির সামনে আমরা চারমূর্তি। গাড়ি না পেলে কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে হবে অথচ লোক হচ্ছে না। জেঠুর একমাত্র ছেলে কানাডায় কর্মরত। মেয়ে গত হয়েছেন বছর চারেক আগে। ভাগ্নি ক'দিন আগে এসেছেন সিউড়ি থেকে। কাছাকাছি আত্মীয় বলতে কেউ নেই।

বাবা, পাড়ার রসিককাকা, আর রমানাথকাকা তিনজনে মিলে আঠারোশো টাকা তুলে দিলেন আমাদের হাতে। শববহনের খাট-বিছানা, ফুল-মালা, খই, ধূপ, কাপড়-নামাবলি, ঘি-মধু-চন্দনকাঠ ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনাকাটা আর শ্মশান-খরচের জন্য। আর ভরসা দিয়ে বললেন—'কেনাকাটাগুলো করে আনতে আনতে ভারতের ব্যাটিং শেষ হয়ে যাবে। তখন দেখবি অনেক ছেলে- ছোকরারা এসে যাবে।'

কেনাকাটা করতে গিয়েও কী বিড়ম্বনা! খাট কিনতে গিয়ে বিক্রেতাকে খুঁজে পাচ্ছি না! সাদা কাপড়, নামাবলি কিনতে গেছি, দোকান খোলা রেখে দোকানদার গিয়ে শামিল হয়েছে বাজার সমিতির অফিসে টিভি দেখার ভিড়ে! ফুলের দোকানদার ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে দুপুরেই! পদে পদে ঠোক্কর! মানুষ মজে গেছে ভারতের জবরদস্ত ব্যাটিংয়ে! ২৬০ রানের ইনিংস। পাক দলের কাছে ছুড়ে দিয়েছে মস্ত চ্যালেঞ্জ!

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বিরতি শেষে আবার খেলা শুরু। ভারত এবার ফিল্ডিংয়ে। জেঠুর দরজায় একটিও বাড়তি লোকের দেখা মিলল না। শম্ভু আর বুবু এবার মরিয়া হয়ে বেরোল লোক খুঁজতে। পাড়ার ক্লাব শূন্য রেখে ছেলেছোকরারা এর-ওর বাড়ি সেঁধিয়ে গেছে সে তো দেখে আগেই বুঝেছি। তেমন একজনের বাড়ি হানা দিয়ে চুপি চুপি খেলা দেখতে বসা দুটো ছেলেকে ওরা পাকড়ে নিয়ে এল। চিনি দুজনকেই। একজনের নাম পলাশ আর একজনের নাম গণেশ। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেকটাই ছোটো। গণেশ ছেলেটি মন্দ নয়, শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু পলাশটা বাচাল। তবে দুটিই ক্রিকেট-পাগল! জবরদস্তি আনা হলেও পরিস্থিতি বুঝে ওরাও আমাদের সঙ্গে হাত লাগাল। বাঁধাবাঁধি করে শব নিয়ে বেরোতে বেরোতে আরও ঘণ্টা দেড়েক সময় লেগে গেল। জেঠুর ভাগ্নি বললেন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে করে শ্মশানে নিয়ে যেতে, সে দাদুর মুখাগ্নি করবে।

রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে ধাক্কা মারলাম অফিস-রুমের দরজায়।

আমরা রাজি হলাম না। ওইটুকু ছেলে, এদিকে লোকজনও কম। আজকের পরিস্থিতিটাই ভিন্ন। শ্মশানেও অব্যবস্থা থাকবে। ছোটো ছেলে, ভয় পেয়ে যাবে! তাকে ছাড়াই আমরা রওনা হলাম।

পথেও ঝঞ্ঝাট কম হল না! যেখানেই টিভি চলছে, শ্লথ করে
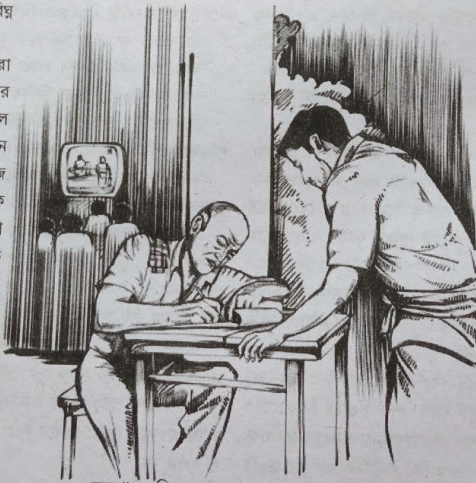
দিচ্ছে আমাদের গতি। দাঁড়িয়ে পড়ছে পলাশ, গণেশ। তখনই নাকি মৃতদেহের ভার বেশি মনে হচ্ছে তাদের! স্কোর জানারও দরকার হয়ে পড়ছে! মাঝে মাঝে হাত ছেড়ে পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোনে কারও কাছ থেকে জেনে নিচ্ছে ম্যাচ আপডেট। যেতে যেতে হইহই আর উল্লাস-ধ্বনি শুনলেই ছুটে ওরা চলে যাচ্ছে উইকেট পতনের রিপ্লে দেখতে! বাধ্য হয়ে কতবার খাট নামাতে হচ্ছে পথে। টানাটানি করে ধরে আনতে হচ্ছে আবার। এমনি করতে করতেই শ্মশানে এসে পৌঁছেছি আমরা।

নির্জন শ্মশান। কোনো চিতাই পুড়ছে না। পাশে ইলেকট্রিক চুল্লির বিল্ডিং। ওপরে খান কুড়ি সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছতে হবে সেখানে। চুল্লি শব্দহীন। অর্থাৎ বন্ধ!

পিন্টু বলল—'ওখানে মিছিমিছি কষ্ট করে তুলে লাভ নেই। আগে অফিসে চল। কাগজের কাজকম্ম মেটাই। কী হালচাল—বুঝে নিই!'

মৃতদেহের কাছে বাকি চারজনকে বিশ্রামে রেখে আমি আর পিন্টুই এসেছিলাম এই যে কাউন্টারে। এখানেই ঘাটবাবুর কাছ থেকে বুঝে নিলাম হালচাল।

যাই হোক, ঘট-সরা-চাল-কলা-তিল-প্যাঁকাটি এইসব বস্তু নিয়ে আমরা দুজনে এসে হাজির হলাম মৃতদেহের কাছে। ইলেকট্রিকে পোড়ানো যাবে না শুনে সকলেই একটু দমে গেল।

কাঠের চুল্লি জ্বালানোর জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা একটা জায়গা পছন্দ করে তার কাছে আমরা খাট সমেত মৃতদেহটি বয়ে এনে রাখলাম। শম্ভু ঘট হাতে জল আনতে একটু দূরে গঙ্গার ঘাটে একাই চলে গেল। কাজ এগিয়ে রাখার জন্য আমি আর বুবু মৃতদেহ থেকে খাটের বাঁধন খুলতে শুরু করলাম। পিন্টু ফুল-মালা সরিয়ে একটা ধারে রাখতে রাখতে পলাশ আর গণেশকে উদ্দেশ করে বলল—'কাঠ মনে হয় আজ আমাদেরই বয়ে আনতে হবে, বুঝলি! তোরা একটু হাত লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে কাঠগুলো এনে দে, তারপর চাইলে তোরা চলে যেতে পারিস। আর দরকার হবে না।'

'তোমাদের একলা ফেলে আমরা চলে যাব?' গণেশ বলল।

'কোথায় একলা হলাম রে! আমরা তো চারজন। গাড়ি পেয়ে গেলে জবরদস্তি করে তোদের ধরে আনতাম না।'

পলাশ মোবাইলে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল—'বাঃ এখন মাঝপথে আমাদের ছেড়ে দিচ্ছ? মড়া ছুঁয়েছি, এখন গঙ্গায় স্নান না করে গেলে বাড়িতে ঢুকতে দেবে?'

'যাবার পথে ছাতুবাবুর ঘাটে স্নান সেরে যা। চৈত্রমাসের গরম, স্নান করে আরাম পাবি।'

'স্নানের ঘাটও আজ নির্জন হবে!'

'হলে কী? সেখানে কত আলো! উলটোদিকে নিমতলা ঘাট। সেখানকার আলোও এপারের ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে যায়।'

পলাশ ঠোঁট ওলটাল—'তোমাদের খুব সাহস, না—?'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছিস। এই তো শম্ভু একা ঘট হাতে চলে গেল!'

পলাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—'তা আছে বটে, তবে তোমাদের খুব অহংকার।'

পিন্টু আর কথা বাড়াল না।

শম্ভু ফিরে আসতেই পিন্টু বলল—'এখানে অঞ্জন আর পলাশ থাক। চল আমরা বাকি সবাই কাঠ আনতে যাই।'

শম্ভু ঘট রেখে তার মোবাইলটা গামছায় মুছছিল।—'দ্যাখ না, ঘট ডোবাতে গিয়ে আমার ফোনটা জলে পড়ে গেল! খুব ভুল করেছি। খেয়াল ছিল না। দ্যাখ তো ফোনটার কী অবস্থা—'

আমি হাত বাড়িয়ে ফোনটা নেওয়ার আগেই পলাশ সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। কমবয়সি ছেলে, আগ্রহ বেশি। তাছাড়া ওর নিজের ফোন থাকায় নাড়াঘাঁটা করে। জানেও বেশি। পলাশ ফোনটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

শ্মশানে কাঠে দাহ করার এই চত্বরটায় একেই আলো কম। তার ওপর আজ যেন আরও ম্রিয়মাণ! চারদিকে একসঙ্গে এত বিদ্যুৎ ব্যবহার হওয়ার জন্য হয়তো ট্রান্সফরমারগুলোতে চাপ পড়ছে! কিংবা অন্য কোনো কারিগরি সমস্যা হচ্ছে!

মৃতদেহ খাটে। গায়ের ওপর শুধু একটি সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। তার ওপর বিছানো নামাবলি। বুকে একটি ছোটো গীতা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। চিতায় তোলার আগে খুলে নেওয়া হবে। বাকি কাজ সবই সমাপন।
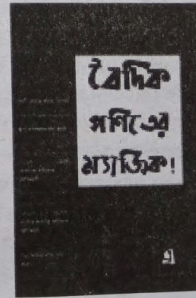
বসে বসে ঝিমুনি এসে যাচ্ছে। গঙ্গার দিক থেকে একটা হালকা শীতল বাতাস বয়ে আসছে বেশ। দুপুর থেকে ধকল তো কম যাচ্ছে না! চোখও বুজে এসেছিল কখন! হঠাৎ সমস্বরের একটা তীব্র চিৎকারে ঝিমুনি টুটে গেল আমার! উল্লাসধ্বনি! শুধু এদিকেই নয়, গঙ্গার ওপার থেকেও ভেসে আসছে সে শব্দ!

ততক্ষণে এক ঝটকায় উঠে পড়েছে পলাশও। কিছু না বুঝতে দিয়েই শ্মশান থেকে বেরিয়ে ছুটল সে যেদিকে অফিসঘর, সেদিকে।

ফিরে এল মিনিট দুই পরেই,—'অঞ্জনদা, আফ্রিদি আউট! সাত উইকেটে ১৮৪। ৪৯ বলে ৭৬ রান করতে হবে ওদের। পাকিস্তান আর পারবে না। মিসবা একা কতটা টানবে? ইন্ডিয়া জিতছেই।' বলে আবার বসে পড়ল পলাশ আমার পাশে।

বসলে কী হবে? উশখুশ করছে পলাশ—'আজ যদি জেতে, ফাইনালেও জিতবে। শ্রীলঙ্কা-কে উড়িয়ে দেবে! শিওর ওয়ার্ল্ড-কাপ চ্যাম্পিয়ন। ধরে নাও আজই ফাইনাল!'

আমি চুপ করে রইলাম।

একটু পরেই আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পলাশ—'অঞ্জনদা, আমি অফিসে ঢুকে একটু খেলা দেখে আসব? লোকগুলো ভেতরে আসতে বলছিল। যাব—একটু?'

'যা—'

'তুমি একা থাকবে? ভয় করবে না?'

আমি নীরবে হাসলাম।

সম্মতি ধরে নিয়ে পলাশ আবার দৌড় লাগাল।

বসে থেকে চোখ বুজে আসছে আবার। কতক্ষণ জানি না, তন্দ্রা ছুটে গেল কার এক কণ্ঠস্বরে! কী যে কথা, তা বুঝলাম না। সংবিৎ ফিরে এদিক-ওদিক দেখলাম। কেউ নেই।

নড়েচড়ে বসতেই আবার সেই কণ্ঠস্বর—'বাকি আর কয় ওভার?'

ধড়াস করে উঠল বুকটা—জেঠু কথা বলছেন? শিরদাঁড়া বেয়ে কী তপ্ত এক স্রোত! ঘাড় শক্ত রেখে জেঠুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। শ-দেড়েকের ওপর মড়া পুড়িয়েছি। কতবার এসেছি শ্মশানে! এমন অনুভূতি কোনোদিন হয়নি আমার! আমি কি ভয় পাচ্ছি?

হঠাৎ মনে হল, নামাবলিটা কেঁপে উঠল যেন! পরমুহূর্তে মনে হল—ওটা গঙ্গা থেকে বয়ে আসা বাতাসের কারণে। এরপর মনে হল নড়ছে চাপা দেওয়া সাদা কাপড়টাও। জেঠু কি নড়ে উঠছেন?

মুখ থেকে বুক হয়ে পায়ের দিকে যাচ্ছে দৃষ্টি। সেই মুহূর্তে আবার—'যা, তুইও খেলা দেখে আয়! আমি থাকি।'

তড়িদাহতের মতো ছিটকে গিয়ে পড়লাম একটু দূরে! তারপর কী যেন এক অদ্ভুত শক্তি আমাকে তাড়িত করে নিয়ে গিয়ে ফেলল শ্মশানের বাইরে! রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে ধাক্কা মারলাম অফিস-রুমের দরজায়। ভেজানো দরজা খুলে হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়লাম ভিতরে। সকলের বিস্ফারিত চোখের কৌতূহল নিরসন করলাম আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে—'শিগ্গির চলুন, মৃতদেহ কথা বলছে!'

তারপর যা হল, সে বর্ণনা হুবহু বলা কিছুতেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তখন ভয়ার্ত। বুকে যেন একসঙ্গে একশো হাপর চলছে।

এতক্ষণ যে লোকগুলি টিভি-তে বিভোর ছিলেন, তাঁরাই উঠে দাঁড়ালেন সকলে একযোগে। ঘাটবাবু সর্বাগ্রে, পিছনে বাদল ডোম, পুরোহিত, আরও কারা কারা যেন! আমি কী করব বুঝতে পারছি না! আমার সহযোগীরা কেউ নেই কাছেপিঠে! তবু বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে তাঁদের অনুসরণ করলাম অবশেষে।

মৃতদেহের কাছাকাছি পৌঁছতেই আবার শোনা গেল—'ভারত জিতবে?'

থমকে গেলেন সকলে। দু-একজন ঘুরেও পড়েছিলেন পালাবেন বলে। আমিও। কিন্তু এক-দুই লহমা মাত্র। আবার এগোচ্ছেন ঘাটবাবু। বুদ্ধি করে টর্চ এনেছেন সঙ্গে। আলো ফেললেন মৃতদেহের মুখে। ঝুঁকে পড়ে যিনি দেখছেন, তিনি কি ডাক্তার? কী দেখছেন—চোখ না ঠোঁট? বুঝতে পারছি না। আমি তো অনেকটাই ব্যবধানে! বাদল ডোম নামাবলি, গীতা, গায়ের ঢাকা তুলে নিয়ে কী যেন খুঁজছে আঁতিপাঁতি করে! শেষে আবিষ্কৃত হল—জেঠুর বালিশের নীচে একদিকের কোণ চেপে ঢুকিয়ে রাখা একটা মোবাইল ফোন!

বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবার ভয়ে স্বীকার করল পলাশ, কীর্তিটা তারই। নিজের ফোনটা চালু করে রেখে গিয়ে দূর থেকে বিকৃত গলায় সে-ই কথা বলছিল শম্ভুর ফোন থেকে!

তার সাফাই—আমাদেরও যে ভয় আছে, তা প্রমাণ করে দেখাবার জন্যই সে এই কাজ করেছে।

এই ঘটনাটি সাড়ে এগারো বছর আগের ৩০ মার্চ ২০১১ সালে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের দিনে ঘটা। উল্লেখ্য, সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে ২৯ রানে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে ভারত। পরে শ্রীলঙ্কা-কে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য বিশ্বকাপও জয় করে।

সেমিফাইনালের ম্যাচ শেষের পরই সেই রাতের পরিস্থিতি বদলে যেন দিন হয়ে ওঠে চতুর্দিক। বাজনা, বাজির শব্দে আর আলোর রোশনাইয়ে পরিবেশই বদলে যায়। শ্মশান চত্বরও গমগম করে ওঠে অধিক মানুষ সমাগমে। কাঞ্চন, অনিমেষ সহ আমাদের পাড়ার জনা বিশেক যুবা-তরুণ বেশ কয়েকটি বাইকে চেপে ছুটে আসে ব্রজেন-জেঠুর নাতিকে সঙ্গে করে।

দাদুর চিতায় অগ্নিসংযোগ করে তাঁর নাতি। আর দাহ শেষে নাভিকুণ্ডলী সরায় করে গঙ্গায় ভাসায় পলাশ—জেঠুর নশ্বর আত্মার আছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। ❖

সুইডিশ ড্যানিশ নগরী মালমো

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

মালমো নামটার সঙ্গে প্রথম পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল সেইদিন, যেদিন 'ওরেসুন্দ' সেতুর রেলপথে সাগর পার করে প্রথম এসে ঢুকেছিলাম সুইডেনে। তা সে আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা হবে। কোপেনহেগেন বিমানবন্দর থেকে সুইডেনের দিকে যাত্রা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এসে উঠেছিল আধুনিকা ওরেসুন্দ সেতুতে। নীল সাগরিকার উন্মুক্ত অপার সৌন্দর্যের বুক চিরে ছুটে চলেছিল সে। অদূরে সাগর উপকূলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সাদা উইন্ডমিলেরা চেয়ে দেখেছিল অবাক বিস্ময়ে। জানিয়েছিল স্বাগতম মেরুপ্রান্তের অচিনপুরের দেশে। আশাতীত এ দৃশ্য ঘোর লাগিয়েছিল চোখে। ঘোর কেটেছিল যখন ট্রেন এসে থেমেছিল 'মালমো' নামের একটি স্টেশনে।

মালমো সুইডেনের তৃতীয় বৃহৎ নগরী। তার স্থান স্টকহোম ও গোটেনবর্গের পরেই। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস রয়েছে যার সেই মালমো আজ ওরেসুন্দের উপস্থিতিতে আরো বেশি জমকালো হয়েছে। গড়ে উঠেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দুরূপে। অতঃপর রেলপথে একাধিকবার পারাপার করা সেই মালমো নগরীকে ভালো করে দেখার অভিপ্রায়ে, সপ্তাহান্তের এক ঝলমলে দিনে লুন্ডের বাসে চড়ে রওনা দিলাম রেল স্টেশনের দিকে।

দক্ষিণ সুইডেনের ছোট্ট নগরীর নাম লুন্ড। বেড়ে উঠেছে ১৬৬৬ সালে স্থাপিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে। স্থান পেয়েছে বিশ্বের প্রথম একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসে পড়াশোনা ও গবেষণার কাজে। লুন্ডের অনতিদূরেই মালমো, যার উপস্থিতি দক্ষিণ সুইডেনের সাগরের ধারে। অপরূপ ওরেসুন্দ সেতুর দ্বারা যুক্ত সে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের সঙ্গে। তার নীচে দিয়ে

ক্যানাল

বোট রাইড

রেলপথ গেছে তো ওপর দিয়ে সড়কপথ। আট কিলোমিটার লম্বা বাল্টিক ও নর্থ-সির সঙ্গমের উপর তৈরি এই সেতু ইউরোপের সাগরপারের সেতুগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। সড়কপথে তাকে পারাপার করেছি একাধিকবার। সেখানে তার বাধাহীন উপস্থিতি। উত্তর মেরুপ্রান্তের দূষণবিহীন ঘন নীল আকাশের নীচে সেতুর দু-ধারের নীলিমায় নীল অন্তহীন জলসম্ভার মোহিত করেছে। জাগিয়েছে বিস্ময়! এবারে সেই মালমো অভিমুখে যাত্রা আমাদের। সমগ্র ইউরোপের যানবাহন ব্যবস্থা দেখেছি চিরদিনই খুব ভালো। আর সুইডেনের ক্ষেত্রে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পঁচিশ বর্গকিলোমিটারের ছোট্ট শহর লুন্ডে বাস চলে দশ মিনিটের ব্যবধানে। সেখানে এখন দ্রুতগামী ট্রামও যুক্ত হয়েছে। গেস্ট হাউসের সুইডিশ মহিলা তো আমাদের বলেই দিলেন, 'আরে, বাসে চড়ার দরকার নেই। ওই সিটি সেন্টারের দিকে বাম্পে বাস লাফাবে। আপনারা বরং ট্রামে চড়বেন। একদম jark free। মাথা নাড়লাম তাঁর কথায়। মনে মনে ভাবলাম এদের এই মাখনের মতো রাস্তায় যদি jerk হয় তাহলে আমাদের এখানে এসে কী বলবে! তা সে যাই হোক, বাসে করে লুন্ড সেন্ট্রালে এসে নামলাম। আমার মেয়েই সমস্ত মালমো ট্রিপ ঘুরিয়েছিল নিজের খরচায় ও তার টিকিটও কেটে নিয়েছিল মোবাইল app-এ। দেখলাম আগে থাকলেও সম্প্রতি এই রীতি মেনে টিকিট কাটার নিয়ম চালু হয়ে যাওয়ার ফলে লুন্ড স্টেশনের সব টিকিট কাউন্টার তুলে দিয়েছে। এখন আর app ছাড়া গতি নেই। শহরের সঙ্গে মানানসই ছোট্ট লুন্ড

পাথরের টেলিস্কোপ

স্টেশনে ট্রেন এসে থামলে আমরা উঠে পড়লাম। আরম্ভ হল স্বল্প দূরত্বের যাত্রাপথ।

গ্রাম-গ্রামান্তর হয়ে ছোটো-বড়ো স্টেশন পেরিয়ে এগিয়ে চলল ট্রেন। দু-দিকে দিগন্তছোঁয়া সবুজের সমাহার। মেশিনে ছাঁটাই করা চাষের জমি ছড়িয়ে রয়েছে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত, যতদূর দৃষ্টি যায়। কোথাও কোথাও কাঁচা হলুদ রঙের রেপসিড চাষের ফুল ভরে রয়েছে, সবুজের পাশ থেকে। কচি সবুজ আর গাঢ় হলুদের পাশাপাশি সম্মিলিত রূপ মুগ্ধ করে। দক্ষিণ সুইডেনের মালমো, লুন্ডের মতো অংশগুলো স্কোনে কাউন্টির অন্তর্গত, যা অবশিষ্ট সুইডেন থেকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন—তা সে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই হোক বা ভৌগোলিক রূপরেখায়। সুইডেন এমন এক দেশ যার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় দশম শতাব্দী থেকে, যেখানে মাত্র সতেরো শতাব্দীতে এসে যুক্ত হয়েছে স্কোনে। কারণ তার আগে সে ছিল ডেনমার্কের অঙ্গ। দ্বিতীয় উত্তর মেরুপ্রান্তের যুদ্ধকালে ডেনমার্কের সঙ্গে সুইডেনের যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে বিরাটভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ডেনমার্ক। ফলে তখনকার ড্যানিশ রাজা ফ্রেডারিক তৃতীয়কে নতিস্বীকার করতে হয় আর বাধ্য হয়ে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে দিতে হয় সমগ্র স্কোনে অঞ্চল সুইডেনকে। সেই থেকে স্কোনে সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের শিল্প সংস্কৃতি ও ধরন-ধারণ সবকিছুই রয়ে যায় ড্যানিশদের মতো। প্রায় উনিশ শতক পর্যন্ত তাদের মধ্যে এই বৈরিভাব ও অসহযোগিতার ধারা লক্ষিত হয়। তারা নিজেদের 'স্কোনিয়ান্স' ও এদেরকে 'রিয়াল সুইডিশ' বলে গণ্য করে। কিন্তু পরে সে ভাবনা প্রশমিত হয় ও স্কোনে হয়ে যায় সুইডেনেরই এক অঙ্গ। এ পার্থক্য ভৌগোলিকরূপেও চোখে পড়ে, যখন দেখি যে স্কোনে অঞ্চলটি ভীষণরকম সমতল ও উর্বর, যা কিনা বিরাটভাবে খাদ্য-শস্য যোগায় সুইডেনকে। এমনধারা চাষের জমি চোখে পড়ে না এ দেশের মধ্য বা উত্তরাংশের দিকে গেলে।

ট্রেনে যেতে যেতে দুইধারে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়। হরিতের আবরণ দিয়ে মোড়া স্কোনে অঞ্চলকে বসন্তের প্রাণবন্ত প্লাবনের মাঝে জীবন্ত লাগে। গাছে গাছে ভরা তার প্রকৃতি। ফুলে ফুলে ঢাকা তার আঙিনা। বিদেশিরা স্বভাবতই হাইকিং করতে ভালোবাসে। এই সময় কান্ট্রিসাইডে, প্লামের বাগানে প্লাম-পিকিং করতে যায় তারা। তোলে, খায়, আনন্দ করে। জানায় বসন্তকে অভিবাদন। ট্রেনে যেতে যেতে পেরিয়ে যায় অজস্র ছোটো ছোটো গ্রাম, বেশিটাই সাজানো সুরকি লাল দেওয়ালের তেকোনা ছাদের বাড়ি দিয়ে। ছোটো-বড়ো বাগানগুলো ভরা মরশুমি ফুলে যেখানে অনাদরে অবহেলায় ঝাড়ে ঝাড়ে ফুটে রয়েছে গোলাপ। সব বাড়িই প্রায় এক ধাঁচের। সবুজের মাঝে তাদের এমন রঙিন উপস্থিতি আকর্ষিত করে। ট্রেনের বড়ো বড়ো শার্সি আঁটা জানলা দিয়ে সেদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে সময়ের জ্ঞান লোপ পায়। সংবিৎ ফেরে গাড়ি মালমো স্টেশনে এসে ঢুকলে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াই। চেয়ে দেখি শহরটার দিকে। স্কোনে কাউন্টির রাজধানী মালমো এমন একটি নগরী যার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে পরিবর্তনের জোয়ার। পরিবর্তনশীল যুগের সাক্ষী সে। সইতে হয়েছে তাকে ভিন্ন দেশের প্রভুর আধিপত্যের কশাঘাত। বইতে হয়েছে স্বভূমি বিচ্ছিন্নতার গ্লানি, ব্যবসায়িক অনটন। করতে হয়েছে শত্রু দেশকে আপন, একান্ত করে। আজ সে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে ওরেসুন্দ সেতু দিয়ে ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, যেখানে তার নাড়ির টান। সভ্যতা-সংস্কৃতির অদৃশ্য গ্রন্থি বাঁধা রয়েছে তার সে দেশের সঙ্গে।

সেই পরিবর্তনশীল রূপটি ধরা পড়ে মালমো স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালে। সাগরপারের নগরী মালমো, নর্থ সির ধারে। সাগর থেকে নানান ছোটো-বড়ো খাঁড়ি বা ক্যানাল ঢুকে গেছে শহরের ভিতর। বহু বহু আগে জলদস্যুদের কালে, জলপথে যুদ্ধ বাধলে এভাবেই মনে হয় তারা নগরীর ভিতরে খাঁড়ির আড়াল নিয়ে প্রতিপক্ষদের প্রতিরোধ করত। সেই ক্যানাল এখন সজ্জিত। সুন্দর লঞ্চ অপেক্ষা করছে তার ধারে। স্টেশনের বাইরের অংশটি আকর্ষণীয়, সাজানো প্রাচীন-নবীন সৌধ দিয়ে। স্টেশনের মূল বাড়ি ও আশপাশের কিছু ইমারত ১৩০০ থেকে ১৬০০ শতকের অর্থাৎ মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেখানে ড্যানিশ স্থাপত্যশিল্পের ছাপ সুস্পষ্ট। এই ড্যানিশ স্থাপত্য ও

স্টেশন চত্বর

উন্মুক্ত সাগর
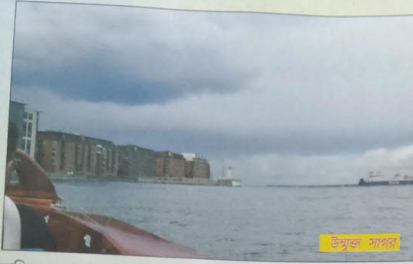
বাড়ির ধরন চোখে পড়ে মালমোর পাশাপাশি লুন্ড, ল্যান্ডস্ক্রোনার মতো অন্যান্য অঞ্চলেও। এই সমস্ত তেকোনা আকৃতির বাড়ি ও সৌধের গায়ে লাগা থাকে সবুজ সতেজ 'ক্রিপার্স' বা পরগাছার মতো। বসন্তের প্রাক্কালে তারা লাল ইট-পাথরের দেওয়ালে সবুজ পাতার আলপনা আঁকে, রঙিন করে রাখে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ঝাড়ে।

এই ক্যানেলের পাশের জায়গাটি খুব সাজানো। বাঁধানো চওড়া চত্বরের ওপর একটি বিরাট গোল পাথর-কাটা ডিজাইন করা আছে। খুবই সাধারণ কিন্তু অভিনব। তার গোল খালি অংশ দিয়ে ক্যানেলকে দূরান্ত পর্যন্ত দেখতে ভারী সুন্দর লাগে। এই আকৃতিটি একটি দুরবিনের চোখ দিয়ে যেন দেখায় ক্যানালটিকে। সেখানে বসে অনেকে ছবি তোলে। ছোটোরা গড়াগড়ি খায় ওই গোলাকৃতির ফাঁকে! সেখানে অল্পক্ষণ থেকে একটি বাস ধরি ও এগিয়ে যাই মালমো ক্যাসেলের দিকে।

বলাই বাহুল্য যে মধ্যযুগীয় এই দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল ডেনমার্কের রাজা এরিকের হাতে, ১৪৩৪ সালে। তারপর সময়ের সঙ্গে তাকে ঘিরে ভাঙা-গড়ার খেলা চলে । অন্যান্য বহু দুর্গের মতো একসময় অর্থাৎ ১৮২৮ পর্যন্ত, তা ব্যবহৃত হয় বন্দিশালা হিসেবে। তারপর মালমো! সুইডেনের আওতায় এলে তার ভাগ্য লিখিত হয় নতুনভাবে। আজ 'মালমো হুস' বা মালমো ক্যাসেলের ভয়াবহতার কালিমা মুছে দিয়ে তাকে পরিবর্তিত করা হয়েছে একটি মিউজিয়ামে। সেখানে উত্তর মেরুপ্রান্ত দেশের রেনেসাঁস যুগ থেকে সাম্প্রতিক কালের শিল্প নিদর্শনগুলি সাজানো আছে। তা ছাড়া রয়েছে দক্ষিণ সুইডেন অঞ্চলের বহু হস্তশিল্প সামগ্রী ও কারুকাজ করা আসবাবপত্র।

সমস্ত জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পনেরো শতাব্দীর মধ্যযুগীয় কেল্লাটি একটি কৃত্রিম জলাশয় বা moat দিয়ে ঘেরা। ঢাকা নিশ্ছিদ্র লাল খোপকাটা নিরেট প্রাচীর দিয়ে, যেখানে আলো-বাতাসের বিশেষ প্রবেশ নিষেধ। এইজাতীয় দুর্গকে ওরা 'সিটাডেল' বলে। একই ধরনের সিটাডেল দেখেছিলাম এই স্কোনে অঞ্চলের আরেক শহর ল্যান্ডস্ক্রোনারে। এরপর একটা বোট রাইডে যাওয়ার ছিল। কিন্তু তখনো হাতে সময় আছে দেখে কিছু খাওয়ার উদ্দেশ্যে ডাউনটাউন বা সিটি সেন্টারের দিকে হাঁটা দিলাম।

চিরদিনই বড়ো শহরের তকমা নিয়ে থেকেছে মালমো। আগে ছিল ডেনমার্কের আওতায়, এখন সুইডেনের বৃহৎ নগরী সে। আগে ডেনমার্কের অঙ্গ হলেও সুইডিশ বড়ো নগরীর বিশেষত্ব চোখে পড়ে মালমোতেও। অন্য দুটোর মতো এ নগরীটিও সাগরতীরে আর যুক্ত অজস্র খাঁড়িকাটা ক্যানাল দিয়ে। এ ছাড়া সিটি সেন্টার ব্যতীত কিছু দূর অন্তর অন্তর কবলস্টোন বসানো চৌকো বড়ো বড়ো উঠোনের মতো আছে। সেইসব 'প্রাসা'কে ঘিরে রেখেছে বাইরে চেয়ার-টেবিল পাতা অজস্র ছোটো-বড়ো কাফে, রেস্তোরাঁয় ও ইট, কাঠ, পাথর দিয়ে তৈরি বাড়িতে, যাকে ওরা Half timbered house বলে। এদেরই পাশাপাশি কিছু বড়ো বড়ো মধ্যযুগীয় ইমারতও আছে। রয়েছে মাঝখানে বসানো সে যুগের রাজার বিরাট প্রতিমূর্তি। তেমনই এক প্রাসার ম্যাকডোনাল্ডে ক্ষুধা নিবারণ করি ও সময় ঘনিয়ে আসছে দেখে হাঁটা দিই বোট স্টেশনের দিকে।

'মালমো' নামের অর্থটিও অদ্ভুত। এ নামের মানে হল 'Ground up maiden'। কী জানি কী হয়েছিল ষোলোশো সালে যা কিনা গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিয়েছিল কোনো অজানা তরুণীকে! সেই নৃশংস-কাণ্ডের প্রস্তর-খণ্ডটি প্রোথিত হয়েছিল টাউন স্কোয়ারে ১৫৩৮ সালে, যা কিনা এখনো আছে। কালের প্রবাহে বেড়ে উঠেছে মালমো, নিয়েছে মহানগরীর রূপ। শুধু নামটুকু রয়ে গেছে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে অভিনবরূপে বেড়ে উঠেছে মালমো। রেনেসাঁসের কারুকার্যে উজ্জ্বল স্থাপত্যের পাশে তার ঝকমকে আধুনিক ইমারতের সারি দেখে থমকে দাঁড়াতে হয়। এমনই এক অতি আধুনিক স্থাপত্য-শিল্পের নাম 'টার্নিং টরসো'। এটি বেঁকানো ধাঁচে তৈরি একটি ১৯০ মিটার বা ৬২০ ফুট উচ্চতার আকাশচুম্বী বিল্ডিং যা মালমোর প্রতীকী-চিহ্ন রূপে খ্যাতি লাভ করেছে। বাড়িটিকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন তাকে ডানদিকে প্যাঁচে প্যাঁচে ঘুরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সে তেমনিভাবে।

বোট স্টেশনে এসে দাঁড়াই। ততক্ষণে বেশ কিছু লোক জমা হয়েছে। বেশির ভাগ ওদেশীয়। সরু লম্বা মতো বোট, অনেকটা বড়ো ডিঙি নাও-এর মতো, ওপরটা খোলা; কিন্তু দাঁড়ে নয়, মেশিনে চলে। টিকিট কেটে সকলে জড় হলে বোট ছেড়ে দিল। আমি গিয়ে বোটের একপাশের ধারের চেয়ারে বসলাম। বোটের কানার পাশেই জল, হাত বাড়িয়েই তাকে স্পর্শ করতে পারছিলাম। আমার সামনেই পাটাতনে বসলেন এক বিদেশিনি মাইক্রোফোন হাতে, আমাদের গাইড হয়ে। মধ্যবয়স্কা মহিলাটির চেহারা ও কথা বলার ধরন দেখে বুঝলাম যে ইনি সুইডিশ নন, ব্রিটিশ। বহুকাল হয়তো আছেন সুইডেনে তাই অনর্গল সুইডিশ বলেন। আবার ইংরেজিও বলেন যথেষ্ট কায়দায়। বোট স্টেশন থেকে ধীর পদে বোট এগোতে লাগল। গাইড মহিলা বলতে লাগলেন জলপথের ধারে সাজানো মালমো শহরের বৃত্তান্ত, উভয়ত সুইডিশ ও ইংরেজি ভাষাতে। আরম্ভ হল আমাদের নৌ-বিহার মালমো নগরীকে কেন্দ্র করে, স্ট্রোমা কম্পানির বোটে।

প্রকৃত অর্থে এই নরডিকেরা তো জলদস্যুদেরই বংশধর। তাই মনে হয় আজ এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এদের নাড়ির টান রয়ে গেছে জলাশয়ের সঙ্গে। জলপথে নগর পরিদর্শন আরম্ভ হল। পেরিয়ে যেতে লাগল বাগান, পার্ক, নবীন-প্রাচীন ইমারতগুলো। কোথাও ক্যানেল প্রসারিত হয়েছে তো কোথাও সংকুচিত। অল্প অল্প দূরত্বেই সেতুর তলা দিয়ে যেতে হচ্ছিল তাকে। তখন সাবধান করছিল গাইড। কখনো কখনো তো পাটাতনে বসা গাইডকেও মাথা নীচু করে নিতে হচ্ছিল, আঘাত সামলাতে। 'নোরা ভ্যালগাটেন' থেকে ছেড়েছিল বোট। মোট পঞ্চাশ মিনিটে ঘুরিয়েছিল পুরোনো-নতুন মিলিয়ে মালমোর একটি বড়ো অংশ। নিয়ে গিয়েছিল সেইসব দিকে, যেখানে গাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়।

পুরোনো মালমো ঘোরার সময় পেরিয়ে যাই kungsparken বা The King's Park নামের প্রায় সাড়ে আট একরের বিস্তৃত একটি বাগান। তার সাজানো লনের ধারে বসে লোকে বিশ্রাম নিচ্ছে, পিকনিক করছে। সুন্দর সুন্দর পার্কের জন্য মালমো বিখ্যাত। এরপর পেরোয় মালমো ক্যাসেলের দুর্গ-প্রাচীরের একাংশ। এইভাবে মালমো বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির মতো আরো কিছু ছোটো-বড়ো ইমারতকে পার করে বোট এসে পৌঁছয় মালমো বন্দরে অর্থাৎ উন্মুক্ত সাগরে। বড়ো বড়ো ঢেউ এসে লাগতে থাকে আমাদের ডিঙি-আকৃতির লঞ্চে, জলচ্ছটা এসে লাগে গায়ে। সেখানে বড়ো বড়ো জাহাজদের আনাগোনা। গ্রীষ্মের সুন্দর সকালে সেখানে কেউ উইন্ড সার্ফিং করছে তো কেউ করছে কয়াকিং। কেউ বা নিজস্ব স্পিড বোটে ঝড়ের বেগে ছুটে যাচ্ছে নর্থ সির নীল বুক চিরে। বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, অতঃপর বোট ঘুরে আবার নতুন ক্যানাল পথে ঢোকে। এখানে সর্বদাই মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। নৌবিহার কালে হঠাৎ একটু বৃষ্টি আসে। কী করে ক্যামেরা বাঁচাব ভাবছি। এমন সময় গাইড আমাদের সকলকে লাল পাতলা প্লাস্টিকের রেইন-কোটের মতোন জিনিস দিলেন। সেই প্লাস্টিকের চৌকো sheet-এ দেখি মাথা ও হাত ঢোকানোর ব্যবস্থা আছে। বৃষ্টি থেকে তাৎক্ষণিক বাঁচার উপায় আর কী! প্রবল হাওয়ার দাপটে হাত-মাথা গলিয়ে আমি কোনোরকমে ক্যামেরাটাকে ঢাকি। কিন্তু অল্পক্ষণেই শীতের দেশের ঝুরঝুরে বৃষ্টি থেমে যায়। বোট যাত্রা সাঙ্গ হলে দেখি সবাই ওই বর্ষাতিগুলো মুড়ে গারবেজ বক্সে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। আমিও তাদের দেখাদেখি তাই করি।

মালমো এমন এক নগরী যার দেশ পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত হয়েছে যার ভাগ্য। কিন্তু তবু সে হারায়নি, হয়নি ভূলুণ্ঠিত। বরং কালের প্রবাহে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। এককালে যা ছিল ডেনমার্কের গৌরব আজ তা জয়ের তিলক এঁকে দিয়েছে সুইডেনের কপালে। সুইডিশ ও ড্যানিশ শিল্প-সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটিয়ে ঝলমলে সাজে সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে ওরেসুন্দ সেতুকে স্পর্শ করে, নর্থ সি-র ধারে।

সম্পূর্ণ উপন্যাস
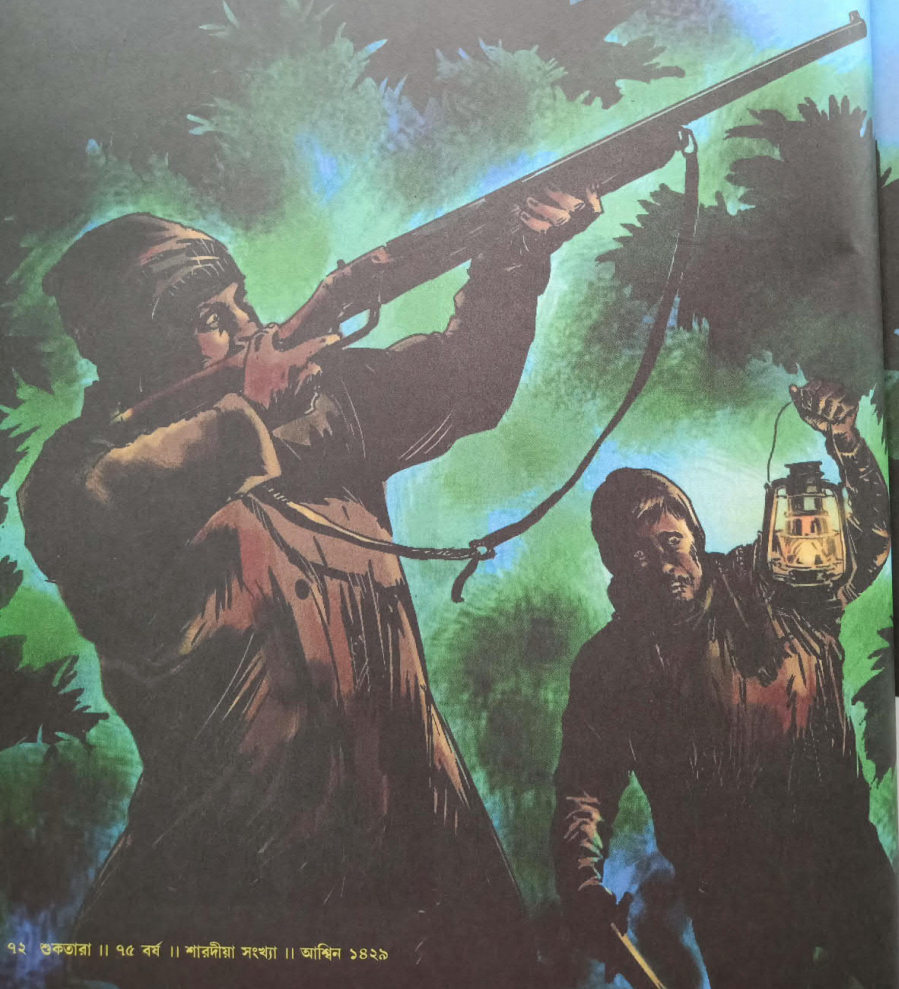
ধবলকুণ্ডের ভয়ংকর

সায়ন্তনী পূততুন্ড

১

সামনে ঘন সন্নিবিষ্ট পাইন গাছের সারি পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠে গিয়েছে। চড়াই-উতরাই পথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে গহিন অরণ্য। চাঁদের হাল্কা আলো গাছের মাথায় পড়ে চিকচিক করছে। কিন্তু তা উপস্থিত অন্ধকারকে দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। রুপোলি আলোয় যতটুকু আবছা আবছা দেখা যায় ঠিক তার পরেই নিকষ কালো আঁধারের রাজত্ব শুরু হয়েছে। অরণ্যের প্রতিটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে, ঝোপঝাড়ের চতুর্দিকে শিকারির মতো ওত পেতে আছে অন্ধকার। দেখলেই মনে হয়, হয়তো বা এই অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কোনো এক হিংস্র দানব। একটু অন্যমনস্কতার সুযোগ পেলেই গোটা অরণ্যকে দলিত মথিত করে বেরিয়ে আসবে!

চতুর্দিকে এখন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে আছে। চারদিক থমথম, নিঃঝুম। আস্তে আস্তে কুয়াশা গোটা অরণ্যকে অধিকার করে নিচ্ছে। অন্ধকার ও চাঁদের অস্ফুট আলোর সঙ্গমে কুয়াশাকে কেমন হালকা নীলাভ বলে মনে হয়। পাতলা চাদরের মতো আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে গোটা জঙ্গলটাকে। প্রেক্ষাপট এখন ধোঁয়া ধোঁয়া। তার মধ্যেই টুপ টুপ করে জ্বলছে বিন্দু বিন্দু আলো। জোনাকিরা নরম সবুজাভ আলোর সংকেত দিচ্ছে। কখনো জোরালো জ্যোতিতে জ্বলছে, কখনো বা মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। আশেপাশেই সম্ভবত বুনোগোলাপের ঝাড় রয়েছে। তার গন্ধে গোটা অরণ্য ভরপুর। নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু কখনো কখনো টুপটাপ পাতা ঝরার শব্দ শোনা যায়, কখনো বা ঝরা পাতার ওপর দিয়ে কোনো জন্তুর মচমচ করে চলে যাওয়ার আওয়াজ। দূর থেকে পিণ্ডর নদীর খলখল ছলছল ধ্বনিও ভেসে আসছে। দ্রুতগামী নদী পাথরে পাথরে প্রতিহত হতে হতে নিজের খেয়ালেই ছুটে চলেছে।

ছোটেলাল আকাশের দিকে তাকাল। তার মুখে স্পষ্ট চিন্তার ছাপ। অন্যান্য দিন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কারই থাকে। যখন ওরা বেরিয়েছিল তখনো আকাশ সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত ছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেকটাই পালটে গিয়েছে। আকাশে এখন থরে থরে কালো মেঘ জমেছে। পাহাড়ি এলাকার আবহাওয়া এরকমই খামখেয়ালি। এই রোদ ঝলমল করছে তো পরক্ষণেই চতুর্দিকের সমস্ত দৃশ্যকে লেপে পুঁছে দিয়ে জোরদার বৃষ্টি নামল! আর একবার বৃষ্টি নামলে তো থামারই নাম নেয় না! তার সঙ্গে ঠান্ডা কনকনে হাওয়া পাল্লা দিয়ে বইতে থাকে!

'হোই!' পেছন থেকে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে এল—'কী হাল হরিয়ান?'

অর্থাৎ, কী পরিস্থিতি! ছোটেলাল চিন্তিত মুখে বিরজুদাদার দিকে তাকায়—'পরিস্থিতি ভালো নয় দাদা। আজ বারিশ হোবে সকুঁ। বৃষ্টি হবে। হয়তো পাহাড়ের অন্যদিকে চালুও হয়ে গিয়েছে। আমি গন্ধ পাচ্ছি।'

বিরজুদাদা নিরুত্তাপ মুখে তার কথা শুনল। এমনই কপাল যে আজই বৃষ্টি হতে হবে! এতদিনের সমস্ত প্রস্তুতি কি তবে শেষ পর্যন্ত জলেই যাবে! তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। না, এত সহজে হাল ছাড়বে না। আজ রাক্ষসটাকে দেখে নেবে সে। বহুদিন ধরে তার অত্যাচার সহ্য করছে গ্রামবাসীরা। তার প্রচণ্ড ক্ষুধার মাসুল গুনে চলেছে তারা! এক এক করে প্রায় একশোর কাছাকাছি নিরীহ তাজা প্রাণ চলে গিয়েছে! কেউ বন্ধুকে হারিয়েছে, কেউ নিজের সন্তানকে—অথবা কেউ বা আবার মা-বাবাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে। শয়তানটার তাণ্ডবে গ্রাম প্রায় খালি হতে বসেছে। বাচ্চা থেকে বুড়ো—কেউ তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি! প্রাণের দায়ে লোকেরা ভিটে, মাটি, বসতবাড়ির মায়া ছেড়েছুড়ে এক কাপড়ে চলে গিয়েছে অন্যত্র। গোটা গ্রাম পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতো শুধু পড়ে পড়ে দেখেছে এই সর্বনাশ!

অনেক হয়েছে! আজ এস্পার কি ওস্পার! সে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে জঙ্গলটাকে জরিপ করতে থাকে। এই রহস্যময় ধোঁয়াশার মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে সেই পিশাচ! ওত পেতে অপেক্ষা করছে শিকারের। কে জানে তার রূপ কেমন! আদৌ কি সে কোনো চতুষ্পদ জাগতিক প্রাণী? না শয়তানের প্রতিমূর্তি! কেমন দেখতে তাকে? সাধারণ বাঘ বা লেপার্ড জাতীয় কিছু? না কিংবদন্তি অনুযায়ী ভড়মানস বা মনুষ্যরূপী নেকড়ে! এখনও পর্যন্ত কেউ তাকে স্পষ্টভাবে দেখেনি। যারা দেখেছে, তারা আর বর্ণনা করার জন্য বেঁচে ছিল না। বাকিরা বিক্ষিপ্তভাবে একেকজন একেকরকম বর্ণনা করেছে। কেউ বলেছে, সে নাকি চারপেয়ে পিশাচ! অন্ধকারে তার চোখ আগুনের মতো ধকধক করে জ্বলে! কেউ বা বলে, আসলে সে কোনো জন্তুই নয়! তার মাথাটা জন্তুর, কিন্তু শরীরটা মানুষের। চতুষ্পদের মতোই গুঁড়ি মেরে চলে বটে, কিন্তু প্রয়োজনে সোজা হয়েও দাঁড়াতে পারে! আবার কারোর বক্তব্য, সে না মানুষ, না পশু। আদতে সে জাগতিক কোনো প্রাণীই নয়। রক্তমাংসলোভী এক অশরীরী! তার ছায়া আছে, কায়া নেই!

আসলে যে সে কী, তা আজও অজানা। কেউ তাকে দেখেনি। রাতের অন্ধকারে সে চুপিচুপি আসে, চুপিচুপি চলে যায়। কোথা থেকে আসে আর কোথায় যে যায়—তা কেউ জানে না! এমনকি কখন আসে, কীভাবে আসে, কী করে বিন্দুমাত্র শব্দও না করে সে কার্যসিদ্ধি করে ফেলে—তাও মানুষের বুদ্ধির বাইরে। আজ পর্যন্ত যত মানুষকে সে মেরেছে, তারা কেউ টুঁ শব্দটি করার সুযোগটুকুও পায়নি—চিৎকার তো দূর!

বিরজুদাদা আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে—'আমি ওকে দেখতে চাই! ওর মুখোমুখি হতে চাই!'

কথাটা শুনেই প্রমাদ গুনল ছোটেলাল। সামনের অন্ধকার অরণ্যর দিকে তাকালেই তার বুক কাঁপছে। কে জানে এর ভেতরে কী লুকিয়ে আছে! আর কার সঙ্গেই বা পাঞ্জা কষতে চায় বিরজুদাদা! মানুষ বা জানোয়ার হলে তবু কথা ছিল। কিন্তু এ যে সাক্ষাত পিশাচ! রক্তমাংসলোলুপ আত্মা! এর সঙ্গে পেরে উঠবে কী করে বিরজু! তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছিন্নভিন্ন কতগুলো মানবশরীর! কারোর পেট থেকে উরু অবধি মাংস খুবলে খুবলে খাওয়া হয়েছে, কারোর বা দেহের একদিকই নেই! বেশির ভাগ দেহেরই শরীরে মাংস বিশেষ অবশিষ্ট ছিল না। আর চতুর্দিকে রক্ত আর রক্ত...উঃ!

ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ছোটেলালের। সে কাঁপা গলায় বলে—'আল্লে না বিরজুদাদা। আজকে থাক। এমনিতেই বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। তার ওপর 'বারিশও' হবে মনে হয়। অন্য কোনোদিন না হয়...!'

'অভি নেহি তো কভি নেহি।'

বিরজুর চোয়াল শক্ত। কণ্ঠস্বরে স্পষ্ট দৃঢ়তা। হাবেভাবেই বোঝা যায় যে এত সহজে ছেড়ে দেবে না। একেই এই গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান সে। গ্রামের মানুষের সুরক্ষার দায়িত্ব তারই। এবং বহুবছর ধরে নিজের কর্তব্য সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছে। গ্রামবাসীরা তাকে যেমন ভয় পায়, তেমন ভালোও বাসে। সেই

কর্তব্যনিষ্ঠ, স্বভাবে ডাকাবুকো মানুষটা চোখের সামনে একের পর এক ভয়াবহ মৃত্যু দেখছে, অথচ তার কিছু করার নেই—এর থেকে বড়ো অসহায়তা বোধহয় আর কিছু হতে পারে না।

হাতের রাইফেলটা শক্ত করে ধরল বিরজু। এটা তার অতি বিশ্বস্ত পয়েন্ট টু-সিক্সটি-ফাইভ ম্যানলিকার। শিকারি হিসাবে এ তল্লাটে তার বেশ নামডাক আছে। ছোটোবেলা থেকেই এ অরণ্যের পথেঘাটে, চড়াই-উতরাইয়ে, পাকদণ্ডিতে ঘুরে বেড়িয়েছে। পাহাড় ও জঙ্গলের প্রতিটা মোড়, প্রতিটা বাঁক তার পরিচিত। হাতের নিশানাও অব্যর্থ। ছুটন্ত বুনো শুয়োরের চোখেও সে গুলি মারতে পারে। আকাশে উড়ন্ত হাঁসের বুকে বিঁধিয়ে দিতে পারে বুলেট। এত সহজে তাকে ফাঁকি দেবে শয়তানটা! মানুষ হোক, কী জানোয়ার—অথবা কোনো পিশাচ, আজ এর শেষ দেখেই ছাড়বে বিরজু।

'চল।'

সে আর কোনো কথা না বাড়িয়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরল। উপায়ান্তর না দেখে ছোটেলালও অরণ্যের 'দেও'-কে একটা নমস্কার ঠুকে পা বাড়ায়। তার এক হাতে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, অন্যহাতে তরোয়াল। কিন্তু তাতেও মনে স্বস্তি নেই। সবাই বলে রাত্রিবেলা এ অরণ্যে দানো, পিশাচ, ভূত, পেতনি ঘুরে বেড়ায়। এমনকি জিন, জিন্নাতের উপস্থিতিও টের পেয়েছে অনেকেই। ঈশ্বর জানেন আজ কার খপ্পরে পড়তে হবে! যেখানে এই চরম সঙ্কটে সন্ধে নামার আগেই গ্রামের অবশিষ্ট মানুষজন দোরে হুড়কো এঁটে দেয়, বাইরে যাওয়ার নামও নেয় না—সেখানে এই গভীর রাতে তারা দুজনে অন্ধকার অরণ্যে ঢুকতে চলেছে! কে জানে এর পরিণতি কী হবে! একমাত্র অরণ্যের দেবতাই তাদের রক্ষা করতে পারেন।

অরণ্য যেন ভয়ংকর একটা হাঁ করে ছিল। তারা দুজনেই নীরবে বনপথ ধরে এগিয়ে চলল। পায়ের নীচে পাইন ফল, শুকনো গাছের পাতা খচখচ, মচমচ করে উঠছে। অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ। যেন ঘন জঙ্গলের মধ্যে কেউ আলতো করে আঁচড় কেটে দিয়েছে। বহুদিন ধরে মানুষ ও পশু যাতায়াত করতে করতে একটা ছোট্ট পথ পেড়ে ফেলেছে। একজনের বেশি দুজন পাশাপাশি চলতে পারে না। দু-দিকে সারি সারি গাছ যেন আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমে মগ্ন। তাদের ছায়া ছায়া দেহ দৈত্যের মতো অভ্রভেদী অহংকারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাছগুলোর মাথার ওপরে মাঝেমধ্যেই চিড়বিড়িয়ে উঠছে বিদ্যুৎরেখা। থেকে থেকে হু হু করে জোরালো হাওয়া এসে ঝাপটা মারছে। সেই হাওয়ার ধাক্কায় গাছেরা মাথা দোলাচ্ছে। দেখলে মনে হয়, কোনো দানব বুঝি অরণ্যকে আলোড়িত করে বেরিয়ে আসতে চায়। সে বেরিয়ে আসবে!...এখনই বেরিয়ে আসবে...!

লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো পথটুকুকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে করতেই হারিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারে। সামান্য যেটুকু পিঙ্গল আভা ছেড়ে যাচ্ছিল, তাতেই আবছা আবছা রাস্তা দেখা যায়। সে পথ সহজ নয়। প্রতি পদে পদে পাথর ও কাঁটাঝোপ এড়িয়ে চলতে হচ্ছে। তার ওপর আবার অনেকখানি চড়াই। বুনোগোলাপের ঝোপ মহীরুহকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরে আছে। তার লাল-সাদা পাপড়ি পাথুরে পথের ওপর ঝরে পড়েছে। গোটা অরণ্য এখন নিস্তব্ধ! আশ্চর্য! কোনোরকমের পাখি বা জন্তুর আওয়াজ নেই! এত নৈঃশব্দ্য, এত অন্ধকার যেন গলা টিপে ধরে! শুধু এখনও পিণ্ডর নদীর কলকল ধ্বনি ভেসে আসছে। আজন্ম পরিচিত আওয়াজটা এখন কেমন যেন অলৌকিক ঠেকছে। নদী বুঝি মুখর হয়ে বলছে—ফিরে যাও...ফিরে যাও...!

ছোটেলাল একবার লণ্ঠনের আলোয় চারদিকটা দেখে নিল। গোটা পৃথিবী এখন ঘুমে মগ্ন। দূরবর্তী পাহাড়গুলোতেও অন্ধকারের রাজত্ব। বিশালকায় নগাধিরাজ যেন চুপ করে কোনো ঘটনার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। নিকটবর্তী গ্রামগুলোতেও কোথাও আলোর লেশমাত্র নেই। একটু আগেও লণ্ঠনের বিন্দু বিন্দু আলো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখন শুধু অন্ধকার। তার দমবন্ধ হয়ে আসে। কে জানে, কোন দিক দিয়ে আসবে মৃত্যুদূত! নিজেদের পদধ্বনিতেই মাঝেমধ্যে ভয় পেয়ে যাচ্ছে সে। কে বলতে পারে, ওদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হয়তো নিঃশব্দে পিছন পিছন আসছে কেউ! সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে!

'রাম রাম রাম।'

মৃদুস্বরে রামনাম জপ করছিল ছোটেলাল। তার বুকের ভেতরে কেউ যেন হাতুড়ি পিটছে। উত্তেজনায় শিরার মধ্যে রক্তের চাপ ক্রমাগতই বাড়ছে। সমস্ত স্নায়ু টানটান। এখনই এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলে হয়তো সে বাঁচত। কিন্তু বিরজুদাদাকে একলা ফেলে কোথাও যেতে পারবে না। ছোটেলাল ভিতু হতে পারে, কিন্তু বেইমান নয়।

আচমকা বনের নির্জনতাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়ে একটা জোরালো আর্তচিৎকার ভেসে এল। মাথার ওপরে ঝটপট শব্দ! ছোটেলাল দেখল একজোড়া জ্বলন্ত চোখ গাছের আড়াল থেকে তার দিকেই দেখছে! সে কী পৈশাচিক চোখ! দপ দপ করে জ্বলছে! সে দৃষ্টি ভীষণ নৃশংস! কোনো দয়া নেই, মায়া নেই! অসম্ভব নিষ্ঠুর!

'ও কী! ও কী!'

ছোটেলাল প্রায় লাফিয়েই ওঠে। সঙ্গে সঙ্গেই সারা বন কাঁপিয়ে আবার সেই ভয়াবহ চিৎকার! যেন কোনো অতৃপ্ত আত্মা প্রবল যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে! ছোটেলালের মনে হল, সে এখনই অজ্ঞান হয়ে যাবে। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। হাতের তরোয়ালটাও পড়ে গেল মাটিতে। যে কোনো মুহূর্তে সেই বিভীষিকা এসে দাঁড়াবে ওদের সামনে। আজকেই তার শেষ দিন...!

'আরে আ-ঢ়ি-য়া-থা!' বিরজু কিন্তু একটুও ভয় পায়নি। বরং বেশ বিরক্ত হয়ে বলল—'বে-ও-কু-ফ কোথাকার! ও তো উল্লু! এমন করছিস যেন উল্লুর ডাক জীবনে শুনিসনি!'

বিরজু বলতে না বলতেই আবার মাথার ওপর একটা ঝটপট শব্দ! পরক্ষণেই একটা প্যাঁচা মহাগম্ভীর মুখে এসে গাছের ডালে বসল। তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখলেই ভয় করে। গোল মুখ, তীক্ষ্ণ নাক ভীষণ নিষ্ঠুর। আরেকবার ডানা ঝটপটিয়ে, ছোটেলালকে আরও একটু ভয় দেখিয়েই সে উড়ে গেল। এখন তার শিকার ধরার সময় হয়েছে।

হঠাৎ কড় কড় করে একটা জোরালো শব্দ। পরক্ষণেই গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ। ছোটেলাল ও বিরজু—দুজনেই শুনতে পেল পাতার ওপর জল পড়ার টপটপ ও হাওয়ার সাঁই সাঁই আওয়াজ। বৃষ্টি অরণ্যের উত্তরদিক থেকে ভেজাতে ভেজাতে আসছে। তার আসার ঝমঝম-টুপটাপ স্পষ্ট শোনা যায়। বিদ্যুতের তরোয়াল কড়কড়িয়ে যেন গোটা আকাশকেই চিরে দিল। মুহূর্তে মুহূর্তে ঝলসে ঝলসে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে! এদিকে কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। অরণ্যের পাতায় পাতায়, ঘাসে, শষ্প-গুল্মে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি বিন্দু। নীরব অরণ্যে বৃষ্টি যেন জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। ভেজা ঘাস, ঝোপঝাড়ের বুনো গন্ধ নাকে এসে ঝাপ্টা মারল। পাথুরে জমিতে জল পড়ে রাস্তাকে করে তুলেছে পিছল। তার সঙ্গে কনকনে হাওয়া!

ছোটেলাল তখন রীতিমতো কাঁপছিল। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা শীতে। একেই সে ভিজে গিয়েছে। তার ওপর উত্তুরে বাতাস তার দেহে তীক্ষ্ণ কামড় বসাচ্ছে। বৃষ্টির দাপটে চতুর্দিক এখন নীলচে ধোঁয়া ধোঁয়া। 'কোহরা' আগেই ছিল। এখন প্রায় কিছুই ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না! ঝড়ের ধাক্কায় পাইনবনে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। যে গাছগুলো চারাগাছ এবং নমনীয়—তারা বারবার মাটির দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে। আর বিরাটদেহী মহীরুহরা টিঁকে থাকার জন্য প্রবল সংগ্রাম চালাচ্ছে। গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে, পাইনবনকে কাঁপিয়ে, ঝাঁকিয়ে দিয়ে শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বয়ে চলেছে। সে শব্দ শুনলে রীতিমতো ভয় হয়!

'বিরজুদাদা, আজ থাক না।' মরিয়া হয়ে বলল ছোটেলাল—'এর মধ্যে কিছুই ঠিকমতো দেখা যাবে না! সে চিতা হোক, কী ভেড়িয়া হোক বা ভেড়মানস! দেখতে না পেলে টিপ করে মারবে কী করে?'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। এই প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে শিকার করা সম্ভব নয়। এবং যার শিকার করতে ওরা এখানে এসেছে, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। যতবারই সে আক্রমণ করেছে, এমন সতর্কভাবে ও নিঃশব্দে করেছে যা কোনো মামুলি জন্তুর পক্ষে সম্ভব নয়! যেখানে প্রতিপক্ষ অসম্ভব ধূর্ত ও সাবধানি সেখানে বিন্দুমাত্রও ভুলচুক করার জায়গা নেই। আর এই মুহূর্তে তো প্রকৃতিই বাদ সাধছে! পরিবেশ প্রতিকূল।

বিরজু একটু হতাশই হল। ভেবেছিল আজ ব্যাপারটার হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বে। কিন্তু উপায় নেই। যেরকম আছাড়ি-পিছাড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে সহজে থামবে বলে মনে হয় না। এমন বর্ষণমুখর রাতে শিকার করা মুশকিল। তাও যদি জানত যে কী জিনিস শিকার করতে চলেছে, তবু কিছুটা সুবিধা হত। কিন্তু ওরা জানেই না যে জন্তুটা আসলে ঠিক কী!

'একবার ধবলকুণ্ডের দিকটা দেখে যাই।'

বিরজুও আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছিল। শীতও করছে। ভেজা কাপড়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তবু সে নাছোড়বান্দার মতো বলল—'বেরিয়েছি যখন তখন একবার দেখতে ক্ষতি কী?'

ছোটেলাল কী বলবে ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত বিরজুর গোঁয়ার্তুমির মাশুল না গুনতে হয়! একেই অন্ধকার, তার ওপর তুমুল বৃষ্টি। এর মধ্যে জন্তুটাকে খুঁজতে যাওয়ার অর্থ মৃত্যুকে ডেকে আনা। কে জানে, এই গহন অরণ্যের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে বসে আছে সে! হয়তো ক্রূর সবুজাভ চোখে আড়াল থেকে তাদেরই দেখছে! হিংস্র লালসায় ঠোঁট চাটতে চাটতে নিঃশব্দ পৈশাচিক হাসিতে ভেঙে পড়ছে। অপেক্ষা করছে, কখন ওদের গলায় দাঁত বসাবে!

'চল।'

বিরজু বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে এগিয়ে যায়। ছোটেলাল উপায়ান্তর না দেখে তার পেছন পেছন গেল। ধবলকুণ্ডের নাম শুনেই তার হৃৎকম্প হচ্ছিল। সবাই বলে, পিশাচটা নাকি সেখানেই থাকে। দিনের বেলা যে মেয়েরা কুণ্ড থেকে জল আনতে যায়, তারা নাকি তার চাপা গর্জন বেশ কয়েকবার শুনেছে। দু-একজন আবার ঘাসবনের মধ্যে একটা আন্দোলনও লক্ষ করেছে। মনে হয়েছে, যেন বড়ো কিছু একটা দ্রুত সরে গেল ঘাসবনের ভেতর দিয়ে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, দিনের বেলায় শয়তানটার দেখা পাওয়া যায় না। সূর্যালোকে নিজেকে প্রকাশ্যে আনতে হয়তো তার আপত্তি আছে। তাই সূর্যাস্তের পর থেকেই তার আতঙ্কে কাঁপতে থাকে ধবলকুণ্ডের আশেপাশের সমস্ত গ্রাম। সন্ধে নামতে না নামতেই সবাই ঢুকে পড়ে নিজেদের আশ্রয়ে। দরজায় কুলুপ এঁটে ভাবতে থাকে, আজ কার পালা!

বর্ষার জলে পাথুরে পথ বেশ খানিকটা পিছল হয়ে গিয়েছে। তার ওপর পথ বেশ এবড়ো-খেবড়ো। যেটুকু মাটি ছিল তা এখন প্যাচপ্যাচে কাদায় পরিণত হয়েছে। দু-এক জায়গায় ছোটো ছোটো ডোবায় জলও জমেছে। পথ ক্রমশ সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। তার মধ্য দিয়েই দুটো মানুষ এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে।

ধবলকুণ্ড জায়গাটা দিনের বেলায় বেশ মনোরম। স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ ঝিলকে চতুর্দিক দিয়ে বেষ্টন করে আছে গাছের সারি। ফাঁকে ফাঁকে রং মিলিয়েছে সাদা প্রজাপতি, অর্কিড। তার চারপাশে প্রায় কোমর ছোঁয়া ঘাসবন। আশেপাশে বুনো 'রসভরি'র ঝোপও রয়েছে। সকালে ও সন্ধ্যায় এখানে প্রাণীরা জল খেতে আসে। গরু-ছাগলও চরে। ধবলকুণ্ডের জল অত্যন্ত ঠান্ডা ও মিষ্টি বলে মেয়েরা এখান থেকেই পানীয় জল সংগ্রহ করে।

কিন্তু রাতের দৃশ্যটা একেবারেই অন্যরকম। ধবলকুণ্ডের জলে প্রবল বর্ষণের ফলে আলোড়ন উঠেছে। তরঙ্গে তরঙ্গে জল এখন অশান্ত। ঝিলের জলে বৃষ্টিপতনের ঝমাঝম শব্দ। গাছের সুনিবিড় ছায়া যেন কালো কালিতে আঁকা কোনো ছবি। একটা ময়না গাছ ঝিলের জলের দিকে ঝুঁকে আছে। আশ্চর্য! গাছটায় কোনো পাতা নেই! কতগুলো শুকনো শাখাপ্রশাখাই সার! গাছ নয়—যেন গাছের কংকাল! গভীর ঘাসবন নীরবে স্থির হয়ে আছে। তার মধ্যে কোথাও কোনো দোলাচল নেই। অদূরেই শৈলশিরার ছায়াদেহ প্রকট। প্রাগৈতিহাসিক দানবের মতো অতিকায় ও সুবিশাল কায়া ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে সে। আকাশে এখনও ঘন মেঘ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণই নেই!

বিরজু সতর্ক দৃষ্টিতে ধবলকুণ্ডের চারদিকটা একবার দেখে

নিল। আশেপাশে কোনো প্রাণী আছে কিনা বোঝা মুশকিল। অবশ্য এই বৃষ্টির মধ্যে কোনো বন্যপ্রাণীই এখানে আসবে না। তবু সাবধানের মার নেই!

'কিছু দেখতে পাচ্ছিস ছোটু?'

এলাকাটাকে ভালো করে জরিপ করতে করতে বলল বিরজুদাদা—'ঘাসবনে কিছু আছে বলে মনে হয়?'

ছোটেলাল উত্তর দিতে গিয়েও থমকে গেল। একটা মাংস পচা দুর্গন্ধ তার নাকে এসে ঝাপ্টা মেরেছে। এই গন্ধ সে চেনে! এর অর্থ, আশেপাশে কেউ আছে! কিছু আছে!

'ফি-য়া-ও...ফি—য়া—ও।'

শিয়ালের জোরাল ডাকে ওরা দুজনেই চমকে উঠল। এ যে বিপদসংকেত! সচরাচর শিয়াল এভাবে ডাকে না। কিন্তু যখনই এভাবে ডাকতে থাকে, তখনই বুঝতে হবে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। শিয়ালটা সম্ভবত বিপজ্জনক কিছু দেখেছে বা আঁচ করেছে। তাই সে গোটা অরণ্যকে সাবধান করে দিচ্ছে। যেন বলতে চাইছে—'সাবধান! সে শিকারে বেরিয়েছে!'

শিয়ালটা ক্রমাগত ডেকেই চলেছে। বিরজু রাইফেলটাকে আরও একটু শক্ত করে চেপে ধরল। ছোটেলালের মনে হল, তার হৃৎপিণ্ড বুঝি এবার থেমেই যাবে। তারা একেবারে নরখাদকের এলাকায় এসে পড়েছে! এখনও স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে কোথাও একজোড়া গনগনে চোখ ঠিকই আছে! তাদের ওপর নজর রাখছে! অনভিপ্রেত এক তৃতীয়পক্ষের উপস্থিতি প্রতি মুহূর্তে টের পাচ্ছে সে। অথচ কাউকেই দেখা যাচ্ছে না! কোথায় শয়তানটা? সে কি অদৃশ্য?

ঠিক সেই মুহূর্তেই কড় কড় করে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তার সঙ্গে সঙ্গেই কটাং করে একটা চিড় খাওয়ার শব্দ! বিরজু তড়িৎগতিতে পাতাবিহীন ময়না গাছটার দিকে ফিরল। ছোটেলাল ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল একটা কালো ছায়া দুরন্ত বেগে গাছ থেকে লাফ মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিরজুর ওপরে! কখন যে সে গাছে চড়ল, কখনই বা চুপিসারে ওদের দিকে এগিয়ে এল—কিছুই ওরা টের পায়নি! ভালো করে কিছু দেখা বা বুঝে ওঠার আগেই আকস্মিক আক্রমণ! সেই ভয়ানক জ্বলন্ত দুই চোখ! রক্তপিপাসু ধারালো দাঁতগুলো লণ্ঠনের আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে! শুনতে পেল পয়েন্ট টু সিক্সটি ফাইভ ম্যানলিকার সশব্দে ধমকে উঠেছে! কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই হাড় হিম করা একটা হিংস্র গর্জন আর বিরজুর চিৎকার!

'ছো—টু! ছো—টু!'

ছোটেলালের হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল! নিঃসীম অন্ধকার আবার ঘিরে ধরল তাকে। কয়েক মুহূর্ত ধস্তাধস্তির শব্দ! আরও একবার গর্জে উঠল রাইফেল! সম্ভবত এবারও লক্ষ্যচ্যুত হল! পরক্ষণেই বিরজুর মরণ আর্তনাদ গোটা জঙ্গলের নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল! শেষ! সব শেষ!

ছোটেলাল দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে উঠে দৌড়তে লাগল। সে ভুলে গেল যে তার হাতে একটা তরোয়াল আছে! এ-ও ভুলে গেল যে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতেই সে এসেছিল! কোনদিকে যাচ্ছে নিজেই জানে না! দৌড়তে দৌড়তেই দেখতে পেল—সেই ভয়ংকর দুটো চোখ আর ঘন কালো ছায়া তার পেছনে ধেয়ে আসছে!

কিছুক্ষণের নীরবতা! তারপরই নিস্তব্ধ জঙ্গল কেঁপে উঠল আরও একটা মানুষের আর্তনাদে!

আতঙ্ক কাকে বলে তা অস্থি-মজ্জায় টের পাচ্ছে গ্রামবাসীরা!

এমনিতেই পাহাড়ি জীবনে অনেকরকমের সমস্যা থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষের গ্রামের দুর্দশা নতুন করে বিশেষ কিছু বলার নেই। কখনো ধস নামছে, কখনো বা পাহাড়ি নদীর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে গ্রামকে গ্রাম! কোনো বছর আবার তুষারপাতে ফসল নষ্ট হয়ে দুর্ভিক্ষ নামছে। তার সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি তো লেগেই আছে। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়িই পাথরের, তাই ঝড়ে বাড়ি-ঘর উড়ে না গেলেও ফসলের ক্ষতি হয়। তার ওপর জঙ্গলের কাছাকাছি বসবাস করার ফলে বন্য জন্তুর মোকাবিলাও করতে হয় তাদের।

তবু এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। দুর্ভিক্ষ, মহামারি, খরা-বন্যার সঙ্গে সংগ্রাম করে টিঁকে ছিল এখানকার অধিবাসীরা। ইংরেজ সরকারের ঔদাসীন্য নিয়েও তাদের কোনো অভিযোগ ছিল না। আসলে অভিযোগ করতে তারা জানে না। দৈনন্দিন খেটে খাওয়া মানুষের জীবনে অভাব ও অশিক্ষা নিত্যসঙ্গী। তা নিয়ে পড়ে থাকলে তাদের চলে না। তাই জীবন স্বাভাবিক গতিতেই চলত।

কিন্তু গ্রামীণ জীবনের শান্তিটুকুও বুঝি কপালে সইল না! একের পর এক শোচনীয় মৃত্যুতে সবাই শোকবিহ্বল হয়ে পড়ল। যতই দিন যেতে লাগল, পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল আতঙ্কের মাত্রা। 'আতঙ্ক' বা 'ভয়' শব্দটা এতটাই সার্বিকভাবে ব্যবহার হয় যে প্রয়োজনের সময় এর ব্যাপ্তি বোঝানো মুশকিল। এক অজানা ভয়ে, অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান অবস্থায় দিন কাটতে লাগল গ্রামবাসীদের। দিনের আলোয় তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলত। পুরুষরা দূরের হাটে কেনাবেচার জন্য অথবা শস্যখেতে কাজ করতে চলে যেত। মেয়েরা ধবলকুণ্ডে গরু-ছাগলের জন্য ঘাস কাটতে বা জল আনতে যেত। শিশুরা বেরিয়ে যেত গরু-ছাগল-মেষ চরানোর কাজে।

কিন্তু যেই সূর্য পশ্চিমদিকে ঢলে পড়ত, বিষণ্ণ সন্ধ্যার ছায়া পাহাড়ের গায়ে ডানা মেলে নেমে আসত—ঠিক তখনই গ্রামবাসীদের মধ্যে ফুটে উঠত সেই অনাবিল আতঙ্ক! যারা বাজারে বা অন্য কাজে গিয়েছিল, তারা শশব্যস্তে বাড়িমুখো হত। ঘাসের বোঝা বা জলের কলসি নিয়ে মেয়েরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হুড়মুড় করে ফিরে আসত ঘরে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ত আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা। চতুর্দিকে থমথম করত এক অশুভ নৈঃশব্দ্য ও অন্ধকার! নেই কোনো কোলাহল! একটি মানুষের কণ্ঠস্বরও শোনা যায় না। কেউ প্রতিবেশীর বাড়িতে তামাক খেতে বা গল্পগাছা করতে যায় না! এমনকি শিশু কেঁদে উঠলেও তার মা সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলে উঠত—'চুপ...চুপ!'

এই আতঙ্কের তাণ্ডব শুরু হয়েছিল ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে। তার প্রথম শিকার দশ বছরের বাচ্চা মেয়ে গৌরী। গৌরী তার বাবা

মোতির একমাত্র সন্তান। তার জন্মের সময়ই মায়ের মৃত্যু হয়। মোতিকে সবাই দ্বিতীয় বিয়ে করার পরামর্শ দিয়েছিল। কারণ এ সমাজে ছেলে না হলে উত্তরাধিকারী পাওয়া যায় না। তাছাড়া বাচ্চা মেয়েটারও তো মায়ের প্রয়োজন আছে। কিন্তু মোতি সমস্ত কথাকে নস্যাৎ করে বুকে করে মেয়েকে বড়ো করে। গৌরী তার বড়ো আদরের মেয়ে। রূপে-গুণেও অতুলনীয়। এই বয়সেই রান্না-বান্না, সংসারের সমস্ত কাজ পটু হাতে করে। মোতি গৌরীর বাবা ঠিকই, কিন্তু মেয়ে একটু বড়ো হতে না হতেই তার মায়ের স্থানটি অধিকার করল। স্নেহে, যত্নে বাবাকে আগলে রাখল। মোতি স্বপ্ন দেখে এ গ্রামের সেরা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে গৌরীর। ধুমধাম করে 'বিদাই' হবে তার। সবাইকে বলে—'ও আগের জন্মে আমার ইজা ছিল। কেমন করে যে ওকে ছেড়ে থাকব!'

সেই অভিশপ্ত দিনটায় সে অন্যান্য দিনের মতোই শস্যখেতে কাজ করছিল। গৌরী নিয়মমাফিক দুপুরে তার জন্য চাপাটি আর ভাজি এনেছিল। তখনো কোথাও কোনো বিপদের সঙ্কেত ছিল না। রোদ ঝলমলে একটা দিন আর পাঁচটা স্বাভাবিক দিনের মতোই এসেছিল। গৌরী সেদিনও বাবাকে সামনে বসিয়ে খাইয়েছিল ও গল্প করেছিল। তার পরনে ছিল লাল রঙের ঘাগরা ও চোলি। কয়েকদিন আগে মোতি তাকে মেলা থেকে কাচের চুড়ি ও পায়েল কিনে দিয়েছিল। সেই কাচের চুড়ির ছনছন ও পায়েলের ছমছম ধ্বনি তুলে গৌরী সেদিন ফিরে গিয়েছিল মাঠ থেকে। বাবাকে বলেছিল—'আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস বাবু।'

মোতি হেসে বলে—'কেন রে?'

গৌরী একটু চুপ করে থেকে জানিয়েছিল যে কিছুদিন ধরে রাতে তার একটা অদ্ভুত অস্বস্তি হচ্ছে। যখন সে একলা থাকে, তখন মনে হয় কে যেন তাকে আড়াল থেকে দেখছে! রাত্রে বাড়ির চারপাশে কার যেন হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পায়। মনে হয়, অজান্তেই কেউ তার কাছাকাছি বসে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। কাউকে দেখতে পায় না ঠিকই, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে।

তখন তার কথায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি মোতি। ভেবেছিল, যতই গিন্নিপনা করুক—আদতে মেয়েটা ছেলেমানুষ। রাতের বেলায় একা থাকতে হয়তো ওর ভয় করে। হয়তো সেজন্যই এরকম অনুভব করছে। সে আর কথা না বাড়িয়ে নিজের কাজে লেগে পড়ে।

সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়ি ফিরছিল সে তখনই রাস্তায় হরলালের সঙ্গে দেখা। হরলাল তার অনেকদিনের বন্ধু। মোতিকে দেখে সে স্বাভাবিকভাবেই খুশি হল এবং তাকে একটু চা ও ধূমপান করার আমন্ত্রণ জানাল। মোতিরও বিশেষ তাড়া ছিল না। রাতের খাওয়া হতে তখনো অনেক দেরি। সে হরলালের বাড়িতে গেল। চা ও তামাক খেতে খেতে সংসারের সুখ-দুঃখের কথা আলোচনা করল। দুই বন্ধুর আলাপচারিতা দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে চলল। মোতির তখন মনেই ছিল না যে গৌরী তাকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল। যখন মনে পড়ল, তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে।

হরলাল তাকে ছাড়তেই চাইছিল না। বহুদিন বাদে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে। তাই গল্প আর শেষই হতে চায় না। তবু মোতি তাকে বলল—'আজ যাই রে। চেলিটা আজ আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল। এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে। আরও দেরি করলে রাগ করবে।'

হরলাল জানত মোতি মেয়ে অন্ত প্রাণ। সে কিছু মনে করল না। বরং হেসে বলল—'ঠিক আছে। আজকে যা। তবে একদিন গৌরীকে নিয়ে আসিস।'

মোতি মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে সেখান থেকে চলে গেল।

তখন জ্যোৎস্নায় গোটা পাহাড় ভেসে যাচ্ছে। তুষার-মৌলী হিমালয় বুঝি রুপোর পোশাক পরে আছে। আশেপাশের গ্রামগুলোর কুটিরে জ্বলছে তেলের বাতি। তার বিন্দু বিন্দু আলো নক্ষত্রের মতোই টিপটিপ করে জ্বলছে। পূর্ণ চাঁদের প্রভায় আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা আকাশ। হালকা হালকা মেঘের পানসি চাঁদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। নীল পরিষ্কার আকাশে হিরের টুকরোর মতো ঝলমল করছে নক্ষত্ররা। হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়ায় অজানা কোনো বনফুলের গন্ধ।

বেশ খোশমেজাজেই বাড়ির দিকে ফিরছিল মোতি। কিন্তু বাড়ির কাছে এসে থমকে গেল। ও কী! দরজা খোলা কেন! গৌরী কি কোথাও বেরিয়েছে? এমনিতে এখানে চুরির উপদ্রব একেবারেই নেই। তবু খোলা দরজাটা দেখে এক অব্যক্ত আশঙ্কায় তার মন ভরে গেল। গৌরী তো কখনো এমন করে না! বাইরে গেলেও সে দরজা বন্ধ করেই যায়! তবে আজ কী হল!

মনের মধ্যে অজানা এক ভয় নিয়ে দুরুদুরু বুকে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল মোতি। আস্তে আস্তে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ভেতরে ঢুকল। ঘরের একপাশে তেলের বাতিটা স্তিমিত আলোয় জ্বলছিল। সম্ভবত তেল বাঁচাবার জন্যই গৌরী পলতেটা নামিয়ে দিয়েছে। একটু দূরেই কাঠের উনুন জ্বলছে। তার ওপর আধপোড়া একটা চাপাটি। গৌরী রাতের খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। কিন্তু সে কোথায়? মোতি এদিক-ওদিক তাকিয়েও কোথাও মেয়েকে দেখতে পেল না।

সে চিন্তিত মুখে লণ্ঠনটার দিকে এগিয়ে গিয়ে আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল। ঠিক তখনই যে দৃশ্যটা চোখে পড়ল, তাতে কিছুক্ষণের জন্য যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেল মোতি। এতক্ষণ লণ্ঠনটার মৃদু আলোয় ঠিকমতো দেখতে পায়নি। এবার আলোটা বাড়িয়ে দিতেই দেখতে পেল ঘরের মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত জমে আছে! আশেপাশে গৌরীর সাধের বেলোয়ারি কাচের চুড়ি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। মেঝের ওপরে কিছু টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার দাগ! মাটির কলসিটা ভেঙে খানখান! চতুর্দিকে রক্ত আর রক্ত!

'গৌ—রী!'

চিৎকার করে ডেকে উঠল মোতি। উন্মত্তের মতো ছুটে গেল প্রতিবেশীদের বাড়ির দিকে। এ ধরনের খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগে না। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা গ্রাম জেনে গেল যে মোতির 'চেলি'কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর তার ঘর রক্তে প্রায় ভেসে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের সব জোয়ান পুরুষ মশাল হাতে বেরিয়ে পড়ল মেয়েটাকে খুঁজতে। রক্তের দাগ উঠোন অবধি ছিল। তারপর আর চিহ্নমাত্র নেই। তবু গ্রামবাসীরা তন্ন

তন্ন করে খুঁজল তাকে। প্রতিবেশীদের ঘরে, মন্দিরে, শস্যখেতে, অরণ্যের ভেতরে—সব জায়গাতেই সন্ধান চালাল। জঙ্গলে একটা কাঁটাঝোপে গৌরীর লাল ঘাগরা-চোলির একটা ছেঁড়া অংশ পাওয়া গেল। পাওয়া গেল তার পায়েলজোড়ার একটাও। কিন্তু গৌরী নেই! কোথাও নেই!

সারা রাত খোঁজাখুঁজি করার পর সন্ধানকারী দল অবশেষে ভোরের দিকে খুঁজে পেল গৌরীর মৃতদেহ! ধবলকুণ্ডের কাছেই পাওয়া গেল তাকে। মেয়েটা একেবারে তালগোল পাকিয়ে পড়েছিল। তার গলায় চারটে দাঁতের কামড়ের দাগ স্পষ্ট! দেহের অনেকটা মাংসই খেয়ে নিয়েছে কেউ!

মোতির বেদনায় বুক ফাটেনি, সেদিন গ্রামে এমন কেউ ছিল না। মোতি শুধু অনিমেষে তাকিয়েছিল তার একমাত্র সন্তানের লাশের দিকে! সে যে শুধুমাত্র তার সন্তান ছিল না। মোতির জীবনের সমস্ত আনন্দ, বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার! সে কিন্তু একফোঁটাও কাঁদেনি! বরং শুধু আপনমনেই বিড়বিড় করে বলেছিল---'ও আমায় বলেছিল...ও আমায় তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলেছিল...আমি শুনিনি... আমি শুনিনি...!'

সেই শুরু। প্রাথমিকভাবে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেলেও ভেবেছিল, এটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। হয়তো বা বন থেকে কোনো 'তেন্দুয়া' বা লেপার্ড ছিটকে এসে পড়েছিল এখানে। হয়তো মানুষ শিকারের লক্ষ্য তার ছিল না। গৃহপালিত ছাগল, গরু বা ভেড়ার শিকার করতেই আসা। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটা কোনোভাবে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল। এমন সহজ শিকার ছাড়েনি পশুটা! নিতান্তই হতভাগিনী মেয়েটার আর মোতির দুর্ভাগ্য!

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওখানেই থেমে থাকল না। এমনই একরাতে এক বালক মেষপালককে খুঁজে পাওয়া গেল না! ভেড়া চরাতে চরাতে সে ধবলকুণ্ডের দিকেই চলে গিয়েছিল। সন্ধে হয়ে গেল, রাত নেমে এল—কিন্তু সে ছেলেটি আর ফিরে এল না। ভেড়ার মালিক ও ছেলেটির বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তারা প্রথমে আশেপাশের গাইচরির জমি আর বাথানগুলোয় খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু কোথাও ছেলেটিকে পাওয়া গেল না! সারা রাত গোটা অঞ্চল তোলপাড় করে তল্লাশি চলল। শেষ পর্যন্ত সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই ধবলকুণ্ড সংলগ্ন পাহাড়ের পাথুরে গিরিখাতে ওর রক্তাক্ত দেহটা পাওয়া গেল! সেই দলামোচা পাকানো একটা অর্ধভুক্ত দেহ! গলায় চারটে দাঁতের দাগ জ্বলজ্বল করছে!

গ্রামবাসীরা তখন সকলে মিলে একটা ঝাঁপানের ব্যবস্থা করল। জঙ্গল ঘেরাও করে একদল মানুষের কোনো জন্তুকে খোঁজার প্রক্রিয়াকে ঝাঁপান বলে। তাদের অনুমান ছিল যে কোনো মাংসাশী জন্তু এ দিকে এসে পড়েছে। এবং সম্ভবত দিনের বেলায় সে ধবলকুণ্ডেরই আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকে। সেই আন্দাজেই গ্রামবাসীরা ঝাঁপান চালাবে ঠিক করল। প্রায় দুশো ঝাঁপানদার বেশ কয়েকটা গাদা বন্দুক ও তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপান চালাল। সঙ্গে রাইফেল নিয়ে বিরজুদাদা ও পাটোয়ারী হরকুঁয়ার। সকাল থেকে দুপুর অবধি ঝাঁপান চলল। ধবলকুণ্ড সংলগ্ন অঞ্চলের প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। ঝোপ-জঙ্গল পিটিয়ে পাটিয়ে খোঁজ চালাল ঝাঁপানদাররা। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না! তেন্দুয়া বা ভেড়িয়া তো দূর—তাদের লেজটুকুও দেখা যায়নি! সবাই ভাবল, জানোয়ারটা হয়তো এ অঞ্চল থেকে চলে গিয়েছে।
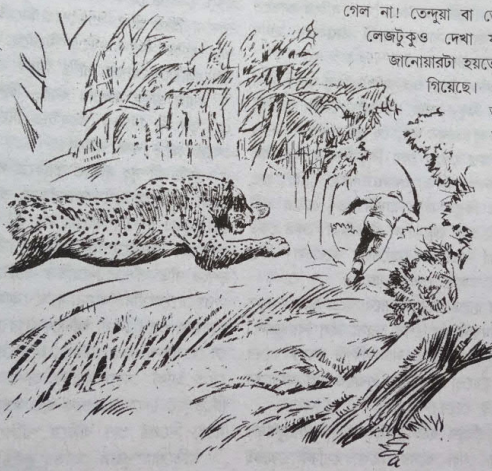
তাদের ধারণা যে কতটা ভুল তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেইদিন রাতেই। দোকানি রাম সিং-এর বউ রাতের খাওয়া- দাওয়ার পর বাইরে বসে বাসন ধুচ্ছিল। আর রাম সিং ঘরে বসে তামাক টানছিল। আচমকা বাসনপত্রের ঝনঝন আওয়াজে সচকিত হয়ে বাইরের দিকে তাকাল সে। যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একটা চতুষ্পদের কালো ছায়া তার বৌকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! বিরাট তার দেহ! চলে যেতে যেতেই একবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দুই চোখে রাম সিং-এর দিকে তাকাল সে। সে যে কী পৈশাচিক ভয়াল দৃষ্টি তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়! রাম সিং-এর কিছু করার ছিল না। সে বুঝেছিল যে স্ত্রীকে উদ্ধার করার আর কোনো উপায় নেই। তাই কোনোমতে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ভালো করে কিছু দেখা বা বুঝে ওঠার আগেই আকস্মিক আক্রমণ!

এমন আরও অনেক ঘটনা আছে। প্রত্যেকটা কাহিনিই করুণ। একের পর এক মানুষ মরতে লাগল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা শয়তানটার খাদ্যে পরিণত হল। প্রথমদিকে সে বাড়ির ভেতরে ঢুকত না। কিন্তু তারপর দেখা গেল জানলা খোলা পেয়ে,

বাড়ির ভেতরে ঢুকে একটি ছ-মাসের শিশুকেও তুলে নিয়ে গেছে! জানলায় গরাদ ছিল না। এখানে তেমন চুরি-ডাকাতি বা অন্যান্য অপরাধ হয় না। তাই জানলার গরাদ যে একটা প্রয়োজনীয় বস্তু, তা কেউ ভেবে দেখেনি। সেই সুযোগেই নিয়ে গেল বাচ্চাটাকে। শিশুটির মা-বাবা তার পাশেই শুয়েছিল। কখন ও কীভাবে সে ঢুকল, কখনই বা বাচ্চাটাকে মারল, কীভাবে তুলে নিয়ে গেল তা কেউ জানে না। এমনকি মা-বাবা কোনো নিঃশ্বাসের শব্দ কিংবা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ—কিছুই পায়নি!

এমনিতেই পাহাড়ি গ্রামের জনঘনত্ব খুব বেশি নয়। একেকটা গ্রামে বড়োজোর পঞ্চাশ কি একশো ঘর লোক থাকে। কোথাও কোথাও তো তার চেয়েও কম। ধবলকুণ্ডের পাশাপাশি তিনটে গ্রামে এই নরখাদকের সন্ত্রাস শুরু হল! সারাদিন সে কোথায় থাকে কে জানে। কিন্তু সূর্যাস্তের পর থেকে তার আতঙ্ক মানুষকে তাড়া করতে শুরু করে। অন্ধকার হওয়ার পরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকলেই তো হয় না! রান্নাবান্না করার জন্য বাইরে আসতে হয়। এমনকি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও অন্ধকারে মানুষ বেরোবেই। শুধু এই সুযোগটাই যথেষ্ট!

আস্তে আস্তে গ্রাম ফাঁকা হতে শুরু করল। কিছু মানুষ মারা পড়ল দানবটার হাতে। কিছু লোক ঘর-বাড়ি ফেলে রেখেই অন্যত্র পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এমন নয়, যে শয়তানটাকে মারার চেষ্টা করা হয়নি। দূর-দূরান্ত থেকে বেশ কিছু শিকারি এসেছিল নরখাদকটাকে মারার জন্য। যদিও এখনও পর্যন্ত সেটা বাঘ, লেপার্ড না নেকড়ে—তা কিছুই জানা যায়নি। তবু চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। জঙ্গলের কাছেই তাঁবু গেড়েছিল শিকারিরা। কেউ কেউ মাচান তৈরি করে সারা রাত ধরে অপেক্ষা করেছিল। কিন্তু পরদিন তাদের কাউকেই জ্যান্ত পাওয়া যায়নি।

এই পরিস্থিতিতে প্রাণ হাতে করে পালানো ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকে না। তবু গ্রামবাসীদের শেষ ভরসা ছিল বিরজুদাদা। এই অসমসাহসী মানুষটি অনেকবারই নানা বিপদ থেকে ওদের বাঁচিয়েছে। বিশ্বাস ছিল, হয়তো বিরজুদাদা এবারও এই আতঙ্কের হাত থেকে ওদের রেহাই দেবে।

কিন্তু সে বিশ্বাসও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল! যেদিন বিরজুদাদার রক্তাক্ত শরীরটা পাওয়া গেল বনের মধ্যে, সেদিন থেকেই অবশিষ্ট গ্রামবাসীরাও দলে দলে গ্রাম ছাড়তে শুরু করল। যেটুকু সাহসে বুক বেঁধে ছিল তারা, সেটুকুও গেল। এই আতঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়!

'ভাবছি আলমোড়ায় আমার ভাইয়ের কাছে চলে যাব।' গম্ভীর গলায় বললেন পঞ্চায়েতের অন্যতম সদস্য শিবা সিং—'এ ছাড়া আর কোনো উপায় তো দেখছি না। এখানে থেকে দানোটার শিকার হওয়ার চেয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভালো। তোমরাও অন্য কোনো ডেরা খুঁজে নাও। এখানে থাকাটা বিপজ্জনক।'

অদূরেই দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় মন্দিরের পূজারি পণ্ডিত নটিয়াল। তিনি নীরবে মাথা নাড়লেন। যদিও চলে যেতে প্রাণ চায় না। এই গ্রামেই তাঁর জন্ম। গোটা শৈশব, যৌবনকাল কাটিয়ে এখন প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছেন। তরুণ বয়েস থেকেই মন্দিরের পুরোহিতের কাজ করছেন। আজীবনের পরিচিত এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে ভাবলেই বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী আছে!

মোতি তাদের সবার দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। এখন সে বুঝি কথা বলতেও ভুলে গিয়েছে। গৌরীর মৃত্যুর পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেল লোকটা! কোনো প্রতিবেশী খেতে দিলে খায়, নয়তো খায় না। কখনই ঘুমোয় না! সারাদিন গোটা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। কী খোঁজে কে জানে! কখনো কখনো ধবলকুণ্ডের কাছে গিয়েও বসে থাকে। যেখানে মাটিতে গৌরীর দেহটা পড়ে ছিল সেখানে পরম আদরে হাত বোলায়। আপনমনেই বিড়বিড় করে। এমনকি রাতেও সে অরণ্যের ভেতরে প্রবেশ করে। হাতে একটা মস্ত রামদা নিয়ে সতর্ক ও সন্ধানী দৃষ্টিতে কাউকে খুঁজতে থাকে। তার চোয়াল অসম্ভব দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ! বদলা চাই! বদলা! মানুষ-নেকড়ে হোক, কোনো রক্তমাংসলোভী পিশাচ হোক, অথবা কোনো হিংস্র জন্তু—প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়বে সে। যে শয়তান তার বুকের ধনকে কেড়ে নিয়েছে, তাকে এত সহজে ছাড়বে না। গৌরীকে মারার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

সবাই তাকে সাবধান করে—'পিশাচটা জঙ্গলের মধ্যে ঘোরে রে। তুই কি নিজের 'জান'টাও দিতে চাস? ও তোকে একলা পেলে ছেড়ে কথা কইবে?'

মোতি নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সে-ও তো তাই চায়! পিশাচটা তার সামনে এসে দাঁড়াক, তার সঙ্গে লড়াই করুক—এটাই তো কাম্য! হয় সে বাঁচবে, নয় ওই শয়তানটা! ও তার মেয়েকে খেয়েছে। গৌরীকে খেয়েছে! গৌরীর নরম গলায় যখন ওই নৃশংস দাঁত বসিয়ে দিয়েছিল জন্তুটা তখন না জানি কত যন্ত্রণা পেয়েছে মেয়েটা! অমন নরম কোমল শরীরটাকে টেনে হিঁচড়ে, পাথরের ওপর দিয়ে, কাঁটাঝোপের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে! যে মেয়ের গায়ে কোনোদিন হাত তোলেনি মোতি, কোনো কারণে হাতে ছ্যাঁকা খেলে বাপের হৃদয় আগে পুড়ত—সেই মেয়েকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়েছে! ওকে এত সহজেই ছেড়ে দেবে! কাপুরুষের মতো নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যাবে!

প্রতিশোধস্পৃহায় মোতির দু-চোখ জ্বলতে থাকে। আজও সে গৌরীকে দেখতে পায়! আজও তার কান্না শুনতে পায়! আজও গৌরী কাঁদে! অরণ্যের ভেতর থেকে সেই কান্না ভেসে আসে। সে কাঁদতে কাঁদতেই বলে—'বাবু, তুই কেন তাড়াতাড়ি ফিরে এলি না! কেন এলি না বাবু!...' মোতি সম্মোহিতের মতো অন্ধকার অরণ্যের দিকে এগিয়ে যায়। তার গৌরী ওখানেই আছে! সে কাঁদছে! দানবটা তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে! মোতিকে পৌঁছোতেই হবে। গৌরীকে আগেরবার বাঁচাতে পারেনি। এবার বাঁচাতেই হবে! সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—'আমি এসেছি গৌরী! তোর বাবু এসেছে! আর কোনো ভয় নেই মা! আর ভয় নেই!'

নীরব অরণ্য এক অব্যক্ত ব্যথায় চুপ করে থাকে। হু হু করে বয়ে যায় হাওয়া। পাইন, দেওদার শিরশিরিয়ে ওঠে। রক্তিম রডোডেনড্রনের ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ে নীরবে। চতুর্দিকে

শিশির ঝরে পড়ার টুপটাপ শব্দ! তার মধ্যেই মোতি শুনতে পায় গৌরীর পায়েলের ছমছম আওয়াজ। গৌরী চলে যাচ্ছে! তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে!

'তুই কী করবি মোতি?' শিবা সিং এবার মোতির দিকে তাকিয়েছেন—'কোনো রিশতেদারের কাছে চলে যাওয়াই ভালো হবে।'

মোতি তার তেলবিহীন উশকোখুশকো চুলে হাত বোলাল। এত দুঃখেও হাসি পেয়ে যায়। এ জগতে তার আর কেউ নেই। যে ছিল সে-ও তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এখন আর হারানোর কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু প্রাণটা। কিন্তু সেটাকে নিয়েই বা কী করবে সে! তার সমস্ত অনুভব, আনন্দ, ইচ্ছে, স্বপ্ন—সব নিয়েই তো চলে গিয়েছে গৌরী। এখন বেঁচে থেকেই বা কী লাভ!

'আমি কোথাও যাব না'। মোতি দৃঢ়স্বরে বলে—'এখানেই থাকব।'

'এখানে থাকবি কী রে!' শিবা সিং চোখ কপালে তুলে ফেলেছেন—'এখানে থাকলে তো মরবি! বিরজুদাদা বন্দুক নিয়েই যার সঙ্গে পেরে উঠল না, তুই রামদা নিয়ে তার সাথে লড়বি! পাগলামি করিস না মোতি। তুই বরং আমাদের কারোর সঙ্গে চল। আমাদের দু-মুঠো জুটে গেলে তোরও জুটবে।'

'আমার আবার বাঁচা-মরা!'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বাক্যটা ছুড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মোতি। তার আর বাদানুবাদের কোনো ইচ্ছে নেই। আস্তে আস্তে সে ধীরপায়ে ওখান থেকে চলে গেল। শিবা সিং চাপাস্বরে বললেন—'ছেলেটা মরবে!'

মন্দিরের পূজারি স্থিরদৃষ্টিতে মোতির অপসৃয়মান দেহের দিকে তাকিয়েছিলেন। মোতি তার ক্লান্ত দেহটাকে কোনোমতে টেনে নিয়ে চলেছে। তার হাঁটার মধ্যে জীবনের কোনো ছন্দ নেই। বরং এক মৃত্যুগন্ধী বিষণ্ণতা ছেয়ে আছে। পূজারির মনে হল, ও প্রতিরাতে মানুষখেকো পিশাচ নয়, নিজের মৃত্যুরই মুখোমুখি হতে চায়। বেঁচে থাকার কোনো কারণ আর নেই। তাই নিজের মরণকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অরণ্যের মধ্যে!

নটিয়াল বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করেন—'ও বেঁচেই বা ছিল কবে!'

তিনদিনের মধ্যেই গ্রাম ফাঁকা হয়ে গেল।

সৌভাগ্যবশত এই তিনদিনে নরখাদকটা আর এ গ্রামে আসেনি। বরং অন্য গ্রাম থেকে দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। নিকটবর্তী গ্রামের একজন কৃষক এবার তার শিকার হয়েছে। সে রাতের বেলায় নিজের বলদটার চিৎকার শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছিল। না বেরিয়ে এসেও উপায় ছিল না কারণ ওই একটি বলদ ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পত্তি ছিল না। বলদটা মারা পড়লে তার পরিবার এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরবে। তাই উপায়ান্তর না দেখে সে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং সরাসরি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। তার আর্তনাদ ও পিশাচটার রক্ত জল করা গর্জন অনেকেই শুনেছিল, কিন্তু কেউ তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি। এমনকি তার নিজের পরিবারের লোকেরাও দরজা এঁটে ভয়ে কাঁপছিল!

লাশটা জঙ্গলের কাছেই অবহেলায় পড়ে ছিল। আশেপাশে ছোপ ছোপ রক্ত। গায়ের পোশাক ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছে। মুখ এতটাই জখম হয়েছে যে তাকে চেনাই দায়। গ্রামের লোকজন এসে ভিড় করে দেখছিল সেই দৃশ্য। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। সবার দৃষ্টিতে শুধু ত্রাস ও নিরাপত্তাহীনতা।

মোতি ঝুঁকে পড়ে হতভাগ্য মানুষটির দিকে তাকিয়েছিল। প্রায় নগ্ন গায়ে রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ। জায়গায় জায়গায় রক্ত শুকিয়ে জমে আছে। তার পায়ের বেশ খানিকটা অংশ ও পেটের কাছে কিছুটা খাওয়া হয়েছে। এখনও লাশের কাছে জ্বলজ্বল করছে জন্তুটার পায়ের ছাপ। জঙ্গলে থেকে থেকে মোতি অল্পবিস্তর সব পশুর পায়ের ছাপই চিনতে পারে। আর এ ছাপ তো তার পূর্ব পরিচিত। দেখে চিনতে ভুল হল না যে এই থাবার ছাপ ওই শয়তানটারই। সম্ভবত সে একটা বিশালাকৃতি মদ্দা তেন্দুয়া বা চিতাবাঘ। থাবার ছাপ দেখে বয়েস বোঝা মুশকিল। তবে হয়তো একটু খুঁড়িয়ে চলে। কারণ ওর সামনের ডানদিকের থাবার ছাপ গাঢ়, বাঁদিকেরটা হালকা। কিন্তু সে যে এখান থেকে কোনো কারণে জোরকদমে চলে গিয়েছে তা তার পদচিহ্ন বুঝিয়ে দেয়।

মুশকিল হল, মোতির কথায় কেউ বিশ্বাস করবে না। গ্রামবাসীরা ধরেই বসে আছে যে সে একটা পশুরূপী মানুষ। এমন কোনো মানুষ যার রক্তমাংসের লোভই এই নরহত্যার কারণ। সবার মত অনুযায়ী, সে দিনের বেলায় মানুষের রূপে থাকে। রাত হলেই স্বমূর্তি ধরে। নয়তো একটা পশু এত চালাক কী করে হয়! মানুষের মতো বুদ্ধি তার। নিঃশব্দে আসে যায়! এমন গোপনে ওত পেতে থাকে যে শিকার বুঝেই উঠতে পারে না। জানলা দিয়ে ঢুকে বাবা-মায়ের মাঝখান থেকে ঘুমন্ত শিশুকে কী অদ্ভুত নিপুণভাবে তুলে নিয়ে যায়, অথচ বাবা-মা টেরই পায় না! এ তো রীতিমতো অলৌকিক কাণ্ড! এ কি সাধারণ কোনো মানুষখেকোর কাজ!

মাঝেমধ্যে মোতিরও ধাঁধা লাগে। সত্যিই এ কোনো বাঘরূপী পিশাচের কাজ নয়তো? গৌরীর ঘটনাটা মনে পড়তেই তার পুরো ব্যাপারটাই অস্বাভাবিক লাগে। যখন গৌরীর সঙ্গে মর্মান্তিক ঘটনাটা হল তখন ওদের এক প্রতিবেশী বিরজু বলেছিল—'মোতি, আমরা তার কয়েক মুহূর্ত আগেও গৌরীকে দেখেছিলাম। ও জল তুলে বাড়ি ফিরছিল। ওকে 'সহি-সলামত' বাড়িতে ঢুকতেও দেখি। কিন্তু তারপর কখন যে এসব ঘটল তা টেরই পাইনি'। এ লোকটা তবু চিৎকার করতে পেরেছিল। গৌরী তো টুঁ শব্দটিও করতে পারেনি! অথচ তার মধ্যে এক অজানা ভয় কাজ করছিল। সে নিজেই মোতিকে বলেছিল যে কে যেন বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে। অর্থাৎ নরখাদকটা আগে থেকেই তার ওপর নজর রাখছিল। আশ্চর্য! কেউ তাকে দেখতে পায়নি! আর এ কেমন মানুষখেকো! যে আগে থেকেই শিকারের গতিবিধি মেপে রাখে! যেন আগে থেকেই সম্ভাব্য শিকার হিসাবে গৌরীকে সে বেছেই রেখেছিল। যেন জানত, মেয়েটার বাবা এইসময় বাড়িতে

থাকে না, বাচ্চা মেয়েটাকে ঘরে একলাই পাওয়া যাবে! কী করে জানল! তবু প্রথম রাতে আক্রমণ করেনি। অপেক্ষা করেছে! কেন? সাধারণ মানুষখেকোর তো এমন স্বভাব নয়। সে যাকে হাতের কাছে পায়, তাকেই মারে। অথচ এ জন্তুটা রীতিমতো বেছে বেছে শিকার করছে!

মোতি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। থাবার ছাপ অনুসরণ করে প্রাণীটা যেদিকে গিয়েছে সেই পথ ধরল। মড়িটাকে ওখানেই ফেলে রেখে একটা দড়িপথ ধরে চলে গিয়েছে সে। দড়িপথ ধরে একটু এগিয়ে যেতেই দু-দিকে নিবিড় লাল রঙের ক্লেরোডেনড্রামের ঝোপ পড়ল। গোটা গাছ রাঙা করে থোকায় থোকায় ফুটে আছে ফুলগুলো। এখনও ভোরের শিশির চিকমিক করে উঠছে ফুলের পাপড়িতে। ঘাসের ডগায় দ্যুতি ছড়াচ্ছে জলবিন্দু। একটু এগোতে না এগোতেই ঝমঝম ধ্বনি কানে এল। আশেপাশেই কোনো নাম না জানা নদী বা ঝোরা সবেগে বয়ে চলেছে।

দড়িপথটা পেরিয়ে যেতেই চিতাবাঘ বা পিশাচ যে রাস্তাটা ধরেছে সেটা নেমে গেছে এক গভীর বনে, গিরিখাতের দিকে। এখানে এসেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল মোতি। এতক্ষণ ও চারটে পায়ের ছাপই দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু এখানে নির্দিষ্ট দূরত্বে শুধু দুটো পায়ের ছাপ! বাকি দুটো পায়ের ছাপ অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়েই গিয়েছে! যেন এখানে এসে জন্তুটা চার পা ছেড়ে হঠাৎই দু-পায়ে সোজা হয়ে হাঁটতে শুরু করেছে! সে পরম কৌতূহলে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। নদীখাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই কুলকুল-ঝমঝম আওয়াজটা আরও জোরালো হল। মোতি দেখল একটা পাহাড়ি নদী উত্তাল ভীম বেগে ছুটে চলেছে। নদীর বুক থেকে উঠে আসছে কুয়াশা! ফেনিল সাদা জল পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে চলেছে। বজ্রগর্জনে ফুলে ফেঁপে উঠছে। দেখলেই বোঝা যায় এই খরস্রোতার জল তুষার-শীতল!

বন্যপ্রাণীরা সচরাচর ঠান্ডা জল এড়িয়ে চলে। আর এই উত্তাল, উদ্দাম তরঙ্গায়িত জলের মধ্যে নামার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না! অথচ কী আশ্চর্য! পায়ের ছাপ ঠিক নদীর একেবারে ধার ঘেঁষেই চলে গিয়েছে। নদী এত তীব্র বেগে বয়ে চলেছে যে জলের ঝাপ্টা গায়ে এসে লাগছিল তার। বিড়াল জাতীয় প্রাণীরা পারতপক্ষে জলের ধারে-কাছে ঘেঁষে না। ওটা তাদের স্বভাব নয়। অথচ নরখাদকটা দিব্যি এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছে! তার পায়ের ছাপ তখনো তাজা।

মোতি অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে এগোল। সে তখন বেশ উত্তেজিত। নদীর পাশের ভেজা মাটিতে বহুদূর বিস্তৃত গুল্মবন গজিয়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও বুনো কুলের ঝোপও চোখে পড়ে। রয়েছে কাঁটাঝোপও। সেই গুল্মবনের ভেতরে ঢুকতে মোতির যথেষ্ট পরিশ্রম হচ্ছিল। কিন্তু তবু সে হাল ছাড়ল না। আস্তে আস্তে পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগোতে লাগল। দূর থেকে একটা কাকার হরিণের ডাক ভেসে আসছিল। মোতি থমকে গিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শোনে। কোনো বিপদসংকেত আছে কি সেই ডাকে?

কাকারটা বার দুয়েক ডেকেই থেমে গেল। তার ডাকের মধ্যে কোনো সতর্কবার্তা নেই। হয়তো সে তার সঙ্গীসাথীদের ডাকছে। মোতি তখনো সাবধানে গুল্মের ঝাড় অতিক্রম করছিল। থাবার ছাপ ক্রমশ মিলিয়ে আসছে। এখন ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। তবু মোতির মনে হল, মানুষখেকোটা ওদিকেই গিয়েছে। এবং ধারে কাছেই আছে। সে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে ঝোপ-ঝাড় ঠেলে এগোল।

মোতির মাথার ওপর দিয়ে পাহাড়ি পিপিটের ঝাঁক উড়ে গেল। তাদের উড়ান স্বচ্ছন্দ। বিপদজ্ঞাপক কোনো ডাকও নেই। তবু যেভাবে তারা একটু এগিয়েই একটা বাঁক নিয়ে ফিরে গেল, তাতে মনে হয় ওখানে কিছু আছে! মোতির সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে যায়। বুকের মধ্যে রক্ত যেন উত্তাল হয়ে ওঠে। তার হাতে এখন রাম-দা না থাকলেও কোমরে বাঁধা আছে ভোজালি। সে ভোজালিটা হাতে নিয়ে এগোতে থাকল। কে জানে, হয়তো এখানেই বসে বিশ্রাম নিচ্ছে তেন্দুয়াটা! নিশ্চয়ই আছে সে! কারণ তার পায়ের ছাপ এখানেই এসে শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দিকটা দেখে নেয়। গুল্মবন যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই একটা উঁচু ঢিবি শুরু হয়েছে। ঢিবির ওদিকে কী আছে তা বলা মুশকিল। তবে ঢিবির মাথায় একটা বড়ো গাছ মাথা অবধি ঘন লতায় ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার আশেপাশেই বেশ কয়েকটা ব্যাবলার পাখি মাটি থেকে পোকা খুঁটে খুঁটে খেতে ব্যস্ত। আর বেশি দূরে নয়। এই ঢিপিটার ওপরে উঠলেই হয়তো দেখা যাবে তাকে! আজ নিজের শত্রুকে দিনের আলোয় স্বচক্ষে দেখবে মোতি।

সে ঢিপির দিকে আরও কয়েক পা এগোতেই একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করল। যেখানে লেপার্ডটার পদচিহ্ন মিলিয়ে গিয়েছে, ঠিক তার অব্যবহিত পরেই একজোড়া মানুষের পায়ের ছাপ প্রকট! এবং সেই ছাপটাও অবিকল চিতাবাঘের পায়ের ছাপটার মতোই। ডান পায়ের ছাপ গাঢ়, বাঁ পায়ের ছাপ হাল্কা! মোতি চমকে ওঠে! এ কী অদ্ভুত মিল! সম্পূর্ণ কাকতালীয়? না অন্যকিছু! সবাই যা বলে, তাই সত্যি নয়তো? যাকে চিতা ভাবা হচ্ছে, সে আসলে মানুষ! চিতার রূপ ধরে শিকার করে। আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে নিজের রূপে ফিরে যায়! তাই যদি হয়, তবে এ-ও সাধারণ কোনো মানুষের কীর্তি নয়!

মোতি ভোজালিটাকে শক্ত করে চেপে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে চলে যায় ঢিপিটার ওপরে। ওদিকে বেশ খাড়া উতরাই। তারপরই পথটা গিয়ে পড়েছে সমতল জমিতে। সেখানে ওকগাছের ভিড়। একপাশে বেতবনের ঝাড়। অন্যদিকে কমলা লিলি ফুল ফুটে আছে। মাঝখানে পান্না-সবুজ ঘাসে ছাওয়া খোলা জমি। কিন্তু আশেপাশে তো কোনো মানুষ নেই! তবে যার পায়ের ছাপ এখানে দেখা যাচ্ছে, সে মানুষটা গেল কোথায়! জন্তুটাই বা কই!

'মোতি।'

মোতি বিহ্বলদৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মানুষটাকে খুঁজছিল। হঠাৎই তার কাঁধের ওপর একটা স্পর্শ পেয়ে চমকে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল। বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল, তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন পুজারি নটিয়াল! তাঁর পরনে সাদা পোশাক। একটু আগেই হয়তো স্নান সেরেছেন। হাতে একটা তামার পাত্র।

আরেক হাতে কিছু লতাপাতা। নগ্ন পা দুটি কাদামাখা। মোতির মনে পড়ল, পণ্ডিত নটিয়াল একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন। শৈশবে নাকি পায়ে খুব জোরদার চোট পেয়েছিলেন। পায়ের হাড় প্রায় ভেঙেই গিয়েছিল। হাঁটতে পারতেন না। অবশেষে নাকি একদিন সন্ধ্যারতির সময় বিগ্রহের সামনে বসে 'মুঝে পৈর দে ঈশ্বর' বলে কেঁদে উঠেছিলেন বালক নটিয়াল। ঐশ্বরিক চমৎকারে তারপরই পায়ে জোর পেলেন তিনি। হাঁটতে পারলেন ঠিকই, কিন্তু বাঁ পাটা একটু দুর্বল থেকেই গিয়েছিল।

মোতি কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কোনোমতে আস্তে আস্তে বলল—'পূজারিজি, আপনি এখানে?'

'ওষধি নিতে এসেছিলাম।' হেসে নিজের হাতের লতা-পাতাগুলো দেখালেন তিনি—'এখানে অনেক ভালো লতাপাতা পাওয়া যায় যেগুলো আমি ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করি। এই দ্যাখ, ব্রহ্মবুটিও পেয়েছি।'

নটিয়াল পূজারি পাশাপাশি গ্রামের বৈদ্যও বটে। ছোটোখাটো অসুখের ওষুধ তাঁর কাছেই পাওয়া যায়। তাই ওষধির সন্ধানে জঙ্গলে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। ব্রহ্মবুটি মূলত ক্ষত সারাতে ও রক্ত বন্ধ করতে লাগে। তবু মোতির সংশয় যায় না। সে একটু চুপ করে থেকে বলল—'ওরা সবাই তো গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। আপনি গেলেন না?'

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন—'ভেবেছিলাম চলে যাব। সকলেই তো দেখলাম ভোর হতে না হতেই দল বেঁধে গ্রাম ছাড়ল। কিন্তু আমি চলে গেলে শিবজিকে জল কে দেবে? সারাজীবন তো শিবজির সেবা করেই কাটিয়ে গেলাম। এখন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ঠাকুরজিকে একলা ফেলে চলে যেতে মন চাইল না।'

'আপনার ভয় করে না?'

প্রশ্নটা শুনে ধূসর চোখ দুটো তুলে অদ্ভুতভাবে তাকালেন নটিয়াল। তারপর আস্তে আস্তে পালটা প্রশ্ন করলেন—'তুইও তো থেকে গেলি। এমনকি রাতের বেলায় বনের মধ্যেও ঘুরে বেড়াস! তোর ভয় লাগে না!'

মোতি চুপ করে থাকে। এর কোনো উত্তর হয় না। যে মানুষের হারানোর কিছু নেই, ভয় নামক বস্তুটা বোধহয় তাকে স্পর্শ করতে পারে না। যার বেঁচে থাকার একমাত্র সহায়টুকুও ঈশ্বর ছিনিয়ে নিয়েছেন, সে মৃত্যুকে ভয় পাবেই বা কেন! মোতির তো মরে যাওয়ারই কথা! তা সত্ত্বেও যে সে জীবিত রয়েছে, তার একটাই কারণ! প্রতিশোধ!

'আপনি তো তন্ত্রমন্ত্র জানেন—তাই না?'

মোতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নটিয়ালের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল—'সবাই বলে আপনি তন্ত্রসাধনা করতেন।

তিনি স্মিত হাসলেন—'তা অল্পবিস্তর সাধনা করেছি। বেশ কয়েক বছর তান্ত্রিকগুরুর কাছে পড়ে ছিলাম। তিনি আমাকে হাতে ধরে কিছু বিদ্যা শিখিয়েছিলেন বটে। তবে সে নেহাতই সামান্য।'

সে কৌতূহলী হয়ে বলল—'আপনি তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে এই পিশাচটাকে মারতে পারেন না?'
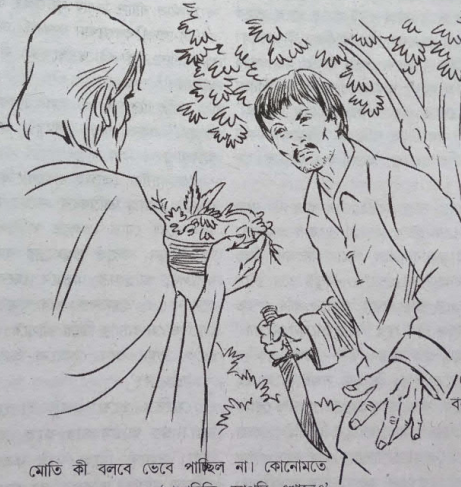
নটিয়াল উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন—'তোরা যা ভাবিস আসলে তন্ত্রমন্ত্র ঠিক তা নয় রে। এ অত্যন্ত উচ্চমার্গের সাধনা। এতে সিদ্ধিলাভ করতে খুব কম লোকই পারে।' বলতে বলতেই তাঁর মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল—'যদি সত্যিই এ কোনো পিশাচের কাজ হয়ে থাকে, তবে সে খুবই শক্তিশালী। তার সঙ্গে এঁটে ওঠার মতো বিদ্যা আমার নেই।'

'আচ্ছা।' একমুহূর্ত ভেবে মোতি ফের বলল—'কোনো মানুষ কি তন্ত্রমন্ত্র দিয়ে নিজেকে ভেড়িয়া বা তেন্দুয়া বানিয়ে ফেলতে পারে?'

মোতি কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। কোনোমতে আস্তে আস্তে বলল—'পূজারিজি, আপনি এখানে?'

প্রশ্নটা শুনে যেন একটু অস্বস্তিতে পড়লেন পূজারি। প্রথমে কোনো জবাব দিলেন না। তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন—'আমি নিজের চোখে সেরকম কিছু দেখিনি ঠিকই, কিন্তু এরকম একটা ঘটনা শুনেছিলাম।'

'কী ঘটনা?'

নটিয়াল হাঁটতে হাঁটতে বলেন—'বহুবছর আগে একজন তান্ত্রিকের এমনই দুর্মতি হয়েছিল। সে তন্ত্রবলে নিজের রূপ পাল্টাতে পারত। তখন আমি জন্মাইনি। বাবার বয়েস তখন একেবারেই অল্প। তাঁর বিয়ে হয়নি। তিনি শিবমন্দিরে সবে

সেবায়েত হয়েছেন। ঠিক তখনই আশেপাশের চার-পাঁচটা গ্রামের ছোটো ছোটো শিশু নিখোঁজ হওয়া শুরু হল! সদ্যোজাত শিশু থেকে শুরু করে দুই-তিন বছরের বাচ্চা গায়েব হয়ে গেল। প্রথমে সকলে ভেবেছিল যে হয়তো বা শেয়াল বা হায়নার কাজ। কিন্তু শেয়াল বা হায়না একের পর এক বাচ্চা তুলে নিয়ে যাচ্ছে, অথচ কেউ তাকে দেখেনি, কেউ টের পায়নি—এ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।'

'তারপর?'

'যথারীতি যাদের বাড়িতে ছোটো বাচ্চা আছে তারা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। কেউ এক পলকের জন্যও নিজেদের বাচ্চাকে কাছছাড়া করতে চায় না, অথচ কাজ না করলে খাবে কী! বাচ্চা কোলে নিয়ে তো খেত-খামারে কাজ করা বা বাজারে মাল বেচতে যাওয়া চলে না। পাহাড়ি মানুষের জীবন যেমন আর কী। ছেলে-মেয়ে কোলে নিয়ে বসে থাকলে ঘর চলবে না। আবার বাচ্চাটাকে অন্য কারোর কাছে রেখে যাওয়াও বিপদ। যে শিশুরা হেঁটে-চলে মায়ের বা বাবার সঙ্গে খেতে-হাটে যেতে পারে, তাকে না হয় সঙ্গে রাখা যায়। কিন্তু কোলের শিশুকে নিয়ে কী করবে! সুতরাং নিরুপায় হয়ে তাদের বাচ্চাকে ছেড়ে যেতে হত। আর একের পর এক শিশু নিখোঁজ হতেই থাকল। গ্রামবাসীদের দুরবস্থা যখন চরমে, তখন শহর থেকে এক শিকারি সাহেব এলেন।'

এই অবধি বলেই একটু দম নিতে থামলেন নটিয়াল। একটা সুগভীর শ্বাস টানলেন। মোতি ততক্ষণে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে বলল—'ফির?'

'তারপর আর কী! সাহেব সঙ্গে করেই বেশ কয়েকটা নধর ছাগল এনেছিলেন। সেগুলোকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করলেন। সারা রাত ছাগলের কাছেই মাচান বেঁধে পাহারা দিলেন। কিন্তু কিছুই ঘটল না। হায়না, নেকড়ে বা শেয়াল—কিছুই তার ফাঁদে পড়ল না। যেন সে জানত যে তার জন্যই ওখানে ফাঁদ পেতে বসে আছে শিকারি। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন সাহেব।' একটু বিরতি দিয়ে ফের বলতে শুরু করেন তিনি—'তখন একদিন গ্রামবাসীরা সব পঞ্চায়েতে জড়ো হল। সেখানে সবাই মিলে এই সিদ্ধান্তে এল যে এটা কোনো সাধারণ পশুই নয়। গুলি-গোলা দিয়ে ওটাকে মারা যাবে না। যাদের বাচ্চা হারিয়ে গিয়েছিল, তারা বলল, এটা কোনোভাবেই কোনো জানোয়ারের কাজ হতে পারে না! কারণ বাচ্চা ওদের চারপাইয়ের পাশে ঝুলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। কোনো হায়না বা নেকড়ে যদি এ কাজ করত, তবে সামান্য আওয়াজটুকুও পাওয়া যেত। কিন্তু তাও পাওয়া যায়নি। এ কোনো পশুর নয়, মানুষের কাজ। ওদের মধ্যে একজন বলল, এটা কোনো তান্ত্রিকের কাজ হলেও হতে পারে। ওরা শিশুবলি দেয়। এমনকি কেউ কেউ তো এমনও বলল যে শিশুদের কচি মাংস নাকি কোনো কোনো তান্ত্রিক খেয়ে থাকে।'

মোতি রুদ্ধশ্বাসে গল্প শুনছিল। এ তো প্রায় এখনকার ঘটনার মতোই! পার্থক্য একটাই। তখন শিশুরাই প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর এখন শিশু-বৃদ্ধ-যুবক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হত্যালীলা চলছে। নয়তো গোটা গল্পটাই প্রায় এক!

নটিয়াল বলতে থাকেন—'তখন সবার মনে পড়ল যে গ্রামের শেষপ্রান্তে বুড়ো ওক গাছের নীচে এক তান্ত্রিক থাকে বটে। ভয়ংকর তার চেহারা! সবাই তাকে ভয় পায়। কিন্তু তান্ত্রিক কোনোদিন মন্দিরে আসেনি। বরং সে নিজের ঘরেই কীসব তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর আশ্চর্যের বিষয়, অন্যান্য সাধু, সন্ন্যাসী বা তান্ত্রিকের মতো সে ভিক্ষা করে না। তাকে কেউ কখনো বাজার বা হাট করতেও দেখেনি। তার ভয়াবহ চেহারার জন্য কেউ তার কুটিরে যেতও না যে ভক্তরা ভেট নিয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সকলের মনে প্রশ্ন উঠল যে, তবে তান্ত্রিক খায় কী! অনাহারে থাকে বলেও তো মনে হয় না। রীতিমতো দশাসই মাংসল চেহারা! সবার মনে সন্দেহ দেখা দিল। উত্তেজিত জনতা ভয়-ডর ভুলে সটান চড়াও হল তার বাড়িতে। তান্ত্রিক তখন ঘরে বসে সাধনা করছিল। গ্রামবাসীরা কোনো কথা না বলেই ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। যা দেখল তাতে তাদের চক্ষু চড়কগাছ! তান্ত্রিকের সারা মুখে, হাতে রক্ত! তার সামনের পাত্রে একটা কয়েকমাস বয়সি শিশুর মৃতদেহ! আশেপাশে নরকরোটি, ছোটো ছোটো হাড়, শিশুদের কংকাল! কয়েক মুহূর্তেই সবাই বুঝতে পারল যে সব এই তান্ত্রিকেরই কীর্তি! সে—ই শিশুদের মেরে চলেছে।'

মোতি একদৃষ্টে নটিয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়! এমনও হতে পারে! এমনও হওয়া সম্ভব! এ যে অবিশ্বাস্য!

'গ্রামবাসীরা একেই খেপে ছিল। তার ওপর এই নৃশংস কর্মকাণ্ড! তারা তান্ত্রিককে গাছের সঙ্গে বেঁধে প্রথমে খুব মারল। একেবারেই মেরে ফেলতে যাচ্ছিল, তখন আমার বাবা তাদের আটকালেন। বাবাও তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপার কিছুটা জানতেন। তিনি বললেন, তান্ত্রিককে এভাবে মেরে ফেললেই সমস্যার সমাধান হবে না। ও তন্ত্রসাধক। ওর ক্ষমতার জোর অনেক বেশি। মরে গেলেও সে আবার ফিরে আসবে। এবার আসবে ভয়ংকর আত্মার রূপে। তখন ওকে ঠেকানো অসম্ভব।'

'তাহলে?'

মোতির প্রশ্নে একটু হাসলেন তিনি—'একটাই উপায় ছিল। ওর অগ্নিসংস্কার করে দেওয়া। অর্থাৎ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা। সকলে মিলে তাই করল। তান্ত্রিককে গাছের সঙ্গে পুড়িয়ে মারল। তারপর ওর দেহাবশেষ ও ভস্ম ভাসিয়ে দিল পিণ্ডর নদীর জলে। সেই থেকে গ্রামে শিশু চুরি ও হত্যা থামল!'

পুরো গল্পটা শুনে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে থাকল মোতি। তার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কোনো মানুষ এমন কাণ্ড করতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে এখন এসব কে করছে! আগের মতোই কোনো তন্ত্রসাধক? এত বছর পরে আবার কার মধ্যে রক্তমাংসের লোভ উদগ্র হয়ে উঠল! এ গ্রামে বা আশেপাশে তো কোনো তান্ত্রিক নেই! তন্ত্র জানা একটা লোকই আছে তার পরিচিতের মধ্যে...!

সে অনিমেষে তাকিয়ে থাকে পণ্ডিত নটিয়ালের দিকে। এই চির পরিচিত মুখের পেছনে আরও একটা অপরিচিত ভয়ানক মুখ

লুকিয়ে নেই তো! চিতাবাঘের পায়ের ছাপটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই ওঁর পায়ের ছাপ শুরু হয়েছে কেন! কী করতে এখানে এসেছিলেন তিনি! যেখানে প্রতিমুহূর্তে প্রাণের ঝুঁকি, সেই নরখাদকটার রাজ্যে এমন নিশ্চিন্তে কোন মতলবে থেকে গেলেন নটিয়াল!

তার মুখের ভাব লক্ষ করেছেন পূজারি। তিনি আস্তে আস্তে বললেন—'কী হল! অমনভাবে তাকিয়ে আছিস কেন? তুই আবার আমাকেই সন্দেহ করছিস না তো?'

বলতে বলতেই অট্টহাস্য করে উঠলেন নটিয়াল পণ্ডিত। মোতি তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়েছিল। একটা জিনিস দেখে চমকে উঠল সে।

ওঁর শ্বদন্ত দুটো বড়ো বেশি তীক্ষ্ণ মনে হচ্ছে না!

অরণ্যের রাতের অন্ধকারকে বর্ণনা করা মুশকিল।

কাজল কালো আঁধারের বুকে আরও ঘন কালো হয়ে রয়েছে পাইন ও দেওদারের জঙ্গল। তার ফাঁক দিয়ে একফালি চাঁদ উঁকি মারছে। চাঁদের আলোকে পেছনে রেখে অরণ্য যেন ছায়া ছায়া সিল্যুয়েটে পরিণত হয়েছে। জ্যোৎস্নায় খাদের বুকের ছোটো ছোটো ঝোরাগুলোকে রুপোয় মোড়া বলে মনে হয়। মৃদু মৃদু হাওয়া গাছের পাতাগুলোকে অল্প অল্প ছুঁয়ে যায়। একপাশে নীলাভ শৈলশিরার বিরাট ছায়া। অন্যদিকে গভীর খাদ রহস্যময় ধোঁয়া নিয়ে নেমে গিয়েছে নীচের দিকে।

আজ আকাশ মেঘমুক্ত। তাই জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক অদ্ভুত মায়াবী লাগে। মনে হয় এ শুধুমাত্র অরণ্য নয়, বরং রূপকথার রাজ্য! এখানেই হয়তো অন্ধকারে হিরে-মানিকের ফুল জ্বলে! কোনো গোপনস্থানে ফুটে থাকে সোনার ব্রহ্মকমল। তাকে পাওয়ার জন্যই রূপকথার রাজপুত্র, কোটালপুত্ররা দল বেঁধে নেমে পড়ে অভিযানে। কিংবা এমন রাতেই বুঝি কোনো রাক্ষসী মানুষের খোঁজে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়! অতিকায় পাইনগাছের মতো তার দেহ! চোখ দুটো বড়ো বড়ো ও জ্বলজ্বলে। গাছের বিরাট শাখার মতো তার দুই হাত ছড়িয়ে শিকার খুঁজে বেড়ায়।

গোটা গ্রামে এখন শ্মশানের নীরবতা! কিছুদিন আগেও মানুষজনের উপস্থিতিতে, তাদের আলাপে-প্রলাপে, শিশুদের হাসি-কান্নায় সরগরম ছিল এলাকাটা! আজ আর কিছুই নেই। কোথাও একবিন্দু আলোও নেই! চতুর্দিকে শুধু শূন্যতা ও নীরবতা খাঁ খাঁ করছে। পাথরের খালি বাড়িগুলো যেন মূক দর্শকের মতো থম মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাঁদের আলোয় একরাশ বিষণ্ণতা মেখেছে সারা দেহে। যেন স্বজনদের হারিয়ে ভেতরে ভেতরে কাঁদছে তারা! সবই তো রয়েছে আগের মতো! দূরের অরণ্য আগের মতোই রহস্যময়, গভীর। নীল আকাশ এখনও জমকালো ও নক্ষত্রখচিত। ছোটো ছোটো ঝোরা আজও চঞ্চল বালিকার মতো পাথরের বুকের ওপর দিয়ে নানা বিভঙ্গে নাচতে নাচতে চলেছে। ধাপ-কাটা খেতগুলো এখনও মানুষের স্পর্শের জন্য অপেক্ষারত। প্রকৃতি তার সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে বসে আছে—কিন্তু দেখবার জন্য মানুষগুলোই নেই! হয়তো আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না আজন্মপরিচিত এই মাটির বুকে।

মোতি চুপ করে নিজের ঘরে বসেছিল। এই গোটা গ্রামে এখন দুটো মানুষই রয়েছে। সে আর পণ্ডিত নটিয়াল। পূজারি ঠাকুরের ঘরটা মন্দিরের কাছে। তেন্দুয়াটা যদি পিশাচ বা দানব জাতীয় কিছু হয়ে থাকে তবে সে মন্দিরের আশেপাশে ঘেঁষবে না। সেদিক দিয়ে ঠাকুর নটিয়াল কিছুটা হলেও নিরাপদ। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে ঠাকুরও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই আছেন। মোতি তাঁকে অনুরোধ করেছিল ওর বাড়িতে এসে থাকার। কিন্তু নটিয়াল তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন। মৃদু হেসে বলেছেন—'জন্ম-মৃত্যু সব তাঁর হাতে রে মোতি! তিনি চাইলে আমি বেঁচে থাকব। নয়তো নয়। আমার ঠাকুরের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।'

মোতি আর জোরাজুরি করেনি। তবে পূজারিজির বাড়িটা এখান থেকেই দেখা যায়। সে জানলা দিয়ে সেদিকেই নজর রাখছিল। কে বলতে পারে, হয়তো নরখাদকটা এসে ওঁর বাড়িতেই হামলা করল! আজ রাতটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এ ক-দিন তেন্দুয়াটা আশেপাশের গ্রামে আক্রমণ করেছে। এবার হয়তো ওদের পালা। মোতির মন বলছিল, চিতাবাঘটা আজ এ গ্রামেই আসবে।

অন্ধকার বুঝি গলা টিপে মারতে আসছে। সহ্য করতে না পেরে মোতি আস্তে আস্তে লণ্ঠনটাকে জ্বালিয়ে দেয়। তার মনে পড়ে যায়, প্রতি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে প্রদীপ জ্বালত গৌরী। তার পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটো শঙ্খকে স্পর্শ করে তাতে যেন প্রাণসঞ্চার করত। মঙ্গলময় ধ্বনিতে বেজে উঠত শঙ্খ। মোতির লক্ষ্মীছাড়া ঘর একটা কল্যাণী হাতের স্পর্শে হয়ে উঠত পবিত্র! নন্দাদেবী, মহাদেবের পুজো করত সে। এত শক্তিশালী দেব-দেবী মিলেও সেই ছোট্ট প্রাণটাকে বাঁচাতে পারল না! তাহলে কীসেরই বা দেবতা! কীসেরই বা দৈবী শক্তি!

সে সজল দৃষ্টিতে চতুর্দিকটা একবার দেখে নেয়। ঘরের এক পাশে টিনের তোরঙ্গে গৌরীর ঘাগরা-চোলি এখনও সযত্নে গুছিয়ে রাখা আছে। যেন এখনই সে গা ধুয়ে এসে পরবে! ওর মধ্যেই সুন্দর করে গুছোনো তার সাজার সরঞ্জাম। রেশমি চুড়ির বড়ো শখ ছিল মেয়েটার। লাল, নীল, সবুজ রঙের রেশমি চুড়ি এখনও চিকমিক করে উঠছে। তার গলার কাজ করা রুপোর হারটাও গৌরী সযত্নে রেখে দিয়েছে। একজোড়া রুপোর কানের বালিও শখ করে বানিয়ে দিয়েছিল মোতি মেয়েকে। সে বালি দুটোও পাওয়া গেল এখানেই। একটা সুন্দর পাথরের খাঁজকাটা চিরুনি, চুলের তেল, কাঁটা সব কিছুই তার নির্দিষ্ট জায়গায় রয়েছে। মাঝখান দিয়ে শুধু মানুষটাই 'নেই' হয়ে গেল!

মোতি পরম আদরে জিনিসগুলো স্পর্শ করে। চিরুনিটায় এখনও ক-গাছি চুল লেগে আছে। প্রাণে ধরে ফেলে দিতে পারেনি। ওর মধ্যে যে গৌরীর গন্ধ মিশে আছে! সে আস্তে আস্তে জামাকাপড়গুলো তুলে ধরে বুক ভরে ঘ্রাণ নিতে থাকে। এই তো! গৌরীর সুগন্ধ এখনও লেগে আছে। তার মনে হল, সবার অগোচরে একটা ছোট্ট মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে

ঠিক তার পেছনে। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এদিকেই।

'আমায় মাফ কর মা!' মোতির চোখ বেয়ে অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ে। সে রঙিন জামাকাপড়গুলো বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে ওঠে—'আমি তোকে বাঁচাতে পারিনি! আমি তোর কথা শুনিনি! অপদার্থ বাপটাকে ক্ষমা করে দে! ক্ষমা করে দে আমায়...!'

নিস্তব্ধ রাত্রি কোনো উত্তর দেয় না। শুধু মোতির চাপা কান্নার শব্দ শোনা যায়। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! যে ভুল সে করেছে, তার কোনো ক্ষমা নেই। এ জীবনে হয়তো নিজেকে কখনই মাফ করতে পারবে না। কেন যে সে গৌরীর কথাকে গুরুত্ব দিল না! কেন যে অন্ধকার নামার আগেই ফিরে এল না!...

এখান থেকেই মন্দিরের আলো দেখা যায়। সন্ধ্যারতির পর প্রদীপ দিয়ে গোটা মন্দির সাজিয়েছেন পূজারি! ঝলমলে আলোকমালায় সেজেছে মন্দির চত্বর। কিন্তু সে আলো উগ্র নয়। বরং প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে সেই আভায়। ঘন অন্ধকারের মধ্যে সে পবিত্র আলো বড়োই সুন্দর লাগছিল। মোতির ব্যথাতুর মনকে যেন খানিকটা শান্ত করল সেই দৃশ্য। সে চোখের জল মুছে অনিমেষে তাকিয়ে থাকল সেই আলোর দিকে। ওইখানে রয়েছেন সবার পূজনীয় ঈশ্বর! সবাই বলে, তিনি নাকি করুণাময়! কী করুণা দেখিয়েছেন তিনি মোতির প্রতি! মোতি তো দূর, ওই ছোট্ট দশ বছরের নিষ্পাপ বালিকার প্রতিও তাঁর বিন্দুমাত্র করুণা হল না! ওকে এমন বীভৎস মৃত্যু দিয়ে কোন করুণা দেখাতে চাইলেন তিনি!

কথাগুলো মনে হতেই একটা তীব্র বিতৃষ্ণা অনুভব করল সে। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে যাবে, হঠাৎই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে গেল মোতি। মন্দিরের আলোকে পশ্চাৎপটে রেখে কে যেন অন্ধকার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে আসছে এদিকেই! যেহেতু আলোটা তার পেছনদিকে তাই মানুষটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাকেও ছায়া বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত সন্ত্রস্ত তার ভঙ্গি। প্রতিটা পদক্ষেপ সতর্কভাবে ফেলছে। হাবেভাবে মনে হয়, যেন কোনো অপরাধ করতে চলেছে। মোতি সবিস্ময়ে দেখল, ছায়ামূর্তিটি একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে! এ হাঁটার ভঙ্গি তার পরিচিত! পণ্ডিত নটিয়াল! তিনি এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন! তা-ও এমন চুপিচুপি! লোকটার কি ভয়-ডর নেই! যেখানে চতুর্দিকে এক নরখাদকের সন্ত্রাস, সেখানে এই অন্ধকার রাতে একা একা কোথায় চলেছেন! জন্তুটা ওঁকে আক্রমণ করলে কি শিবজি বাঁচাতে আসবেন! এমন কী প্রয়োজন পড়ল যে রাতের বেলায় একলা বেরোতে হল তাঁকে!

মোতি ভাবল জানলা দিয়ে পণ্ডিতজিকে ডাকবে। কিন্তু সে কিছু করার আগেই তিনি হনহন করে হেঁটে জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! নটিয়াল কি নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করতে গেলেন! ওঁর হাতে তো লণ্ঠনও নেই! অন্ধকারে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করা মৃত্যুরই শামিল! এমনিতেই এদিকে বন্যপ্রাণীর অভাব নেই। বাঘ, পাহাড়ি ভালুক, শিয়াল, হায়নার মতো মাংসাশী প্রাণী তো আছেই, তার সঙ্গে আবার সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে নরখাদক লেপার্ড! পিশাচ হোক আর যাই হোক, জন্তুটা ভয়ংকর। তার ওপর পণ্ডিতজি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। নরখাদকটা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও কিছু করতে পারবেন না! এ কি অতিরিক্ত সাহস না নিছকই বোকামি!

মোতি কিছু বলার বা করার আগেই নটিয়াল হনহনিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। সে কিছুক্ষণ বেকুবের মতো জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে আবার চারপাইয়ের ওপর বসে পড়ে। তার দু-চোখে অদ্ভুত এক সংশয় ঝিকিয়ে ওঠে। পূজারিজির হাবভাব বড়োই রহস্যময়! আগে শুনেছিল যে, তিনি নাকি চোখে কম দেখেন বলে রাতের বেলা বিশেষ বাইরে বেরোতে চান না। কিন্তু এখন তো দিব্যি হনহনিয়ে চলে গেলেন! দেখে তো একবারের জন্যও মনে হল না যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি কম! বরং মনে হচ্ছিল রাতে তিনি অন্যান্য সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক ভালো দেখেন!

মোতির দৃষ্টি সন্দেহকুটিল হয়ে ওঠে। সে ভাবল, পণ্ডিতজিকে অনুসরণ করলে কেমন হয়! এত জোরকদমে কোথায় চলেছেন তিনি? তা-ও আবার জঙ্গলের দিকে! সে তাড়াতাড়ি উঠে লণ্ঠনের পলতেটাকে বাড়িয়ে দেয়। হাতের কাছেই ছিল রাম-দাটা। এক হাতে লণ্ঠন, আরেক হাতে সেটাকে নিয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার খিল খুলতেই যাবে, তার আগেই একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আটকে দিল। সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ায়।

বাইরে তখন সমস্ত শব্দ স্তব্ধতায় লীন হয়ে গিয়েছে। নীলাভ ধোঁয়াশা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। দূরের অরণ্য হালকা হালকা হাওয়ায় মৃদু দুলছে। যেন কোনো অনির্দিষ্ট ইশারায় মাথা দোলাচ্ছে গাছগুলো। চাঁদের আলোয় চতুর্দিক রুপোলি। আকাশ স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। রক্তকাঞ্চনের লতায় খেলে বেড়াচ্ছে শিরশিরে হাওয়া। কোনো বুনোফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়!

ঠিক তখনই মোতির মনে হল, ঘরের বাইরে, চারপাশে কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে!

বাইরে তখন অন্ধকার ও জ্যোৎস্নায় আলো-আঁধারি পরিবেশ! যেটুকু দৃষ্টিসীমার মধ্যে রয়েছে সবই ছায়া ছায়া। তবু জানলা দিয়ে বাইরের দিকটা দেখার চেষ্টা করল মোতি। তার মনে হল, হালকা একটা পদশব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে ঘন নিঃশ্বাস টানার আওয়াজও! কিন্তু শব্দটা এক জায়গায় স্থির নেই। বরং বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

'কে?'

লণ্ঠনটাকে জানলার কাছে নিয়ে এসে সাবধানে বাইরের দিকে তাকায় মোতি। বাইরে তো কেউ নেই! কাউকেই দেখা যাচ্ছে না! অথচ পায়ের আওয়াজটা সে ঠিকই শুনেছিল। এখনও তার মনে হচ্ছে, এই বাড়িটাকে কেউ নিঃশব্দে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। এ কী ধরনের অলৌকিক অনুভূতি! কেউ নেই, অথচ মনে হচ্ছে কেউ আছে! আছেই!

খণ্ডমুহূর্তের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই একটা শক্তিশালী ধাক্কা এসে

আছড়ে পড়ল দরজার ওপরে! এখানকার বাড়িগুলো পাথরের হলেও দরজা কাঠের। মোতির মনে হল একটা অশান্ত ঝড় তার দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাইছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল একটা চাপা গরগর শব্দ! শয়তানটা এসেছে! একেবারে বাড়িতেই এসে হাজির! যেন তাকে ছুড়ে দিচ্ছে অশ্রুত চ্যালেঞ্জ—'খুব তো আমায় মারতে চেয়েছিলি তাই না? এবার সামনাসামনি লড়াই করে দেখা।'

ধাক্কার চোটে কাঠের দরজাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আশঙ্কা হয়, কয়েক ধাক্কাতেই ভেঙে যাবে বুঝি! শুধু ধাক্কা নয়, মোতি টের পেল তেন্দুয়াটা এবার তার দরজা আঁচড়াচ্ছে! প্রচণ্ড ঘসঘস শব্দ হচ্ছে। কিন্তু ও টের পেল কী করে যে শূন্য গ্রামে একটা মানুষ এখনও একা রয়ে গিয়েছে! সারা গ্রামে যে কেউ নেই, তা নিশ্চয়ই তার জানা। নিশ্চয়ই ঘুরে দেখেছে গোটা এলাকাটা। কিন্তু সে বুঝল কী করে যে এই বাড়িতেই একজন মানুষকে পাওয়া যাবে! লণ্ঠনের আলোই কি তবে ওকে এখানে টেনে এনেছে? না আগে থেকেই জানত যে এ বাড়ির মানুষটা এখনও গ্রাম ছেড়ে যায়নি!

মোতি শক্ত করে রাম-দাটাকে চেপে ধরে। দরজা যদি ভাঙে তবে চিতাবাঘটাকে সে দেখে নেবে। এমনিতেই যে কোনো মাংসাশী প্রাণীর কাছে মানুষ অত্যন্ত সহজ শিকার। না তার দাঁত-নখ আছে, না ধারালো শিং বা খড়্গ! হাতির মতো বলশালীও নয় আবার সজারুর মতো কাঁটাওয়ালাও নয়! প্রতিরোধশক্তি নিতান্তই কম। এতদিনের নরখাদক জীবনে চিতাবাঘটা সে সত্য বুঝে গিয়েছে। তাই বুঝি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। আজ ওকে উচিত শিক্ষা দেবে মোতি! প্রতিশোধকামী মানুষ যে বাঘের চেয়েও ভয়ংকর হতে পারে তা বুঝিয়ে দেবে।

দরজার ওপর ধাক্কার জোর আরও বাড়ল। প্রাণীটা যে অতিকায় সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ওর থাবার ছাপও সাধারণ চিতাবাঘের থেকে বড়ো। গায়ে যেন অসুরের জোর! পণ করে নিয়েছে আজ দরজা ভেঙেই ছাড়বে। সে কখনো দরজায় ধাক্কা মারছে। কখনো আঁচড়িয়ে কাঠ কুচি কুচি করছে। উন্মত্তের মতো লেগে রয়েছে মোতির সঙ্গে। যেন আজ এর শেষ দেখেই ছাড়বে! থেকে থেকেই গলার গভীরে গরগর করছে। আবার কখনো বা শোনা যাচ্ছে তার হিংস্র গর্জন! সে গর্জন শুনলে রক্ত জল হয়ে যায়!

লণ্ঠনের আলোয় মোতি দেখল দরজায় চিড় ধরেছে। জন্তুটা নাছোড়বান্দা। লেপার্ডের ঘ্রাণশক্তি বিশেষ নেই। তাই ওর পক্ষে মানুষের গন্ধ পাওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও সে ঠিক খুঁজে নিয়েছে শিকারকে! এত সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না। একেবারে মরিয়া হয়ে ধাক্কা মারছে দরজায়। সে-ও ভেতরে ভেতরে নিজেকে প্রস্তুত করল লড়ার জন্য। আজ একটা লড়াই তবে হয়েই যাক! মোতি এদিক-ওদিক তাকাতেই দেওয়ালের এককোণে রাখা পাইনকাঠের মশাল দেখতে পেল। সচরাচর রাতের বেলায় লণ্ঠন ও পাইনকাঠের মশালই ওদের আলো জোগায়! সেটাকে তুলে নিয়ে সে তৈরি হল আসন্ন যুদ্ধের জন্য।

কাঠের দরজার ওপর গভীরভাবে নখ বসিয়ে দরজাটাকে প্রায় ফালাফালা করে দিচ্ছিল পিশাচটা! তার পরিশ্রম অবশেষে সফল হল। দরজার গায়ে একটা গর্ত করে ফেলেছে সে। খিলটা খুলে পড়বে পড়বে করছে। আর বেশ কয়েকবার ধাক্কা দিলে দুর্বল দরজা আর প্রতিরোধ করতে পারবে না। এখন মোতি আর তেন্দুয়াটার মাঝখানে শুধু একটি কাঠের পলকা দরজা, যেটা প্রায় ভাঙতেই বসেছে! ওকে আর বেশিক্ষণ আটকে রাখা যাবে না!
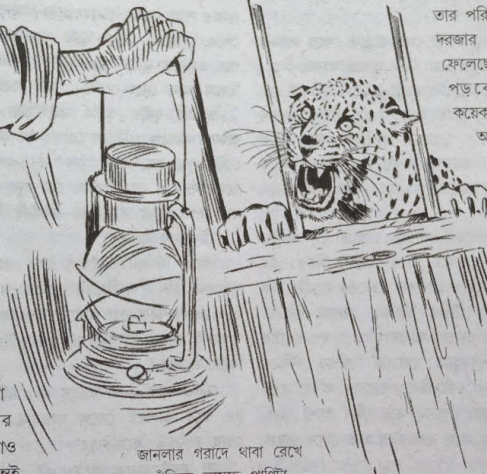
জানলার গরাদে থাবা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাণিটা

মোতির বুকের ভেতরটা গুম গুম করছে। হৃৎস্পন্দন প্রায় কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। যতই সাহসী হোক, অন্ধকার রাতে এক নরখাদকের মুখোমুখি হওয়া যথেষ্টই ভয়ের ব্যাপার। তার কপাল বেয়ে ঘামের ফোঁটা টপ টপ করে পড়ছে। এখনও চিতাবাঘটা তার দৃষ্টিসীমার বাইরে। কিন্তু তার ভয়াল গর্জন শুনে বুঝতে বাকি থাকে না যে সে শুধু দশাসই-ই নয়, অসম্ভব ক্রূর ও নিষ্ঠুরও বটে।

আর কয়েক মুহূর্ত মাত্র। এখনই ভেঙে যাবে দরজা তারপর...!

হঠাৎ করেই আবার চতুর্দিকে নীরবতা ছেয়ে গেল! এতক্ষণের উগ্র আক্রমণ আচমকাই যেন শান্ত হয়ে গেল। মোতি তার ভবিতব্যের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু তেন্দুয়াটা অজানা কারণে রণে ভঙ্গ দিয়েছে! তার মন পরিবর্তনের কারণ কী তা ঠিক বোঝা গেল না! এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, দরজাটা সে ভেঙে

গুঁড়িয়ে ছাড়বে। অথচ দরজা যখন সত্যিই জখম হয়ে ভাঙার উপক্রম করছিল, ঠিক তার আগেই সে হাল ছেড়ে দিল।

হাল ছেড়ে দিল, না আক্রমণের পরিকল্পনা পরিবর্তন করল? মোতি উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করে। এখনও কি তার পায়ের শব্দ শোনা যায়? কিংবা চাপা গরগর আওয়াজ! সে এখনও বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে না তো! কিন্তু সেরকম কোনো লক্ষণ টের পাওয়া যায় না। তবে কি চলে গেল?

মোতি নিজেকেই নানান প্রশ্নে জর্জরিত করছিল। পশুটার হাবভাব কিছুই সে বুঝে উঠতে পারছে না! সে এলই বা কেন, আর লড়াইয়ের মাঝখানেই পূর্ণবিরতি টেনে দিয়ে চলে গেলই বা কেন! কী ছিল তার উদ্দেশ্য! এসোব কথা চিন্তা করতে করতেই তার চোখ পড়ল জানলায়! সে দিকে দেখতেই ও চমকে উঠেছে! ও কী! জানলার গরাদে থাবা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাণীটা! চলে যায়নি। বরং জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তারই দিকে।

বিস্ময়ের ধাক্কায় আরেকটু হলেই মোতির হাত থেকে লণ্ঠনটা পড়ে যেত। একটা বিরাট গোল মাথা উঁকি মারছে জানলা দিয়ে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় তার ভেলভেটের মতো চামড়ায় বুটিদার ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! দুটো ভয়াবহ হলুদ নৃশংস চোখ অসম্ভব লালসায় ও রাগে ধিকিধিকি জ্বলছে। লেপার্ডটা তার দিকে তাকিয়েই একবার কানদুটো ছড়াল। ভাবটা এমন যেন বলতে চায়—'তুই আমায় দেখতে চেয়েছিলি না? এখন তো দেখে ফেলেছিস। এবার?'

মোতি পুতুলের মতো ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে একটুও ভয় না পেয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জন্তুটার দিকে। এই সেই শয়তান যে গৌরীকে খেয়েছে! তার চোখের সামনে এক মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠল গৌরীর ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহটা! চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। ওই ধারালো থাবায় ছিঁড়েছে দশ বছরের মেয়েটার বুক! হয়তো শেষমুহূর্তে মেয়েটা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছিল! হয়তো সে ব্যথায় কেঁদেছিল! বারবার মরিয়া হয়ে করুণ স্বরে ডেকেছিল নিজের বাবুকে। মনে ক্ষীণ আশা ছিল, যাই হোক না কেন, তার বাবু এসে রাক্ষসটার হাত থেকে তাকে বাঁচাবে!

কিন্তু আসেনি! কেউ আসেনি! মোতির চোখে জল আর রক্ত দুই-ই জমল। শয়তানটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। আজ হোক, কাল হোক—ওকে মরতে হবেই। আর মোতির হাতেই ওকে মরতে হবে!

দুজনেই দুজনের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকে। পরক্ষণেই লেপার্ডটা প্রচণ্ড একটা গর্জন করে ওঠে। ধারালো হিংস্র দন্তপঙ্‌ক্তি লণ্ঠনের আলোয় চকচক করছে! দেখলেই ভয় করে! মনে হয়, এখনই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে মোতিকে! নরমাংস-রক্তের স্বাদ পেয়েছে ওর জিভ! এত সহজে ছাড়বে না।

কিন্তু আদতে তেমন কিছুই হল না! একবার গর্জে উঠেই চুপ করে গেল সে। তারপর জানলা থেকে সরে গেল। চাঁদের আলোয় দেখতে পেল মোতি, চিতাবাঘটা চলে যাচ্ছে! শিকারকে স্পর্শ না করেই ফিরে যাচ্ছে এখান থেকে! জ্যোৎস্নায় চকচক করছে তার রেশমি চামড়া। যেন কোনোরকম তাড়া নেই, এমনই দুলকি চালে চলে যাচ্ছে সে। মোতি লক্ষ করল, তার চলার মধ্যে কী যেন একটা অসঙ্গতি আছে! ঠিক অন্যান্য প্রাণীদের মতো মসৃণ গতিতে এগোচ্ছে না সে। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল তার।

চিতাবাঘটা একটু খুঁড়িয়ে হাঁটছে!

'কাল রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন পণ্ডিতজি?'

সকালের পূজা-পাঠ শেষ করে 'ছোটা হাজরি' তথা প্রাতরাশ সারছিলেন নটিয়াল। মোতির প্রশ্নটা শুনে একটু হাসলেন—'পাশের গ্রামের সবাই চলে গেলেও তোর-আমার মতোই দু-তিন ঘর লোক থেকে গিয়েছে। ওদের মধ্যে একজনের ভাবারী বুখার হয়েছিল। প্রায় এখন-তখন অবস্থা। আমায় যেতে বলেছিল। সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম বলে যেতে পারিনি। তাই রাতে গিয়ে দেখে এলাম।'

ভাবারী বুখার অর্থাৎ ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া এই পাহাড়ি অঞ্চলে অত্যন্ত পরিচিত রোগ। বহু মানুষই এই রোগে ভোগে। কেউ সুস্থ হয়, কেউ হয় না। এখানে আশেপাশে কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল তো দূর—কোনো ডাক্তারই নেই! ফলস্বরূপ ওদের বাঁচা-মরা—সবটাই ঈশ্বরের হাতে।

'ফিরলেন কখন?'

'রাতে ফিরিনি।' খাওয়া শেষ করে থালাটা সরিয়ে রেখে বললেন তিনি—'এমনিতেই রাতের বেলায় নরখাদকটার উপদ্রব। তার ওপর ঠিকমতো চোখে দেখতেও পাই না। তাই রাতে ওখানেই থেকে গেলাম। সকালে ভুটিয়া তারা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছি।'

মোতি আর কথা বাড়ায় না। নটিয়াল তার দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন—'কাল রাতে পিশাচটা কি তোর বাড়িতে এসেছিল?'

সে একটু চমকে ওঠে। এই খবরটা পূজারি ঠাকুরকে দিল কে! যখন তেন্দুয়াটা এসেছিল, তখন তো তিনি গ্রামে উপস্থিত ছিলেন না! ভুটিয়া তারা, অর্থাৎ শুকতারা ওঠার অনেক আগেই সে চলে গিয়েছিল। যদিও সারা রাত মোতি ঘুমোতে পারেনি। তার বারবার মনে হচ্ছিল, আবার বুঝি অদৃশ্য কেউ তার বাড়ির পাশে চক্কর লাগাচ্ছে! অথবা এই বুঝি জানলায় কোনো মাথা দেখা গেল! মাঝেমধ্যেই তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পাচ্ছিল দরজা আঁচড়ানোর প্রবল শব্দ। ফলস্বরূপ বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। কিন্তু সেসব তো নটিয়ালজির জানার কথা নয়!

মোতির সপ্রশ্ন দৃষ্টি লক্ষ করেই জবাব দিলেন তিনি—'যখন ফিরছিলাম, তখন তোর বাড়ির দরজাটা চোখে পড়ল! দরজার বাইরে বড়ো বড়ো আঁচড়ের দাগ দেখেই বুঝলাম শয়তানটা এসেছিল।'

সে একদৃষ্টে নটিয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'কাল আমি তাকে দেখেছি।'

তিনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন মোতির দিকে। মোতি আস্তে আস্তে বলল—'জন্তুটা খুঁড়িয়ে চলে পণ্ডিতজি। ওর বাঁ-পাটা খোঁড়া!'

নটিয়াল চমকে উঠলেন কি! অজান্তেই তাঁর হাতটা বাঁ-পায়ের হাঁটু স্পর্শ করে গেল। বিস্ময়স্খলিত স্বরে বললেন—'খোঁড়া! ঠিক দেখেছিস?'

মোতি ইতিবাচকভাবে মাথা নাড়ে। আগেই থাবার ছাপ দেখে ব্যাপারটা সে অনুমান করেছিল। কাল স্বচক্ষে দেখেও নিয়েছে। সে আড়চোখে পণ্ডিতজির মুখের দিকে তাকায়। ওঁর মুখ কেমন ফ্যাকাশে ও রক্তশূন্য মনে হচ্ছে। তিনি যেন একটু সামলে নিয়ে বলেন—'হতে পারে ওটাই ওর মানুষখেকো হওয়ার কারণ।'

বাঘ বা লেপার্ড সহজে মানুষখেকো হয় না। বরং এতদিনের অভিজ্ঞতায় মোতি জানে, তারা মানুষকে একটু এড়িয়েই চলে। এ জঙ্গলে তাদের নিজস্ব খাদ্য প্রচুর আছে। শম্বর, কাকার, ঘুরাল বা বনবরা প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। তাই খেয়েই ওরা মহানন্দে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু বিপদ তখনই হয়, যখন হরিণ বা অন্য কোনো জন্তু শিকার করাটা কঠিন হয়ে পড়ে। তার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ অবশ্যই বার্ধক্য। মাংসাশী প্রাণীদের বয়েস হয়ে গেলে শারীরিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। কমে যায় দাঁত ও নখের ধারও। তখন দ্রুতগামী হরিণের সঙ্গে গতিতে পেরে ওঠা কঠিন। তখনই খোঁজ পড়ে অপেক্ষাকৃত সহজ শিকারের। আর মানুষের চেয়ে সহজ শিকার আর কী-ই বা আছে! কিংবা কোনো বাঘ বা লেপার্ড যদি আহত হয়, এবং শিকারে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখনো সে প্রথমে গৃহপালিত পশু, যেমন, ভেড়া, ছাগল বা গরু মারতে শুরু করে। এবং অচিরেই বুঝতে পারে যে ভেড়া, ছাগলের থেকেও সুস্বাদু এবং সহজ শিকার তার সামনেই আছে। সে হল মানুষ! এই জ্ঞানটি হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হয় এবং সে নরখাদকে পরিণত হয়।

মোতি কাল রাতে পশুটাকে দেখেছে। সে আদৌ বৃদ্ধ নয়। বরং রীতিমতো জোয়ান এক চিতাবাঘ। তার ঝকঝকে চামড়া অন্তত তেমনই সাক্ষ্য দেয়। দাঁতও যতদূর দেখেছে ক্ষয়াটে নয়। সম্ভবত নটিয়ালজির কথাই সঠিক। তার বাঁ-পাটা খুঁতো। সেজন্যই সে শিকার করতে অক্ষম। কিন্তু এই জখম বাঁ-পায়ের কথা শুনে নটিয়ালজির মুখ অমন শুকিয়ে গেল কেন! তিনি কি মোতির মনোভাব কিছু আঁচ করেছেন!

এসব ভাবতে ভাবতেই মোতি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল পণ্ডিতজির ডাকে—'মোতি, তুই সকাল থেকে কিছু খেয়েছিস?'

বলাই বাহুল্য, সে সকাল থেকে কিছুই খায়নি। এখন বেশির ভাগ সময়ই হয় অনাহারে, নয় অর্ধাহারে থাকে। তার মনে হয় এ জগৎ-সংসার সবই মিথ্যে! কী হবে রান্না করে! শরীরটাকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া তো আর কিছুই নয়! যে মানুষটা নিত্যনতুন পদ রান্না করত, সবসময়ই বাবুর পছন্দের খাবার বানাত—সে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। আর কেউ হাসিমুখে বলবে না—'দ্যাখ বাবু, তোর জন্য ক্ষীর বানিয়েছি।' খেতে বসলেই মনে পড়ে, একটা মিষ্টি চেহারা তার পাশে বসে থাকত। বাবুর মুখের তৃপ্তি দেখে সে পরম আনন্দ পেত। গরিবের ঘরে খুব বেশি পদ রান্না করার সুযোগ নেই। কিন্তু যেটুকু থাকত তাই বড়ো সযত্নে, সস্নেহে এনে দিত সে। মোতির মনে হত—ওর 'গৌরী' নামটা সার্থক! ও-ই আসলে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার আরেক রূপ। অনেক পুণ্যের ফল হিসাবে তাকে নিজের সন্তান রূপে পেয়েছিল! মোতিই লক্ষ্মীছাড়া, তাই ধরে রাখতে পারল না।

মোতি আলতো করে ইতিবাচক মাথা ঝাঁকাল। মিথ্যে কথা বলল। পণ্ডিতজি যদি জানতে পারেন যে সে না খেয়ে আছে, তাহলেই খেয়ে যেতে জোর করবেন। আর তার খাওয়ার রুচি একেবারেই নেই। কাল রাতের কথা ভেবেই আপশোশ হচ্ছে! কেন যে সে তেন্দুয়াটাকে অত সময় দিল! বরং নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারত তার সামনাসামনি। কিছুক্ষণের জন্য যেন সে-ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। ওই দুটো জ্বলন্ত চোখ বুঝি সম্মোহিত করে ফেলেছিল তাকে। কী করা উচিত তা ভুলে গিয়েছিল ওই মুহূর্তে।

মিথ্যে কথা বললেও নটিয়াল তার মনের কথা টের পেলেন। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে হতভাগ্য মানুষটার ঠিকমতো খাওয়া জোটেনি। তিনি অবশ্য তা প্রকাশ না করেই বললেন—'শিবজিকে প্রসাদ চড়িয়েছিলাম। আর তো কেউ খাওয়ার নেই। তুই-ই নিয়ে যা।'

মোতি এবার আর আপত্তি করল না। ঈশ্বরের ওপর তার অভিমান অবশ্যই আছে। কিন্তু সে অবিশ্বাসী নয়। ঠাকুরের প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করা যে পাপ তা-ও সে জানে। তাই বিনা প্রতিবাদে শিবজির প্রসাদ নিয়ে নিল। মুখে কিছু না বললেও প্রাকৃতিক নিয়মে খিদেও পেয়েছিল তার। তাই চুপচাপ প্রসাদের পুরি আর মিঠাই খেয়ে নিয়েছে দেখে খুশিই হলেন নটিয়াল। আহা! বেচারাকে আদর করে খেতে দেওয়ার কেউ নেই! সারা দিনরাত লক্ষ্মীছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায় কে জানে। বার কয়েক তো তিনি স্বচক্ষেই ওকে ধবলকুণ্ডের সামনে বসে থাকতে দেখেছেন। এই করে হয়তো একদিন প্রাণটাই দেবে মানুষটা। ভাগ্যিস কাল রাতে সে বাইরে বেরোয়নি। নয়তো পিশাচটা ওকে খেয়ে ফেলত!

খাওয়াদাওয়া সেরে পণ্ডিতজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এল মোতি। এখন তার অনেক কাজ। কাল রাতে শয়তানটা তাকে খেতে পারেনি। এর অর্থ সে নিশ্চয়ই অভুক্ত ছিল। তার খোঁড়া বাঁ-পা সাক্ষী দেয় যে শিকার করে খেতেও ও অক্ষম। সুতরাং নিশ্চয়ই এখন তার পেটে খিদে দাউ দাউ করে জ্বলছে। পশুরা মানুষের মতো খিদে সহ্য করে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। হয় সে ইতিমধ্যেই অন্য কোনো শিকার খুঁজে নিয়েছে, নয় এখনও না খেয়ে রয়েছে। যদি মানুষ শিকার করত, তবে এতক্ষণে খবর

পেয়ে যেত। আর যদি গৃহপালিত কোনো প্রাণী শিকার করে থাকে তবে এই বেলা তার মড়িটা খুঁজে রাখা ভালো। সেক্ষেত্রে চিতাবাঘটাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে।

অরণ্যের সূর্যস্নাত সকাল তখন রূপে, রঙে ঝলমল করছে। একদিকে বরফে ঢাকা পর্বতরাজির দিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয় শত শত সোনার বর্শা ছুড়ে মারছে কেউ! পর্বতের নীল শিরায় শিরায় সোনালি রোদ পড়ে চিকমিকিয়ে উঠছে! নীচে পিণ্ডর নদী পাহাড়ের সোনালি প্রতিচ্ছবি আর দু-দিকে পাইনের সবুজের ছোঁয়া নিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। তার স্বচ্ছ জল থেকে থেকে সূর্যালোকে ঝিকিয়ে ওঠে। অন্যদিকে খাদ বেয়ে নেমে গেছে সাদা আর আশমানি রঙের পপির গুচ্ছ। তার সবুজ রঙের ডাঁটি বেয়ে তখনো গড়িয়ে পড়ছে ভোরের শিশির। মাঝখানে কখনো সবুজ ঘাসের গালিচা, কখনো নানা রঙের বুনোফুল।

অরণ্য এখন পাখিদের কলকাকলিতে ভরপুর। কেউ কিচির-মিচির করছে, কেউ বা আবার শিস দিচ্ছে। রসিক দামা, বুলালচশম, সাতসয়ালী আকাশের রঙিন প্রেক্ষাপটকে আরও রঙিন করে তুলছে। কেউ প্রাণভরে গান গেয়ে সকালকে স্বাগত জানাচ্ছে তো কেউ বিক্ষিপ্ত চেঁচামেচি করে রসভঙ্গ করছে। জংলি মোরগের দল মাটি থেকে খাবার খুঁটে খুঁটে খেতে ব্যস্ত। অরণ্যকে যেন সূর্যালোকে আরও সুপুষ্ট, আরও সবুজ মনে হচ্ছে। মাথার ওপরে গাঢ় সবুজ রঙের চন্দ্রাতপ। ওক গাছে পুষ্ট ওক ফল। পার্বত্য ভালুকেরা প্রায়ই এই ওক ফল খেয়ে থাকে। নিবিড় পাইনবনের ফাঁকে ফাঁকে কখনো বুনোকুলের ঝোপ, কখনো বা রাসপবেরির। সাদা, লাল, গোলাপি রঙের অর্কিড ঘন সবুজের মধ্যেই কোথাও কোথাও উঁকি মারছে। কোনো কোনো গাছে বুনোফুলের লতা জড়িয়ে আছে। তাকে ঘিরে উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতিরা। কত রঙের যে সমাহার তাদের ডানায় তা বর্ণনা করা মুশকিল। কোনোটার পাখায় কমলার মধ্যে সোনালির বুটি। কোনোটা আবার আশমানি আর রুপোলিতে মাখামাখি!

মোতি সতর্ক দৃষ্টিতেই নরখাদকটার থাবার ছাপ অনুসরণ করছিল। অরণ্যের সৌন্দর্যে তার মনই নেই। সে দেখতে চায় কাল রাতে তার বাড়ি থেকে ফিরে এসে জন্তুটা ঠিক কোন দিকে গিয়েছিল। তার বাড়ির সামনের রাস্তাতেই চিতাবাঘটা পায়ের ছাপ রেখে গিয়েছে। সেই ছাপ কখনো ফাঁকা জমি, কখনো বা কাঁচা রাস্তা বেয়ে চলেছে জঙ্গলের দিকে। সে আশা করেছিল ক্ষুধার্ত পশুটা হয়তো কোনো গ্রামের দিকে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তার উল্টোটাই হয়েছে। যে কোনো কারণেই হোক, চিতাবাঘটা জঙ্গলের পথই ধরেছে।

অরণ্যের ভেতরে প্রবেশ করতে না করতেই একপাল বাঁদরের চেঁচামেচি শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে গেল মোতি। আশেপাশে কোনো বড়ো জন্তু আছে নাকি! কিন্তু তার বহুদিনের অভ্যস্ত চোখ তেমন কিছু দেখতে পেল না বা নাক কোনো গন্ধের সন্ধান পেল না। কোথাও কোথাও মাটির ওপর বাদামি রঙের পাতার স্তূপে পথ ঢাকা পড়েছে। সে উৎকর্ণ হয়ে শোনে, আশেপাশে পাতার মচমচ শব্দ শোনা যায় কিনা। পাখিদের স্বচ্ছন্দ উড়ান বা তাদের ডাকের মধ্যে কোথাও বিপদসংকেত নেই। তবু কোমরে গোঁজা ভোজালিটার ওপরে হাত রাখল মোতি। তেমন কিছু হলে দেখা যাবে।

চিতাবাঘটা এখান থেকে একটা বাঁক নিয়েছে। থাবার ছাপ দেখে সে নিশ্চিন্ত হল যে তার পায়ে পায়েই এগোচ্ছে। এবং সম্ভবত এখান থেকে ও ধবলকুণ্ডের দিকেই গিয়েছে। কারণ এ রাস্তাটা ধবলকুণ্ডের দিকেই যায়। এখান থেকে নীচের রূপসি উপত্যকা ও রুপোর ফিতের মতো আঁকাবাঁকা পিণ্ডর নদী স্পষ্ট। ওদিকের পাহাড়ে নামমাত্র কয়েকটা গ্রাম। খড়ে ছাওয়া কুঁড়েঘরের পাশাপাশি স্লেটপাথরের ছাদ দেওয়া বেশ কয়েকটা ঘরও চোখে পড়ে। পাহাড়ের পেছনদিকে এবড়োখেবড়ো শিলারাশি প্রমাণ দেয় যে কখনো এখান দিয়ে তুষার ধস নেমেছিল। মোতির বাঁদিক দিয়ে পাহাড় চড়াইয়ের পথে গিয়েছে এবং ডানদিকে অতলান্তিক খাদ! মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে ধবলকুণ্ডের পথে।

মোতি সাবধানে এগোচ্ছিল। রাস্তা যথেষ্টই সংকীর্ণ। তার ওপর মাঝেমধ্যেই রাস্তার ওপর দিয়ে কুলকুলিয়ে চলে গিয়েছে ছোটোখাটো ঝোরা। তার জন্য পথ বেশ পিছল। এবড়োখেবড়ো তো বটেই। এখানে কোনোভাবে পা পিছলে পড়লে কয়েক হাজার ফুট নীচে খাদে পড়তে হবে! তাই যতটা সম্ভব পা টিপে টিপে এগোনোই ভালো। এখান থেকে একমাইল ওপরে আরও একটি গ্রাম আছে। কিন্তু চিতাবাঘটা সে পথেও যায়নি। মোতি এবার নিশ্চিত হল যে সে ধবলকুণ্ডের দিকেই গিয়েছে। এ বিষয়ে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই তার।

সেই সংকীর্ণ, এবড়োখেবড়ো পথে বেশ খানিকটা এগোনোর পরেই কিছুটা ফাঁকা জমি পড়ল। সেখানে তখনো জ্বলজ্বল করছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তবিন্দু! কাল রাতে বৃষ্টি হয়নি বলে রক্তের দাগ ধুয়ে যায়নি। রক্তবিন্দু দেখামাত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠল মোতি। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল রক্তের দাগ অনুসরণ করে। তার মানে, কাল মানুষ শিকার করতে না পেরে চিতাবাঘটা জঙ্গলের কোনো প্রাণীকেই শিকার করেছে। রক্তের দাগের পাশাপাশি তীক্ষ্ণ আঁচড় কাটার লম্বা দাগ। মোতি প্রথমে বুঝে উঠতে পারল না যে এই লম্বা আঁচড়ের দাগটা ঠিক কীসের! লেপার্ডটা এখান থেকে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে গিয়েছে নাকি! কিন্তু তা-ও কীভাবে সম্ভব! সে সম্ভবত শিকারকে ধরে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছিল। মোতির যদি ভুল না হয়, তবে এটা কোনো মৃত হরিণের শিঙের কাজ। যখন চিতাবাঘটা হরিণটাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখনই তার তীক্ষ্ণ সূঁচালো শিং মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে গিয়েছে। মোতি মনে মনে খুশিই হল। ওকে অনুসরণ করার আরও একটা সূত্র পাওয়া গেল।

দাগটা যেদিকে গিয়েছে সেদিকে একটা ছোটোখাটো জলপ্রপাত পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ছে। আর যেখানে পড়েছে সেটাই ধবলকুণ্ড। জলপ্রপাতটা প্রায় পনেরো কি কুড়ি ফুট উঁচু। সাদা ফেনিল জল প্রবল গতিতে বয়ে চলেছে নীচের দিকে। সশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুণ্ডে। ধবলকুণ্ড প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গজ চওড়া একটা জলাশয়। তার জল বেশ গভীর ও স্ফটিক

স্বচ্ছ। এতটাই স্বচ্ছ যে কুণ্ডের তলার নুড়ি পাথর অবধি স্পষ্ট দেখা যায়। এমনকি তলদেশে যে পাঁচ থেকে দশ পাউন্ড ওজনের কতগুলো মাছ খেলা করছে তাও ওপর থেকেই নজরে পড়ে। তার মধ্যে কতগুলো পোনা মাছ আবার কতগুলো বেশ ভারী আকারের মহাশোল। দেখলেই বোঝা যায় যে খেয়েদেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু ধবলকুণ্ডের মাছ কেউ ধরে না। সকলের বিশ্বাস এখানে বনদেবী বিরাজ করেন। এবং ধবলকুণ্ডের মাছ তাঁর খেলার সঙ্গী। তাই কেউ মাছগুলোকে বিরক্ত করে না। বরং সুযোগ পেলে ছোলাভাজা বা অন্যান্য কোনো খাবার খেতে দেয়।

ধবলকুণ্ডের চারপাশে গাছের সমারোহ। ঘন সবুজ গাছের সারির মধ্যে ছন্দপতন ঘটিয়েছে শুধু পাতাবিহীন ন্যাড়া ময়না গাছটা। এছাড়া চতুর্দিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ধবলকুণ্ডের স্বচ্ছ জলেও ঘন সবুজ গাছের প্রতিবিম্ব পড়ে তিরতির করে কেঁপে উঠছে। একটু দূরেই মখমলি মরকত সবুজ ঘাস। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে লম্বা ঘাসবন আর রিংগালের ঝোপ।

মোতি একটু এগোতেই দেখতে পেল দৃশ্যটা। একটা ছোট্ট হরিণের বাচ্চার দেহ পড়ে রয়েছে সেই সবুজ ঘাসের ওপরে! চিতাবাঘটার ধ্যাবড়া পায়ের ছাপ ঠিক তার পাশেই। এখানে বসেই সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। পায়ের আর পেটের মাংস অনেকটাই খেয়ে ফেলেছে। তারপর মড়িটা এখানেই ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। সে তবু চারপাশটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে জরিপ করে নিল। নাঃ, লেপার্ডটা ধারে-কাছে নেই। তবে এখন না থাকলেও হয়তো রাতে মড়ির কাছে ফিরে আসবে অবশিষ্ট মাংসটুকু খেতে।

ছোট্ট হরিণের বাচ্চার দেহ পড়ে রয়েছে...

মৃত হরিণটার বয়েস একেবারেই বেশি নয়। হয়তো কালও সে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। দুষ্টুমি করে খেলাও করছিল। দেখলেই বোঝা যায় শিশু হরিণটা এখনও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেনি। মায়ের স্নেহচ্ছায়াতেই সে বড়ো হয়ে উঠছিল। কাল রাতে মায়ের বুক ঘেঁষে হয়তো পরমশান্তিতে ঘুমিয়েও পড়েছিল। কিন্তু হিংস্র নখ-দাঁত তাকে আর বেড়ে উঠতে দিল না। মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করল করাল মৃত্যুর গহ্বরে! কে বলতে পারে, সন্তানহারা পাগলিনি মা বুঝি এখনও অরণ্যে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ডেকে বেড়াচ্ছে সন্তানকে। ভাবছে, ছোট্ট সোনা বুঝি দুষ্টুমি করে কোথায় লুকিয়ে আছে। মা ডাকছে—'ফিরে আয়...ফিরে আয়...!'

মোতির মনে পড়ে গেল, ঠিক এখানেই পড়েছিল গৌরীর দেহটা। এরকমই ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত! সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সেখানেই। হরিণটার মাথায় আলতো করে হাত বোলাল! যেন ওটা হরিণের শবদেহ নয়, গৌরীর দেহ! বড্ড ব্যথা পেয়েছে বাচ্চাটা। ব্যথা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর কোনোদিন জাগবে না! আর কোনোদিন খেলা করবে না মায়ের সাথে! সে-ও চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল! ঠিক যেমনভাবে গৌরী হারিয়ে গিয়েছিল।

এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়, অবর্ণনীয় কষ্টে মোতি বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিশু হরিণটার মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে সে অজানা বেদনায় কাঁদতেই থাকে! যেন ওটা কোনো হরিণের নয়, তার সন্তানের শবদেহ!

৬
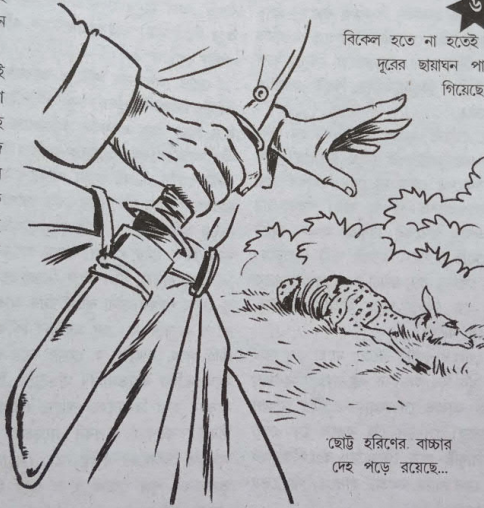
বিকেল হতে না হতেই প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি শুরু হল। দূরের ছায়াঘন পাহাড়টা তখন মেঘে ঢেকে গিয়েছে। জলস্ফীত কালো মেঘ কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘিরে ধরেছে তাকে। তুষার পর্বতের ছায়া পিণ্ডর নদী ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে এল। শুধু পাহাড়ের চূড়াটা এখনও সূর্যের আলোয় রক্তাভ। এছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়চূড়ায় সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে একপ্রস্থ মেঘের গায়ে পড়েছে। কালো মেঘগুলো লালচে আভা মেখে আরও ভয়ানক দর্শন হয়ে উঠেছে। যেন একদল খ্যাপা মোষ শিং বাগিয়ে আক্রমণ করার জন্য তৈরি!

কিছুক্ষণ পরেই প্রচণ্ড ঝড় ও শিল পড়া শুরু হল। ঘন ঘন বজ্রনিনাদে পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার মধ্যেই প্রবল বেগে ঝরে পড়ছে বড়ো বড়ো শিলের টুকরো। হাতে-পায়ে লাগলেই যেন শীতল ছ্যাঁকা মারে! শিল পড়ার প্রচণ্ড আওয়াজ ও কাছেপিঠেই বাজ পড়ার শব্দে প্রায় কানে তালা লাগার উপক্রম। ধবলকুণ্ডের জলে টুকরো টুকরো শিল ছিটকে ছিটকে পড়ছে ও টপ টপ আওয়াজ তুলছে। গাছের পাতাও বেশ খানিকটা চোট খেয়ে গেল শিলাবৃষ্টিতে। ঝড় উন্মত্তের মতো শোঁ শোঁ করে ঝাপটা মেরে চলেছে। তার গতি বেশ উদ্‌ভ্রান্ত। যেন কোন দিকে

যাওয়া উচিত ঠিক করে উঠতে পারছে না। অতৃপ্ত আত্মার মতো একবার এদিকে, একবার ওদিকে আছড়ে পড়ছে।

মোতি এই পরিস্থিতিতেই গুটিশুটি মেরে বসেছিল একটা গাছের ডালে। সে একটা ঘন পাতাওয়ালা গাছ বেছে নিয়ে বসেছে বলে শিলাবৃষ্টি তার তেমন ক্ষতি করতে পারছিল না। কিন্তু ঝড়ের দাপটে গাছটা মাঝেমধ্যেই নুয়ে পড়ছিল। আশেপাশে ডাল ভাঙার 'মটাং মটাং' শব্দ শুনে তারও রীতিমতো ভয় করছিল যে এই ডালটাও ভাঙে বুঝি! যখনই আশেপাশে বজ্রপাত হচ্ছিল, তখনই গোটা গাছটা থরথর করে কেঁপে উঠছিল!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনো অঘটন ঘটল না। ঘণ্টাখানেক শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ের দাপাদাপির পর প্রকৃতি আবার শান্ত হল। তখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। মাটিতে পড়ে থাকা কাচস্বচ্ছ শিলের টুকরোগুলোয় অস্তমিত সূর্যের আলো পড়ে লক্ষ লক্ষ আলোর কণার বিচ্ছুরণ ঘটল। যেন ঘাসের মধ্যে লক্ষ হিরা জ্বলছে! গাছের পাতায় পাতায়ও জলবিন্দু ঝিকমিক করছে। এখন সেই কালো ধুমসো মেঘ সরে গিয়েছে। তার পরিবর্তে অস্তমিত সূর্যের রশ্মিতে এতক্ষণের ধোঁয়ায় ঢাকা পাহাড়গুলো সিঁদুরে লাল হয়ে উঠেছে। আকাশে কেউ যেন কিছুটা কমলা, কিছুটা গোলাপি ও সোনালি রং ছুড়ে দিয়েছে।

মোতির সূর্যাস্ত দেখায় কোনো আগ্রহ ছিল না। সে তার আজকের লড়াইয়ের জন্য ধবলকুণ্ডটাকেই বেছে নিয়েছে। লক্ষ করে দেখেছে, আক্রমণ যেখানেই হোক না কেন, বেশির ভাগ মড়িই এই ধবলকুণ্ডের আশেপাশেই পাওয়া যায়। শয়তানটার আস্তানা এখানেই। সে এখান থেকেই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে কার্যকলাপ চালায়! তাই মোতি এখানে এসেই ঘাঁটি গেড়েছে। এখন ওর হাতে ধরা আছে পেল্লায় রাম-দাটা। আজ এখান থেকে জীবিত একজনই ফিরবে। হয় মোতি আজ ইতিহাস লিখবে, অথবা নিজেই ইতিহাস হয়ে যাবে।

আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল। শিকারি বাজের মতো ঝুপ করে নেমে এল অন্ধকার। তবে খুব ঘন অন্ধকার নয় কারণ আকাশে চাঁদ আছে। কালকের মতো আজও জ্যোৎস্নাময় রাত্রি। আকাশ এখন আয়নার মতো পরিষ্কার! দেখলে কে বলবে যে একটু আগেই প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়ে গিয়েছে! বরং কিছুক্ষণ আগের নির্মম প্রকৃতি এখন যেন পরম মমতায় হাসছে। পাহাড়ের খামখেয়ালিপনা বোধহয় এমনই!

হঠাৎই একটা খলবল শব্দ শুনে সজাগ হয়ে উঠল মোতি। উৎকর্ণ হয়ে শুনল আওয়াজটা। ধবলকুণ্ডে কেউ জল খেতে এসেছে। সে চুপিসারে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল বেশ কয়েকটা হরিণ জল পান করতে ব্যস্ত। চাঁদের আলোয় তাদের শিংগুলো মখমলে মোড়া বলে মনে হয়। অপরূপ কারুকার্য করা গায়ের চামড়া। তাদের একটু সামনেই পড়ে রয়েছে বাচ্চা হরিণের রক্তমাখা মড়িটা। কিন্তু সেদিকে ওদের দৃষ্টিই নেই। সারাদিনের পরিশ্রমের শেষে জল পান করে তৃষ্ণা মেটাতে এসেছে ওরা। অন্য কোনোদিকে লক্ষ করা ওদের স্বভাব নয়।

হরিণের দলটা জল খেয়ে চলে গেল। মোতি মড়িটার দিকে লক্ষ রেখে ঠায় বসে থাকে। তার মন বলছে শয়তানটা একবারের জন্য হলেও এদিকে আসবে। অন্ধকার এখানে দুর্ভেদ্য নয়। বরং চাঁদ তাকে জন্তুটাকে মারার জন্য যথেষ্ট আলো দেবে। ওই পিঙ্গল জ্বলজ্বলে চোখদুটোও ওর উপস্থিতি জানাবে। এখন শুধু ওকে বাগে পাওয়ার অপেক্ষা। সে বিন্দুমাত্রও অধৈর্য না হয়ে সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

আস্তে আস্তে বনের অন্যান্য জন্তু-জানোয়াররাও জল খেতে এল ধবলকুণ্ডে। এবার একদল কাকার হরিণ, শম্বর দল বেঁধে জল খেতে এল। মোতি তীব্রদৃষ্টিতে লক্ষ করল তাদের মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য আছে কিনা। কিন্তু হরিণের দলটা ধীরে-সুস্থে, ভারী নিশ্চিন্তে জল পান করে চলে গেল। তার কিছু সময় পরে একটা বুনো শুয়োরও এল। শুয়োরটা দাঁতাল। মোতি নিঃশব্দে ঘাপটি মেরে থাকে। দাঁতাল শুয়োরের স্বভাব মোটেই সুবিধের নয়। সবসময়ই তারা কড়া মেজাজে থাকে। আর মানুষ দেখতে পেলেই মাড়িয়ে-গুঁতিয়ে ফালা ফালা করে দিতে চায়। তাই দাঁতালটাকে এড়িয়ে চলাই ভালো। তারপর একটা শেয়াল এল!

মোতি অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকায়। অরণ্যের আকাশ চিরকালই সুন্দর। চতুর্দিকে পাইন গাছের ঘন বন যেন গোল হয়ে ঘিরে ধরে একফালি আকাশকে বেড় দিয়ে রেখেছে। শান্ত, নীল আকাশে নক্ষত্রগুলোকে রুপোর উজ্জ্বল চুমকি বলে মনে হয়। ফোঁটা ফোঁটা আলো গোটা আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত। তার মাঝখানে গোল চাঁদ। যেন কেউ রুপোর একটা বড়ো থালাকে ঘষে মেজে চকচকে করে সাজিয়ে রেখেছে। মাঝেমধ্যে দু-এক টুকরো নরম সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে অজানার পথে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধতা বাড়তে লাগল। আগে তবু দু-একটা পাখির ডানা ঝটপটানির আওয়াজ কানে আসছিল। এখন তা-ও আসছে না। শুধু একটানা ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। কখনো মিহি সুরে, কখনো বা মোটা স্বরে ডেকেই চলেছে তারা। তার সঙ্গে মাছির ভনভনানি। মড়িটাকে ঘিরে রয়েছে একঝাঁক মাছি। ঘাসবন আর রিংগালের ঝাড়ে একবার-দুবার আন্দোলন উঠেছিল ঠিকই। যতবার ঘাসবন নড়েচড়ে উঠেছে, ততবারই মোতি সচকিত হয়েছে। কিন্তু তা নেহাতই হাওয়ার ধাক্কা। পূর্বের তুষারাবৃত শৃঙ্গ থেকে হু হু করে হিমেল হাওয়া এসে আছড়ে পড়ছে। শীতে তার দেহ কাঁপছিল। বাতাসের ধাক্কা সামলানোর জন্য সে ডালটা যতটা সম্ভব জোরে আঁকড়ে ধরল। ঠান্ডা হাওয়া তার শরীরে দাঁত ফোটাচ্ছে। গাছের ডাল বেয়ে ছোটো ছোটো পিঁপড়ে ওর জামার মধ্যে ঢুকে চামড়া কামড়ে ধরছে। তবু হাল ছাড়ল না মোতি। সে নিশ্চুপে স্থির হয়ে বসে আছে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায়।

হঠাৎই মোতির এক অদ্ভুত অলৌকিক অনুভূতি হল। তার মনে হল একজোড়া চোখ তার অজান্তেই তাকে লক্ষ করছে। সে চকিতে নিজের চতুর্পাশটা ভালো করে দেখে নেয়। কোথাও কিছু নেই তো! রিংগালবনকে অস্থির করে এখনও বয়ে চলেছে হাওয়া। ঘাসবনে সরসর শব্দ! পাইন গাছের পাতা থেকে থেকে

শিরশির করে উঠছে। কিন্তু তা নেহাতই স্বাভাবিক। আশেপাশে কোনো জীবকে দেখা যায় না। তবে এরকম মনে হচ্ছে কেন? সে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব এখানে নেই! অথচ ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে মোতির!

প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন টেনে টেনে চলল। কোথাও কিছু নেই। তবু নিজের মধ্যে একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছিল মোতি। বুকের মধ্যে যেন দামামা বাজছে। চোখ যাই বলুক, মন বলছে কেউ আছে, কিছু তো আছেই! হিমেল হাওয়া যখনই তাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল, তখনই বারবার শিহরিত হচ্ছিল সে। ওর মনে হচ্ছিল, সেই পিশাচটার ঠান্ডা আঙুল তাকে স্পর্শ করে গেল বুঝি। তার চোখ মড়িটার দিকে নিবদ্ধ। জ্যোৎস্নার আলোয় ওটাকে একটা সাদা দাগের মতো দেখাচ্ছে। চিতাবাঘটা এলে বা মড়িটাকে ছুঁলেই পরিষ্কার দেখা যাবে।

পাইন গাছের পাতা আবার শিরশির করে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য এক খণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢাকা দিল। অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে এল অন্ধকার। মোতি আপশোশে ঠোঁট কামড়ায়। এখন মড়িটাকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। সে তো চাঁদের আলোর আশাতেই ছিল। আচমকা যে চাঁদ মেঘে ঢাকা পড়বে তা কে জানত! যদিও তার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তা সত্ত্বেও এই অন্ধকারে ঠাহর করা মুশকিল।

ঠিক তখনই ধবলকুণ্ডের বুক থেকে কুয়াশা চারিদিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। মোতির মনে হল রহস্যময় কুয়াশা যেন একটু একটু করে কিছুর রূপ নিচ্ছে! যেন সেই ধোঁয়া থেকেই গড়ে উঠছে কোনো প্রাণীর দেহ! সে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সেদিকেই। আদতে ব্যাপারটা ঠিক কী হচ্ছে!

পরমুহূর্তেই একটা হালকা ঝাঁকুনি অনুভব করল মোতি। ঠিক মাথার ওপরের ডালটা মড়মড় করে উঠেছে! সে বিদ্যুৎগতিতে ওপরের দিকে তাকায়। এক ঝলক বোঁটকা দুর্গন্ধ তার নাকে ঝাপ্টা মারল! সেই সঙ্গে দেখতে পেল দুটো ভয়াবহ চোখের খুনির দৃষ্টি! চিতাবাঘটা এখানে! কখন এল! মোতি তো তার অপেক্ষাতেই প্রহর গুনছিল। নজর রাখছিল মড়িটার ওপরে। কিন্তু সে মড়িটার কাছে যায়নি! বরং মোতির অগোচরে ঘনিয়ে এসেছে একেবারে কাছে! কোন অলৌকিক শক্তিতে কোনোরকম ইঙ্গিত না দিয়েই প্রাণীটা কীভাবে এত কাছে এসে পড়ল তা মোতির জানা নেই! যখন সে উদগ্র কৌতূহলে কুয়াশার দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক সেই ফাঁকেই তাকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল শয়তানটা! কিন্তু মোতি যে এখানে আছে তা ও জানল কী করে! গাছপালার ভিড়ে লুকিয়ে থাকা একটা মানুষের অস্তিত্ব টের পেল কী ভাবে! আশ্চর্য! ও কি সত্যিই সাধারণ কোনো জন্তু? না পিশাচ!
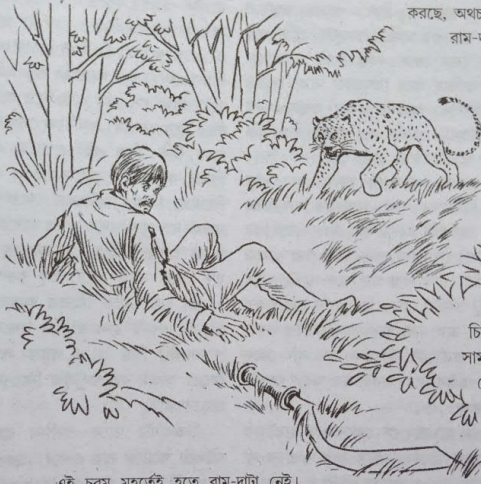
কানের কাছে যেন বাজ পড়ল! মোতিকে আর কোনো কিছু চিন্তা না করতে দিয়েই তার ওপর লাফিয়ে পড়ল নরখাদকটা! তার প্রচণ্ড গর্জনে অরণ্য যেন কেঁপে উঠল! মোতি তড়িৎগতিতে তার আক্রমণ এড়িয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে গাছ থেকে নীচে পড়ে গেল। তার হাত থেকে রাম-দাটা ছিটকে গিয়েছে। মোতি এখন সম্পূর্ণ নিরস্ত্র! একটা অসম্ভব ক্রুদ্ধ চিতাবাঘ এই মুহূর্তে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার পরিকল্পনা করছে, অথচ এই চরম মুহূর্তেই হাতে রাম-দাটা নেই!

...এই চরম মুহূর্তেই হতে রাম-দাটা নেই।

সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। ঝুপ করে গাছ থেকে নেমে তার সামনে এসে থাবায় ভর দিয়ে দাঁড়াল প্রাণীটা। মেঘের টুকরোটা চাঁদের ওপর থেকে সরে গিয়েছে। পূর্ণজ্যোৎস্নায় এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। অত্যন্ত চমৎকার স্বাস্থ্যের এক যুবক চিতাবাঘ! মোতিকে তার সামনে দেখে হিংস্র দন্তপঙ্ক্তি বের করে আবার গর্জন করে উঠল! এ গর্জন শুনলে যে কোনো মানুষ ভয়েই বেহুঁশ হয়ে যাবে। মোতির হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। তবু সে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। উত্তেজিত হয়ে কোনো ভুল কাজ করতে চায় না।

লেপার্ডটা বোধহয় আশা করেছিল যে তার সামনের শিকার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠবে বা দৌড়ে পালাতে চাইবে। এমন বহুবার সে দেখেছে! সবসময়ই শিকার তাকে দেখে পালাতে চায়। কিন্তু এখানে ঘটনাটা উলটো ঘটল! মানুষটার মধ্যে পালানো তো দূর, ভয় পাওয়ার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না! মোতি একেবারে তার জ্বলন্ত দুই চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চাদপসরণের কোনো লক্ষণই নেই!

চিতাবাঘটা এবার কয়েক কদম পিছিয়ে গেল। মোতি বুঝতে পারে যে ও এবার তার ওপর লাফিয়ে পড়বে। পশুটা একনাগাড়ে

গলার গভীরে ক্রুদ্ধ গরগর করে চলেছে। তার হাবেভাবেই স্পষ্ট যে শিকারকে এত সহজে ছাড়বে না। মোতির আপশোশ হয়। রাম-দাটা যে এই প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক কোথায় পড়ল! হাতের কাছে থাকলে এই রক্তপিপাসু জন্তুটাকে বুঝিয়ে ছাড়ত মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে!

খণ্ডমুহূর্তের বিরতি। পরক্ষণেই লেপার্ডটা ঝাঁপিয়ে পড়ল মোতির ওপরে! মোতিও বুঝতে পেরেছিল সে এটাই করবে। তাই সে এক লাফে সরে গেল। জন্তুটার প্রথম আক্রমণ ব্যর্থই হল! সে ঘাসে ঢাকা জমিতে দাঁড়িয়ে সজোরে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল। নিজের ব্যর্থতায় নিজের ওপরই রেগে গিয়েছে বোধহয়। কিন্তু তখনই সে আবার আক্রমণ করল না। বরং জ্বলজ্বলে চোখে নিজের শিকারকে মেপে নিল। হয়তো বুঝে নিতে চাইল তার রণকৌশল।

চাঁদের আলো চিতাবাঘটার গায়ে পড়ে পিছলে পড়েছে। জন্তুটাকে দেখলেই ভয় করে। বিশেষ করে ওর আগুনে চোখদুটো! প্রতিপক্ষকে ও ভয় দেখিয়েই আধখানা মেরে ফেলে। কিন্তু মোতি ভয় পাবার পাত্র নয়! সেও নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে তেন্দুয়াটার দিকে। বোঝার চেষ্টা করছে যে এবার কোনদিক দিয়ে আক্রমণ আসবে। জন্তুটা এখনও হিংস্রভাবে গরগর করেই চলেছে। মোতি তার ভয়াল দন্তপঙ্ক্তি দেখল। হাড়-মাংস চিবিয়ে খাওয়ার জন্য তৈরি সে!

জন্তুটা একবার কান ছড়াল। পরক্ষণেই আবার কান খাড়া করেছে। যেন শিকারের নিঃশ্বাসের শব্দ, নড়াচড়ার সামান্যতম আওয়াজটুকুও শুনতে চায়। তারপরই আবার ঝাঁপ দিল। এবার তার লক্ষ্য মোতির ঘাড় এবং গলা। সে জানে কোনোমতে গলা কামড়ে ধরতে পারলেই মানুষটার গল্প শেষ! কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোতি একটা ডিগবাজি খেয়ে একটু পিছিয়ে গেল। চিতাবাঘটা তার গলার নাগাল পেল না ঠিকই, তবে তার থাবা ছুঁয়ে গেল মোতির একটা হাত! মোতি যন্ত্রণায় কাতরে ওঠে! সে টের পেল তার কাঁধ থেকে কবজি অবধি চিরে গিয়েছে পশুটার নখে! একটা উষ্ণ তরল গলগল করে হাত বেয়ে পড়ছে! রক্ত!

মোতির একটা হাত জখম হয়েছে। সে কোনোমতে হাতটাকে চেপে ধরে। দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলে—'হারব না আমি! এত সহজে হার মানব না! ও আমার গৌরীকে খেয়েছে। বদলা চাই...বদলা!'

জন্তুটাও হাল ছাড়ার পাত্র নয়। রক্তের দর্শন সে পেয়ে গিয়েছে। বুঝতে পেরেছে যে মানুষটা আহত। এখন শিকারকে হাতছাড়া করতে একেবারেই রাজি নয়। সে এবার কোনোরকম ভূমিকা ছাড়াই দুটো থাবার নখ জোরে বিঁধিয়ে দিয়েছে মোতির বুকে। মোতি সামলাতে না পেরে চিত হয়ে পড়ে গেল। টের পেল তার বুকের মাংসের মধ্যে ধারালো নখগুলো গেঁথে গিয়েছে। যন্ত্রণায় কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখে অন্ধকার দেখল সে। সেই ফাঁকেই তাকে হিড়হিড় করে টেনে লম্বা ঘাসবনের মধ্যে নিয়ে চলল পশুটা।

মোতির মনে হল এখনই তার হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে। এই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত! এই তীক্ষ্ণ নখ হৃৎপিণ্ডকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। অথবা এক্ষুনি নিষ্ঠুর দাঁতগুলো কামড়ে ধরবে তার গলা! মাথাটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ধড় থেকে। বুকের একপাশ থেকে কয়েক পাউন্ড মাংস তুলে নিয়েছে শয়তানটা! রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। অসম্ভব যন্ত্রণায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। তবু দাঁতে দাঁত চেপে একটা শেষ চেষ্টা চালাল সে। পশুটার নরম পেট ঠিক তার পায়ের কাছে। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সর্বশক্তি দিয়ে ওর তলপেটে প্রচণ্ড এক লাথি মারল মোতি।

কানফাটানো গর্জন! কিন্তু তার মধ্যে রাগ আর ব্যর্থতার ছাপ স্পষ্ট। মোতির গায়ে বুঝি তখন অসুরের জোর! তার এক লাথি খেয়ে অত বড়ো জন্তুটা ছিটকে পড়ল! চিতাবাঘটার নরখাদক জীবনে এতবড়ো স্পর্ধা বোধহয় আর কোনো শিকার দেখায়নি! সে যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল। বুঝতে পারল এ শিকার অন্যদের মতো দুর্বল নয়। একে কব্জা করতে তাকে যথেষ্টই পরিশ্রম করতে হবে। সে এবার আর দ্রুত আক্রমণে গেল না। বরং আস্তে আস্তে মোতির চারপাশে ঘুরতে লাগল।

প্রচণ্ড কষ্টে মোতি সবই চোখে ঝাপসা দেখছিল। আশেপাশের নিসর্গ ঝাপসা হয়ে আসছে। শুধু অনির্বাণ জ্যোতির মতো জ্বলছে দুটো চোখ। সে অতি কষ্টে উঠে বসে। চিতাবাঘটা তখনো তাকে ঘিরে ঘুরে চলেছে। এমনিতে লেপার্ড অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের চেয়ে ভীতু। কিন্তু এই লেপার্ডটা একেবারেই অন্যরকম। মানুষ শিকার করে করে তার সাহস ও আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে মানুষটা যতই লড়াই করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাকে মরতেই হবে। এর মধ্যেই যথেষ্ট আহত হয়েছে সে। যা রক্তপাত হচ্ছে তাতে লেপার্ডটা যদি তাকে না-ও মারে, শুধু রক্তক্ষরণেই মরে যাবে মোতি।

সে কোনোমতে নিজের আহত শরীরটাকে টেনেটুনে উঠে দাঁড়ায়। এখনই হাল ছাড়লে চলবে না। হ্যাঁ, প্রতিপক্ষ অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু তা-ও তাকে লড়ে যেতে হবে। যতক্ষণ না দেহের অন্তিম রক্তবিন্দুটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ লড়াই ছাড়বে না।

চিতাবাঘটা তাকে প্রদক্ষিণ করতে করতেই আকস্মিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপরে। এরপর যা ঘটল তাকে এক কথায় হাতাহাতি বলা চলে! জন্তুটা আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে মোতির ঘাড়ে কিংবা গলায় কামড় বসাবার। আর মোতি তার মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরেছে, যাতে কিছুতেই সে কামড়াতে না পারে। প্রচণ্ড রাগে তেন্দুয়াটা তাকে সুযোগ পেলেই আঁচড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মোতির লৌহকঠিন আলিঙ্গন থেকে কিছুতেই নিজেকেই ছাড়াতে পারছে না! অসম্ভব আক্রোশে সে গর্জন করছে, লেজ আছড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে-দাপাচ্ছে, মোতি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে—তবু তাকে ছাড়ছে না!

'তুই আমার গৌরীকে খেয়েছিস! তোকে আমি ছাড়ব না!'

বলতে বলতেই তার গলা ডান হাত দিয়ে ভীম বেষ্টনে জড়িয়ে ধরল মোতি। লেপার্ডটার এবার প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসে। এ কী আশ্চর্য মানুষ! পরাজয় বা পশ্চাদপসরণের নামই করছে না! উলটে সমানতালে যুঝে যাচ্ছে তার সঙ্গে। রক্তাক্ত হচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, তা সত্ত্বেও লড়ছে!

নরখাদকটা এবার একটা পালটি খেয়ে মোতির ওপরে উঠে এল। মোতি তখনো তাকে ছাড়েনি। সে যেন ঠিকই করে রেখেছে যে যাই হোক, আজ শয়তানটাকে ছাড়বে না! লেপার্ডটা তার বাহুবন্ধনে রীতিমতো দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। মাটিতে মোতিকে নিয়েই সে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না! কখনো মোতি তার ওপর চেপে বসছে, কখনো বা সে মোতির বুকের ওপর উঠে আসছে। রীতিমতো দুজনের মধ্যে ঝটাপ্‌টি চলছে। পশুটা থাবা মারার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই, তবে মোতি তাকে বেকায়দায় ধরে রেখেছে বলে সফল হচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ এই অসম দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলল। চিতাবাঘটাও এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মোতিও ক্রমাগত রক্তক্ষরণে দুর্বল বোধ করছে। তার সাময়িক দুর্বলতার সুযোগ নিল নরখাদকটা। যে হাত দিয়ে ওর গলা বেষ্টন করে রেখেছিল মোতি, সেই হাতটাই আঁচড়ে দিল। মোতি কাতরোক্তি করে ওঠে। তার বন্ধন ঢিলে হয়ে যায়। সেই সুযোগেই লেপার্ডটা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার নিষ্ঠুরতা ও প্রতিশোধস্পৃহা বেড়ে গিয়েছে অনেকগুণ! সে ফের হিংস্র গর্জন করে ওঠে।

মোতি তখন নির্জীবের মতোই মাটিতে পড়ে ছিল। তার শরীরে আর শক্তি নেই। এতক্ষণ মানুষখেকোটাকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। আর বুঝি পারা যায় না! তার সারা দেহ রক্তে ভিজে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় প্রাণীটা আঁচড়ে মাংস তুলে দিয়েছে! ওর সঙ্গে বোধহয় আর লড়তে পারবে না মোতি! এই শেষ...এই শেষ...! আঃ!

চিতাবাঘটা আবার একটা লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই ফাঁকেই মোতির মনে হল, তার ঠিক ডানদিকে কী যেন একটা চাঁদের আলোয় চকচক করছে! ও কি তার দৃষ্টিভ্রম! না অন্যকিছু! জিনিসটা কী? ঝাপসা দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হতেই মুহূর্তের মধ্যে মোতির মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ খেলে গেল! ওই তো! তার রাম-দা ওখানেই পড়ে আছে।

লেপার্ডটা ঠিক তখনই লাফটা দিল! তার শরীরটা সোনালি বিদ্যুতের মতো চিড়িক করে ওঠে। সেই খণ্ডমুহূর্তেই মোতি ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল রাম-দাটা। প্রাণীটা তখনো শূন্যে! সামনের থাবাদুটো হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়েছে সে। তার পেটটা মোতির মাথার ঠিক ওপরে। মোতির হাতে রাম-দা ঝলসে উঠল। ধারালো অস্ত্রটার বাতাস কাটার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই সে সপাটে রাম-দা চালাল পশুটার গলা লক্ষ্য করে। দেহের সমস্ত শক্তি নিংড়ে দিয়ে এক মোক্ষম কোপ বসিয়ে দিল ওর গলায়।

ধপ করে একটা আওয়াজ! চিতাবাঘটা সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল! ধারালো রাম-দায় তার গলায় পোঁচ পড়েছে! গলগল করে রক্ত পড়ছে। তার পেটটা বেশ কয়েকবার উঠল নামল! হাত-পা মৃত্যুযন্ত্রণায় থরথর করে কেঁপে উঠল! সারা দেহ বেশ কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল! একবার শেষবারের মতো ডেকে উঠল সে! জোরালো একটা শ্বাস পড়ল। তারপর সব স্থির! নিস্পন্দ, নিথর দেহটা পড়ে রইল ধবলকুণ্ডের মাটিতে।

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে মোতি! তার দু-চোখে বিস্ময়। শেষ? সব শেষ? যে বেঁচে থাকতে এত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, একটু আগেও যাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত বলে মনে হচ্ছিল, তার শেষটা এমন অনাড়ম্বর ভাবে হল! সে অনিমেষে দেখতে থাকে নরখাদকটাকে। মৃত্যুর ঘোরে চোখদুটো আধবোজা, গলা চুঁইয়ে তখনো তাজা রক্ত পড়ছে, থাবা দুটো ছড়ানো, শরীরের সমস্ত পেশি শিথিল! কল্পনায় কতবার ওকে দেখেছে মোতি! কেউ ওকে পিশাচ বলেছে, কেউ ভেড়মানস বা মানুষরূপী নেকড়ে! মোতি নিজেই কতকিছু ভেবেছিল ওর সম্বন্ধে! ভেবেছিল ওর দেহটা মানুষের, মাথাটা লেপার্ডের। অথবা তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে কেউ রূপ বদল করে চিতাবাঘে পরিণত হয় বুঝি!

কিন্তু ও তো পিশাচ নয়! কোনো তেন্দুয়ারূপী মানুষও নয়। ও একটা সাধারণ লেপার্ড! যার বুদ্ধি ও সতর্কতা মানুষের আতঙ্কের কারণ হয়েছিল। হয়তো বাঁ-পায়ে কোনো কারণে চোট পেয়েছিল। সেজন্যই নরখাদক হয়ে গিয়েছিল সে। এ ছাড়া আর কিছুই নয়!

আস্তে আস্তে মৃত শত্রুর পাশেই ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল মোতি। রাম-দাটা ছুড়ে ফেলল অবহেলায়, যার এক কোপেই মৃত পশুটার সঙ্গে ওর সমস্ত জাগতিক হিসাব চুকে গিয়েছে। বেদনামাখা দৃষ্টিতে তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ এখনও সৌন্দর্যে ঝলমল করছে। সারা দেহে অজস্র ক্ষত! ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হয়ে চলেছে। কিন্তু মোতির কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। সে তখন ভাবছিল, বেঁচে থাকার একমাত্র কারণটাও আজ শেষ হয়ে গেল। এরপর কী নিয়ে থাকবে! কার জন্যই বা থাকবে!

'বাবু!'

একটা কচি গলার শব্দ শুনে মোতি সচকিত হয়ে উঠল। শুনতে পেল কাচের চুড়ির রিনরিন, পায়েলের ছমছম। কেউ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। আকাশের চাঁদ-তারাকে এখন আরও উজ্জ্বল মনে হয়! এক আশ্চর্য আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে গোটা আকাশ। যেন আলোর জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে! সে টের পেল তার কপালে একটা কচি নরম হাতের স্পর্শ! কেউ তার মাথায় সস্নেহে হাত বোলাচ্ছে!

কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও সে কোনোমতে বলল—'আমি পেরেছি মা! আমি তোকে রক্ষা করতে পেরেছি...!'

'হ্যাঁ বাবু, তুই পেরেছিস! এখন ঘুমিয়ে পড়। ঘুম যা!'

ছোট্ট হাতের মায়াবী স্পর্শ গোটা দেহে যেন পরম শান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমস্ত অস্থিরতা, ব্যাকুলতা, ব্যথা-যন্ত্রণা মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন মোতির ঘুম পাচ্ছে। খুব আরামে দু-চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে। আকাশটা যেন নেমে আসছে তার আরও কাছে। আরও আলোকিত হয়ে উঠেছে! হয়তো এখন এখানে কোথাও কোনো বাবা তার ছোট্ট মেয়েকে বাঘের গল্প বলছে। কিংবা কোনো মা তার বাচ্চাকে লোরি গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। তাদের ভয় দেখাতে, চোখের ঘুম কেড়ে নিতে আর কেউ আসবে না!

নক্ষত্রের আলো দু-চোখে ভরে নিয়ে মোতি ধবলকুণ্ডের মাটিতেই শুয়ে রইল! ❖

গল্প

জাওলাগিরির নরখাদক

মূল কাহিনি—কেনেথ এন্ডারসন

অনুবাদ—নির্বেদ রায়

[লেখক-পরিচিতি কেনেথ ডগলাস স্টুয়ার্ট এন্ডারসনের জন্ম ১৯১০ সালের ৮ মার্চ, প্রয়াণ ১৯৭৮ সালের ৩০ অগস্ট। দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে তাঁর শিকার এবং রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনিগুলো ছড়িয়ে আছে।

কেনেথ এন্ডারসনের জন্ম এক স্কটিশ পরিবারে, পড়াশোনা বিশপ কটন বয়েজ স্কুল আর ব্যাঙ্গালোরের সেন্ট জোসেফ কলেজে। স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে আইন পড়তে যান, কিন্তু পড়া অসমাপ্ত রেখেই ফিরে আসেন ভারতে। হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স্ লিমিটেডে ফ্যাক্টরি ম্যানেজার পদে কাজ করেন। প্রায় ২০০ একর জমি কর্নাটক, হায়দরাবাদ আর তামিলনাড়ু, এই তিনটি রাজ্যে এন্ডারসন তাঁর নিজস্ব জমি হিসাবে ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর শিকার কাহিনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'জাওলাগিরির নরখাদক'।]

জাওলাগিরি একটা গ্রাম, কৃষ্ণগিরি জেলায় অবস্থিত। কৃষ্ণগিরি তামিলনাড়ুর একটি জেলা। এক হাজার হেক্টর জমির উপর গ্রাম, লোকসংখ্যা এখন চার হাজারের কাছে, যখনকার কথা বলছি তখন আরও অনেক কম ছিল, বাড়িঘরও কম ছিল। কাছাকাছি আধা শহর বলতে ডেনকানিফোট্টাই, এখান থেকেই জেলার সব কাজকর্ম হয়।

পাহাড় আর উপত্যকার উপর জ্যোৎস্নারাত যে না দেখেছে তাকে তার সৌন্দর্য বোঝানো মুশকিল; গাছগুলোর উপর যেন রুপোর জলের ঢেউ খেলে যায়, তবে নীচের তৃণগুল্মে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকে—সরীসৃপ আর হিংস্র জন্তুদের সেই আঁধারে শিকার ধরার জন্য।

জাওলাগিরি ঘিরে যে জঙ্গল সে এই নিয়মের মধ্যেই চলত, জঙ্গলের অনুশাসন মেনে একরকম শান্তিতেই দিন কাটছিল, কিন্তু মানুষের উপস্থিতি সমস্ত প্রকৃতির নিয়মের রীতিনীতি ভেঙে দেয়, এখানেও তাই ঘটল—

তিনজন চোরাশিকারির উপস্থিতি নদীর পাড়ে উঁচু জমিতে খুঁজে পাওয়া গেল। দেখা গেল, নদীর পাড় নয়, আসলে জন্তুদের জল খাওয়ার একটা জায়গা। সেখানেই তিনজন ওত পেতে অপেক্ষা করে। যখন হরিণরা জল খেতে আসে, তখন ওরা নিশানা করে বন্দুক চালায়—বন্দুক বলতে দুটো পুরোনো প্যাচ্লক্ বন্দুক, তাই দিয়েই কাজ চলে যায়।

সেদিনও সূর্যাস্তের পর তিনজন জলাশয়ের ধারে আড়ালে এসে বসেছিল। রাত খানিকটা পার হওয়ার পর প্রথমে একটা খস্খস্ শব্দ, তারপর ঝোপঝাড় বেশ জোরে নড়াচড়া করা শুরু করল। জঙ্গলের ভাষা বলছে এটা কোনো ভারী জন্তুর ঘোরাফেরার আওয়াজ।

চোরাশিকারিদের সর্দার মুনিয়াপ্পা, বন্দুকের নিশানাও তার অব্যর্থ। ঝোপঝাড়ের আওয়াজ আর নড়াচড়া দেখে তার আর ধৈর্য থাকছে না বলেই মনে হল—পাশের বন্দুকটা তুলে নিয়ে সে লক্ষ্য স্থির করে তৈরি হল। সে নিশ্চিত যে জন্তুটা বুনোশুয়োর। মারতে পারলে পয়সা পাওয়া যাবে মাংস বিক্রি করে, আবার দু-তিনবেলা পেটও চালানো যাবে ওই মাংসে।

লক্ষ্য স্থির করে অপেক্ষা করার মধ্যেই বড়ো একটা ছায়া, যেটা আশপাশের গাছপালার ছায়া থেকে আরও গাঢ় ছায়া, আর সচলও বটে—এসে পড়ল বন্দুকের লক্ষ্যের মধ্যে। মুনিয়াপ্পা গুলি চালাল।

একটা চাপা গর্জন, গাছপালা আর ঝোপঝাড় তোলপাড়, আর সেই আওয়াজে চমকে উঠেছে শিকারির দল পর্যন্ত—না, বুনোশুয়োর-নয়, বাঘ! নির্ঘাৎ বাঘের গর্জন!

সঙ্গে সঙ্গে আড়াল থেকে সরে গিয়ে দ্রুত গ্রামের পথে ফিরেছে চোরাশিকারির দল। ভয়ে আর অন্ধকারের মধ্যে চোখ চালিয়ে দেখার চেষ্টাও করেনি; আহত বাঘ বড়ো ভয়ংকর জানোয়ার!

সারারাত তিনজনে ঘুমোতে পারেনি চিন্তায় চিন্তায়...সকালে উঠে এগিয়েছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অবশ্য অস্বস্তি কেটে গেছে। পূর্ণবয়স্ক এক তরুণ বাঘের মৃতদেহ চোখে পড়েছে। কাছে গিয়ে বোঝা গেছে যে পুরোনো 'মাস্কেট' বন্দুক থেকে ছোড়া গুলি সরাসরি তার হৃৎপিণ্ডে আঘাত করেছে। একেবারেই অতর্কিতে লক্ষ্যভেদ বলা যায়। কিন্তু গ্রামের মানুষ মুনিয়াপ্পা আর তার শাগরেদদের বেশ সম্ভ্রমের চোখে দেখা শুরু করেছে এখন থেকে—বাঘশিকারি বলে কথা!

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা থেকে গ্রামের আবহাওয়া পাল্টে গেছে। বাঘের গর্জনে কেঁপে কেঁপে উঠেছে গোটা গ্রাম আর তার আশপাশের জঙ্গল। অভিজ্ঞ মানুষরা অবশ্য বলেছে—ওটা বাঘের গর্জন নয়, বাঘিনির। বন্ধু ও সঙ্গী বাঘটাকে খুঁজে না পেয়ে ওই অসহিষ্ণু গর্জন। দিনের বেলা গর্জন শোনা যাচ্ছে জঙ্গলের ভিতর থেকে, আর রাত্রে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ছে বাঘিনি। একদম গ্রামের গা ঘিরে গর্জনের আওয়াজ মানুষজনকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

জ্যাক লেনার্ড তরুণ শিকারি, তখনো কোনো বড়ো শিকার তার বন্দুকের নিশানায় আসেনি, ফলে তার উৎসাহ প্রবল। প্রশাসনের থেকে চিঠি পেয়ে সে আটদিনের মাথায় এসে জাওলাগিরিতে পৌঁছোল, ঘটনা ঘটে যাওয়ার আটদিন বাদে। এসে প্রথমে সে গ্রামের পরিবেশ-পরিস্থিতি ভালো করে বুঝে নিল, তারপর বাঘিনির চলাচলের পথে এগোল। চারদিকে পায়ের ছাপ, বোঝা গেল বাঘিনি সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু বন-বাংলোর পাশে অনেকগুলো ছাপ দেখে লেনার্ড ঠিক করে নিল আজ রাতেই একবার সুযোগ নিয়ে দেখবে।

সূর্য পাটে বসেছে, লেনার্ড বন্দুক নিয়ে একটা উইটিবি বেছে নিয়েছে, উইটিবি পথের পাশে, ভালো জায়গায়। আস্তে আস্তে ঘড়িতে সোয়া ছ-টা বেজে গেছে, সন্ধ্যা...হঠাৎ কতগুলো নুড়িপাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ, পাতার ফিসফিস আওয়াজ—লেনার্ড দৃষ্টি সতর্ক করল, কিন্তু বাঘের চিহ্ন নেই।

মিনিট পার হচ্ছে, যেন ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পথের একপ্রান্ত থেকে আকৃতি চোখে পড়ল, লেনার্ড বুঝল, ওটা বাঘিনি, এইদিকেই আসছে বটে। আর খুব তাড়াতাড়িই সেটা লেনার্ডের কাছাকাছি এসে পড়ল।

লেনার্ড রাইফেলটা বাঁ-কাধে নিয়ে নিল আর উইটিবির আড়াল থেকে যতটা সম্ভব বেরিয়ে এল, যেন জন্তুটাকে গুলি করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

লেনার্ড গুলি করল, লক্ষ্য বাঘের বুক—কিন্তু আর একটু আড়াল থেকে বেরোনোর দরকার ছিল বোধ হয়! গুলি গিয়ে লাগল বাঘিনির ডানদিকের কাঁধে। ভারী বন্দুকের গুলি, অনেকটাই বিদ্ধ হল। প্রচণ্ড গর্জনে জঙ্গল কাঁপিয়ে বাঘিনি মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল...লেনার্ড পিছু নেওয়ার চেষ্টা করল বটে কিন্তু রক্তের দাগ সব জায়গায় পাওয়া গেলেও গভীর জঙ্গল আর পাথুরে টিলার মধ্যে জানোয়ারটার খোঁজ পাওয়া গেল না। আশাহত হয়ে লেনার্ড ফিরে এল। তবে বাঘিনির গর্জন আর জাওলাগিরি গ্রাম বা তার সন্নিহিত অরণ্য অঞ্চলে শোনা যায়নি, গ্রামের মানুষ খুশি হয়েছিল।

কয়েকটা মাস এভাবে কেটে গেল। সুলেকুন্ডা গ্রামে এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল। সুলেকুন্ডা থেকে জাওলাগিরি প্রায় সাত মাইল দূরে, অরণ্য আরও গভীর। একটা পুরোনো মন্দির আছে, যেখানে আশপাশের গ্রামবাসী পুজো দিতে আসে। বাবা, মা আর তাদের ষোলো বছর বয়সের একটা ছেলে, এই তিনজন মিলে মন্দিরে পুজো দিয়ে ফিরছিল। পথে একটা তেঁতুলগাছ, গাছটায় তেঁতুল ফলে আছে। কাঁচা তেঁতুল। ছেলেটা ওই তেঁতুল পাড়তে গিয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল। জায়গাটা মন্দির থেকে চারশো মিটার মতো দূরে।

একটা চাপা গর্জন, তারপর ছেলেটার প্রাণপণ চিৎকারের শব্দ। বাবা আর মা ঘুরে তাকিয়ে দেখল প্রকাণ্ড বাঘিনি ছেলেটার ঘাড় কামড়ে ধরে একটু দূরে যে নালাটা যাতায়াতের এই পথটার মাঝখান দিয়ে বইছে, তার মধ্যে লাফ মেরে অদৃশ্য হল। প্রবীণ মানুষ দুটির প্রাণপণে চিৎকার করেও কোনো ফল হল না, একটু পরে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে এল।

নরহত্যার একটা সূত্রপাত। মানুষখেকো বাঘিনি এরপর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তার শিকার ধরা শুরু করল। উত্তরে জাওলাগিরি থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণে গুন্ডালাম, আবার কুড়ি মাইল পশ্চিমে মহীশূর রাজ্যের সীমান্ত থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল

দূরে ডেনকানিকেটা পর্যন্ত পনেরোজন মানুষ তার শিকার হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি মেয়ে, একজন সদ্যবিবাহিতা পর্যন্ত। ঠিক তখনই কেনেথ এন্ডারসন একটা জরুরি চিঠি পেলেন। লেখক তাঁর বন্ধু হোসুর টাউনের সাব-কালেক্টর ভদ্রলোকের কাছ থেকে, জেলা আর অঞ্চলকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য।

কেনেথ ডগলাস স্টুয়ার্ট এন্ডারসন, জাতে ইংরেজ, জন্ম ভারতে। আর ভারতকে পছন্দ করেই তাঁর এখানে পড়াশোনা, এমনকী ইংলন্ডে আইন পড়তে গিয়ে অসমাপ্ত রেখে ভারতে ফিরে আসার কারণও বোধকরি সেটা। জঙ্গল ভালোবাসেন, তবে নরখাদক দানবদের শিকার করাও তাঁর নেশা।

জাওলাগিরিতে এসে সমস্ত খবর তিনি সংগ্রহ করলেন বাঘিনি সম্পর্কে। এমনকি লেনার্ডের ছোঁড়া গুলি আর বাঘিনির আহত হওয়ার ব্যাপারেও। এবার সব তথ্য যোগাড় করে এগোলেন জাওলাগিরি থেকে সুলেকুন্ডার দিকে, কিন্তু সে পথে কোনো পায়ের ছাপ পাওয়া গেল না, এদিকে বেশ কিছুদিনের মধ্যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। সেটাও বাঘিনির পায়ের ছাপ না পাওয়ার বড়ো কারণ। ফলে সেখান থেকে গুন্ডালাম, ঘটনার জায়গা থেকে প্রায় ২৩ মাইল দূরে, দক্ষিণদিকে। এখানে এসে এন্ডারসন থাকার ব্যবস্থা করলেন, বড়ো বড়ো খাটাল আছে এখানে আর এই অঞ্চল থেকে প্রায় সাতজন রাখাল বাঘিনির শিকার হয়েছে, গত চার মাসের মধ্যে!

কেনেথ এন্ডারসনের বন্ধু উপ-সমাহর্তা বা সাব-কালেক্টর ভদ্রলোক তিনটি হৃষ্টপুষ্ট মোষের বাচ্চা, বাঘিনির টোপ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেনেথ তিনটে মোষ বা মোষশাবককে তিন জায়গায় বাঁধলেন।

একটাকে গুন্ডালাম থেকে মাইলখানেক দূরে একটা স্রোতস্বিনীর মুখে সেজেহাপ্পি নদীর সঙ্গে সেটা যেখানে মিশেছে তার মুখে বাঁধা হল, আর দুটোর মধ্যে একটাকে চার মাইল দূরে আনচেট্টি গ্রামে, অন্যটাকে জলাশয়ের মুখে বাঁধলেন, যেখানে গরু-মোষ আর রাখালের দল জল খেতে আসে, সেখানে।

এই টোপ বাঁধার পর এন্ডারসন পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ উইনচেস্টার রাইফেল হাতে সমস্ত অঞ্চলটা ঘোরা শুরু করলেন— যদি কোথাও জন্তুটার পায়ের ছাপ, অথবা বাঘিনিটারই দেখা মেলে!

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা বেরিয়ে গুন্ডালাম নদীর পাড়ে নরম মাটির উপর বাঘিনির পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। পায়ের ছাপ ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল জলাশয়ের পাশে যেখানে তিনি টোপ হিসাবে মোষটাকে বেঁধে রেখে গেছিলেন, তার সামনে এসে বাঘিনি দাঁড়িয়ে লক্ষ করেছে, কিন্তু মোষের বাচ্চাটাকে স্পর্শ করেনি পর্যন্ত, বাচ্চাটা ওইরকম বাঁধাই রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় দিন খবর এল—

দ্বিতীয় দিন পায়ের ছাপ পাহাড়ি রুক্ষ মাটিতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসতে হয়েছিল, ঠিক তেমনই তৃতীয় দিনেও সকালবেলা থেকে দুপুরবেলা পর্যন্ত কোনো চিহ্ন না পেয়ে ফিরছেন —তাঁবুতে এসে একটু গরম জলে স্নান করে দুপুরের খাওয়া সারছেন—এমন সময়ে মোড়লকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামবাসীরা এসে হাজির—আজ সকালে বাঘিনি মানুষ মেরেছে, আনচেট্টি থেকে ছোটো পল্লিটা এক মাইল দূরেও নয়।

কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে দৌড়োলেন; যেতে যেতে বিবরণ শুনলেন—গতকাল সন্ধ্যার সময় লোকটি বাড়ি ফেরার পর হঠাৎ খেয়াল করে যে খোঁয়াড়ের মধ্যে একটা বড়ো কিছু ঘটেছে। গরু-মোষগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সেখানে যায়, কিন্তু আর ফিরে আসেনি। বাড়ির লোক অপেক্ষা করে ভোর হওয়া পর্যন্ত, তারপর ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে লোকটি বাঘিনির শিকার হয়েছে, কিন্তু একটা চিৎকার পর্যন্ত তারা শুনতে পায়নি।

এইভাবেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এন্ডারসন।

তারপর বলেছেন, 'গিয়ে দেখলাম, খোঁয়াড়ের কাছে বাঘিনির পিছনের পায়ের ছাপ, আর একটু এগিয়ে দেখা গেল রক্তের ছাপ— প্রচুর রক্তপাত হয়েছে মানুষটার, আর তার জামাকাপড়ের অংশ পথের ধারে গাছপালায়, ঝোপেঝাড়ে আটকে আছে। বাঘের পথ অনুসরণ করতে কষ্ট হচ্ছিল, উঁচু-নীচু ঝোপঝাড়, জঙ্গলের নীচে পাথুরে পথ, সেখানে বাঘের পায়ের ছাপ অদৃশ্য হয়ে গেছে, তখন রক্ত আর জামাকাপড়ের অংশই ভরসা।

শেষ পর্যন্ত যখন লোকটার দেহাবশেষ পাওয়া গেল তখন দুটো কথা বোঝা গেল। প্রথম কথা, বাঘিনি তার শিকারের অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, বাকি অর্ধেক ফেলে গেছে জলাশয়ের পাড়ে—পরে বাকি অংশ উদরস্থ করতে আসবে। আর দ্বিতীয় কথা হল, বাকি

দেহটাকে একটা বড়ো পাথরের নীচে রেখে গেছে, যেজন্য শকুনের উৎপাত হয়নি। উঁচু আকাশ থেকে দেহটা দেখা যাচ্ছে না, ফলে গোটা দুই কাক ছাড়া খুব বেশি মাংসাশী প্রাণী জড়ো হয়নি।

আর একটা অস্বস্তির কথা হল, জায়গাটা!

যেখানে দেহাবশেষ রাখা আছে, তার আশেপাশে কোথাও একটা বড়ো গাছপালা নেই যে মাচা বাঁধা হতে পারে। শিকারিকে অপেক্ষা করতে হবে মাটিতে বসেই—যেটা নরখাদক বাঘিনির জন্য বসে থাকার মানে—আত্মহত্যা! কিন্তু আপাতত এছাড়া উপায় নেই।

দুপুরের আগে বাঘিনি ফিরবে না, তাই দুপুর গড়াতেই জায়গা খুঁজে নিয়ে বসতে হয়েছে।

প্রথম জায়গাটা দেখামাত্র বাতিল করেছি, সেটা জলাশয়ের পাড়ে একদম 'দেহ'টার মুখোমুখি। জমির উপর, চারদিক খোলা—মানুষখেকো বাঘিনির কাছে এর থেকে লোভনীয় টোপ আর কিছু হতে পারে না।

দ্বিতীয় স্থানটি মন্দের ভালো। দেহাবশেষ থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে একটা পাথরের গায়ে পিঠ দিয়ে বসে অপেক্ষা করা। সেটাই ঠিক হল।

সাড়ে তিনটে কি চারটের থেকে অপেক্ষা করা শুরু হল। গরমে খানিকক্ষণের মধ্যেই আমার গায়ের জামা ঘামে ভিজে সপ্‌সপ্ করতে লাগল। ধীরে ধীরে বিকেল হয়ে সন্ধ্যা গড়াল। আকাশে চাঁদ উঠল। পূর্ণিমা খুব কাছে, চাঁদ দেখে বোঝা যাচ্ছে। টর্চলাইটের কোনো প্রয়োজন নেই, হাতঘড়ির কাঁটা পর্যন্ত সে আলোয় দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। প্রতীক্ষা চলছে, হঠাৎ সামনে একটা বনমোরগ এসে বসল। একটু নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে বনমোরগ দূর থেকে বাঘ দেখতে পায়, ডাকতে শুরু করে, ফলে সতর্ক অতটা না থাকলেও চলে শিকারির। ফলে একটু গা এলিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে বনমোরগ উড়ে গেল। আবার সতর্ক হতে হল।

রাত্রি গড়াচ্ছে, প্রায় আধমাইল দূরে একটা সম্বর হরিণ ডেকে উঠল। তারপর আরও দুটো ডাক ভেসে এল। বুঝলাম, এবার তিনি আসছেন, দেখা হবে। রাইফেল নিয়ে তৈরি হলাম। কিন্তু দশ মিনিট, পনেরো মিনিট পেরিয়ে আধঘণ্টা পেরোবার পর মনে হল, এতক্ষণে বাঘিনির এসে পড়ার কথা, অথচ তার দেখা নেই—প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমেল স্রোত নেমে গেল। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমার জীবনে বার বার আমাকে রক্ষা করেছে। এখানেও তাই হল, না হলে ওই 'মড়ি'র পাশে আমার মৃতদেহের অংশ পড়ে থাকত সন্দেহ নেই।

একটা নুড়ি পাথর গড়িয়ে আমার পাশে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল নিয়ে ঘুরলাম, সামনে ফুট চারেক উঁচু পাথর, সেই পাথর পেরিয়ে মুখ তুলতেই দেখলাম মুখোমুখি সাক্ষাৎ মৃত্যু—মাত্র আট ফুট দূরে নরখাদক বাঘিনি। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়লাম, কানের পাশে প্রচণ্ড আওয়াজে বাঘিনি লাফ দিয়ে আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, আর লাফ দেওয়ার সময় তার পিছনের পায়ে লেগে রাইফেল আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ল নীচে, মাটিতে। একটু দূরে নালা, সেদিকেই লাফ দিয়েছে জানোয়ারটা। এখন যদি সে ফিরে এসে আবার আক্রমণ করে তাহলে আমার থেকে অসহায় আর কেউ নেই। সেই ঝুঁকি নিয়েই নীচে নেমে রাইফেলটা কুড়িয়ে আনলাম। পরীক্ষা করে দেখা গেল কোনো ক্ষতি হয়নি।

এরপর মোষের টোপ দিয়ে টানা দশ দিন চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু জানতাম সে চেষ্টায় লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত এগারো দিন পরে বন্ধু সাব-কালেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এলাম ব্যাঙ্গালোরে। বলে এলাম, যদি কোথাও নরখাদকের কোনো ঘটনা কানে আসে, তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাতে, আমি চলে

আসব। আসলে এই ক-দিনে আক্রান্ত গ্রামবাসীদের উপর একটা দায়িত্ববোধ জন্মে গিয়েছিল আমার, এই জন্যই ওকথা বলা। আর একটা কারণও বোধহয় ছিল—আমার ছোড়া গুলিতে বাঘের একটা কান উড়ে গিয়েছিল, ফলে ওই কানকাটা বাঘিনি আমার স্মৃতিকে মাঝে-মধ্যেই উসকে দিচ্ছিল।'

ব্যাঙ্গালোরে বেশ কয়েকমাস কেটে গেল। কেনেথ এন্ডারসন এর মধ্যে কয়েকটা চিঠি পেয়েছেন বটে, কিন্তু সব চিঠিতেই সাব-কালেক্টর লিখেছেন—গুজবের কথা, পর পর গুজব ছড়িয়েছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষখেকোটার সম্পর্কে। শেষ পর্যন্ত সত্যি খবরটা এসেছে বটে, ওই চিঠির মাধ্যমেই, জরুরি চিঠি।

'একটা কথা এর মধ্যে বলে দিই। বাঘিনিকে গুলি করার পরে বাঘিনি পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু একটা সাদা বস্তু আমার

সামনে পড়ে থাকে। বন্দুক কুড়িয়ে এনে দেখি সেটা বাঘিনির একটা কান। বন্দুকের গুলিতে ছিটকে মাটিতে পড়েছে, বড়ো একটা কান, প্রায় গোটা কানটাই। এর ফলে বাঘ কিছুদিনের মতো ব্যথা অনুভব করবে বটে কিন্তু শিকার ধরতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, হবেও না। বরং ব্যথার সঙ্গে মানুষ খুনের প্রবণতাও বাড়বে, কারণ মানুষই তার ওই কান হারাবার জন্য দায়ী।

সুলেকুন্ডা গ্রামের যে ভাঙাচোরা পোড়ো মন্দিরটার কথা আগে বলেছি, যেখানে পুজো দিতে মানুষ মাঝে-মধ্যে যাতায়াত করে, সেখানে একজন পুরোহিত আছেন পুজো নেওয়ার জন্য, তার ব্যবস্থা করতে।

এবার সেই পুরোহিত বাঘের শিকার। মন্দির থেকে খানিকটা দূরে বিশাল একটা পিপুলগাছের নীচে শিকড়ের গায়ে পুরোহিতের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, তাঁর বুক আর আশপাশের কিছু অংশ খেয়ে বাকি দেহটা বাঘ ফেলে রেখে গেছে। পুজো দিতে যারা গেছে তারা এই দৃশ্য দেখে এসে খবর দিয়েছে। পুজো আর দেওয়া হয়নি, কারণ পুরোহিত মন্দিরে নেই, তাঁর খোঁজ করতে গিয়েই এই মৃতদেহের আবিষ্কার।

মন্দিরের ঠিক সামনে চাতালে আমি আর দুজন সঙ্গী গিয়ে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা হল—চারিদিকে আগুনের কুণ্ড সাজিয়ে সে রাতটা কাটালাম; সকালে উঠে দেখলাম, শকুন আর হায়না মিলে পূজারির দেহটাকে কয়েকটা হাড়ে পর্যবসিত করেছে, শরীরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। গত রাতে সম্ভবত একটা লেপার্ড মানে চিতাবাঘ একটা হরিণ শিকার করেছে, তার আওয়াজ পেয়েছি আর একটা বুনো হাতির ডাক শুনেছি।

হতাশ হয়েই সকালে পাশের কুয়ো থেকে জল তুলে, সেই জলে চা তৈরি করে খেলাম, সঙ্গে কিছু খাবার খেয়ে এগোলাম। জঙ্গল ভেঙে প্রায় আট ঘণ্টা লাগল গুন্ডালাম পৌঁছোতে।

পৌঁছে গ্রামের এক মোড়লের সঙ্গে দেখা হল, লোকটা বাঘিনির একেবারে মুখোমুখি হয়েছিল। ঘটনা ঘটেছিল দিনের বেলাতেই। মোড়ল একটা গ্রামের লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা ধরে আসছিল। পথে লোকটার প্রস্রাব পায়, আর প্রস্রাব করতে জঙ্গলের ধারে যায়---ঠিক তখনই ঝোপের আড়াল থেকে একটা প্রকাণ্ড মুণ্ড বের হয়, যার একটা কান নেই। মোড়লের চোখের সামনে বাঘিনি লোকটাকে তুলে নিয়ে যায়---শুধুমাত্র একটা আর্তনাদ করার সুযোগ পেয়েছিল লোকটা। হিসাব অনুযায়ী এটা বাঘিনির আট নম্বর মানুষ শিকার।

এরপর বাঘিনির খোঁজ পাওয়া গেল জাওলাগিরি বনবাংলোর কাছে, বাংলোর দারোয়ান মেরেছে—এর মধ্যে আড়াই দিন আমি বেশ ঝুঁকি নিয়েই ঘুরেছি বাঘিনির খোঁজে, সত্যি বলতে আমার মধ্যে একটা মরিয়া ভাব গড়ে উঠেছে, তাই ওই ঝুঁকি নিয়ে ফেলছি। ভাবিনি যে একমুহূর্তের মধ্যে আমার আর বাঘিনির অবস্থান পাল্টে যেতে পারে—শিকারি ওই মুহূর্তের মধ্যে নিজেই শিকারে পরিণত হতে পারে।

ফিরলাম সুলেকুন্ডার জঙ্গলে ওই মন্দিরের ধারে, এখন আমার দলে লোকসংখ্যা বেড়ে বারোজনে দাঁড়িয়েছে। লোকসংখ্যা বাড়তে বিপদের সম্ভাবনা কমেছে ঠিকই, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার একটু অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, তা হোক।

প্রায় বছরখানেক আগে একটা ছেলে এখানে বাঘের কবলে প্রাণ হারিয়েছিল, তখনই মন্দির থেকে সামান্য দূরে বড়ো একটা তেঁতুলগাছ চোখে পড়েছিল। সেই তেঁতুলগাছে মাচা বাঁধলাম, সঙ্গের লোকজন যে যার মতো অন্যান্য গাছে জায়গা করে উঠে বসল। এর মধ্যে বাঘের গর্জন কানে এসেছে—আর এও বুঝেছি যে এটা মিলনের সময়, তাই বাঘ নয়, বাঘিনি গর্জন করে সঙ্গী বাঘের খোঁজ করছে। এই বাস্তবটুকুকে সামনে রেখেই এবার কাজ শুরু করতে হবে, দেখা যাক!

মাটি থেকে বারো ফুট উপরে মাচা বাঁধা হয়েছে। চারদিক দেখা যায়; সেখান থেকে বাঘিনির গর্জনের উত্তরে বাঘের গর্জন করলাম। একবার নয়, পর পর দু'বার। কোনো উত্তর এল না। এবার শরীরের সমস্ত দম টেনে নিয়ে প্রাণপণে তৃতীয়বার 'গর্জন' করলাম। এবার উত্তর এল। আর একবার গর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম বাঘিনি এই দিকেই আসছে, উত্তরে সেটা বোঝা গেল।

গর্জন আর প্রতি-গর্জনের মধ্যে দিয়ে বাঘিনি আমার থেকে একশো গজের মধ্যে এসে পড়েছে বুঝলাম, এবার বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করলাম। সাতাশ সেকেন্ডের মধ্যে বাঘিনির পুরো শরীর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, কাটা-কান সহ।

বাঘিনির গতি থামাতে একটা গোঙানির আওয়াজ করলাম। চকিতে বাঘিনি থেমে গিয়ে উপর দিকে চাইল। আর রাইফেলের গুলি ঠিক তার দুই চোখের মাঝখানে গিয়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে বিদ্ধ হল।—আরেকটা গুলি তার কপাল লক্ষ্য করে চালালাম—বাঘিনি ততক্ষণে মৃত।

জাওলাগিরির মানুষখেকো মৃত; আমার সঙ্গে যে এগারোজন সঙ্গী ছিল তাদের হই-হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে সমস্ত অঞ্চলে তা রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আমার মনটা সামান্য বিষণ্ণ ছিল। শেষ পর্যন্ত ছলনার আশ্রয় নিয়েই বাঘিনিটাকে মারতে হল, এটা শিকারির বীরত্ব বলা চলে না।

গ্রামবাসীদের আনন্দ-উত্তেজনা চলছিল, আর আমি গরম চা, খাবার আর দু-পাইপ ধূমপানের পর যেন একটু শক্তি ফিরে পেলাম। আমার স্টুডিবেকার গাড়িতে বাঘিনির দেহটাকে চড়িয়ে নিয়ে যখন ফিরছি তখন মনে একটাই স্বস্তি—অনেক মানুষ বাঁচল এই ভয়ংকর নরখাদকের কবল থেকে। এটা কম বড়ো কথা নয়।' ❖

অভিশপ্ত অ্যায়োকিগাহারা
(জাপান)

ড. গৌরী দে

ছবি : শৈবাল দত্ত

পৃথিবী-বিখ্যাত চামড়া ব্যবসায়ী মিঃ নাকিয়ারা রীতিমতো চিন্তায় পড়েছে। বেশ চলছিল তার ব্যবসা 'জাপানিজ ওয়ান্ডার' রমরমিয়ে, হঠাৎ দেখা গেল ইংলন্ডের মিঃ চার্লসের 'ইন্টারন্যাশনাল বিগ স্টোর' তার ব্যবসার ওপর কালো ছায়া ফেলছে। দুজনেরই ব্যবসা একই মেটিরিয়ালস্ নিয়ে। দুজনেই বিভিন্ন চামড়ার জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। জুতো, ব্যাগ, টুপি, দস্তানা, বেল্ট আরও কত কী। নাকিয়ারার ব্যবসায় ছিল নানা ধরনের চামড়ার জুতোর বিশেষত্ব। হঠাৎ দেখা গেল চার্লসও জুতোর ক্ষেত্রে একটা নতুন চমক দিল। সেটা হল বিভিন্ন সাপের চামড়ার জুতো। বাজারে রীতিমতো আলোড়ন তৈরি করল চার্লস। আর এইখানেই মার খেয়ে গেল নাকিয়ারা। ওরা নতুনত্ব কিছু করার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু ক্রমশ পেছিয়ে পড়তে লাগল।

জাপানের টোকিও শহরে একটা দশতলা বাড়ির চারতলায় নাকিয়ারার অফিস, আজ সেখানে বেশ কিছু বিজনেস পার্টনারের আগমন ঘটেছে। সবাই-এর মুখে এককথা—'নাকিয়ারা—কিছু করো, কিছু ভাবো। এভাবে চললে আমাদের বিরাট লস্ হয়ে যাবে।'

নাকিয়ারা চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরময় পায়চারি করতে করতে ভাবছিল কী করবে সে। এভাবে চললে তো একদিন তাকে পথে বসতে হবে। নাঃ এটা হতে পারে না, কিছু তো তাকে করতেই হবে। অনেকেই অনেকরকম পরামর্শ দিতে লাগল। কিন্তু কোনোটাই কারো মনের মতো হল না। সকলে ব্যাপারটা নাকিয়ারার ওপর ছেড়ে দিয়ে বলল—

—তুমি ভাব। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি, দেরি কোরো না। তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে।

সবাই চলে গেল। নাকিয়ারার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সুজুকি কিন্তু গেল না। ও একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দরজায় কে যেন নক করতে লাগল। নাকিয়ারা নিজের টেবিলের ওপর মাথায় হাত রেখে বসে ছিল—ওই অবস্থাতেই বলল—

—কে!

—স্যার আমি রবার্ট।

—রবার্ট! তোর পি. এ., ও হঠাৎ এ সময়? বলল সুজুকি।

যথেষ্ট বিরক্তি গলায় নিয়ে চাপাস্বরে বলল নাকিয়ারা—

—তুমি! তুমি কী করতে এসেছ—? ছুটি তো হয়ে গেছে। যাও বাড়ি—যাও।

রবার্ট দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আমি কিছু বলতে চাই। আমি জানি ব্যবসায় খুব লোকসান হচ্ছে—তাই....

—তাই....তাই কী? ব্যবসার লাভ-লোকসানে তোমার তো কোনো মাথাব্যথা থাকার কথা নয়। দেখো আমার মনমেজাজ ভালো নেই—তুমি এখন আসতে পারো।

রবার্ট বিনীত কণ্ঠে বলল—স্যার, এটা আপনি কী বলছেন? এই ব্যবসার লাভ-লোকসানের ওপর তো আমাদের সব কর্মচারীর ভাগ্য নির্ভর করছে। তাই আমি যা বলতে এসেছি দয়া করে একটু শুনুন।

সুজুকি নাকিয়ারার হাতের ওপর হাত রেখে একটু চাপ দিল। তারপর রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল—

—বেশ বল তুমি কী বলবে।

নাকিয়ারা ঠিক যেমন ভাবে বসেছিল ঠিক তেমন ভাবেই বসে রইল। রবার্ট বলতে শুরু করল—

—স্যার—, আমি লন্ডনের ছেলে। আপনার এখানে কাজ করার আগে আমি কিছুদিন লন্ডনে চার্লসের কাছে কাজ করেছিলুম। আমার সঙ্গে ওর ভালো পরিচিতি আছে।

—হ্যাঁ তাতে কী?—নাকিয়ারা বিরক্ত হয়ে বলে।

রবার্ট বলল—না আমি যদি ওঁর সঙ্গে দেখা করে......

—কী বলবে তুমি! আর তোমাকে চার্লস পাত্তাই বা দেবে কেন। সুজুকি বলে ওঠে।—তোমার গিয়ে কোনো লাভ নেই।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় নাকিয়ারা। প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলে—

—লাভ আছে—, লাভ আছে সুজুকি।

—কী বলছ—নাকিয়ারা? সুজুকি অবাক হয়।

—হ্যাঁ তুমি যাবে চার্লসের কাছে। আর গিয়ে কী বলতে হবে—আমি তোমাকে বলে দেব। এখন যাও।

সুজুকি প্রশ্ন করে—কী করতে চাইছিস, তুই?

নাকিয়ারা বলে—সব বলব। এখন নয়। এখন আমার একটু বিশ্রাম চাই।

পরের দিন টিফিন ব্রেকের সময় নাকিয়ারা রবার্টকে তার অফিসে ডেকে পাঠাল। সারারাত ধরে ও ভেবেছে ও কী করবে। একটাই রাস্তা। চার্লসকে ওর পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া। তার জন্যে যে কোনোভাবেই হোক চার্লসকে পাঠাতে হবে অভিশপ্ত অ্যায়োকিগাহারার জঙ্গলে। তাহলেই সব সমাধান। ও নিজে জাপানি হয়ে জানে এই জঙ্গল কতটা বিপজ্জনক। এটা ভূতুড়ে জঙ্গল নামে বিখ্যাত। লোকে ওখানে আত্মহত্যা করতে যায়। আর ফিরে আসে না। প্রতি বছর শয়ে শয়ে লোক সেখানে যায় আত্মহত্যা করতে। জঙ্গল জুড়ে শুধু অতৃপ্ত আত্মাদের ঘোরাফেরা। কোনো সুস্থ মানুষ গেলে আর বেরোতে পারে না, ফিরেও আসে না। ২০০৪ সালে ১০৮ জনের প্রাণ গেছে ওই জঙ্গলে। বছরের পর বছর ধরে জমেছে লাশের পাহাড়। স্থানীয় পুলিশ গভীর জঙ্গল থেকে ঝাঁট দিয়ে লাশ পরিষ্কার করে। শোনা যায় অতীতে প্রচণ্ড এক দুর্ভিক্ষের সময় শত শত লোক না খেতে পেয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে থাকতে মরে যেত। এ ছাড়াও বলা হয় বৌদ্ধ শ্রমণরা নাকি যোগসাধনার জন্যে অনশন করে ওখানে পড়ে থাকত। তারপর মারা যেত। তাদেরও আত্মা নাকি আজও ঘুরে বেড়ায়। কোনোভাবে একবার যদি চার্লস ওখানে গিয়ে পড়ে, তবে....

—স্যার আসব?

—এসো—।

রবার্ট ঘরে ঢুকল।

—আপনি আমাকে ডেকেছেন, স্যার?

—হ্যাঁ। তুমি যেন কী বলছিলে? তুমি চার্লসের ইন্টারন্যাশানাল বিগ স্টোরে কাজ করতে।

—হ্যাঁ স্যার—বেশ কয়েক বছর করেছি।

—বেশ, তা তুমি যে এখন জাপানিজ ওয়ান্ডারে কাজ করো সেটা ওরা জানে?

—না স্যার, এখানে আসার পর থেকে আমার সঙ্গে ওদের আর কোনো যোগাযোগ নেই। তবে চার্লসের ব্যবসাবুদ্ধি অসাধারণ।

—বেশ। তুমি তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করো। কায়দা করে ওকে অ্যায়োকিগাহারা জঙ্গলে পাঠাবার ব্যবস্থা করো।

—অ্যায়োকিগাহারা জঙ্গলে? কেন?—অবাক হল রবার্ট।

রেগে গেল নাকিয়ারা।—

—শোনো রবার্ট, কাজটা যদি করতে পারো তাহলে আমার কোম্পানিতে তোমাকে শেয়ার হোল্ডার করে দেব। সম্মান, টাকা দুটোই পাবে। না পারো তো বলে দাও।

রবার্টের চোখ দুটো লোভে চকচক করে উঠল। কর্মচারী থেকে শেয়ার হোল্ডার! ওর মতো ছাপোষা মানুষ তো এসব ভাবতেই পারে না। মুখে বলল—

—আমি চেষ্টা করব স্যার। কিন্তু সবকিছু অ্যারেঞ্জমেন্ট.....

—আমার দায়িত্ব। বলল নাকিয়ারা। তুমি শুধু তোমার বুদ্ধি খরচ করে ওকে টোকিও বিমানবন্দরে এনে ফেল। তারপর যা করার আমি করব। এখন তুমি যাও।

ওরা লক্ষ করল না—ওদের সব কথা দরজার আড়াল থেকে কেউ শুনছে।

—আর শোনো সব ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। কেউ কিছু জানতে না পারে। বলল নাকিয়ারা।

রবার্ট মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে—আর ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকল নিকারো। নাকিয়ারার ভায়ের ছেলে—কিন্তু ও তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করেছে। যখন যা চেয়েছে— দিয়েছে। বলতে গেলে কাকার আদরে নিকারো যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে আর তাই সে ক্রমশ জেদি আর খামখেয়ালি হয়ে উঠেছে।

—এসো নিকারো। কী দরকার বলো।

নিকারো সোজাসুজি প্রশ্ন করে—

—অ্যায়োকিগাহারার জঙ্গলে কি ভূত আছে কাকা?

চমকে ওঠে নাকিয়ারা। বলল—

—হঠাৎ এ কথা?

নিকারো বলল—না, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় গিয়ে দেখি সত্যি কী ব্যাপার।

নিকারো....! আতঙ্কিত নাকিয়ারা ধমকে উঠল। খবরদার নিকারো, তুমি কলেজে পড়ছ, মন দিয়ে পড়াশোনা করো—অন্য কিছুতে মন দিও না। তোমার মুখে যেন আর কোনোদিন এই জঙ্গলের নাম না শুনি।

—কেন কাকা! এটা তো আমাদের জাপানেরই একটা জায়গা—, জানব না সব সত্যি কি না?

—নিকারো...আবার ধমক দেয় নাকিয়ারা। তোমাকে আমি বারণ করছি—এটা আমার আদেশ। বুঝেছ?

নিকারো মাথা নেড়ে চলে যায় কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, একদিন ও যাবেই, শুধু সুযোগের অপেক্ষা। ওকে সবটা জানতে হবে।

লন্ডনের অফিসে চার্লস বসে কাজ করছিল, জন আর অ্যান্ড্রুর

সঙ্গে। ওরা দুজনেই চার্লসের বন্ধু। অ্যান্ড্রু অ্যাকাউন্টস দেখে—আর জন চার্লসের সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যবসাটা সামলায়। জনের আর একটা পরিচয় আছে। ও রাইফেল শুটিং-এ চ্যাম্পিয়ন, ঠাট্টা করে বলে—

—আমি তোর বডিগার্ডও বটে।

দরজায় নক করল রবার্ট।

—আসতে পারি স্যার—?

ওরা তিনজনেই দরজার দিকে তাকাল। জোয়ান, লম্বা ছিপছিপে রবার্ট ঘরের ঠিক বাইরে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

—কে! ভেতরে আসুন।—বলল চার্লস।

—আমায় চিনতে পারছেন না স্যার! আমি রবার্ট—আপনার কাছে—আপনার পি. এ হয়ে....

ওকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিয়ে চার্লস একগাল হেসে বলল—ওয়েলকাম রবার্ট। তা এতদিন পরে? কী খবর? কী করছ এখন?

রবার্ট ঘরে ঢুকল। চার্লস ওকে ইশারায় বসতে বলে বলল—

—কোথায় কাজ করছ? না কি কিছু করছ না বলে আবার আমার কাছে এসেছ?

—না স্যার, আমি জাপানে একটা খুব ভালো চাকরি পেয়েছি।

—বাঃ, খুব ভালো। তা জাপানে কেন? এতদূরে? এখানে কিছু পেলে না?

—না স্যার, পেয়েছিলাম, তবে ওরা প্রচুর টাকা অফার করেছিল। আসলে স্যার আমার টাকার খুব দরকার ছিল। তাই...।

—ঠিক আছে, এখন বলো—তুমি কী জন্যে এসেছ?

—স্যার। আমি আপনার নুন খেয়েছি। আপনি ছাড়াননি, আমি আপনাকে বেশি টাকার লোভে ছেড়ে গেছিলাম। তাই ভাবতাম কোনোভাবে যদি আপনার কোনো কাজে আসতে পারি—তাহলে আমার খানিকটা শান্তি হবে। তাই বলছি স্যার আপনি যদি একবার জাপানে যেতে পারেন তাহলে আপনার ব্যবসার প্রচুর লাভ হবে।

চার্লস একটু নড়েচড়ে বসল। লোকটা কী বলতে চায়! ব্যবসা তো চার্লসের একমাত্র লক্ষ্য। যদি ব্যবসার উন্নতি হয় তবে তো তার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না। চার্লস মনের ভাব চেপে নিস্পৃহ গলায় বলে—

—আর ইউ ম্যাড! ইংলন্ড আমার মাতৃভূমি সেটা ছেড়ে জাপানে যাব—কেন? ওখানে তো আমি কিছুই জানি না—চিনি না। কী ব্যাপার বলো তো রবার্ট—তুমি হঠাৎ জাপানে নিয়ে যেতে চাইছ কেন আমায়?

রবার্ট বিনীত কণ্ঠে বলল—না স্যার আমি আপনাকে যেতে বলছি না—শুধু একটা সাজেশন দিতে এসেছিলাম—সেটা শুনে যদি আপনি মনে করেন যাবেন—তবেই যাবেন—নয়তো নয়।

—কী বলতে চাও তুমি! খুলে বলো তো।

—শুনুন স্যার, জাপানে অ্যায়োকিগাহারা নামে একটা জঙ্গল আছে, জন্তু-জানোয়ারে ভর্তি। ওখানে গিয়ে শিকার করলে আপনি চামড়া পাবেন বিনা পয়সায়। আর আপনার তো নানা ধরনের চামড়ার প্রয়োজন। ভালো টাকায় কিনতেও হয়।

—কিন্তু সে জঙ্গলে আমার মতো এক বিদেশিকে ঢুকতে দেবে কেন? শিকার করতেই বা দেবে কেন?

হাসল রবার্ট।—সেইজন্যেই তো আমি এসেছি স্যার—ও জঙ্গলে কোনো বিধিনিষেধ নেই—। ফুজি পাহাড়ের নীচে এই বিশাল জঙ্গল। ঘন গাছপালায় বনটা প্রায় অন্ধকার হয়ে থাকে। আর একটা কথা স্যার—আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—আমি ওই শহরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের উচ্চপদস্থ এক কর্মচারী, আপনার পারমিশন তো আমার হাতে।
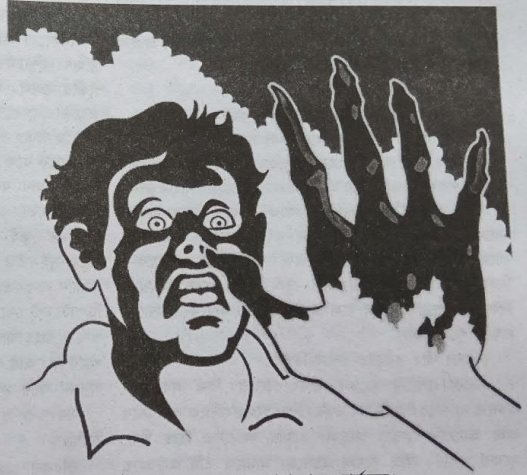
একটা লম্বা হাত এসে এক ধাক্কা মারে—চার্লসকে।

রবার্ট মনে মনে ঈশ্বরকে জানায়—আমাকে মিথ্যে বলার জন্যে ক্ষমা কোরো ঈশ্বর। কাজটা আমায় করতেই হবে আমার পরিবারের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তারপর আবার বলতে শুরু করল, স্যার দায়িত্ব আমার, গাড়ির ব্যবস্থা করে দেওয়া থেকে শুরু করে থাকা এমনকি ফিরে আসা পর্যন্ত সব দায়িত্ব আমার।

চার্লসের পাশেই বসেছিল, ওর দুই প্রিয় বন্ধু অ্যান্ড্রু আর জন। চার্লস ওদের দিকে তাকাল।

—তোমরা কী বলো?

দুজনেই মাথা নেড়ে বলল—মন্দ কী! একটা অ্যাডভেঞ্চার

হবে, তার সঙ্গে যদি লাভ হয়—তবে তো ক্ষতি নেই।

চার্লস রবার্টের দিকে তাকিয়ে বলল—ঠিক আছে, যাবার প্ল্যানটা আমি পরে তোমার সঙ্গে করে নেব। এখন তুমি বরং এসো।

রবার্ট চলে যেতে জন বলল—আমি তোমাদের জন্যে দুটো বন্দুক আর আমার জন্যে একটা রাইফেল নেব। গভীর জঙ্গলের ব্যাপার, সাবধানের মার নেই।

অ্যান্ড্রু বলল—আর আমি বড় ১৮ ইঞ্চি লম্বা একটা ইলেকট্রনিক্স টর্চ নেব। জ্বালালে দিনের মতো আলো হবে। তা ছাড়া দস্তানা, গামবুট এসবও লাগবে।

চার্লস হেসে বলল—তার সঙ্গে বস্তা আর দড়ি।

ইঙ্গিতটা বুঝে তিন বন্ধুই হেসে উঠল।

হোটেলে ফিরে রবার্ট নাকিয়ারাকে ফোন করল।—স্যার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

—বেশ—। এবার টোকিওতে নেমে কী করতে হবে মনে আছে তো?

—হ্যাঁ স্যার। সব মনে আছে। প্রথমে ফুজিয়ামা হোটেল। তারপর সাফারি গাড়ি...নম্বরটাও আমার নোট করা আছে।

—বেশ পরপর আমাকে খবর দিয়ে যেও।

—নিশ্চয়ই স্যার।—ফোন কেটে দিল রবার্ট।

ওরা যখন টোকিও বিমানবন্দরে নামল তখন প্রায় বিকেল। রবার্ট ওদের নিয়ে গেল পাঁচতারা হোটেল ফুজিয়ামাতে। ঠিক হল পরদিন লাঞ্চের পর রবার্ট গাড়ি নিয়ে আসবে অ্যায়োকিগাহারায় যাবার জন্যে।

এত অব্দি ঠিক চলছিল। হঠাৎ বিপদে পড়ল রবার্ট। নাকিয়ারাই গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিল। রবার্ট তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ভীষণভাবে চমকে গেল। একী! ড্রাইভারের পোশাকে—নিকারো! রবার্ট অবাক হয়ে বলল—তুমি....তুমি এখানে কী করছ? নিকারো কোনো কথা না বলে একটা অ্যাটাচি বার করে রবার্টের সামনে খুলে ধরল।

—এসব কী? রবার্টের গলায় বিস্ময়।

—টাকা। শোনো আঙ্কেল। এসব তোমার। কিন্তু কাকা যেন জানতে না পারে। আমি সব জানি। তিন ইংলন্ডবাসীকে তুমি নিয়ে যাচ্ছ অ্যায়োকিগাহারার জঙ্গলে। আমার বহুদিনের ইচ্ছে ছিল, সুযোগ পাইনি। আজ সুযোগ এসেছে। আমাকে তুমি আটকাতে পারবে না। তুমি তো জানো আমার জেদ।

—কিন্তু স্যার জানতে পারলে....রবার্টকে থামিয়ে নিকারো বলে—

—জানবে না। জানতে পারলে কিন্তু তুমিই ফাঁসবে।

—মানে—? অসহায়ভাবে প্রশ্ন করে রবার্ট।

—মানে—এই টাকাটা তখন আমি কাকাকে দেখিয়ে বলব—এই টাকা তুমি চুরি করেছ আমাদের অফিস থেকে। তারপর বুঝতে পারছ কী হাল হবে তোমার। সোজা চাকরি থেকে আউট আর জেল-হাজত বাস। আমি জানি কাকা আমাকে কোনোদিনই ওখানে যেতে দেবে না।

—তুমি তো আলাদা যেতে পারতে, এদের সঙ্গে কেন?—রবার্ট বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে।

—তার কারণ এরা শিকার করবে। সেটাই আমি দেখতে চাই। একা গেলে সেটা হবে না। এবার বলো—কী করবে? জেল.....না.....

অগত্যা রাজি হতেই হল রবার্টকে। লাঞ্চের পরই গাড়ি চলে এল হোটেল ফুজিয়ামাতে। মাথায় বড়ো টুপি, কোমরে বন্দুক, রাইফেল, টর্চ সব নিয়ে তিন বন্ধু গাড়িতে উঠে বসল। রবার্ট পরিচয় পর্বটা সেরে নিল। নিকারোকে দেখিয়ে বলল—ও আপনাদের গাইড কাম ড্রাইভার—নিকারো। আর এটাও রাখুন।—কিছু স্ন্যাকস আর জলের পাউচ রয়েছে।

রবার্ট বক্সগুলো গাড়িতে রেখে বলল—

—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনারা হোটেলে ফিরে আসবেন। যদি রাত হয়ে যায় তাও বেরিয়ে আসবেন।

চার্লস হেসে বলল—তুমি কি ভয় পাচ্ছ নাকি! আমাদের সঙ্গে ঝুক আছে আবার গাইডও আছে, তাই না!

রবার্ট মাথা নাড়ল কিন্তু ভয়ে তার বুকটা দুরদুর করে উঠল।

অ্যান্ড্রু জিজ্ঞেস করল—কতক্ষণ লাগবে যেতে?

নিকারো বলল—টোকিও শহর থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি মাউন্ট ফুজির নীচে এই গভীর জঙ্গল। জঙ্গলটা ১৩০৫ স্কোয়ার মাইল লম্বা। রাস্তাও এবড়ো- খেবড়ো জঙ্গলের ভেতর। রাস্তা জানা না থাকলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এত বড়ো বড়ো গাছ দিয়ে ঘেরা যে লোকে বলে গাছের সমুদ্র। এটুকু বলে থেমে গেল নিকারো। বাকিটা আর বলল না—। বললে যদি ওরা পেছিয়ে আসে তাহলে তো ওরও যাওয়া হবে না। কাল রাতে ওর বন্ধু বলেছিল—তুই যাস না নিকারো। অ্যায়োকিগাহারা মানে জানিস? মানে সুইসাইড ফরেস্ট। প্রতি বছর ১০০ জন করে লোক এখানে আত্মহত্যা করে। মৃতদেহের পাহাড় হয়ে যায়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে বছরে একবার ওসব মৃতদেহ পরিষ্কার করে। ওখানে প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে না। আর বলেছে বৌদ্ধ শ্রমণরা এখানে গাছের নীচে বসে অনশন করে মৃত্যুবরণ করত।

সব কথা শুনে নিকারোর যাবার ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়ে গিয়েছিল।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। জন বলল—তাহলে তো ঘণ্টাতিনেক লাগবে—১০০ মাইল তো কম নয়।

নিকারো খানিক আগেই গাড়ি স্টার্ট করে দিয়েছিল। বলল—হ্যাঁ স্যার।

চওড়া রাস্তা, দু-ধারে গাছ, মনোরম দৃশ্য—গাড়ি এগিয়ে চলল ১২০ মাইল স্পিডে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল মাউন্ট ফুজি। নীচটা ঘন অন্ধকার। গাড়ি যত এগোতে লাগল নীচের অন্ধকারটা ফিকে হতে আরম্ভ করল। তারপর বেশ পরিষ্কার। জঙ্গলটায় ঢুকতে কোনো বাধা নেই তাই কেউ বাধাও দেবে না। গাড়ি থামিয়ে নিকারো বলল—স্যার এবার আমাদের হাঁটাপথে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।

অ্যান্ড্রু, জন, চার্লস টর্চ-বন্দুক, সব নিয়ে নেমে বলল—নিকারো তুমি পথ দেখাও।

নিকারো কিছুই জানে না, কিন্তু কাউকে বুঝতে দিল না। তাহলে

তো ওরও যাওয়া হবে না। মুখে বলল—হ্যাঁ স্যার চলুন—। আমাকে ফলো করে।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। চার্লস হাতের টর্চটা জ্বালতেই দিনের মতো আলো হয়ে গেল। সেই আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সরু পায়ে হাঁটা পথ জঙ্গলের দিকে ঢুকে গেছে। পায়ের তলায় পাঁকের মতো—। চারিদিকে গাছগুলো যেন সব হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পথ আটকাবার জন্যে। ওরা টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছিল, মাঝে মাঝে নিভিয়েও দিচ্ছিল চোখটা সয়ে নেবার জন্যে। হঠাৎ ওরা থমকে দাঁড়াল। সামনে এক বিশাল বড়ো গাছের ডাল থেকে একটা মৃতদেহ ঝুলছে। টর্চ ফেলল চার্লস আর সঙ্গে সঙ্গে চাপা আর্তনাদ করে উঠল। কী বীভৎস! চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, একহাত জিভ বেরিয়ে লক্‌লক্ করছে। টর্চ নিভিয়ে আবার জ্বালল চার্লস। কিন্তু কই—মৃতদেহটা তো নেই। পাশ থেকে হিসহিস করে সাপের মতো কেউ বলে ওঠে—খবরদার কোনো আলো নয়।

চার্লস চেঁচিয়ে ওঠে—কে? কে?

একটা লম্বা হাত এসে এক ধাক্কা মারে—চার্লসকে। চার্লস পড়ে যায়। ওর হাত থেকে টর্চটা ছিটকে পড়ে কোথাও।

অন্ধকারে জন চলতে গিয়ে ধাক্কা খেল। ও পরিষ্কার দেখল মাটিতে পড়ে আছে একটা আধখাওয়া মড়া, ও ধাক্কা খেয়ে ওটাকেই জড়িয়ে ধরেছিল। গা-হাত-পা চটচট করছে। বুঝল—পচাগলা মড়ার মাস। অ্যান্ড্রু ভয়ের চোটে এলোপাথাড়ি বন্দুক ছুঁড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে সাঁড়াশির মতো কে যেন তার গলাটা ধরে তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল—। নিকারো ইতিমধ্যে একটু এগিয়ে গিয়েছিল।—বন্দুকের শব্দে পিছন ফিরে দেখে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। নিকারো একটু ভরসা পেয়ে বলল—

—আমার লোকেরা এখানেই আছে, দয়া করে ওদের কাছে আমায় পৌঁছে দেবেন।

সন্ন্যাসী বলল—এসো। খপ করে ওর হাতটা ধরল। একটা হিমশীতল স্পর্শ শরীরের শিরায় শিরায় বয়ে যেতে লাগল নিকারোর। ওর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না। লোকটা এক ঝটকা মারল নিকারোর হাত ধরে। কী অমানুষিক শক্তি সেই ঝটকায়—। নিকারোর শরীরটা হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়ল এক গভীর গর্তে। নিকারো বুঝতে পারল একটা কাদা ভরা পাঁকের মধ্যে গিয়ে সে পড়েছে। ওঠবার চেষ্টা করল, পারল না। ক্রমশ চোরাবালির মতো তলিয়ে যেতে লাগল সেই পাঁকে। অ্যান্ড্রু, নিকারো দুজনেই প্রাণ হারিয়েছে। বাকি চার্লস আর জন। যে আধখাওয়া মৃতদেহ জড়িয়ে ধরে পড়েছিল জন, সেটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল। জন পালাতে গেল পারল না। যে গাছের ডালে তারা দেখেছিল মৃতদেহ ঝুলছে—জন বুঝতে পারল ওর দেহটাও ওইরকম করে ঝুলছে। ওর হাত-পা অবশ, চেতনাও আস্তে আস্তে লুপ্ত হচ্ছে—ঠিক সেইসময় একটা রক্তচোষা বাদুড় তার শরীরে এসে বসে তার গলার নালিতে কামড় দিল। ধীরে ধীরে জনের প্রাণহীন দেহটা গাছের ডাল থেকে মাটিতে পড়ে গেল। চার্লস তখনও মাটিতে হাতড়ে টর্চ খুঁজছিল—কোনো একটা বস্তু তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ১৫/২০ ফুট উঁচু এক জায়গায় রাখল। তারপর ঠেলে ফেলে দিল নীচে। কারা যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল—আমরাও এইভাবেই আত্মহত্যা করেছি। মাটিতে পড়ার আগের মুহূর্তে চার্লস শুনতে পেল জঙ্গলজুড়ে এক পৈশাচিক অট্টহাসি। চার্লস বেঁচে থাকলে দেখতে পেত একদল কঙ্কাল তাকে ঘিরে আনন্দে নৃত্য করছে।

পরদিন সকালে কাউকে না জানিয়ে রবার্ট জঙ্গলে চলে এল। জঙ্গলের একটু দূরেই টহলদারদের অফিস। রবার্ট ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—

—কাল সন্ধেবেলা একটা গাড়িতে কিছু লোক....

টহলদারদের মধ্যে একজন বলল—

—হ্যাঁ, গাড়িটা আমি দেখেছি। জঙ্গলের ধারেই পড়ে আছে কাল থেকে।

তার মানে! বুকটা ছাঁৎ করে উঠল রবার্টের ভয়ে। নিকারো? নিকারো কোথায়!

রবার্ট হাল ছাড়ল না। টহলদারদের টাকা খাইয়ে জঙ্গল তল্লাশি করল। বীভৎস অবস্থায় পাওয়া গেল জন, অ্যান্ড্রু আর চার্লসের মৃতদেহ। প্রত্যেক দেহ রক্তশূন্য। মাথা-মুখ সব থেঁতলে গেছে। কিন্তু নিকারোর দেহটা কোথায়? একজন টহলদার খাদের ধারে দাঁড়িয়ে কী দেখছিল—রবার্ট তাকে জিজ্ঞেস করল—

—কী হল? পেলে?

লোকটা ইশারায় দেখাল—একটা ড্রাইভারের টুপি পড়ে আছে খাদের ভেতর।

নাকিয়ারা নিজের অফিসে চেয়ারে বসে ঘড়ি দেখছে আর ছটফট করছে। এতক্ষণে ওই চার্লসের দল নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে ওই অ্যায়োকিগাহারার জঙ্গলে। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ওই একাই এবার রাজত্ব করবে—আর লাভ করবে কোটি কোটি ইয়েন (জাপানি টাকা)। কিন্তু রবার্টের আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন! নিকারো, হ্যাঁ নিকারোকে এবার ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীদের মধ্যে একজন বানিয়ে দেবে। ওর তো কোনো সন্তান নেই—নিকারোই তো ওর একমাত্র অবলম্বন। নিকারোকে সুখবরটা দিতে হবে—

ভাবনায় ছেদ পড়ল। ঘরে ঢুকল রবার্ট। বিধ্বস্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল নিকোয়ারা—বলো, বলো রবার্ট, সুখবরটা...

—হ্যাঁ স্যার ওরা আর নেই। তবে—

—তবে? তবে আবার কোথা থেকে এল।

—স্যার, নিকারো—থমকে গেল রবার্ট।

—হ্যাঁ বলো—নিকারো, নিকারোকে কিছু বলেছ নাকি!

—স্যার নিকারো—আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে ওদের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়েছিল।

—কী বলছ! নিকারো কোথায়, ডাকো ওকে, আমি ওকে...

রবার্ট মাথা নীচু করে বলে—নিকারো আর নেই স্যার।

—কী...কী...বললে রবার্ট? নিকারো নেই মানে? কী বলছ তুমি...

—সরি স্যার...রবার্টের গলা কেঁপে ওঠে।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা—। তারপর সারা ঘর কাঁপিয়ে চিৎকার করল নিকোয়ারা—নিকারো...., নিকারো—নিকারো—সেই বুকফাটা আর্তনাদ রবার্টও সহ্য করতে পারল না—। কান্নায় ভেঙে পড়ল।❖

(সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে।)

গল্প

পাহাড়ি পথের বন্ধু

জয়দীপ চক্রবর্তী

ছবি : নচিকেতা মাহাত

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় খুশিপিসি বার বার বলেছিলেন, 'তোদের সমতলের রাস্তায় সাইকেল চালানোর সঙ্গে কিন্তু পাহাড়ি পথে সাইকেল চালানোর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ঢালু রাস্তায় গড়গড়িয়ে চললেও যখন চড়াইতে উঠতে হবে তখন দেখবি পরিশ্রমে জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সাইকেল নিয়ে একান্তই যদি বেরোস, খুব বেশি দূরে যাস না।' বাধ্য ছেলের মতো খুশিপিসির সামনে মাথা নেড়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার ইচ্ছে টাপুরের খুব একটা ছিল না। বরং পাহাড়ি পথে সাইকেল সঙ্গী করে এলাকাটা ঘুরে-টুরে ভালো করে দেখে নেওয়াটাই উদ্দেশ্য ছিল তার।

খুশিপিসির বাড়িটা পাহাড়ের এমন একটা জনপদ, যাকে আদৌ টুরিস্ট স্পট বলা যায় না। পাহাড়ের ছোট্ট ছোট্ট শহরগুলো যেমন হয়, এ জায়গাটাও তেমনিই। কিছু টিনের চালওয়ালা বাড়িঘর। রাস্তার পাশে পাশে বেশ কিছু দোকান-পাট। একটা ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর একটা স্কুল। স্কুল থেকে আরও কিছু পথ এগিয়ে গেলে পুরোনো একটা চার্চ। স্কুলটা ওই চার্চেরই অধীনে। পিসেমশাই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একমাত্র ডাক্তার। সেই সুবাদে খুশিপিসিদের এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরে থাকা। পিসি বলছিলেন, 'এখানে খুব বেশিদিন থাকতে হবে না। আর বড়োজোর বছরখানেক। পিসেমশাইয়ের বদলির অর্ডার হয়ে যাবে তার মধ্যে। আশা করা যাচ্ছে তখন কোনো বড় হাসপাতালেই পোস্টিং হয়ে যাবে তাঁর।'

টাপুরের অবশ্য জায়গাটা মন্দ লাগছিল না। এমন ভিড়-ভাড়াক্কাহীন পাহাড়ি জনপদে থাকার অভিজ্ঞতা আগে হয়নি তার। সন্ধের পরে আস্ত এলাকাটাই কেমন যেন ভূতুড়ে হয়ে যায়। পাহাড়ের ওপরে দূরের শহরের আলো জ্বলে মিটমিট করে। রাতের আকাশের তারাদের সঙ্গে মিশে থেকে। পাহাড়ি জঙ্গল থেকে আওয়াজ আসে কত রকমের। সূর্য ডুবে সন্ধে নামলেই শীত যেন হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে গায়ের ওপরে। সন্ধে গড়াতে না গড়াতে জবুথবু জনপদটা ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতরে। তখন এই পাহাড় আর পাহাড়ের মানুষজনকে নিয়ে কত গল্পই যে বলে খুশিপিসি! টাপুর আর তার মা হাঁ করে সেইসব গল্প শোনে।

এখান থেকে খানিক এগিয়ে গেলে রানিখেত। মুন্সিয়ারি, রানিখেত, কৌশানী এসব পরিচিত টুরিস্ট স্পট। প্রচুর মানুষ বেড়াতে আসে। থাকারও দারুণ বন্দোবস্ত আছে এসব জায়গায়। টাপুররাও আগে ঘুরে এসেছে এসব জায়গায়। খুশিপিসিরা এ অঞ্চলে আসবার আগেই। বাবা সঙ্গে ছিল সেবার। কী যে মজা হয়েছিল!

এবারে খুশিপিসির বাড়িতে বাবাকে ছাড়াই আসতে হয়েছে। বাবা আসতে পারেননি অফিসের কাজ থাকার জন্যে। স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে এসে বাবা টাপুরের মাথার চুল ঘেঁটে দিতে

দিতে বলেছিলেন, 'এবারে তো আমার যাওয়া হল না। তুই আর মা গিয়ে দেখে-টেখে আয় জায়গাটা। তেমন বিশেষ কিছু যদি নজরে পড়ে, এসে গপ্পো করিস কিন্তু আমাকে।' তেমন বিশেষ কিছু এখনও অবশ্য চোখে পড়েনি টাপুরের। ফিরে যাবার সময়ও এসেই গেল প্রায়। তাই বিকেলগুলো কিছুতেই বাড়িতে বসে থেকে কাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না টাপুরের। সাইকেলটা পিসেমশায়ের। আগে এই সাইকেল চালিয়েই হাসপাতালে ডিউটি করতে যেতেন। মাস তিন-চার হল তাঁর ব্লাড সুগার ধরা পড়েছে। তাই এখন হেঁটেই যাচ্ছেন রোজ।

সাইকেলটা পড়ে রয়েছে দেখে টাপুর বলেছিল, 'আমি ওটা নিয়ে একটু আশপাশটা ঘুরে আসি?'

'আয়', পিসি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানিয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি পথের চড়াই-উতরাইয়ের কথাটা স্মরণ করিয়ে সাবধানও করে দিয়েছিলেন। আর একটা কথাও অবশ্য বলেছিলেন তিনি। একটু চাপা স্বরে টাপুরের কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলেন, 'ওই পুরোনো চার্চটার দিকে যাস না বাবু। ওদিকটা ভালো নয়।'

'কেন, ভালো নয় কেন? কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল টাপুর।

পিসেমশাই হাসপাতালে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন তখন। পিসি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, 'ধুস, জায়গার আবার ভালো-খারাপের কী আছে? এ তো সমতলের শহর এলাকা নয় যে পথেঘাটে গুন্ডা-বদমাশের ভয় থাকবে। আসলে ওদিকটা নির্জন। পাহাড়ি জঙ্গলটাও খানিক ঘন। লোকজনের তাই যাতায়াত কম...'

মা বলে উঠল, 'ও নির্জন পাহাড়-জঙ্গলে যাবার দরকারটাই বা কী তোর? পিসি বারণ করছে যখন যাবি না ব্যাস...'

বাড়িতে থাকার সময় সন্ধেবেলা একা টিউশন পড়তে গেলেও মা দুশ্চিন্তা করে। কাজেই মা যে খুশিপিসির সঙ্গে গলা মেলাবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাজেই অহেতুক তর্ক না করে চুপ করে গেল টাপুর। টাপুর বুদ্ধিমান। সে জানে, এরপর কথা বাড়াতে গেলে সাইকেল নিয়ে একা বেরোনোর প্ল্যানটাও মা এক্ষুনি বাতিল করে দিতে পারে।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় মনে মনে ঠিক করেই নিয়েছিল টাপুর, ডান দিকের রাস্তা না ধরে আজ বাঁ দিকের রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাবে সে। এদিকটা সত্যিই নির্জন। দোকান-টোকান নেই বললেই চলে। একটা পাকদণ্ডি পাহাড়ের বুক চিরে সোজা ওপরে উঠে গেছে। ওই পথ ধরে এগিয়ে নিশ্চিত কোনো পাহাড়ি গ্রাম আছে। টাপুরের গন্তব্য সোজা পথে খানিক গিয়ে ডান দিকে যে ঢালু রাস্তাটা নেমে গেছে সেই দিকে। বেশ কিছু দূর এগিয়েই রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। টাপুর থমকালো। এবার কোন দিকে যাবে সে? যে রাস্তাটা ডান দিকে এগিয়েছে সে পথটা খাড়া ওপর দিকে উঠে গেছে। আর বাঁ দিকের অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তাটা ইউ-এর মতো বাঁক নিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে নীচের দিকে।

প্রায় সম্মোহিতের মতোই টাপুর ডান দিকের রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকের ভাঙা, অপ্রশস্ত, জংলি পথটা ধরেই সাইকেল ছুটিয়ে দিল। এদিকটা যেন বড্ড চুপচাপ, থমথমে। ঝিঁঝিপোকাদের সম্মিলিত ডানা নাড়ানোর শব্দও বাজছে একটানা। সেই শব্দও ছাপিয়ে কানে আসছে ঝর ঝর করে তীব্র বেগে ছুটে চলা নদীর জলের শব্দও। নদীটা এখনও চোখে পড়েনি। খুব সামনেই নদীটাকে পেয়ে যাবে নিশ্চিত। ভাবতে ভাবতেই ইউটার্নের মাঝামাঝি এসে পড়ল টাপুর আর তখনই সেই তীব্র চিৎকারটা শুনতে পেল সে। পিছন দিকের পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে থেকে কে যেন প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্টপ, স্টপ, স্টপ—'

ঢালু রাস্তায় সাইকেলের গতি ভালোই। দুম করে থামা মুশকিল। আর তখনই দূর থেকে দৃশ্যটা চোখে পড়ল তার। সামনে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে রাস্তাটা ভেঙে ঢুকে গেছে অনেকখানি নীচে ছুটে চলা নদীর মধ্যে। টাপুর ভয় পেয়ে গেল। গায়ের জোরে চেপে ধরতে গেল সাইকেলের বাঁ হাতে ধরে থাকা ব্রেকটা। তাতে সাইকেলের গতি কমল বটে, কিন্তু থামল না। নিশ্চিত বিপদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই টাপুর দেখল আশেপাশের জঙ্গল থেকে তিনটে প্রায় তার বয়েসিই ছেলে দৌড়ে এসে তিন দিক থেকে শক্ত করে ধরে ফেলল তাকে। আর তখনই একটা ভারী গলা গম্ভীর স্বরে বলল উঠল, 'ওয়েল ডান। ওয়েল ডান মাই সনস্।'

টাপুর সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল যখন, তখন তার হাঁটুদুটো তির তির করে কাঁপছে। বুকের মধ্যেও ধড়াস ধড়াস শব্দ হৃদপিণ্ডে। আর একটু হলেই চরম বিপদ হয়ে যাচ্ছিল। রাস্তাটা প্রায় শেষ। আর মাত্রই কয়েক ফুট এগোলে সে সাইকেল সমেত হুড়মুড় করে পড়ে যেত ষাট-সত্তর ফুট নীচের নদীতে। হাড়গোড় তো ভাঙতই, আদৌ সে আর বেঁচে থাকত কিনা কে জানে!

ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে সে হাসল, 'থ্যাংকস।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল সেই ভারী গলার মানুষটিকে। সাদা ধপধপে গাউন। একমাথা কাঁচাপাকা চুল। মুখে হালকা দাড়িগোঁফ। গলায় ঝোলানো ক্রস। তাঁর চোখ দুখানা এমনই স্নিগ্ধসুন্দর যে সেদিকে চাইলেই মন ভালো হয়ে যায়। টাপুর ঝুঁকে পড়ে তাঁর পা ছুঁতে যেতেই দু-হাতে তাকে ধরে ফেললেন ফাদার। তারপর বুকে টেনে নিয়ে ভারী সুন্দর করে হেসে বললেন, 'ডোন্ট টাচ মাই ফিট। তোমার জায়গা এখানে, এই বুকের মধ্যে।'

ফাদারের সারা শরীর থেকেই চমৎকার একটা গন্ধ উড়ছিল বাতাসে। পুজো বাড়িতে ধূপ, ধুনো, গুগগুল আর হোমের আগুনে পোড়া ঘি মিলেমিশে যে অদ্ভুত সুন্দর একটা গন্ধ তৈরি করে, এ গন্ধটাও যেন অনেকটা সেই রকমই।

ফাদার খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক আছে তো? লাগেনি তো কোথাও?'

'না।' টাপুর হাসে, 'ভাগ্যিস ওরা আমাকে ধরে ফেলেছিল।'

ফাদার হাসলেন, 'এসো তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই ওদের।'

এক এক করে তিনজনের সঙ্গে টাপুরের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি, 'এই হল আমাদের অ্যারন, ও জিতেন হেমব্রম এবং এই হল নীল—ইন্দ্রনীল। তোমার কী নাম? আমরা কী বলে ডাকব তোমাকে?'

'আমার নাম সাগ্নিক, বাড়িতে সকলে অবশ্য আমাকে টাপুর বলেই ডাকে।'

'আমরাও তোমাকে টাপুর বলেই ডাকি তাহলে?' অ্যারন, নীল এবং জিতেন ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর এই হলেন ফাদার ব্রাউন। আমাদের অভিভাবক আবার আমাদের বন্ধুও।'

ফ্রাদার ব্রাউন আবারও মিষ্টি করে হাসলেন। তারপর বললেন, 'তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ টাপুর?'

'হ্যাঁ। এখানে আমার এক পিসি থাকেন। আমি আর আমার মা তাঁর কাছে এসেছিলাম দিন চারেকের ছুটি নিয়ে। পরশু আমরা ফিরে যাব।'

'পরশুই?' নীল ম্লান মুখে বলল।

'হুঁ।'

'যাঃ তাহলে তো তোমার ছুটি শেষই হয়ে গেল টাপুর।' জিতেনও বলল, 'তোমাকে এখানে দেখে খুব আনন্দ হয়েছিল আমাদের। ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে ক-দিন একসঙ্গে খেলব আমরা। আমরা খেলার মতন বন্ধু পাই না এখানে জানো...'

টাপুর জিতেনের কথা বলার ঢঙে একটু অবাকই হল। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে, 'কেন, বন্ধু পাও না কেন?'

'এদিকে কেউ তো আসেই না', অ্যারন বলল, 'তোমাকে এদিকে আসতে দেখে সত্যি বলতে কী, প্রথমটা তো আমরা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন আসে না?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল টাপুর।

'প্রকৃতি নিজেই বোধহয় তাঁর কিছু সৌন্দর্য মানুষের আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন', ফাদার ব্রাউন টাপুরের মাথায় আলতো হাত রাখলেন, 'মানুষের অহেতুক ভিড়ে প্রকৃতির নিজস্ব কত শব্দ, কত দৃশ্যকে যে নষ্ট করে ফেলে টাপুর। এখানে সেইসব শব্দ, সেইসব স্বপ্নের মতো সুন্দর দৃশ্যগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই বোধহয় প্রকৃতি মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করতে চেয়েছেন নিজের মতো করে।'

টাপুর ফাদারের কথা ঠিক বুঝতে পারছিল না। ফ্যালফ্যাল করে সে তাকিয়েছিল ফাদারের দিকে।

তিনি আকাশের দিকে চেয়ে আত্মগত ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন আবার, 'মনে রাখবে নির্জনতারও একটা আলাদা মাধুর্য আছে। কিন্তু সে সুন্দর সকলে কি বোঝে, বলো? অধিকাংশ মানুষ এই নিরিবিলি, থমথমে প্রকৃতিকে ভয় পায়। তাই তারা এ তল্লাট মাড়ায় না। কিন্তু আমরা ক-জন এই নির্জন সুন্দরের সঙ্গে মিশে গেছি। ভাগ্যিস মিশে ছিলাম, তাই না তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হল, বলো টাপুর?'

'আপনারা রোজ এখানে আসেন?'

'আসব আর কোথা থেকে?' নীল হাসে, 'এই নদী, এই জঙ্গল, এই পাহাড়ের ঢাল, এটাই তো আমাদের বাসস্থান।' ফাদার নীলের কথার খেই ধরে বলেন হাসতে হাসতে, 'আমরা এখানে থাকি আর অপেক্ষা করি, কবে আমাদেরই মতো নির্জনতাপ্রিয় কেউ এসে যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে, আমাদের খেলার সাথী হয়ে।'

ফাদারের কথার শেষটায় কী লুকনো অর্থ ছিল কে জানে! কিন্তু টাপুরের কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল।

ফাদার হেসে বললেন, 'কী হল টাপুর? চুপ করে রইলে যে? তুমি কি আমাদের খেলার সঙ্গী হতে চাও না?'

'আপনিও খেলেন ওদের সঙ্গে?' টাপুর একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল ফাদারের মুখের দিকে চেয়ে।

অ্যারন, জিতেন, নীল, তিনজনেই হেসে উঠল হো-হো করে। তারপর খলবল করে বলে ওঠে, 'খেলেন বইকি। না খেলে কি উপায় আছে? আমরা কি ছাড়ি তাঁকে?'

ফাদার গলা নামিয়ে বলেন, 'উপায় কি টাপুর? আজ না হয় তুমি এলে। কিন্তু অন্যদিন এই তিনজনের খেলার সঙ্গী বলতে তো আমি একাই। আর হ্যাঁ, মাঝে মাঝে সে খেলায় অবশ্য এই বিশ্ব প্রকৃতিও এসে যোগ দেন...'

'এই প্রকৃতি?' অবাক হয়ে বলে টাপুর, 'প্রকৃতি খেলায় যোগ দেবে কী করে? সে কি তোমার-আমার মতো মানুষ নাকি?'

ফাদার এবং বাকি তিনজনেই হো হো করে হেসে ওঠে টাপুরের কথায়।

'সে ম্যাজিক দেখতে চাও তুমি?' টাপুরের হাত ধরে টান দেয় জিতেন, 'চলো তাহলে আমাদের সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'ওই নদীর কাছে, নীচে।'

ভয় পেয়ে যায় টাপুর। ইতস্তত করতে থাকে সে।

'যাও', ফাদার চোখের ইশারায় ওদের সঙ্গে যেতে বলেন

টাপুরকে। তারপর আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'কোনো ভয় নেই। এরা সকলে তোমার সত্যিকারের বন্ধু।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে জংলি গাছের ডাল আর পাহাড়ের গা ধরে ধরে সন্তর্পণে নীচে নেমে আসে টাপুর ওদের সঙ্গে। নদীর একেবারে কাছে গিয়ে পৌঁছয়। ভীষণ আওয়াজ করে ছোটো, বড়ো, মাঝারি পাথরের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে সেই নদী। পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে কোনো কোনো জায়গা থেকে জল ঠিকরে উঠছে ওপরে। সেই জলের গুঁড়ো এসে লাগছে টাপুরের মুখে-চোখে। নদীর জলে তাদের প্রতিবিম্ব ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। জায়গাটা সুন্দর। তবু কেন যে মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি পাকিয়ে উঠছে টাপুরের কে জানে!

নীল বলল, 'এখানে একসময় একটা গির্জা ছিল জানো?'

'তাই, কোথায়?'

'এখানেই ছিল কোথাও। এখন সেটা নদীর জলে ওই পাথরদের মধ্যে মিশে গেছে।'

'ইশ, কী করে এমন হল?'

'গির্জার সঙ্গেই ছিল ছোট্ট একটা স্কুল। কয়েকজন বাচ্চা ছেলে পড়াশোনা করত সেই স্কুলে। তখন ভ্যাকেশন চলছে। স্কুলের ছেলেদের সকলেই প্রায় বাড়ি চলে গেছে তখন। গির্জার ফাদারের সঙ্গে থেকে গেল কেবল তিনটি ছেলে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল জিতেন হেমব্রম।

'কেন থেকে গেল তারা?'

'তাদের একজনের বাবা তার মা-কে নিয়ে সেই সময় একটা অফিসিয়াল ট্যুরে বাইরে ছিলেন। ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার সময় ছিল না তাঁর', নীল বলল।

'আর বাকি দুজন?'

'তাদের বাবা-মা কেউ ছিলেনই না। তারা ছিল অরফ্যান', অ্যারন ম্লান হাসে, সেই ফাদারই ছিলেন তাদের সব।'

'তারপর?'

'একদিন হঠাৎ রাত্রিবেলা নদীতে হড়পা বান এল। আর সেই বানে উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা বড়ো বড়ো পাথরের ঘায়ে ভেঙে টুকরো হয়ে ফুলে ওঠা নদীর জলে ভেসে গেল সেই স্কুল, সেই গির্জা...'

'আর সেই তিনটে ছেলে, ফাদার?'

'ওই মহাপ্রলয়ের মাঝখানে পড়ে কেউ কি আর বাঁচে?' বলতে বলতেই চোখ ছল ছল করে উঠল নীলের, জিতেনের, অ্যারনের...

'কতদিন আগে ঘটেছিল এ সব?'

'তা দেখতে দেখতে বোধহয় বছর সাত-আট হয়ে গেল...'

মনটা খারাপ লাগছিল টাপুরের। নদীর তীর বরাবর আর একটু এগোতেই নদীর ওদিকে একটা বাড়ির ভাঙা ভাঙা ভিত চোখে পড়ল তার। তার খানিক তফাতে বড় গোল পাথরের আড়ালে থাকা গির্জার চুড়োর মতো দেখতে একটা ফলকও চোখে পড়ে গেল টাপুরের। এগিয়ে গিয়ে দেখবে একবার জিনিসটা? মনে চিন্তাটা এলেও নিজেকে সামলে নিল টাপুর। বিকেল মরে আসছে। উত্তর ভারতের এই পাহাড়ে সন্ধে খানিক দেরিতে হয় ঠিকই, তবু আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। এতটা পথ একা ফিরতে হবে তাকে। চড়াই পথে জোরে সাইকেল চালানো যায় না। টাপুর ফেরার জন্যে পিছু ফিরল। আর পিছন ফিরেই ভারী অবাক হয়ে গেল সে। জিতেন, নীল, অ্যারন, তিনজনের কাউকেই চোখে পড়ছে না তো! তাকে একা ফেলে রেখে কোথায় গেল ওরা? এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, কিন্তু এখন মনে হল, খুব শীত করছে তার। নদীর দিকে থেকে ঠান্ডা কনকনে হাড় কাঁপিয়ে দেওয়া হাওয়া যেন একেবারে পোশাক ভেদ করে শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাইছে টাপুরের।

চিৎকার করে ডেকে উঠল টাপুর, 'নীল, জিতেন, অ্যারন...'

নদীর উল্টোদিকের উঁচু পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বার বার ফিরে আসতে লাগল সেই ডাক। মনে হল পাহাড় জুড়ে একসঙ্গে অনেকে যেন প্রাণপণে আকুল হয়ে ডেকে চলেছে তিনটি ছেলেকে। তাদের সম্মিলিত আহ্বানে সেই জনহীন নিরিবিলি সম্পূর্ণ উপত্যকাটাই যেন রহস্যময় হয়ে উঠল হঠাৎ করে। ঠিক সেই সময়েই কোথা থেকে তিনটে পাখি এসে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল টাপুরের মাথার ওপরে। নদীর দিক থেকে ছুটে এল প্রজাপতির ঝাঁক।

নদীর জলের নিরন্তর ছুটে চলার শব্দও, মাথার ওপরে গোল হয়ে ঘুরতে থাকা পাখি তিনটি বা প্রজাপতিদের তাকে ঘিরে পতপতিয়ে উড়ে চলার মধ্যে কোথাও হয়তো তেমন অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না, তবুও ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল টাপুর। নদীর কাছ থেকে সরে এসে পাহাড়ের গায়ে জেগে থাকা অসমান খাঁজে পা ফেলে ফেলে দ্রুত ওপরের রাস্তায় উঠে এল টাপুর। সেখানে তার সাইকেলটা একলা দাঁড়িয়ে ছিল তার জন্যে। কিন্তু ফাদার আর তার নতুন তিন বন্ধুর দেখা পেল না টাপুর। আর একটুও দেরি না করে সাইকেলে উঠে খুশিপিসির বাড়ির পথ ধরল টাপুর।

ভুল শুনল কিনা কে জানে, সাইকেল চালাতে চালাতেই টাপুরের মনে হল কারা যেন খিল খিল করে হেসে উঠল পিছন থেকে। তাদের দেখার জন্যে আর পিছনে চেয়ে দেখল না টাপুর। বরং চড়াই পথে যতটা পারল, সাইকেলের গতি বাড়িয়ে দিল সে।

২

সকালে ঘুম থেকে ওঠা ইস্তক মনে মনে নিজেকে দুয়ো

দিচ্ছিল টাপুর। ইশ, এত্ত বোকা আর ভীতু সে! নীলু, জিতেন আর অ্যারন নিশ্চিত তাকে রাম ভীতু ভেবে খুব মজা পেয়েছে কাল। তখনই বোঝা উচিত ছিল, ওরা ম্যাজিক দেখাবে বলে নদীর কাছে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। ম্যাজিকও তো আসলে মানুষকে বোকাই বানায়।

দ্রুত মনস্থির করে ফেলল টাপুর। আজ বিকেলেও ওখানে যাবে সে। যেতেই হবে। একলা একলা বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে হবে নদীর কাছে। সে জানে, ওরাও নিশ্চিত থাকবে ওখানে, আজও। ফাদার তো বলেইছিলেন, সাধারণ মানুষ ওদিকে না গেলেও তাঁরা ওখানে নিত্যই যান। প্রকৃতির শান্ত, গম্ভীর নির্জনতা উপভোগ করেন মানুষের স্বাভাবিক ব্যস্ত জীবন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে।

নিজের দু-হাত মুঠো করল টাপুর। ওদের সে আজ প্রমাণ করেই ছাড়বে, টাপুর ভীতু নয়।

দুপুরের পর থেকেই আকাশে হালকা মেঘ জমছিল। ঠান্ডাও যেন আজ অন্য দিনের থেকে কিছু বেশি। মা বলল, 'আজ আর নাই বা বেরোলি টাপুর। আকাশের পরিস্থিতি সুবিধের ঠেকছে না। যদি বৃষ্টি নামে, ভিজে-টিজে গেলে ঠান্ডা লেগে অসুখ করবে। কালই আমাদের ফেরা মনে থাকে যেন।'

টাপুর আব্দেরে গলায় বলল, 'কালই তো ফিরে যাব মা। আজ দিনটা একটু ঘুরেই আসি। প্লিজ না কোরো না।'

খুশিপিসি হেসে ফেললেন, 'আমাদের এই পাহাড়ি বাসস্থানটা তোর খুব পছন্দ হয়েছে না রে টুপুর?'

'হ্যাঁ', ওপর-নীচে মাথা দোলায় টাপুর।

'যা ঘুরেই আয়', টাপুরের থুতনি ধরে চুমু খেয়ে বলেন খুশিপিসি, 'এক্ষুনি বৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না। তবে বেশি দেরি করিস না যেন। আর পুরোনো গির্জার দিকে যাস না।'

'পুরোনো গির্জাটা কোন দিকে বলো তো?' টাপুর কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল এবার।

'এখান থেকে দূর আছে খানিক। সাইকেলে গেলে মিনিট কুড়ি তো লাগবেই। যেখানে রাস্তাটা দু-ভাগ হয়ে দু-দিকে চলে গেছে। বাঁ দিকের জংলি ভাঙা রাস্তা ধরে খানিক এগিয়ে রাস্তাটা ভেঙে চলে গেছে নদীর মধ্যে...'

'পুরোনো গির্জাটাও কি ভেঙে নদীর মধ্যেই মিশে গেছে নাকি পিসি?' খুশিপিসির কথার মাঝখানেই বলে ওঠে টাপুর। মনে মনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা টের পাচ্ছিল সে। নীল, জিতেনরা পুরোটাই তো তাহলে গুলগাপ্পা মারেনি তাকে...

'হ্যাঁ, শুনেছি বেশ ক-বছর আগে একবার নাকি হড়পা বানে পুরো এলাকাটাই ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। রাস্তা, স্কুল, গির্জা...' বলতে বলতেই থেমে গিয়ে অদ্ভুত চোখে টাপুরের দিকে চাইলেন খুশিপিসি, 'কিন্তু সে কথা তুই কী করে জানলি?'

'এমনি বললাম', টাপুর হাসে। তারপর এক মুহূর্তও আর না দাঁড়িয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বুকের মধ্যে হৃদস্পন্দন দ্রুততর হচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল, নদীর কাছে ওই পুরোনো গির্জাকে ঘিরে আরও কিছু রহস্য আছে যা এখনও জানা বাকি রয়ে গেছে তার। একটা ক্ষীণ সূত্র মনের মধ্যে বার বার উঁকি মারছে, কিন্তু কিছুতেই যেন নিশ্চিত হতে পারছে না সে এখনও...

সে বুঝতে পারছিল, নদীর কাছে ওই পুরোনো গির্জাকে ঘিরে আরও কিছু রহস্য আছে যা এখনও জানা বাকি রয়ে গেছে তার।

ভাঙা রাস্তার প্রায় প্রান্তে এসে থামল টাপুর। রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে সাইকেলটাকে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল সে। চারপাশ আশ্চর্য শান্ত। পুরো এলাকাটাই থমথম করছে। নীচে ছুটে চলা নদীর শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। একটা পাখিও যেন ডাকছে না আজ। টাপুর চাপা গলায় ডাক দিল, 'নীল, জিতেন, অ্যারন—'

পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হল সেই ডাক, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দিল না কেউ।

বাঁ কাঁধের ওপরে একটা হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে পিছন ফিরে চাইল টাপুর। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাত রেখেছেন কাঁধে। পাশে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। ভারী শান্ত অথচ বিষণ্ণ তাঁদের চোখ-মুখ।

ভদ্রলোক ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'হু আর ইউ মাই সন?'

'আমি টাপুর।'

'তুমি এখানে কেন?'

'আমি আমার বন্ধুদের খুঁজতে এসেছি আংকল।'

'বন্ধু? কারা তোমার বন্ধু?' মহিলা অবাক হয়ে বলেন টাপুরের মুখের দিকে চেয়ে।

'নীল, জিতেন, অ্যারন...'

'হোয়াট?' ভয়ানক উত্তেজিত দেখাচ্ছে এখন ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা দুজনকেই, 'তোমরা কি অনেকদিনের বন্ধু? আই মিন, তোমরা সকলেই কি আশেপাশেরই কোনো গ্রামে থাকো একসঙ্গে?'

'উঁহু।'

'তাহলে?'

'আমি এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। আমার পিসির বাড়িতে। কালই আমি ফিরে যাব কলকাতায়।'

'তাহলে ওদের সঙ্গে তোমার কবে বন্ধুত্ব হল?'

'গতকাল। কালই আমি প্রথম এসেছিলাম এই জায়গায়। আর এখানেই কাল ফাদার ব্রাউন আর ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল আমার। ওরা আমাকে সঙ্গে করে নদীর কাছে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে পুরোনো গির্জা আর স্কুল ছিল সেই জায়গাটা দেখাবে বলে...'

'ওহ্ নো', ভদ্রমহিলা ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'গত ন-বছর ধরে আমরা এই দিনটিতে এখানে আসি নিয়ম করে। কিন্তু আমরা তো একবারও তাদের দেখা পেলাম না?'

'তুমি ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দিতে পারবে অন্তত একটিবারের জন্যে?' ভদ্রলোকের গলা বুজে এল কান্নায়।

টাপুর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল তাঁদের দিকে। কিছুই বুঝতে পারছিল না সে।

মহিলা কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'তুমি একবারটি ডাকো ওদের প্লিজ—'

টাপুর চিৎকার করে ডেকে উঠল ওদের নাম ধরে। কিন্তু এবারেও কেউ সাড়া দিল না তার ডাকে।

অভিমানে গলা ভারী হয়ে আসছিল টাপুরের। আকুল হয়ে সে বলল, 'কাল সকালে আমি ফিরে যাচ্ছি। আর কখনো দেখা হবে না হয়তো তোমাদের সঙ্গে। কাছে থাকলে প্লিজ সামনে এসে দাঁড়াও তোমরা...'

এবারেও কেউ সামনে এসে দাঁড়াল না, সাড়াও দিল না কেউ। বরং নদীর দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া পাক খেয়ে উঠে এসে তাকে পাক খেতে খেতে বইতে লাগল। টাপুরের স্পষ্ট মনে হল সেই হাওয়া ফিসফিস করে তার কানের কাছে এসে বলে চলেছে, 'আমরা যে অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছি টাপুর। সকলের সামনে এসে দাঁড়ানো যে মানা আমাদের। কিন্তু তোমার বন্ধুত্ব মনে রাখব আমরা। তুমিও যেন ভুলে যেও না আমাদের...'

'আর ডেকো না ওদের', মহিলা এগিয়ে এসে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন টাপুরকে, 'আমাদের সামনে তারা কিছুতেই আসবে না।'

'কেন?'

'অভিমান', মহিলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যেদিন ছুটি পড়ল, আমি যে নিতে আসিনি ইন্দ্রনীলকে। সে বছরেই আমাদের কাছে আবদার করেছিল সে, ছুটিতে অ্যারন আর জিতুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি আসবে। ওদের তো নিজেদের বাড়ি বলে কিছু ছিল না। কিন্তু ওঁর অফিসের কাজে সেই সময় আমরা ইওরোপে। এমনকি হড়পা বানে সব যখন ভেসে গেল, সেই সময়েও এসে পৌঁছতে পারিনি আমরা...' কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি।

'আপনারা...'

'ইন্দ্রনীলের বাবা-মা', ভদ্রলোক বললেন।

টাপুরের মাথার মধ্যে সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক তার মুখের বিহ্বল ভাব লক্ষ করে বললেন, 'এসো।'

নীচে নেমে নদীর পাড় বরাবর খানিক হেঁটে যেতেই সেই বড়ো পাথরটা চোখে পড়ল। আর সেই পাথরের আড়ালে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা স্মৃতিফলকটা। কাল এটা দেখেছিল টাপুর, কিন্তু কাছে আসেনি। আজ তার সামনে এসে দাঁড়াতেই স্মৃতিফলকের গায়ের ওপরে খোদাই করা নামগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ল তার। ফাদার ব্রাউন, জিতেন হেমব্রম, ইন্দ্রনীল রয়, অ্যারন গোমস।

'আজ এই দিনেই হারিয়ে গিয়েছিল তারা চিরকালের জন্যে। ন-বছর আগে...' বলতে বলতেই হাতের ঝোলা থেকে একরাশ ফুলের পাপড়ি বের করে স্মৃতিফলকের পায়ের কাছে ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন তাঁরা।

টাপুর দাঁড়িয়ে ছিল চুপটি করে। দু-চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরছিল তার। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু মনে হল, নদীর তীর ঘেঁষে, পুরোনো গির্জার ধ্বংসাবশেষের ওপরে কোথা থেকে যেন একটা সাদা ধপধপে পাখি উড়ে এসে বসে তাকিয়ে রইল তার দিকে। আর তিনটে রংবেরঙের পাখি সেই বড়ো সাদা পাখিটাকে ঘিরে উড়তে লাগল কিচিরমিচির শব্দ করতে করতে।

আকাশের গায়ে কালচে মেঘের দল আরো ভিড় করে এসেছে তখন। সূর্য ঢেকে গিয়ে আঁধার নামছে নদীর জলে, পাহাড়ের গায়ে। ইন্দ্রনীলের বাবা বললেন, 'এবারে ফেরা যাক।'

ওরা তিনজন নদীর কাছ থেকে সরে এসে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসতে থাকে। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁটতে থাকে ফিরে যাওয়ার রাস্তার দিকে। ❖

বড়ো গল্প

সাত পুতুল

সৈকত মুখোপাধ্যায়

কালোমানিক দাসের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল গত মার্চ মাসের শেষের দিকে। সে ছিল একজন বৈদ্য বা কবিরাজ। রাস্তার ধারে বসে জড়িবুটি বিক্রি করত। বলত পৃথিবীতে এমন কোনো অসুখ নেই, যা ওর ওই জড়িবুটিতে সারে না।

সে তো বলতেই হবে। না বললে লোকে ওর কাছে আসবে কেন? ওর তো নামের পেছনে একগাদা ইংরিজি ডিগ্রি নেই।

আলাপটা কেমন করে হয়েছিল বলি। বরানগর বাজারের রাস্তায় একটা ছোটো কালীমন্দির আছে। মন্দিরের সামনের ফুটপাথটায় বসে বেশ কয়েকজন হকার তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করে। কেউ বিক্রি করে রেডিমেড কাপড়চোপড়। কেউ প্লাস্টিকের থালা, বাটি, বালতি। কেউ বা আবার ঘর সাজাবার নানান আইটেম। ওই মার্চ মাসের শেষের দিকেই একদিন ওখান দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি, ওদের মধ্যে বসে একটি ছেলে বেশ উঁচু গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাকে ঘিরে বেশ কিছু লোক জমে গেছে।

ওই ছেলেটাই হচ্ছে কালোমানিক।

তখন তো ওর নাম জানতাম না। তবে প্রথম নজরেই চোখে পড়েছিল যে, ছেলেটার চেহারা আর কথাবার্তা দুটোই বেশ আকর্ষণীয়। পঁচিশ-বছরের বেশি বয়স হবে না। গায়ের রং শ্যামলা। ছিপছিপে গড়ন। নাক-চোখ বেশ কাটা কাটা। ঘাড় অবধি বাবরি চুল।

চেহারার সঙ্গে মানানসই ছিল তার পোশাক-আশাকের বাহার। মালকোঁচা মেরে পরা একটা হলুদ ধুতি আর লাল পাঞ্জাবি। দেখলেই বোঝা যায় সস্তার নকল সিল্কের তৈরি। গলায় বেশ কয়েক ছড়া পাথরের মালা। অনর্গল বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন-কঠিন রোগের ওপরে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল। এরকম জড়িবুটি-ওলা কলকাতার রাস্তায় আকছার দেখতে পাওয়া যায়। ওদের নিয়ে আমার কোনোকালেই কোনো আগ্রহ ছিল না, তাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যেতে পারলাম না একটাই কারণে। ওর সামনে সাজিয়ে রাখা জড়িবুটিগুলোর মধ্যে একটা অদ্ভুত জিনিসে আমার চোখ পড়ে গেল।
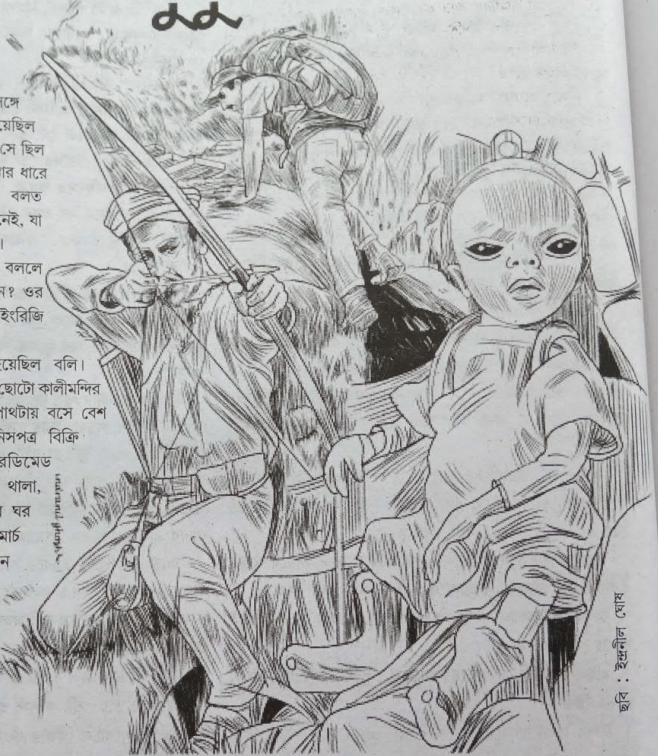
এমনিতে আর যা-যা ছিল সেসবই অতি সাধারণ জিনিস। সেই ধনেশ পাখির ঠোঁট, বাঁদরের খুলি—শজারুর কাঁটা আর প্যাঁচার পালক। হয়তো শহুরে লোকেদের ওসব দেখে তাক লাগতে পারে, কিন্তু আমি নীল চ্যাটার্জি—ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার। বছরের মধ্যে আট মাস আমার জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে দিন কেটে যায়। আমি কেন ওসবে ভুলব? বরং ওগুলো দেখলে আমার গা জ্বালা করে।

নিরীহ পশুপাখিগুলোকে না মেরে তো আর ওগুলো সংগ্রহ করা যায়নি।

সেইজন্যেই আমি একবারও না থেমে জায়গাটা পেরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি লম্বা মানুষ। ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে চোখ চলে গেল কালোমানিক আর ওর সামনে সাজানো একশো-একখানা হাড়গোড়, আঁশ-নখ, শিশি-বোতল আর শেকড়-বাকড়ের দিকে। যে-জিনিসটার কথা বলছি সেটা এমন কিছু বড়ো নয়। অত জিনিসের ভিড়ে আমার চোখ এড়িয়েও যেতে পারত। কিন্তু এড়াল না।

যা কিছু অলৌকিক, যা কিছু অকল্পনীয়, তা যে কেন এই নীল চ্যাটার্জিরই চোখে পড়ে তা কে জানে। কত কী-ই যে দেখলাম গত দশ-বছরের কেরিয়ারে। কখনো মরুভূমির দানবিক পতঙ্গ, যারা মানুষের মতন চলাফেরার ভঙ্গি দিয়ে মানুষকেই ঠকিয়ে মারে। আবার কখনো অন্য গ্রহের পরজীবী, যাদের মরণ-ছোবলে পৃথিবীর জীবেরা মণির মতন উজ্জ্বল লাল-পাথরে বদলে যায়। মরিশাসের প্যারাকিট-দ্বীপে জীবন্ত টিউমারদের কথাও কি কোনোদিন ভুলতে পারব, যারা মানুষের ঘাড়ে কামড় দিয়ে আটকে থাকত আর ওইভাবেই মানুষগুলোকে বানিয়ে ফেলত নিজেদের হাতের পুতুল।

কিন্তু সত্যি বলছি, কালোমানিকের কাছে যে কঙ্কালটা সেদিন দেখেছিলাম, তার পরিণতি যে এমন অবিশ্বাস্য হতে পারে, সেকথা তখন স্বপ্নেও ভাবিনি।

হ্যাঁ। একটা কঙ্কালই দেখেছিলাম। খুব ছোটো একটা প্রাণীর কঙ্কাল।

অন্যান্য সব মন-ভোলানো জিনিসের অনেকটা পেছনে, একটা বড়ো কাচের জারের মধ্যে কঙ্কালটা রাখা ছিল। জায়গাটায় রাস্তার আলো ভালো করে পৌঁছচ্ছিল না, তাই একটু আলো-আঁধারি মতন হয়েছিল। তবু প্রথম নজরেই আমার মনে হয়েছিল ওটা একটা নতুন প্রজাতির বাঁদরের কঙ্কাল।

ইতিমধ্যে কখন যে আকাশে কালবৈশাখীর মেঘ জমেছিল আমরা কেউই খেয়াল করিনি। হঠাৎই গুরগুর করে মেঘ ডেকে উঠল। হাওয়ার বেগও বেড়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল ঝড়বৃষ্টি আসতে আর দেরি নেই। মুহূর্তের মধ্যে কালোমানিককে ঘিরে যে-ভিড়টা জমেছিল, সেটা উধাও হয়ে গেল। কালোমানিক বেজার মুখে একটা বাক্সের মধ্যে ওর জড়িবুটির সংগ্রহ গুছিয়ে তুলতে শুরু করল। তখনই আমি প্রথমবার ভালো করে কাচের জারের মধ্যে রাখা কঙ্কালটাকে দেখলাম এবং নিশ্চিত হলাম যে ওটা নকল। প্লাস্টিকের তৈরি। কারণ...আচ্ছা, কারণগুলো পরে বলছি। আমি কালোমানিকের কাছে গিয়ে জারটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "ওটা প্লাস্টিকের তৈরি, তাই না?"

কালোমানিক হাতের কাজ না থামিয়েই একবার আড়চোখে দেখল আমি কোন জিনিসটার কথা বলছি। তারপর বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল, "আমার কাছে কোনো নকল জিনিস নেই। এসবই আসল, পবিত্র এবং দুর্লভ।"

আমি তাই শুনে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। যতক্ষণ ওর কাজ শেষ না হয় আর ওর সঙ্গে কোনো কথা বললাম না। কালোমানিক খেয়াল করেনি যে, আমি একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ও সব জিনিস বাক্সে ভরে উঠে দাঁড়াল। মুখে হতাশা এবং বিরক্তি। হতচ্ছাড়া কালবৈশাখীর জন্যে ওর আজকের ব্যাবসাটা মাটি হল।

দেখলাম ও এদিক-ওদিক তাকিয়ে রিকশা খুঁজছে। অত বড়ো লোহার ট্রাঙ্কটা তো আর হাতে করে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু রিকশা ছিল না কোথাও। ততক্ষণে ঝড়ের বেগ বেশ বেড়ে উঠেছে। চড়বড় করে বড়ো-বড়ো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিও ঝরে পড়ল। বোঝাই যাচ্ছিল, এক্ষুনি মুষলধারায় শুরু হবে।

আমার খুব মায়া হল। ছেলেটা আমার চেয়ে না হোক দশ বছরের ছোটো। ও যেটা করছে তা করছে নিজের পেটের দায়ে। চুরি-ডাকাতি তো আর করছে না। ও ওষুধের যা দাম বলছিল তাতে আজকাল এক প্যাকেট চকলেটও হয় না। যদি সে-ওষুধ কাজ না করে তাতেই বা কী হবে? বড়োজোর খদ্দেরদের সেই টাকাটুকু জলে যাবে।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কী ভাই?"

ও গম্ভীরমুখে উত্তর দিল, "কালোমানিক। কালোমানিক দাস।"

বুঝলাম, সেই যে কঙ্কালটাকে প্লাস্টিকের তৈরি বলেছিলাম, সেই রাগ এখনো যায়নি। তাই গলাটাকে যথাসম্ভব নরম করে বললাম, "এখন কোথায় যাবে?"

"কেন?"

"আমার গাড়িটা কাছেই পার্ক করা আছে আর আমার হাতে এখন তেমন কাজও নেই। তাই তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারি। ঝড়জল থামার আগে তুমি রিকশা পাবে না, তাই বলছিলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে কালোমানিকের মুখের চেহারা বদলে গেল। বলল, "দেবেন স্যার? সত্যিই তাহলে খুব উপকার হয়। বুঝতে পারছি ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁর গরিব সন্তানকে বাঁচানোর জন্যে।"

কালোমানিক ওর বাসার যে ঠিকানা দিল, সেটা বরানগর থেকে বেশি দূরে নয়। ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আট-মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। ও বলল, "আসুন স্যার। একটু আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিন।"

এমনিতে যেতাম কিনা জানি না। কিন্তু তখনো আমার মাথায় সেই অদ্ভুত বাঁদরের কঙ্কালটার কথা ঘুরছিল। তাছাড়া ঝড়টাও তখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। তাই গাড়িটা ওর বাড়ির বাইরে পার্ক করে একদৌড়ে ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ভিজেও গেলাম পুরোপুরি।

বলছি বটে 'ওর ঘর'। কিন্তু আসলে ঘরটা ও ভাড়া নিয়েছিল। ডানলপ মোড় থেকে বেলঘরিয়ার দিকে যেতে ডানদিকে একটা সরু রাস্তা ঢুকে গেছে। তারই একপাশে তিনতলা পুরোনো বাড়ির গ্রাউন্ড-ফ্লোরের ছোটো একটা ঘর। কালোমানিক বলল, ওর মতন বাইরে থেকে যারা কলকাতায় ব্যবসা করতে আসে, তারাই একেকজন একেকটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কেউ থাকে দশদিন, কেউ থাকে দু-মাস। কোনো ঠিক নেই।

"আসুন স্যার।" ট্রাঙ্কটা ঘরে ঢুকিয়ে আলো জ্বালল কালোমানিক। বলল, "কিছু যদি না মনে করেন, এই শুকনো তোয়ালেটা দিয়ে গা-মাথা মুছে নিন। তারপর আমি আপনাকে একটা মশলাদার চা খাওয়াব। খেলেই দেখবেন শরীর কীরকম চাঙ্গা হয়ে

যায়। এই চায়ের ফরমুলা আমার ফ্যামিলির বাইরে কেউ জানে না।"

আমি তো বসতেই চাইছিলাম। ততক্ষণে ও নিজের নামটা আমাকে বলেছে। আমার নাম আর কাজের ধরনটাও শুনে নিয়েছে। তাতে ওর বেশ খানিকটা ভক্তি বেড়েছে আমার সম্বন্ধে। গা-মাথা মুছতে-মুছতে ওকে বললাম, "কালোমানিক! এবার তোমার নিজের কথা কিছু বলো। এত সব রোগ আর তার ওষুধের কথা শিখলে কোথা থেকে?"

ঘরের কোনায় রাখা একটা ছোটো স্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে কালোমানিক সেসব কথাই বলতে শুরু করল। আমি একটা প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে নিয়ে ওর মুখোমুখি বসে শুনছিলাম।

"স্যার, আপনার যখন বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণী নিয়েই কাজ, তখন আপনি তো নিশ্চয়ই মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড আর ওড়িশার বর্ডার জুড়ে ছড়িয়ে-থাকা হাতিবাড়ি জঙ্গলের নাম শুনেছেন। ওই জঙ্গলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আছে কিছু আদিবাসী গ্রাম। কবে থেকে রয়েছে তা কেউ জানে না।

"পৃথিবীর ইতিহাসে কত কিছু ঘটে গেছে। বুদ্ধ জন্মেছেন, খ্রিস্ট জন্মেছেন, মহম্মদ জন্মেছেন। মুঘল কিংবা ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ শাসন করে গেছে। আবার একদিন সমস্ত রাজত্বের অবসান হয়েছে। অনেক রক্তক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেসবই জঙ্গলের বাইরে—শহরে আর গ্রামে। জঙ্গলের মধ্যে সেইসব মহাপ্লাবনের একটা ছোটো ঢেউও কখনো ছিটকে আসেনি।

"দশ-হাজার বছর আগেও বনের মধ্যে যে জলের কুণ্ডে হাতির পাল স্নান সেরে যেত, আজও তারা সেই কুণ্ডে, ঠিক সেইভাবেই জল উথাল-পাথাল করে স্নান সেরে যায়। দশ-হাজার বছর আগে যেভাবে সন্ধেবেলায় জঙ্গলের চতুর্দিক থেকে ময়ূরের ডাক ভেসে আসত, এখনো ঠিক সেইভাবেই সন্ধে নামে। আর আমাদের গ্রামের লোকেরাও ঠিক একইভাবে হরিয়াল আর তিতির পাখি শিকার করে। মাটি খুঁড়ে কন্দ তুলে আনে। মহুয়া আর বুনো জাম কুড়োয়।

"হ্যাঁ স্যার। আমাদের গ্রামের লোকেরা কোনোদিনই চাষবাস করেনি। ইদানীং সরকারি উদ্যোগে অল্পস্বল্প চাষ করছে ঠিকই, কিন্তু ওতে আমাদের পোষায় না। কারণ জঙ্গলের মধ্যে চাষের জমি থাকলে তার ফসল ঘরে তোলা একরকমের অসম্ভবই বলতে পারেন। তার আগেই ফসল খেয়ে যাওয়ার জন্যে টিয়াপাখি রয়েছে, হরিণ রয়েছে, বুনো শুয়োর রয়েছে। আর এদের আটকানো গেলেও হাতির পালকে আটকাবে কে? আমাদের ছ-মাসের পরিশ্রমে জমিতে যে ভুট্টা কিংবা ধান জন্মায়, হাতির পাল এসে এক রাতের মধ্যে সেই সব ফসল খেয়ে নিয়ে চলে যায়।

"সেইজন্যেই জঙ্গল-গ্রামের মানুষরা এখনো সেই শিকার করে আর ফলমূল কুড়িয়েই বেঁচে থাকে।

"দু-একটা পরিবারের অন্যরকমের কিছু জীবিকা থাকে। যেমন ধরুন কামার—যারা কাস্তে, কুড়ুল, তিরের ফলা এইসব বানায়। কামার তো সব গ্রামেই একঘর থাকতে হবে। তারপর ধরুন ছুতোর, ঘরামি এদেরও লাগে।

"আর লাগে কবিরাজদের। নাহলে অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখবে? জঙ্গলে তো আর পাশ-করা অ্যালোপ্যাথ-হোমিওপ্যাথ ডাক্তার নেই। তার জন্যে যেতে হয় অনেক দূরে—শহরে। আমাদের ফ্যামিলিটা স্যার কবিরাজের ফ্যামিলি। পুরুষানুক্রমে আমরা জঙ্গলের গাছ-গাছড়া, পশুপাখির শরীরের নানান অংশ আর নানারকমের মাটি আর পাথর মিশিয়ে ওষুধ তৈরি করে আসছি। আপনার মতন শিক্ষিত লোকেরা হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ঠিকঠাক ব্যবহার জানলে এইসব প্রাকৃতিক উপাদানেই ম্যাজিকের মতন রোগ সেরে যায়।"

আমি বললাম, "সে কী! অবিশ্বাস করব কেন? ওষুধ হিসেবে এইসব প্রাকৃতিক উপাদানই তো মানুষকে চিরকাল রোগের থেকে আরাম দিয়ে এসেছে। হোমিওপ্যাথি-অ্যালোপ্যাথিতেও তো বহু গাছগাছড়া আর মিনারেলসের ব্যবহার হয়। এখনো হয়।"

চা হয়ে গিয়েছিল। একটা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে করে একগ্লাস চা এনে কালোমানিক আমার হাতে ধরিয়ে দিল। এক-চুমুক খেয়েই বুঝলাম, অজানা কিছু মশলার ব্যবহারে সেই চায়ের গন্ধ হয়েছে যেমন খোলতাই, স্বাদও তেমনি চনমনে। জিজ্ঞেস করলাম, "চায়ে কী মিশিয়েছ, কালোমানিক?" ও বলল, "নাম বললে তো আপনি বুঝতে পারবেন না। হাতিবাড়ি জঙ্গলের বাইরে এই পাতা অন্য কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাও জানি না। যদি আমার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে যেতেন তাহলে আপনাকে গাছটা চিনিয়ে দিতাম।"

তারপর বলল, "আমাদের গ্রাম থেকে আমিই প্রথম ঝাড়গ্রাম স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম। হায়ার-সেকেন্ডারি পাশ করার পরে ইচ্ছে করেই আর পড়লাম না। ততদিনে কলকাতা, খড়্গপুর এইসব শহরগুলো আমি চিনে ফেলেছি। বুঝতে পেরেছি, ছোটোবেলা থেকে বাবা-দাদুর কাছে যে চিকিৎসা-বিদ্যা শিখেছি, সেই বিদ্যা নিয়ে শহরে পৌঁছলে অনেক বেশি লাভবান হব।

"ভুল ভাবিনি। আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই ইনকাম হচ্ছে। তবে এই চিকিৎসা আমি কোনোদিন চেম্বারে বসে করতে পারব না। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরেই করতে হবে। কারণ, যেসব গরিব মানুষেরা এই জড়িবুটির চিকিৎসায় বিশ্বাস করে, তারা কেউ ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে চিকিৎসা করায় না।"

চা শেষ করে অনেকক্ষণ ধরে ওকে যে-অনুরোধটা করব ভাবছিলাম, সেটা করেই ফেললাম। বললাম, "কালোমানিক! তোমার ওই বাক্সের মধ্যে কাচের জারে একটা কঙ্কাল আছে। মনে হয় বাঁদরের কঙ্কাল। সেটা একবার দেখাবে?"

কালোমানিক অবাক হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "ওটা দেখে কী করবেন?"

বললাম, "দ্যাখাও না একবার। তখন একপলক দেখে কেমন যেন মনে হয়েছিল, ওটা যে-জন্তুর কঙ্কাল, সেটা আমার অচেনা। তাই আরেকবার ভালো করে দেখতে চাইছি।"

কালোমানিক আর কোনো কথা না বলে ট্রাঙ্কটা খুলে কাচের জারটা সাবধানে বার করে এনে আমার সামনে বিছানার ওপর নামিয়ে রাখল। তারপর নিজেও আমার মুখোমুখি বসল।

আমি খুব মন দিয়ে বহুক্ষণ ধরে কঙ্কালটাকে দেখলাম এবং তিনটে জিনিসে নিশ্চিত হলাম।

এক, কঙ্কালটা অরিজিনাল। প্লাস্টিক বা অন্য কোনো জিনিস

দিয়ে বানানো নয়। যে-জায়গাগুলো ক্ষয়ে গেছে সেখান থেকেই এটা বুঝতে পারছিলাম।

দুই, বাঁদর নয়। কঙ্কালটা মানুষের। অমন চওড়া কপাল, লম্বা ঘাড়, আর চ্যাপটা বুকের খাঁচা বাঁদর জাতীয় কোনো প্রাণীরই থাকে না। এগুলো একদমই মানুষের বিশেষত্ব। তাছাড়া পা আর কোমরের হাড়, যেটাকে পেলভিস বলে, সেগুলো দেখেও নিশ্চিত হলাম।

তিন, এটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এটা পূর্ণবয়স্ক একজন পুরুষ মানুষের কঙ্কাল।

জীবনে প্রচুর অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। তবু কঙ্কালটা দেখে আমার মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে উঠল। একটু সামলে নিয়ে বললাম, "কালোমানিক! তুমি এই কঙ্কালটা কোথা থেকে পেয়েছ?"

"কেন স্যার?"

"বলছি। আগে তুমি বলো এটা কোথা থেকে পেয়েছ?"

কালোমানিক বলল, "দেখুন। তিন-বছর আগে যখন জড়িবুটি বেচতে শহরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম, তখনই মনে হল কিছু লোক জড়ো করার মতন জিনিস লাগবে। শুধু কথায় লোক জমবে না।

"আমাদের গ্রামে এক বৃদ্ধ মানুষ আছেন। তাঁর নাম সুরেশ বা সুরেন কিছু একটা হবে। আমরা গ্রামসুদ্ধু লোক তাঁকে সুরোদাদু বলে ডাকি। সুরোদাদু যৌবনে ছিলেন নামকরা শিকারি। এখন বয়স হয়ে গেছে বলে আর শিকার করতে পারেন না। কিন্তু জঙ্গলে ঘোরার নেশাটাও ছাড়তে পারেন না। তাছাড়া ফিরবেনই বা কোথায়? সুরোদাদুর স্ত্রী মারা গেছেন অনেক বছর আগে। ছেলেমেয়েও নেই। তাই সুরোদাদু এখনো জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান আর এটা-ওটা কুড়িয়ে জড়ো করেন। মাসে একবার করে হাটে গিয়ে সেগুলো বিক্রি অরে আসেন।

"এই ট্রাঙ্কের ভেতরে যা-কিছু দেখছেন, সবই সুরোদাদুর কাছ থেকে নিয়ে আসা। আমি নিজেই সুরোদাদুর ঘর থেকে বেছেবুছে নিয়ে এসেছিলাম। উনি তাকিয়েও দেখেননি কী নিলাম আর না নিলাম। খুব ভালোবাসেন তো আমাকে, তাই।

"এই ধনেশের ঠোঁট, প্যাঙ্গোলিনের আঁশ, ওই মাকাল ফলের খোসা, সব। বাঁদরের কঙ্কালটাও সুরোদাদুর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। সুরোদাদু ওটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তা অবশ্য আমি জিজ্ঞেস করিনি। জঙ্গলের ভেতরে এরকম কত পশুপাখির মৃতদেহই তো পড়ে থাকে। ভেবেছিলাম সেইভাবেই পেয়েছেন। কিন্তু আপনি বললেন না তো স্যার, এই কঙ্কালটা নিয়ে আপনি জানতে চাইছেন কেন।"

আমি বললাম, "কালোমানিক। এখনো আমার জানা শেষ হয়নি। বরং বলতে পারো সবে শুরু হল। বাকিটা জানার জন্যে আমাকে এক্ষুনি একবার তোমার সেই সুরোদাদুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তুমি গ্রামে ফিরবে কবে?"

কালোমানিক বলল, "আমি তো কালকেই ফিরব ভাবছিলাম। ভোর ছটায় ধর্মতোলা থেকে একটা বাস ছাড়ে। ওটা ধরব।"

আমি বললাম, "দরকার নেই। কাল তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার গাড়িতে। আমার মোবাইল নাম্বারটা রেখে দাও। আর তোমার নাম্বারটাও আমাকে দাও। আগামী কয়েকদিন এই নাম্বার দুটো আমাদের খুব কাজে লাগবে।"

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "আমি সঙ্গে গেলে তোমার অসুবিধে নেই তো?"

কালোমানিক বলল, "অসুবিধে আমার তো কিছুই নেই স্যার। বরং আপনার মতন মানুষ আমাদের গ্রামে পা দিলে আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই খুব খুশি হবে। কিন্তু আপনারই কষ্ট হবে। আমাদের গ্রামে ইলেকট্রিসিটি নেই। সোলার ব্যাটারিতে সন্ধের দিকে কিছুক্ষণ আলো জ্বলে আর মোবাইলে চার্জ-টার্জ দেওয়া যায়। এই গরমে ফ্যান আর এসি ছাড়া আপনার খুব কষ্ট হবে। খাবারদাবারও সেরকম কিছু—"

আমি ওর পিঠে একটা চাপড় মেরে ওকে থামালাম। বললাম, "বছরে আট মাস আমি তোমাদের গ্রামের থেকেও বেশি দুর্গম জায়গায় ঘুরে বেড়াই। তোমাদের গ্রামে তো তবু রাস্তা আছে। আমাকে বেশির ভাগ সময়ে বন কেটে নিজের রাস্তা নিজেকেই তৈরি করে এগোতে হয়। টিনের খাবার ফুরিয়ে গেলে তোমাদের মতোই জঙ্গলের ফলমূল আর পাখি-টাখি শিকার করে খাই। কাজেই আমার অসুবিধের কথা ভেবো না। ঠিক আছে, কাল ভোর পাঁচটায় পৌঁছে যাচ্ছি। রেডি থেকো।"

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। কালোমানিকের ঘর থেকে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন পেছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম, ও হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। স্বাভাবিক। ও আমাকে বদ্ধ উন্মাদ ছাড়া এই-মুহূর্তে আর কীই বা ভাববে?

কালোমানিকের গ্রামের নাম কুসুমকুঁয়া। জায়গাটা সত্যিই দুর্গম। শেষ সাত-কিলোমিটার ঘন জঙ্গলে ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি চড়াই ভেঙে গাড়ি চালাতে হল। এই গ্রামের ছেলে হয়েও যে কালোমানিক কলকাতা, খড়্গপুর, পাটনা দাবড়ে বেড়াচ্ছে এটাই প্রমাণ করে ওর মনের জোর।

চৈত্রের শেষ। হাতিবাড়ি ফরেস্টের সমস্ত শিমুল-পলাশের গাছ রাশিরাশি লাল ফুলে ভরে গিয়েছিল। রাত নামলে আর রঙিন ফুলগুলো দেখা যেত না। তার জায়গায় অজস্র চেনা-অচেনা বুনোফুলের গন্ধে নেশা ধরে যেত। প্রথমদিন আমাদের পৌঁছোতে-পৌঁছোতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। তাই সেদিন আর কোথাও বেরোলাম না।

কালোমানিকের বাড়িতে শুধু ওর মা-বাবা আর দুটি ছোটো বোন ছিল। একটা ঘরে শুধু আমারই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন ওঁরা। রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে, ভোর না হতেই আমি কালোমানিকের সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম সুরোদাদুর কুঁড়েঘরের উদ্দেশে। বেরোবার সময় কালোমানিকের কাছ থেকে সেই খুদে-মানুষের কঙ্কালটা নিয়ে আমার ব্যাকপ্যাকের ভেতরে যত্ন করে ঢুকিয়ে রাখলাম। সুরোদাদুকে বুঝিয়ে বলতে হবে তো আমরা তাঁর কাছে ঠিক কোন জিনিসটার কথা জানতে চাইছি। কঙ্কালটা ওঁকে না দেখালে শুধু মুখের কথায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমাদের কপালই খারাপ। কালোমানিক যেটা ভয় পাচ্ছিল, সেটাই হল। দেখা গেল সুরোদাদু বাড়িতে নেই। ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরটার দরজার দুটো পাল্লা নারকেল-দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।
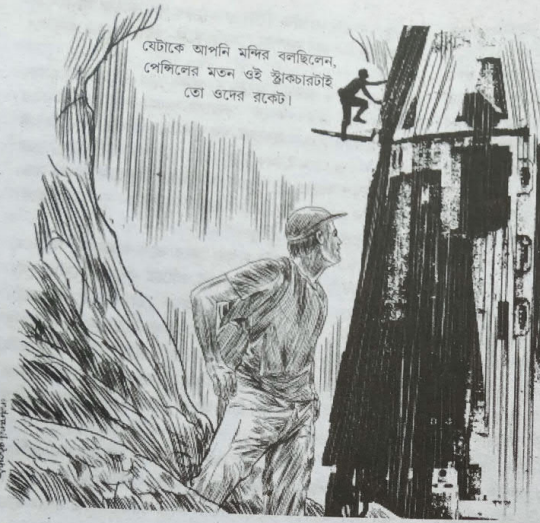
কালোমানিক কিন্তু তখনো জানে না, আমি কঙ্কালটার মধ্যে এমন কী দেখেছি, যার জন্যে এরকম পাগলামি করছি। কিন্তু ও বোধহয় এটাও বুঝতে পারছিল যে, আমি যতক্ষণ নিজে নিশ্চিত হতে না পারছি, ততক্ষণ কিছুই বলব না। তাই আমাকে আর কঙ্কাল-প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেসও করছিল না।

যাই হোক, আমরা চটপট কালোমানিকের বাড়িতে ফিরে গিয়ে দিন-তিনেকের মতন শুকনো খাবার দুজনের দুটো ব্যাগে পুরে নিলাম। আমি তাছাড়াও আরো কিছু কিছু জিনিস নিলাম, যেগুলো না নিয়ে আমি জঙ্গলে ঢুকি না। যেমন টর্চলাইট, দুটো হালকা হ্যামক—যেগুলো গাছে দোলনার মতন টাঙিয়ে রাত কাটানো যায়। তাছাড়াও পোকামাকড় তাড়ানোর ক্রিম, ওষুধ, বাইনোকুলার এবং আমার রিভলবার।

বিশাল হাতিবাড়ি ফরেস্টের ভেতরেও যে সুরোদাদুকে খুঁজে পাব, সেই বিশ্বাস আমার ছিল। তার কারণ, দীর্ঘদিন অরণ্যবাসী মানুষদের সঙ্গে বন্ধুর মতন মেলামেশার ফলে যে-কটা জিনিস আমি ওদের কাছ থেকে শিখেছিলাম, তার একটার নাম 'বুশক্র্যাফট'। জঙ্গলে টিকে

ওটা গ্রামের কুকুরদের আটকানোর জন্যে। ওই ঘর খোলা পড়ে থাকলেও চোর ঢুকবে না। কারণ ঘরের ভেতরে নাকি কটা মাটির বাসন আর ছেঁড়া চাদর-কম্বল ছাড়া আর কিছু নেই। আর থাকে ওই বন থেকে সংগৃহীত জিনিস। কার অত দায় পড়েছে ওসব জিনিস চুরি করতে?

পাশের বাড়ির বাসিন্দারা কালোমানিকের প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, সুরোদাদু সবে গতকালই নাকি জঙ্গলভ্রমণে বেরিয়েছেন। এখন তাঁর ফিরতে সাতদিনও লাগতে পারে, চোদ্দোদিনও লাগতে পারে। সবটাই সুরোদাদুর মর্জির ওপরে নির্ভর করছে।

এদিকে আর ঠিক চারদিন পরেই আমাকে সিমলায় জুলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটা সেমিনারে যোগ দিতে হবে। কাজেই সাতদিন তো দূরের কথা, তিনদিনও আমি কুসুমকুঁয়ায় থাকতে পারব না। এখন আমরা তাহলে কী করব?

কালোমানিককে জিজ্ঞেস করলাম, "সুরোদাদু তো সবেমাত্র গতকাল জঙ্গলে ঢুকেছেন। আমরা যদি এখনই একটু পা চালিয়ে ওঁকে ফলো করি, তাহলে ধরে ফেলতে পারব না?"

কালোমানিক বলল, "হ্যাঁ। পারতেও পারি। যদি উনি ঠিকঠাক কোনদিকে গেছেন সেটা বোঝা যায়। জঙ্গলে তো রাস্তা বলতে জন্তুজানোয়ারদের পায়ে চলা রাস্তা। সেগুলো মাকড়সার জালের মতন সারা জঙ্গলে ছড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যে কোনটা ধরে সুরোদাদু গেছেন, সেটাই তো বোঝা মুশকিল।"

আমি বললাম, "তবু চলো, একবার চেষ্টা করে দেখি। যদি ওঁর খোঁজ না পাই তাহলে ফিরে আসব।"

থাকতে গেলে বুশক্র্যাফট শিখে রাখা খুব জরুরি। বুশক্র্যাফট জানি বলেই কোনো জন্তু বা মানুষের চলার পথকে আমি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে পারি। তার পায়ের নীচে মাড়িয়ে-যাওয়া একটা শুকনো পাতা, তার মাথায় লেগে ভেঙে যাওয়া একটা গাছের ডাল, এইসব চিহ্ন ধরে আমি বুঝতে পারি সে কতক্ষণ আগে, কোনদিকে গেছে।

সুরোদাদুকে পেয়ে গেলাম দ্বিতীয়দিন সন্ধের সময়। তবে কে যে কাকে পেলাম সেটা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

তখন জঙ্গলে অন্ধকার নেমে এসেছে। একটু আগেই আমরা ঝোরার পাশে একটা নিভোনো আগুনের কুণ্ড দেখে এসেছি। ছাইয়ে হাত দিয়ে দেখেছিলাম তখনো গরম রয়েছে। তার মানে সুরোদাদু খুব বেশিক্ষণ আগে এখান থেকে যাননি। তারপর আর বড়োজোর দুটো বাঁক ঘুরেছি কি ঘুরিনি, সাঁইসাঁই করে দুটো তির আমার আর কালোমানিকের থেকে ছ-ইঞ্চি দূরে একটা শাল গাছের গুঁড়িতে গেঁথে গেল। আমাদের পেছনদিক থেকে একটা গলার স্বর ভেসে এল—"হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে ওখানেই দাঁড়িয়ে যাও। একটুও যদি নড়ো, পরের তিরদুটো তোমাদের বুকে ঢুকবে।"

সঙ্গে-সঙ্গেই সেই নির্দেশ মান্য করলাম। তবে তার মধ্যেই কালোমানিক ভয়ার্ত-গলায় চেঁচিয়ে উঠল—"সুরোদাদু! আমি কুসুমকুঁয়া গ্রামের কালোমানিক। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আপনি দয়া করে তির-ধনুকটা সরিয়ে রাখুন।"

আমাদের পেছনদিক থেকে এক বৃদ্ধ আমাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন। বয়সের ভারে লম্বা শরীরটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু

চলাফেরা এখনো যথেষ্ট চটপটে। চোখের দৃষ্টি যে কতটা তীক্ষ্ণ তার পরিচয় তো একটু আগেই পেয়েছি, যখন সন্ধের অন্ধকারের মধ্যেও উনি দুটো তিরকে নিখুঁত লক্ষ্যে গেঁথে দিয়েছিলেন।

আমাদের দুজনকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বললেন, "কিছুক্ষণ আগে থেকেই তোমাদের ওপরে নজর রাখছি। তবে দূর থেকে কালোমানিকের মুখটা চিনতে পারিনি। আর এই বাবুটির শহুরে পোশাক দেখে ভেবেছিলাম, চোরাশিকারি বুঝি। যদি তাই হতে, তাহলে আর তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতাম না। মেরে এখানেই কোথাও গোর দিয়ে গ্রামে ফিরে যেতাম। যাই হোক, বলো দেখি কালোমানিক, আমার সঙ্গে তোমার এত কী জরুরি প্রয়োজন পড়ল?"

কালোমানিক আমাকে চোখের ইশারা করল। আমি প্রথমে নিজের পরিচয় আর কালোমানিকের সঙ্গে কীভাবে আমার আলাপ হয়েছিল, সেটা ওঁকে বললাম। তারপর পিঠের ব্যাগ থেকে সেই কঙ্কালটাকে আস্তে আস্তে ওঁর সামনে নামিয়ে রেখে বললাম, "সুরোদাদু। বলুন তো এই কঙ্কালটা কোথায় পেয়েছিলেন?"

উনি কঙ্কালটার ওপরে ঝুঁকে পড়ে খুব মন দিয়ে ওটাকে দেখতে শুরু করলেন। ওঁর সুবিধে হবে বলে আমি সোলার লাইটটা জ্বেলে দিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ ওটাকে খুঁটিয়ে দেখে উনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম এর মধ্যেই ওঁর মুখটা কাগজের মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বুঝলাম, উনি কালোমানিক নন। এর মধ্যেই যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন। বুঝে নিয়েছেন, এটা সত্যিকারেই একটা ছ-ইঞ্চি লম্বা পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের কঙ্কাল। যা সাধারণ বুদ্ধিতে অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য।

কিন্তু তারপরেই সুরোদাদু যা বললেন, তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, কালোমানিকও নয়। উনি বললেন, "এটা কোথা থেকে এসেছে আমি কেমন করে বলব বলো তো। আমি...আমি তো নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না।"

কালোমানিক এই কথা শুনে আঁতকে উঠল। বলল, "সুরোদাদু! তিন-বছর আগে আপনার ঘর থেকেই তো অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে এটা নিয়ে এসেছিলাম।"

"অন্যান্য জিনিস মানে?"

"মানে ওই ধনেশ পাখির ঠোঁট, শজারুর কাঁটা, বাঁদরের খুলি এইসব।"

"তখন ওইসব জিনিসের মধ্যে তুমি এটা পেয়েছিলে? আমাকে তখনই বলোনি কেন?" প্রশ্ন করলেন সুরোদাদু।

কালোমানিক বলল, "আমি কি জানতাম এটার মধ্যে কোনো বিশেষত্ব আছে? এখনো তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এটা দেখে তো বাঁদরের কঙ্কাল বলেই মনে হচ্ছে।"

সুরোদাদু বললেন, "বুঝতে পারছি। এই বাবুটিই তার মানে কঙ্কালটার বিশেষত্ব খেয়াল করেছেন। যাইহোক, বলছিস যখন আমার ঘর থেকেই পেয়েছিলিস, তখন আমাকে একটু ভাবতে দে।"

উনি দু-চোখের ওপরে হাত চাপা দিয়ে একটা পাথরের ওপরে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি সেই-সুযোগে কালোমানিককে কঙ্কালটা দেখিয়ে বুঝিয়ে বললাম কেন এটা আশ্চর্য, কেন এটা অলৌকিক। ও শুনে রীতিমতন ভয় পেয়ে গেল। বলল, "স্যার, এটাকে ফেলে দিন। ওই ঝোরার জলে ছুড়ে ফেলে দিন, প্লিজ। এটা ভূতুড়ে জিনিস। কাছে থাকলে আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে।"

আমি ওর পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "উলটোটাই হবার সম্ভাবনা বেশি, কালোমানিক। একটা সাধারণ ফসিল খুঁজে পেয়ে কত মানুষ বিখ্যাত হয়ে গেছেন। তুমি যদি এই ছ-ইঞ্চি লম্বা মানুষের উৎস খুঁজে পাও তাহলে সারা-পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা তোমাকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচবেন; কারণ, তাহলে মানুষের অভিযোজনের ইতিহাসটাও আবার নতুন করে লিখতে হবে।"

কালোমানিক কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই সুরোদাদু হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। খুব উত্তেজিত ভঙ্গিতে কালোমানিকের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, "একটু মনে করবার চেষ্টা কর তো ভাই, তুই আমার ঘরের যেখানে কঙ্কালটা পেয়েছিলিস, সেখানে আর কিছু ছিল?"

কালোমানিক অস্বস্তিতে পড়ল। বলল, "অনেকদিন আগের কথা তো। তবে আবছাভাবে যেন মনে পড়ছে এটার ঠিক পাশেই কাঠের তৈরি কিছু জামাকাপড়, গয়না, মুকুট এইসব পড়েছিল।"

সুরোদাদু খুব আগ্রহ নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলেন। ওর মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে বললেন, "কী বললি? কাঠের তৈরি সাজ?"

"হ্যাঁ, সুরোদাদু। এখন মনে পড়ছে, ওগুলোর গায়ে অসম্ভব সুন্দর কারুকার্য ছিল। আমি ওই কাঠের মুকুট, কাঠের জামা আর মুকুট সবই নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ব্যবসার কাজে লাগবে না বলে বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলাম। সেটাই ভুল হয়েছিল। পরে আর খুঁজে পাইনি। হয়তো আমার বোন দুটোই খেলতে গিয়ে ওগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল।"

সুরোদাদু কালোমানিকের এই কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওই কাঠের পুতুলের সাজ কোথায় পেয়েছিলাম সেটা তোমাদের দেখাতে পারি। কঙ্কালের কথা কিছু বলতে পারব না। চলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এখন? এই অন্ধকারে?"

উনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহো, তাই তো! অন্ধকার হয়ে গেছে দেখছি। আচ্ছা, তাহলে কাল সকালেই রওনা হওয়া যাবে। জায়গাটা এখান থেকে অনেকটাই দূরে। প্রথমে ঝোরার তীর ধরে সাত-আট মাইল হাঁটতে হবে। তারপরে একটা হাজার-ফুট গভীর খাদে নামতে হবে। সকালে বেরোলেও পৌঁছোতে বিকেল হয়ে যাবে।"

বললাম, "তাহলে আজ রাতটা আমরা এখানেই থেকে যাই?"

উনি বললেন, "হ্যাঁ, থাকতেই পারি। তবে জমিতে নয়, গাছের ওপরে। নীচে বড়ো শঙ্খচূড় সাপের উপদ্রব। মাথার ওপর দিয়ে পাখি উড়ে গেলে ওরা সেই পাখির ছায়াকে ছোবল মারে, এমন ওদের রাগ। আর বিষের কথা কী বলব। শঙ্খচূড়ের ছোবলে হাতিকে মরে যেতে তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।"

তাই হল। আমি আর কালোমানিক মাটির অনেক ওপরে হ্যামক টাঙিয়ে রাত কাটালাম। সুরোদাদু অবশ্য হ্যামকে শুতে রাজি হলেন

না। উনি বললেন এতবছর ধরে যেমন উঁচু গাছের তেডালায় শুয়ে ঘুমিয়েছেন, তেমনই ঘুমোবেন।

*   *   *   *

অন্য দুজনের কতটা ঘুম হল জানি না। আমি প্রায় সারারাত জেগে নিশাচর পশু-পাখিদের অর্কেস্ট্রা শুনলাম। তারপর ভোরের দিকে একটু চোখ লেগে আসতেই স্বপ্ন দেখলাম হ্যামকের দড়ির ওপর দিয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতন ব্যালেন্স রেখে এগিয়ে আসছে সারি-সারি কঙ্কাল। চমকে জেগে উঠলাম। ইতিমধ্যে সূর্য উঠে গিয়েছিল। সুরোদাদু গাছের নীচে নেমে আমাদের তাড়া দিলেন, "চলো, চলো। আর দেরি করলে ওখানে পৌঁছোতে সন্ধে নেমে যাবে। তখন যেটা দেখাতে চাইছি, সেটা দেখাতে পারব না।"

আধঘণ্টা বাদে যখন ঝোরার তীর ধরে ওঁর পাশাপাশি হাঁটছি, তখন জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যাচ্ছি সুরোদাদু? আর কী দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?"

উনি বললেন, "ভাই, জায়গাটার কোনো নাম তো নেই। আমার একটা গর্ব ছিল যে, এই পুরো হাতিবাড়ি জঙ্গলকে আমি হাতের তালুর মতন চিনি। সেই যে পনেরো-ষোলো বছর বয়সে বাবার সঙ্গে শিকার করতে এসে এই জঙ্গলের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে গত পঞ্চাশ বছরে এই অরণ্যের প্রতিটি ইঞ্চি আমি পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখেছি। প্রতিটি ঋতুতে এখানে রাত কাটিয়েছি। এই বনের প্রত্যেকটা হাতির পাল আমাকে চেনে। আমার গায়ের গন্ধ পেলে দূর থেকে চিৎকার করে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কীহে, কেমন আছ?

"তবু সেই আমিই পাঁচ বছর আগে এরকমই এক চৈত্রমাসের সন্ধেয় এমন এক জায়গায় গিয়ে পড়লাম, যে-জায়গায় আগে কখনো কেউ যায়নি।"

বললাম, "সেখানে কেমন করে পৌঁছলেন আপনি?"

উনি বললেন, "ইচ্ছে করে পৌঁছইনি। একটা দুর্ঘটনা আমাকে ওখানে পৌঁছে দিয়েছিল। হয়েছিল কি, সেদিন একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। তাই খেয়াল করিনি ঝোপের মধ্যে একটা চিতাবাঘ বসে আছে। চিতাবাঘটা একলা থাকলে আমাকে কিছু বলত না নিশ্চয়ই, কারণ, আমি তো ওর শিকার নই। কিন্তু ওর সঙ্গে বাচ্চা ছিল। আর সঙ্গে বাচ্চা থাকলে যে-কোনো জন্তুই হিংস্র হয়ে ওঠে।

"আমি বেখেয়ালে ঝোপটার কাছে গিয়ে পড়তেই চিতাটা ঝোপের ভেতর থেকে বিদ্যুতের মতন উড়ে এসে আমাকে অ্যাটাক করল। তখন নিজেকে বাঁচানোর দুটো রাস্তা ছিল আমার কাছে। হয় হাতের ছুরি দিয়ে ওটার পেট ফাঁসিয়ে দেওয়া আর নাহলে পেছনদিকে লাফ দিয়ে ওর আক্রমণটাকে এড়ানো। মারতে পারলাম না, কারণ ততক্ষণে আমি আড়চোখে ওর বাচ্চাগুলোকে দেখে নিয়েছি। মাকে মারলে বাচ্চাগুলোও বাঁচবে না। তাই আমি আর কিচ্ছু না দেখে পেছনে লাফ মারলাম আর গড়িয়ে পড়লাম হাজার ফুট গভীর খাদের মধ্যে।

"বাঁচব বলে আশা করিনি, কিন্তু বেঁচে গেলাম।

"তীব্রবেগে গড়িয়ে পড়ছিলাম। পাহাড়ের গায়ে সামান্য লতাপাতার আস্তরণ ছিল, কিন্তু ভালো করেই জানতাম ওই আস্তরণের নীচে রয়েছে অসংখ্য ধারালো আর শক্ত পাথর। কাজেই নিশ্চিত ছিলাম তারই মধ্যে কোনোটায় ঠুকে এক্ষুনি আমার মাথাটা দু-ফাঁক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। কেন হল না জানো? হল না, কারণ, ঠিক ওই জায়গাটাতে লতাপাতার নীচে ছিল মসৃণ এক পথ। সেই পথের ওপর দিয়ে গড়াতে-গড়াতে আমি পড়ছিলাম আর চেষ্টা করছিলাম দু-হাতের কাছে যা পাই তাই আঁকড়ে ধরে পতনটাকে রুখতে।

'প্রায় পাঁচশো ফুট ওইভাবে গড়িয়ে পড়ার পরে হাতের নাগালে একটা কিছু পেয়ে সেটা আঁকড়ে ধরে স্থির হলাম। চিত হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ জোরে শ্বাস নিয়ে নিজেকে সামলালাম। তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের ডানহাতের মুঠোর দিকে তাকালাম। বুঝতে পারছিলাম, যে-জিনিসটা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে সেটা কোনো গাছের ডাল কিংবা কিংবা শেকড় নয়। তাহলে জিনিসটা কী, যেটা আঁকড়ে ধরে আমি পড়ে যাওয়া আটকালাম।

"দেখলাম, একটা বড়ো লোহার কড়া। দেখে আমি যে কতটা অবাক হয়েছিলাম, তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। কারণ, আমার কথা ছেড়েই দাও, আমার পূর্বপুরুষেরাও কখনো বলেননি যে, হাতিবাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ওই-জায়গায় কোনোদিন মানুষের বসবাস ছিল। তাহলে এই জঙ্গলে ঢাকা রাস্তা, এই লোহার কড়ার মতন জিনিসটা—এসব এল কোথা থেকে?"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুরোদাদু বললেন, "তারপর যা দেখলাম সেটাই দেখাবার জন্যে তোমাদের এখন সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। এখন আর কথা বোলো না, কারণ, দেখতেই পাচ্ছ, আমাদের খাড়াই রাস্তা ধরে খাদের নীচে নামতে হবে। এখন অন্যমনস্ক হলে বিপদ।"

ওখান থেকেই ঝোরাটা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচে খাদের দিকে নেমে গিয়েছিল। এতক্ষণের ধীরে বয়ে যাওয়া জলের ধারার চেহারাই গিয়েছিল বদলে। জলের স্রোত পাথরে-পাথরে ধাক্কা খেয়ে দুধের মতন সাদা ফেনা ছিটিয়ে, গর্জন করে নেমে যাচ্ছিল নীচে। মিথ্যে কথা বলব না, ঝোরার সেই চেহারা দেখে আমারও বুক কাঁপছিল। বুঝতে পারছিলাম, কোনোরকমে একবার ওই ঝোরায় পা পড়লে মৃত্যু অনিবার্য।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "রাস্তা কই?"

উনি বললেন, "আছে। এই ঝোরার পাশ দিয়েই রাস্তাটাও নীচে নেমে গেছে। ঘাসের নীচে চাপা পড়ে গেছে বলে দেখতে পাচ্ছ না। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার পেছন-পেছন এসো।"

এতক্ষণ কালোমানিক কোনো কথা বলেনি। এবার ও হঠাৎ বলে উঠল, "আমি যাব না।"

সুরোদাদু বললেন, "সে কী! কেন?"

কালোমানিক বলল, "আমার তো আপনার বা নীলস্যারের মতন পাহাড় বেয়ে ওঠা-নামার অভ্যাস নেই। আমার ওই খাদের দিকে তাকালেই ভয় লাগছে। আপনারা ঘুরে আসুন, আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।"

আমরা দুজনেই বুঝতে পারলাম, কালোমানিকের কথায় যুক্তি

আছে। জঙ্গলের ছায়ায় সারা-বছর যে-রাস্তা ঢাকা পড়ে থাকে, যে-রাস্তার ওপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে যায়, সে-রাস্তা যে কতটা পেছল হতে পারে তা আমরা জানি। তার ওপরে এখানে রাস্তাটা নেমে গেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ-ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। যাদের অভ্যাস নেই তাদের এই-রাস্তায় না যাওয়াই ভালো।

সুরোদাদু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, "বেশ, তুই তাহলে এখানেই থাক। সবথেকে ভালো হয় যদি ওই পাকুড় গাছটার ওপরে উঠে বসে থাকিস। তাহলে হট করে চিতা বা ভালুক-টালুক চলে এলেও চিন্তার কিছু থাকবে না।"

কালোমানিক তাই শুনে বিশাল পাকুড় গাছটার ওপরে উঠে গেল। আমার ব্যাকপ্যাক, সুরোদাদুর কাঁধের ঝুলি সব ওর জিম্মায় দিয়ে দিলাম। আমার কাছে রইল শুধু আমার টর্চ, জলের বোতল এবং রিভলবার আর সুরোদাদুর পিঠে ওঁর চিরসঙ্গী তির-ধনুক।

আমি খুব সাবধানে সুরোদাদুর পেছন-পেছন ঘাসে ছাওয়া খাদের পাড়ের একটা জায়গায় পা দিলাম আর পা দিয়েই বুঝলাম, সুরোদাদু এতটুকুও ভুল বলেননি। আমার পায়ের নীচে একটা পাথরের চৌকোনা স্ল্যাব রয়েছে।

পুরো রাস্তাটাই ওরকম পাথরের স্ল্যাব দিয়ে বাঁধানো ছিল। নামতে-নামতে একটা সময় আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে আমি হাঁটু গেড়ে বসে দু-হাত দিয়ে টেনে কিছুটা ঘাসের আস্তরণ ছিঁড়ে সরিয়ে দিলাম। যা দেখলাম তাতে আমার চোখ কপালে উঠে গেল।

ভেবেছিলাম, বহু পাহাড়ি-রাস্তাতেই লোকাল-লোকেরা যেভাবে যাহোক-তাহোক করে পাথরের টালি দিয়ে রাস্তা বাঁধিয়ে দেয়, এখানেও নিশ্চয়ই সেরকমই কিছু দেখব। কিন্তু না। দেখলাম নিখুঁত মাপে কাটা সমান মাপের সব টালি। শুধু তাই নয়। অবিকল আধুনিক ফুটপাথের টালির কায়দায় একটি টালির খাঁজে পাশের টালির কিছুটা ফালি ঢুকে গিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটা টালিকে শক্ত করে আটকে রেখেছে।

অথচ সুরোদাদু বলছেন, তাঁর পূর্বপুরুষেরাও এখানে কোনো লোকালয়ের কথা জানতেন না। তার মানে বহুযুগ আগে এই রাস্তা নির্মিত হয়েছিল, হয়তো আদিবাসীরা এই বনে আসারও অনেক আগে। তাহলে তো আমাদের অন্তত পাঁচ হাজার বছর আগের কথা ভাবতে হয়।

পাঁচ হাজার বছর আগে এত নিখুঁত পাথরের কাজ!

আমি রিভলবারের বাঁটটা দিয়ে একটা টালির কোণে সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করলাম। রিভলবারের বাঁটের সেই জায়গাটায় চলটা উঠে গেল, পাথরটা যেমনকার তেমনই রইল। সুরোদাদু এতক্ষণ চুপ করে আমার কাণ্ড-কারখানা দেখছিলেন। এবার গম্ভীর-গলায় বললেন, "আমিও চেষ্টা করে দেখেছিলাম, পারিনি। আরেকটা জিনিস দেখাই তোমাকে। এই নাও, এটা ধরো।" এই বলে নিজের গলার বাঘনখের মালাটা খুলে আমার হাতে দিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, "এটা নিয়ে কী করব?"

উনি বললেন, "মালার মাঝখানে যে কালো-পাথরটা দেখছ, ওটা চুম্বক-পাথর। এই দেখো—" বলে নিজের ভোজালিটা কোমর থেকে খুলে পাথরটাতে ছোঁয়াতেই ভোজালিটা খট করে পাথরের গায়ে আটকে গেল।

বললাম, "হ্যাঁ। চুম্বকই তো দেখছি। তো?"

"এবার ওটা রাস্তার ওই টালির গায়ে ছুঁইয়ে দেখো কী হয়।"

মালার চুম্বকটাকে আমি পাথরের কাছে নিয়ে যেতেই সেটা পাথরের গায়ে আটকে গেল। ছাড়াবার সময় বেশ জোর লাগাতে হল আমাকে।

উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "কিছুই মাথায় ঢুকছে না। লোহার আকরিক আমি চিনি। এই পাথরগুলো মোটেই সেই হেমাটাইট নয়। এগুলোর রং তো সাদাটে আর হেমাটাইট হয় লাল। তাহলে চুম্বককে টানছে কেন?"

সুরোদাদু বললেন, "এই তো রহস্যের শুরু। যত নীচে নামবে, দেখবে পুরো জায়গাটা জুড়েই এরকম আরো অনেক রহস্য রয়েছে। সেইজন্যেই গত পাঁচ বছরের মধ্যে নিজে এখানে কয়েকবার ঘুরে গেলেও, গ্রামের একটি লোককেও এই জায়গাটার কথা বলিনি। আমার তিনকুলে কেউ নেই। আমি মরে গেলেও কারুর ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার জন্যে অন্য কারুর ক্ষতি হোক, আমি চাই না।"

"কে করবে ক্ষতি? কেউ কি এখানে আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সুরোদাদু আমার এই প্রশ্নের উত্তরে একটা অদ্ভুত কথা বললেন। বললেন, "আমি চোখে কাউকে দেখিনি। কিন্তু এখানে এলেই আমার কেন জানি না মনে হয়, কারা যেন আমার দিকে নজর রাখছে। শুধু তাই নয়, ফিসফিস করে কারা যেন সারাক্ষণ বলে, "চলে যাও। চলে যাও এখান থেকে'।"

আমি নীল চ্যাটার্জি। পৃথিবীর নির্জনতম জায়গায় বহু রাত একা কাটিয়েছি—এখনো কাটাই। বহু বীভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি হয়েছি, একাই। কাজেই সুরোদাদুর এই-কথা শুনে আমার কোনো প্রতিক্রিয়া হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল। সত্যিই আমারও মনে হচ্ছেল, কারা যেন আমাদের দেখছে। কারা যেন ফিসফিস করে বলছে, "আর এগিয়ো না, শান্তি নষ্ট কোরো না আমাদের।"

জোর করে মনের অস্বস্তিটা কাটিয়ে আবার নামতে শুরু করলাম। যতই সাবধানে যাই, রাস্তাটা তো আসলে ঢালু, তাই নীচে নেমে যেতে খুব বেশি সময় লাগল না। বড়োজোর এক-ঘণ্টার মধ্যে সুরোদাদু আর তাঁর পেছন-পেছন আমি খাদের নীচের মাটিতে পা রাখলাম। তারপর আমি বেকুবের মতন চারিদিকে তাকালাম।

জায়গাটার মধ্যে কোনো অসাধারণত্ব খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই আমি বেকুব হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা একফালি সরু জমির ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমাদের ঠিক উলটোদিকেই উঠে গেছে আরেকটা টিলা, যেটার উচ্চতাও ওই তিন-হাজার ফুট মতন হবে। আমাদের পেছনে ছোটোখাটো একটা জলপ্রপাতের মতন নেমে এসেছে সেই ঝোরাটা—তারপর আমাদের সামনে দিয়ে বয়ে গেছে পশ্চিমদিকে। তাছাড়া আর সবটাই জঙ্গল, শুধুই জঙ্গল। যেরকম জঙ্গল খাদের ওপরেও দেখে এসেছি।

জায়গাটার মধ্যে বিশেষত্ব যদি কিছু থাকে, তা হল নিস্তব্ধতা। একটা মাছি ওড়ার শব্দও কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। খেয়াল করে

টর্চের আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম, গাছের নীচে
চিত হয়ে পড়ে রয়েছে কালোমানিক।

বুঝলাম, এখানে কোনো প্রাণী নেই। কোনো পাখিও না। কিন্তু সেটা খুব বড়ো ব্যাপার নয়।

সুরোদাদুকে সেটাই জিজ্ঞেস করলাম। বললাম, "কী জন্যে এখানে নিয়ে এলেন সুরোদাদু? ওই কঙ্কালটার সঙ্গে জায়গাটার কী সম্পর্ক? আপনি কীসব যেন কাঠের জামাকাপড়, গয়না, মুকুট এইসবের কথা বলছিলেন। সেগুলোই বা কোথায়?"

সুরোদাদু বললেন, "দেখাচ্ছি। তার আগে একবার তোমার ঘড়িটা দেখো তো।"

"কেন? সেখানে যাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়-টময় আছে নাকি?" হালকাচালে কথাগুলো বলে আমি শার্টের স্লিভটা গুটিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকালাম এবং তাকিয়েই রইলাম। ঘড়ির কাঁটাগুলো বনবন করে ঘুরে যাচ্ছিল এবং তিনটে কাঁটাই ঘুরছিল উলটোদিকে।

"উলটোদিকে ঘুরছে কি?" সুরোদাদু বললেন।

আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম, হ্যাঁ।

"বলেছিলাম না তোমাকে, এখানে অনেক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে। যাইহোক, চলো, যেটা তোমাকে দেখাতে এনেছি সেটা দেখিয়ে আনি। আজ যেন জায়গাটা একটু বেশিই নিস্তব্ধ লাগছে। ভালো লাগছে না এখানে দাঁড়াতে।"

নিজের মনেই কীসব বিড়বিড় করতে-করতে সুরোদাদু সোজা সেই জলপ্রপাতের ধারা ভেদ করে ওদিকে চলে গেলেন। জলের পর্দা তাঁকে আমার চোখ থেকে আড়াল করে দিল। অগত্যা আমিও সেই জলের পর্দা ভেদ করে ওদিকে গেলাম, যদিও ব্যাপার-স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

ওদিকে গিয়েই বুঝতে পারলাম প্রপাতের আড়ালে একটা বড়ো গুহার মুখ রয়েছে। সেই গুহামুখেই দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন সুরোদাদু। আমি ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, "চলো! এই গুহা ধরে কিছুটা যেতে হবে।"

আমি বললাম, "একমিনিট দাঁড়ান। টর্চটা জ্বালি। গুহার ভেতরটা খুব অন্ধকার।"

সুরোদাদু বললেন, "চেষ্টা কোরো না। টর্চ জ্বলবে না। আমি দেখেছি, খাদের নীচে এই পুরো অঞ্চলটায় মানুষের তৈরি-করা কোনো যন্ত্রই কাজ করে না।"

আমি টর্চটা জ্বালাবার বহু চেষ্টা করলাম। সত্যিই জ্বলল না।

সুরোদাদু কিছুক্ষণ আমার পণ্ডশ্রম দেখলেন। তারপর বললেন, "আমি নিশ্চিত, তোমার রিভলবারটাও এখানে কাজ করবে না। তবে আমার তির-ধনুক কাজ করবে। অবশ্য চাইব যাতে সেরকম পরিস্থিতি না আসে।"

আমরা দুজন ওই আবছা অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই হাঁটতে শুরু করলাম। গুহার ভেতরটা শুধু যে অন্ধকার তাই নয়, বেশ স্যাঁতসেঁতে। ছাদ থেকে, দেয়াল থেকে অবিরাম জল টুপিয়ে পড়ছিল। অবশ্য আমরা তো ইতিমধ্যেই জলপ্রপাত পেরিয়ে আসার সময় আপাদমস্তক ভিজে চুপ্পুর হয়ে গিয়েছিলাম। তবু ব্যাপারটা অস্বস্তিকর।

আরো অস্বস্তিকর গুহার ভেতরের ভ্যাপসা গন্ধটা। পাথুরে ছাদটা এতই নীচু যে, আমাদের প্রায়ই গুঁড়ি মেরে হাঁটতে হচ্ছিল। তবে বেশিক্ষণ নয়। হঠাৎই সরু গুহাটা দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং উচ্চতায় বিশাল হয়ে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ওই হলঘরের মতন জায়গাটাতেই গুহাটা শেষ হয়েছে। চারিদিকে পাথুরে দেয়াল—কোনোদিকে আর এগোবার জায়গা নেই।

এই জায়গাটায় মেঝে, দেয়াল সব খটখটে শুকনো। কোথাও জল চোঁয়াচ্ছিল না। আরো আশ্চর্য ব্যাপার, গুহার এই শেষ-প্রান্তে অন্ধকারও অনেকটাই হালকা লাগছিল—যদিও যুক্তি বলে এখানেই অন্ধকার সবচেয়ে গাঢ় হওয়া উচিত ছিল। মনে হচ্ছিল এখানে দেয়ালের কিছু পাথর স্বয়ংপ্রভ, ফসফরাসের মতন নিজেরাই খুব মৃদু, হালকা-সবুজ একটা আলো বিকীরণ করছে। সেই আলোতেই দেখলাম, হলঘরের মতন জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা মন্দির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুরোদাদুও তন্ময় হয়ে ওই মন্দিরের দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কার মন্দির, সুরোদাদু?"

উনি ওদিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই উত্তর দিলেন, "জানি না ভাই। এমনকি এটাও জানি না যে, ওটা সত্যিকারেরই মন্দির কিনা।"

উনি কথাটা খুব একটা ভুল বলেননি। যেটাকে মন্দির বলছি, সেটার শেপ ঠিক একটা পেনসিলের মতন। গোল একটা টাওয়ার মাটি থেকে প্রায় কুড়ি-ফুট সোজা উঠে গেছে। তারপর হঠাৎই সরু হয়ে একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলেছে। এরকম গঠনের কোনো মন্দির আমি আগে কোথাও দেখিনি। তবু মন্দির ছাড়া এটা আর কী হতে পারে?

সুরোদাদুকে আবার প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি এখানেই কঙ্কালটা পেয়েছিলেন?"

উনি একটু অধৈর্য-সুরে বললেন, "না। তোমাকে বললাম তো, কঙ্কাল আমি পাইনি। আমি দেখেছিলাম ক-টা কাঠের পুতুল, যার মধ্যে একটা সেই প্রথমবারেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এখনো নিশ্চয় সেগুলো আছে। চলো দেখাচ্ছি।"

এই বলে সুরোদাদু ওই মন্দিরটার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমিও ওঁর সঙ্গে গেলাম। কিন্তু তারপরে আর কী করব বুঝতে পারছিলাম না, কারণ, প্রায় আট-ফুট ব্যাসের বাড়িটার চারিদিকে একটা চক্কর দিয়ে আমি না পেলাম কোনো দরজা, না দেখলাম কোনো জানলা। যেন সলিড একটা পিলার। হাত দিয়েই বুঝলাম, পিলারটা তৈরি হয়েছে এখানে আসার পথে যে টালিগুলো দেখেছিলাম তাদের মতন একই মেটিরিয়ালে।

সুরোদাদুকে সবে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, "ঢুকব কোথা দিয়ে?" তার আগেই দেখি উনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড শুরু করেছেন। আমি খেয়াল করিনি। মন্দিরটার দেয়ালের একদিকে সারি দিয়ে নীচ থেকে ওপর অবধি খাঁজ কাটা ছিল। উনি তরতর করে সেই খাঁজগুলোর মধ্যে পা রেখে ওপরে উঠতে শুরু করেছেন।

মুহূর্তের মধ্যে চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়ে উনি এক-জায়গায় দাঁড়ালেন। নীচ থেকে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না উনি ঠিক কোথায় পা রেখে দাঁড়ালেন, তবে যেভাবে একটা হাত মন্দিরের দেয়াল থেকে সরিয়ে, সেই-হাতের ইশারায় আমাকেও ওপরে উঠে আসতে বললেন, তাতে বুঝলাম জায়গাটা দুজন মানুষের পক্ষেও যথেষ্ট। তাই আর দেরি না করে আমিও উঠে গেলাম এবং দেখলাম, ওখানে মন্দিরের দেয়াল ঘিরে একটা দু-ফুট চওড়া কার্নিশের মতন অংশ বেরিয়ে রয়েছে।

আমি কার্নিশে পা রেখে সুরোদাদুর পাশে দাঁড়ালাম। উনি আমাকে ইশারায় চূড়ার পেন্সিলের ডগার মতন সরু জায়গাটার দিকে দেখালেন। নীচ থেকে বোঝা যাচ্ছিল না, ওই অংশটা কাচের মতন স্বচ্ছ। তার মধ্যে দিয়ে দেখলাম, ঠিক ওই ঢাকনাটার নীচে দেয়াল ঘেঁষে গোল হয়ে বসে আছে পাঁচটা কাঠের পুতুল। প্রতিটি পুতুল ছ-ইঞ্চি মতন লম্বা। তাদের গায়ে কারুকার্য করা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবির মতন পোশাক। মাথায় মুকুট। বাহুতে আর গলায় অদ্ভুত দেখতে কিছু গয়না। দেখে মনে হচ্ছিল মেটিরিয়ালটা কাঠ। তবে অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কাঠ অতদিন টেঁকে না।

সুরোদাদু বললেন, "প্রথম যখন দেখেছিলাম, তখন ওখানে সাতটা পুতুল ছিল। আমি লোভ সামলাতে না পেরে এই ঢাকনার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে একটা পুতুল তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

আমি বললাম, "একটা? না দুটো?"

"একটাই।"

"তাহলে এখন পাঁচটা পুতুল রয়েছে কেন? আর কেউ তো এই মন্দিরের কথা জানে না। ছ-নম্বর পুতুলটা কোথায় গেল?"

বলতে-বলতেই মাথা উঁচু করে গুহার ওই জায়গার ছাদটার দিকে তাকালাম এবং মুহূর্তের মধ্যে আমি সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "সুরোদাদু! নামুন, জলদি নামুন! আমাদের এখান থেকে পালাতে হবে। এক্ষুনি।"

আমার বলার ভঙ্গিতে নিশ্চয় এমন কিছু ছিল যার জন্যে সুরোদাদু আর কোনো প্রশ্ন না করে দেয়ালের খাঁজে পা রেখে নীচে নেমে গেলেন। পেছন-পেছন আমি। তারপর আর পেছন দিকে না তাকিয়ে আমরা যে-পথে এই গুহায় এসেছিলাম, সেই-পথ ধরেই দৌড়লাম সেই জলপ্রপাতের দিকে। একটুও না থেমে জলপ্রপাত পার হয়ে পাহাড়ের চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলাম।

কাজটা সহজ ছিল না, কারণ, আগেই বলেছি রাস্তাটার ঢাল প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি। তার ওপরে প্রচণ্ড পেছল। মসৃণ টালির বুকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার মতন কোনো গ্রিপও পাচ্ছিলাম না। আমার দম শেষ হয়ে যাচ্ছিল ওপরে উঠতে। বয়সের কারণে সুরোদাদুর কষ্ট যে আরো বেশি হচ্ছিল সেটাও বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমার থামার উপায় ছিল না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, কালোমানিক এই-মুহূর্তে প্রচণ্ড বিপদের মুখে পড়েছে। এমনকি ওর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

প্রায় দেড়-ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় আমরা খাদের মাথার কাছে পৌঁছে গেলাম। এবার আমাদের আলোর প্রয়োজন, কারণ, আলো ছাড়া জঙ্গলে চলতে পারব না। আমি একবার থেমে, ব্যাকপ্যাক থেকে টর্চলাইটটা বার করে, বোতাম টিপলাম। আমি দেখতে চাইছিলাম, টর্চটা কাজ করছে কিনা।

হ্যাঁ, কাজ করছে। জোরালো আলোর বীম গিয়ে পড়ল ঠিক আমার পায়ের নীচের রাস্তাটায় আর তখনই আমি এবং সুরোদাদু সেই দৃশ্যটা দেখলাম, যার মতন আতঙ্কজনক দৃশ্য আমরা কেউই আগে দেখিনি। আমার পায়ের নীচে ছিল সেই পাথরের ব্লকটা, নামার সময় যেটার ওপর থেকে আমি নিজের হাতে ঘাস আর লতাপাতা পরিষ্কার করে গিয়েছিলাম। তখন ব্লকটা ছিল পরিষ্কার। এখন সেটার ওপরে কয়েকটা কাদা মাখা পায়ের ছাপ। ছাপগুলো আমাদের পায়ের নয়।

পৃথিবীর কোনো মানুষের পায়ের ছাপই নয়।

কারণ, এক-একটা পায়ের ছাপের মাপ একটা কুমড়োর বীজের চেয়ে বড়ো নয়। অথচ প্রতিটি ছাপের মধ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুড়ো আঙুল থেকে কড়ে-আঙুল অবধি পাঁচটা আঙুল। মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পায়ের আঙুল অমন গায়ে-গায়ে সাজানো থাকে না।

সুরোদাদু ভয়ার্ত-মুখে আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে ফিসফিস করে বললেন, "এরা কারা নীল? কাঠের পোশাকের আড়ালে এরা কারা?"

আমি বললাম, "অন্য গ্রহের প্রাণী। বাকি যা বুঝেছি পরে বলব। এখন শুধু এটুকুই বলছি, এই পায়ের ছাপ সেই ছ-নম্বর পুতুলের, যাকে আমরা একটু আগে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আর সে আমাদের আগে-আগে যাচ্ছে, পাঁচ-নম্বরের কঙ্কাল ফিরিয়ে আনতে। যে-কঙ্কালটা রয়েছে কালোমানিকের কাছে।"

জঙ্গলের রাস্তায় উঠেই আমি আর সুরোদাদু উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়লাম সেই পাকুড় গাছটার দিকে, যেটার ওপরে কালোমানিক আশ্রয়

নিয়েছিল। কিন্তু গাছটার কাছে পৌঁছেই আমরা দুজনেই স্থির হয়ে গেলাম। আমাদের দুজনেরই মনে হয়েছিল আমরা বড্ড দেরি করে ফেলেছি। আর বোধহয় কিছু করার নেই। টর্চের আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম, গাছের নীচে চিত হয়ে পড়ে রয়েছে কালোমানিক। হাতদুটো দু-পাশে ছড়ানো। চোখ বন্ধ। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরোচ্ছে।

তবু কোনোরকমে জড়তা কাটিয়ে ওর পাশে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসলাম। নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে সুরোদাদুর দিকে তাকিয়ে বললাম, "বেঁচে আছে, সুরোদাদু! নিশ্বাস পড়ছে।"

হ্যাঁ। বেঁচেই ছিল কালোমানিক, শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই ওর জ্ঞান ফিরে এল। কিন্তু তারপর আর বিশেষ কিছুই বলতে পারল না। ওর শুধু মনে আছে, অন্ধকারের মধ্যে ও ওর পাশের ডালটায় একটা খসখস শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছিল, ডালটা থেকে ছ-ইঞ্চি ওপরে দুটো সবুজ চোখ জ্বলছে। ও ভেবেছিল বুনোবেড়াল কিংবা ভামের মতন কোনো ছোটোখাটো জন্তু-টন্তু হবে। সেটাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে হাতটা তুলতেই একটা ইলেকট্রিক-শকের মতন ঝটকা ওই সবুজ চোখদুটো থেকে বেরিয়ে এসে ওকে অজ্ঞান করে ফেলে দেয়। আর কিছু ওর মনে নেই।

কালোমানিক যেখানে শুয়েছিল, তার ঠিক পাশেই পড়েছিল আমার ব্যাকপ্যাকটা। মুখের চেনটা খোলা। আর সমস্ত জিনিস ঠিকঠাকই ছিল। ছিল না শুধু সেই ছ-ইঞ্চি মানুষের কঙ্কালটা।

এই ঘটনার পর আমরা আর এক-মুহূর্তও ওখানে থাকার সাহস পাইনি। সন্ধের অন্ধকারের মধ্যেই আমি, সুরোদাদু আর কালোমানিক হাঁটা লাগিয়েছিলাম কুসুমকুঁয়া গ্রামের দিকে। যেতে-যেতে ওদের বলেছিলাম আমার ধারণার কথা।

বলেছিলাম, ওই মন্দিরের ঠিক ওপরে গুহার ছাদের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, পাহাড়ের গায়ে একটা বিশাল ধসের চিহ্ন। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম, একসময়ে ওখানে ছিল বিশাল এক গহ্বর। কিন্তু ওই ধসের সঙ্গে অজস্র পাথর নেমে এসে সেই গহ্বরটাকে চিরকালের মতন বন্ধ করে দিয়েছে।

সেই সঙ্গেই বন্ধ করে দিয়েছে অন্য গ্রহের সাতটি প্রাণীর ফেরার পথ।

কালোমানিক আর সুরোদাদু একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, "ফেরার পথ মানে? গর্ত থাকলেই ফিরতে পারত? কীসে করে ফিরবে?"

বললাম, "কেন? রকেটে করে। কালোমানিক তো দেখোনি, কিন্তু সুরোদাদু, আপনি তো সেই রকেটটা দেখেছেন। যেটাকে আপনি মন্দির বলছিলেন, পেন্সিলের মতন ওই স্ট্রাকচারটাই তো ওদের রকেট। ওটাকে ওরা পাহাড়ের গায়ের ওই গর্তের ভেতর দিয়ে গুহার ভেতরে ল্যান্ড করিয়েছিল—সে কত হাজার বছর আগে তা জানি না। কিন্তু জায়গাটা বেছেছিল চমৎকার। একদম প্রকৃতির নিজের হাতে বানানো লঞ্চিং-প্যাড।

"ওরা নিশ্চয় খুব বেশিদিন পৃথিবীতে থাকত না। কিন্তু হঠাৎই ধস নেমে ওদের ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেল।

"ওদের আয়ু কতদিন তাও জানি না, তবে মনে হয় পৃথিবীর হিসেবে পাঁচ-হাজার বছরের কম হবে না। তাই গত পাঁচ-হাজার বছর ধরে ওরা ওই গুহার মধ্যেই থেকে গেছে। থাকতে বাধ্যই হয়েছে বলা ভালো, কারণ ইতিমধ্যে হাতিবাড়ির জঙ্গলেও মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে। বেরোলেই তো মানুষের চোখে পড়ে যাবে।

"তবুও ওরা মানুষের চোখ এড়াতে পারল না। সুরোদাদুর মতন মানুষ তো খুব কমই আছেন। সুরোদাদুই একদিন হঠাৎ করে গিয়ে হাজির হলেন ওই গুহায়। ওদের রকেটটাকে ভাবলেন মন্দির। ওদের নভোচরের পোশাক পরা শরীরগুলোকে ভাবলেন মন্দিরের মূর্তি। আর ওরকম একটা মূর্তিকে নিয়ে চলে এলেন নিজের ঘরে।"

সুরোদাদু এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতন আমার কথা শুনছিলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, "আমি তাকে ঘরে নিয়ে আসার আগেই কি সেই প্রাণীটি মারা গিয়েছিল?"

বললাম, "নিশ্চয়ই তাই। নভোচরের পোশাকের মধ্যে ছিল শুধুই অন্য গ্রহের প্রাণীটির ছোট্ট কঙ্কাল। একদিন কোনোভাবে সেই পোশাক খুলে পড়েছিল। আপনি খেয়াল করেননি। কালোমানিক তুলে এনেছিল কঙ্কাল আর তার পোশাক। ওগুলো যে একদিন একসঙ্গেই ছিল সেটা ও বুঝতে পারেনি।"

"তারপর?" কালোমানিক জিজ্ঞেস করল।

বললাম, "ওই সাতজন নভোচরের মধ্যে একজন তো মারা গেছেই। সম্ভবত বাকিরাও সবাই জীবিত নেই। ছ-জনের মধ্যে দুজন, তিনজন কিংবা চারজনই ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে। ন্যাচারাল-ডেথ। পাঁচ-হাজার বছরের আয়ুও তো একদিন ফুরোয়। কাজেই ওরাও মারা যাচ্ছে।

"সে যাই হোক। অন্তত একজন যে এখনো জীবিত আছে, সে-কথা নিশ্চিত। সেই একজনই আজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল তার সহযাত্রীর দেহের অবশেষ। কালোমানিকের কাছ থেকে সে তার বন্ধুর কঙ্কাল ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাদের মহাকাশযানে। এই পৃথিবীতে একমাত্র যে-জায়গাটুকু তাদের আপন, যে-জায়গাটুকুতে এখনো তাদের ফেলে আসা মাতৃভূমির গন্ধ আর স্পর্শ লেগে আছে, সেইখানে। মৃত্যুর পরেও ওরা সাতজন একসঙ্গে ওই মহাকাশযানের ককপিটেই পাশাপাশি বসে থাকতে চায়।

"হয়তো এখনই যদি আমরা আবার ওই গুহায় ফিরে যাই, যদি ককপিটের স্বচ্ছ ঢাকনাটা খুলে ভেতরে উঁকি মারি, দেখব যে ওরা সাতজনেই পাশাপাশি বসে আছে। তাদের মধ্যে আজ ঠিক ক-জন মৃত আর ক-জন জীবিত, আমরা জানতেও পারব না।"

সুরোদাদু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ওদের এই ইচ্ছেটাকে আমি সম্মান করি। যতদিন বেঁচে আছি, ওই গুহার দিকে আমি আর পা ফেলব না। আর কাউকে বলবও না ওই গুহার কথা।"

কালোমানিক নিজের মনে বলল, "কেমন করে ভুলব, যে আজ বন্ধুর মৃতদেহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল সে অনায়াসে আমাকে খুন করতে পারত, কিন্তু করেনি। তার মানে ওরা উচ্চস্তরের জীব। এই সম্মান ওদের প্রাপ্য।"

আমি বললাম, "সাতটি দুঃখী জীবের স্মরণে আমিও আর এদিকে পা ফেলব না, কথা দিলাম। এই গল্প এখানেই শেষ হল।" ❖

জুতো রহস্য
গল্পঃ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
চিত্রনাট্য ও ছবিঃ জুরান নাথ
তোমার কাগজে খবর কই হে জয়ন্ত? এ তো খালি বিজ্ঞাপন খাওয়াচ্ছ দেখছি। হাঃ হাঃ
কেন কর্নেল? পজিটিভ নিউজ চোখে পড়ছে না? হাঃ হাঃ
তখনই-
জুতো পায়ে ঢুকতে পারি স্যার?
নিশ্চই পারেন। আসুন।
?!!
তবে খুলে রেখে এলেও আপনার নতুন জুতো যে চুরি যাবে না, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।
অ্যাই! তাহলে যথাস্থানেই এসেছি।
আমার ভাগ্নে গোকুল, স্যার আপনি চেনেন ওকে। বাবুগঞ্জ ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার। আপনার ঠিকানা দিয়ে বলল, এর কিনারা করতে আপনিই পারবেন।
??

জুতো চুরির ব্যাপার তো?
ক'জোড়া চুরি গেছে এ পর্যন্ত?

তিনজোড়া।
এ বাজারে এক-
জোড়া চামড়ার জুতোর
দাম চিন্তা করুন স্যার!

তিন-তিনজোড়া জুতো লোপাট।
রোববার থেকে শুরু। তারপর বিস্যুতবার,
শুক্কুরবার আবার একজোড়া নতুন কিনে
আনলাম। সেদিনই সন্ধেবেলা সেটাও
হাওয়া। বুঝুন স্যার। সব্বার জুতো পড়ে
আছে, আমারটাই কেবল লোপাট।
এ কেমন চোর স্যার?

ঠাকুরবাড়ির
দরজা থেকে?

ঠিক ধরেছেন। রাজাদের ঠাকুরবাড়ি।
ওঁরা কলকাতায় চলে এসেছেন। দালান-কোঠা
সবই ধসে পড়েছে। শুধু ঠাকুরবাড়িটাই কোনো
রকমে টিকে ছিল। পুজোআচ্চাও প্রায় বন্ধ।
সেবায়েত চলাফেরা করতে পারে না, তার
পায়ে বাত। ওই শুয়ে শুয়েই নমো-নমো।
বুঝলেন তো স্যার?

তারপর কোনো
সাধুর আবির্ভাব হল
ঠাকুরবাড়িতে?

অ্যাই! গোকুল যা যা বলছিল
একেবারে হুবহু ঠিকঠাক মিলে যাচ্ছে।
আপনি এ সব, মানে কী করে—

তারপর থেকে রোজ সন্ধে বেলা শাস্ত্রপাঠ, কীর্তনের আসর বসছিল।
আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। শাস্ত্রপাঠ-কথকতা-কীর্তন। বেশ কিছু ভক্ত সমাগমও হচ্ছিল রোজ।
আপনার নাম কী?
আজ্ঞে আমার নাম পাঁচুগোপাল সিংহ। আমার বাবার নাম যদুগোপাল সিংহ। আর আমার ঠাকুর্দার নাম হল গিয়ে, জয়গোপাল সিংহ।
ঠাকুর্দা কী করতেন?
তিনি ছিলেন রাজবাড়ির খাজাঞ্চি।
খাজাঞ্চি?
আজ্ঞে হ্যাঁ। খাজাঞ্চি মানে ওই ক্যাশিয়ার স্যার! আজকাল খাজাঞ্চি বললে—
আপনার বাবা কী করতেন? আর আপনি কী করেন?
!!
বাবা ছিলেন রাজবাড়ির সেরেস্তাদার। মানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট যাকে বলে।
আর আমি রেলের টিকিট চেকার ছিলাম। গত মাসে রিটায়ার করে পৈতৃক বাড়িতে এসে উঠেছি। বিয়ে-টিয়ে করিনি।আমার বিধবা দিদি, গোকুলের মা আমাদের বাড়িতেই থাকত। আমি আসার পরই সে গোকুলের কোয়ার্টারে চলে গেছে। অত করে বললাম, থাকল না। বলে কিনা, এ বাড়িতে ভূতের অত্যাচার সইতে পারবে না।
ভূতের অত্যাচার! মানে?
?
আজ্ঞে রাতবিরেতে কী সব অদ্ভুত শব্দ। কুকুর চেঁচালেই থেমে যেত। প্রথমে গা করিনি, কিন্তু সমস্যা না মেটায়, শেষে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করলাম। তাতেও কাজ হল না। এমন সময়—
এমন সময় সাধুবাবার আবির্ভাব। কাজেই তার শরনাপন্ন হলেন। তাই তো?

হলাম। কিন্তু সাধুবাবার কৃপায় ভূতের অত্যাচার যেই না বন্ধ হল, অমনি হঠাৎ জুতো চুরি শুরু হয়ে গেল নতুন করে।
সাধুবাবা কোনো সমাধান করতে পারলেন না বলছেন?

সমাধান করতে গিয়েই তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড স্যার। শনিবার, মানে কাল সকালে ঠাকুরবাড়ির যে ঘরে সাধুবাবা থাকতেন, সেই ঘরের বারান্দায় চাপ চাপ রক্ত দেখা গেল। সারা বাবুগঞ্জ হুলুস্থুলু। পুলিশ এসে বলল, বডি নদীতে ফেলে দিয়েছে। আমি তো এর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আপনি যে রোজ সাধুবাবার আসরে যেতেন, আপনার কি মনে হত না যে আপনার ফাঁকা বাড়িতে চোর ঢুকতে পারে?
ভুলো স্যার। ভুলোর চ্যাঁচানি যে একবার শুনবে সে-ই পালাবে।

ভুলো কোনও কুকুর?
আজ্ঞে হ্যাঁ।

দিদির পোষা দিশি কুকুর। দিদি চলে গেলেও ভুলো কিন্তু যায়নি।
তাহলে ভুলো এখন আপনার বাড়ি পাহারা দিচ্ছে?
হাঃ

অ্যাঁ? সর্বনাশ! ওর কথা তো কাল থেকে খেয়ালই নেই। ভুলোকে কাল থেকে তো দেখিনি। ভুলো কি দিদির বাড়ি চলে গেছে?

আশ্চর্য কর্নেল! আপনি অন্ধকারে ঢিল ছোড়েন, আর দিব্যি সেই ঢিল লক্ষ্যভেদও করে।

অন্ধকারে? নাহ্ জয়ন্ত! আমি আলোতেই ঢিল ছুড়েছি।

জুতো চুরির কথা আপনি জানতেন তাহলে?
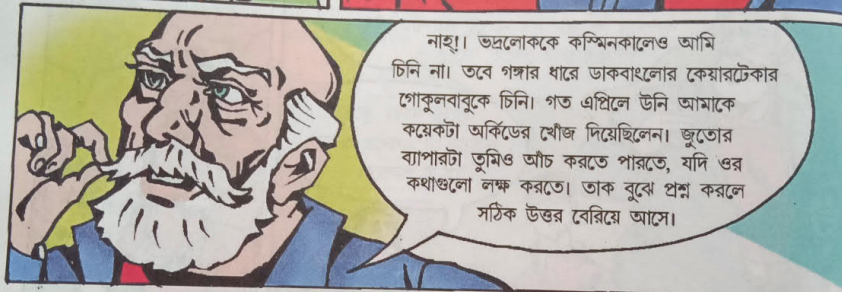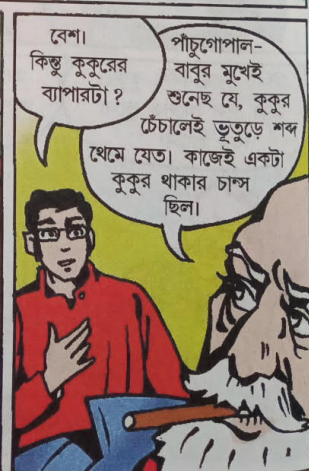
হুম! তাহলে ভূত আসলে জুতো চুরি করতেই আসত। রীতিমতোরহস্যজনক ঘটনা। কুকুরটাও নিপাত্তা হয়ে গেল সাধুবাবার মতো কিন্তু কুকুরের জন্যে ভদ্রলোক গুলতির বেগে বেরিয়ে গেলেন কেন?
বাহ্! ক্রমশ তোমার বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে।
খাজাঞ্চি! খাজাঞ্চি... আগের দিনে রাজা খেতাবধারী বড় জমিদারদের খাজাঞ্চিখানা থাকত। ট্রেজারি! খাজাঞ্চি ঠিক ক্যাশিয়ার নয়, ট্রেজারার। খুব আস্থাভাজন লোক হওয়া চাই। খুব গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দটা। আস্থা...
বাবামশাই কফি!
হ্যাঁ। কফি খেয়ে আমরাও গুলতির বেগে বেরিয়ে যাব।
মাত্র তিন ঘণ্টার জার্নি। পৌঁছেই লাঞ্চ খাওয়া যাবে।
নমস্কার! আসুন আসুন।

বাংলোয়-
মামাবাবুর মাথায় ছিট আছে। মা এতকাল দাদামশাইয়ের ভিটে আগলে রেখেছিলেন।
! !
এত বলেও আমার কোয়ার্টারে আনতে পারিনি। মামাবাবু রিটায়ার করে বাড়ি ফিরলেন। অমনিই নাকি ভূতের উপদ্রব শুরু হল। আসলে ভূত-টুত, জুতোচুরি সব বোগাস।
মামাবাবুর পাগলামিতে অতিষ্ঠ হয়েই মা আমার কাছে চলে আসেন। কিছুক্ষণ আগে আপনার ওখান থেকে ফিরে আবার এক পাগলামি করতে এসেছিলেন।
ভুলোর জন্যে?
আপনি শুনেছেন? ভুলো মায়ের পোষা কুকুর। মামাবাবুর ধারণা, ভুলো মায়ের কাছে পালিয়ে এসেছে।
জুতো চুরির জন্যে নয়। সাধুবাবার হত্যা রহস্যের ব্যাপারে খটকা লাগছিল বলেই মামাবাবুকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম।
এবার আপনারা একটু রেস্ট করুন।
আপনিও রেস্ট নিন।

হালকা ভাতঘুমের অভ্যাস আমার..
প্রজাপতি ধরতে বেরিয়েছিলেন? নাকি অর্কিডের খোঁজে?
নাহ্! জুতোর খোঁজে।
আপনি কি ভেবেছেন চোর আপনাকে জুতো ফেরত দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে?
কতকটা তা-ই। তবে এভাবে ফেরত দেবে ভাবিনি।
কীভাবে?
জুতো মেরে।
হ্যাঁ। জুতো মারা আর কাকে বলে? ছ' পাটি ছেঁড়া পামশু আমাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারা। একপাটি আমার টাকেই পড়তে যাচ্ছিল। মাথা না সরালে পেরেকে রক্তারক্তি হয়ে যেত। সোল ওপড়ালে সব জুতোরই পেরেক বেরিয়ে থাকে। কপাল জোরে বেঁচেছি বুঝলে জয়ন্ত।
সর্বনাশ!
একটা নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে মুখ তুলেছি, অমনই টুপিটা—

—পড়ে গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে জুতো ছুড়েছে।
ঠকাস!
ক-ক্কী!
সোল ওপড়ানো পেরেক বেরোনো জুতো!
সোল ওপড়ানো জুতো? তাহলে কি পাঁচুগোপালবাবুর জুতোর সোলের ভিতর কিছু লুকনো ছিল?
সেই জুতো যদি সেকালের এক জমিদারবাড়ির ট্রেজারারের পৌত্রের হয়।
সেলাম সাব। চায়।
রামহরি! তুমি তো এখানকার লোক।
রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর বাড়িতে কে-কে আছেন তুমি নিশ্চই বলতে পারবে?
ঠাকুরমশাইয়ের তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে নেই। শুধু গিন্নিঠাকরুন আছেন। ঠাকুরমশাই তো বাতের ব্যথায় বিছানায়।
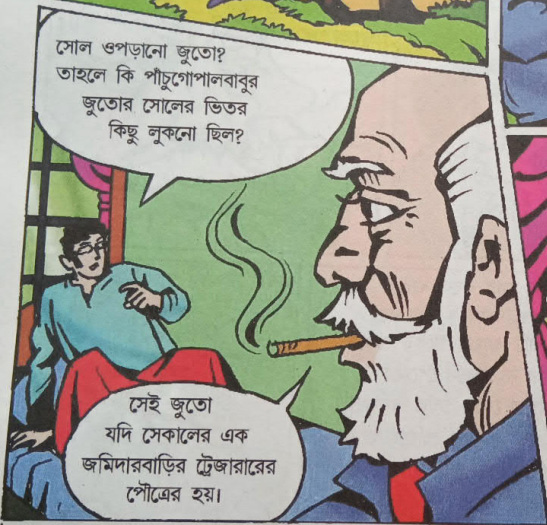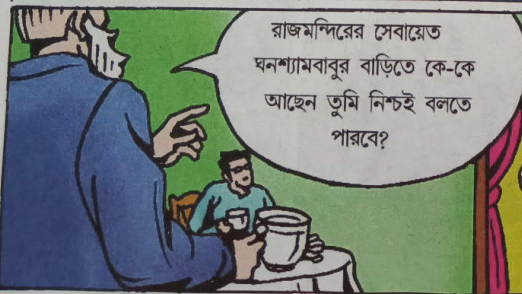
ঠাকুরমশাইয়ের কোনোভাই বা জ্ঞাতি নেই?
এক ভাই ছিল। বনিবনা হত না। সে প্রায় তিন-চার বছর আগের কথা স্যার। শুনেছি চুরি-ডাকাতি করে সে এখন জেলে। সেই নিয়েই তো দাদার সঙ্গে ঝগড়া।
ঠিক আছে। তুমি এসো রামহরি।
!!
চলো জয়ন্ত। ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি যাই।
সেইমতো
টিং টিং
আর যাওয়া যাবে না স্যার। এখান থেকে হেঁটে চলে যান।
কেন হে? ভূতের ভয়ে নাকি?
?!!

ঠাট্টাতামাশার কথা নয় স্যার! এ তল্লাটে দিনদুপুরে কেউ পা বাড়ায় না। যাচ্ছেন যান। সাবধানে যাবেন।
বলে কী!
বোঝো!
ওটাই সেবায়েতের বাড়ি মনে হচ্ছে।
এ তো ধ্বংসস্তূপ!
ঠাকুরমশাই— ঠাকুরমশাই আছেন নাকি?
?!
ক্যাঁ-চ!
কোত্থেকে আসছেন আপনারা?
কলকাতা থেকে আসছি। কয়েকটা কথা বলেই চলে যাব আমরা।
কিন্তু উনি তো অসুস্থ।
না,
আপ
সাধু

না, কথাটা আপনার সঙ্গে। আপনি কি ঠাকুরবাড়িতে সাধুবাবার আসরে যেতেন?
আপনারা কি পুলিশের লোক?
আমার কথার জবাব দিলে খুশি হব। সত্যি না বললে কিন্তু ঝামেলায় পড়বেন।
আমরা তো কারও কোনো ক্ষতি করিনি বাবা।
আপনি কি সাধুবাবার আসরে যেতেন?
একদিন গেছিলাম।
শুক্রবার সন্ধেয়? তাড়াতাড়ি বলুন।
সবাই চলে যাওয়ার পর আপনি কি সাধুবাবার সঙ্গে চুপিচুপি দেখা করেছিলেন? চুপ করে থাকবেন না।
হ্যাঁ। করেছিলাম।
তার সাথে দেখা করেছিলেন কেন? বলুন। তা না হলে ঝামেলায় পড়বেন কিন্তু।
বলে দাও না। এত ভয় কিসের? ভূতো নিজের পাপের শাস্তি পেয়েছে।
?!!

একদিন-না-একদিন সে খুন হতই। হয়েছে। পুলিশকে বলে দাও সব কথা।

?!!!

ঠাকুর্দার সিন্দুকের তলায় লুকনো ছিল স্যার। ঠাকুর্দার জুতোই মনে হচ্ছে।
কী বিচ্ছিরি গন্ধ!
এবার আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। রাজবাড়ির ওদিকটায় এতক্ষনে ঘন অন্ধকার। আপনি সেখানে গিয়ে এই গানটা গাইবেন।
গান!!
গা-গান! ওরেবাবা! আমি তো স্যার গান গাইতে পারি না।
দেরি করবেন না পাঁচুগোপালবাবু। জলদি জলদি মুখস্থ করে নিন।
অ্যাঁ! হ্যাঁ—
চেষ্টা করবেন। নিন মুখস্থ করুন। 'চলে আয় ওরে ভূতো- পায়ে দিবি রাঙা জুতো।'
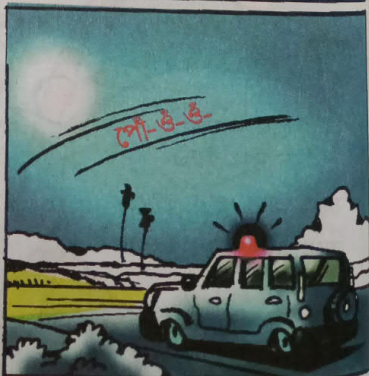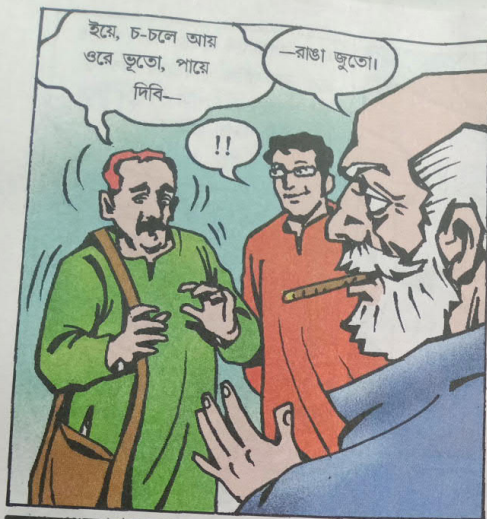
ইয়ে, চ-চলে আয় ওরে ভূতো, পায়ে দিবি—
—রাঙা জুতো।
!!
কিন্তু গা-গান গাইতে হবে কেন স্যার?
আপনার জুতো চোর সেই ভূতটাকে ধরতে হবে না? তিন-তিনজোড়া জুতো চুরি করেছে সে।
তখনই-
বডি পাওয়া গেছে কর্নেলসায়েব। শকুনে প্রায় সাবাড় করেছে। তবে স্কেলিটনটা আছে। বেশি দূরে ভেসে যায়নি। কিছু দূরে একটা খাঁড়িতে ভাসছিল। মুণ্ডকাটা বডি।
সাধুবাবার বডি?
না! আপনার ভুলোর।
হায়, হায়! আমার ভুলোকে কে মারল?
ভূতো! আপনার ঠাকুর্দার জুতোজোড়া নিন। চলুন ভূতোকে ফাঁদে ফেলা যাক।
পোঁ-ঔ-ঔ-

ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। ঢিবির আড়াল থেকে কর্নেল চাপাস্বরে বললেন-
জোরে গানটা শুরু করুন।
চলে আয় ওরে ভূতো, পায়ে দিবি রাঙা জুতো—
চলে আয় ওরে ভূতো... পায়ে দিবি রাঙা জুতো—
কালো অন্ধকার ফুঁড়ে ভেসে উঠল এক ছায়ামূর্তি..
জুঁতো এঁনেছিস? দেঁ! দেঁ!
ওরেবাবা! ভূ-উ-উ-ত!
?!!
চারিদিক থেকে টর্চের আলো জ্বলে উঠল-
এক পা-ও নড়বে না ভূতনাথ! চারিদিক পুলিশ ঘিরে রেখেছে।
অ্যাঁ!! প-পুলিশ!
ভু-ভু-ভু-
ছদ্মবেশী সাধুবাবাকে চিনতে পারছেন পাঁচুগোপালবাবু?
এ তো দেখছি- ভূতনাথ!
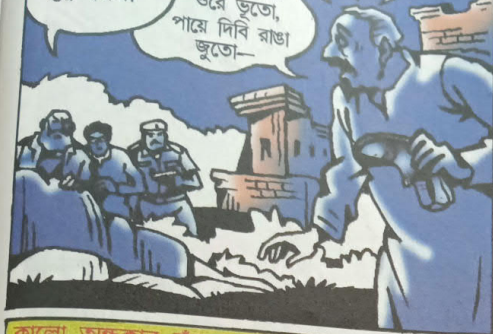
ঠিক। রাজমন্দিরের সেবায়েত ঘনশ্যামবাবুর ভাই ভূতনাথ। আপনার ভুলোর মুন্ডু কেটে রক্ত ছড়িয়ে আত্মগোপন করেছিল। আপনার ঠাকুর্দার দু'পাটি জুতোর সোলের ভেতর লুকিয়ে রাখা দশটা সোনার মোহরের খবর ভূতনাথ পেয়েছিল আপনার দিদির কাছে। মুখ ফসকে বলে ফেলায়, পরে দিদি বুদ্ধি করে বলেছিলেন, সেই মোহর জুতোর সোলে লুকনো আছে। আপনি রিটায়ার করে বাড়ি ফেরার পর তাই সে আপনার জুতো চুরির ধান্দা করেছিল। যাই হোক, চলুন, বাংলোয় ফেরা যাক।
বোঝো! এই সবের পেছনে ভূতনাথ!
জব্বর কাজ কর্নেল!
সমাপ্ত

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মরূদ্যানে শয়তান

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

আবুধাবি এয়ারপোর্টের বাইরে পা রাখতেই শহরটার জৌলুশ দেখে সুদীপ্তর চোখ ধাঁধিয়ে যাবার উপক্রম হল। চারদিকেই শহরটার বুকে দাঁড়িয়ে আছে অত্যাধুনিক সব গগনচুম্বী বহুতল। পেট্রো ডলারের দম্ভে সত্যিই যেন সমুদ্র উপকূলবর্তী এই মরু শহর আকাশকে ছুঁতে চাইছে। পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে একের পর এক বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ডের বহুমূল্য গাড়ি, যা নগরবাসীর বৈভবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পৃথিবীর যে-কোনো প্রসিদ্ধ শহরের মতোই নানান ধরনের মানুষের ভিড় আবুধাবি এয়ারপোর্ট চত্বরে। তার মধ্যে যেমন আছে নিখুঁত ইওরোপিয়ান পোশাক পরা মানুষরা, তেমনই আছে ধবধবে সাদা আলখাল্লা ও মাথায় কালো ব্যান্ড লাগানো হেড স্কার্ফ পরা আরবরা। পার্কিং লটের কাছেই একটা ফোয়ারা-সমৃদ্ধ উন্মুক্ত স্থানে আরব এমিরেটসের পতাকা উড়ছে। সেখানেই সুদীপ্তকে দাঁড়াতে বলেছেন হেরম্যান। তাই সে জায়গা চোখে পড়া মাত্রই নিজের ট্রলিব্যাগটা টানতে টানতে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্ট, অর্থাৎ বিচিত্র গল্পকথার প্রাণীর অন্বেষক, জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী হেরম্যান গত একযুগ ধরে পৃথিবীর যে প্রান্তেই অভিযানে যান না কেন, সুদীপ্তকে সঙ্গে নিয়েই সে দেশে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু এই প্রথম এ ঘটনার ব্যতিক্রম ঘটল। তিনদিন আগেই হেরম্যান এসে উপস্থিত হয়েছেন এই সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। ভিসা প্রাপ্তির সমস্যার কারণে সুদীপ্ত তাঁর সাথে একই দিনে এখানে এসে উপস্থিত হতে পারেনি; সে এসে হাজির হল আজ তিনদিন পর। হেরম্যান তাকে নিতে আসবেন। তবে ঠিক কী কারণে হেরম্যান এখানে এসেছেন তা ই-মেল, হোয়াটস্-অ্যাপ বা টেলিফোন মারফত যতটুকু কথাবার্তা হয়েছে দুজনের মধ্যে, তাতে তা তিনি খোলসা করে জানাননি। কারণ, যতক্ষণ না তাঁর অভিযান শুরু হচ্ছে ততক্ষণ আসল কারণ সম্পর্কে রহস্যময়তা জিইয়ে রাখতে পছন্দ করেন সুদীপ্তর কাছে। তিনি শুধু জানিয়েছেন তাঁর একদা সহপাঠী বর্তমানে হলিউড অভিনেতা ধনকুবের মার্লিন ক্রোর অনুরোধে তিনি এক মরূদ্যানে ক্রো-এর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে এসেছেন। তবে সুদীপ্ত বিগত বারো-চোদ্দো বছর ধরে হেরম্যানের সফরসঙ্গী হিসাবে তাঁকে যতটুকু চেনে তাতে হেরম্যানকে তার কোনোদিন নিতান্তই ছুটি কাটাবার জন্য কোথাও যাবার লোক বলে মনে হয়নি। তাই সুদীপ্তর অনুমান, হেরম্যানের এই আমিরশাহি সফরের পিছনেও নির্দিষ্ট কোনো কারণ লুকিয়ে আছে এবং তা ক্রিপ্টোজ্যুলজি সংক্রান্ত।

পতাকাদণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে সুদীপ্ত চারপাশে তাকিয়ে হেরম্যানের খোঁজ করতে লাগল। অবশ্য তাকে খুব বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ধবধবে সাদা আলখাল্লা আর মাথায় ব্যান্ড লাগানো আরোবিয়ান স্কার্ফ বাঁধা এক দীর্ঘদেহী আরব এসে দাঁড়াল তার সামনে। লোকটার চোখে কালো সানগ্লাস, পাগড়ি বা স্কার্ফের কাপড় দিয়ে লোকটার মুখমণ্ডল এমনভাবে আবৃত যে মুখের চামড়ার কোনো অংশ দেখা যাচ্ছে না। লোকটা সুদীপ্তর মুখোমুখি এসে এমন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে রইল যে বেশ অস্বস্তিবোধ হল সুদীপ্তর। কথা বলছে না লোকটা! তাই বাধ্য হয়েই সুদীপ্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাউকে খুঁজছেন?'

প্রশ্ন শুনেও নিরুত্তর রইল লোকটা।

সুদীপ্ত আবারও প্রশ্ন করল, 'আপনি আমাকে কিছু বলতে চান?'

এবার লোকটা প্রথমে ধীরে ধীরে তার চশমাটা খুলল। তারপর মুখের স্কার্ফটা সরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সুদীপ্ত। হেরম্যান সুদীপ্তর হাত দুটো জড়িয়ে ধরলেন। সেবার শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার পর আবার এক বছর পর তাদের দুজনের সাক্ষাৎ হচ্ছে। তাই আবেগমথিতভাবে সুদীপ্তও বেশ কয়েক মুহূর্ত হেরম্যানের হাত দুটো চেপে ধরে থাকার পর তাঁকে বলল, 'একেবারে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন! আপনি যে এ পোশাকে আমার সামনে আবির্ভূত হবেন তা ভাবিনি!'

হেরম্যান কথাটা শুনে বললেন, 'মরু অঞ্চলে এ পোশাক দাবদাহ থেকে বাঁচতে বেশ আরামদায়ক। তাই পরেছি। তোমার জন্যও একটা কিনে রেখেছি। পরে দেখো। তোমার আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?' হেরম্যানের কণ্ঠস্বর বেশ ভাঙা ভাঙা। সুদীপ্ত বলল, 'না, কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু আপনার গলা এমন বিচ্ছিরিভাবে ভাঙল কীভাবে?'

হেরম্যান ভাঙা গলায় জবাব দিলেন, 'বলতে পারো এটা আমার বোকামির ফল। গরমের দেশে পা রেখেই এ দেশের পরিবেশের সঙ্গে শরীরটাকে খাপ খাওয়ানোর সুযোগ না দিয়ে আমি লোভে পড়ে বরফ মেশানো তরমুজের শরবত খেয়ে ফেলেছিলাম গলা ভেজাতে। ব্যাস, সেই যে গলা ভাঙল তা তিনদিনেও ঠিক হল না।'

এ কথা বলার পর হেরম্যান বললেন, 'চলো এবার, রোদ ক্রমশ বাড়ছে। মরুভূমিতে লু প্রবাহিত হবার আগেই আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানো দরকার। দেখছ, এখন সবেমাত্র সকাল ন-টা, তার মধ্যেই শহরের বাতাস কেমন গরম হতে শুরু করেছে! আর মরুভূমির মধ্যে তো আরো গরম।'

সুদীপ্ত কথা না বাড়িয়ে অনুসরণ করল হেরম্যানকে।

পার্কিং লটেই রাখা বড়ো খাঁজকাটা চাকাঅলা একটা ল্যান্ডরোভার গাড়ির কাছে গিয়ে তার দরজা খুলে সুদীপ্তর ট্রলিটা গাড়ির পিছনের সিটে রেখে হেরম্যান বললেন, 'এবার উঠে পড়ো।'

হেরম্যান নিজে এরপর উঠে বসলেন চালকের আসনে আর তাঁর নির্দেশ পালন করে সুদীপ্ত উঠে পড়ল তাঁর পাশের আসনে।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সুদীপ্ত তাঁকে প্রশ্ন করল, 'আপনি একাই চালিয়ে আনলেন গাড়ি? দু-দিনেই মরুভূমির পথ চিনে ফেললেন?'

হেরম্যান ভাঙা গলায় হেসে বললেন, 'না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। আমার সামনে ড্যাশবোর্ডের গায়ে যে স্ক্রিনগুলো দেখছ তার মধ্যে একটা আমাদের যাত্রাপথ নির্দেশ করবে। গন্তব্য আগাম সেট করে রাখতে হয় এর সফট্ওয়ারে। গাড়ি তোমাকে তোমার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। সাধারণত আমরা রাস্তা বলতে যা বুঝি, মরুভূমিতে তা অনেক জায়গাতে নেই বললেই চলে। এখন তোমার চোখের সামনে শুধু বালি আর বালি। এক একসময় মরুঝড় এমন হয় যে সূর্য ঢেকে যায়, সে অবস্থায় তুমি উত্তর না দক্ষিণে এগোচ্ছ তা পর্যন্ত বুঝতে পারবে না। এখন এই অত্যাধুনিক গাড়ির সফ্টওয়ার প্রযুক্তিই তোমার ভরসা। সে তোমাকে ঠিক তোমার ঠিকানায় পৌঁছে দেবে।'

একথা বলে হেরম্যান গাড়ি নিয়ে এগোলেন এয়ারপোর্ট চত্বর ছেড়ে বাইরে যাবার জন্য। দু-মিনিটের মধ্যেই বাইরে বেরিয়ে পড়ল সুদীপ্তরা।

শহরের রাস্তা বেশ ঝাঁ-চকচকে। দামি গাড়ি ছুটে চলেছে সারবদ্ধ ভাবে নিজেদের লেন ধরে। পথের দু-পাশে কাচে ঢাকা বহুতল শপিংমল, আকাশছোঁয়া নানান ধরনের বিল্ডিং। তার মাঝখান থেকে কোথাও কোথাও উঁকি দিচ্ছে সাবেক আরব স্থাপত্যে নির্মিত শ্বেতপাথরের তৈরি মসজিদ-মিনার। ফুটপাতেও প্রচুর লোকজন যাওয়া-আসা করছে। গাড়ি চালাতে চালাতে হেরম্যান বললেন, 'তুমি হয়তো জানো যে সাতটি মরুরাজ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এই আরব আমিরশাহি। তাদের সম্মিলিত রাজধানী হল এই আবুধাবি আর প্রধান বাণিজ্য নগরী হল দুবাই।'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, বইতে পড়েছি। আবুধাবি আর দুবাই ছাড়া

আরব এমিরেটসের আরও একটা রাজ্যের নাম আমি ক্রিকেট ভক্ত হিসাবে জানি। সেটা হল শারজা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম আছে সেখানে।' হেরম্যান বললেন, 'বাকি চারটে রাজ্য হল, আজমান, আল ফুজাইরাহ, আল খাসাইহ ও আল কাইওয়াইন। প্রত্যেক রাজ্যের শাসনকর্তা হলেন একজন আমির। তাই তাঁদের সম্মিলিত দেশের নাম, আমিরশাহি। আবুধাবির আমির রাষ্ট্রপ্রধান হলেও প্রত্যেক রাজ্যের আমিরকে স্বাধীন রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। নিজ রাজ্যে তাঁদের স্বাধীন আইনকানুন পরিচালিত হয়। বাইরের লোকের চোখে এখানকার সব কিছুকে একইরকম মনে হলেও স্থান প্রভেদে বিভিন্ন আমির রাজ্যে আইনকানুন, সংস্কৃতিগত নানা পার্থক্য আছে।'

হেরম্যানের কথা শুনে সুদীপ্ত বুঝতে পারল প্রত্যেকবারের মতোই হেরম্যান কোনো নতুন জায়গায় আসার আগে যেমন সে জায়গা সম্পর্কে পড়াশোনা করে আসেন তেমনই এ জায়গা সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করে এসেছেন। এ শহরে আগে কোনোদিন সুদীপ্ত আসেনি। তাই সে দু-পাশ দেখতে দেখতে চলল।

আধঘণ্টা চলার পর শহরের বাইরে এসে পড়ল গাড়ি। মসৃণ হাইওয়ে সোজা এগিয়েছে সামনের দিকে। পথের দু-পাশে বাড়ি-ঘরের সংখ্যা কম। উন্মুক্ত জমির পরিমাণই বেশি।

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'আমাদের কত সময় লাগবে সেই মরূদ্যানে পৌঁছোতে?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তিন থেকে চার ঘণ্টার মতো। আমরা সোজা পূর্বদিকে যাব।'

হাইওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করল গাড়ি। গাড়ির স্পিড মিটারের কাঁটা মাঝে মাঝেই একশোর ওপরে উঠে যাচ্ছে। জনবসতির চিহ্ন যেন ক্রমশই মুছে যাচ্ছে চারপাশ থেকে, আর মাটির রংও যেন ক্রমশ সাদা বর্ণ ধারণ করছে। ঘণ্টাখানেক চলার পর সুদীপ্তরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছোল যে তাদের সামনে শুধু বালি আর বালি! তার বুক চিরেই এগিয়েছে পিচের রাস্তা। ইতিমধ্যে হেরম্যানের সঙ্গে বেশ কয়েকটা মরু অঞ্চলে অভিযানে গেছে সুদীপ্ত। কিন্তু সে সব মরুভূমি অঞ্চলের সঙ্গে এ মরুভূমির পার্থক্য হল, সেসব মরু অঞ্চলের মতো এখানকার বালির রং সোনালি বা হলদেটে নয়, ধবধবে সাদা। কেউ যেন একটা সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে চারপাশে। মরুভূমিতে প্রবেশ করার পর উল্টোদিক থেকে আসা যাত্রীবাহী প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা কমে আসতে লাগল, চোখে পড়তে লাগল শুধু তেলের ট্যাঙ্কার অথবা খনন ইত্যাদি যান্ত্রিক কাজে নিয়োজিত ভারী গাড়ি। তবে পথের পাশে নতুন একটা জিনিস চোখে পড়তে লাগল তা হল ছোটো-বড়ো উটের সারি বা কাফেলা। যে সব মানুষরা উটগুলোতে বসে আছে তাদের পোশাকের মলিনতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা মরু অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষ। হেরম্যান বললেন, 'মরুভূমির যত গভীরে যাবে তত দেখবে সেখানকার মানুষদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে উট। শুধু পরিবহনের জন্যই নয়, তারা উটের দুধ খায়, মাংস খায়, চামড়া দিয়ে তাঁবু এমনকি পোশাকও বানায়, মনোরঞ্জনের জন্য উটের দৌড়ও করানো হয়। এমন কষ্টসহিষ্ণু উপকারী প্রাণী মনে হয় পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।'

ঘণ্টা দুই পিচরাস্তা ধরে চলার পর হঠাৎই রাস্তা শেষ হয়ে গেল। রাস্তার পাশে একটা বিরাট সাইনবোর্ড রয়েছে। আরবি আর ইংরাজিতে তাতে যা লেখা আছে তার মূল বক্তব্য হল, 'আপনারা এবার আল দাহির মরু অঞ্চলে প্রবেশ করতে চলেছেন। কোনো নির্দিষ্ট পথ মরুভূমির মধ্যে না থাকায় এ মরুভূমিতে প্রবেশ করতে হলে সঙ্গে গাইড বা পথপ্রদর্শক থাকা প্রয়োজন। নইলে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটকদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে তাঁরা যেন মরু অঞ্চলে বসবাসকারী যাযাবর ও অন্যান্য উপজাতিদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন।' এ ছাড়া যারা মরুভূমিতে প্রবেশ করতে চলেছে তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল ও খাদ্যদ্রব্য রাখার পরামর্শও লেখা রয়েছে সাইনবোর্ডে।

যেখানে সাইনবোর্ডটা রয়েছে সেখানে একটা ছোটো ঘরের মতো চেকপোস্ট রয়েছে, কয়েকটা উটও রয়েছে। সুদীপ্তদের গাড়িটা সেখানে উপস্থিত হতেই আলখাল্লা পরা, কাঁধে অস্ত্রধারী দুজন লোক সেই চেকপোস্ট থেকে বেরিয়ে এসে গাড়ি গতিরোধ করে জানতে চাইল তারা কোথায় যাচ্ছে? সঙ্গে গাইড আছে কি না?

হেরম্যান জবাব দিলেন, তাঁদের গন্তব্য হল আল হামাম মরূদ্যান। সেখান থেকেই তিনি সকালে আবুধাবিতে গেছিলেন, এখন ফিরছেন।

মরুভূমির সরকারি রক্ষীরা এরপর আর তাদের পথ আটকাল না। রাস্তাহীন আল দাহির মরুভূমিতে নেমে পড়ল সুদীপ্তদের ল্যান্ডরোভার। গাড়ি এবার নিজেই পথ চিনে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

২

মরুভূমিতে প্রবেশ করার পর মাঝে মাঝে মানুষের যাওয়া-আসার চিহ্নস্বরূপ কিছু গাড়ির চাকার দাগ দেখা যাচ্ছিল, তারপর সেসবও মিলিয়ে গেল। চারপাশে শুধু দিকচিহ্নহীন ধু ধু বালু সমুদ্র। সূর্য ঠিক মাথার ওপর। সুদীপ্ত একবার কয়েক মুহূর্তের জন্য জানলার কাচটা নামাতেই গরম বাতাস প্রবেশ করল গাড়ির ভিতর। তাতে বাইরের তাপমাত্রাটা মোটামুটি অনুমান করতে পারল। হেরম্যানের দৃষ্টি সামনের বালু সমুদ্রের দিকে। নিশ্চুপ ভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি। সুদীপ্ত একসময় বলল, 'আপনার বন্ধু মার্লিন ক্রো পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে এই মরুভূমির মধ্যে সম্পত্তি কিনতে গেলেন কেন?'

প্রশ্ন শুনে হেরম্যানের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'ধনকুবের অভিনেতা। খেলোয়াড় ইত্যাদি সেলিব্রিটিদের নানান অদ্ভুত খেয়াল থাকে। তাঁরা কেউ দ্বীপ কেনেন, কেউ আন্টার্টিকায় জমি কেনেন, আবার কেউ বা মরূদ্যান কেনেন। আসলে এগুলো তাঁদের কাছে এক ধরনের স্ট্যাটাস সিম্বল। আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা শুধু মরূদ্যান নয়, তার একটা অন্য বিশেষত্ব আছে। তুমি সেখানে গেলেই ব্যাপারটা দেখতে পাবে।'

সুদীপ্ত এরপর কথাটা বলেই ফেলল, 'আমার তো মনে হয় না যে নিছক ছুটি কাটাবার জন্য আপনি এখানে ছুটে এসেছেন। আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

রহস্য জিইয়ে রেখে হেরম্যান বললেন, 'আগে ওখানে চলোই না, তারপর ধীরেসুস্থে সব জানতে পারবে।'

এগিয়ে চলল গাড়ি। একসময় চারপাশে ছোটো-বড়ো বালির টিলা শুরু হল। হেরম্যান বললেন, এই টিলাগুলো সৃষ্টির কারণ বালুঝড়। টিলাগুলোর ঢালের সংকীর্ণ ফাঁক গলে দুলতে-দুলতে, এপাশ-ওপাশে কাত হতে হতে এগিয়ে চলল ল্যান্ডরোভার। একসময় সুদীপ্তর চোখে পড়ল একটা বালুস্তূপের ঢালের নীচে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন উটচালক। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'এখানে আমাদের গাড়ি ছাড়তে হবে। বাকি রাস্তাটা উটের পিঠে যেতে হবে। কারণ সামনে বেশ কয়েকটা বালিয়াড়ি আছে। তাদের ঢালের বালিগুলো অত্যন্ত ঝুরঝুরে। গাড়ি সেখানে উঠতে গেলে উল্টে পড়ার সম্ভাবনা। তবে উটের পিঠে পথ বেশি নয়, মাইল পাঁচেকের মতো হবে। আসার সময়ও পথটা আমি উটের পিঠেই এসেছি। ক্রো সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে।'

লোকগুলোর কাছে গিয়ে থামল ল্যান্ডরোভার। জনা সাতেক উটবাহক। তাদের আপাদ-মস্তক আলখাল্লা আর স্কার্ফে মোড়া। হেরম্যান আর সুদীপ্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। বাইরে নামতেই গরমের হলকা টের পেল সুদীপ্ত। হেরম্যান তাঁর পোশাকের ভিতর থেকে একটা আরবি স্কার্ফ বের করে সেটা সুদীপ্তকে দিয়ে বললেন, 'এটা দিয়ে মুখ, নাক ঢেকে নাও, নইলে ঝলসে যাবে।'

হেরম্যানের নির্দেশ মতোই কাজ করল সুদীপ্ত।

উটচালকরা সুদীপ্তদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারা গাড়ি থেকে নামতেই কয়েকজন লোক দুটো উটের লাগাম টানতে টানতে তাদের কাছে এনে মাটিতে বসাল। সুদীপ্তর ট্রলিব্যাগটা গাড়ি থেকে নামিয়ে একটা উটের গায়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চালকসমেত দুটো উটের পিঠে উঠে বসলেন হেরম্যান আর সুদীপ্ত। তাঁদের দুটো উট, সঙ্গে আরও দুটো উট যাত্রা শুরু করল আল হামাম মরূদ্যানের উদ্দেশে।

চারপাশে শুধু বালির পাহাড়। মাথার ওপর গনগনে রোদ। সেই অনুচ্চ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কখনো ওপরে ওঠা আবার কখনো নীচে নামা। এভাবে ঘণ্টাখানেক সময় চলার পর একটা বালিস্তূপের মাথায় ওঠার পর হেরম্যান আঙুল তুলে সামনের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে আমরা এসে গেছি।'

সুদীপ্ত বালিয়াড়ির মাথা থেকে তাকিয়ে দেখল মরুভূমির সামনেটা যতদূর চোখ যায় বরাবর সমতল। আর কিছুদূরে তার মধ্যে চোখে পড়ছে খেজুরকুঞ্জ। ওয়েসিস! মরূদ্যান!

সুদীপ্ত ইতিমধ্যে হেরম্যানের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আফ্রিকা ও অন্য অঞ্চলের মরুভূমিতে গেলেও আগে কোনোদিন সে মরূদ্যানে যায়নি। তাই দূর থেকে জায়গাটা দেখেই বেশ পুলকিতবোধ করল সে। বালিয়াড়ির ঢাল বেয়ে নেমে উটের সারি সোজা এগোল সেই মরূদ্যানের দিকে। ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল সেই খেজুরকুঞ্জ।

তাদের গন্তব্য আল হামাম মরূদ্যানে পৌঁছে গেল সুদীপ্তরা। এ মরূদ্যান মাঝারি আকৃতির। দশ-বারোটা খেজুর গাছ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বিঘেখানেক মনে হয় জায়গাটার পরিধি। তবে তার চারপাশটা বেশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। উটের পিঠ থেকে মরূদ্যানের ভিতর ইসলামিক স্থাপত্যে নির্মিত একটা বাড়ির ছাদের অংশও সুদীপ্তর চোখে পড়ল। গম্বুজ আকৃতির ছাদ।

প্রাচীরের গায়ে লোহার পাত বসানো কাঠের তৈরি বিশাল একটা গেট আছে। তার সামনে উটের পিঠ থেকে নামানো হল হেরম্যান আর সুদীপ্তকে। গেটের গায়ে একটা পকেট গেট আছে। বাইরে সুদীপ্তদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটা লোক সেই গেট খুলে বাইরে উঁকি দিল। তারপর হেরম্যানকে দেখে তাদের ভিতরে আসার জন্য ইশারা করল। সেই পকেট গেট দিয়ে প্রথমে হেরম্যান আর তাঁর পিছন পিছন ট্রলিব্যাগ হাতে সুদীপ্ত মরূদ্যানে পা রাখল। প্রাচীর ঘেরা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা বেশ বড়ো পাথরের তৈরি বাড়ি। আর খেজুর গাছগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটাকে ঘিরে। ভিতরে ঢুকে দু-পা এগোতেই একটা ছোটো ডোবার মতো জায়গা চোখে পড়ল সুদীপ্তর। তার চারপাশটা কাঁটাতারের ফেনসিং দিয়ে ঘেরা। সেটা দেখিয়ে হেরম্যান বললেন, 'এই জলাশয়ে একসময় স্নান করত পথিকরা। তাই এই মরূদ্যানের নাম আল হামাম বা স্নানের জায়গা।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'বাড়িটা এখানে কে বানিয়েছিল?'

সুদীপ্তকে নিয়ে সোজা বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে হেরম্যান বললেন, 'কোনো এক আরব শেখ প্রথমে প্রমোদ ভবন হিসাবে এ বাড়িটা এখানে বানিয়েছিলেন।' বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎই একটা শব্দ শুনে চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদীপ্ত। কাছেই একটা খেজুর গাছের নীচে একটা পাথরের তৈরি ঘরের মতো ছাদঅলা জায়গা। যে ঘরের সামনের অংশটা দেওয়ালের পরিবর্তে জাল দিয়ে ঘেরা। আর তার মধ্যে পায়চারি করছে একটা পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ! সুদীপ্তকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে বাঘটাও দাঁড়িয়ে পড়ে সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে চাপা গড়গড় শব্দ করল। যেন সে বলল, সাবধান! ধনকুবের আমির বা আরব শেখেরা অনেকে বাঘ বা সিংহ পোষেন তা ছবিতে দেখেছে সুদীপ্ত। চিতাবাঘটাকে দেখে সে বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, 'এই বাঘটাও আপনার বন্ধুর সম্পত্তি নাকি?'

হেরম্যান হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

এরপর তিনি সুদীপ্তকে নিয়ে প্রবেশ করলেন গম্বুজের মতো ছাদ আর সামনে বারান্দা ঘেরা সেই বাড়ির ভিতর।

বাড়ির ভিতরটা কিন্তু আশ্চর্যরকম ঠান্ডা। এ বাড়িটা যে মরুভূমির মধ্যে অবস্থান করছে তা বোঝাই যায় না! বাড়িটার মাথায় গম্বুজ থাকার জন্য, গঠনগত কোনো কৌশলের কারণেই এই শীতলতা। হেরম্যান বারান্দা পেরিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকলেন সুদীপ্তকে নিয়ে। মাঝারি আকৃতির ঘর, একটাই মাত্র জানলা। তার বাইরে কিছুটা তফাতে একটা খেজুর গাছের গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে। ঘরের মেঝেতে পুরু কার্পেট, খাট, বিছানা, চেয়ার-টেবিল সবই আছে সে ঘরে। এ ঘর সংলগ্ন একটা ছোটো ঘরও আছে। সেটা স্নানঘর। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'এটা তোমার শোবার ঘর। বাথরুমে কাঠের পিপেতে জল ভরা আছে। ফ্রেশ হয়ে নাও। একটু পরই খাবার আসবে।'

এযাবৎকাল সুদীপ্ত, হেরম্যানের সঙ্গে যত অভিযানে গেছে তাতে তারা সাধারণত একটা রুম শেয়ার করেছে। এতে তাদের আলাপ-আলোচনার সুবিধা হয়। এবার তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা দেখে সুদীপ্ত মৃদু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনার থাকার ব্যবস্থা?'

হেরম্যান বললেন, 'ক্রো-র ঘরের পাশে ছোটো একটা ঘরে। আসলে পুরোনো সহপাঠীর সঙ্গে বেশ কয়েক দশক পর দেখা তো, তাই রাতে আড্ডা দেবার জন্য ও নিজের ঘরের পাশেই আমার শোবার ব্যবস্থা করেছে।'—এ কথার পর হেরম্যান বললেন, 'আমি এখন যাচ্ছি। বিকালে তোমার সঙ্গে ক্রো-এর পরিচয় করিয়ে দেব।'

হেরম্যান চলে যাবার পর সুদীপ্ত স্নান সেরে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক খাবার দিয়ে গেল। গরম রুটি, কয়েক ধরনের সবজি আর মাংসের একটা পদ। লোকটাকে দেখে সুদীপ্তর মনে হল যেন এ লোকটাই সদর দরজা খুলে দিয়েছিল। খাওয়া সেরে দরজা বন্ধ করে সুদীপ্ত শুয়ে পড়ল।

৩

সুদীপ্তর যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। বাইরে রোদের তেজ কিছুটা হলেও কমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজাতে টোকা পড়ল। সুদীপ্ত দরজা খুলল। কফি আর কুকিজ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে দুপুরে যে খাবার দিয়ে গেছিল সে। তার পাগড়ির রং দেখে তাকে চিনতে পারল সুদীপ্ত। তবে লোকটার মুখের ঢাকাটা এখন খোলা। তার মুখ দেখে তাকে মাঝবয়সি একজন আরব বলেই মনে হল সুদীপ্তর।

ধীরে-সুস্থে কফি পান করে পোশাক পরিবর্তন করতে করতেই ছ-টা বেজে গেল। আর এরপরই হেরম্যান এসে হাজির হলেন। হাতে একটা প্যাকেট। সেটা তিনি সুদীপ্তর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এর মধ্যে আরবি আলখাল্লা আর হেড স্কার্ফ আছে। তোমার জন্য কিনেছি, পোরো। আরাম পাবে।'

সুদীপ্ত পোশাকটা নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার পর হেরম্যান বললেন, 'চলো এবার, ক্রো তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

পোশাকের প্যাকেটটা ঘরে রেখে হেরম্যানকে অনুসরণ করল সুদীপ্ত। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল তারা দুজন। বাইরে এখন দুপুরের মতো গরম বাতাসের হলকা আর নেই। কয়েক-পা এগোতেই চিতাটার খাঁচার দিকে চোখ গেল তার। ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত দেখল বাঘটার গলাতে একটা কলারও পরানো আছে। অক্লান্তভাবে চিতাটা খাঁচার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে চলেছে।

খাঁচাটার পাশ কাটিয়ে আর একটু এগোতেই বিপরীত দিকে একটা খেজুর গাছের নীচে টেবিল-চেয়ার পাতা রয়েছে। সেখানে বসে আছেন একজন লোক। তাঁর পরনে অবশ্য জিন্স আর সাদা টি-শার্ট। গায়ের চামড়ার রং সাদা। হেরম্যানের সঙ্গে সুদীপ্ত তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তর দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি ক্রো। এই মরূদ্যানে আপনাকে স্বাগত জানাই।'

সুদীপ্ত করমর্দন করার সময় দেখতে পেল লোকটার ডান বাহুতে বেশ বড়ো একটা সিংহর ট্যাটু আঁকা আছে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্তর মনে হল লোকটার বয়স হেরম্যানের মতোই হবে এবং করমর্দনের সময় ক্রোয়ের হাত স্পর্শ করে সুদীপ্ত অনুমান করল লোকটা বেশ শক্তসমর্থও বটে। হয়তো বা লোকটা নিয়মিত শরীরচর্চাও করেন।

করমর্দনের পর তাঁর মুখোমুখি বসল সুদীপ্তরা। ক্রো, সুদীপ্তকে বললেন, 'আপনার এখানে থাকতে কোনো সমস্যা হবে না তো? হেরম্যানের সঙ্গে আমারও যাবার ইচ্ছা ছিল আপনাকে এয়ারপোর্ট থেকে রিসিভ করার জন্য। কিন্তু আমার এখন একমাত্র কর্মচারী আব্দুল। বাকি কর্মচারীদের আমি কাজ থেকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি। এ বাড়িটা লোকজনের অভাবে এখন ফাঁকা। তাই ইচ্ছা থাকলেও মরূদ্যান ছেড়ে আপনাকে আনতে যাওয়া সম্ভব হল না।'

সুদীপ্ত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'না, না, এখানে থাকতে আমার কোনো সমস্যাই হবে না। নতুন জায়গা। বেশ ভালোই লাগবে। তাছাড়া হেরম্যান জানেন, সব জায়গাতেই আমরা মানিয়ে নিতে পারি।'—কথাটা বলে সুদীপ্ত মৃদু হাসল।

হেরম্যানও হেসে ভাঙা গলায় বন্ধুর উদ্দেশে বললেন, 'হ্যাঁ, পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমি, সমুদ্র পাড়, কত বিচিত্র জায়গায় যে আমরা খোলা আকাশের নীচেও রাত কাটিয়েছি তা জানলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

ক্রো বললেন, 'জায়গা হিসাবে এই মরূদ্যানটাও কিন্তু মন্দ ছিল না। ছেড়ে যেতে হবে বলে আমার একটু খারাপই লাগছে।'

এ কথা বলে তিনি হেরম্যানকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার বন্ধুকে ব্যাপারটা জানিয়েছ কি?'

হেরম্যান বললেন, 'না, এখনও বলে ওঠা হয়নি।'

ক্রো এরপর সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা হল এই মরূদ্যানটা আমি এক শেখের কাছে বিক্রি করে দিতে চলেছি। আসলে বয়স আর কাজের চাপ দুটোই বাড়ছে। অতদূর থেকে আমার পক্ষে এখানে আসাটাও একটু অসুবিধা হচ্ছে। আর বোঝেনই তো বছরে অন্তত একবার দু-বার সম্পত্তি না দেখতে এলে কর্মচারীরা মালিকের অবর্তমানে জায়গাটাকে নিজেদের স্বার্থে নানাভাবে ব্যবহার করে। এখানে আমার কিছু পোষ্যও আছে। তাদেরও ভালোভাবে যত্নের প্রয়োজন। দুষ্প্রাপ্য প্রাণী সব। তাই সবদিক ভেবে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই মরূদ্যান এ দেশেরই একজনকে বিক্রি করে দেব। সাউথ আমেরিকার একটা দেশে একটা সবুজ পাহাড় দেখেছি। খুব সুন্দর জায়গা। আমার পক্ষে যাওয়া- আসারও সুবিধা হবে সেখানে। ভাবছি ওই পাহাড়টাই কিনব এবার অবসর সময় যাপনের জন্য।' একটানা কথাগুলো বলে কিছুটা দূরে চিতাবাঘের খাঁচার দিকে চেয়ে রইলেন মার্লিন ক্রো।

সুদীপ্ত মনে মনে তাঁর কথা শুনে ভাবল, এ সব মানুষের কত টাকা থাকলে তবে এঁরা এসব মরূদ্যান বা পাহাড় কিনতে পারেন!

সুদীপ্তও এরপর চিতাটার খাঁচার দিকে তাকিয়ে ক্রোকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার একটি পোষ্যকে তো দেখতে পাচ্ছি। বাকিরা কোথায়?'

ক্রো হেসে বললেন, 'আজ অন্ধকার নামতে তো আর বেশি

দেরি নেই। কাল সকালে আপনাকে তাদের দেখাব।' এই বলে হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে একটু রহস্যপূর্ণ হাসলেন ক্রো। আর হেরম্যানের ঠোঁটের কোণেও যেন একটা আবছা হাসি ফুটে উঠল। তা দেখে সুদীপ্তর মনে হল যে এখানে এমন কোনো একটা ব্যাপার আছে যা এই মুহূর্তে তার সামনে প্রকাশ করলেন না তাঁরা।

আব্দুল নামের লোকটা এসে টেবিলে লাল শরবত ভর্তি দুটো বড়ো গ্লাস নামিয়ে রাখল। ক্রো একটা গ্লাস তুলে নিয়ে অন্য গ্লাসটা সুদীপ্তকে দেখিয়ে বললেন, 'খেয়ে নিন, শরীর ঠান্ডা হবে। হেরম্যান ভয়ে আর তরমুজের রস মুখে দিচ্ছে না।'

সুদীপ্ত গ্লাসটা হাতে তুলল ঠিকই, কিন্তু এই রস পান করে যদি তার অবস্থাও হেরম্যানের মতো হয়, এ কথা ভেবে সে গ্লাসটা মুখে তোলার আগে একটু থমকে গেল। ব্যাপারটা অনুমান করে ক্রো সুদীপ্তকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'চুমুক দিন, ঠান্ডা হলেও শরবতটা গলা ভাঙার মতো ঠান্ডা নয়। তা ছাড়া হেরম্যান প্রচণ্ড রোদে ঘোরার পরই বরফ দেওয়া তরমুজের শরবত পান করেছিল। তাই গলাটা অমন ভেঙে গেছে।'

ক্রোর কথা শোনার পর সুদীপ্ত ধীরে ধীরে ক্রোয়ের মতোই তরমুজের শরবতে চুমুক দিতে লাগল। মৃদু-মন্দ মিষ্টি বাতাস বইছে মরূদ্যানে। তার বাইরে দূরের যে বালির টিলার মাথায় ওঠার পর আসার সময় হেরম্যান সুদীপ্তকে প্রথম এই মরূদ্যানটা দেখিয়েছিলেন সেই টিলাটার আড়ালে এবার ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত যেতে লাগল। অপূর্ব সুন্দর মরুদৃশ্য! কয়েক মিনিট সেই দৃশ্যর দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপভাবে বসে রইল সবাই। হঠাৎ একটা ঝনঝন ধাতব শব্দে সুদীপ্ত সূর্যাস্তের থেকে চোখ সরিয়ে অন্য পাশে তাকাল। সে দেখল আব্দুল নামের লোকটা চিতাবাঘটার গলার কলারে লোহার শিকল পরিয়ে তাকে খাঁচার বাইরে হাঁটাচ্ছে। অর্থাৎ চিতাটা পোষ মানা।

মৌনতা ভঙ্গ করে ভাঙা গলাতে হেরম্যান এরপর তাঁর বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে আল বীন কাশেম কবে আসছেন?'

ক্রো জবাব দিলেন, 'পরশু। আশা করি আর তিন-চারদিনের মধ্যেই সব কাজ মিটিয়ে ফেলতে পারব।'

সুদীপ্ত একটু ইতস্তত করে জানতে চাইল, 'আল বীন কাশেম কে?'

ক্রো বললেন, 'তিনি হলেন এ দেশেরই এক আমিরের ভাইপো। প্রভূত সম্পত্তির মালিক। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি ভবিষ্যতে আমির হবেন। এই সম্পত্তি তাঁকেই বিক্রি করার কথা হয়েছে। তিনি দেখতে আসছেন এই মরূদ্যান।'

ক্রোর এ কথা বলার পর হেরম্যান নিজের গলাতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমার গলাটা বিকাল থেকে ব্যথাও করছে। শুধু গলাই ভাঙেনি, ইনফেকশনও হয়েছে মনে হচ্ছে। আমি ঘরে গিয়ে ওষুধ খাই। তোমরা বরং এখানে বসে গল্প করো।'—এই বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

সুদীপ্তরও ইচ্ছা ছিল হেরম্যানের সঙ্গে যায়, কিন্তু ক্রোকে একলা রেখে উঠে যাওয়াটা অভব্যতা হবে মনে করে সে বসে রইল। চেয়ার ছেড়ে উঠে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন হেরম্যান।

তিনি চলে যাবার পর ক্রো সুদীপ্তকে প্রশ্ন করলেন, 'হেরম্যান আমার সম্পর্কে, এই মরূদ্যান সম্পর্কে আপনাকে কী কী জানিয়েছে বলুন তো?'

সুদীপ্ত হেসে জবাব দিল, 'তেমন কিছু নয়। আপনি একসময় জার্মানিতে পড়তে গেছিলেন, হেরম্যানের সহপাঠী ছিলেন, এই মরূদ্যান আপনার সম্পত্তি। আপনি এখানে হেরম্যানকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এসব সামান্য কিছু কথা।'

সুদীপ্তর জবাব শুনে ক্রো আবারও প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আমার কোনো সিনেমা দেখেছেন?'

হেরম্যান আঙুল তুলে সামনের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে আমরা এসে গেছি।'
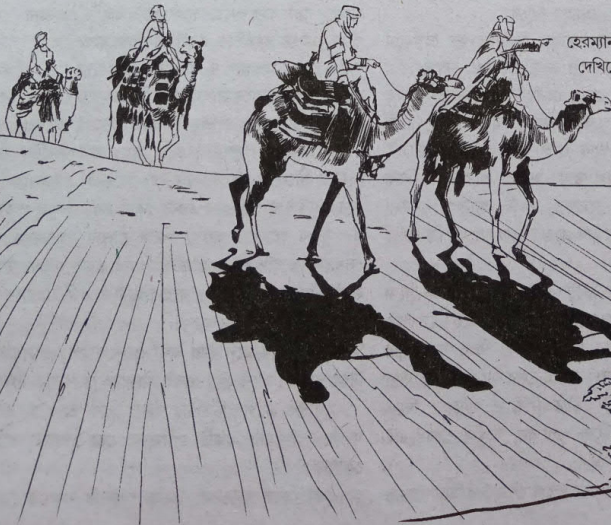
সুদীপ্ত জবাব দিল, 'মার্জনা করবেন, সিনেমা দেখা আমার খুব বেশি একটা হয় না। তবে এবার যখন আপনার সঙ্গে পরিচয় হল তখন নিশ্চয়ই দেখব।'

ক্রো বললেন, 'এখানে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রায় নেই বললেই চলে। নইলে দেখাবার চেষ্টা করতাম। এমনকি ফোনের লাইনও থাকে না। ফোন করতে হলে যেতে হয় মরুভূমির বাইরে শহরের দিকে। হেরম্যানও আপনাকে ফোন করতে সেখানেই গেছিল।'

ক্রোর আব্দুল নামের কর্মচারী চিতাবাঘটাকে মরূদ্যানের মধ্যে কিছুটা ঘুরিয়ে এনে আবার তার খাঁচায় ঢুকিয়ে দিল। সুদীপ্ত দেখল এরপর লোকটা বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল।

টিলার মাথার আড়ালে সূর্য ক্রমশ ঢুকে যাচ্ছে। ক্রো এরপর তাকে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন ইন্ডিয়া সম্পর্কে। সূর্যাস্তের শোভা উপভোগ করতে করতে তাঁর প্রশ্নর যথাসাধ্য উত্তর দিতে লাগল সুদীপ্ত।

নানান কথাবার্তা বলতে বলতেই সূর্য ডুবে গেল একসময়। সুদীপ্তর ঘড়িতে ইতিমধ্যে সাতটা বেজে গেছে। চারপাশে আলো যখন কমে আসতে লাগল তখন ক্রো বললেন, 'চলুন এবার ওঠা যাক।'

ক্রোয়ের সঙ্গে সুদীপ্ত চেয়ার থেকে উঠে এগোল বাড়ির ভিতর ঢোকার জন্য।

ক্রো বললেন, 'একটা সমস্যা হয়েছে। এখানে তো এমনি ইলেকট্রিসিটি নেই, তাই জেনারেটার দিয়েই কাজ চলত। দু-দিন হল সেটা বিকল হওয়াতে তেলের বাতিতেই আপনাকে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। তবে গরম লাগবে না। মরু অঞ্চলের পরিবেশ দিনের বেলা যেমন দ্রুত গরম হয়ে ওঠে তেমনই সূর্য ডোবার পরই শীতল হতে শুরু করে।'

বাড়ির ভিতর ঢুকে সুদীপ্তকে তার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ক্রো। ইতিমধ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হল আবদুল নামের সেই আরবি। তার হাতে তেলের বাতি। সুদীপ্তর ঘরের টেবিলে সে সেটা রাখল। তারপর ক্রো আর তার কাজের লোক চলে গেল। তারা চলে যাবার পরই সুদীপ্তর মনে হল হেরম্যানের ঘরটা কোথায় তা জেনে নেওয়া দরকার ছিল, তাঁর গলাব্যথা কেমন আছে তা জানা প্রয়োজন। এতদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা। একটু গল্পগুজব করে সন্ধ্যাটা কাটাতে পারলে ভালো হত। আর এরপর সুদীপ্তর মনে হল, হেরম্যান হয়তো নিজেই আসবেন তার সঙ্গে দেখা করতে। তাই সে প্রতীক্ষা করতে লাগল তাঁর জন্য। বাইরের পৃথিবী প্রথমে ডুবে গেল গাঢ় অন্ধকারে, তারপর আবার ধীরে ধীরে চাঁদ উঠতে শুরু করল আকাশে।

হেরম্যান যখন সুদীপ্তর ঘরে উপস্থিত হলেন তখন রাত আটটা। তাঁকে দেখে সুদীপ্ত উৎফুল্লভাবে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছিলাম। আপনার ঘরটা কোথায় জানা থাকলে আমি নিজেই সেখানে চলে যেতাম। কতদিন সামনাসামনি প্রাণ খুলে কথা বলিনি আপনার সঙ্গে।'

হেরম্যান ভাঙা গলায় জবাব দিলেন, 'ডানদিকের অলিন্দ দিয়ে এগোলেই ক্রোয়ের ঘরের গায়েই আমার ঘর। বেশি দূরে নয়।'

সুদীপ্ত বলল, 'বসুন, গল্প করা যাক। কত রাত আমরা তাঁবু বা খোলা আকাশের নীচে বসে সারারাত গল্প করে কাটিয়েছি বলুন?'

হেরম্যান একইরকম ভাঙা গলাতে বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়ে। কিন্তু আমার গলার যা অবস্থা তাতে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না। আজ আর আমি তোমাকে সঙ্গ দিতে পারছি না, তবে কাল আমি তোমাকে একটা ভালো জিনিস দেখাব। আজ আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব। কথা বললেই ব্যথা বাড়ার সম্ভাবনা।'

হেরম্যানের এ কথা শুনেই সুদীপ্ত বলল, 'ঠিক আছে আপনাকে আর এখন কথা বলতে হবে না। আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমার সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

হেরম্যান এরপর সুদীপ্তর উদ্দেশে 'গুডনাইট' জানিয়ে বাইরে বেরোতে গিয়েও চৌকাঠের সামনে থেমে গেলেন, তারপর সুদীপ্তকে বললেন, 'একটা কথা, রাতে বাড়ির বাইরে বেরিও না কিন্তু। রাতে চিতাবাঘটাকে ওরা ছেড়ে দেয়। ভোরের আলো ফোটার আগে পর্যন্ত ও ছাড়া থাকে। ওকে দিয়ে ওয়াচ ডগের কাজ করানো হয়।'—এ কথা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

হেরম্যান চলে যাবার পর নানান কথা ভাবতে ভাবতে সুদীপ্ত আরো একঘণ্টা সময় কাটিয়ে দিল। রাত ন-টার কিছুক্ষণ পর খাবার দিয়ে গেল আব্দুল। তন্দুরি রুটির মতো দেখতে একধরনের রুটি

আর মাংসের ঝোল। খাওয়া সেরে ঘরে রাখা পাথরের আরবি কুঁজো থেকে জল খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সুদীপ্ত। আর এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির পিছন দিক থেকে প্রথমে একটা শিয়াল জাতীয় কোনো প্রাণী ডেকে উঠল। তারপর ধীরে ধীরে আরও নানা ধরনের অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসতে শুরু করল। সুদীপ্ত অনুমান করল এসব ক্রোর পোষ্যদের শব্দই হবে। রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জেগে উঠতে শুরু করেছে। পরদিন নিশ্চয়ই তাদের দেখার সৌভাগ্য হবে সুদীপ্তর। আফ্রিকা ও অন্যত্র নানান জঙ্গলে আশ্চর্য প্রাণী বা ক্রিপ্টিডের সন্ধানে বহু অভিযানে গিয়ে সারারাত নানান বন্যপ্রাণীর শব্দ শোনার অভিজ্ঞতা সুদীপ্তর আছে। কাজেই এসব শব্দ প্রাথমিক অবস্থায় তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল না। সে সব শব্দ শুনতে শুনতে হেরম্যানের সঙ্গে তার অভিমানের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সুদীপ্ত।

কিন্তু মাঝরাতে একটা শব্দে হঠাৎই ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। তার মনে হল বাঘ বা সিংহ এ ধরনের কোনো প্রাণী যেন কোথাও গর্জন করে উঠল! বিছানাতে উঠে বসল সে। জানলার বাইরে চাঁদের আলোতে খেজুর গাছের গুঁড়িটা সমেত বেশ কিছুটা মরূদ্যানের অংশ দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত দ্বিতীয়বার শব্দটা শোনার প্রতীক্ষা করতে লাগল। পৃথিবীর নানাপ্রান্তে বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার সুবাদে হেরম্যানের মতোই বাঘ, সিংহ, লেপার্ড, চিতা ইত্যাদি প্রাণীর গর্জন আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারে সুদীপ্ত। দ্বিতীয়বার শব্দটা ভালো করে শুনলেই সুদীপ্ত বুঝতে পারবে কোন প্রাণীর গর্জন সেটা। কিন্তু সুদীপ্ত কিছুক্ষণ জেগে থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার সে গর্জন শুনতে পেল না। তবে সে দেখতে পেল, কিছুদূর থেকে টহলদার চিতাবাঘটা তার ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে! বাঘটা এসে দাঁড়াল সুদীপ্তর জানলার পাশেই খেজুর গাছের গুঁড়িটার গায়ে। জানলার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল প্রাণীটা। বেশ বড়ো পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। তবে সুদীপ্তর ভয়ের কিছু নেই। বেশ বড়ো মোটা লোহার গরাদ বসানো আছে জানলাতে। তা ভেঙে ভিতরে ঢোকা বাঘটার পক্ষে অসম্ভব। জানলার দিকে দেখার পর বাঘটা কয়েকবার গা ঘষল খেজুর গাছের গুঁড়িতে। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্যদিকে। সুদীপ্তও এরপর আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

৪

বাকি রাতটা নিরুপদ্রবেই ঘুমিয়ে কাটাল সুদীপ্ত। সকাল সাড়ে ছ-টা নাগাদ ঘুম ভাঙল তার। ঘুম ভাঙার পর তার প্রথমেই মনে পড়ল হেরম্যানের কথা। তিনি কেমন আছেন কে জানে? সুদীপ্ত বিছানা ছেড়ে উঠে ফ্রেশ হয়ে নেবার পর সাতটা নাগাদ একই সঙ্গে চা আর প্রাতরাশ নিয়ে হাজির হল আব্দুল। মজার ব্যাপার তার সঙ্গে গরম চা যেমন আছে তেমনই আছে ঠান্ডা তরমুজের শরবত। এছাড়া রুটি-মাখন, আঙুর, খেজুর নানাবিধ খাবারও আছে প্রাতরাশে। তা দেখে সুদীপ্ত অনুমান করল সম্ভবত ভারী প্রাতরাশ গ্রহণই এখানকার রীতি। সুদীপ্ত আব্দুলকে প্রশ্ন করল, 'হেরম্যান ঘুম থেকে উঠেছেন?'

প্রশ্ন শুনে আব্দুল নামের আরব লোকটি এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যে তার অর্থ হ্যাঁ, বা না দুটোই হতে পারে।

আব্দুল চলে যাবার পর ধীরেসুস্থে প্রাতরাশ শেষ করতে করতে সুদীপ্তর হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত রাতে ঘুমের ঘোরে শোনা অদ্ভুত শব্দটার কথা! কীসের গর্জন ছিল ওটা? নাকি ঘুমের ঘোরে আসলে সে চিতাবাঘের ডাক শুনেছিল?

প্রাতরাশ সাঙ্গ করার পর সুদীপ্ত হেরম্যানের দেওয়া আরবি আলখাল্লাটা পরে নিল। মাথায় স্কার্ফটাও জড়িয়ে নিল। এরপর সে হেরম্যানের খোঁজে যাবার জন্য ঘর থেকে বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল, ঠিক সেইসময় হেরম্যান স্বয়ং এসে হাজির হলেন। সুদীপ্ত তাঁকে গুডমর্নিং জানিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনার গলার অবস্থা কেমন?'

হেরম্যান ভাঙা গলাতে জবাব দিলেন, 'ভালো নয়। ব্যথা কখনও বাড়ছে, কখনও থাকছে না। যেমন এখন নেই।'—এ কথা বলে হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'রাতে ঘুম কেমন হল?'

সুদীপ্ত বলল, 'ভালোই। তবে মাঝরাতে কোনো একটা প্রাণীর গর্জন শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল! ওটা কার ডাক বলুন তো? অনেকটা যেন বাঘ বা সিংহের গর্জনের মতো মনে হল!'

হেরম্যানের ঠোঁটের কোণে একটা কৌতুকপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। সুদীপ্তর প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে তিনি বললেন, 'চলো এবার। ক্রো তোমাকে তার পোষ্যদের দেখাবে বলে অপেক্ষা করছে।'

হেরম্যানের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে সুদীপ্ত দেখল ক্রো দাঁড়িয়ে আছেন। তবে আজ তাঁর পরনে শর্টস-টি-শার্টের পরিবর্তে আরবি আলখাল্লা। সুদীপ্তর সঙ্গে তিনি প্রাতঃকালীন সম্ভাষণ বিনিময়ের পর বললেন, 'এ পোশাকে আপনাকেও কিন্তু আরবদের মতোই দেখাচ্ছে। চলুন এবার আপনাকে আমি আমার ছোট্ট মরু চিড়িয়াখানাটা দেখাই।'

ক্রো আর হেরম্যানের পিছন পিছন বাড়িটাকে বেড় দিয়ে বাড়ির পিছনের অংশে উপস্থিত হল সুদীপ্ত। প্রথমে একটা রেলিং ঘেরা ওপেন এনক্লোজার তার ওপাশে আবার পাথরের তৈরি বড়ো বড়ো ঘর দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীর ঘেঁষে। কিছুটা দূর থেকেই এনক্লোজারের মধ্যে লম্বা শিং-অলা দুটো প্রাণীকে দেখতে পেল সুদীপ্ত। সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে ক্রো প্রথমে সুদীপ্তকে বললেন, 'আমার সংগ্রহে যেসব পশু-পাখি আছে এরা সবাই মরুরাজ্যের প্রাণী। মরুভূমির গভীরে থাকা নানান উপজাতি, শিকারি, বেদুইনদের কাছ থেকে আমি এদের সংগ্রহ করেছি।'

এ কথা বলার পর তিনি হেরম্যানকে বললেন, 'তুমি তোমার বন্ধুকে প্রাণীগুলোর ব্যাপারে বুঝিয়ে দাও। হাজার হোক তুমি প্রাণী বিশেষজ্ঞ। আমার চাইতে তুমি এ ব্যাপারে ভালো বোঝাতে পারবে।'

এ কথার জবাবে হেরম্যান মৃদু হেসে বললেন, 'সুদীপ্তও বহু প্রাণী চেনে। আমার সঙ্গে ক্রিপ্টিডের খোঁজে অনেক অভিযানে সাক্ষী থেকেছে ও।'

ওপেন এনক্লোজার বা উন্মুক্ত খাঁচাটার সামনে প্রথমে গিয়ে দাঁড়াল তারা। বিশাল আকারের দুটো অ্যান্টিলোপ ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। মাথায় প্রায় চারফুট লম্বা তীক্ষ্ণ শিং, সাদা গাত্রবর্ণ। হরিণ জাতীয় প্রাণী হলেও হরিণের সঙ্গে এই অ্যান্টিলোপদের বিশেষ একটা ব্যাপারে পার্থক্য থাকে। হরিণের শিং শাখাপ্রশাখা যুক্ত হয়,

কিন্তু অ্যান্টিলোপের শিং-এর শাখাপ্রশাখা থাকে না। তাদের শিং দুটো এমন সমান্তরালভাবে মাথায় বসানো থাকে যে পাশ থেকে দেখলে মনে হয় প্রাণীটার একটাই মাত্র শিং। যে কারণে অনেকে এ প্রাণীকে রূপকথার প্রাণী ইউনিকর্ন বলেও ভেবে থাকে। এ প্রাণী ইতিপূর্বে আফ্রিকাতে দেখেছে সুদীপ্ত।

এনক্লোজারের বাইরে দাঁড়িয়ে হেরম্যান সুদীপ্তকে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কী প্রাণী বলো তো?'

সুদীপ্ত হেসে জবাব দিল, 'ওরেক্স বা অরিবেক্স অ্যান্টিলোপ। ওই সমান্তরাল শিং-দুটোর জন্য দূর থেকে দেখলে অনেক সময় যাদের একশৃঙ্গী ইউনিকর্ন বলে মনে হয়। যার সন্ধানে আপনি একবার আফ্রিকার মরুভূমিতে অভিযান চালিয়েছিলেন।'

কথাটা শুনে হেরম্যান সুদীপ্তর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ। তবে ওদের সম্পর্কে তোমাকে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। এই ওরেক্স অ্যান্টিলোপ যে শুধু এই ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের জাতীয় প্রাণী তাই নয়, একই সঙ্গে জর্ডন, ওমান, বাহারিন, কাতারেরও জাতীয় প্রাণী। পাঁচটা দেশের জাতীয় প্রাণী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে এই ওরেক্স।'

সুদীপ্তকে নিয়ে হেরম্যান আর ক্রো এরপর এগোলেন সার সার পাথরের ঘরগুলোর দিকে। সেই ঘরগুলোর সামনের অংশটা জাল দিয়ে ঘেরা।

প্রথম ঘরটার মধ্যে শাখাপ্রশাখাযুক্ত একটা মরা গাছের গুঁড়ি আছে। তার ডালে বসে আছে বিশালাকৃতির দুটো ঈগল জাতীয় পাখি। তাদের সবল পায়ে তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখ, বড়ো বাঁকানো ঠোঁট। হেরম্যান বললেন, 'এরা হল ঈগল বাজ। ঈগলের মতো বিশাল আকৃতির বলে এদের ঈগল বাজ বলে। মরুভূমির গভীরে বসবাসকারী কিছু উপজাতির মানুষরা এই বাজগুলোকে পোষ মানিয়ে এদের দিয়ে অন্য পাখি, খরগোশ ইত্যাদি শিকার করে।'

ঈগলের পরের ঘরটাতে রয়েছে বেশ কয়েকটা খ্যাঁকশিয়াল। মরুভূমির নানান অংশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। মাংসাশী প্রাণী হলেও এদের সর্বভুক বলা যেতে পারে। খাদ্যের লোভে এরা মরুভূমির গ্রামগুলোর কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। সুদীপ্ত বুঝতে পারল গত রাতে ঘুমাতে যাবার আগে এদেরই ডাক শুনেছিল সে।

হেরম্যান আর ক্রোর সঙ্গে একের পর এক খাঁচা দেখতে লাগল। তাদের কোনোটাতে রয়েছে মরুভূমির বিশালাকৃতির বিড়াল, কোথাও বা হায়না, কোথাও বেবুন। সুদীপ্তরা বেবুনের খাঁচার পাশ দিয়ে যাবার সময় খাঁচার ভিতরে থাকা গোটা চারেক বেবুন উত্তেজিত ভাবে চিৎকার শুরু করল। সুদীপ্তকে হেরম্যানই একবার বলেছিলেন সিংহ আর বেবুন নাকি চিরশত্রু। সিংহ যেমন বেবুন মারে তেমনই বেবুনও সুযোগ পেলেই সিংহর বাচ্চা মেরে ফেলে! ক্রো বললেন, তিনি মরূদ্যানটা দশ বছর আগে কিনেছেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি এই প্রাণীগুলোকে এখান থেকে সংগ্রহ করেন। একমাত্র চিতাবাঘটাই নাকি তিনি হলিউডে সিনেমাতে পশুপাখি সরবরাহকারী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। সার সার খাঁচাগুলো দেখা শেষ হবার পর সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ওই শেখ কি এই পশুপাখিগুলোও কিনবেন?'

ক্রো জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ। সবসুদ্ধই কিনবেন। বলা যেতে পারে এই মরূদ্যান কিনতে চাওয়ার পিছনে শেখের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু আমার সংগ্রহে থাকা বিশেষ একটি দুষ্প্রাপ্য প্রাণী।'

সুদীপ্ত কথাটা শুনে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, 'কী সেটা?'

কিন্তু তার আগেই হেরম্যান বললেন, 'চলো এবার তাকে দেখবে। আসলে ওই প্রাণীটাকে দেখার জন্যই আমি এখানে ছুটে এসেছি!' এই বলে তিনি খাঁচাগুলোর বিপরীত দিকে বাড়ি সংলগ্ন একটা পাথরের তৈরি ঘর আঙুল তুলে দেখালেন। সে ঘরের সামনেটা চামড়ার পর্দা ঢাকা। সুদীপ্ত আগেই অনুমান করেছিল এমন কোনো প্রাণীর জন্যই হেরম্যান ছুটে এসেছেন এই আরব মুলুকে। উৎসাহভরে হেরম্যানদের সঙ্গে সুদীপ্ত এগোল সেই ঘরের দিকে।

সে ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে সুদীপ্ত বুঝতে পারল সেটাও আসলে একটা খাঁচা। তবে রোদ যাতে সরাসরি সেই খাঁচার ভিতর প্রবেশ না করতে পারে সে জন্য খাঁচার সামনের অংশটা চামড়ার আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা। খাঁচাটার কাছে যেতেই একটা জান্তব গন্ধ নাকে এল সুদীপ্তর। বাঘ-সিংহের খাঁচার কাছে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়। খাঁচার একদম সামনে উপস্থিত হবার পর ক্রো একটা দড়ি টেনে সামনের পর্দাটা একপাশে সরিয়ে দিলেন। মোটা লোহার গরাদের ওপর শক্ত লোহার জালের ওপাশে বিরাট ঘরের এক কোণে একটা বিশালাকৃতি প্রাণীকে শুয়ে থাকতে দেখল সুদীপ্ত। একটা সিংহ! সূর্যের আলো, চোখে পড়তেই আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল প্রাণীটা। আর এরপরই তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। ইতিপূর্বে আফ্রিকা অভিযানে গিয়ে বহু সিংহ দেখেছে সুদীপ্ত। কিন্তু এই সিংহ কলেবরে তাদের প্রায় দ্বিগুণ। এত বড়ো সিংহ ইতিপূর্বে কোনোদিন দেখেনি। সব থেকে বড়ো কথা সিংহটার কেশর বা গায়ের লোম কালো, ধূসর, বাদামি বা ঈষৎ হলদেটে বর্ণের নয়, সে সব কিছুই সোনার রঙের, বাঘের গায়ের মতো উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের! যেন সোনার সিংহ! প্রাণীটা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। প্রাণীটাকে দেখার পর বিস্মিত সুদীপ্ত তাকাল হেরম্যানের দিকে। হেরম্যান বললেন, 'এ হল সান লায়ন। আরব দেশের বহু পৌরাণিক গল্প-কাহিনিতে এর উল্লেখ আছে সূর্য দেবতার বাহন রূপে। বালির গভীরে নাকি বাস করে এরা। কিছু মানুষ শুধু কোনোসময় এদের দূর থেকে দেখেছে বলে কোনো কোনো সময় দাবি করেছে। তবে পণ্ডিত জীববিজ্ঞানীরা কোনোদিন এই সূর্য সিংহের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেননি। তাঁরা এতকাল এই প্রাণীটিকে অশিক্ষিত আরব বেদুইনদের মনগড়া গল্পই ভেবে এসেছেন। কোনো কোনো কাহিনিতে একে সোনার সিংহও বলা হয়েছে।' সুদীপ্ত বলে উঠল, 'তার মানে তো এই সূর্য সিংহ একটা ক্রিপ্টিড!'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই ক্রিপ্টিড। যাদের খোঁজে আমরা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াই। প্রাণীটাকে দেখে চোখ সার্থক হল আমার। সান লায়ন নিছক গল্পগাথার প্রাণী নয়।'

সুদীপ্ত বলল, 'আমারও চোখ সার্থক হল।'

প্রাণীটা এরপর গা ঝাড়া দিল। কিছু লোম বাতাসে উড়ল। সুদীপ্তর তা দেখে মনে হল, যেন লোম নয়, একমুঠো স্বর্ণরেণু যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল প্রাণীটার গা থেকে! এমনই তার রঙের ঔজ্জ্বল্য।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে বিশালাকৃতির সেই সোনালি সিংহর দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত তার পাশে দাঁড়ানো ক্রোকে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে আপনি কোথা থেকে কিনলেন?'

হেরম্যানের বন্ধু বললেন, 'কিনিনি। ওকে আমি অদ্ভুতভাবে পেয়েছি।'

এরপর একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'ঘটনাটা আমি তবে আপনাকে বলি। তখন মাত্র কয়েক বছর হল আমি এই মরূদ্যানটা কিনেছি। নতুন সম্পত্তির প্রতি আগ্রহের কারণে সময় পেলেই পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত থেকে এখানে ছুটে আসি। আব্দুল হল আমার সব থেকে পুরোনো কর্মচারী। প্রচণ্ড গরমের জন্য এখানে তো দিনের বেলা বাইরে বেরোনো যায় না, তার ওপর এখনও এখানকার পরিবেশের সঙ্গে আমি পুরোপুরি খাপ খাইয়ে উঠতে পারিনি। তাই দিনের বেলা আমি বাড়ির ভিতরেই থাকতাম, তবে বিকাল হলেই আমি আব্দুলকে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে মরুভূমির মধ্যে বেড়াতে যেতাম। তেমনই এক বিকালে দুজনে বেরিয়েছি, কয়েক ঘণ্টা ঘুরতে ঘুরতে মরূদ্যান থেকে বেশ অনেকটা দূরে আরও গভীর মরুভূমির মধ্যে পৌঁছে গেছি। সূর্য যখন প্রায় ডুবতে যাচ্ছিল তখন আমরা উটের মুখ ঘোরাতে যাচ্ছিলাম ফেরার জন্য। ঠিক সেই সময় আমরা দেখতে পেলাম কাছেই একটা বালির টিলার নীচে পড়ে আছে একটা লোক! সে মরুভূমিতে পথভ্রষ্ট কোনো লোক হবে মনে করে তাকে দেখামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে উট থেকে নামলাম আমরা। কঙ্কালসার লোকটার চামড়া সূর্যের তাপে পুড়ে গেলেও সে যে একজন শ্বেতাঙ্গ তা বুঝতে অসুবিধা হল না আমাদের। তার পরনের পোশাক আর শরীরের অবস্থা দেখে লোকটা যে বহুদিন যাবৎ মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা বুঝতে পারলাম। ক্যানভাসের একটা বড়ো থলে পড়েছিল তার পাশে। লোকটার চোখ বন্ধ থাকলেও তার বুকটা তখনও ক্ষীণভাবে ওঠানামা করছিল। আমি তার কাঁধ ধরে ঝাঁকাতেই সে ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল। আমি প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কে? এই মরুভূমিতে কেন এসেছিলে?'

লোকটা জবাব দিল, 'আমি ইওরোপীয়, আরব মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে এসেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'সোনা খুঁজে পেয়েছ তুমি?'

লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। ওই থলের মধ্যে আছে।'

এ কথা বলার পরই সে জড়ানো গলায় বলল, 'দোহাই তোমাদের, আমাকে একটু জল দাও, জল। সোনা নিয়ে নাও, কিন্তু জল দাও আমাকে।'

আমার সঙ্গে জলের বোতল ছিল। আমি জলের বোতল বার করে জল ঢেলে দিলাম লোকটার মুখে। আমি ভেবেছিলাম লোকটা জলপান করে একটু সুস্থ হবে, কিন্তু ঘটনাটা উল্টো ঘটল। বহুদিন পর জলপান করার পর লোকটার শরীরটা হঠাৎ মুচড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল, মারা গেল লোকটা। তার পোশাক হাতড়ে কোনোরকম পরিচয়জ্ঞাপক তথ্য পাওয়া গেল না। তারপর তার সেই থলেটা খুললাম আমরা। থলের ভিতর কী পাওয়া গেল জানেন? না সোনা নয়, একটা মুমূর্ষু সিংহ শাবক! তখন এ বাড়িতে চিড়িয়াখানার জন্য দু-একটা পশুপাখি আনা শুরু হয়েছে। আব্দুল তাই বলল, 'চলুন এটাকে আমরা মরূদ্যানে নিয়ে গিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করি।'

এরপর সেই অপরিচিত লোকটাকে বালির স্তূপের মধ্যে কবর দিয়ে শাবকটাকে এখানে নিয়ে এলাম আমরা।'

ক্রো এ পর্যন্ত বলার পরই বাইরের রোদ বা খাঁচার সামনে সুদীপ্তদের উপস্থিতির কারণে সম্ভবত বিরক্তবোধ করে চাপা গর্জন করে উঠল প্রাণীটা। সিংহের গর্জনের মতো শোনালেও সিংহের গর্জনের সঙ্গে যেন মৃদু ফারাক আছে এ প্রাণীটার গর্জনে।

প্রাণীটা ডাক ছাড়লেই হেরম্যান বললেন, 'ওকে বিরক্ত করা ঠিক নয়, চলো আমরা ঘরের দিকে ফিরতে ফিরতে কথা বলি।'

ক্রো, পর্দা দিয়ে আবার ঢেকে দিলেন খাঁচার সামনেটা, তারপর ফেরার পথ ধরে বলতে শুরু করলেন, 'বেঁচে গেল প্রাণীটা। শুধু বাঁচাই নয়, দিনে দিনে বেড়ে চলল প্রাণীটা, আর তার গায়ের রঙের উজ্জ্বলতাও বাড়তে শুরু করল। কয়েক বছরের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম যাকে আমি পেয়েছি সে সাধারণ কোনো সিংহ নয়। তবে বাইরের লোকের কাছে আমি আমার সিংহের ব্যাপারটা জানাইনি। মরূদ্যানটা আমার পশু-পাখি সমেত বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নেবার পর আমি কিছুদিন আগে হেরম্যানকে প্রাণীটার ছবি ও বর্ণনা পাঠাই। হেরম্যান তখনই মোটামুটি আমাকে বলে দিয়েছিল প্রাণীটার পরিচয়। তারপর আমার আমন্ত্রণে এখানে আসার পর প্রাণীটাকে দেখে একদম নিশ্চিত হয়েছে যে এটা সত্যিই আরব রূপকথায় বর্ণিত সেই সান লায়ন বলে।'

বন্ধুর এ কথা বলা শেষ হবার পর হেরম্যান মাথা নেড়ে সমর্থন জানালেন তাঁকে।

ক্রোর পুরো কথা শোনার পর সুদীপ্ত তাঁর উদ্দেশে বলল, 'সেই শ্বেতাঙ্গের থলেতে সোনা না থাকলেও সোনার থেকে দামি জিনিস পেয়েছিলেন আপনি।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, সোনার থেকেও দামি এই সোনার সিংহ। সারা পৃথিবীর কোনো চিড়িয়াখানাতে এই সোনার সিংহ নেই।'

কথাটা শুনে সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'এ প্রাণীটাকে আপনি ইওরোপ-আমেরিকার কোনো চিড়িয়াখানাতে না দিয়ে আরব শেখের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তিনি কি বেশি দাম দেবেন বলে?'

ক্রো বললেন, 'এই সব আরব শেখেরা ইওরোপ-আমেরিকার চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বা মালিকদের থেকে বেশি ধনী। প্রাণীটা পছন্দ হলে সম্ভবত শেখ বীন কাশেম ইওরোপের-আমেরিকার থেকে বেশি দামেই প্রাণীটা কিনবেন। তবে প্রাণীটা তাঁকে বিক্রি করতে চাওয়ার প্রধান কারণ নয়। হেরম্যান বলল, তীব্র গরম বা তীব্র শীতের দেশের প্রাণীকে যত ভালো করে রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন তারা বেশিদিন বাঁচে না। আমি চাই না এই দুষ্প্রাপ্য মরু সিংহের কোনো ক্ষতি হোক। তাই শেখের কাছেই এই প্রাণীটা বিক্রি করতে পারলে ভালো হয়।'

সুদীপ্তর বেশ ভালো লাগল ক্রোয়ের ভাবনা শুনে। প্রাণীটার সুরক্ষাই সবার আগে প্রয়োজন। বাড়ির সামনের দিকে ফিরে এল তারা। সবেমাত্র সকাল আটটা বেজেছে। এর মধ্যেই সূর্যের কী তেজ!

বাড়ির বারান্দায় উঠে আসার পর একপাশে রাখা চেয়ার দেখিয়ে ক্রো বললেন, 'তোমরা এখানে বসে গল্প করো, আমি ঘর থেকে ঘুরে আসছি।'

৫

মুখোমুখি দুটো চেয়ারে বসল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'সান লায়নের ব্যাপারে বাইরের পৃথিবীকে কি আপনি জানাবেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আপাতত তেমন কিছু ভাবিনি। শেখ যদি প্রাণীটা কেনেন তারপর তাঁর অনুমতিক্রমে বাইরের পৃথিবীকে ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানালেও জানাতে পারি। এ প্রাণীটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমি এমন কিছু করতে চাই না যাতে ক্রো বিব্রত বোধ করে। জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাটাই বড়ো ব্যাপার। সান লায়নের অস্তিত্ব আছে, এবং তাকে আমি চাক্ষুষ করেছি এটাই আমার কাছে বড়ো ব্যাপার।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'প্রাণীটার দাম কত হতে পারে বলুন তো?'

হেরম্যান একটু চুপ করে থেকে ভাঙা গলায় বললেন, 'এসব দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর দাম নির্ধারণ তো কোনো নিয়ম মেনে হয় না। কয়েক কোটি মার্কিন ডলার হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। শেখদের কাছে অবশ্য এ টাকা কিছুই না।'

সুদীপ্ত বলল, 'প্রাণীটাকে নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ইচ্ছা আছে নাকি আপনার? এখানে থাকার ব্যাপারে আপনার কী পরিকল্পনা?'

হেরম্যান বললেন, 'না, ওকে নিয়ে কোনো পরীক্ষা করার ভাবনা আমার নেই। কারণ, প্রাণীটার ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সত্যি এটা সান লায়ন। এখানে আমরা আর দু-তিনদিন থাকব। শেখের সঙ্গে ক্রোর ব্যাপারটা মিটে গেলেই ফেরার জন্য রওনা হব। আসলে ক্রো চাইছে যে শেখের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, প্রাণীটাকে বিক্রির বন্দোবস্ত করার সময় আমি উপস্থিত থাকি।'

তারা দুজন কথা বলতে বলতেই ক্রো ফিরে এলেন। হেরম্যানের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'চলো তবে বেরিয়ে পড়া যাক?'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'কোথায় যাব আমরা?'

প্রশ্ন শুনে ক্রো প্রথমে বললেন, 'শহরের দিকে যাব। শেখের আপ্যায়নের জন্য বেশ কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে।'

এ কথা বলার পর একটু থেমে তিনি বললেন, 'আমাকে মার্জনা করবেন। গাড়িতে আমার আর হেরম্যানের বসার পর অন্য কারো বসার জায়গা হবে না। কারণ ফেরার সময় গাড়িটাতে মালপত্র বোঝাই থাকবে।'

ক্রোয়ের মুখে ওই শেষ কথাটা শুনে বাড়িতে বসে সময় কাটাতে হবে বলে স্পষ্টতই একটা হতাশার ভাব ফুটে উঠল সুদীপ্তর মুখে। হেরম্যান তার মনের ভাব বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আসলে ক্রো কিছুতেই আমার সঙ্গলাভের সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছে না। বহু বছর পর ওর সঙ্গে দেখা। দু-দিন পর ও ফিরে যাবে হলিউডে আর আমি জার্মানিতে। এরপর আমাদের দুজনের আর কবে দেখা হবে জানি না। আমি বুঝতে পারছি তোমার খারাপ লাগছে। ফিরে এসে আজ রাতে গল্প করব দুজনে।'

এরপর আর সুদীপ্তর বলার কিছু থাকে না। মুখে হাসি ফুটিয়ে সে বলল, 'যান ঘুরে আসুন।' তাঁরা দুই বন্ধু এরপর মরূদ্যান ছেড়ে বেরিয়ে বাইরে হাজির হওয়া দুটো উটের পিঠে চেপে রওনা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে থাকার পর সুদীপ্ত নিজের ঘরে ফিরে এল।

সারাটা দিন সুদীপ্ত নিজের ঘরেই শুয়ে বসে কাটাল। দুপুরে নির্দিষ্ট সময় খাবার দিয়ে গেছিল আব্দুল। দুপুরের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে নেবার পর বিকালে সে বাইরে গিয়ে বসল। মরুভূমির বুকে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখে মনটা চাঙ্গা হল। গতদিনের মতোই আব্দুল চিতাবাঘটাকে খাঁচা থেকে বের করে মরূদ্যানের মধ্যে এক পাক ঘুরিয়ে আনল।

হেরম্যানরা ফিরলেন সূর্যাস্তের বেশ কিছুক্ষণ পর। সুদীপ্ত তখন নিজের ঘরে ফিরে গেছিল। হেরম্যান বাড়িতে ফেরার পর তার ঘরে ঢুকে প্রচণ্ড ভাঙা গলাতে জানতে চাইলেন, সারাদিন বাড়িতে থাকতে তার কোনো অসুবিধা হয়েছিল কিনা?

সুদীপ্ত জানাল, হেরম্যানের অনুপস্থিতিতে তার মাঝে মাঝে একটু একা লাগছিল ঠিকই, কিন্তু তাছাড়া তার অন্য কোনো অসুবিধা হয়নি।

হেরম্যান এরপর বিমর্ষ মুখে বললেন, 'ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে বেশ রাত পর্যন্ত গল্প করে কাটাব কিন্তু সেটা আর হচ্ছে না। ফেরার সময় থেকে গলায় এমন ব্যথা শুরু হয়েছে যে কথা বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি খুবই দুঃখিত তোমাকে সঙ্গ দিতে না পারার কারণে।'

সুদীপ্তও তাঁর কণ্ঠস্বর আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে কষ্টের ব্যাপারটা বুঝতে পারল। তাই সে হেরম্যানকে বলল, 'গল্প না হয় পরে করা যাবে। আপনি বরং ঘরে গিয়ে ওষুধ খেয়ে বা গার্গল করে দেখুন যে ব্যথা কমানো যায় কি না? আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই।'

কোনোক্রমে মুখে হাসি ফুটিয়ে হেরম্যান এরপর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

হেরম্যানের সঙ্গলাভে বঞ্চিত হবার কারণে সুদীপ্তর খারাপ লাগলেও সে বুঝতে পারল হেরম্যান নিরুপায়। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেলেও হেরম্যানের গলা কেন ঠিক হচ্ছে না ভেবে বেশ চিন্তিতবোধ করল সে।

আব্দুল রাতের খাবার দিয়ে গেল নির্ধারিত সময়। নৈশাহার সাঙ্গ করে দরজা বন্ধ করে সুদীপ্ত বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাত একটু বাড়তেই গত রাতের মতোই ফের শিয়ালের ডাক শোনা গেল। তারপর হায়নাটা আজ হ্যা, হ্যা করে ডেকে উঠল। নানানরকম শব্দ ভেসে আসতে লাগল বাড়ির পিছনদিকের চিড়িয়াখানা থেকে। নানান কথা ভাবতে লাগল সুদীপ্ত।

রাত বেড়ে চললেও এদিন কিন্তু ঘুম এল না সুদীপ্তর। হয়তো বা তা সারাদিন ঘরে শুয়ে বসে থাকা, কোনো পরিশ্রম না হওয়ার

কারণেই। একসময় সেই সান লায়নের গর্জন শোনা গেল। একবার ডেকেই থেমে গেল প্রাণীটা। অন্ধকার ঘরে শুয়ে সুদীপ্ত ভাবতে লাগল ক্রোর মুখে শোনা সান লায়ন উদ্ধারের গল্পটার কথা। সুদীপ্তর মনে হল ওই শ্বেতাঙ্গ আসলে কোনো ক্রিপ্টোজ্যুলজিস্টও হয়ে থাকতে পারেন। সোনা বলতে হয়তো তিনি সোনার সিংহ বলতে চেয়েছিলেন।

সিংহের ডাকটা শোনার পর আরও বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। আর এরপরই আরও একটা প্রাণীর ডাক শোনা গেল হঠাৎ। বেবুনের ডাক! জঙ্গলে অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে এ ডাক চেনা সুদীপ্তর। একবার নয়, বার বার ডাকছে বেবুনগুলো। সে ডাক শুনে সুদীপ্তর মনে হল যে বেবুনরা কোনো কিছু দেখে যেন উত্তেজিতবোধ করছে! তাই অমনভাবে ডাকছে!

বিছানা থেকে উঠে পড়ে জানলার সামনে এসে সুদীপ্ত দাঁড়াল। চাঁদের আলোতে বাইরেটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর এরপর কিছুটা কাকতালীয় ভাবেই একটা লোককে বাড়ির পিছনদিক থেকে ছুটে আসতে দেখল। লোকটার পরনে আলখাল্লা, পাগড়ির কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা। লোকটা প্রথমে সুদীপ্তর জানলার পাশ দিয়েই বাড়ির সামনের দিকে ছুটে গেল। তারপর সম্ভবত কোনো কিছু একটা দেখতে পেয়ে ফিরে এসে সোজা ছুটল কিছু দূরে প্রাচীরের দিকে। প্রাচীর বেয়ে কোনোরকমে ওপরে উঠতে শুরু করল লোকটা। ঠিক এমন সময় বাড়ির দু-পাশ থেকে আরও দুজন ছুটে এল সুদীপ্তর জানলার বাইরে। বাড়ির পিছন দিক থেকে যে ছুটে এল তার মুখের আচ্ছাদন না থাকায় চাঁদের আলোতে তাকে চিনতে পারল সুদীপ্ত। সে আব্দুল। তার হাতে একটা ছোরা! আর বাড়ির সামনের দিক থেকে ছুটে এল চিতাবাঘটা। পলায়মান লোকটাকে দেখতে পেয়ে তারা দুজনেই এবার ছুটল প্রাচীরের দিকে। তারা যখন প্রাচীরের কাছে পৌঁছল, কোনোরকমে প্রাচীরের ওপর উঠে পড়েছে লোকটা। সম্ভবত আব্দুলের নির্দেশেই চিতাটা এরপর লোকটাকে ধরার জন্য গর্জন করে লাফ দিল ওপর দিকে। তবে বাঘটা লোকটাকে স্পর্শ করার আগেই সে বাইরে ঝাঁপ দিল। আব্দুল এরপর বাঘটাকে নিয়ে ছুটল বাড়ির সামনের দিকে যাবার জন্য।

এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে সুদীপ্ত বুঝে উঠতে পারল না যে লোকটাই বা কে? আর আব্দুলই বা তাকে ধরার জন্য ছোরা হাতে দৌড়াল কেন? এরপর বেশ কিছুক্ষণ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল সে, কিন্তু বাইরে কাউকেই আর তার চোখে পড়ল না। শুধু মাঝে মাঝে ডাকতে থাকল বেবুনটা। একসময় সুদীপ্ত আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘটনাটার কথা ভাবতে ভাবতে অবশেষে একসময় ঘুম নেমে এল তার চোখে।

রাতে ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল বলে এদিন একটু দেরিতেই সুদীপ্তর ঘুম ভাঙল। আর তারপরই সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল গত রাতের ঘটনাটার কথা। কী হল তারপর? আব্দুল কি বাইরে বেরিয়েছিল? সে কি ধরতে পেরেছিল লোকটাকে? এ সব ভাবতে ভাবতেই তার দরজাতে টোকা পড়ল। আব্দুল এসে হাজির হল প্রাতরাশ নিয়ে। দরজা খোলার পর সে যখন টেবিলে প্রাতরাশ নামিয়ে রাখল তখন সুদীপ্ত তাকে প্রশ্ন করল, 'কালকে রাতে ওই লোকটা কে ছিল? যে প্রাচীর টপকে পালাল?'

প্রশ্ন শুনে মৃদু চমকে উঠে আব্দুল তাকাল সুদীপ্তর দিকে। সুদীপ্ত এবার খেয়াল করল আব্দুলের একটা চোখের নীচে বেশ ভালোরকম কালশিটে পড়ে ফুলে আছে। স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন জেগে আছে তার মুখমণ্ডলে! গত রাতের কোনো মারপিটের চিহ্ন নাকি?

সুদীপ্তর প্রশ্নের জবাবে আরবি ভাষায় লোকটা কী যেন বলল। তারপর ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

মুখ-হাত ধুয়ে প্রাতরাশ খেয়ে হেরম্যানের খোঁজে ঘরের বাইরে বেরোল সুদীপ্ত। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে সুদীপ্ত দেখতে পেল বাড়িটাতে ঢোকার মুখে বারান্দায় যেখানে চেয়ার পাতা থাকে সেখানে বসে মৃদু স্বরে কথাবার্তা বলছেন হেরম্যান আর ক্রো। সুদীপ্ত তাঁদের সামনে উপস্থিত হতেই দুই বন্ধু কথা থামিয়ে তাকালেন তার দিকে। সুদীপ্ত তাঁদের উদ্দেশে গুডমর্নিং জানিয়ে একটা চেয়ারে বসে হেরম্যানকে প্রশ্ন করল, 'আপনার শরীর কেমন আছে?'

হেরম্যান ভাঙা গলায় বললেন, 'আপাতত ব্যথাটা একটু কম। তবে ফেরার পথে শহরে গিয়ে একজন ভালো ডাক্তার দেখাতে হবে। নইলে পুরোপুরি সুস্থ হওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

এ কথা শোনার পর সুদীপ্ত তাঁদের কাছে বলল, গত রাতে দেখা ঘটনার কথা। তা শুনে ক্রো বললেন, 'আমরা ওই ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা করছিলাম। সম্ভবত যে লোকটা মরূদ্যানে প্রবেশ করেছিল সে একজন চোর। সান লায়নটার অভ্যাস হল, সারাদিন ঘুমায় আর রাতে জেগে উঠে খাবারের জন্য ডাক ছাড়ে। তখন আব্দুল গিয়ে ওকে খাবার দিয়ে তারপর রাতে ঘুমাতে যায়। কাল রাতেও আব্দুল খাবার দিতে গেছিল সিংহটাকে। ঠিক সেই সময় লোকটার মুখোমুখি হয়ে যায় আব্দুল। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা তার মুখে ঘুষি মারে, তারপর প্রাচীর টপকে পালায়। যে দৃশ্য আপনার চোখে পড়েছে।'

সুদীপ্ত শুনে বলল, 'এই মরুভূমির মধ্যে চোর আসে কোথা থেকে? আশেপাশে তো কোনো জনবসতি নেই।'

ক্রো বললেন, 'অনেক সময় অপরাধীরা পুলিশের হাত এড়াবার জন্য মরুভূমিতে পালিয়ে আসে। তারা অনেক সময় খাদ্য-পানীয়র সন্ধানে বা চুরির লোভে মরূদ্যানে হানা দেয়। আমি মরূদ্যানটা কেনার পরও কয়েকবার এ ঘটনা ঘটেছিল। যে কারণে চিতাটা এনেছিলাম আমি। ভাগ্য ভালো গতকাল লোকটা চিতাবাঘটার মুখে পড়েনি। তাহলে ও বাঁচত কি না সন্দেহ।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'আপনার অতিথি আজ কখন আসছেন?'

ক্রো বললেন, 'বিকাল নাগাদই এসে পড়বেন। এখানেই রাত্রিবাস করবেন তিনি। শেখ সম্ভবত দু-রাত এখানে থাকবেন। কিছু লোকজনও তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবে।'

সুদীপ্ত তাঁকে আবারও প্রশ্ন করল, 'আপনার সঙ্গে শেখের যোগাযোগ হল কী ভাবে?'

ক্রো বললেন, 'কয়েক বছর আগে একবার আমি এখানে এক

জায়গাতে উটের দৌড় দেখতে গেছিলাম। ঘোড়দৌড়ের মতো বাজি রেখে অনেক বড়ো বড়ো উটের দৌড় প্রতিযোগিতা করা হয় এখানে। শেখ-আমিরদের মতো ধনী মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষরাও ওই দৌড় দেখতে যায়। ওই উটের দৌড়ের জায়গাতেই শেখের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার পরিচয় জানার পর কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেছিলেন, যদি আমি কখনও মরূদ্যানটা বিক্রির কথা ভাবি, তবে যেন তাঁকে একবার জানাই। কাজেই কিছুদিন আগে যখন এ জায়গাটা বিক্রি করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম তখন তাঁকে ব্যাপারটা জানালাম। তাঁর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন আমি কথা প্রসঙ্গে জেনেছিলাম যে তিনি পশু-পাখির ব্যাপারেও প্রবল আগ্রহী। তাঁর প্রাসাদেও একটা চিড়িয়াখানা আছে। তবে সান লায়নের ব্যাপারটা কিন্তু আমি প্রথমে তাঁকে জানাইনি। সেটা আমি তাঁকে জানালাম তিনদিন আগে। হেরম্যান যখন এখানে এসে প্রাণীটার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত বোধ করল তখন। আর সান লায়নের খবরটা শুনেই বীন কাশেম বললেন তিনি এখানে আসছেন।'

একটানা কথাগুলো বলার পর একটু থেমে ক্রো সুদীপ্তকে বললেন, 'আপনাকে একটা ছোটো সাহায্য করতে হবে।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'কী সাহায্য?'

ক্রো বললেন, 'শেখের মন-মেজাজ যদি এখানে এসে ভালো থাকে তবে তিনি সান লায়ন বা এই মরূদ্যানের দামের ব্যাপারে বেশি দরাদরি করবেন না। তাঁকে আমার খুশি রাখা দরকার। এই সব ধনী শেখেরা দেশ-বিদেশের নানান গল্প শুনতে খুব ভালোবাসে। গল্প শোনাবার জন্য এদের প্রাসাদে মাইনে করা কর্মচারীও থাকে। বীন কাশেমও এর ব্যতিক্রম নন। হেরম্যানের যা গলার অবস্থা তাতে তো সে গল্প শোনাতে পারবে না। আপনি যদি শেখকে আপনাদের কোনো একটা অভিযানের কথা শোনান তবে ভালো হয়। হেরম্যান আর আপনার কথাও আমি শেখকে বলেছি। তিনিও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হতে ও কথা বলতে আগ্রহী।'

সুদীপ্ত বলল, 'ঠিক আছে গল্প শোনাব। কিন্তু কোন অভিযানের কথা তাঁকে বলা যায় বলুন তো?'

সুদীপ্ত প্রশ্নটা করল হেরম্যানের দিকে তাকিয়ে। হেরম্যান জবাব দিলেন, 'তুমিই নির্বাচন করো কোন গল্পটা শোনাবে।'

সুদীপ্ত একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ইন্দোনেশিয়ার মুন্দা দ্বীপে সোনার কোমাডো ড্রাগনের খোঁজে অভিযানের কাহিনিটাই তবে বলব।'

ওই ঘটনার কথা হেরম্যান তাঁর বন্ধুকে কখনো শুনিয়েছেন কিনা সুদীপ্তর তা জানা নেই। কিন্তু ক্রো সুদীপ্তর কথা শুনে বললেন, 'হ্যাঁ, ওটাই ভালো গল্প। সোনার সিংহ কিনতে আসা শেখকে সোনার ড্রাগনের গল্প শোনানোই ভালো।'

এ কথা বলার পর ক্রো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যাই দেখি আব্দুল অতিথি আপ্যায়নের ব্যাপারে কতটা কাজ সম্পন্ন করল? ওকে আবার বাইরেও পাঠাতে হতে পারে।'

ক্রো চলে গেলেন। সুদীপ্ত আর হেরম্যান বসে রইলেন। টুকটাক কিছু কথাবার্তার পর হেরম্যান বললেন, 'আমি বরং এবার ঘরে যাই। শেখ এলে তো ভদ্রতাবশত কিছু কথা তাঁর সঙ্গে বলতেই হবে। তার আগে গলাটাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।'—এ কথা বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। অগত্যা সুদীপ্তকেও উঠে দাঁড়াতে হল। হেরম্যান চলে যাবার পর বাড়ির বাইরের জমিতে নেমে কিছুক্ষণ সুদীপ্ত উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটাহাঁটি করল। হেরম্যানের গলা ব্যথার ব্যাপারটা মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তুলছে সুদীপ্তকে। হেরম্যানের গলাতে খারাপ কোনো অসুখ হয়নি তো?— এ প্রশ্নটা ঘুরপাক খেতে লাগল সুদীপ্তর মনে। বাগানে হাঁটতে হাঁটতেই একসময় প্রচণ্ড গরম অনুভূত হল তার। রোদের তেজ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। তাই বারান্দা থেকে সুদীপ্ত আবার নিজের ঘরে ফিরে এল। সকালের বাকি সময়টা আর দুপুরটা নিস্তরঙ্গভাবেই কেটে গেল সুদীপ্তর। তবে এর মধ্যে সে শেখকে যে গল্পটা শোনাবে তা মনে মনে গুছিয়ে নিল। বিকাল হতেই সুদীপ্ত তৈরি হয়ে নিল ঘরের বাইরে বেরোবার জন্য। সকালে ওই টুকটাক কথার মাঝে হেরম্যান তাকে একবার বলেছিলেন যে শেখের অভ্যর্থনার সময় আরবি আলখাল্লা পরাই ভালো। তাই সেই পোশাকই সুদীপ্ত পরল। ঠিক পাঁচটার সময় টোকা পড়ল সুদীপ্তর দরজায়। সুদীপ্ত দরজা খুলতেই হেরম্যান তাকে বললেন, 'শেখদের দেখা যাচ্ছে। চলো, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন তাঁরা।'

৭

হেরম্যানের সঙ্গে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সুদীপ্ত দেখল ক্রো আর আব্দুল দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অতিথিকে স্বাগত জানাবার জন্য তাদের দুজনের পরনেই নতুন আলখাল্লা। মাথায় স্কার্ফ। সুদীপ্ত তাদের
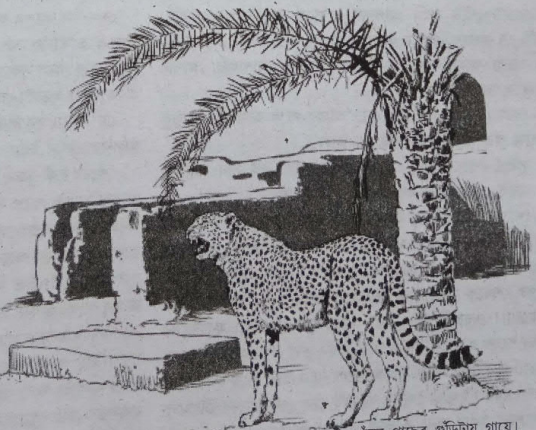
বাঘটা এসে দাঁড়াল সুদীপ্তর জানলার পাশেই খেঁজুর গাছের গুঁড়িটায় গায়ে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ক্রো আঙুল তুলে দেখালেন মরূদ্যান থেকে কিছু দূরে সেই উঁচু টিলাটার দিকে। তার ঢাল বেয়ে নামছে সার সার উট। পিঠে তাদের সওয়ারি। মরূদ্যানের কাছে এসে পড়েছেন শেখ।

শেষ উটটা যখন ঢাল বেয়ে নীচে নেমে পড়ল তখন ক্রো বললেন, 'এবার বাইরে বেরোনো যাক।'

সবাই মিলে এরপর এগোনো হল গেটের দিকে। আব্দুল মরূদ্যানের গেটটা সম্পূর্ণ খুলে দিল। শেখকে স্বাগত জানাবার জন্য হেরম্যান আর সুদীপ্তকে নিয়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালেন ক্রো। ক্রমশ মরূদ্যানের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল সেই উটের কাফেলা। সুদীপ্ত গুনে দেখল মোট সাতটা উট আছে।

দেখতে দেখতেই মরূদ্যানে হাজির হয়ে গেলেন আরব শেখ বীন কাশেম। তিনি মাঝবয়সি একজন লোক, পরনে ধবধবে সাদা পোশাক, কোমরবন্ধে সোনালি খাপে রাখা বাঁকানো ছুরি, কালো শ্মশ্রুমণ্ডিত শুভ্র মুখমণ্ডলে ফুটে আছে সম্ভ্রান্ত ভাব। মাথার স্কার্ফের ফিতেগুলো সোনার তৈরি। বিকালের আলোতে শেখের হাতের হীরকাঙ্গুরীয়গুলো ঝিলিক দিচ্ছে। এসব দেখে উটের পিঠে বসা শেখকে চিনতে ভুল হল না সুদীপ্তর। শেখের দু-পাশে দুটো উটে বসেছে শেখের দুই দেহরক্ষী। স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ঝুলছে তাদের পিঠ থেকে। শেখ আর তাঁর দেহরক্ষীদের পিছনে রয়েছে শেখের ভৃত্যরা। শেখের রক্ষী ও ভৃত্যদের মুখ স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা।

শেখ তাঁর উট থেকে মাটিতে নামতেই ক্রো সুদীপ্তদের নিয়ে হাজির হলেন তাঁর সামনে। ক্রো শেখের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ বিনিময়ের পর হেরম্যান ও সুদীপ্তর সঙ্গে বীন কাশেমের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই হলেন আমার বন্ধু বিখ্যাত প্রাণী বিশারদ ও ক্রিপ্টোজুলস্টি হেরম্যান ও তাঁর ভারতীয় বন্ধু সুদীপ্ত।'

হেরম্যান আর সুদীপ্ত শেখের সঙ্গে করমর্দন করার পর শেখ বীন কাশেম হেরম্যানকে বললেন, 'আপনার কথা শোনার পর ইন্টারনেট ঘেঁটে আমি আপনার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমি যে কারণে এখানে এসেছি সে ব্যাপারে আপনার উপস্থিতি ও বক্তব্য আমার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আশাকরি, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

হেরম্যান মৃদু হেসে বললেন, 'আমার পক্ষে আপনাকে যতটুকু সাহায্য করা দরকার নিশ্চয়ই তা করব।'

সুদীপ্ত শেখের কথা শুনে অনুমান করল, ওই সান লায়নের ব্যাপারেই হেরম্যানের বক্তব্য শুনতে চান শেখ।

শেখের ভৃত্যরা কিন্তু উটগুলোকে মরূদ্যানের ভিতরে ঢোকাল না। উটের পিঠের থেকে মালপত্র নামিয়ে ফেলল তারা। সে সবের মধ্যে রয়েছে বড়ো বড়ো বেশ কয়েকটা চামড়ার সুটকেস। ক্রো এরপর শেখকে মরূদ্যানের ভিতরে পদার্পণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। দেহরক্ষী দুজন আর দুজন ভৃত্যকে নিয়ে মরূদ্যানের ভিতর প্রবেশ করলেন বীন কাশেম। দুজন ভৃত্য শেখ আর সুদীপ্তদের পিছন পিছন সেই ঢাউস সুটকেসগুলো বহন করে নিয়ে চলল আর শেখের বাকি দুই ভৃত্য গেটের বাইরেই রয়ে গেল তাদের উটগুলো দেখাশোনা করার জন্য বা অন্য কোনো কারণে।

মরূদ্যানের চারদিকে তাকাতে তাকাতে সুদীপ্তদের সঙ্গে বাড়িটার দিকে এগোতে এগোতে শেখ বললেন, 'বেশ ভালোই লাগছে জায়গাটা। আমাদের একটা পারিবারিক মরূদ্যান আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে এমন একটা মরূদ্যান কিনতে আগ্রহী আমি।'

ক্রো বললেন, 'আমি ব্যাপারটা জানি বলেই তো মরূদ্যানটা বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেবার পরই আপনাকে জানালাম।'

বাড়ির ভিতর প্রবেশ করার আগে হঠাৎই চিতাবাঘের খাঁচার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন শেখ। তারপর চিতাটার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'এই লেপার্ডটা কোথা থেকে জোগাড় করেছেন?'

ক্রো বললেন, 'আমাদের হলিউড সিনেমাতে কয়েকজন লোক আছে যারা পশুপাখি সরবরাহ করে। তাদেরই একজনের থেকে কিনে এখানে এনেছিলাম। রাতে ও ছাড়া থাকে, পাহারাদারের কাজ করে।'

শেখ কথাটা শুনে বললেন, 'আপাতত আজ রাতে চিতাটাকে ছেড়ে রাখার দরকার নেই। আমার অস্ত্রধারী রক্ষীরাই রাত পাহারায় থাকবে। প্রাণীটা ছাড়া থাকলে অপরিচিত লোক দেখে কোনো বিপত্তি ঘটতে পারে।'

ক্রো শেখের কথার জবাবে বললেন, 'ঠিক আছে, প্রাণীটাকে রাতে আটকে রাখা হবে।'

শেখ বীন কাশেম এরপর জানতে চাইলেন, 'সেই প্রাণীটা কোথায়, যাকে দেখার জন্য আমি নিজে ছুটে এলাম? শুধু মরূদ্যান কেনার ব্যাপার হলে সেটা আমার লোকেরা এসেই করে যেতে পারত।'

সুদীপ্ত বুঝতে পারল শেখ সান লায়নের খোঁজ করছেন। ক্রো বললেন, 'বাড়ির পিছনে এক জায়গায় ওর থাকার ব্যবস্থা। আপনি আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে আহার-পানীয় গ্রহণ করে নিন। তারপর না হয় আপনাকে নিয়ে যাব।'

শেখ বীন কাশেম বললেন, 'অনেকটা পথ এসেছি। বিশ্রাম নিয়ে তাজা হতে আমার বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে। তখন অন্ধকার নেমে যাবে। কাল সকালে দিনের আলোতে আমি ভালো করে দেখব তাকে। আজ সন্ধ্যাটা বরং আমি আপনাদের সঙ্গে গল্প করেই কাটাব।'

ক্রো হেসে বললেন, 'তাই ভালো। তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। আপনার যেমন ইচ্ছা, তেমনই হবে।'

শেখের রক্ষী দুজন কিন্তু বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল না। বাড়িতে ঢোকার মুখে দু-পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। শুধু শেখের ভৃত্য অথবা অনুচর দুজন বাক্সগুলো নিয়ে শেখের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। বাড়ির যে অংশে সুদীপ্ত, হেরম্যান বা মরূদ্যানের মালিকের জায়গা তার বিপরীত দিকে কয়েকটা ঘরে শেখ আর তাঁর সঙ্গীদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। শেখের থাকার জন্য বেশ বড়ো একটা ঘর নির্বাচন করা হয়েছে। তার মেঝে মুড়ে ফেলা হয়েছে গালিচায়। সুদৃশ্য খাট ও আসবাবপত্রে সাজানো হয়েছে ঘরটা। টেবিলে রাখা আছে নানাবিধ ফল, খাদ্যদ্রব্য আর পানীয়। শেখকে খুশি করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন ক্রো। সুদীপ্ত একটা জিনিস অনুমান করল। ক্রো নিজে একজন ধনকুবের এবং অভিনেতা। কিন্তু সম্ভবত ক্রো

নিজে জানেন যে শেখ বীন কাশেমের অর্থ-সম্পত্তির পরিমাণের তুলনায় তাঁর নিজের সম্পত্তি কিছুই নয়। শেখকে যথাসম্ভব আরাম-আয়েশে রাখতে চেষ্টা করার অন্যতম কারণ এটিও।

নিজের ঘরে প্রবেশ করার পর শেখ জানালেন, এখন আর তাঁর জন্য ক্রো বা তাঁর লোকেদের ব্যতিব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। এখন তিনি বিশ্রাম নেবেন। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি ডাক পাঠাবেন গল্পগুজব-কথাবার্তা বলার জন্য।

ক্রোর সঙ্গে সুদীপ্ত, হেরম্যান এরপর শেখের ঘরের কাছ থেকে সরে এল। শুধু শেখের ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল আব্দুল, যদি কোনো কারণে শেখের কিছু প্রয়োজন হয় সে জন্য।

নিজেদের ঘরের দিকে আসার পর ক্রো নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'শেখ বীন কাশেমকে দেখে আপনার কী মনে হল?'

হেরম্যান ভাঙা গলাতে জবাব দিলেন, 'লোকটা যে শুধু ধনী তাই নয়। ওর চলাফেরা, কথাবার্তা বুঝিয়ে দিচ্ছে এই মরুদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে ওর ধমনীতে। একদম নিখুঁত ইংরিজিতে কথা বলছেন। অর্থাৎ শুধু অর্থ নয়, পেটে বিদ্যাও আছে।'

এ কথা বলার পর হেরম্যান বললেন, 'তুমি এখন ঘরে যাও। শেখের ডাক এলে আমি তোমাকে ডেকে নেব।'

তাঁর কথা শুনে নিজের ঘরে ফিরে এল সুদীপ্ত।

প্রায় দু-ঘণ্টা পর হেরম্যান তাকে ডাকতে এলেন। তাঁর সঙ্গে শেখ কাশেমের ঘরে ঢুকে সুদীপ্ত দেখল ইতিমধ্যে ক্রো সে ঘরে উপস্থিত হয়েছেন। বেশ কয়েকটা কাচের আবরণ ঢাকা তেলের বাতি জ্বালানো হয়েছে ঘরে। তাতে ঝলমল করছে ঘরটা। গোলাপ জল বা অন্য কোনো সুগন্ধীর সুবাস ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরে। একটা টেবিলে বসে কথা বলছিলেন শেখ আর ক্রো। হেরম্যান আর সুদীপ্তকে দেখে শেখ বললেন, 'আসুন আপনারা। আপনাদের থেকে গল্প শুনব।' শেখের আহ্বানে সুদীপ্ত আর হেরম্যান সেই টেবিল সংলগ্ন চেয়ারে বসল। শেখের দুই ভৃত্যও তাদের কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে। তাদের মুখ এখনও হেড স্কার্ফের আবরণ দিয়ে ঢাকা। শুধু তাদের চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে। হয়তো বা এটাই তাদের রীতি।

প্রথমে টুকটাক কথাবার্তা শুরু করলেন শেখ। সুদীপ্তকে তিনি জানালেন একবার তিনি ইন্ডিয়া গেছিলেন একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এরপর তিনি বেশ কিছুক্ষণ হলিউড সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন ক্রোয়ের কাছ থেকে। সেখানকার লোকজন কেমন, কীভাবে সিনেমা বানানো হয় এসব ব্যাপারে শেখ কাশেমকে নানান তথ্য জানালেন অভিনেতা ক্রো।

ক্রোয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তিনি হেরম্যানকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা তো ক্রিপ্টোজুলজিস্ট। এ শব্দ সম্পর্কে আমার একটা ধারণা আছে। তবুও আপনার কাছ থেকে এই ক্রিপ্টোজুলজির ব্যাপারে স্পষ্টভাবে জেনে নিতে চাই।'

হেরম্যান ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে শুরু করলেন—'এ পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণীর সম্বন্ধে শোনা যায়, যাদের দেখা যায় লোককথা, উপকথা বা গল্প-কাহিনিতে। অথবা এমন কোনো প্রাণী যা বহু লক্ষ বছর আগেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেউ কেউ যদিও কখনো কখনো দাবি করে থাকে যে এই সব প্রাণীকে তারা দেখেছে, কিন্তু বিজ্ঞানী মহল যতক্ষণ না এসব প্রাণীকে চাক্ষুষ করেন, ততক্ষণ তাদের অস্তিত্বকে তাঁরা স্বীকার করেন না। এসব গল্পকথা, রূপকথা বা পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রাণীকে বলা হয় 'ক্রিপ্টিড'। এই যেমন হিমালয়ের তুষার মানব বা ইয়েতি, আমেরিকার বিগফুট, মাদাকাস্কারের মানুষখেকো গাছ, সমুদ্রের দানব অক্টোপাস বা আপনাদের সিন্দাবাদ নাবিকের গল্পের বিশাল বক পাখি অথবা মরু উপজাতিদের মুখে শোনা সান লায়ন বা গোল্ডেন লায়ন। ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের কাজ হচ্ছে এদের নিয়ে গবেষণা করা ও এদের খুঁজে বেড়ানো। বেশ কয়েকটা এ ধরনের প্রাণীর অস্তিত্বও কিন্তু ইতিমধ্যে প্রমাণ করে ফেলেছেন জীববিজ্ঞানী ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা।'

হেরম্যানের কথা শুনে শেখ বললেন, 'এবার পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট হল আমার কাছে। আপনারা দুজন তো পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন এসব প্রাণীর খোঁজে?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, পৃথিবীর নানান প্রান্তে, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল সর্বত্রই আমরা ঘুরে বেড়াই ক্রিপ্টিডের খোঁজে। রোমাঞ্চকর সব অভিযান। আপনি চাইলে আমার বন্ধু তেমনই এক অভিযানের কাহিনি শোনাতে আপনাকে প্রস্তুত হয়ে আছে।'

কথাটা শুনেই শেখ উৎফুল্লভাবে বলে উঠলেন, 'বাঃ তাহলে তো ভালোই হয়। আমি গল্প শুনতে খুব ভালোবাসি। সিগার ধরিয়ে আমেজ করে গল্পটা শুনি।'

এ কথার পর শেখ ঘরের মধ্যে রাখা বিরাট একটা চামড়ার সুটকেস দেখিয়ে তাঁর এক ভৃত্যকে বললেন, 'ওটা এখানে আনো। ওর মধ্যে আমার সিগারের প্যাকেট আর লাইটার রেখেছি।'

শেখ কাশেমের নির্দেশ পালন করে তাঁর অনুচর সেই ঢাউস সুটকেসটা সুদীপ্তদের সামনে টেবিলের ওপর রাখল। শেখ সুটকেসটা খুলতেই সবারই চোখ আটকে গেল তার ভিতর। সুটকেসের মধ্যে থরে থরে সাজানো আছে সোনার বাট আর মার্কিন ডলারের বান্ডিল! কোনো মানুষের কাছে একসঙ্গে এত সোনা আর টাকা ইতিপূর্বে দেখেনি সুদীপ্ত। সম্ভবত বেশ কয়েক কোটি মার্কিন ডলারের সম্পদ আছে বিরাট সুটকেসটার মধ্যে! শেখ ধীরে-সুস্থে বাক্সের ভিতর একটা পকেট থেকে সিগারের প্যাকেট ও সোনালি রঙের লাইটার বার করলেন। তাঁর লাইটারটাও সম্ভবত সোনার হবে। কাজ মেটার পর তিনি আবার বাক্সটা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর ভৃত্য টেবিলের ওপর থেকে সুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে রেখে দিল নির্দিষ্ট স্থানে। শেখ সিগার ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিয়ে সুদীপ্তকে বললেন, 'এবার গল্পটা বলুন।'

তাঁর কথা শুনে সুদীপ্ত শুরু করল তাদের সোনার ড্রাগনের খোঁজে অভিযানের কাহিনি। কীভাবে তারা ইন্দোনেশিয়াতে অভিযানে গেল, কীভাবে তারা গিয়ে পৌঁছল জঙ্গলের ভিতর প্রাচীন মন্দিরে সোনার ড্রাগনের আবাসস্থলে, কীভাবে সুদীপ্তরা সোনার ড্রাগন আর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাওয়া এক বামন উপজাতির সন্ধান পেল, সে সব রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ দিয়ে যেতে লাগল সে। শেখ

শুনতে থাকলেন সুদীপ্তর কাহিনি। বাইরে বেড়ে চলল রাত।

সুদীপ্তর গল্প বলা যখন শেষ হল তখন রাত দশটা বেজে গেছে। তার গল্প বলা শেষ হতেই শেখ বলে উঠলেন, 'তোফা, তোফা। আপনার এ কাহিনি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। খুব সাহসী লোক আপনারা।'

এ কথা বলার পর শেখ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাল সকালে আবার আমাদের দেখা হবে। আমার এখন ডিনারের সময় হয়ে গেছে।'

শেখের ঘর থেকে বেরিয়ে ক্রো আব্দুলের সঙ্গে এগোলেন অন্যদিকে। আর হেরম্যানের সঙ্গে সুদীপ্ত এগোল নিজের ঘরে ফেরার জন্য।

বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ্ত বলল, 'লোকটা কত টাকা আর সোনা সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন দেখলেন?'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'এসব টাকা ওদের কাছে সামান্য। সম্ভবত শেখ মরূদ্যানটা কেনার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। সোনা বা নগদেই এখানে সম্পত্তির হাতবদল হয়।'

হেরম্যান এরপর বললেন, 'এবার যা আমার অবস্থা হল তাতে দুজনের একান্তে আড্ডা দেওয়াই হচ্ছে না। কাল আশা করি কেনা-বেচার ব্যাপারটা ভালোভাবে মিটে যাবে। তাহলে পরশুই বেরিয়ে পড়ব আমরা। আবুধাবি থেকে সোজা দুবাই যাব। সেখানে ভালো ডাক্তার দেখিয়ে তোমার সঙ্গে কটা দিন সময় কাটিয়ে দেশে ফিরব।'

কথাটা শুনে সুদীপ্ত বলল, 'বাঃ বেশ ভালো পরিকল্পনা, তবে তাই হবে।'

এরপর হেরম্যান নিজের ঘরে ফিরে গেলেন আর সুদীপ্তও ঘরে ফিরে এল।

আধঘণ্টা পর আব্দুল রাতের খাবার দিয়ে গেল। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল সুদীপ্ত। এ রাতে কিন্তু শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম নেমে এল তার চোখে।

তবে তার ঘুম কিন্তু ঘণ্টাখানেকের বেশি স্থায়ী হল না। সিংহটা রোজ নির্দিষ্ট সময়ই ডাকে। সুদীপ্তর সে শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল। পাশ ফিরে শুল সে। বাইরে চাঁদের আলো। জানলার কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছে খেজুর গাছের গুঁড়িটা। সেদিকেই তাকিয়ে রইল সে।

কয়েক মিনিট পর হঠাৎই তার মনে হল, গাছের গুঁড়িটা যেন একটু নড়ল। ভালো করে তাকাবার পর সে বুঝতে পারল, গুঁড়ি নয়, আসলে একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে গুঁড়ির গায়ের সঙ্গে মিশে। সে লোকটাই নড়ল! সুদীপ্তর মনে হল লোকটা যেন তার ঘরের ভিতরই দেখার চেষ্টা করছে! কে ও? গত রাতের সেই চোরটা আবার মরূদ্যানে ঢোকেনি তো? কথাটা মনে হতেই বিছানা থেকে নেমে এগোল জানলার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই সেই লোকটা গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে নিমেষের মধ্যে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল অন্য কোথাও। এ লোকটার পরনেও আরবি পোশাক ছিল, মাথার স্কার্ফ দিয়ে মুখ ঢাকা। সুদীপ্ত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চেষ্টা করতে লাগল লোকটাকে দেখার। লোকটাকে আর সে দেখতে পেল না। তবে সে আব্দুলকে দেখল। আব্দুল একটা কাঠের বালতি নিয়ে বাড়ির পিছন দিক থেকে এসে সামনের দিকে চলে গেল। সম্ভবত সিংহটাকে খাবার খাইয়ে ফিরল সে। সুদীপ্ত এরপর বিছানায় ফিরে এল।

সকাল আটটা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে ঘর থেকে বেরিয়ে সুদীপ্ত বারান্দার বিপরীত দিকে শেখের ঘরের কাছে পৌঁছোতেই দেখতে পেল তাঁর ঘরের দরজার বাইরে ক্রো আর হেরম্যান দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আব্দুলও। তাঁদেরকে সুদীপ্ত গুডমর্নিং জানাবার পর হেরম্যান সুদীপ্তকে প্রশ্ন করলেন, 'ঘুম কেমন হল?'

হেরম্যানের ভাঙা গলা এদিনও ঠিক হয়নি। সুদীপ্ত বলল, 'ভালো।'

এরপর সে গত রাতের সেই লোকটার কথা জানাতে যাচ্ছিল হেরম্যানকে, কিন্তু তার আগেই দরজা খুলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এলেন শেখ। বাইরে দাঁড়ানো ক্রো, হেরম্যান আর সুদীপ্তর সঙ্গে তিনি প্রভাতী সম্ভাষণ বিনিময়ের পর বললেন, 'চলুন এবার, যাকে দেখার জন্য আমি এখানে এসেছি তার কাছে যাওয়া যাক?'

ক্রো বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন।'

শেখকে নিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল তারা। শেখ কাশেমের অস্ত্রধারী দেহরক্ষী দুজন কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সুদীপ্তদের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে শেখ এগোতেই তারাও সুদীপ্তদের অনুসরণ করল। বাড়ির পিছন দিকে পশু-পাখিদের ঘরগুলোর সামনে পৌঁছে গেল সকলে। খাঁচাগুলো দেখতে দেখতে শেখ বললেন, 'মরূদ্যানটা যদি আমি কিনি তবে পশু-পাখির সংখ্যা আরো বাড়াব।'

সাধারণ পশু-পাখির খাঁচাগুলো শেখকে দেখানোর পর সুদীপ্তরা তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হল সান লায়নের ঘরের সামনে। পর্দাটার সামনে এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে একটা 'চক চক' শব্দ কানে এল। ক্রোর ইঙ্গিতে আব্দুল দড়ি ঠেলে পর্দাটা সরিয়ে দিল। আলো ছড়িয়ে পড়ল গরাদের ভিতর। ঘরটার কোণে একটা বেশ বড়ো চৌবাচ্চা আছে। তার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জল খাচ্ছিল প্রাণীটা। ওই শব্দটা তারই। ঘরে আলো ঢুকতেই মুখ তুলে তাকাল প্রাণীটা। কী আশ্চর্য সুন্দর জানোয়ার! যেমন বিশাল তেমন সুন্দর! শেখও বিমোহিত ভাবে চেয়ে রইলেন প্রাণীটার দিকে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাকভাবেই কেটে গেল। ক্রো এরপর সিংহটার উদ্দেশে 'আয় আয়' বলে ডাক শুরু করলেন। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল বিশাল প্রাণীটা। তারপর সে মাথা ঘষতে লাগল জাল বসানো গরাদের গায়ে। প্রাণীটার সোনালি কেশর আর দেহ থেকে যেন হলদে আগুন ঝিলিক দিচ্ছে। সত্যিই যেন প্রাণীটা সান লায়ন অথবা সোনার সিংহ!

ক্রো এরপর জালের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে প্রাণীটার মাথাটা চুলকে দিলেন। একদম কাছ থেকে দেখে সুদীপ্ত এবার একটা জিনিস খেয়াল করল। প্রাণীটার কপালে ছিট ছিট কতগুলো কালো রঙের ফুটকি আছে।

শেখ বিস্ময়ের স্বরে বললেন, 'আমি এমন জন্তু আগে কোথাও দেখিনি! শুধু গল্পের বইতে এমন সিংহের কথা পড়েছি বা গল্প শুনেছি।'

এ কথা বলার পর শেখ ক্রোয়ের কাছে জানতে চাইলেন, সিংহটা তিনি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন?

ক্রো এ ব্যাপারে সুদীপ্তকে যে কাহিনি শুনিয়েছিলেন, সেই একই কাহিনি বিবৃত করলেন শেখকেও। সিংহটা গরাদের কাছ থেকে সরে গিয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের এক কোণে।

শেখ বীন কাশেম এরপর বেশ কিছুক্ষণ সিংহটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, 'মিস্টার হেরম্যান, আপনি নিশ্চিত তো যে এই প্রাণীটাই আমাদের গল্পগাথায় বর্ণিত সেই সান লায়ন? আপনি পণ্ডিত মানুষ। এসব ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আপনার বক্তব্যর ওপরই কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে।'

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'আমি নিশ্চিত এই প্রাণীটাই আরব উপকথার সেই সান লায়ন। এর গায়ের রঙের জন্য অনেক কাহিনিতে একে সোনার সিংহও বলা হয়েছে।'

শেখ আবারও প্রশ্ন করলেন, 'কোনো ধোঁকা নেই তো?'

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন শুনে হেরম্যান এবার একটু আহত কণ্ঠে বললেন, 'মিস্টার বীন কাশেম। ক্রো আর আপনার মধ্যে প্রাণীটা কেনা-বেচার ব্যাপারে আমার কোনো স্বার্থ নেই। আমার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা ও কাজের ব্যাপারে আমি একদম সৎ। নইলে নিজের পয়সা খরচা করে এই সব প্রাণীর সন্ধানে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম না। জার্মানির অথবা পৃথিবীর যে-কোনো শহরে আরাম-আয়েশ করে জীবন কাটিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার আছে। ক্রোকে আমি আপনার কাছে প্রাণীটা বিক্রি করার প্রস্তাব রাখতে বলেছি কারণ আমি চাই প্রাণীটা ওর স্বাভাবিক বাসস্থান অর্থাৎ মরু অঞ্চলেই থাকুক। আমার সার্টিফিকেটের ওপর ভিত্তি করে ক্রো কিন্তু ইওরোপ-আমেরিকার কোনো ধনকুবেরের কাছেও প্রাণীটা বিক্রি করতে পারে। সিংহটাকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওকে কেনার লোকের অভাব হবে না। আমাকে মার্জনা করবেন আপনাকে একথাগুলো বলার জন্য।'

হেরম্যানের মনের ভাব বুঝতে পেরে শেখ বললেন, 'আমার কথায় আপনি আহত হয়ে থাকলে আমি দুঃখিত। আসলে আমি তো প্রাণী বিশেষজ্ঞ নই। তাই প্রাণীটাকে কেনার আগে ওর পরিচয় সম্পর্কে আমার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এটা সাধারণ সিংহ হলে ওর সম্পর্কে আপনাকে আমি প্রশ্ন করতাম না।'

একথা বলার পর শেখ বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন প্রাণীটার পরিচয় নিশ্চিত করলেন তখন আমি প্রাণীটাকে কিনতে রাজি আছি। মিস্টার ক্রো আপনি এই সান লায়ন আর এই মরূদ্যানের জন্য কী দাম ঠিক করেছেন বলুন?'

ক্রো যেন এ প্রশ্নর জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন, 'সিংহটার দাম আমি ধরেছি এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমাকে দিতে হবে এই মরূদ্যানের জন্য। আমার কেনা দামেই আমি মরূদ্যানটা অন্য পশুপাখি জিনিসপত্র সমেত তুলে দেব আপনার হাতে।'

সুদীপ্ত হিসাব করে দেখল ভারতীয় মুদ্রাতে প্রায় আট কোটি টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে সিংহটার জন্য! একই দাম মরূদ্যানটারও!

প্রস্তাবটা শুনে একটু ভেবে নিয়ে শেখ বীন কাশেম বললেন, 'যদিও দামটা একটু বেশি বললেন তবু তাই দেব। টাকা আমার সঙ্গেই আছে। আমি আজ এখানে থাকব। কাল আমি আপনাকে আবুধাবি নিয়ে যাব বিক্রয়পত্র করার জন্য। অবশ্য সেখানে আপনাকে নিয়ে যাবার আগেই টাকাটা আমি আপনার হাতে তুলে দেব। সম্পত্তি বিক্রির পর আপনি যদি এখানে কটা দিন থাকতে চান তাহলেও আমার আপত্তি নেই।'

কথাটা শুনে ক্রো বললেন, 'না, সম্পত্তি আর সিংহটা বিক্রি করার পর আমি আর এ জায়গার মায়া বাড়াব না। আবুধাবি থেকেই দেশে ফেরার জন্য রওনা হয়ে যাব।'

হেরম্যান তাঁকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'ঠিকই করবে তুমি। শুধু শুধু এ জায়গার মায়া বাড়িয়ে মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আর আমি, সুদীপ্তও কাল তোমাদের সঙ্গে বেরিয়ে আবুধাবি হয়ে দুবাইয়ের দিকে রওনা হয়ে যাব।'

কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গেল। সুদীপ্ত এসব কথা শুনে একটা জিনিস বুঝতে পারল যে ওই দুই মিলিয়ান মার্কিন ডলার শেখ বীন কাশেমের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। নইলে তিনি এত সহজে ক্রোর দাবি মতো টাকা দিতে রাজি হতেন না।

সান লায়নটা এরপর সম্ভবত ঘুমাবার আগে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। সে জানলই না তার মালিকানা বদলের কথা পাকা হয়ে গেল। আব্দুল পর্দাটা টেনে দিল।

চিতাটা এরপর লোকটাকে ধরার জন্য গর্জন করে লাফ দিল ওপর দিকে।
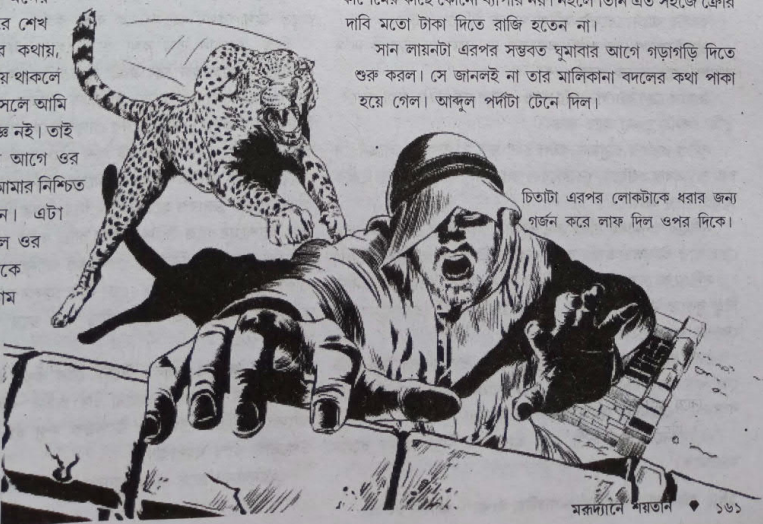
সে জায়গা থেকে সরে আসার পর শেখ কিছুক্ষণ ধরে বাড়ির চারপাশটা আর মরূদ্যানটা ভালো করে দেখে নিলেন। সান লায়নটার ব্যাপারে তিনি বেশ খুশিই হয়েছেন বলে মনে হল। কারণ ঘুরতে ঘুরতে কথা প্রসঙ্গে তিনি একবার বললেন, 'আমি যদি কোনোদিন আমিরের আসনে বসি তবে এই সান লায়নকেই সরকারি প্রতীক চিহ্ন করব।'

রোদ ক্রমশ কড়া হতে শুরু করেছে। তাই শেখের মরূদ্যান দেখার পর সবাই আবার বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। ক্রো শেখকে নিয়ে চললেন শেখের ঘরের দিকে। হেরম্যান সুদীপ্তকে জানালেন যে শেখের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর গলাটা আবার ব্যথা করছে। তাই তিনি ঘরে যাচ্ছেন গার্গল করার জন্য। হেরম্যান তাঁর ঘরে চলে যাবার পর সুদীপ্তও তার নিজের ঘরে ফিরে এল।

বেলা বাড়তে থাকল। ঘরে একলা বসে থাকতে সুদীপ্তর ভালো লাগছিল না। হঠাৎ তার মনে হল গত রাতের লোকটার কথা একবার হেরম্যানকে জানিয়ে রাখা দরকার। শেখের সামনে কথাটা আর বলা হয়নি তাঁকে। কথাটা হেরম্যানকে জানাবার জন্য ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে হেরম্যানের ঘর যেদিকে সেদিকে এগোল সে। ইতিপূর্বে তাঁর ঘরে যায়নি সুদীপ্ত। হেরম্যান তাঁর ঘরের অবস্থান যেখানে বলেছিলেন সেখানে পৌঁছে সুদীপ্ত ঘরগুলোর দিকে তাকাতে লাগল হেরম্যান কোন ঘরে আছেন তা বোঝার জন্য! হঠাৎই একটা ঘরের ভিতর থেকে অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ শুনতে পেল সে। ঘরের দরজার পাল্লাদুটো সামান্য একটু ফাঁক করা। সেটা হেরম্যানের ঘর মনে করে সে সেই দরজার কাছে গিয়ে তার উপস্থিতির কথা হেরম্যানকে জানাতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই সে শুনতে পেল সেই ঘরের ভিতর ক্রোয়ের কণ্ঠস্বর। ক্রো কাউকে বললেন, 'দুই মিলিয়ন ডলারের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ টাকা আছে শেখের সুটকেসে। অন্য সুটকেসেও টাকা বোঝাই থাকতে পারে। সেগুলোই বা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেব কেন?'

কথাটা কানে যেতেই সুদীপ্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

যার উদ্দেশে ক্রো কথাটা বললেন, সে বলল, 'তাহলে কি আমি আমার লোকজনকে খবর দেব?'

জবাবে ক্রো বললেন, 'হ্যাঁ, দাও। তাতে তোমারও ভাগ্য খুলবে। তুমি এখনই রওনা হয়ে যাও।'

সুদীপ্ত এরপর অনুমান করল ক্রো যার সঙ্গে কথা বলছেন সে হয়তো এবার বাইরে বেরোবে। তাই সে দরজার কাছ থেকে কিছুটা সরে এল।

সুদীপ্তর অনুমানই সত্যি হল, দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ক্রো আর আব্দুল। অর্থাৎ আব্দুলের সঙ্গেই কথা বলছিলেন ক্রো।

সুদীপ্তকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। তাদের দুজনকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সুদীপ্ত ক্রোকে প্রশ্ন করল, 'হেরম্যানের ঘর কোনটা বলুন তো?'

ক্রো পাশের ঘরটা দেখিয়ে সুদীপ্তকে প্রথমে বললেন, 'এই তো এই ঘরটা।' তারপর সে ঘরে থাকা হেরম্যানের উদ্দেশে বললেন, 'হেরম্যান তোমার বন্ধু এসেছেন।'

হেরম্যানকে হাঁক দিয়ে ক্রো আব্দুলকে নিয়ে রওনা হলেন অন্যদিকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দরজা খুললেন হেরম্যান। সুদীপ্ত প্রবেশ করল তাঁর ঘরে।

ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে মুখোমুখি বসল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। ক্রো আর আব্দুলের অদ্ভুত কথোপকথন তখনও কানে বাজছে সুদীপ্তর। হেরম্যানকে সে প্রথমে প্রশ্ন করল, 'আপনার গলার অবস্থা এখন কেমন?'

হেরম্যান ভাঙা গলাতে জবাব দিলেন, 'ওই একইরকম। গার্গল বা সেঁক দিলে কিছু সময়ের জন্য কমছে, তারপর আবার বাড়ছে।'

সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম। গত রাতে একটা লোক আমার ঘরের জানলার পাশে খেজুর গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছিল। ঠিক যখন সান লায়নটা ডাকল তখনকার ঘটনা। আমি জানলার কাছে যেতেই মুখ ঢাকা লোকটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল!'

কথাটা শুনে হেরম্যান একটু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'পরশু রাতের চোরটা দ্বিতীয়বার এ বাড়িতে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না। কারণ সে চিতাটাকে পাহারাতে থাকতে দেখেছিল। এক হতে পারে শেখের সঙ্গে আসা কোনো লোক তোমার জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি মরূদ্যানে প্রবেশ করেছিল। যাই হোক না কেন ঘটনাটা সন্দেহজনক। আমি কথাটা ক্রোকে জানিয়ে রাখছি। শেখের সুটকেসে অতগুলো টাকা আছে। যদিও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা আছে তবুও ক্রো-এর তরফ থেকেও বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো।'

হেরম্যানের কথার পর সুদীপ্ত একটু ইতস্তত করে বলল, 'আরও একটা ব্যাপার আমার আপনাকে জানানোর আছে। আপনার বন্ধু ও তাঁর ভৃত্যর কথা আমার কাছে যেন সন্দেহজনক লাগছে!'

হেরম্যান ভ্রু কুঁচকে জানতে চাইলেন, 'এর মানে?'

সুদীপ্ত প্রশ্নের জবাবে কিছুক্ষণ আগে শোনা ক্রো আর আব্দুলের অদ্ভুত কথোপকথন হেরম্যানকে ব্যক্ত করল।

কিন্তু হেরম্যান তার কথা শুনে হেসে ফেলে বললেন, 'এ ব্যাপারটা আসলে হল ক্রো একটা উটের রেসের আয়োজন করতে চায় শেখের জন্য। আব্দুলের পরিচিত একদল লোক আছে যারা উটের দৌড় করায়। শেখ উটের দৌড় ভালোবাসেন। এই দৌড়ের আয়োজন করলে শেখ নিশ্চয়ই খুশি হয়ে আব্দুলকে তাঁর সুটকেস থেকে বখশিশ দেবেন। আর শেখেদের বখশিশ মানে জানো তো? কয়েক হাজার ডলারও হতে পারে। আর ক্রোর নিজেরও ইচ্ছা আছে শেখ কাশেমের সঙ্গে উটের দৌড়ে বাজি ধরার। ক্রো আমাকে তার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে, শেখকেও জানিয়েছে। শেখ কাশেমও ব্যাপারটাতে বেশ উৎসাহিত। ক্রো আর আব্দুল তা নিয়েই আলোচনা করছিল। আব্দুল সেই উটের দৌড় যারা করে তাদেরকেই ডেকে আনতে গেল।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'উটের রেস কখন হবে?'

হেরম্যান বললেন, 'রাতে চাঁদ ওঠার পর। শুনেছি চাঁদের আলোতে উটের রেস খুব উত্তেজক দৃশ্য হয়। আমি, তুমি খুব উপভোগ করব ব্যাপারটা।'

হেরম্যানের সঙ্গে এরপর আরও টুকটাক কিছু কথা বলে সুদীপ্ত

নিজের ঘরে ফিরে এল। তবে ক্রো আর আব্দুলের কথোপকথন প্রসঙ্গে সুদীপ্তকে হেরম্যান ব্যাখ্যা করলেও কেন জানি সেই কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল সুদীপ্তর মনে। সে আর ঘরের বাইরে বেরোল না। নানান জায়গাতে সে হেরম্যানের সঙ্গে গেছে। কিন্তু এই প্রথমবার কোনো একটা জায়গায় এসে কেমন যেন একলা মনে হতে লাগল নিজেকে। হয়তো বা সেটা হেরম্যানের সঙ্গে গল্প না করতে পারার কারণেই। দিন কেটে গিয়ে একসময় বিকাল হল। রোদের তেজ একটু কমতেই সুদীপ্ত ঘর থেকে বাইরে বেরোল। বাড়ির বাইরে পা রাখতেই সে দেখতে পেল ক্রো দাঁড়িয়ে আছেন। সুদীপ্তর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, 'আজ রাতে একটা সুন্দর জিনিস দেখতে পাবেন। সম্ভবত আগে তা কোনোদিন দেখেননি।'

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, 'কী জিনিস?'

ক্রো বললেন, 'উটের দৌড়। আমারও হয়তো আর এ দৌড় দেখার সুযোগ হবে না। কালই তো আমি এই মরূদ্যান ছেড়ে রওনা হয়ে যাব। তারপর দু-একদিনের মধ্যে এই আরব মুলুক ছেড়ে পাড়ি দেব আমেরিকা।'

সুদীপ্ত বলল, 'হেরম্যান বলছিলেন, আপনি উটের দৌড়ের আয়োজন করেছেন।'

ক্রো বললেন, 'হ্যাঁ, আব্দুল গিয়ে যারা উটের দৌড়ে অংশ নেবে তাদের সবাইকে খবর দিয়ে এসেছে। সন্ধ্যা নামলেই তারা এসে পড়বে। যাই একবার খোঁজ নিয়ে দেখি শেখ কী করছেন?' এ কথা বলে তিনি বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন। সুদীপ্ত একলা ঘুরতে শুরু করল মরূদ্যানের মধ্যে। দূরের বালু টিলার আড়ালে ধীরে ধীরে সূর্য মুখ লুকাতে শুরু করল। তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়তে লাগল মরুময় এই পৃথিবীতে। হেরম্যানের সঙ্গে বিশ্বের নানান প্রান্তে অভিযানের সুবাদে সুদীপ্ত একটা জিনিস খেয়াল করেছে যে পৃথিবীর কোনো প্রান্তের পরিবেশ যতই প্রাণহীন অথবা রুক্ষ হোক না কেন সময় বিশেষে প্রকৃতি তার মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। যেমন এই সূর্যাস্তের সময় এই বালুময় মরুভূমির সৌন্দর্য। সাদা বালির সমুদ্রে যেন কৃষ্ণচূড়ার রং লাগতে শুরু করেছে বিদায়ী সূর্যের আলোতে। এ যেন এক অপার্থিব সৌন্দর্য! সুদীপ্ত বেশ কিছুক্ষণ মরূদ্যানের মধ্যে ঘুরে বেড়াল, তারপর যখন বাড়ির কাছে ফিরে এল তখন সে দেখল হেরম্যান বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুদীপ্ত পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি প্রথমে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী অপরূপ সূর্যাস্ত দেখেছ?'

সুদীপ্ত বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই অপূর্ব।'

এরপর সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'তাহলে কালই আমরা রওনা হচ্ছি তো?'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, তেমনই তো কথা আছে।'

এ কথা বলার পর হঠাৎ তিনি সুদীপ্তকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার সঙ্গে কোনো হাতিয়ার এনেছ? ছুরি বা পিস্তল, এ ধরনের কোনো কিছু?'

প্রশ্নটা শুনে সুদীপ্ত অবাক হয়ে বলল, 'আমি তো হাতিয়ার বহন করি না। যে সব অভিযানে প্রয়োজন হয়েছে তখন আপনিই তো তা সংগ্রহ করেছেন। হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন? কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখছেন নাকি?'

হেরম্যান ভাঙা গলায় হেসে বললেন, 'না, না, সে সব কিছু নয়। দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম তুমি এক হাতে ছুরি অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! স্বপ্নটা মনে পড়ল তাই মজা করে জানতে চাইলাম।'

সুদীপ্ত হাসল হেরম্যানের কথা শুনে। ঠিক এই সময় বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন ক্রো। হেরম্যানের উদ্দেশে তিনি বললেন, 'তোমার সঙ্গে একান্তে কিছু আলোচনার ব্যাপার ছিল। যদি আমার ঘরে আসো ভালো হয়।'

কথাটা শুনে হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'আমি ক্রোয়ের ঘরে আছি। উটের দৌড় দেখার জন্য বাইরে যাবার আগে তোমাকে ডাক দেব।'

বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলেন হেরম্যান। সুদীপ্তও অগত্যা কিছু সময়ের মধ্যে ঘরে ফিরে এল। সূর্য ডুবে গিয়ে একসময় অন্ধকার নামল বাইরে।

রাত ন-টা নাগাদ হেরম্যান এসে উপস্থিত হলেন সুদীপ্তর ঘরে। তিনি বললেন, 'চলো এবার বেরোতে হবে। বাইরে বেরোবার জন্য সকলে প্রস্তুত হয়ে গেছেন।'

হেরম্যানের পিছন পিছন এগিয়ে বাড়ির বাইরে বেরোতেই সুদীপ্ত দেখল ইতিমধ্যেই শেখ বীন কাশেম তাঁর অনুচরদের নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্রো আর আব্দুলও দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে। সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেই ক্রো বললেন, 'চলুন এবার এগোনো যাক। আজ কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখেছেন! অনেক দূর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাবে। রেস দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না আমাদের।'

সবাই মিলে এরপর এগোল মরূদ্যানের বাইরে গেটের দিকে। বাইরে বেরোতেই সুদীপ্ত দেখতে পেল গেটের বাইরে উপস্থিত উটের দৌড়ে যোগ দিতে আসা লোকগুলোকে। গেটের একপাশে উট নিয়ে সার বেঁধে বসে আছে তারা। পনেরোজন মতো লোক হবে। আর অন্যপাশে রয়েছে শেখের সাতটা উট আর তিনজন লোক। শেখ বাইরে আসতেই সব লোকজন, যে যেখানে ছিল উঠে দাঁড়িয়ে শেখকে সেলাম জানাল। শেখও মাথা নেড়ে তাদের সেলাম গ্রহণ করলেন। সত্যিই চাঁদের আলোতে অপূর্ব সুন্দর আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারপাশ। যেন বালি নয়, শ্বেতশুভ্র মর্মর বিছানো রয়েছে দিগন্ত পর্যন্ত। তার মধ্যে কাছে-দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটো-বড়ো টিলা। বড়ো যে টিলাটা আছে সেদিকে বেশ খানিকটা দূরে একটা বড়ো দণ্ডের মাথায় পতাকা উড়ছে। সেটা দেখিয়ে ক্রো বললেন, 'আব্দুল সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। ওটাই হল ফিনিশিং পয়েন্ট। ওখানে যাওয়া যাক। আব্দুল এদিক থেকে রেস স্টার্ট করাবে। তবে একটা সমস্যা। আমাদের কাছে তো বন্দুক নেই। আপনার একজন দেহরক্ষীকে বলুন যে ওখানে থাকবে। আব্দুল বললে সে একটা গুলি ছুড়বে রেস শুরু করার জন্য। আমি একটা টর্চ জ্বালিয়ে রেস শুরু করার ইঙ্গিত দেব।'

শেখ বললেন, 'ঠিক আছে তাই হবে।'

ক্রো এরপর শেখকে বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে দশ হাজার ডলারের একটা বাজি ধরতে চাই আপনার আপত্তি না থাকলে। আপনি উট পছন্দ করুন, আমিও করছি।'

শেখ বললেন, 'হ্যাঁ, বাজি না হলে উটের রেস ঠিক জমে না। আমি রাজি।'

উটচালকরা এরপর উটগুলোর পিঠে উঠে তাদের দাঁড় করাল। বাজির জন্য শেখ আর ক্রো কয়েকটা উট পছন্দ করলেন। শেখের পছন্দের উটের পায়ে সাদা রিবন আর ক্রো-র পছন্দ করা উটগুলোর পায়ে কালো রিবন বেঁধে তাদের চিহ্নিত করে দিল আব্দুল। এ কাজ মেটার পর শেখ আর তাঁর একজন দেহরক্ষী ও দুজন অনুচর সমেত ক্রো, হেরম্যান, সুদীপ্ত এগোল ফিনিশিং পয়েন্টের দিকে।

সেই পতাকার নীচে পৌঁছে গেল সবাই। পিছনের বড়ো টিলাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শেখ কাশেম ক্রোকে বললেন, 'নিন, এবার শুরু করতে বলুন।'

সুদীপ্তরা দেখতে পাচ্ছে ওপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে ছুটবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে উটগুলো। একদম নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো। শেখের কথা শুনে ক্রো পকেট থেকে টর্চ বার করে জ্বালিয়ে কয়েকবার সেটা নাড়ালেন ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকা আব্দুলের উদ্দেশে। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। তারপরই একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে উটগুলোও ছুটতে শুরু করল।

এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। চাঁদের আলোতে ঝড়ের মতো ছুটে আসছে উটগুলো। তাদের সওয়ারিরা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে উটের পিঠ ছেড়ে। উটগুলোর পায়ের আঘাতে বালির ঝড় উঠছে তাদের চারপাশ ঘিরে। দেখতে না দেখতেই উটগুলো সুদীপ্তদের কাছে পৌঁছে গেল। সুদীপ্ত খেয়াল করল প্রথম যে উটটা তাদের পাশ দিয়ে পতাকাটা অতিক্রম করে গেল, তার পায়ে সাদা রিবন বাঁধা। অর্থাৎ বাজি জিতলেন শেখ। আর শেখও সেটা নিজে খেয়াল করে আরবিতে উল্লাস প্রকাশ করে কী যেন বললেন।

গতিময়তার জন্য সব উটগুলোই একে একে পতাকা অতিক্রম করে টিলার দিকে চলে গেল, তারপর ফিরে এসে বৃত্তাকারে দাঁড়াল সুদীপ্তদের ঘিরে।

শেখ বললেন, 'আমি সব কটা উটকেই পুরস্কৃত করব। বেশ লাগল দৌড়।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন ফেরা যাক। ক্রো-ও এবারে আপনাকে আপনার প্রাপ্য প্রদান করবে।'

মরূদ্যানে ফেরার জন্য হাঁটতে শুরু করল সকলে। তাদের চারপাশ ঘিরে উটচালকরা। কিন্তু কিছুটা হাঁটার পরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একজন লোক হঠাৎ উটের পিঠ থেকে প্রথমে আচমকা লাফ দিল শেখের দেহরক্ষীর ওপর। মাটিতে পড়ে গেল দেহরক্ষী। আর এরপরই শেখ আর সুদীপ্তর ওপরও উট থেকে ঝাঁপ দিল কয়েকজন। মাটিতে পড়ে গেল সুদীপ্তরাও। যারা তাদের ধরেছে তাদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সুদীপ্ত। সেই অবস্থাতে সুদীপ্ত দেখল কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন হেরম্যান আর ক্রো। তাঁরা সাহায্যে এগিয়ে না এসে অন্য লোকগুলোর সঙ্গে সুদীপ্তর লড়াই দেখছেন। তাঁরা কি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন?

আর এরপরই একটা ঘটনা ঘটল, শেখের রক্ষী তখনও সুদীপ্তর মতোই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল উটচালকদের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। লোকগুলো চেষ্টা চালাচ্ছিল তার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। আর সেই টানাটানিতেই সম্ভবত ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বেরোতে শুরু করল প্রচণ্ড শব্দ করে। গুলির আঘাতে ছিটকে পড়ল রক্ষীর সঙ্গে জাপ্টাজাপ্টি করা একজন। আর এরপরই সেই গুলির শব্দের প্রত্যুত্তরেই যেন একসঙ্গে মরুভূমি কাঁপিয়ে বেশ কয়েকটা বন্দুকের শব্দ শোনা গেল টিলার দিক থেকে। সুদীপ্তদের ঘিরে থাকা উটচালকরাও কেউ কেউ এবার আগ্নেয়াস্ত্র বার করে টিলা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে লাগল। চারপাশে মুহূর্তের মধ্যে এক প্রচণ্ড অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। গুলির শব্দ আর চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজে মরুভূমির নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যেতে লাগল। তবে টিলার দিক থেকেই আক্রমণের তীব্রতা বেশি। অবিশ্রান্ত গুলি সেদিক থেকে ছুটে আসছে সুদীপ্তর আশেপাশের উটচালকদের লক্ষ্য করে। আর মরূদ্যানের দিক থেকেও শেখের উটগুলো ছুটে আসতে শুরু করল। তাদেরও লক্ষ্য যেন যারা সুদীপ্তদের বন্দি করার চেষ্টা করছিল সেই উটের রেস করতে আসা লোকগুলো। টিলার দিক থেকে আসা গুলির আঘাতে সুদীপ্তর আশেপাশে বেশ কয়েকজন লোক উটের পিঠ থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল। তা দেখে সুদীপ্তকে যারা আক্রমণ করেছিল তারা তাকে ছেড়ে দিয়ে উটের পিঠে উঠে পালাতে গেল। সুদীপ্ত উঠে দাঁড়িয়ে দেখল চারপাশে যে যার মতো পালাচ্ছে। তার চোখে পড়ল একটা উটের পিঠে উঠতে যাচ্ছেন ক্রো। কিন্তু তিনি উটের পিঠে উঠে বসার আগেই একটা গুলি এসে লাগল তাঁর বুকে। মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। যে ভঙ্গিতে ক্রো মাটিতে পড়লেন তাতে সুদীপ্ত অনুমান করল, তিনি আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াবেন না। সুদীপ্তর কাছেই মাটিতে কারো কাছ থেকে একটা পিস্তল খসে পড়েছিল। ক্রোর অবস্থা দেখার পরই সুদীপ্ত মাটি থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সোজা ছুটতে শুরু করল মরূদ্যানের দিকে। তার মনে হল একমাত্র সেখানে পৌঁছোলেই হয়তো বা তার রক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে। চারপাশে উট আর মানুষের ছোটাছুটি আর গোলাগুলির মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে কিছুটা ভাগ্যক্রমেই সুদীপ্ত পৌঁছে গেল মরূদ্যানের কাছে। গেটের মুখে কোনো লোক ছিল না। যারা ছিল তারা গিয়ে যোগ দিয়েছে সুদীপ্তর পিছনে যে লড়াই চলছে সেখানে। গেট দিয়ে মরূদ্যানে প্রবেশের আগে সে একবার পিছন ফিরে তাকাল কোথাও হেরম্যানকে দেখা যায় কিনা সেজন্য। কিন্তু চাঁদের আলোতে মরুপ্রান্তরে যারা লড়াই করছে বা ছুটে পালাচ্ছে তাদের সকলের পরনেই প্রায় একই ধরনের পোশাক। বড়ো টিলার দিক থেকে উটের পিঠে চেপে বহু লোক উপস্থিত হয়েছে সেই পতাকাটার কাছে। যারা বিভিন্ন দিকে ছুটে পালাচ্ছে তাদের দিকে গুলি চালাচ্ছে সেই নবাগত উষ্ট্র আরোহীরা। সে লোকগুলোও ভালো কি মন্দ সুদীপ্তর তা জানা নেই। কাজেই সে আর কালবিলম্ব না করে ঢুকে পড়ল মরূদ্যানের ভিতর। কিন্তু বাড়িটার দিকে কিছুটা এগিয়েই সে দেখতে পেল হেরম্যানকে। তাঁর হাতে শেখের সেই বড়ো সুটকেসটা। যার মধ্যে ডলার আর সোনার বাট আছে।

সুটকেসটা বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে হেরম্যান এগোচ্ছেন বাড়ির পিছন দিকে যাবার জন্য। অর্থাৎ হেরম্যান আগেই এসে ঢুকে পড়েছেন মরূদ্যানে। হেরম্যানের হাতে সুটকেসটা দেখে সুদীপ্তর একটু আশ্চর্য লাগলেও এর পরক্ষণেই সুদীপ্তর মনে হল হয়তো-বা টিলার দিক থেকে যে বড়ো দলটা এসেছে সেই দলটা মরুদস্যুর দল হতে পারে। হয়তো বা শেখের সম্পদ লুণ্ঠন করতেই তারা এসেছে। আর একই চেষ্টা উটের রেসে আসা লোকগুলোও হয়তো করতে চেয়েছিল। আর এ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই হেরম্যান শেখের টাকাপয়সা তাদের থেকে রক্ষা করার জন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছেন। একথা সুদীপ্ত ভাবতে ভাবতেই হেরম্যান অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাড়ির পিছন দিকে। তাঁর কাছে যাবার জন্য সুদীপ্তও ছুটল সেদিকে। বাড়ির পিছন দিকে উপস্থিত হয়েই সুদীপ্ত দেখতে পেল বেবুনগুলো প্রচণ্ড চিৎকার আর লম্ফঝম্প শুরু করেছে তাদের খাঁচার মধ্যে। এরপর সেই খাঁচাগুলোর মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগিয়েই সুদীপ্ত দেখতে পেল হেরম্যানকে। সুটকেস হাতে তিনি এগোচ্ছেন বাড়ির পিছন দিক দিয়ে কোথাও একটা যাবার জন্য। হেরম্যান যখন ঠিক সিংহটার খাঁচার পাশ দিয়ে হাঁটছেন ঠিক সেই সময় সুদীপ্ত তাঁর উদ্দেশে বলল, 'হেরম্যান আমিও এসে গেছি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

১০

সুদীপ্তর কণ্ঠস্বর শুনেই হেরম্যান ঘুরে দাঁড়ালেন তার দিকে। তিনি তাকাতেই সুদীপ্ত তাঁকে উত্তেজিতভাবে বলল, 'বাইরে কী ঘটছে তা আমি কিছুই বুঝছি না! রেসে যোগ দিতে আসা লোকগুলো হঠাৎই কেন যে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কেন যে টিলার দিক থেকে লোকগুলো তাদের আক্রমণ করার জন্য ছুটে এল তা বুঝতে পারছি না! ক্রো মারা পড়েছেন।' হেরম্যান সুদীপ্তর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তার হাতে ধরা পিস্তলটা দেখে ভাঙা গলায় বললেন, 'সব কথা পরে বলব, আগে তোমার পিস্তলটা দাও আমাকে।'

সুদীপ্ত হেরম্যানের নির্দেশ পালন করার জন্য পিস্তলটা নিয়ে এগোল তাঁর দিকে। কিন্তু এরপরই আরো একটা কণ্ঠস্বর কানে এল সুদীপ্তর। কে যেন বলে উঠল, 'না, পিস্তলটা দিও না ওর হাতে। ও তোমাকে ওই পিস্তল দিয়ে পালাবার আগে মারবে।'

কথাটা শুনেই সুদীপ্ত থমকে দাঁড়িয়ে যেখান থেকে কণ্ঠস্বরটা এল সেদিকে তাকাল। বেবুনের খাঁচার আড়াল থেকে বাইরে বেরিয়ে খাঁচার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একজন লোক। সুদীপ্ত তার দিকে তাকাতেই লোকটা তার মুখের আচ্ছাদন খুলে ফেলল। চাঁদের আলোতে লোকটার মুখ দেখে সুদীপ্ত হতভম্ব হয়ে গেল! এও যে হেরম্যানের মুখ! তার দু-দিকে দুজন হেরম্যান তা কীভাবে সম্ভব? বিস্মিত, হতভম্ব সুদীপ্ত একবার এদিকে, আর একবার ওদিকে তাকিয়ে দুই হেরম্যানকে দেখতে লাগল। সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা হেরম্যানও যেন অবাক হয়ে গেলেন দ্বিতীয় হেরম্যানের আবির্ভাবে। অবশ্য এরপরই তিনি সুদীপ্তকে বললেন, 'পিস্তলটা আমাকে দাও অথবা এখনই গুলি করো এই নকল হেরম্যানকে।'

কিন্তু এ কথা শুনেই দ্বিতীয় হেরম্যান সুদীপ্তর উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'আমি নকল নই। আমার মুখোশ পরে সিংহের খাঁচার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে হল ক্রো। আর ক্রোর মুখোশ পরা যে লোকটা গুলি খেয়ে মরল সে হল আমার মুখোশ পরা এই ক্রোর সহকারী।'

এ কথার জবাবে প্রথম হেরম্যান বলে উঠলেন, 'এ লোকটা নিশ্চয়ই কোনো শয়তান হবে। শেখের টাকা লুঠ করার জন্য আমার মুখোশ পরেছে। গুলি করো, গুলি করো ওকে।'

দুজনের কথাবার্তা শুনে সুদীপ্তর মাথার ভিতরটা কেমন যেন গুলিয়ে যেতে লাগল। ওদিকে মরুপ্রান্তর থেকে চিৎকারের শব্দ ক্রমশই যেন মরূদ্যানের দিকে ছুটে আসছে! আর বেবুনের দলও তারস্বরে খাঁচার গায়ে ঝাঁপাচ্ছে আর চিৎকার শুরু করেছে। সুদীপ্ত বুঝে উঠতে পারছে না কী করা উচিত? হঠাৎ এরপর দ্বিতীয় হেরম্যান বলে উঠলেন, 'তুমি এমন তিনটে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো যা আমাদের অভিযান সম্পর্কে। যে উত্তর দিতে পারবে বুঝবে সেই আসল হেরম্যান।' এ কথা শুনে প্রথম হেরম্যান চিৎকার করে উঠলেন, 'এখন কি এসব খেলার সময়? দাও, পিস্তলটা আমাকে দাও। ওটা আমার দরকার। যারা মরূদ্যানের দিকে আসছে তারা মরুদস্যু। আর এই লোকটা ওদেরই কেউ হবে।'

কিন্তু দ্বিতীয় হেরম্যানের প্রস্তাব মনে ধরল সুদীপ্তর।

পিস্তলটা মাথার ওপর তুলে ট্রিগার টানল।

সে বলে উঠল, 'আপনাদের মধ্যে যেই হেরম্যান হোন না কেন, বলুন তো আমার সঙ্গে যখন আপনার প্রথম পরিচয় হয় তখন আপনি কিসের সন্ধানে কোন অভিযানে গিয়েছিলেন?'

দ্বিতীয় হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'ইয়েতির সন্ধানে আমি হিমালয় অভিযানে গেছিলাম। সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।'

প্রথম হেরম্যান, দ্বিতীয় হেরম্যানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এভাবে যে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল সে তো অনেকেই জানে। এ আর নতুন কী?'

সুদীপ্ত এরপর একটু কঠিন একটা প্রশ্ন ছুড়ে দিল—'বুরুন্ডিতে সবুজ মানুষের খোঁজে গিয়ে আমরা যে হীরকখণ্ডটা হাতে পেয়েছিলাম সেটা দিয়ে কী করা হয়েছিল?'

প্রথম হেরম্যান এবারও এ প্রশ্নর জবাব দিতে পারলেন না, কিন্তু বেবুনের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হেরম্যান জবাব দিলেন, 'ওই হিরাটার নাম ছিল 'কিং অব জঞ্জিবার'। বহু রক্তপাত হয়েছিল ওই হিরাটার জন্য। লোভ যাতে আমাদেরও গ্রাস না করে সেজন্য আমি ওই হিরাটাকে টাঙ্গানিকা হ্রদে একটা জলহস্তীর খোলা মুখের মধ্যে ছুড়ে দিয়েছিলাম।'

একদম নির্ভুল উত্তর। আর এ যে হুবহু হেরম্যানেরই গলা!

প্রথম হেরম্যান এবার কিছুটা ধমকের স্বরেই বললেন, 'এ সব কী হচ্ছে সুদীপ্ত! ডাকাতরা এসে পড়ল বলে! গুলি করো লোকটাকে।'

কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে সুদীপ্ত তার শেষ প্রশ্নটা করল তাদের দুজনের উদ্দেশে—'ম্যামথের সন্ধানে গিয়ে কি আমরা শেষ পর্যন্ত ম্যামথের দেখা পেয়েছিলাম?'

প্রথম হেরম্যান এবারও নিরুত্তর রইলেন, কিন্তু দ্বিতীয় হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, দেখা পেয়েছিলাম। যাদের আমরা সাজানো ম্যামথ ভেবেছিলাম তারা সত্যি ম্যামথ ছিল।'

সঠিক জবাব। তা ছাড়া এই দ্বিতীয় হেরম্যানের কণ্ঠস্বর সত্যি হেরম্যানের মতো। সুদীপ্তর এবার বুঝতে অসুবিধা হল না কে আসল আর কে নকল হেরম্যান।

বেবুনের খাঁচার কাছে দাঁড়ানো হেরম্যান, নকল হেরম্যানের উদ্দেশে বললেন, 'ক্রো, পালাবার চেষ্টা কোরো না। তাহলে মরবে তুমি। শেখের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তুমি হয়তো বেঁচে গেলেও যেতে পারো।' ঠিক এই সময় খাঁচার ভেতর থেকে সিংহটা ডেকে উঠল। তার খিদে পেয়েছে। ভাঙা গলা নয়, অন্য একটা কণ্ঠস্বর এবার বেরিয়ে এল সেই নকল হেরম্যানের গলা থেকে। তিনি বললেন, 'আমি নই, মরবে তোমরা। আমি সে ব্যবস্থা করছি।'

এ কথা বলেই তিনি একছুটে এগিয়ে সিংহের দরজাটা খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলোতে খাঁচার বাইরে বেরিয়ে পড়ল বিরাট সিংহটা। সে একবার তার মালিককে শুঁকল। নকল হেরম্যান বা ক্রো মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলেন সিংহটার দিকে। তা শুনে বিশাল জন্তুটা এক পা এক পা করে এগোতে থাকল সুদীপ্তর দিকে। সিংহটাকে দেখে কান ফাটানো চিৎকার শুরু করেছে বেবুনের দল। এগিয়ে আসছে প্রাণীটা।

প্রাণীটাকে ভয় দেখাবার জন্য সুদীপ্ত পিস্তলটা মাথার ওপর তুলে ট্রিগার টানল। খট করে একটা শব্দ হল। সুদীপ্ত এতক্ষণ পরে বুঝতে পারল তার পিস্তলে গুলি নেই!

হেরম্যানের মুখোশ পরা ক্রোও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'এবার তোমরা কোনোভাবেই আমাকে আটকাতে পারবে না। আমি যাচ্ছি, মরো তোমরা।'

সুদীপ্ত হতভম্ব। এবার সে কী করবে? ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে দানবটা! দুটো লাফ দিলেই সে সুদীপ্তর ঘাড়ে এসে পড়বে। ঠিক এই সময় সুদীপ্ত আর সিংহের মাঝের জমিটাতে হঠাৎই ঝাঁপিয়ে পড়ল বেবুনগুলো। সিংহটাকে ঠেকানোর জন্য তার চিরশত্রু বেবুনের খাঁচা খুলে দিয়েছেন হেরম্যান। সিংহের থেকে আকারে ছোটো হলেও দলবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ বেবুনেরা। তাদের দাঁতেরও ধার আর ক্ষিপ্রতা কম নয়। মুহূর্তের মধ্যে এরপর প্রাণীগুলো চারপাশ থেকে আক্রমণ করে বসল অত বড়ো সিংহটাকে! সিংহের গর্জন আর বেবুনের চিৎকারে ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল রাত্রির নিস্তব্ধতা। ওদিকে লোকগুলোর চিৎকার- চেঁচামেচির শব্দও শোনা যাচ্ছে। তারা মনে হয় ঘিরে ফেলেছে বা ঢুকে পড়েছে মরূদ্যানে!

মুখোশধারী ক্রো সিংহটার সঙ্গে বেবুনদের লড়াই যখন শুরু হল তখন বাড়ির পিছনদিকে ছুটলেন ঠিকই, কিন্তু তারপরই আবার ফিরে এসে অন্যদিকে পালাবার চেষ্টা করলেন। তা দেখে সুদীপ্তরা অনুমান করল যে দিকে তিনি পালাচ্ছিলেন সম্ভবত সেদিক থেকে লোক এসে পড়েছে। আর এরপরই একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটল। সিংহ আর বেবুনের দল ছোটাছুটি করে লড়াই করতে গিয়ে পলায়মান নকল হেরম্যানের ওপর গিয়ে পড়ল। সিংহটা একটা থাবা চালাল একটা বেবুনকে লক্ষ্য করে। আর সেই প্রচণ্ড থাবার আঘাত বেবুনের গায়ে না পড়ে গিয়ে পড়ল নকল হেরম্যানের মাথায়। এক আঘাতেই মনে হয় ক্রোর মাথার খুলি চুরমার হয়ে গেল। মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। তাঁর শরীরের ওপরই লড়াই চালাতে লাগল সিংহ আর বেবুনগুলো। হিংস্র প্রাণীগুলোর নখের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে লাগল ক্রোয়ের শরীর। মাটিতে পড়ে রইল তাঁর হাতের সুটকেসটা। তবে সিংহের সঙ্গে বেবুনদের লড়াইয়ে হার-জিৎ-এর নিষ্পত্তি হল না। কারণ, এরপরই বাড়ির দু-পাশ থেকেই শূন্যে গুলি চালাতে চালাতে বাড়ির পিছন দিকে এসে উপস্থিত হল অনেক লোক। বন্দুকের প্রচণ্ড শব্দে আর এত মানুষের কোলাহলে ঘাবড়ে গেল বিবাদমান প্রাণীগুলো। সিংহটাকে ছেড়ে দিয়ে বেবুনগুলো ছুটল প্রাচীরের দিকে। গাছ বাইতে ওস্তাদ বেবুনের দল নিমেষের মধ্যে প্রাচীর টপকে বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সিংহটা কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ছুটে গিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ল। হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

লোকগুলো এরপর একদম কাছে এসে পড়ল সুদীপ্ত আর হেরম্যানের। তাদের মধ্যে শেখ বীন কাশেমও আছেন। তাঁর হাতেও একটা পিস্তল। সুদীপ্তদের দেখে তিনি হেরম্যানের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আসল হেরম্যান তো?'

হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাতের আস্তিনটা গুটিয়ে একটা ছাপ দেখিয়ে বললেন, 'এই যে আমার হাতে আপনার সিলমোহরের

ছাপ যেটা আপনার লোকেরা আমার হাতে দিয়েছিল আসল লোক আর নকল লোক যাতে শনাক্ত করা যায় তার জন্য। তা ছাড়া আমি গলা লুকাবার জন্য ভাঙা গলাতেও কথা বলছি না।'

সুদীপ্তও শেখের উদ্দেশে বলল, 'হ্যাঁ, ইনি আসল হেরম্যান। কোনো ভুল নেই।'

শেখ বীন কাশেম হেরম্যান আর সুদীপ্তর কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে পিস্তলটা নীচে নামিয়ে বললেন, 'ক্রো-এর সঙ্গী দুজন গুলি খেয়ে মারা পড়েছে। এরা যে উটের দৌড় করাবার জন্য মরু ডাকাতদের ডেকে আনবে এতটা আমি ভাবিনি। ডাকাতগুলোকে দিয়ে আমাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা অথবা আমাদের অন্য কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়ে খুন করানোর পরিকল্পনা ছিল ক্রোর। তবে একটা ব্যাপার ওর জানা ছিল না যে আমাদের মতো শেখদের মাত্র দুজন নিরাপত্তারক্ষী থাকে না, পঞ্চাশজন দেহরক্ষী থাকে। এবং তারা আমাদের থেকে দূরে থাকে না।'

একটানা কথাগুলো বলে শেখ প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু শয়তানটা কোথায়?'

শেখের প্রশ্নের জবাবে হেরম্যান আঙুল তুলে দেখালেন কিছু দূরে মাটিতে পড়ে থাকা ক্রোয়ের দেহটা।

শেখের সঙ্গে সুদীপ্ত আর হেরম্যান এরপর গিয়ে দাঁড়ালেন ক্রোয়ের মৃতদেহের সামনে। সিংহের থাবার আঘাতে সত্যি ক্রোর মাথার খুলি ভেঙে গেছে। মুখ থেকে ছিঁড়ে ঝুলছে মুখোশটা। সারা শরীর তাঁর ছিন্নভিন্ন। তার কয়েক হাত তফাতে পড়ে আছে শেখের ডলার আর সোনার বাট ভর্তি সুটকেসটা। যেটা নিয়ে ক্রো পালাতে যাচ্ছিলেন।

হেরম্যান এরপর শেখকে খুলে বললেন শেখ মরূদ্যানে প্রবেশ করার আগে এ জায়গায় যে ঘটনা ঘটল সে কথা।

সব শুনে শেখ বললেন, 'চলুন এবার বাড়ির ভিতর ঢোকা যাক। কাল সকালে এরপর যা করার করব।'

শেখের নির্দেশে তাঁর সুটকেসটা তুলে নিল তাঁর এক অনুচর। চাঁদের আলোতে পড়ে রইল ক্রো-র মৃতদেহ। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত সুদীপ্ত আর হেরম্যান শেখের সঙ্গে এগোল বাড়ির ভিতর রাত্রিবাসের জন্য।

পরদিন সকালে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন হেরম্যান আর সুদীপ্ত। হেরম্যান বললেন, 'ক্রোয়ের ডাকে আমি এখানে এসেছিলাম ঠিকই, কিন্তু ক্রো-যে এত বদলে গেছে, এত ভয়ংকর লোভী মানুষে পরিণত হয়েছে তা তার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ না হবার কারণে ধারণা ছিল না। আসলে সে আমাকে এখানে ডেকেছিল যাতে আমি শেখের কাছে বলি যে ওটা সান লায়ন সে জন্য। আমার ক্রিপ্টোজুলজিস্ট হিসাবে নাম আছে। আমি সিংহটাকে সান লায়ন বলে সার্টিফিকেট দিলে তিনি জন্তুটা চড়া দামে কিনবেন সে জন্যই আমাকে ডেকেছিল। কিন্তু যখন সিংহটাকে সান লায়ন বলতে রাজি হলাম না তখন সে আমাকে বলল, জুয়াতে তার অনেক ধার হয়ে গেছে আমেরিকাতে। সিংহটা তাকে চড়া দামে বিক্রি করতেই হবে শেখের কাছে। আমি তাকে সাহায্য করলে সে আমাকে টাকার একটা ভাগ দেবে। কিন্তু তার দেখানো লোভেও যখন আমি রাজি হলাম না তখন সে আমাকে একটা ঘরে বন্দি করল। হয়তো আমাকে খুন করার পরিকল্পনাই ছিল কিন্তু তুমি এখানে আসার পর রাতে আমি আব্দুলকে কাবু করে পালাই। তুমি যাকে প্রাচীর টপকাতে দেখেছিলে সে লোক আমিই ছিলাম। পালাতে গিয়ে মরুভূমিতে শেখের লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারা আমাকে শেখের কাছে নিয়ে গেল, আমি শেখকে সব কথা জানালাম। শেখ ঠিক করলেন ক্রোকে জব্দ করবেন। তাই তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের বড়ো দলটাকে আত্মগোপন করতে বলে সামান্য কয়েকজনকে নিয়ে হাজির হলেন এখানে। তাঁর সঙ্গে উটচালক হিসাবে আমিও এখানে হাজির হলাম। মুখে ফেট্টি বাঁধা থাকাতে তুমি আমায় চিনতে পারোনি। গতকাল রাতে আমিই তোমার ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। শেখের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল আজ আমি আত্মপ্রকাশ করে ক্রোর সামনে শেখের কাছে তার স্বরূপ উন্মোচন করব। কিন্তু তার আগেই কালকের ঘটনাটা ঘটে গেল। নিজের কৃতকর্মের শাস্তি পেল ক্রো।'—একটানা কথাগুলো বলে থামলেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত বলল, 'ক্রো যে অভিনেতা হিসাবে দক্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু গলাটা নকল করতে পারবে না বলে সে গলা ভাঙার ধাপ্পা দিচ্ছিল। কিন্তু এত দ্রুত সে তার ও আপনার মুখোশ কীভাবে বানিয়ে ফেলল?'

হেরম্যান বললেন, 'আমার ধারণা সে আগেই মুখোশ দুটো বানিয়ে বিকল্প পথ খোলা রেখেছিল। আমি যদি তার কথায় রাজি না হই তবে সে নিজে হেরম্যান সেজে, তার সঙ্গীকে ক্রো সাজিয়ে শেখকে ধোঁকা দেবে সে জন্য। আর সে কাজটাই করছিল সে। কিন্তু অতি লোভের কারণে তার শেষরক্ষা হল না।'

হেরম্যানের কথা শুনে সুদীপ্ত তাঁকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, 'প্রাণীটা সান লায়ন নয়তো কী?'

কিন্তু ঠিক সে সময় বাড়ির ভিতর থেকে রক্ষী পরিবৃত বেরিয়ে এলেন শেখ বীন কাশেম। তিনি হেরম্যানকে বললেন, 'চলুন, দেখে আসা যাক প্রাণীটার অবস্থা এখন কেমন?'

শেখের সঙ্গে সুদীপ্তরা এরপর পৌঁছে গেল বাড়ির পিছন দিকে। ক্রোর মৃতদেহের ওপর একটা কাপড় চাপা দেওয়া হয়েছে। দেহটাকে অতিক্রম করে তারা পৌঁছে গেল খাঁচার সামনে। পর্দাটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভিতরে বসে আছে বিশাল জন্তুটা। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে তার সোনার অঙ্গ। তবে বেবুনের আক্রমণে তার দেহে কয়েকটা ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সুদীপ্ত কোনো প্রশ্ন করার আগেই হেরম্যান বললেন, 'এ জন্তুটাকে ক্রো সভ্য জগতের কোনো চিড়িয়াখানা থেকে সংগ্রহ করে এখানে এনেছিল। কারণ এমন প্রজনন চিড়িয়াখানাতেই হয়। এই প্রাণীটার নাম লাইগার। লায়ন আর টাইগারের সন্তান। দ্যাখো ওর কপালে ফুটকি আছে। ওটা দেখেই আমি বুঝেছিলাম এটা রূপকথার সান লায়ন নয়, 'লাইগার'।' ❖

দেশের মানুষ

সুভাষ ধর

ছবি : রঞ্জন দত্ত

লালবাজারের ট্রাফিক ডিভিশনে হাজারো সমস্যা নিয়ে লোকজনের ভিড় লেগেই থাকে। কারো ট্রাফিক আইন এদিক-ওদিক করে লাইসেন্স জমা পড়েছে, কেউ এসেছে ডিসির সঙ্গে দরবার করে যদি ফাইনের টাকাটা কমানো যায়; কারো ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে অনেকগুলো গাড়ি ভাড়া খাটে, পুলিশের কর্তাদের সঙ্গে ওঠাবসা থাকলে পুলিশি উৎপাত এড়ানো চলে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ঘোষ ডিডি বিল্ডিং থেকে ট্রাফিক ডিভিশনে এসেছে স্বপন ব্যানার্জির সঙ্গে খানিকটা গালগপ্পো করতে। হাতে কাজ নেই, সুশান্ত অন্য কাজে অফিসের বাইরে, ঘোষ এই সময়টায় গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্বপন ট্রাফিকের রেকর্ড সেকশনে বসে। কিন্তু এই মুহূর্তে রিজার্ভ অফিসারের ঘরে কাজ নিয়ে ফেঁসে আছে। ঘোষ খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরে চলে যাব যাব করছে, তখুনি নজরে এল এক বয়স্ক ভদ্রলোক ভিড়ে দাঁড়িয়ে অসহায় মুখে এদিক-ওদিক দেখছেন। ঘোষের যা অভ্যাস আগ বাড়িয়ে ফালতু ঝামেলায় নাক গলানো। ভদ্রলোককে ডেকে বলল—'দাদু, আপনার কী সমস্যা? আমারে কইতে পারেন। ছোটুমোটু কিছু হইলে ব্যবস্থা হইয়া যাইব।'

বয়স্ক ভদ্রলোক ঘোষের কথা শুনে কাছে এগিয়ে এসে বললেন—'তুমি কে ভাই? ট্রাফিকের ঝুটঝামেলা তুমি বুঝি সামলে দিতে পার? তুমি দালালি করো বুঝি? চিন্তা নেই, কাজটা করে দিলে দালালি বাবদ যা তোমার পাওনা সেটা দিয়ে দেব। সুনীলকে বলতাম কিন্তু সে মহাব্যস্ত লোক। সামান্য কাজে ওর কাছে যাওয়াটা ঠিক দেখায় না।'

ঘোষ ডিডির লোক, সাদা পোশাকে আছে। তাই বলে ওকে একেবারে দালাল ভেবে নেবে নাকি! ঘোষের প্রেস্টিজে বেশ ধাক্কা লাগল। বলল—'মশয়, আপনে আমারে শেষে দালাল ভাবলেন? চলেন তবে, উলটদিকের বিল্ডিংয়ে চলেন, ওইখানে আমার অফিস। আমি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের দারোগা। সামান্য ট্রাফিক সমস্যা থাকলে তুড়ি মাইরা সামলাইয়া দিতে পারি।'

ভদ্রলোক 'তাই নাকি? আচ্ছা আচ্ছা।' বলে ঘোষের সঙ্গ ধরলেন। ভদ্রলোকের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হয়ে গেছে পাঁচ বছর আগে, খেয়াল করেননি, এখন রিনিউ করতে গিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন। ঝামেলাটা আর কিছু না, তাঁর বয়স। সত্তর পার হয়ে গেছে। এই বয়সে নতুন করে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে গেলে অনেক হ্যাপা। নিজের দপ্তরে বসে ঘোষ এসব দেখেশুনে বুঝল ব্যাপারটা তার সাধ্যের বাইরে। এমনকী অন্য কেউ যে পারবে তাও নয়। বলল—'দাদু, আপনার নতুন লাইসেন্স পাওয়া খুবই দুষ্কর। বয়সের কারণে চোখের ডাক্তার-ফাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। মনে হয় না কুনো ডাক্তার ওইরকম কিছু দিব। সোজা কথা, আপনে বাড়ি ফিরা যান, আপনে যা চান তা হইব না। হইবার কথাই না।'

দাদু যে এমন খিটকেল মেজাজের আগে বোঝা যায়নি। ঘোষের কথা শুনে একেবারে ক্ষেপে আগুন, তেলে বেগুন। বললেন—'তুমি পারবে না, তবে আমাকে এখানে ডেকে আনলে কেন? তোমার মতলব তেমন সুবিধের ঠেকছে না তো! তোমার মতো লোককে কেমন করে টিট করতে হয় আমার জানা আছে।

দাঁড়াও, সুনীলকে আমি সব বলছি। আমরা এক দেশের লোক, তাকে বলে তোমাকে কেমন টাইট দিই দেখে নিও।'

ঘোষ গোঁয়ার লোক। গরম হয়ে বলল—'আপনার ভালা করতে চাইলাম, উলটা আমারে বদনাম! যান, যান, আপনার কুন সুনীল মোক্তার আছে, তার কাছে যান। আমি কারো পরোয়া করি না।'

সুশান্ত দপ্তরে ফিরে এসে চুপচাপ সব শুনছিল। বুড়ো চলে যাবার পর বলল—'ঘোষ, সকাল সকাল কোন ঝামেলা পাকিয়ে এলে? সব ব্যাপারে নাক গলাতে যাও কেন? ট্রাফিকের ব্যাপার ট্রাফিক বুঝবে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এসব হলে বুঝতাম। উনি কী হুমকি দিয়ে গেলেন সেটা তোমার মাথায় ঢোকেনি? সুনীল মানে সুনীল মোক্তার নয়, ডিসি হেড কোয়ার্টার্স সুনীল চৌধুরী! কে না জানে তাঁর দেশের লোকের উপর কী সাংঘাতিক দরদ! বুড়ো তোমার নামে রিপোর্ট ঠুকলে তোমার কপালে দুঃখ আছে!'

ঘোষ ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেও বাস্তবে তা হল না। খিটকেল বুড়ো ডিডি বিল্ডিং থেকে নেমেই সোজা সামনের বিল্ডিংয়ের দোতলায়। সুনীল চৌধুরী ডিসি হেড কোয়ার্টার্স, মানে কমিশনার সেন সাহেবের নীচেই দু-নম্বরে। একটু দয়ামায়া কম, ভুলচুক কাজে ঘটলে ছাড়াছাড়ি নেই। পারসেল হাতে মাথা কাটেন। তবে দুর্জনে বলে—দেশের ভাই-বেরাদর হলে সাতখুন মাপ!

এক ঘণ্টাও পার হয়নি। ডিসি ডিডি দেবী রায়ের তলব। সুশান্ত পাশের বিল্ডিং-এর দোতলায় ছুটল। অচিরাৎ ফিরেও এল। মুখে রাজ্যের বিরক্তি। বলল—'ঘোষ দেখলে তো? যত্রতত্র চুলকাতে যাও কেন? তোমার দাদু সোজা পাত্র নন। সুনীল চৌধুরীর কাছে তোমার নামে এক কাহন লাগিয়ে এসেছেন। প্রায় হাতে মাথা কাটা পড়ছিল। তিনি ভাগ্যিস দেবীবাবুকে ব্যাপারটা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছিলেন বলে এ যাত্রা বেঁচে গেল। দেবীবাবু তোমাকে চেনেন। আমাকেও স্নেহ করেন, তবু আমাকে একশোটা কথা বলতে হল। পুরো ব্যাপারটা আমার সামনেই প্রায় ঘটেছিল, আমি নিজেও সাক্ষী, এইসব বলে আপাতত চাপা দিয়ে এসেছি।'

ঘোষ উল্লসিত হয়ে বলল—'বস, আর চিন্তা নাই তো? একখান কথা কমু? আমিও তো ওইপার বাংলাফেরত। কায়দা কইরা সুনীল চৌধুরীর দেশের লোক এইরকম একখান কথা তেনার কানে পৌঁছাইয়া দেওয়া যায় না?'

সুশান্ত বলল—'ওই আনন্দেই থাকো। উনি শুনেছি ফরিদপুরের, তুমি তো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাওয়াল। শেষে জালিয়াতি কেসে ফাঁসবে নাকি? আরেকটা ব্যাপার সামনে এসে পড়াতে তোমারটা চাপা পড়ে গেল। আজকাল দেবীবাবুর মাথায় সায়েন্টিফিক ইনভেস্টিগেশন ব্যাপারটা খুব ঘুরছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ব্লাড, হেয়ার, পয়জন, ভিসারা টেস্ট এসব ছাড়াও ক্রাইম ডিটেকশনের আরো উপায় খুঁজতে হবে। সি আর এসের (ক্রাইম রেকর্ড সেকশন) নীহার রায়কে নিয়ে একবার দেবীবাবুর সামনে বসতে হবে। কাল বারোটায় সময় দিয়েছেন। তুমিও থেকো।'
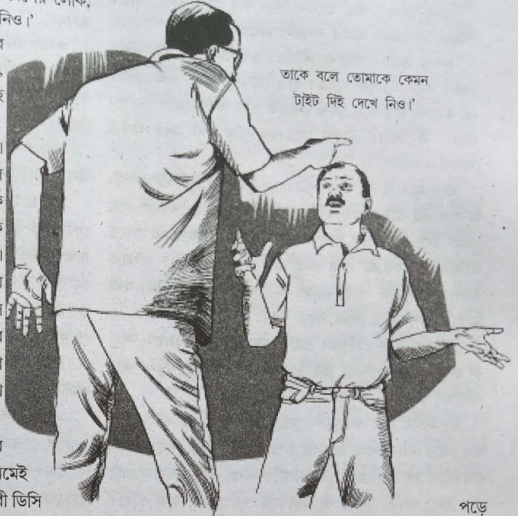
ঘোষ বলল—'আমারে কী দরকার? আপনাদের আলোচনায় আমি আর কী নতুন কথা কমু? আপনারা দুইজন ভিতরে বসবেন, আমি বাইরে পাহারা দিমু। তবে লগে লগে আছি কথা দিলাম।'

পরদিন বেলা বারোটার মিটিং সাড়ে বারোটায় থামল। দেবীবাবু কম কথায় কাজ সেরে নেন। নীহার দেবীবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের বিল্ডিং, নিজের অফিসে ফিরে গেল। সুশান্তও ঘোষকে নিয়ে নিজের অফিসে ফিরবে, কী দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—'ঘোষ, আমি যা দেখছি তুমি কি তা দেখছ?'

ঘোষ বলল—'দেখুম না কী কন? আমার কর্ম সারছে!'

সেই বয়স্ক ভদ্রলোক, যাঁকে নিয়ে ঘোষের সাম্প্রতিক বিড়ম্বনা, তিনি গুটি গুটি পায়ে ডিসি হেডকোয়ার্টার সুনীল চৌধুরীর কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পথ ধরেছেন।

সুশান্ত বলল—'কী ঘোষ, দাদুর সঙ্গে কথা বলবে না? জানবে না, সুনীল চৌধুরীর সঙ্গে কী কী কথা হল? তোমার নামে আরো কিছু লাগিয়ে গেলেন কিনা?'

ঘোষ বলল—'বস, ছাড়ান দেন। দাদু, হাত ধুইয়া আমার পিছনে লাগছেন। আমার কপালে নির্ঘাৎ বদলি!'

সুশান্ত বলল—'দাঁড়াও, দাঁড়াও। সব সময় খারাপটা ভাবো কেন? সুনীল চৌধুরী অসম্ভব ব্যস্ত লোক। ফালতু কথায় সময় নষ্ট করবেন না।' বলে নিজে থেকেই দাদুর পথ আগলে দাঁড়াল। বলল—'কী স্যার? চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা হল? আবার কোনো সমস্যা?'

দাদুর মুখে চিন্তার ছাপ। বললেন—'আগের দিন ওই ঘোষটা অনর্থক এই অফিস ওই অফিসে দৌড়ঝাঁপ করিয়ে আমার জান কয়লা করে ছেড়ে দিল, আগের দিন সুনীলকে সেই কথাই বলতে এসেছিলাম। কাজের কথা আর হল কোথায় সেদিন? আজকে আসতে বলেছিল, তাই কাজের কটা কথা বলে গেলাম। ব্যস্ত মানুষ, বেশি সময় দিতে পারে কই?'

ঘোষের পক্ষে কৌতূহল চেপে রাখা মুশকিল। বলল—'দাদু, কী কথা হইল? আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল। নতুন কইরা পাইবেন কি?'

দাদু বিরস মুখে বললেন—'নাহে, সুনীল আমার ওই আশায় জল ঢেলে দিল। বলল, এই বয়সে আর লাইসেন্সের দরকার নেই। ফুল টাইম ড্রাইভার রেখে কাজ চালাতে বলল। অন্য একটা কাজের কথা ছিল। বলল, দেখছি কী করা যায়। খুব জরুরি কাজ ওইটা।'

দাদু চলে যাবার পর ঘোষ বলল—'দাদুর মন খারাপ। নালিশ কইরা বালিশ পাইলেন!'

দুপুরের শেষ দিকে সুশান্ত ঘোষকে বলল—'ঘোষ, দেবীবাবু জানেন তুমি আর আমি দুজনেই বড়বাজারে কাজ করেছি। আজ সন্ধেয় রাজকাটরায় একটা অপারেশন আছে। অ্যান্টি রাউডি সেকশনের দিলীপ দাশগুপ্ত তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে ওখানে একটা রেইড করবে। আজকাল বেশ কিছু গুন্ডা লোক ওখানে একটা গদি জবরদখল করে রেখেছে। গদির মালিক ওখানে আবার দখল নিয়ে ব্যবসা চালাতে চাইছেন কিন্তু গুন্ডারা কিছুতেই ওটা হতে দিচ্ছে না। তোমাকে দিলীপের সঙ্গে যেতে হবে। রাজকাটরা একটা বিশাল ভুলভুলাইয়া। দিলীপের পক্ষে রাস্তা খুঁজে বার করাই সমস্যা। যতক্ষণ এরা এধার-ওধার করবে ততক্ষণে সব পাখি উড়ে যাবে!'

ঘোষ বলল—'বস, আপনে থাকবেন না? রাজকাটরা আমি ভালোই চিনি। কিন্তু কুন জায়গাটা অকুস্থল, সেইটা না জানলে কিছুই করা যাইব না।'

সুশান্ত বলল—'জানি। ব্যাপারটা গোপন রাখো। রাজকাটরার মশলাপট্টি তুমি তো হাতের তালুর মতো চেনো। ওখানকারই একটা জবরদখল গদি। মালিকের বয়সের কারণে গদি কিছুদিন বন্ধ ছিল, সেই ফাঁকে কিছু দুষ্টলোক এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। মালিক কিছুতেই গদিতে ঢুকতে পারছেন না। ভালো টাকা পেলে তবেই ছাড়বে মতলব।'

ঘোষ বলল—''বুঝলাম। হের লগে আমারে টানাটানির কী কারণ?'

সুশান্ত বলল—'কারণ আছে। ওদের দুষ্কর্ম একটু বেলার দিকে। বিকেলের পরে ফাঁকা সময় পায়, তখন আসর বসে। আসল উদ্দেশ্য চাপ দিয়ে ভালো টাকা কামিয়ে নেওয়া। আর তুমি ওদের চেনো।'

ঘোষ বলল—'সবটা জলবৎ তরলং বুঝাইলেন। কিন্তু আমার কিছুই বোধগম্য হইল না। আরেকটু খোলসা করবেন?'

সুশান্ত বলল—'ঘোষ, তুমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাউয়াল, এ খবর দেবীবাবুও রাখেন। ইন্সিডেন্টলি ওই শয়তানগুলোও মোটামুটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং তার আশেপাশের লোক। তুমি এদের চাঁই এবং আরো অনেককেই চেনো। কাজেই ধরপাকড়ের সময় চেনামুখের লোকগুলোকে তুলে নেওয়াটা নিতান্তই সহজ কাজ তোমার পক্ষে।'

ঘোষ বলল—'শেষে দেশের লোক হইয়া আমারে দিয়া ওই কর্মটা করাইবেন? দেশের মানুষ চিনি এইটাও ঠিক।'

সুশান্ত বলল—'উপায় নেই। ডিউটি ফার্স্ট। তাছাড়া লোক-গুলোর রেকর্ড ভালো নয়।'

ঘোষ বলল—'বস, আমি আপনার লগে লগে থাকি। আপনেই থাকবেন না, এইটা কী রকম হইল? আপনে নিজেও তো ওই এলাকার প্রতিটি ছিদ্র চিনেন।'

সুশান্ত বলল—'চিন্তার কী আছে? এ.আর.এসের পুরো টিম ছাড়াও বড়বাজার থানার ফোর্স বাজারের আশেপাশে থাকবে। পালাবার সব রাস্তা সিল হয়ে যাবে। বাছাধনরা সব খেঁচাকলে আটকে পড়বে। আমার একটা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে পুলিশ প্রসিকিউটারের সঙ্গে মিটিং রয়েছে। কাজ হয়ে গেলে তোমাদের ওদিকটায় উঁকি মেরে যাবই কথা দিলাম।'

সন্ধ্যার অভিযানে সবাই সাদা পোশাকের পুলিশ। একরকম নিঃশব্দেই অকুস্থলে পৌঁছে গেল। কিন্তু তবু পুলিশি চেহারা বলে কথা! হাট্টাকাট্টা চেহারা, ছোট্ট করে ছাঁটা চুল, হাঁটাচলার ছন্দ, এসবই পাবলিকের থেকে আলাদা। একেবারে শেষ মুহূর্তে কী করে ভিতরে জমায়েত সাত-আটজনের দলটার একজন চেঁচাল—'সারছে-সারছে পুলিশ! ভাগ, ভাগ!'

হুড়োহুড়ির মধ্যে দুজন ধরা পড়ল। ঘোষ একজনকে জাপটে ধরেছিল। অন্যটাকে ক-জনে মিলে কাবু করলেও বাকি ক-জন নিমেষে রাজকাটরার মানুষের ভিড়ে উধাও। দিলীপ দাশগুপ্ত কথাবার্তায় চৌখস, কিন্তু ধরপাকড়ের বেলায় গা বাঁচিয়ে চলে। ওর আশপাশ দিয়েই যার যেমন ভেগেছে।

ঘোষ যাকে চেপে ধরেছিল সে খানিকক্ষণ ছটফট করে খ্যান্ত দিল। খুব মিষ্টি করে বলল—'কাকা, কামডা কি ঠিক করলেন? শেষে আমারেই ধরলেন?'

ঘোষ বলল—'এই ছেমড়া? কী কস? কে তোর কাকা? আমারে কাকা ডাকস ক্যান? পুলিশরে তো হগলে মামু ডাকে?'

ধরাপড়া ছোকরা চি চি করে বলল—'এইডা কী কইলেন? কাকারে কাকা কমু না মামা কমু? আমি হইলাম আপনের জ্ঞাতি দাদা বরদা পালের পোলা চন্দ্রনাথ পাল। আমারে চিনতে পারলেন না?'

ঘোষ বলল—'বরদা পাল মানে বাউনবাইড়ার (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) মেড্ডার বরদা? লতায়পাতায় আত্মীয়তা কিছু একটা আছে জানি। তা তুই কবে থাইক্যা এইসব দলে নাম লেখাইছস? তর বাবার রেকর্ড তো ভালো না জানি।'

ছোকরা বলল—'আমার ডাকনাম চান্দু, আমারে ওই নামেই ডাইকেন। আমার বাবার লগে আপনার দেখাসাক্ষাৎ নাই? তাইনে এই বাজারেই মশলার ব্যবসা করেন। আপনে জানেন না? আমরা কিন্তু খারাপ কাম করি না।'

ঘোষ বলল—'তর বাবার লগে একবার-দুইবার দেখা হইছে। আমি বড়বাজারে নাই কয় বছর হইল। অন্যত্র বদলি হওনের কারণে এই দিকে আসা-যাওয়া নাই। তোরা কুন কুমতলবে পরের গদিতে? জুয়া খেলছস নাকি?'

চান্দু বলল—'এইডা কী কইলেন কাকা? আমরা জুয়া খেলুম ক্যান? ফাঁকা গদি, মাঝেসাঝে এইখানে বইসা গপ্পোসপ্পো করি। দেখেন, ভিতরে কোনো জুয়ার সামগ্রী আছে কিনা! তাস, টাকা কিছুই নাই।'

ততক্ষণে দিলীপ এসে দেখেশুনে বলল—'ঘোষবাবু, তাইতো। জুয়ার সরঞ্জাম তো কিছুই দেখছি না। গ্যাম্বলিং অ্যাক্টে আটকাব কী করে?'

ঘোষ বলল—'অগো পকেট সার্চ করলে তাসের প্যাকেট পাইতেও পারতেন। অগত্যা জবরদখলের উদ্দেশ্যে জমায়েত, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, এইসকল ধারায় কেইস করতে বাধা নাই। হেডকোয়ার্টারের অর্ডার। ছাড়াছাড়ি করার প্রশ্নই নাই।'

এমন সময় একটি মধ্যবয়স্ক গাঁট্টাগোঁট্টা লোক ঘোষের সামনে এসে প্রায় ডুকরে উঠল—'সতুরে, তুই আমার ছোটো ভাই সম্পর্কের। আর তুই কিনা আমার পোলাডারে ধইরা কিলাইতে আছস?'

ঘোষ লোকটিকে চিনতে পারল, বরদা পাল নাম লতায়পাতায় কিছু একটা হয়ও। যোগাযোগ নেই, তবে গুন্ডামি ষন্ডামি করে শুনেছে। মেড্ডার কালভৈরব মন্দিরের কাছাকাছি থাকত দেশভাগের আগে। বড়বাজারে পোস্টিং থাকাকালীন একবার, দুবার দেখা হয়নি এমনও নয়। বলল—'পোলাডারে তোমার মতোই গুন্ডা বানাইলা নাকি? পরের সম্পত্তিতে দখলদারি, পুলিশের লগে হাতাহাতি, কিলাকিলি। তুমার পোলাও এইসব করছে? সামাল দিতে পারবা তো?'

বরদা বলল—'ভাইরে, বুঝতে পারে নাই। সাদা পোশাকে আছো তো। এই গদিটা অনেকদিন ফাঁকা পইড়া আছে। আমাদের পোলাপানরা সন্ধ্যার দিকে গল্পগাছা করতে আসে এইখানে। অন্য কুনো বদ খেয়াল নাই। চাও তো যার গদি তারেই ফিরাইয়া দিমু। আমি আছি না? স্যাররে লইয়া ভিতরে বসো, আমি কোকাকোলার ব্যবস্থা করছি। লগের ফোর্স যারা যারা আছে তাদের ওইদিকে নিয়া বসাই, কিঞ্চিৎ জলপানের ব্যবস্থাও হইয়া যাইব।'

দিলীপ শান্তিপ্রিয় লোক। নির্ঝঞ্ঝাটে গদির পজেশান আসল মালিকের হাতে গছিয়ে দিলেই কার্যসিদ্ধি। কিছু অবাঞ্ছিত লোক একটা গদি জবরদখল করে অসামাজিক কাজকর্ম করছে, সেটা বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন দেবীবাবু। সে কাজটা করে দিতে পারলেই হল। বলল—'ঘোষবাবু, নট এ ব্যাড প্রপোজাল। আপনার দেশের লোক, লতায়পাতায় আত্মীয়ও দেখছি। ব্যাপারটা এমিকেবলি মিটে গেলে মন্দ কী? চলুন না হয়, আমরা দুজন গদির ভিতরে বসি। দৌড়ঝাঁপের পর কোকাকোলা পেলে মন্দ হত না। সঙ্গের সেপাইরা না হয় অন্যত্র বসুক। বরদাবাবু, দেখবেন ওরাও যেন কোকাকোলাটোলা পায়।'

ঘোষ একটু দোনামোনায় পড়ল। অত সহজে ব্যাপারটা মিটিয়ে দেওয়া যায় কি? বড়কর্তার সঙ্গে ফোনাফোনি হল না, কোর্টকাছারির ব্যাপার থাকল না, গদির দখল ছেড়ে দিলাম মুখে বলল, পরে কথার খেলাপ করবে না তেমন ভরসা আছে তো? বরদা সহজ লোক না, এটাও শোনা আছে।

দিলীপ 'ফুঃ ফুঃ' করে বলল—'অত ভাববার কিছু নেই। বাজার কমিটির প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি কারা আছে ডেকে নেব। এখানে বসেই একটা লেখাপড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করি। আসুন, ভেতরে বসে ঠান্ডা কিছু খেয়ে একটু জিরিয়ে নিই। কাছাকাছি ফোন কোথাও আছে নিশ্চয়। ফাইনাল কিছু করার আগে সাহেবের সঙ্গে ফোনেও কথা সেরে নেব।'

ভেতরে ঢালাও গদি, মাথার উপরে বন বন করে পাখা ঘুরছে। একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসা যাবে, ঠান্ডা পানীয় একটু পরেই আসছে, এইসব সাতপাঁচ ভেবে দিলীপের পিছন পিছন ঘোষও গদির ভিতরে ঢুকল। ভিতরে এককোণে একটা টেলিফোনও রয়েছে দেখে ঘোষ রিসিভার তুলে দেখে লাইন কাটা।

দুজনে গদির ভিতরে আয়েশ করে বসল। বেশ বড়োসড়ো গদি, বিশ ফুট বাই ষোলোফুট হবে নিশ্চয়। ঘোষ সাতপাঁচ ভাবছে, তার মধ্যেই একটা ষণ্ডাগোছের লোক ভিতরে ঢুকে দুজনের হাতে ঠান্ডা কোকাকোলার বোতল ধরিয়ে দিল। বরদা মধুর হেসে বলল—'আমি একটু বাইরে সিপাইরা ঠান্ডা কিছু পাইল কিনা দেইখা আসি। পাঁচ মিনিট, যামু আর আসুম। কুনো চিন্তা নাই। আমি আছি না? শ্যামাকান্ত, দরজাটা টাইনা দিবি। সাহেবরা শান্তিতে বসুক। সতু, সত্যেন ভাই, আমি চলিরে।'

আগে বরদা, পিছে শ্যামাকান্ত। শ্যামাকান্ত দরজার দুটো পাল্লা টেনে দিল, তারপরই একটা 'খ্যাচাং' আওয়াজ। ঘোষ

বলল—'দিলীপবাবু, আওয়াজটা সন্দেহজনক। বাইরে থাইকা খিল টাইনা দিল নাকি? আমরা কি খেঁচাকলে আটকা পড়লাম? সঙ্গের সিপাইরা অখন কুথায়?'

বলেই একলাফে দরজা টেনে খুলতে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই। দরজা বাইরে থেকে খিল টেনে বন্ধ করা হয়েছে। বরদা দরজার বাইরে থেকে হিস হিস করে বলল—'সতু, তর খুব দেমাক, পুলিশ হইয়া ধরারে সরা ভাবস না? এইবারে ভিতরে বইসা ইষ্টনাম নিতে থাক। আমার পোলাডারে কিলচড় মারছস, তরে ছাইড়া দিমু নাকি? অখন লালবাজারে ফোন কইরা ইতিবৃত্ত জানামু। তেনারা আসবেন, তোদের মুক্ত করবেন, তারপরে অপদার্থ দুই দারোগারে বরখাস্ত করবেন অবিলম্বে।'

ঘোষ আতঙ্কে দিশাহারা। বরদা যা বলছে, অবশ্যই তা হতে পারে। নির্বোধের মতো ফাঁদে পড়েছে। দেবীবাবুর তবু দয়ামায়া আছে, সুনীল চৌধুরী জানলে একদম 'ঘচাং ফুঃ'। সাসপেন্ড তো অবধারিত। চিঁ চিঁ করে বলল—'দাদারে, ও বরদাভাই, দেশের লোক হইয়া এমুন বাঁশ দিবা?'

বাইরে থেকে খিক খিক করে হেসে বরদা বলল—'ছাড়ান দে ওইসব দেশের কথা! আপনে বাঁচলে বাপের নাম। তুই কুন দেশের কথা কস? হগ্গলের আগে নাকি তর ডিউটি? আধঘণ্টা এইভাবে থাক! তারপরে মুক্ত যদি বা হইলি তগো বরখাস্ত রোখে কে?'

এইসব চাপানউতোর আরো চলত। দিলীপের প্রায় নাভিশ্বাস অবস্থা। অপারেশনের দায়িত্বে থেকে এমন নির্বোধের মতো খাঁচায় আটকে যাবার জন্য প্রথম কোপটা ওর ঘাড়েই পড়বে নিশ্চিত!

এমন সময় দরজার বাইরে একটা সন্দেহজনক শব্দ। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে বাঁশফাটার আওয়াজের মতো! একবার নয়, একাধিকবার! ঘোষ উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠল। বলল—'আর চিন্তা নাই। নির্ঘাৎ বস আইসা গেছেন। আওয়াজটা অতি অবশ্য বসের বিশুদ্ধ বাঙালি চপেটাঘাত। যার গালে লাগব অর সাতদিনের জন্য ভাত চিবাইয়া খাওয়ায় ছেদ!'

ঘোষের অনুমান সঠিক। ঝনাৎ শব্দে গদির দরজা খুলে গেল। বাইরে সুশান্ত, তার পিছনে গায়ে শামলা চড়ানো কোর্টের উকিল শচীন দত্ত। নীচে ভূলুণ্ঠিত বরদা পাল আর শ্যামাকান্ত, দুজনেই গালে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় চিঁ চিঁ করছে।

সুশান্ত বলল—'যাক, ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। গদির আসল মালিক দেবদাস মিত্রের ফেভারে কোর্ট থেকে অর্ডার বার করতে যেটুকু দেরি হল। কাজটা পাকা করে তবে এলাম। দিলীপ, তোমার ফোর্সের লোকজন কোথায়? তোমরা দুজন এমন আলাদা হয়ে পড়লে কেমন করে?'

ঘোষ বলল—'ওই বরদাকান্ত কায়দা কইরা বাকি ফোর্স দূরে কোথায় বসাইয়া কোকাকোলা নিবেদন করছে অবশ্য অবশ্য। বস, অর অন্য গালে আরেকখান আপনার বিশুদ্ধ চপেটাঘাত করেন। ফড় ফড় কইরা হগল কথা পেট থাইকা বাইর কইরা দিব।'

দিলীপ চিঁ চিঁ করে বলল—'বোসদা, খালি দুজনকে হাতে পেলাম। বাকি সবাই কেটে পড়েছে। খুব বেইজ্জতের ব্যাপার!'

সুশান্ত বলল—'ঘাবড়াও মত। পালাবার সব রাস্তা বন্ধ। সব কটা বাঁদর রাজকাটরার মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। ধরে ফেলব।'

দিলীপ বলল—'রাজকাটরার ভিতরে কাতারে কাতারে মানুষ। এখানে ভিড়ে গেলে চিনে চিনে বার করা প্রায় অসম্ভব।'

সুশান্ত বলল—'আমাদের ঘোষবাবু আছে কী জন্য? যারা পালিয়েছে তারা সবাই ঘোষের পরিচিত দ্যাশের লোক। ঘোষ করিৎকর্মা এসব কাজে। সব কটাকে চুন চুনকে পাকড় লেঙ্গে।'

বরদা ভূমিশয্যা থেকে কঁকিয়ে উঠল—'সতুরে, ভাই সত্যেন, তুমি আমার দেশের লোক, সম্পর্কের ভাই। শেষে তুমি নিজে দেশের লোকদের গ্রেপ্তার করবা? কামটা কি ঠিক হইব?'

ঘোষ খেঁকিয়ে উঠল—'চুপ, বেশি কথা কইবা না। আমার লগে বৈঠকবাজি কইরা, গদ্দির ভিতরে আটকাইয়া রাখার সময় কুন দেশের কথা তুমার মনে ছিল? তাছাড়া আমি পুলিশকর্মী, আমার কাছে আমার ডিউটি সবার আগে। যারা যারা লুকাইয়া আছে এই বাজারের ভিড়ের মধ্যে, সব কয়ডারে আমি চিনি। সব কয়ডারে ঠিক ধইরা ফেলুম।'

সুশান্ত বলল—'ঘোষ, ওই দূরে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন দেখতে পাচ্ছ? এনাকে তুমি চেনো। এনার নাম দেবদাস মিত্র। ইনিই এই গদির আসল মালিক।'

ঘোষ বলল—'আরে, ইনি তো সেই ডিসি হেডকোয়ার্টার সুনীল চৌধুরীর দেশের লোক। আমার নামে তেনার কান ভাঙাইতে গেছিলেন!'

সুশান্ত বলল—'ঘোষ, এই অভিযানের জন্য তোমার নাম দেবীবাবু নয়, স্বয়ং সুনীল চৌধুরী সাজেস্ট করেছিলেন। কেন জানো?'

ঘোষ অবাক হয়ে বলল—'বস, কেন, কেন?'

সুশান্ত হেসে বলল—'তোমার উপর উষ্মা দেখিয়েছিলেন এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি এটাও ঠিক। তবে ওই প্রসঙ্গে সুনীলবাবুকে উনি বলতে ভোলেননি যে ঘোষ ছেলেটার পরোপকারের জন্য অদম্য উৎসাহ। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়াও অন্য একটা কাজের কথাও উনি তাঁকে বলে রেখেছিলেন। সেটা এই জবরদখল গদির পুনরুদ্ধার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কিছু কুসন্তান এই অপকর্মে জড়িত এটা তিনি জানতেন। এই সবকিছু জানার পরেও শ্রী দেবদাস মিত্র ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আরেক সন্তান শ্রী সত্যেন ঘোষ যেন এই পুলিশিকাজে তাঁর সাহায্যে অংশ নেয় এইটাই চেয়েছিলেন সুনীলবাবুর কাছে। ডিসি হেডকোয়ার্টারেরও এই ব্যাপারে পূর্ণ সম্মতি ছিল, এইটাই তোমাকে জানাবার ছিল।' ❖

মনজিৎ গাইন

স্বর্ণকুঠুরি রহস্য

ছবি : নচিকেতা মাহাত

সতুকার কাছে একটা মেল এসেছে। সতুকা মেলটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। আমি সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সতুকা, কোথা থেকে মেল এল?"

"এই মেলটা এসেছে লালবাজার থেকে। তাদের কাছে একটা কেস এসেছে সেটার সমাধানে তারা আমার সাহায্য চাইছে।"

"কী কেস?"

"বাগবাজারের জনৈক বিকাশ বল্লভ বেশ কিছুদিন ধরে নিখোঁজ। তাঁর সন্ধানে আমাদের এখন নামতে হবে।"

"কোনো এক্সট্রা ইনফর্মেশন এই কেসে?"

"হ্যাঁ, বিকাশ বল্লভ একজন প্রখ্যাত পাইকারি বস্ত্র ব্যবসায়ী। কলকাতার বেশ বড়ো বড়ো শাড়ির দোকানে বিকাশ বল্লভ শাড়ি সাপ্লাই দিতেন। ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁর খুবই গুডউইল আছে।"

"তাহলে সতুকা, এই কেসে আমরা এগোব কী করে? আমরা কি প্রথমেই ধরে নেব যে এই কেসটা পুরোপুরিভাবেই বিজনেস রাইভালিরি জন্যেই ঘটেছে?"

"হ্যাঁ, সেটা ধরে নেওয়া আপাতত সোজা কিন্তু সেটাই আমাদের তদন্তের গতিমুখ কোনোভাবেই হবে না।"

"তাহলে আমরা এখন কোথা থেকে আমাদের তদন্ত শুরু করব?"

"আমাদের প্রথমে যেতে হবে বিকাশ বল্লভের বাড়িতে। সেখান থেকে আমাদের এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য নিয়ে তারপর এগোতে হবে।"

বটুকবাবুকে নিয়ে আমরা চলে গিয়েছি শ্যামবাজারে বিকাশ বল্লভের বাড়িতে। সেখান থেকে যা জানা গেল তাতে বোঝা গেল বিকাশ বল্লভ ঢাকা থেকে জামদানি শাড়ি এনে এখানে বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতেন। আর সেই জামদানি শাড়ি আনতে বিকাশ বল্লভ ঢাকায় যান আর তারপর সেখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যান।

সতুকার তাই শুনে প্রশ্ন, "বিকাশবাবুর কাছে কি কোনো হুমকি ফোন বা টাকা চেয়ে কোনো ফোন এসেছিল?"

"সেরকম কোনো কিছু আসেনি বা আমাদের বলেনি। কিন্তু বাবাকে বেশ কিছুদিন ধরে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল।"

"কী কারণে সেটা আপনারা কি জানতে পেরেছিলেন?"

"না, সেটা বাবা আমাদের বলেনি তবে জিজ্ঞাসা করলে খুবই বিরক্ত হত।"

"ঠিক আছে, আপনি আপনার বাবা বাংলাদেশের কোথা থেকে জামদানি শাড়ি নিয়ে আনতেন সেটা একটু জানান আর তাঁর সঙ্গে

ওখানে কার কার যোগাযোগ ছিল সেটাও আমাদের জানাবেন।"

সতুকার নির্দেশে বিকাশ বল্লভের ছেলে রাজু বল্লভ সবকিছু বলে গেল। সতুকা সেটা নোট করে নিল। সতুকা ওখান থেকে বেরোনোর আগে বলল, "আপনার বাবার ঘরটা একটু আমি ঘুরে দেখতে চাই।"

"অবশ্যই আসুন।"

আমরা তিনজনে বিকাশ বল্লভের ঘরে গেলাম। সেখানে বেশ কিছু বই। সতুকা সেগুলো নেড়েচেড়ে বলল, "আপনার বাবার তো দেখছি ইতিহাস বিষয়ে ভালোই আগ্রহ। অনেক বই-ই ইতিহাস নিয়ে।"

"হ্যাঁ, আমার বাবা ইতিহাস নিয়ে পড়তে খুব ভালোবাসে।"

সতুকা বেশ কয়েকটা বই নেড়েচেড়ে দেখার পরে একটা বই একটু যেন সময় নিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সতুকা বইটা দেখেশুনে বলল, "আচ্ছা, আমি কি এই বইটা নিয়ে যেতে পারি?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, অবশ্যই নিয়ে যান।"

"আচ্ছা আপনার বাবার কি কোনো ডায়েরি বা নোটবই জাতীয় কিছু ছিল যাতে তিনি ব্যবসার সবকিছু লিপিবদ্ধ করে রাখতেন?"

"না, সেরকম তো কিছু ছিল না। একটা ব্যবসার খাতা ছিল। সেখানেই সব ব্যবসার হিসাব লিখে রাখতেন।"

"সেই খাতাটা একটু আমায় দিতে হবে।"

সতুকার হাতে সেই খাতা অবিলম্বে চলে এল। সতুকা সেটা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, "এছাড়া অন্য কোনো খাতা কি ছিল?"

"হ্যাঁ, একটা নোটবইতে এইসব বই থেকে পড়ে কিছু কিছু লিখে রাখত বাবা।"

"সেটা কোথায়?"

"সেটা বাবা যখনই বাংলাদেশে যেত, সঙ্গে করে নিয়ে যেত।"

"ওকে, আর একটা প্রশ্ন। আপনার বাবা তো খুব দামি দামি শাড়ি সরবরাহ করতেন কলকাতার বড়ো বড়ো শাড়ির দোকানে। কোনো দোকানে পেমেন্ট-পত্তর আটকে ছিল বা আপনার বাবা কোনো মহাজন থেকে ধার নিয়েছিলেন কিন্তু সেটা শোধ করতে পারছিলেন না, এরকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি তো?"

সতুকার এই প্রশ্ন শুনে রাজু বল্লভ একটু মাথা নেড়ে নিয়ে বলল, "না, সেরকম কোনো ঘটনা ঘটলে বাবা নিশ্চয়ই আমাদের বলত।"

"আপনার বাবা যে এবারে বাংলাদেশে পৌঁছেছিলেন, সে সম্বন্ধে কি আপনারা নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ, আমরা নিশ্চিত কারণ বাবা বাংলাদেশ পৌঁছে সেখান থেকে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিল তার বাংলাদেশে পৌঁছে যাওয়ার খবর।"

"ওকে, তাহলে, আপনি সেই ফোন নম্বরটা আমাকে একটু দিন।"

সতুকার কথা শুনে রাজু বল্লভ সেই ফোন নম্বরটা সতুকাকে দিল। সতুকা সেই ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করে দেখল—সুইচড অফ!

সতুকা ওখানে আরও কিছু দরকারি কথা বলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসার পরে বটুকবাবু যে এতক্ষণ নির্বাক দর্শক হয়ে ছিল সে এবারে বলল, "তাহলে কি এবারে আমাদের গন্তব্য ওপার বাংলা—বাংলাদেশ?"

সতুকা ঘাড় নাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ, একদম তাই।"

লালবাজার থেকে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমরা এবারে যাব বাংলাদেশের ঢাকায়। সেখানেই বিকাশ বল্লভ উঠেছিলেন একটা হোটেলে। সতুকা ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে সেখানে পৌঁছে নিজের আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল ওখানেই বিকাশ বল্লভ প্রতিবার বাংলাদেশ এলেই উঠতেন আর এবারে ওখান থেকে দিন তিনেক আগে সেই যে বেরিয়ে যান তারপর আর তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। সতুকা জিজ্ঞাসা করল, "কার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন?"

"এখানে একজন আসত বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে কিন্তু সে কোথায় থাকে এটা আমরা কিন্তু জানি না।"

সতুকা সব শুনে এবারে বলল, "আমি একবার বিকাশ বল্লভের ঘরে যেতে চাই।"

"হ্যাঁ, যেহেতু আপনি বিকাশ বল্লভের নিখোঁজ হওয়ার অনুসন্ধান করতে এখানে এসেছেন তাই আপনাকে নিয়ে আমি ওই ঘরে ঢুকছি; না হলে আমরা আমাদের কোনো বোর্ডারের ঘরে ঢুকি না।"

সেই ঘরে ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে ঢুকে সতুকা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগল খুবই গভীর ভাবে। সতুকা খুঁজছে বিকাশ বল্লভের সেই নোটবই। কিন্তু সেখানে সেসব কিছু নেই। বিকাশবাবুর একটা জামার পকেটে সতুকা একটা চিরকুট পেল আর তাতে লেখা একটা অদ্ভুত ছড়া—

গুপ্তযুগের সোনা
আকবরের হাতে গোনা
লুকিয়ে আছে কোথায়
বকের বাড়ি যেথায়!
এবার পাব হাতে
জানবে না কেউ যাতে
বেরোতে হবে ভোরে
স্বর্ণকুঠুরির দোরে!

সতুকার হাত থেকে আমি যখন এটা নিয়ে পড়লাম তখন আমার মনে হচ্ছে এর মধ্যে বড়ো কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু কী রহস্য লুকিয়ে আছে সেটা আমরা কেউ বুঝতে না পারলেও বটুকবাবু বলল, "এ তো কোনো গুপ্তধনের রহস্য সংকেত মনে হচ্ছে। সাত্যকিবাবু, আপনি কিছু বুঝতে পারছেন এই নিয়ে?"

সতুকা বটুকবাবুর এই কথা শুনে বলল, "না, আপাতত বুঝতে না পারলেও বোঝার চেষ্টা করছি।"

"কিন্তু আপনি যাই বলুন সাত্যকিবাবু আমি কিন্তু এর কোনো মাথামুন্ডুই বুঝতে পারছি না।"

সতুকা তাই শুনে বটুকবাবুকে মৃদু হাসতে হাসতেই বলে, "বোঝার চেষ্টা করতে হবে।"

আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। সতুকাকে আমার প্রশ্ন, "এখন আমাদের কাজটা কী?"

সতুকার কিছু বলার আগেই বটুকবাবুর উক্তি, "এখন আমাদের কাজ হবে ওই ছড়ার অর্থ উদ্ধার করা।"

সতুকা তাই শুনে বলল, "সেটা অবশ্যই আমাদের কাজ কিন্তু তার আগে আমাদের কাজ হবে ঢাকায় এসে বিকাশ বল্লভ যাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখতেন, তাদের একটা লিস্ট বার করা। আর তার জন্যে আমাকে আপাতত ঢাকার পুলিশ সদরে গিয়ে ওখান থেকে মোবাইল কোম্পানিতে বিকাশ বল্লভের নম্বর দিয়ে ওই লিস্ট বার করতে হবে।"

"আমরা তাহলে কি এখন তোমার সঙ্গে যাব?"

"না, আপাতত তোদের আর আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। এখন তোরা অপেক্ষা কর হোটেলে। তারপর ওখান থেকে ফিরে এসে আবার একসঙ্গে বেরোনো যাবে।"

সতুকা আমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে গেল।

সতুকা ফিরে এল একটু বেলায়। ফিরে এসেই সতুকা আমাদের তাড়া দিচ্ছে, "শেরু-বটুকবাবু, তোরা রেডি হয়ে নে। এবারে আমাদের বেরোতে হবে।"

আমি তাই শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কোথায় বেরোবে?"

"এখন আমাদের বেরোতে হবে রিয়াজ আলি বুলবুলের খোঁজে।"

"সে কে?"

"সে ঢাকায় বিকাশ বল্লভের সব জামদানি শাড়ি সরবরাহ করত।"

আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে ঢাকা পল্টন অঞ্চলে রিয়াজ আলি বুলবুলের কাছে পৌঁছে গেলাম। রিয়াজ আমাদের যা বলল, "হ্যাঁ, আমি অবশ্যই বিকাশ দাদার জন্যে সারা বাংলাদেশের সেরা সেরা জামদানি শাড়ি এনে দিতাম কিন্তু ইদানীংকালে দাদার ফোকাসটা অন্যদিকে চলে গিয়েছিল।"

সতুকা তাই শুনে জিজ্ঞাসা করল, "কোন দিকে ওঁর ফোকাস চলে গিয়েছিল?"

"আসলে এই ঢাকায় অনেক পুরোনো জিনিসপত্র আছে, সেইসব জিনিসপত্র যারা পাচার করে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে দাদার যোগাযোগ দিনদিন বাড়ছিল।"

"তুমি তাতে বারণ করোনি?"

"হ্যাঁ, আমি তাতে বারণ করেছিলাম কিন্তু দাদা সেইসব কথা শুনত না। বলত, তোমার এইসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই।"

"তারা কারা তুমি কি বলতে পারবে?"

"না, আমি তাদের আশেপাশেও থাকি না।"

সতুকা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমি সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সতুকা, এবারে ওইসব সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবে বলো তো? ওদের ফোন নম্বর কি বিকাশ বল্লভের মোবাইলের কল লিস্টে পেয়েছ?"

"না রে পাইনি। আসলে বিকাশ বল্লভের ফোনের কল লিস্টে থাকা বেশ কিছু নম্বর সুইচড্ অফ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওরাই হচ্ছে সেইসব সন্দেহভাজন ব্যক্তি যারা নিজেদের ফোন নম্বর বন্ধ করে ফেলেছে।"

"ওই ফোন নম্বরগুলো কাদের নামে তোলা সেটা একটু দেখলে হত না?"

"হ্যাঁ, সেটাও আমি দেখেছি কিন্তু সেই নথিগুলোও দেখা যাচ্ছে পুরো জালি।"

"তাহলে আপাতত আমাদের আর ওদের কাছে পৌঁছোনোর কোনো সুযোগ নেই?"

"না, সেরকম কোনো সুযোগ না থাকলেও একটা উপায় কিন্তু আছে।"

"কোন উপায়?"

"কেন, বিকাশ বল্লভের হোটেলের ঘর থেকে পাওয়া ছড়ার অর্থ উদ্ধার করতে পারলেই আমরা মনে হয় এই রহস্য সমাধানের অনেকটা কাছে চলে যেতে পারব।"

সতুকার এই কথা শুনে বটুকবাবু খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সাত্যকিবাবু আপনি কি এই ছড়ার অর্থ উদ্ধার করে এই রহস্য সমাধানের পথে এগোতে পারবেন?"

"দেখা যাক চেষ্টা করে।"

এটা বলে সতুকা সমানে ঢাকার হোটেলে বিকাশ বল্লভের জামার পকেট থেকে পাওয়া ছড়াটা আপন মনে বলে যেতে লাগল—

গুপ্তযুগের সোনা
আকবরের হাতে গোনা
লুকিয়ে আছে কোথায়
বকের বাড়ি যেথায়!
এবার পাব হাতে
জানবে না কেউ যাতে
বেরোতে হবে ভোরে
স্বর্ণকুঠুরির দোরে!

নিজে আপনমনে বেশ অনেকক্ষণ ওই ছড়া বিড়বিড় করে বলার পরে সতুকা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "শেরু, এই ছড়াটা শুনে তোর কি কিছু মনে হচ্ছে?"

"আমার মনে হচ্ছে গুপ্ত যুগের কোনো গুপ্তধন যেটা যথাসম্ভব সোনারই হবে সেটা আকবরের আমলে আবার কোনো কারণে নাড়াচাড়া হয়, সেটা লুকোনো আছে এই ঢাকারই আশেপাশে কোথাও একটা আর আমাদের কলকাতার বস্ত্র ব্যবসায়ী বিকাশ বল্লভ যেভাবে হোক সেই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়ে যান। আর সেটার সন্ধানে গিয়েই শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিখোঁজ হয়ে যেতে হয়।"

আমার কথা শুনে সতুকার চোখে-মুখে বেশ আনন্দের রেশ। তার মানে আমার ধারণাটা মোটামুটি ঠিক দিকেই এগোচ্ছে। আমি তাই আমার বলা শেষ করে সতুকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী সতুকা, মোটামুটি আমার অ্যাজামশান ঠিক আছে তো?"

সতুকা আমার কথা শুনে ঘাড় নাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ, একদমই তোর অ্যাজামশান ঠিক আছে। কিন্তু এখন আমার ইচ্ছা যেভাবে হোক ওই ছড়ার অর্থ উদ্ধার করা।"

"কিন্তু কীভাবে সেটা করবে বলো তো?"

"তার জন্যে আমাকে গভীর ভাবে ভাবতে হবে আর অনেক পড়াশোনা করতে হবে। তাহলেই এই ছড়ার অর্থ উদ্ধার করা যাবে।"

সতুকা এবারে অবশ্য বিকাশ বল্লভের বাড়ি থেকে আনা একটা বই নিয়ে পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি লক্ষ করে দেখলাম সেই বইটা ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের ওপরে একটা বই।

সতুকা পরে হোটেল থেকে বেরোল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সতুকা, এখন কোথায় যাবে?"

"তোরা রেস্ট নে, আমি একটু ঘুরে আসি।"

সতুকার চোখ-মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সতুকা মনে হয় কোনো একটা কিছুর সন্ধান করতেই এইভাবে বাইরে গেল। বটুকবাবুর জিজ্ঞাসা, "কী ব্যাপার বলো তো শেরু, তোমার কাকা এইভাবে কি বকের বাড়ির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল আমাদের না নিয়েই?"

"না-না, সতুকা বকের বাড়ির সন্ধান যদি পেত তাহলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে নিয়েই বেরোত। এখন মনে হয় বকের বাড়ির পথের সন্ধান করতেই বেরিয়েছে।"

সতুকা ফিরে এল তখন অনেক রাত। আমি দেখলাম সতুকা বেশ চিন্তিত। সতুকাকে ওইভাবে চিন্তিত দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কী ব্যাপার সতুকা, তোমায় এরকম চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?"

"আচ্ছা শেরু, বিকাশ বল্লভ বাংলাদেশ থেকে জামদানি শাড়ি কলকাতায় নিয়ে যেতেন। আর জামদানি শাড়ি খুব ভালো তৈরি হয় সোনারগাঁতে। আর এই সোনারগাঁ খুবই প্রাচীন এক জনপদ। আমার মনে হচ্ছে ওখানেই কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।"

বটুকবাবুর তাই শুনে উত্তর, "আর বকের বাড়িটা কোথায়?"

"সেটার সন্ধান এখনও পাওয়া না গেলেও ছড়ার অন্য শব্দগুলো কিন্তু সোনারগাঁতে এসে মিলে যাচ্ছে।"

"কীরকম?"

"এই যেমন প্রাচীন বাংলার বা বলা যায় সুবে বাংলার একসময় রাজধানী ছিল এই সোনারগাঁ আর গুপ্ত যুগ, সেন যুগ আর পাল যুগেও খুব সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। তারপর আকবরের আমলে তো সুবে বাংলার রাজধানীও ছিল। তারপর ঐতিহাসিক রমেশ-চন্দ্র মজুমদারের বই পড়ে যে তথ্য পেলাম সেটা আরও ইন্টারেস্টিং।"

"কী সতুকা?"

"এই সোনারগাঁর প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণগ্রাম আর সেই নামের কারণ এখানে নাকি একটা সোনার খনি ছিল প্রাচীন বাংলায়।"

তাই শুনে বটুকবাবু বলল, "তাহলে তো আমরা এখন আর শুধু ওই ছড়ায় লেখা স্বর্ণকুঠুরির সন্ধান করব না, আমরা তো এখন সন্ধান করতে চলেছি এক সোনার খনির?"

"দেখা যাক আমরা কীসের সন্ধান পাই।"

পরের দিন আমরা চলে গেলাম ঢাকার খুব কাছেই সোনারগাঁতে। বেশ কয়েক জায়গায় যেখানে জামদানি শাড়ি তৈরি হয়, সেখানে আমরা গেলাম। কী অপূর্ব কাজ সেইসব শাড়িতে! দেখলেই চোখ একেবারে জুড়িয়ে যায়। সতুকা তাই দেখতে দেখতে আমাদের বলল, "জানেন বটুকবাবু, এই জামদানি কিন্তু সেই প্রাচীন বাংলার ঢাকাই মসলিনেরই এক দুর্দান্ত ধরন। প্রাচীন বাংলার সেই ঐতিহ্য এই সোনারগাঁয়ের জামদানি শাড়ি তৈরি করা তাঁতিরা এখনও ধরে রেখেছে।"

জামদানি শাড়ি তৈরি করা তাঁতি রাজীব মাহমুদের সামনে তখন আমরা বসে আছি। রাজীব বেশ কমবয়সি তরুণ। তার কাছ

থেকে জানা গেল বিকাশ বল্লভ তার কাছ থেকেও অনেক শাড়ি নিতেন। সতুকা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ''আচ্ছা রাজীব, তুমি বলতে পারবে এখানে এই সোনারগাঁতে প্রাচীন কী কী নির্দশন আছে দেখার মতো?''

সতুকার এই প্রশ্ন শুনে সে বলল, ''হ্যাঁ, এখানে অনেক কিছু দেখার জিনিস আছে যেগুলো খুবই প্রাচীন।''

এই বলে বেশ কিছু জায়গার কথা রাজীব আমাদের বলে গেল। সতুকা সব কিছুই ভালো করে শুনে নিচ্ছে। এবারে সতুকার প্রশ্ন, ''আচ্ছা আরও প্রাচীন কিছু আছে, যেখানে সব মানুষ যায় না?''

এবারে রাজীব বলল, ''হ্যাঁ, এখান থেকে একটু দূরে একটা পোড়ো বাড়ি আছে যাকে আমরা সবাই কঞ্চিবাড়ি বলে ডাকি। সেখানে নাকি আগে ট্যাঁকশাল ছিল। তবে সেখানে এখন কেউ যায় না, পুরোপুরি ভূতের বাড়ি, অনেক জিন থাকে।''

সতুকা তাই শুনে নিজের মনেই কয়েকবার বলে নিল, ''কঞ্চিবাড়ি-কঞ্চিবাড়ি!''

আরও বেশ কিছু কথা বলার পরে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। বেরিয়ে আমরা রাস্তার ধারে যখন দাঁড়িয়ে আছি, সেইসময় হঠাৎ করেই আমাদের সামনে দিয়ে এক বাইকের পিছনে বসে থাকা একজন একটা ঢেলা ছুড়ে দিয়ে চলে গেল। সেটায় একটা কাগজ গাডার দিয়ে লাগানো ছিল। সতুকা সেটা তুলে নিয়ে দেখে তাতে লেখা—ইন্ডিয়ান ডিটেকটিভ, তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে এখান থেকে সোজা আবার ইন্ডিয়াতে ফেরত যাও। নাহলে কিন্তু তোমাদের ডেডবডি ইন্ডিয়াতে ফেরত যাবে।

এই চিরকুটটা পড়ে সতুকার মুখে হাসি, ''তাহলে আমরা এবার ঠিক জায়গাতেই যাচ্ছি।''

''ঠিক জায়গা কোনটা, সতুকা?''

''ওই যে কঞ্চিবাড়ি।''

''মানে?''

''আরে ওটাই তো বকের বাড়ি।''

''কীভাবে?''

''বককে সাধুভাষায় বলে ক্রৌঞ্চ আর স্ত্রী-লিঙ্গে ক্রৌঞ্চী আর সেটা চলতি কথায় পালটাতে পালটাতে কঞ্চি হয়ে গিয়েছে।''

''কিন্তু সতুকা, এইভাবে প্রাচীন আমলে কি কেউ বকের বাড়ি নাম দেয়?''

''না-না, কেউ বকের বাড়ি নাম দেয়নি। আসল নাম হচ্ছে ক্রোড়িবাড়ি। আকবরের আমলে যারা রাজস্ব সংগ্রহ করত তাদের ক্রোড়ি বলা হত আর তারা ওখানেই থাকত বলে ওখানটাকে বলা হয় ক্রোড়িবাড়ি। আর ক্রোড়িবাড়ি চলতি ভাষায় ক্রোঞ্চীবাড়ি

মারে একেবারেই কুপোকাত।
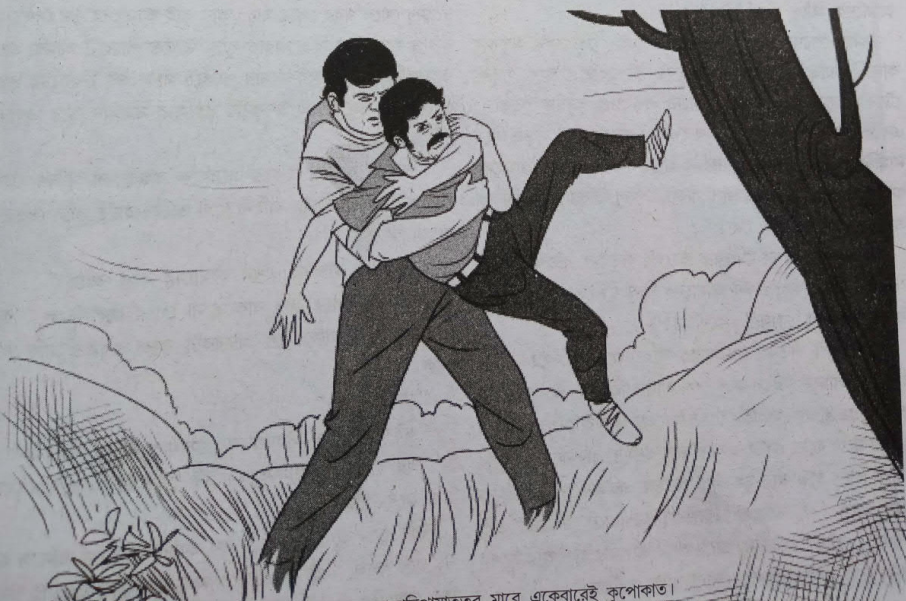
থেকে কঙ্কিবাড়ি হয়ে বিকাশ বল্লভের ছড়ায় হয়ে গিয়েছে বকের বাড়ি। আমাদের এখন যেতে হবে সেই ক্রোড়িবাড়িতে। তবে খুব সাবধানে কারণ আমাদের পিছনে এখন ফেউ লেগে গিয়েছে।"

আমরা ওখানে পৌঁছে গিয়েছি। একেবারেই ভাঙাচুরো একটা বাড়ি। যাতায়াতের পথ একেবারেই ঝোপ ও আগাছায় ঢাকা। সেখান দিয়ে যেতে গেলে এমনিতেই খুব ভয় করে। সতুকা বলল, "সাবধান, এখানে কিন্তু বিষধর সাপ থাকতে পারে।"

খুব হালকা একটা পায়ে চলা রাস্তা আছে। সতুকা সেইদিকে আমাদের ইঙ্গিত করল। তার মানে এখানে অল্প হলেও লোকজন আসে। সতুকা সামনে এগিয়ে চলেছে। চারপাশে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বড়ো পুকুর আছে দুটো। তবে ঘাট একেবারেই ভেঙেচুরে গিয়েছে। আমরা একেবারে ওই কঙ্কিবাড়ি বা বকের বাড়ির সমানে চলে এসেছি। ভেতরে ঢুকতে যাব আর তখনই আমাদের পিছনে একজনের হিসহিসে গলা, "ইন্ডিয়ার টিকটিকি, তোমরা এখন কালু শেখের পিস্তলের নলের সামনে আছ, নড়চড় করেছ, কী মরেছ!"

কিন্তু কালু শেখ সতুকাকে কোনোভাবেই চিনত না। তার এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সতর্ক হওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই সতুকা তার কেরালার প্রাচীন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াত্তুর এক প্যাঁচে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে বলল, "বল, কোন গুপ্ত কুঠুরিতে তোরা প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পেয়েছিস, সেখানে আমাদের আগে নিয়ে চল।"

কালু শেখের আর কিছু করার নেই। সে তখন সতুকার কালারিপায়াত্তুর মারে একেবারেই কুপোকাত। তাকে সতুকা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কোনো এক গুপ্ত কুঠুরির ভেতরে। একটা এরকম গুপ্ত কুঠুরির মুখ খোঁড়া। আমরা সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নামছি। ভেতরে বেশ কয়েকজন আছে বোঝা যাচ্ছে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, "কালু, ইন্ডিয়ার টিকটিকিরা এখানে চলে আসেনি তো?"

কালুর কিছু উত্তর দেওয়ার আগেই সতুকার বাজখাঁই গলা, "এই, তোদের কালু এখন আমাদের জিম্মায়। তোরা আগে বল বিকাশ বল্লভকে কোথায় রেখেছিস?"

এটা বলেই সতুকা অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের গতিতে ওদের একেবারে সামনে। তখন কালু শেখ আমার জিম্মায়। আর তারপর সতুকার জোরালো মোবাইল টর্চের আলোয় আমরা দেখলাম দুজন কুঠুরির মধ্যে বড়ো একটা জালায় ভরা স্বর্ণমুদ্রা বার করেছে। আর তাদের পাশে হাত আর মুখ বাঁধা অবস্থায় একজন। সতুকা তাঁকে দেখে বলল, "ও, তাহলে বিকাশবাবু আপনাকে এখানেই এরা বন্দি করে রেখেছে। দাঁড়ান, আগে আমি আপনার হাত আর মুখের বাঁধন খুলে দেই। তারপর শোনা যাবে সবকিছু।"

সতুকা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বিকাশ বল্লভের বাঁধন খুলে দিল। আর সেই সময়েই ক্রোড়িবাড়ির গুপ্তকুঠুরি থেকে যারা সেই প্রাচীন আমলের স্বর্ণমুদ্রার জালা বার করছিল, তারা সতুকার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল কিন্তু তার আগেই সতুকা তার কালারিপায়াত্তুর প্যাঁচে তাদেরও পুরো ধরাশায়ী করে ফেলল।

বিকাশ বল্লভ তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "আপনারা কারা, আর কীভাবে জানলেন এই জায়গার হদিস? এরা আজকেই এই স্বর্ণকুঠুরির সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল আর সোনার মোহরের জালা পেয়ে যাওয়ার পরে ওরা আমাকে মেরেই ফেলত।"

"আপনার ওই জামার পকেটে থাকা ছড়া লেখা কাগজটাই আমাকে এই জায়গার হদিস দেয়। আর আপনি কী করে এই জায়গার হদিস পেলেন বলুন তো?'

"আমি এইসব পুরোনো এলাকার ইতিহাস সন্ধান করতে করতে একটা বিদেশি বইয়ের সন্ধান পাই। সেখানে এই ক্রোড়িবাড়ির কথা লেখা আছে। আর তাই আমি এদের সাহায্য নিয়ে এই গুপ্তধন উদ্ধার করতে গিয়ে এদের খপ্পরে পড়ে যাই।"

সতুকাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "সতুকা, কিন্তু এরা আমাদের খবর জানল কী করে?"

"আসলে আমরা এখানে এসে বিকাশবাবুর সন্ধান শুরু করেছিলাম আর ওরা সেটা ওদের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো চরদের থেকে খবর পেয়ে যায়। আর তাই আমাদের ভয় দেখানো কাগজ ছুড়ে দেয় কিন্তু এরাও বুঝে উঠতে পারেনি আমরা এত তাড়াতাড়ি বিকাশবাবুর জামার পকেটে থাকা ওই চিরকুটের ছড়া থেকে এত সহজে এই স্বর্ণকুঠুরি রহস্যের সমাধান করে এখানে পৌঁছে যাব।"

"তাহলে সতুকা, এবারে এদেরকে বাংলাদেশ পুলিশ যাকে ওরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বলে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করো।"

"হ্যাঁ, ওই কাজটাই এখন আমাদের বাকি আছে।"

বটুকবাবু এবারে আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, "কিন্তু সাত্যকিবাবু, আমাদের যে আরেকটা কাজ এখনও বাকি রয়ে গেল।"

"কোন কাজ?"

"ওই যে প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের সোনার খনির সন্ধান করা।"

"হ্যাঁ, সেই অনুসন্ধান আমরা এই স্বর্ণকুঠুরি থেকে বার হয়েই শুরু করে দেব।"

তাই শুনে বটুকবাবুর মনে খুব আনন্দ আর সে আনন্দে হাত উঁচু করে বলল, "এই না হলে শেরুর গোয়েন্দা সতুকা! থ্রি চিয়ার্স ফর গোয়েন্দা সতুকা! হিপ-হিপ-হুররে!" ❖

পাঁচু
শৈবাল দত্ত

একদিন
আঁ! এ-একী!

দামি মোবাইলটা এভাবে রেখেছেন কেন?
কী হবে?

পকেটমারি হয়ে যাবে।
কীভাবে?

দাঁড়ান, ডেমো দিচ্ছি।

প্রথমে এভাবে পকেটে হাত দিয়ে তুলে নেবে।
?

তারপর?

পালাবে।
5 STAR HOTAL
ও, আচ্ছা।

এক ঘণ্টা পর
আর একবার তোকে হাতে পাই।

থানায়
এইভাবে মোবাইলটা নিয়ে পালাল জানেন স্যার।
বুঝতে পেরেছি, চিন্তা করবেন না আমি এক্ষুনি বেরোচ্ছি।

দাদু, এপাশে পাঁচুকে দেখেছেন?
কেন বাবা?

ওকে আজ ধরতেই হবে। বড্ড জ্বালাচ্ছে।
বটতলায় সাধু সেজে বসে আছে।

কুইক!

এবার পালাবি কোথায়?

ওঠ ব্যাটা, তোকে মজা দেখাচ্ছি।
এই, এই, করছিস কী? আমি হলুম ত্রিকালদর্শী সাধু শ্রী শ্রী...

একী, এতো জেনো ডাকাত!
না-া!

পাঁচুকে ধরতে এসে ছেনোকে পেয়ে গেলাম। আহা, পদোন্নতি আটকায় কে?

স্যার, সেটা এই পাঁচুর জন্যই হল, ওই বুড়োটা আমিই ছিলাম।
অ্যাঁ, পাঁচু!

দাঁড়িয়ে দেখছো কী?
যাও অ্যারেস্ট হিম।
কিন্তু এ?

স্যার এটা খুলে দিন, আমিই ওকে ধরে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব।

স্যার, এক মিনিট, একজনকে ধরতে একটা ডাকাত, একটা পুলিশকে লাগাচ্ছেন? এটা একটু ইনজাস্টিস হয়ে যাচ্ছে না?

কথায় যুক্তি আছে,
ছেনোই যাক, ওকে ছেড়ে দাও।

তোকে দেখাচ্ছি।
পারবি না রে ছেনো।

স্যার, ছেনো যদি পালায়?
পালাবে কোথায়? এটা তো আমার হাতে।

এক ঘন্টা পর

দু-ঘন্টা পর

তিন ঘন্টা পর
ভ্যাঁ-া-া-া

যদি সোঁদোরবনে যেতে না চাস, তাহলে একথা যেন কেউ জানতে না পারে, বুঝলি ?
ইয়েস স্যার!

থানায়
স্যার পেলেন ?
বলছি।

একটা ঘরে লুকিয়েছিল, আমরা ঘিরে ফেললাম, শুরু হল ফায়ারিং, ও গুলি চালাচ্ছে, আমরাও চালাচ্ছি, বিশাল এনকাউন্টার। তারপর আমার একটা গুলি ওকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল, সে কী রক্ত, ভাবতে পারবেন না। যাহোক, এখন হাসপাতালে কোমায় আছে।

কিন্তু, আমার ফোন ?
পেয়ে যাবেন, আপনাকে ফোন করে জানাব।

আমার তো ফোনই নেই।
আরে মেসেজ পাঠিয়ে দেব ।
POLICE

ঠিক আছে।

তখন বেশ কিছুটা দূরে
সত্যি, তোর যা বুদ্ধি আমার তা নেই।
তুই তো ডাইনোসর।

তার মানে ?
মানে, হিউজ বডি, বাট লিট্‌ল ব্রেন।

সে যাক, তুই এই পাঁচশো টাকা রাখ, তোর পুরস্কার।
পাবি না রে, ওটা এখন আমার পকেটে।

অ্যাঁ, তুই আমারও পকেট মেরেছিস!
হেঁ হেঁ হেঁ!

সাবাশ পাঁচু।
ওরে বা-বা-রে!

শেষ

সম্পূর্ণ উপন্যাস

চন্দ্রদ্বীপের গুপ্তধন

রাজা ভট্টাচার্য

১

জগদানন্দ রায়ের প্রাসাদটি প্রায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার অন্তরালে নিশ্চিন্তে আছে বহু বৎসর যাবৎ। চারিদিকে সুদীর্ঘ পরিখা, তাতে হিংস্র কুমির ক্ষুধার্ত অবস্থায় নিষ্পলক চক্ষে প্রহরা দেয়। পরিখার অভ্যন্তরে নারিকেল বৃক্ষের সারি; অদূরেই প্রবাহিত পুণ্যতোয়া গঙ্গার ধারা স্পর্শ করে উড়ে-আসা প্রভাতী বায়ুতে সেই নারিকেলের শাখা আন্দোলিত হচ্ছে, প্রকাণ্ড সুরম্য রাজভবনটি নবোদিত সূর্যের আলোয় যেন ধৌত হয়ে যাচ্ছে এই মুহূর্তে। বন্দিদের বন্দনাগীতি ভেসে আসছে সুউচ্চ নহবতখানা থেকে। চন্দ্রদ্বীপ এক সুখসৌপ্তিক রাত্রি যাপন করে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে ধাবিত পুণ্যার্থীদের পদশব্দে রাজপথ ক্রমে মুখর হয়ে উঠছে। অধিকাংশ স্নানার্থীর পরনে অতি সংক্ষিপ্ত পোশাক; পুরুষেরা বস্তুত কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত, নারীদের সর্বাঙ্গে ভারী রূপার অলঙ্কার। স্বপ্নসম লোকযাত্রা। বোঝা যায়, চন্দ্রদ্বীপের প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করেন।

কচুয়া নগরের সমৃদ্ধি যে অকারণেই সমগ্র সমতটের ঈর্ষার কারণ নয়, তা যেমন এই নগরের নাগরিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, তেমন বোঝা যায় নগরটির দিকে তাকালেও। সুউচ্চ ভবনগুলি চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী কচুয়ার অর্থনৈতিক সাফল্যের স্পষ্ট উদাহরণ। সেই সকল ভবনের মধ্যেও সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপুলায়তন রাজভবনটি। সুউচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত ইষ্টকনির্মিত ভবনটি যেমন সুরক্ষিত, তেমনই ভব্যদর্শন। এই ভবনের এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের পত্তন ঘটেছিল একই সঙ্গে; রাজা দনুজমর্দন দেব রায়ের সময়কালে সে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বের কথা। দনুজমর্দনের পঞ্চম পুরুষ রাজা জয়দেব রায় অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করলেন, তাও বেশ কয়েক বৎসর হয়ে গেল। দেহুড়গাতি থেকে এসে জয়দেবের দৌহিত্র পরমানন্দ রাজত্বভার গ্রহণ করলেন, এবং মাতামহের ব্যবস্থা পরিবর্তিত করে কায়স্থদের সামাজিক বিন্যাস নতুন করে গড়ে তুললেন; এ সব তো নিতান্ত নিকট-অতীতের কথা।

কিন্তু আজ প্রভাতে জগদানন্দের সহসা এই অতীত-ইতিহাস চিন্তা করার কথা নয়। অন্যান্য দিন এই সময় তিনিও গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; বস্তুত, রাজার স্নান শেষ হওয়ার পরেই প্রজাদের জলস্পর্শ করার রীতি। সমতটের এই অঞ্চলে অবশ্য পদ্মাই গঙ্গারূপে স্বীকৃত। রাজবাটি থেকে গঙ্গা বড়োজোর দশ রশি দূরে, পদব্রজে এক নিমেষের অধিক সময় লাগে না। রাজা স্বয়ং এই পথ প্রত্যহ উষালগ্নে পদব্রজেই অতিক্রম করে থাকেন। আজ সেই নিয়মের গুরুতর ব্যত্যয় ঘটেছে। তার কারণ আছে। কারণটি গুরুতর।

গতকাল রাজপুরোহিত আচার্য বাসুদেব এক অত্যাশ্চর্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। রাজা জগদানন্দ স্বয়ং মহাকালীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন—এমন এক প্রবাদ চন্দ্রদ্বীপের লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, তিনিও সেই ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, দীর্ঘক্ষণ তাঁর বাক্যস্ফূর্তি হয়নি।

আচার্য বাসুদেব বলেছেন, এই বৎসর, ১৫০৫ শকাব্দে, স্বয়ং মা-গঙ্গা জগদানন্দের অন্তিম প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। অন্তিমকালে তিনি মূর্ত হয়ে রাজাকে দর্শন দেবেন, তাঁকে গ্রহণ করবেন।

প্রাথমিকভাবে জগদানন্দ এই ভবিষ্যদ্বাণীর গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবনই করতে পারেননি। কোন প্রার্থনা? মা-গঙ্গা মূর্তি পরিগ্রহ করে দর্শন দেবেন, একজন সাধকের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আর কীই-বা হতে পারে? কিন্তু 'গ্রহণ করবেন'—এর অর্থ কী? কী গ্রহণ করবেন? তাঁকে?

তা ছাড়া আরো একটি শব্দ অসীম ব্যঞ্জনা বহন করছে যে! 'অন্তিমকালে!'

অন্তিমকাল! রাজা জগদানন্দের অন্তিমকাল কি আসন্ন তাহলে?

★ রশি = আনুমানিক ৮০ হস্ত।

★ এক নিমেষ = ১৬ মিনিট সময়কাল।

প্রায় সমস্ত রাত্রি জগদানন্দ অতিবাহিত করেছেন জাগ্রত অবস্থায়। এমন বিচিত্র ভবিষ্যদ্বাণী যেকোনো মানুষকেই বিমূঢ় করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেই কারণেই অপরাপর দিনের মতো অতি-প্রত্যুষে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়নি আজ। সুউচ্চ নহবতখানা থেকে ভেসে-আসা মধুর প্রভাতী স্তবগাথা আজ প্রথম ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

এখন রাজবাটীর দ্বিতলের গবাক্ষ থেকে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে ধাবমান পুণ্যার্থীদের স্রোতের দিকে তাকিয়ে একটি ক্ষুণ্ণ নিঃশ্বাস ফেললেন জগদানন্দ। পিতা পরমানন্দের মৃত্যুর পর থেকে তিনি প্রজাদের পুত্রজ্ঞানে পালন করেছেন। চন্দ্রদ্বীপের সমৃদ্ধির মূল কারণ সমুদ্র। অসংখ্য সমুদ্রগামী বহিত্র মুহূর্তে মুহূর্তে দূর দেশান্তরের পথে যাত্রা করছে পণ্য বহন করে। রাজা জগদানন্দের এই সকল ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে অনুক্ষণ; অপরাপর রাজাদের ন্যায় তিনি শুধু শুল্ক সংগ্রহ করেই কর্তব্য সমাপন করেন না। অপরদিকে কঠোর শক্তি-সাধনায় পূর্ণসিদ্ধ হয়েছেন তিনি।

তবে ভবতারিণী সহসা বিমুখ হলেন কেন? কেন এত দ্রুত, এমন অসময়ে ঘনিয়ে এল অন্তিমকাল?

সহসা দ্বারপ্রান্তে শিশুকণ্ঠের কলরব শোনা যেতেই জগদানন্দের ভ্রূকুটিকুটিল ললাট মেঘমুক্ত হয়ে গেল, অধরে সস্নেহ হাস্যের রেখা দেখা দিল—

তাঁর পৌত্র, কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র প্রতিদিনের মতোই উষাকালে পিতামহকে প্রণাম করতে এসেছে—

রামচন্দ্রের অবশ্য এখনও প্রণাম করার মতো গম্ভীর কর্মের উপযুক্ত বয়স হয়নি। এক দাসী তাকে জগদানন্দের ব্যক্তিগত বাসকক্ষের দ্বার পর্যন্ত নিয়ে এলেই সে দাসীর হাত ছাড়িয়ে সবেগে ছুটে এসে পিতামহের ক্রোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরক্ষণেই এই কক্ষটি উতরোল হাস্যোচ্ছ্বাসে ভরে যায়। জগদানন্দ পৌত্রকে অসম্ভব স্নেহ করেন, এই শিশুটির সঙ্গে কাটানো প্রভাতী প্রহরগুলি তাঁর বড়ো প্রিয়।

আজও রামচন্দ্র ছুটে এসে পিতামহকে তার ক্ষুদ্র কোমল হস্তে বেষ্টন করল। জগদানন্দ হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলেন,"বলো, দাদা, আজ কোন গল্প শুনবে?"

এই কক্ষটি দ্বিতলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। জগদানন্দ বসে আছেন একটি বৃহৎ পালঙ্কের উপরে, বাতায়নপার্শ্বে। রামচন্দ্র পিতামহের ক্রোড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা, আমাদের রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ কেন হল?"

এই কাহিনি সে অন্তত একশতবার শুনেছে। আসলে, এই ঘটনাটি শুনতে সে ভালোবাসে। জগদানন্দ বিরক্ত হন না; প্রাণপ্রিয় পৌত্রকে তিনি প্রত্যেকবার সমান উৎসাহিত কণ্ঠে একই কিংবদন্তি বলে চলেন।

"শোনো তবে, দাদা। সে ভারী আশ্চর্য ব্যাপার। বহুকাল পূর্বে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামের এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। অমন পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ ক্বচিৎ দেখা যায়। বিক্রমপুরে বাস করতেন তিনি। শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। সাধক মানুষ। তা যথাকালে এক ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল।"

বালক জিজ্ঞাসা করল,"আচ্ছা দাদা, আমরা ব্রাহ্মণ?"

"না দাদা!" ঈষৎ হাস্য করলেন জগদানন্দ,"আমরা কায়স্থ। আমাদের প্রকৃত পদবি বসু। রাজা বলে রায় উপাধি ধারণ করেছি।"

"আচ্ছা। তারপর?"

"বিয়ের কথা হয় গুরুজনদের মধ্যে। ফলে চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী তাঁর পত্নীর সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বিয়ের পরের দিন তিনি জানতে পারলেন, তাঁর পত্নীর নাম ভগবতী। তিনি তো শুনে একেবারে ভেঙে পড়লেন।"

বালক রামচন্দ্র কথাটির তাৎপর্য বুঝতে পারল না স্বাভাবিকভাবেই। সে পিতামহর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল,"কেন? বউয়ের নাম ভগবতী হলে কী হয়?"

"কিছুই হয় না, দাদা।" সহাস্যে বললেন জগদানন্দ, "কিন্তু চন্দ্রশেখর ছিলেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। ভগবতী তাঁর উপাস্য দেবী, তাঁকে তিনি মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেন। সেই 'ভগবতী' নামের কোনো মহিলার সঙ্গে তিনি দাম্পত্যজীবন কাটাবেন কী করে?

"তখন তিনি ঠিক করলেন, আর এই সংসারে থাকবেন না। একটা ছোটো ডিঙিনৌকো নিজেই চালিয়ে তিনি ভেসে পড়লেন। সে বহুকাল আগের কথা; তখনো বাকরগঞ্জ বলে কোনো জায়গাই ছিল না, সব জলের নীচে। সাগর আরো ঢের কাছে ছিল। তা তিনি তো নৌকো চালিয়ে একা একাই চলে গেলেন সমুদ্রের মধ্যে বহুদূরে, যেখান থেকে আর ডাঙা দেখা যায় না, চারিদিকে জল আর জল। চন্দ্রশেখর ভাবলেন, এখানেই তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

"এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল, সেই অকূল সমুদ্রের বুকে আরো একটা ছোট্ট ডিঙি ভাসছে। এইখানে অত ছোটো ডিঙিতে কে ভাসে? চন্দ্রশেখর অবাক হয়ে সেইদিকেই নৌকো এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে তিনি তো একেবারে থ হয়ে গেলেন!"

"কেন? থ হয়ে গেলেন কেন?" প্রত্যেকবার একই আকুলতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে রামচন্দ্র।

"তিনি অবাক হয়ে দেখলেন, সেই ক্ষুদে ডিঙিটায় একা বসে আছে ছোট্ট এক কন্যে!"

"তারপর?"

"চন্দ্রশেখর তো হাঁ! এই এত গভীর সমুদ্র, কোনোদিকে তাকালে কিছু দেখা যায় না; সেখানে কোনো কন্যে একা একা নাও চালিয়ে কোথায় যাচ্ছে? কী করছে সে?

"এতই অবাক হলেন তিনি যে, জিজ্ঞাসাই করে বসলেন—'হ্যাঁ গা মেয়ে, অকূল পাথারে একা ঘুরছ যে বড়ো, তোমার প্রাণে বুঝি ভয়ডর নেই?'

"মেয়েটি বললে—'আমি জেলের মেয়ে। সমুদ্দুর আমার দেশ, এই নাও আমার ঘরদোর। আমাদের আর ভয় কী, ঠাকুর? কিন্তু তুমি তো দেখছি ব্রাহ্মণ মানুষ, গলায় পৈতে! তা তুমি এখানে কী করছ গো?'

"চন্দ্রশেখর দুঃখ দুঃখ মুখে বললেন তাঁর কষ্টের কথা। ও বাবা! বউয়ের নাম ভগবতী বলে তিনি ঘর ছেড়েছেন, এই শুনে সেই কন্যের মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠল! বলল, 'তুমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেও মূর্খ। জানো না, নারী মাত্রেই ভগবতী? স্ত্রীজাতি মানেই প্রকৃতির অংশ! স্ত্রীর নাম ভগবতী বলে তুমি ঘর ছেড়েছ? সেই ভগবতী কোথায় নেই, সেইটে দেখাও দেখি!"

এই পর্যন্ত বলতে বলতেই জগদানন্দের চোখ সজল হয়ে উঠল, তিনি ললাটে হাত স্পর্শ করে উদ্দেশে প্রণাম করলেন। তাঁর দেখাদেখি রামচন্দ্রও ছোট্ট দুটি হাত সাধ্যমতো ভক্তিভরে কপালে ঠেকাল।

জগদানন্দ বলে চললেন, "এই কথা শুনে চন্দ্রশেখর বুঝতে পারলেন, এ তো সাধারণ কোনো জেলে-মেয়ে নয়! এক লম্ফে নিজের নৌকো থেকে তাঁর ডিঙিতে গিয়ে উঠলেন তিনি; সটান সেই কন্যের পায়ে পড়ে বললেন, 'বলো মা, কে তুমি?'

"অনেকবার অস্বীকার করার পর সেই বালিকা স্বমূর্তি ধারণ করে বলল, 'হ্যাঁ বাছা, আমিই তোমার ইষ্টদেবী—ভগবতী। সকল নারীর মধ্যেই আমারই প্রকাশ, নামে কী যায়-আসে?' তারপর চন্দ্রশেখরের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দেবী বর দিলেন, 'এই স্থান শুষ্ক হয়ে দ্বীপ হবে। তোমার নাম অনুসারে তার নাম হবে চন্দ্রদ্বীপ। তুমি হবে সেই অঞ্চলের রাজা, অধিপতি।' এই বলে দেবী ভগবতী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

"আমরা তো ব্রাহ্মণ নই, এই যে বললেন আপনি?" জিজ্ঞাসা করল রামচন্দ্র।

"না, দাদা। আমরা তো কায়স্থ। এই চন্দ্রশেখরের শিষ্য ছিলেন দনুজমর্দন দেব রায়। লোকে বলত দনুজ রায়। ইনিই এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এঁর এক বংশধর অপুত্রক ছিলেন বলে আমার পিতা পরমানন্দ রায় এসে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হয়ে—"

এই পর্যন্ত বলেই তিনি থেমে গিয়ে বললেন, "কে রে ওখানে? ভিতরে আয়!"

বৃহৎ কপাট খুলে ভিতরে এসে দাঁড়াল এক ভৃত্য, তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন দুইজন মানুষ। তাঁদের একত্রে দেখে জগদানন্দ চমকিত হলেন। মন্ত্রী মুকুন্দ সেন এত সকালে কখনও রাজার কাছে আসেননি এর আগে। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন রাজপুরোহিত বাসুদেব আচার্য। দুজনেরই মুখ কোনো ভয়াবহ আশংকায় শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেছে এই মুহূর্তে।

রাজা জগদানন্দের হাস্যোজ্জ্বল মুখ কালো হয়ে গেল। পৌত্রকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে তিনি চাকরটিকে ইশারা করলেন তাকে অন্তঃপুরে দিয়ে আসার জন্য।

সে চলে গেলে তিনি দুই আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, "কী হয়েছে?"

মন্ত্রী মুকুন্দ কিছু বলার আগেই আচার্য বললেন, "মহাবিপদ আসন্ন, মহারাজ! ভয়ংকর বিপদ। আমার-আপনার নয় সমগ্র চন্দ্রদ্বীপের পক্ষে মহাবিপদ ঘনিয়ে আসছে!"

এইবার জগদানন্দের মুখ শুষ্ক হয়ে গেল।

২

বাগবাজারের এই দিকটায় কখনও আসেনি আর্য। ওর দৌড় বাটার কাছে অরিত্রদের বাড়ি পর্যন্ত। অরিত্রর মা এবং কাকিমা দুজনেই মারাত্মক ভালো রান্না করেন, এবং তার চেয়ে বড়ো কথা—

খাওয়াতে বেজায় ভালোবাসেন। ফলে কলেজ-ফেরত প্রায়ই ওরা তিনজন চলে আসে বাগবাজারে, প্রাণভরে খেয়েদেয়ে, আড্ডা মেরে রাত ন'টার পর বাস ধরে সল্টলেকে ফিরে যায়।

এই যাতায়াতের সূত্রে অরিত্রর বাড়ির লোকেরাও স্বাভাবিক-ভাবেই আর্য আর ঋতমকে চিনে ফেলেছেন। অরিত্রদের বাড়িটা অন্তত দেড়শো বছরের পুরনো। বিশাল বাড়ি, কতগুলো ঘর—তা বোধহয় অরিত্রও ঠিকঠাক জানে না। একসময় নাকি এই বাড়িতে একসঙ্গে পঞ্চাশজন মানুষ বাস করত আত্মীয়স্বজন আশ্রিত মিলিয়ে। এখন কমতে কমতে আটজন। দোতলার অর্ধেক ঘর বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তবু এইসব বাড়ির লোকদের একটা অদ্ভুত প্রবণতা থাকে; বাড়িতে অতিথি এলে দিব্যি খুশি হয় সবাই। এমন একমুখ হেসে 'এই যে আর্য! আরে ঋতম যে!'—বলে অভ্যর্থনা জানায় সবাই, যে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায়—

কাজেই অরিত্র যেদিন ওর মামাতো ভাইয়ের পৈতের নেমন্তন্নর কার্ডটা ওদের হাতে দিল, ওরা বিশেষ অবাক হয়নি—অরিত্রর মামাবাড়িও বাগবাজারে, একদম গঙ্গার উপরে; এটুকু ওদের জানা ছিল। গিফট হাতে লজ্জা লজ্জা মুখ করে ওরা চলে গেল নির্দিষ্ট দিনে যথাস্থানে—

ঠিকানা খুঁজেপেতে বাড়িটার সামনে পৌঁছে ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে!

"এ কী বাড়ি রে আর্য!" বলল ঋতম।

আর্যও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে। রাস্তাটা সরু আর প্যাঁচোয়া; যথেষ্ট দূরে গিয়ে দাঁড়াতে না-পারার ফলে ওরা পুরোটা দেখতে পাচ্ছে না। তাতেও বাড়িটার আশ্চর্য গঠনশৈলী, এর বিশালত্বের মহিমা ওদের চুপ করিয়ে দিল। আর্যদের সল্টলেকের হালফ্যাশনের ঝলমলে বাড়িটাও এর পাশে কিস্যু না, যেন ছবি বিশ্বাসের রাজকীয় ব্যক্তিত্বের পাশে আজকের লালচুলো চ্যাংড়া ছেলে।

বিশাল গেটের মাথায় পৃথিবীর উপর পা-রাখা সিংহ। দেউড়ি পেরিয়ে ঢুকলে বেশ বড়ো উঠোন, তার মাঝখানে দুর্দান্ত বাড়িটা গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছড়কাটা ডোরিক থাম উঠে গেছে তিনতলা পর্যন্ত। বারান্দাটাই ওদের মাথার উপরে আরো অন্তত পাঁচফুট উঁচু। শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে সেই বারান্দায় উঠে এলে সার সার গ্রিক দেবতাদের স্ট্যাচু। মাঝে প্রধান ফটক, সেটা দিয়ে হাতি ঢুকে যাবে, এত বড়ো। ভিতরে ঢুকেই প্রকাণ্ড হলঘর। আজ লোকজনে গমগমে করছে ঘরটা। তার দেওয়ালে বাইসন থেকে বাঘ পর্যন্ত যাবতীয় পশুর স্টাফ-করা মাথা। ঝাড়বাতি ঝুলছে। বেলজিয়াম গ্লাসের আয়নায় ঝলসাচ্ছে ঝাড়বাতির আলো—

এলাহি ব্যাপার একেই বলে—দুই বন্ধুর হাঁটা বন্ধ হয়ে গেল ব্যাপার-স্যাপার দেখে। অরিত্র এসে উদ্ধার না-করলে ওরা বোধহয় ওরকম হাঁ করে দাঁড়িয়েই থাকত—

"হ্যাঁ রে অরিত্র, তোর মামারা যে জমিদার, বলিসনি তো আগে!" আর্য বোকাটে গলায় বলেই ফেলল।

অরিত্র আজ খুব সেজেছে; পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, এমনকি গলায় উত্তরীয়। হো হো করে হেসে উঠে বলল, "এখনও জমিদারি! যাচ্ছেতাই!"

আর্য তখনো হাঁ করে ঘরটা দেখছিল। ফিসফিস্ করে বলল, "ঋতম, পিয়ানোখানা দেখেছিস? অন্তত একশো বছরের পুরনো, বুঝলি! রিডগুলো দ্যাখ! হলুদ হয়ে গেছে! কয়েক লক্ষ টাকা দাম হবে রে!"

অরিত্র বলল, "জমিদারি না রে ব্যবসা ছিল এদের আয়, ছোটোমামার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইতিহাসের খনি যাকে বলে; আর তেমনি গপ্পে—জমে যাবে, দেখিস—"

ভয়ে ভয়ে অরিত্রর পিছন পিছন ওরা উঠে এল দোতলায়—কাঠের সিঁড়ি, কালো কাঠের হাতলে আলো পিছলে যাচ্ছে।

দোতলায় উঠে একটা লম্বা বারান্দার ডানপাশে সার সার ঘর। ঋতম মৃদু গলায় বলল, "ওরে আর্য! এক-একটা ঘরে আমাদের বাড়ির তিনখানা ঘর ঢুকে যাবে রে!"

আর্য উত্তর দিল না—হাঁ করে দেওয়ালে টাঙানো পেন্টিং দেখতে লাগল। অরিত্র একটা ছবি দেখিয়ে চাপা গলায় শুধু বলল, "উইলিয়াম প্রিন্সেপের অরিজিনাল।" শুনে ওদের মুখ আরেকটু হাঁ হয়ে গেল।

তিন নম্বর ঘরটার সামনে এসে অরিত্র বলল, "এইটে ছোটোমামার ঘর—আয়।" বলে প্রকাণ্ড কড়াটা নাড়াল। ভিতর থেকে একটা গম্ভীর অথচ শাণিত গলা শোনা গেল, "কে?"

ভিতরে ঢুকে ওরা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। বিশাল ঘরটার দুটো দেওয়াল বইয়ের আলমারিতে ঢাকা। একসঙ্গে এত বই ওরা কলেজের লাইব্রেরি ছাড়া কোথাও দেখেনি। দরজার উলটোদিকের দেওয়ালে মস্ত দুটো জানলা; তার একটা খোলা, সেটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাইরের ঝোপঝাড় আর বুড়ো গাছগাছালি। অন্যটার রঙিন কাচ বেয়ে নানা রঙের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে দাবার ছক-কাটা মেঝেতে। বাঁদিকে একটা বিরাট পালঙ্ক, তার সিঁড়ি আছে! মাঝখানে একটা বড়ো টেবিল, তার ওপাশে বসে আছেন এক অসম্ভব সুপুরুষ ভদ্রলোক।

ওদের ঢুকতে দেখে ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন, মুখে চওড়া হাসি, "আচ্ছা, এক মিনিট। লেট মি গেস—তুমি হলে আর্য, আর এ ঋতম। ঠিক বললাম?"

ওরা একমুখ হাসল। ভদ্রলোক বললেন, "অরু তোমাদের কাণ্ডকারখানার গল্প এতবার বলেছে, না-দেখেও চেনা হয়ে গেছ তোমরা—এসো এসো। আমি ওর ছোটোমামা, তোমরাও স্বচ্ছন্দে মামা বলতে পারো, শুভমামাও বলতে পারো। আমার নাম শুভব্রত।"

টেবিলের অন্যপাশে বসল ওরা শুভমামার মুখোমুখি। অরিত্র লম্ফ দিয়ে উঠে বসল খাটে।

ভদ্রলোক বললেন, "কেমন লাগছে ইংরেজিতে এম. এ. করতে? এককালে আমিও করেছিলুম কিছুদিন, তারপর ছেড়েছুড়ে ইতিহাসের লাইনে চলে গেলুম।"

"আপনাদের বাড়িটাই তো জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস!" বলল আর্য।

"তা বলতে পারো।" মাথা নাড়লেন শুভব্রত, "তবে এটা পরে তৈরি হয়েছে—মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এসে প্রথম বাড়িটা তৈরি করেছিলেন জয়রাম বসু। সেই বাড়ি ছিল গোবিন্দপুরে, গঙ্গার উপরে। তারপর কোম্পানি সেই জমি অধিগ্রহণ করে তার বদলে এই জমিটা দিল। এই বাড়ি তৈরি হল ১৭৫৯ সালে।"

"মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি?" জিজ্ঞেস করল ঋতম।

"হ্যাঁ। পরাধীন ভারতে কোম্পানি বলতে তো ওটিই!"

আর্য বলল, "তার মানে এই বাড়ির বয়েস—"

"আড়াইশো বছরের উপরে।" হাসলেন শুভব্রত, "তবে প্রথমে একটা ছোটো বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল। সেটা পিছনের বাগানে পোড়ো হয়ে পড়ে আছে দেখভালের অভাবে। আজকালকার দিনে এত বড়ো বাড়ি মেনটেন করা—বোঝোই তো!"

"অরিত্র বলছিল, আপনাদের কখনও জমিদারি ছিল না!" ঋতম আজ কৌতূহলের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়েছে যেন।

"না, সে-অর্থে জমিদার বলা চলে না আমাদের পরিবারটাকে—ব্যবসাই আমাদের লক্ষ্মী। প্রধান ব্যবসা ছিল মশলার। রেশমকুঠিও ছিল বিশাল। তার কাগজপত্র—আজকের ভাষায় লাইসেন্স বলতে পারো, এখনও রাখা আছে। দাঁড়াও।" বলে উঠে গিয়ে দেওয়াল-জোড়া আলমারির একটা ড্রয়ার খুলে কয়েকটি ফাইল বের করে আনলেন শুভব্রত। খুব সাবধানে টেবিলের উপরে রেখে একটা অদ্ভুত দেখতে চিমটে দিয়ে তার থেকে বের করে আনলেন একটা কাগজ—মোটা কাগজ, রংটাও অন্যরকম। তাতে যে কী লেখা আছে, তা ওরা বুঝতে পারল না—হরফগুলো অচেনা।

শুভব্রত বললেন, "ফারসি ভাষা—সেকালে এই ভাষাতেই সরকারি কাজকর্ম হত—আর এই যে পাঞ্জাটা দেখছ, এটা কার—আন্দাজ করতে পারো?"

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে মাথা নাড়ল।

"মুর্শিদকুলি খাঁয়ের।" বলে মৃদু হাসলেন তিনি।

চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে রইল ওরা—অরিত্র এবার শব্দ করে হেসে উঠল।

"বাংলার প্রথম নবাব!" এইবার প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আর্য!

"ঠিক তাই।" মাথা নাড়লেন শুভব্রত, "ইনি এই বংশের রামনারায়ণকে অনুমতি দিচ্ছেন রেশমকুঠি খোলার জন্য।"

"বোঝো কাণ্ড! এতদিনের পুরনো কাগজ আপনি সামলে রেখে দিয়েছেন?"

"ইতিহাস বস্তুটাকে যে রক্ষা করতে হয়, আর্য!" মোলায়েম হেসে বললেন তিনি, "পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ব্যবসা করেছেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা—এই দ্যাখো—বারুইপুরের চিনির ব্যবসার আসল দলিল—তারপর—এক সেকেন্ড; এই হল জঙ্গীপুরের রেশমকুঠিতে কাঁচামাল যোগান দেওয়ার চুক্তিপত্র! এই দ্যাখো স্বয়ং প্রিন্স দ্বারকানাথের সই! অবশ্য তখনো তিনি প্রিন্স হয়ে ওঠেননি!"

গা শিরশির করছিল ওদের। ঋতম বলল, "তার মানে আপনাদের আসল বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে?"

"হুঁ, বলতে পারো।" শুভব্রত বললেন, "সেই বাড়ি এখন ভাগীরথীর গর্ভে; বহুকাল আগেই ভাঙনে তলিয়ে গেছে।"

"সেইজন্যই আপনাদের পূর্বপুরুষেরা কলকাতায় চলে এলেন?" জিজ্ঞাসা করল ঋতম।

মাথা নেড়ে শুভব্রত বললেন, "মনে হয় না। আসলে এঁদের দরকার ছিল দেশের অর্থনৈতিক রাজধানীতে থাকাটা, নইলে ব্যবসা মার খাবে। কাজেই সিরাজের পতনের পর থেকে যখন কলকাতা ক্রমে বাংলার রাজধানী হয়ে উঠল, তখন অন্যান্যদের সঙ্গে এঁরাও চলে এলেন। আমার ধারণা, সেই মুর্শিদাবাদের বাড়িটি যখন তলিয়ে গেল ভাঙনে, তখনই তা পরিত্যক্ত। তাছাড়া, মুর্শিদাবাদেও আমাদের প্রকৃত বাসভূমি নয়।"

"তাহলে! মুর্শিদাবাদেও এসেছিলেন আবার অন্য কোনো জায়গা থেকে?"

"ঠিক তাই। এই বসু-পরিবারের আসল নিবাস ছিল চন্দ্রদ্বীপে—তখন অবশ্য তারা জমিদারই ছিল। আরো একটু এগিয়ে তাঁদের তখনকার অর্থে রাজাই বলা উচিত।"

"চন্দ্রদ্বীপ!" প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল দুই বন্ধু, "এটা কোন দ্বীপের নাম? শুনিনি তো কখনও?"

রহস্যময় হাসি হেসে শুভমামা বললেন, "চন্দ্রদ্বীপ কোনো দ্বীপ নয়।"

"ইনি এই বংশের রামনারায়ণকে অনুমতি দিচ্ছেন রেশমকুঠি খোলার জন্য।"

যাব্বাবা! নাম চন্দ্রদ্বীপ, অথচ দ্বীপ নয়! ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল বিস্মিত হয়ে।

"না। চন্দ্রদ্বীপ কোনো দ্বীপের নাম নয়, বা বলা ভালো, ছিল না। তখন দক্ষিণবঙ্গের ভূগোলটাই আসলে অন্যরকম ছিল—এখনকার তুলনায় অনেক আগেই দেখা মিলত সমুদ্রের, মোহনাগুলোও ছিল অনেকখানি উত্তরে। নদরাজ লৌহিত্য অনেক কম পথ পাড়ি দিয়েই সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হতেন। সেই অগভীর সমুদ্র ভরাট হয়ে, অতি সাম্প্রতিককালে তৈরি হয়েছে আজকের দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো। তাদের মধ্যে একটির নাম চন্দ্রদ্বীপ।"

আর্য মাথা চুলকে দ্বিধার সঙ্গে বলল, "আমি অবশ্য ঠিক জানি না—কিন্তু চন্দ্রদ্বীপ বলে কোনো জেলা আছে নাকি পশ্চিমবঙ্গে—বা বাংলাদেশে? পশ্চিমবঙ্গে তো ডেফিনিটলি নেই—"

"বাংলাদেশেও নেই। কথিত আছে, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী নামে এক ভক্তকে দেবী ভগবতী বর দিয়েছিলেন, সমুদ্র শুকিয়ে গিয়ে সেখানে যে স্থলভাগ সৃষ্টি হবে, তারই নাম হবে চন্দ্রদ্বীপ। তাঁর শিষ্যরা সেই স্থানে রাজত্ব করবেন বহুকাল। এই শিষ্যবংশের আদি পুরুষের নাম রাজা দনুজমর্দন দেব রায়। ইনিই আমাদের আদিপুরুষ।"

"কিন্তু এ তো কিংবদন্তি!" একগুঁয়ে গলায় বলল ঋতম।

"সে তো বটেই! সেকালে যেকোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকেই অতিপ্রাকৃত চেহারা দেওয়া হত—সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ ঘটে রাহু-কেতুর জন্য; এইরকম। আসলে পলি পড়ে যে স্থলভাগ জেগে উঠল, তার দখল নিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। সেকালে এই অঞ্চলের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। বাকেলা-চন্দ্রদ্বীপ এলাকার নামই পরবর্তীতে জমিদার আগা বাকের খানের নাম অনুসারে হয়ে যায় বাকেরগঞ্জ। আজ এই অঞ্চলটিই বরিশাল নামে পরিচিত।"

"বরিশাল!" প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল ওরা দুজন।

"হ্যাঁ। বরিশাল জেলাই সেদিনের চন্দ্রদ্বীপ। এর রাজধানী ছিল কচুয়া। এখানেই রাজত্ব করতেন রায় উপাধিধারী দনুজমর্দন দেবের বংশধরেরা। রাজা জয়দেব রায় অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে এঁদের দৌহিত্রবংশ বসুরা এর অধিকারী হন। এঁদের প্রথম পুরুষের নাম পরমানন্দ। এঁর ছেলে জগদানন্দের আমলে চন্দ্রদ্বীপে এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আজ সেই ঘটনা অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু সেকালের বইয়ে, যেমন ধরো আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে তার স্পষ্ট বর্ণনা আছে।"

"কী ভয়াবহ ঘটনা?" বলে উঠল ঋতম।

"সেটা ১৫০৮ শকাব্দের কথা, তার মানে ধরো ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হবে—হ্যাঁ, কে?"

বাইরে থেকে একজনের কুণ্ঠিত গলা শোনা গেল, "ছোটোবাবু! মা বললেন, খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, তা সবাইকে নিয়ে যদি নীচে আসেন—"

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে-থাকা গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটার দিকে একঝলক তাকিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন শুভব্রত, "ছি ছি ছি! আমি না—সত্যিই—চলো চলো, আগে খেয়ে নেওয়া যাক! আড়াইটে বাজতে গেল—"

বিরস মুখে উঠে পড়ল ওরা। আধঘণ্টা পরে খেলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

অরিত্র মিটিমিটি হাসছিল। বন্ধুদের ঘাবড়ে যাওয়াটা যে ও বেজায় এনজয় করছে, তা আর বলে দেওয়ার দরকার নেই। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ঋতম চাপা গলায় বলল, "তুই জানিস, কী ঘটনা?"

আর্য বারণ করল, "না! অরিত্রটা আধখানা বলবে, জিভ কাটবে, সালটা যেন কত ছিল—বলে ছাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে। খেয়ে নিই, তারপর শুভমামাকেই চেপে ধরতে হবে। চল।"

অরিত্রর অবশ্য গল্প বলার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। খাসা গলদা চিংড়ির খুশবু আসছে এবার। কে এমন সময় কথা বলে সময় নষ্ট করতে যাবে, শুনি?

৩

জগদানন্দ স্তম্ভিত হয়ে আচার্য বাসুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আচার্য যা বলছেন, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর আয়ু আর মাত্র সাতদিন। আগামী শুক্রবার সেই আয়ু শেষ হচ্ছে।

আচার্যের দিকে তাকিয়ে জগদানন্দ আবার বললেন, "আচার্য মহাশয়! ঠিক কী ঘটতে চলেছে, তা স্পষ্ট করে আমাকে আর একবার বুঝিয়ে বলুন। হেঁয়ালিপূর্ণ গণনার ভাষায় নয়, সাধারণ ভাষায়।" তাঁর কণ্ঠস্বর থমথম করছে অনাগত আশঙ্কায়।

আতঙ্কিত কণ্ঠে বাসুদেব আচার্য বললেন, "মহারাজ! পুরুষানুক্রমে আমরা চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের পৌরোহিত্য করে আসছি। এইরূপ দুর্দৈব কখনো ঘনিয়ে আসতে দেখিনি। গণনার এমন ভয়ঙ্কর ফল কখনও পাইনি। আপনাকে যত শীঘ্র সম্ভব সিদ্ধান্ত নিতে হবে, পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।"

ঈষৎ অধৈর্য ভঙ্গিতে জগদানন্দ বললেন, "যা করণীয়, তা আমি করব। আপনি শুধু বলুন—গণনায় আপনি কি দেখেছেন।"

বাসুদেব আচার্য নিজের আসনে ঋজু হয়ে বসে দুই চক্ষু বন্ধ করলেন। তারপর পক্ককেশের উপর একবার হাত বুলিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলে চললেন, "মহারাজ! একদিক দিয়ে আপনার আজীবনের সাধনা সিদ্ধিলাভ করতে চলেছে। আপনি সারা জীবন এই প্রার্থনা করে এসেছেন; অন্তিমকালে যেন মা গঙ্গা আপনাকে মূর্তিমতী হয়ে দর্শন দান করেন। সেই অভিলাষ আপনার পূর্ণ হবে। মা গঙ্গা স্বয়ং দেহ ধারণ করে আপনাকে দর্শন দেবেন এবং তাঁর চরণে আশ্রয় দেবেন।"

"এই হেঁয়ালি আমার পক্ষে অবোধ্য। আরো স্পষ্ট করে বলুন, কী ঘটতে চলেছে।"

"মহারাজ! কোনোভাবে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। আমি তার স্বরূপ বুঝতে পারিনি, কিন্তু এই কথা স্পষ্টাক্ষরে জানাচ্ছি—এই কচুয়া নগরী এবং চন্দ্রদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চল অচিরেই ভয়ঙ্কর প্লাবনে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যাবে। আপনার রাজধানী জলের অতলে তলিয়ে যাবে। অসংখ্য প্রজার প্রাণহানি ঘটবে; সম্পত্তি যা কিছু আছে, বিনষ্ট হবে। এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সহস্র বৎসরে হয়তো একবার ঘটে। আপনি সর্বাগ্রে রাজপরিবারের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুন।"

মন্ত্রী মুকুন্দ বললেন, "আমিও সেই কথাই বলি, মহারাজ। এক মহাপ্লাবন আসন্ন। যত দ্রুত সম্ভব রাজপরিবারকে সুরক্ষিত কোনো অঞ্চলে প্রেরণ করুন। প্রাণধারণের উপযোগী সমস্ত উপকরণ এবং যথেষ্ট ধনসম্পদ তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যাতে প্রবাসে তাঁরা কষ্ট না-পান। মনে রাখবেন, আপনার হাতে মাত্র সাত দিন সময় আছে।"

জগদানন্দ অধীর স্বরে বললেন, "আপনাদের কোনো ধারণা আছে, আপনারা কী বলছেন? বহু পুরুষের সাধনায় গড়ে উঠেছে এই রাজ্য। সাতদিনের মধ্যে তার কী ব্যবস্থা করব আমি? আর তাছাড়া প্রজারা আমার প্রাণস্বরূপ। তাদের পরিশ্রমেই চন্দ্রদ্বীপের সমৃদ্ধি। এই অবস্থায় আমি কখনও তাদের ত্যাগ করতে পারি? কেবলমাত্র নিজের পরিবারের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করলেই কি রাজার কর্তব্য পালন করা হল?"

"তা হয়তো হল না, কিন্তু রাজার সুরক্ষাই প্রজার সুরক্ষা। রাজপরিবার রক্ষা পেলে তাঁরা আবার চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যকে তার গরিমা ফিরিয়ে দিতে পারবেন। এই ভবিষ্যৎবাণী আপনি প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা করলে ভয়ঙ্কর চাঞ্চল্য উপস্থিত হবে; বিপদের পূর্বেই রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন—রাজপরিবারকে সুরক্ষিত কোনো স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া।"

"আর আপনার পরিবার? বাসুদেব আচার্য মশাইয়ের পরিবার? তাদের প্রাণ, প্রাণ নয়? তাদের সুরক্ষা আমার কর্তব্য নয়?"

মুকুন্দ অধৈর্য হয়ে বললেন, "তাদের ব্যবস্থাও হবে। আপনি অগ্রের কর্তব্য অগ্রে করুন; এই আমার পরামর্শ।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে জগদানন্দ বললেন, "বেশ। একটি একটি করে কর্তব্য সমাধা করা যাক। সর্বাগ্রে যুবরাজ কন্দর্পনারায়ণ এবং আমার পৌত্রটিকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন—নিকটেই কোথাও, যাতে বিপদ কেটে গেলে তারা দ্রুত ফিরে এসে প্রজাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। এদের সঙ্গে রাজভাণ্ডারের অর্ধেক ধন পাঠিয়ে দিন।"

এইবার মন্ত্রী মুকুন্দের মুখ প্রসন্ন হল, "উত্তম, মহারাজ। আমি সন্ধান নিচ্ছি, কোথায় কুমারকে গোপনে এবং নিরাপদে রাখা যাবে কয়েকদিনের জন্য। তারপর? মধ্যমকুমার? আপনার কনিষ্ঠ পুত্র?"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করে জগদানন্দ বললেন, "বীরনারায়ণকে নৌকাযোগে পাণ্ডুয়ায় প্রেরণ করা হোক। রাজকোষের এক-চতুর্থাংশ তার সঙ্গে পাঠান। বলে দিন, আজই যেন সে যাত্রার আয়োজন করে—কাল, বা বড়োজোর পরশুই যেন সে রওয়ানা হয়ে যায়—পাণ্ডুয়ায় গিয়ে সে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, কোথায় আশ্রয় নেবে—সকলই আমি তাকে বলে দেব।

"আর কনিষ্ঠ ক্ষেত্রনারায়ণকে...সে কিশোর-মাত্র। তাকে কোথায় পাঠানো যায়, সে-বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন—নইলে বীরনারায়ণের সঙ্গেই—"

বাসুদেব বললেন, "মহারাজ, এই বিষয়ে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।"

"বলুন।" বললেন জগদানন্দ।

"চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের যাবতীয় সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে বাণিজ্য। সেই বাণিজ্যের অর্ধাংশ চলে সুবর্ণভূমির সঙ্গে। সুবর্ণভূমিতে আমাদের অসংখ্য পরিচিত বণিক বাস করেন, যাঁরা রাজ-পরিবারকে যেকোনো বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হবেন। কনিষ্ঠ কুমারকে যথোচিত বাণিজ্যোপকরণ সহ সেই দ্বীপে প্রেরণ করুন। বিপদ কেটে গেলে তিনি পুনরায় চন্দ্রদ্বীপে ফিরে আসবেন সপ্তসিন্ধু জয় করে!"

বেশ কিছুক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করে জগদানন্দ বললেন, "উত্তম প্রস্তাব। এর ফলে সুবর্ণভূমির সঙ্গে চন্দ্রদ্বীপের বাণিজ্যিক সম্পর্কও অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

এইবার নিজের আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন জগদানন্দ, "মুকুন্দ! আচার্য! আপনারা সম্পূর্ণ গোপনে সকল ব্যবস্থা করুন। আর একটি কথা।" এক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন,"এই মহাসঙ্কটকালে চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেকোনো মূল্যে আমি এখানেই থাকব।"

"জানতাম, আপনি এ-কথাই বলবেন। আপনার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা আমি চিন্তা করেছি, মহারাজ!" মুকুন্দ বললেন।

"কীরকম?"

"মঠের নহবতটি সমগ্র কচুয়ার উচ্চতম স্থান। আগামী বৃহস্পতিবার রাত্রে আপনি এই রাজভবন পরিত্যাগ করে সেখানে আরোহণ করবেন। প্লাবন যত উচ্চতাতেই উঠুক, নহবতের শীর্ষদেশ স্পর্শ করতে পারবে না।"

"আর আপনারা?"

"আমি আর আচার্য বাসুদেব আপনার সঙ্গে থাকব, মহারাজ। পুরুষানুক্রমে এই চন্দ্রদ্বীপের রাজপরিবারের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। আপনাকে অনিবার্য বিপদের সম্মুখে ফেলে আমরা পলায়ন করতে পারব না।"

জগদানন্দ বললেন, "আমিও একই কারণে পলায়ন করতে পারি না, মুকুন্দ। যদি চন্দ্রদ্বীপ সত্যই ধ্বংস হয়ে যায়, তবে আমি সেই ধ্বংসস্তূপ দেখার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।"

"আমিও না।" বললেন বাসুদেব।

জীবনে এই প্রথমবার পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে বন্ধুর মতো হাসলেন এক রাজা, তাঁর মন্ত্রী আর কুলপুরোহিত।

যন্ত্রের মতো মসৃণভাবে, ষড়যন্ত্রের মতো গোপনে চলল আয়োজন। সমুদ্রগামী জাহাজ আর নদীপথে যাত্রার উপযুক্ত নৌকা—দুই-ই প্রস্তুত হতে লাগল। বোঝাই করা হতে লাগল দীর্ঘযাত্রার পাথেয়, প্রকাণ্ড পেটিকায় পূর্ণ করা হল ধনরত্ন। শুধু, রাজ্যের কেউ সে-কথা জানতেও পারল না—রাজপরিবারের অভ্যন্তরে যে নিঃশব্দে কান্নার রোল উঠেছে, তা এমনকি দাসদাসীরাও শুনতে পেল না।

তিনদিন পরে সম্পূর্ণ গোপনে, পৃথক পথে যাত্রা করল দুটি দল। একটি সুবর্ণভূমির উদ্দেশে, অন্যটি উত্তরাভিমুখে, পাণ্ডুয়ার উদ্দেশে। অপর দলটি যে কোথায় গেল, তা কেউ জানতে পারল না।

ছয় দিন পরে, আসন্ন সন্ধ্যাকালে রাজা জগদানন্দ, মন্ত্রী মুকুন্দ এবং আচার্য বাসুদেব উঠে এলেন নহবতের শীর্ষের ক্ষুদ্র কক্ষটিতে। একটি দ্বার, একটিমাত্র জানালা। এমন ক্ষুদ্রাকার কক্ষে তিনজন

মানুষের রাত্রিযাপন রীতিমতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। মহারাজ যে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছেন, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর প্রসন্ন গম্ভীর মুখে এসবের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। দূরাগত সন্ধ্যারতির শব্দ শুনে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন তিনি।

এক অতিদীর্ঘ বিনিদ্র রাত যখন প্রায় অতিক্রান্ত, পূর্বাকাশ রক্তিম হয়ে উঠছে; তখন সহসা সূচিবিদ্ধের মতো ভূমিশয্যা থেকে উঠে বসলেন বাসুদেব—তাঁর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর দুজন।

মৃদু মৃদু শিহরিত হচ্ছে নহবতখানা, যেন ভূমির অতল গহ্বর থেকে উঠে আসছে এক আশ্চর্য কম্পন! মনে হচ্ছে, যেন কোনো এক দৈত্য এতদিন লুকিয়ে ছিল মাটির অনেক নীচে কোথাও, আজ তার বন্দিদশা ঘুচে গিয়েছে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসছে সে পাতালের অন্ধকারে।

বাসুদেব সহসা নহবতখানার মেঝেতে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করলেন। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সঙ্গে বলে উঠলেন, "হে মাতা গঙ্গা! আমাদের প্রণতি গ্রহণ করো! রক্ষা করো চন্দ্রদ্বীপকে! রক্ষা করো, মা!"

এর প্রায় অর্ধ দণ্ড পরে এক ভৈরব কলরোল শোনা গেল, যেন শত শত মত্ত হস্তী মহা-আতঙ্কে ছুটে আসছে পৃথিবী কম্পিত করে—নহবতখানার জানালা দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে তাঁরা দেখলেন, এক মহাতরঙ্গ ছুটে আসছে চলমান পর্বতের মতো। সেই পর্বতাকার ঢেউয়ের সামনে শুষ্ক তৃণের মতো ভেসে যাচ্ছে বিপুলাকার সমুদ্রগামী জাহাজ, ক্ষুদ্র নৌকো; ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে দরিদ্রের পর্ণকুটির এবং ধনী বণিকের প্রকাণ্ড অট্টালিকা! বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে নীল আকাশ থেকে! বৃক্ষশাখা ত্যাগ করে সহসা অজস্র পাখি উড়ে গেল আকাশে!

প্রলয় এল! মহাপ্রলয়!!

বিদ্যুদ্বেগে সেই মহাতরঙ্গ ছুটে এল সমস্ত পৃথিবী মথিত করে রাজভবনের দিকে। তছনছ হয়ে গেল পরিখার পাশের নারকেল গাছগুলি খড়ের কুচির মতো। বিশাল ইষ্টকনির্মিত প্রাসাদ নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, যেন তা শুষ্ক পত্রে তৈরি। পরক্ষণেই থরথর করে কেঁপে উঠল সুউচ্চ নহবতখানা! তিনজন সমস্বরে বলে উঠলেন, "মা গঙ্গা! মা স্বয়ং এলেন তবে সত্যই!"

বেড়েই চলল সেই তরঙ্গের উচ্চতা, যতক্ষণে না তা নহবতের জানালা স্পর্শ করল। জানালায় স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহারাজ জগদানন্দ স্বয়ং। মুহূর্তে সেই ভৈরব কলরোল গ্রাস করল তাঁকে। এক বিপুল তরঙ্গ এক পলকের জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, পরমুহূর্তেই জানালা দিয়ে ছিটকে গেল জগদানন্দের দেহ—তখনো তাঁর মুখচ্ছবি উদ্ভাসিত, চোখে আনন্দাশ্রু, মুখে সেই একই কথা—"মা! মা গো! মা গঙ্গা! তোমার চরণে স্থান দাও মা!" পলক ফেলতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দেহ।

প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়াবহ এক শব্দ করে ভেঙে পড়ল নহবতখানা! এক মুহূর্তে অবিশ্বাস্য উচ্চ সেই ঢেউ গ্রাস করে নিল সবকিছু! মুকুন্দ এবং আচার্য বাসুদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন অতল জলের মধ্যে।

যেখানে একটু আগে ছিল এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যনগরী, এক সমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী—সেখানে এখন অথই তরঙ্গিত সমুদ্র! খণ্ড খণ্ড হয়ে-যাওয়া গৃহ আর জাহাজের অবশেষ। কল্লোলিত তরঙ্গের উচ্ছ্বাস! নিমজ্জিত মানুষের শেষ আর্তনাদ!

কিছুক্ষণের মধ্যে তাও স্তব্ধ হয়ে গেল। নেমে এল শ্মশানের নীরবতা।

৪

"সমকালীন অভিযাত্রীদের বইপত্র অনুযায়ী, চার-পাঁচ ঘণ্টার ভয়াবহ বন্যায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল সবকিছু। অন্তত দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিলেন সেইদিন। ভাবতে পারো তোমরা?" বললেন শুভমামা।

খেয়ে-দেয়ে অরিত্রর মামাবাড়ির প্রকাণ্ড ছাতে এসে বসেছিল ওরা চারজন। দু-খানা ফুটবল মাঠ হয়ে যাবে হেসে-খেলে, এতই বড়ো ছাত—তার দুই প্রান্তে আবার দুটো গম্বুজ। তারই ছায়ায় বসে গল্পটা বলছিল শুভমামা—

"সত্যিই গঙ্গা দেহধারণ করে নিজে এসেছিলেন জগদানন্দকে মৃত্যুর মুহূর্তে দেখা দিতে?" আর্যর গলায় প্রবল অবিশ্বাসের সুর আর চাপা থাকল না।

হেসে ফেলে আর একটা সিগারেট ধরাল শুভমামা, "তাই হয়? এসব রূপক। তলিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে—প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির ফলে সমুদ্রে বন্যা হয়েছিল, এমনটা হতেই পারে। তবে আমার একটা অন্য থিওরি আছে।"

"কী?"

কিছুক্ষণ চুপ করে বাড়ির পিছনের ঝোপঝাড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে শুভমামা বলল, "সুনামি।"

"সুনামি?" সমস্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আর্য আর ঋতম। অরিত্র স্বভাবতই এসব গল্প আগে শুনেছে, ও চমকাল না—

ছাইটা আলগোছে ঝেড়ে নিয়ে শুভ বলল,"ভেবে দ্যাখো, আচমকা যেভাবে বিশাল ঢেউ এল, এক ঝটকায় তছনছ হয়ে গেল গোটা একটা জনপদ—এই সবকিছুই সেদিকেই ইশারা করছে না? তারপর ধরো এই যে বিপুল সংখ্যায় মানুষ মারা গেল; তার মানে তারা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল, বিপদের আভাসটুকুও পায়নি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। নইলে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে চলেছে, বিশাল ঢেউ উঠতে পারে—এগুলো কিন্তু সুমদ্রের কাছে থাকা মানুষেরা, পার্টিকুলারলি নাবিকেরা বুঝে যাবে আগেই, তাই না? এই কারণেই আমার মনে হয়েছে, সেদিন চন্দ্রদ্বীপে যেটা হয়েছিল, সেটা আর কিছু নয়—সুনামি।"

মাথা নাড়ল ওরা—এটা আন্দাজ বটে, কিন্তু লজিক আছে এই অনুমানের পিছনে—

"এরপর কী হয়েছিল, শুভমামা?" জিজ্ঞেস করল ঋতম।

"বলা মুশকিল। চন্দ্রদ্বীপ যে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামলে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই; কারণ জগদানন্দের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ, এবং তারপর বিখ্যাত রামচন্দ্র রায়েরা বংশপরম্পরায় রাজত্ব করেছেন সেখানে। বাকি রইল দুটি শাখা—তার মধ্যে একটি চলে গিয়েছিল পাণ্ডুয়ায়, সেখান থেকে পরে তারা চলে আসে মুর্শিদাবাদে। সেখানে

এরা রেশমের ব্যবসায় অসাধারণ উন্নতি করেছিল। আরো পরে আমাদের পূর্বপুরুষদের গতি হল কলকাতায়। বাকিটা তো দেখতেই পাচ্ছ।" বলে হাত ঘুরিয়ে নিজেদের বাড়িটা দেখিয়ে দিল শুভমামা—আলাপের একঘন্টার মধ্যেই সম্বোধনটা যে আপনি থেকে তুমি হয়ে গেছে, সেটা অবশ্য এই মানুষটির অনবদ্য ব্যবহারের ফল।

আর্য হঠাৎ মাথা তুলে বলল, "মামা, হঠাৎ ওই রামচন্দ্র রায়কে তুমি 'বিখ্যাত' বললে কেন? ইনি কেন বিখ্যাত?"

"সে কী হে!" সত্যিই অবাক হয়ে বলল শুভমামা, "রামচন্দ্র রায়কে চিনতে পারলে না?"

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা দুজন। নির্ঘাত খুব পরিচিত কেউ হবেন, ওদের মাথায় আসছে না।

"আরে ইনিই হলেন সেই রামচন্দ্র, যিনি যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন! মনে নেই—'যশোর-নগরধাম, প্রতাপাদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ!' অন্নদামঙ্গল?"

"ভারতচন্দ্র! এ হে হে!" চেঁচিয়ে উঠল আর্য!

"ঠিক তাই। এঁকে নিয়েই ররবীন্দ্রনাথের সেই উপন্যাস—বউ-ঠাকুরানির হাট।"

"তোমাদের বাড়িটাই জ্বলজ্যান্ত ইতিহাস বই একখানা।" আবার বলল ঋতম।

অরিত্র এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এখন একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ইতিহাসের ঝোঁকে তোরা চিংড়িটা খেলিই না ভালো করে। ওরে, ছোটোমামা কালও গল্প করবে, কাল আর এই নেমন্তন্নবাড়িটা থাকবে না, বুঝলি?"

সমবেত হো হো হাসিটাকে এতটুকু পাত্তা না-দিয়ে অরিত্র আবার বলল, "বরাবর এই আর্যটাই গোলমাল পাকায়—ধুর!"

শুভমামা বলল, "হ্যাঁ, আর্য, তুমি নাকি যেখানেই যাও, সেখানেই একটা কিছু গণ্ডগোলে পড়ে যাও? সত্যি নাকি কথাটা?"

আর্য হাত-মুখ নেড়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, অরিত্র বলল, "জিজ্ঞেস করো, আন্দামানে একটা ভাঙা জাহাজ দেখতে যাওয়ার আইডিয়া কার ছিল? কে আমাদের দণ্ডকারণ্য দেখাবে বলে একটা ভূতুড়ে গুহায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল?"

আর্য ভাষা ফিরে পেল এতক্ষণে, "তা তোরাই বা যাস কেন? ঘরে বসে থাক, আর মিত্র কাফের ব্রেন চপ খা!"

একটা ঝগড়াঝাঁটি বেধে উঠতে পারে বুঝে শুভমামা বলল, "তা বাপু, আমি এটুকু বুঝি—কলকাতার গলির মধ্যে জন্মেছি মানেই যে সেটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে হবে, তার কোনো মানে নেই। এত বড়ো পৃথিবীটা তবে আছে কী করতে?"

ঋতম এসোব শুনছিল না, একমনে পিছনের গাছগাছালিতে ভরা জমিটার দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ বলল, "মামা, ওই পুরনো বাড়িটা একবার কাছ থেকে দেখা যায় না?"

এক লাফ দিয়ে উঠে পড়ল শুভমামা, "কেন যাবে না? বিশেষ কিছু নেই বটে, কিন্তু এত পুরনো স্ট্রাকচার বোধহয় এখন কলকাতায় খুব বেশি বাকি নেই। চলো, দেখেই আসা যাক। আমি শুধু একবার গণেশকে ডেকে নিই।"

এবার অবশ্য বাড়ির সামনের দিক দিয়ে নয়, পিছনের একটা লোহার তৈরি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা—শুধু দোতলার অনন্ত গলিঘুঁজি পেরনোর সময় ঋতম বলল, "ওরে আর্য, মামা আর অরিত্র যদি আগে চলে আসে, আমাদের আর ফেরা হবে না রে!" সত্যিই গোলকধাঁধা বটে!

পিছনে নেমে ওরা বুঝতে পারল, যেটাকে ওরা ঝোপঝাড় ভাবছিল, সেটা রীতিমতো একটা বাগান ছিল এককালে। বড়ো বড়ো সব গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। কলকাতা শহরের একেবারে পেটের মধ্যে যে এরকম একটা জায়গা লুকিয়ে থাকতে পারে, ভাবাই যায় না! দিনেমানেও রীতিমতো অন্ধকার এখানে—তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে এক অতি প্রাচীন, ক্ষয়াটে চেহারার বাড়ি। মূল বাড়িটার মতো আলিশান রাজকীয় চেহারা নয়। অন্যরকম দেখতে—প্লাস্টার নেই। ইটের দেওয়াল, দরজাগুলোর মাথা গোল। বাইরের দিকের ঘরগুলো ছ'কোনা। জানলায় পাখি লাগানো—পরিত্যক্ত, জরাজীর্ণ; কিন্তু শক্তপোক্ত।

একতলায় এক সার ঘর—বারান্দায় খড়কুটো, মাকড়সার জাল, পায়রার ময়লা। সারি সারি বন্ধ দরজায় তালা লাগানো—শুভমামা বলল, "শিওর নই, তবে সম্ভবত কাছারি ছিল এই জায়গাটা—ব্যবসার কাজ চলত এখান থেকে। পিছনের দিকটায় অবিশ্যি লোকজন থাকত, বোঝা যায়। গণেশ, মাঝের দরজাটা খুলে দে ভাই।"

এইবার বোঝা গেল গণেশ নামের রোগাপটকা লোকটাকে ডেকে নেওয়ার কারণ। তার হাতে একটা মস্ত লোহার আংটা, তা থেকে অন্তত পঞ্চাশখানা হরেকরকমের চাবি ঝুলছে—এর মধ্যে থেকে ঠিক চাবিটা একবারে বেছে নেওয়া শুভমামার কম্ম নয়। অবশ্য লোকটাও মোটেই একবারে খুঁজে পেল না সঠিক চাবিটা—মিনিট দুয়েক হাতড়ে হঠাৎ 'এইত্তো!' বলে একটা ক্ষয়ে-যাওয়া তামাটে চাবি দিয়ে পেল্লায় তালাটা খুলে ফেলল।

ঘরটা বিশাল, এ-পাশে একটা হলেও ভিতরের দিকে ছ-খানা দরজা। মেঝেতে দাবার ছকের মতো সাদাকালো খোপকাটা—গোটা দেওয়াল আলমারিতে ঢাকা—মাঝখানে আদ্যিকালের একটা ইজিচেয়ার পড়ে আছে, সাদা কাপড়ে ঢাকা সেটা—তার সামনে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, তাতে একটা চার-মাথাওলা অদ্ভুত দেখতে মূর্তি। পাশে একটা মস্ত গড়গড়া।

"বাপ রে! পুরো মিউজিয়াম!" বলে উঠল আর্য।

শুভমামা হেসে ফেলে বলল, "এখনই? চলো, ভিতরে আরো অনেক কিছু আছে দেখার মতো। এটা, ওই যে বললাম, কাছারিবাড়ি বা অফিস পোরশন ছিল বাড়ির। ব্যবসার কাজ চলত এখান থেকে। সেকালের ব্যবসাবাণিজ্য, বাজারদর—এসবের প্রচুর ইনফরমেশন পেয়েছি এই আলমারিগুলো থেকে।"

এবার বোঝা গেল, এত বছরের পরিত্যক্ত হলেও বিশেষ ধুলো-টুলো পড়েনি কেন জিনিসপত্রে। শুভমামা নিয়মিত আসে এই বাড়িটায়।

ভিতরের দিকের দরজা দিয়ে ঢুকলে পাশাপাশি কয়েকটা সুড়ঙ্গের মতো গলি। সেগুলো থেকেও আবার গলি বেরিয়েছে। এখান থেকে

ওখান থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে। গোলকধাঁধা রীতি-মতো। চারদিকে পুরনো আসবাব, মাথার উপর কাপড়- জড়ানো ঝাড়বাতি ঝুলছে—এই ঘরগুলো কাছারিবাড়ির মতো অত পরিষ্কার নয়, ঝুল পড়েছে। দু-একটা ঘরে পড়ে আছে ভাঙা পালঙ্ক, প্রকাণ্ড কিন্তু চিড়-ধরা বেলজিয়াম গ্লাসের আয়না—

বাইরে থেকে অত বোঝা যাচ্ছিল না, এই বাড়িটাও বেশ বড়ো। পুরোটা ঘুরে দেখতে ওদের প্রায় আধঘন্টা লেগে গেল।

"সত্যিই, জাদুঘরে ঘোরার মতোই একটা ফিলিং হচ্ছে কিন্তু, কী বলিস?" বাইরের ঘরটায় ফিরে এসে আর্য বলে উঠল, "হ্যাঁ রে অরিত্র, তুই এসেছিস আগে এদিকটায়?"

অরিত্র বলল, "দু-একবার। আজকাল আর ছোটোমামা ছাড়া বিশেষ কেউ আসে না এই বাড়িতে—ছেলেবেলায় লুকোচুরি খেলতে আসতাম অবিশ্যি, কিন্তু ভাই, অস্বীকার করব না, এখানে দিনে-দুপুরেও একটু গা-ছমছম করে।"

কথাটা মিথ্যে নয়—বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছে। ঝুপসি অন্ধকার ঘরটায়। দু'খানা আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু এত বড়ো ঘরের সবটা তাতে আলোকিত হয় না—কোণে কোণে জমে আছে অন্ধকার।

হঠাৎ ঋতম বলল, "মামা, এই ইজিচেয়ারটায় বসব একবার? বেশ একটা ইয়ে ফিলিং হবে কিন্তু, কী বলিস, আর্য?"

হেসে ফেলে শুভমামা বলল, "কাপড়টা তুলে আগে দ্যাখো, বেশি ধুলো নেই তো? আমারও বেশ কিছুদিন আসা হয়নি এ-বাড়িতে।"

কাপড়টা তুলে অবশ্য বোঝা গেল, চেয়ারটা দিব্যি আছে, এমনকি বেতের বুনন অবধি একদম ঠিকঠাক আছে—সাবধানে চেয়ারটায় বসে ঋতম টেবিলে রাখা গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "ওরে কে আছিস, তামাকটা সেজে দিয়ে যা দেখি!" বলে মুখ দিয়ে গুড়ুক গুড়ুক করে শব্দ করতে লাগল।

আর্য হাসতে হাসতে একটা চাঁটি মারতে এগিয়ে গেল ওর দিকে। তারপর কী মনে করে টেবিল থেকে সাবধানে হাতে তুলে নিল মাঝখানে পড়ে থাকা মূর্তিটা—বলল, "শুভমামা, এটার ব্যাপারটা কী?"

শুভ মূর্তিটাকে হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল খানিক। তারপর মাথা নেড়ে বলল, "কখনও খেয়াল করিনি তো! আশ্চর্য!"

আর্য কিছু ভেবে বলেনি, এমনিই জিজ্ঞেস করেছিল। এখন শুভর বিস্মিত মুখ দেখে নিজেও ভালো করে দেখল ফের হাতখানেক উঁচু মূর্তিটা—ওর চেনা কোনো দেবতার চেহারা এরকম নয়। পদ্মফুলের উপর বাবু হয়ে বসে আছেন ইনি। চারটে হাত। ডানদিকের হাতদুটোয় পদ্মফুল আর বোধহয় রুদ্রাক্ষের মালা। বাঁদিকের নীচের হাতটায় একটা কমণ্ডলু। উপরের হাতটায় ভাঁজ-করা কাগজের মতো কিছু একটা। কোন দেবতার মূর্তি এটা? আশ্চর্য হওয়ার মতোই বা কী দেখল শুভমামা?

এমন সময় একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে চমকে উঠল ওরা। খট করে একটা শব্দ হল, তারপরেই কারো পড়ে যাওয়ার মতো আওয়াজ, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার চিৎকার, আর ধপধপ করে দ্রুত ছুটে যাওয়া পায়ের শব্দ—পুরো ব্যাপারটাই এত ঝড়ের বেগে ঘটে গেল যে, ওরা বাইরের দিকে তাকানোর আগেই সব আবার আগের মতো চুপচাপ; শুধু বহুদূর থেকে ভেসে আসা গাড়ির হর্নের আওয়াজ।

পরক্ষণেই একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শুভমামা, পিছন পিছন ওরাও—তারপর আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বারান্দার মাঝামাঝি জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে গণেশ নামের সেই রোগাপাতলা চেহারার লোকটা। একটু দূরে ছিটকে পড়েছে মস্ত চাবির গোছা—

আধো অন্ধকারেও এটুকু বুঝতে ওদের অসুবিধা হল না, গণেশের মাথার পাশে গড়িয়ে যাওয়া তরলটা আসলে রক্ত ছাড়া আর কিছুই না।

৫

"হামেশাই আমরা কাছের জিনিস খেয়ালই করি না—নিজের হাতের তালুর রেখাগুলো যে কত বিচিত্র ডিজাইন তৈরি করে রেখেছে, মন দিয়ে দেখেছ কখনও? এও কিছুটা তেমন ব্যাপার।" নিজের পছন্দের চেয়ারে বসে বলল শুভমামা। সামনের টেবিলটার উপর রাখা মূর্তিটার উপর এখন স্থির হয়ে আছে টেবিলল্যাম্পের জোরালো আলো। এইমাত্র সেটাকে খুব সাবধানে পরিষ্কার করা হয়েছে—

উলটোদিকের চেয়ারে বসা অরিত্র বলল, "এবার একটু বুঝিয়ে বলবে, ছোটোমামা? কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না তো!"

এইমাত্র হসপিটাল থেকে ফিরেছে ওরা—ডাক্তারবাবু স্পষ্ট জানালেন, ভোঁতা এবং ভারী কোনো জিনিস দিয়ে বেশ জোরে মারা হয়েছিল গণেশকে—চোদ্দো বছর ধরে এই বাড়িতে কাজ করছে গণেশ। নিতান্ত চুপচাপ ভালোমানুষ যাকে বলে। কেন কেউ এরকম নিরীহ মানুষকে এমনভাবে মারবে, কীভাবেই বা পিছনের সেই পোড়োবাড়িতে কেউ ঢুকল—কিছুই মাথায় ঢুকছে না কারো—বাগবাজারের বসুদের বাড়িতে এমন ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটেনি—ডাক্তাররা এখনও গণেশের সঙ্গে কথা বলার পারমিশন দেননি। ওর কাছ থেকে আগে জানতে হবে, ও কিছু দেখেছে কিনা। কিন্তু সেটা কাল সকালের আগে সম্ভব নয়।

এমনিতেই এই পরিবারটি আজকালকার মাইক্রো-ফ্যামিলির যুগে ম্যামথের মতোই বড়ো, তার উপর আজ বাড়িতে অনুষ্ঠান থাকায় প্রচুর মানুষ ছিলেন। সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে কে বা কারা এমন কাণ্ড ঘটিয়ে গেল, সত্যিই বোঝা মুশকিল। আপাতত থানায় অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীর বিরুদ্ধে একটি ডায়েরি করা ছাড়া আর কিছুই করা যায়নি।

এইসব কাজকর্ম মিটিয়ে ওরা যখন আবার শুভমামার ঘরে ফিরে এল, তখন রাত প্রায় ন-টা। হাসপাতাল থেকে সোজা বাড়ি ফিরে গেলেই পারত আর্য আর ঋতম। কিন্তু শুভমামার চোখ দেখেই ওরা বুঝতে পারছিল, এটা শুধু কোনো ছিঁচকে চোরের মারধোর করে পালানোর ঘটনা নয়। আর হ্যাঁ, ওই মূর্তিটা সাধারণ নয়; নইলে ওইরকম সাঙ্ঘাতিক অবস্থাতেও হাসপাতালে যাওয়ার আগে মূর্তিটা হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে নিজের ঘরে রেখে যেত না শুভমামা।

আর এখন, সেই মূর্তিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে চলেছে শুভমামা। তার ধারালো চোখদুটো ঝকঝক করছে, যেন এক্ষুনি এমন কিছু ঘটবে, যা ওদের চিন্তার বাইরে! দম বন্ধ করে টেবিলটাকে ঘিরে দাঁড়াল ওরা—

"এই মূর্তিটা আমি জন্ম থেকে দেখে আসছি, বুঝলে আর্য! অরু নিজেও অন্তত দশবার দেখেছে এটা—কাছারিঘরের সদর দরজার মুখোমুখি যে দেওয়ালটা, তাতে একটা খোপ করে রাখা ছিল মূর্তিটা—" বলে চলল শুভব্রত, "অযত্নে পড়ে থেকে এর রংটাই ঢেকে গিয়েছিল। রিসেন্টলি লোক লাগিয়ে ওই ঘরটা পরিষ্কার করানো হল আমারই কাজের জন্য। তখনই মূর্তিটা কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখা হল। তারপরও আমি কিচ্ছু খেয়াল করিনি।"

"কী খেয়াল করনি?" আর্য টেনসড্ গলায় জিজ্ঞেস করল।

"এইবার ভালো করে দ্যাখো।" বলে ধীরে ধীরে মূর্তিটা ঘোরাতে লাগল শুভমামা, "কিছু খেয়াল করছ?"

দু-পাক ঘোরানোর পরেই হঠাৎ আর্য বলল, "আরে! ঠিকই তো!"

ঋতম বলল,"আরে কী ঠিকই তো?"

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে আর্য বলল, "অন্ধ নাকি তুই? এই মুখটার রং যে আলাদা, দেখতে পাচ্ছিস না?"

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে আর্য—মূর্তিটার একটা মাথার রং আলাদাই বটে! অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ঋতম আর অরিত্র।

শুভমামা বলল, "এটা ব্রহ্মার মূর্তি। আমরা, হিন্দুরা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পিছনে তিনজন দেবতা আছেন বলে বিশ্বাস করি। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। ভারতে শিবমন্দির অসংখ্য; আর বিষ্ণুর মন্দির খুব বেশি না-থাকলেও দুই অবতারের মধ্যে দিয়ে আসলে অধিকাংশ মানুষ বিষ্ণুকেই পুজো করেন।"

"রাম আর কৃষ্ণ।" বলে উঠল ঋতম।

"রাইট! কিন্তু ব্রহ্মা, অর্থাৎ স্বয়ং সৃষ্টির দেবতাই কোনো অজানা কারণে একেবারে উপেক্ষিত।" বলে চলল শুভব্রত, "যে-কটা ব্রহ্মামন্দির আছে, তার মধ্যে সবচাইতে বিখ্যাত অবশ্যই রাজস্থানের পুষ্করের মন্দিরটা। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মন্দিরে যান তীর্থ করতে। কিন্তু বাড়িতে ব্রহ্মামূর্তি? আমি অন্তত জীবনে দেখিনি! অথচ দ্যাখো, আমার নিজের বাড়িতেই, একেবারে চোখের সামনে একটা ব্রহ্মামূর্তি কয়েকশো বছর ধরে রয়েছে, কেউ খেয়ালও করেনি! আমিও না!"

"কিন্তু মাথার রং—"

"সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম। ব্রহ্মার চারটি মাথা, যে-কারণে তাঁকে চতুরানন বলা হয়। স্বভাবতই, এই চারটি মাথার রং একই হবে! কিন্তু এই পার্টিকুলার মূর্তিটার একটা মাথার রং আলাদা। এই দ্যাখো!" বলে মূর্তিটা ওদের দিকে ডানপাশ করে বসিয়ে দিল শুভমামা।

ঠিকই—বাকি তিনটে মাথা সাদা হলেও ব্রহ্মার ডানদিকের মুখের রং উজ্জ্বল সোনালি। আলো পড়ে, এবং বহুদিন পর ঝাড়পোছ হওয়ায় এখন সেই সোনালি মুখটা ঝলমল করছে।
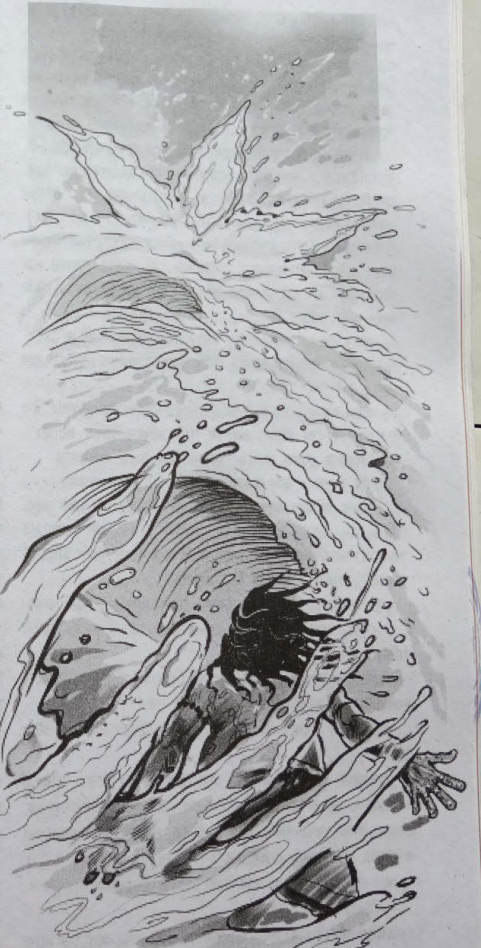
সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়তে চলেছে, বিশাল ঢেউ উঠতে পারে

"হঠাৎ একটা মাথার রং আলাদা কেন?" জিজ্ঞেস করল ঋতম।

শুভমামা মাথা নাড়ল, "প্রায় নিশ্চিত হয়ে বলা যায়; এটা কোনো দিককে ইন্ডিকেট করছে—কথা হল, কোন দিক?"

আর্য বলল, "সেটা আর বোঝার উপায় আছে কি?"

"কেন? নেই কেন?" ওর দিকে তাকাল সবাই।

"ভেবে দ্যাখো, মূর্তিটা তো কোথাও না কোথাও বসানো ছিল? সেই অবস্থান অনুযায়ী এই মুখটা কোনো এক দিককে ইঙ্গিত করছিল। এবার, যখনই সেই অবস্থান থেকে মূর্তিটাকে সরিয়ে অন্যভাবে বসানো হল, তখনই আর সেই ইঙ্গিতটা কাজ করবে না!"

চিন্তিত গলায় শুভমামা বলল, "খাঁটি কথা। কিন্তু যদি ধরে নিই, কাছারিঘরের কুলুঙ্গিটায় যেভাবে মূর্তিটা বসানো ছিল, সেটাই ওর পোজিশন, তাহলে তো একটা কোনো দিক দেখাবে? সেটা কোনদিক? দাঁড়াও—এক মিনিট—"; বলে একবার পিছনে, অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া বাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মূর্তিটা আন্দাজ মতো বসিয়ে দিল শুভমামা, "এটা যদি সেই অভীষ্ট অবস্থান হয়ে থাকে, তাহলে—এই আলাদা রঙের মুখটা নির্দেশ করছে—এটা হল—রাইট, দক্ষিণ দিক।"

ঋতম বলল, "আমি একটা কথা বলব? তোরা হাসবি না তো?"

আর্য কেমন একটা থতমত খেয়ে বলল, "যাব্বাবা! হাসতে যাব কেন? বল!"

ঋতম বলল, "এর জন্য অরিজিনাল পোজিশনের দরকারই ছিল না! বোঝাই তো যাচ্ছে, আলাদা রংটা দক্ষিণে ইঙ্গিত করছে!"

"কীভাবে বোঝা গেল?" অবাক হয়ে বলল শুভমামা।

"কী আশ্চর্য! ডান মানেই যে দক্ষিণ!" বলল ঋতম।

নিজের কপালে আলতো একটা চাপড় মেরে শুভমামা বলল, "দিন দিন বোকা হয়ে যাচ্ছি, বুঝলি অরু! এটা মাথাতেই আসেনি! ডানদিকের মুখ আলাদা করে রাখা আছে দক্ষিণ ইন্ডিকেট করতেই। ঋতম একেবারে ঠিক বলেছে।"

"দক্ষিণদিকে কী আছে? কোথা থেকে দক্ষিণ?" আর্য বলল।

"যেখান থেকেই ভাবো না কেন, দক্ষিণ মানেই সমুদ্র।" বলল অরিত্র।

মাথা নাড়ল শুভমামা, "ঠিক কথা! কিন্তু শুধু মাথার রং আলাদা হওয়াটাই এই মূর্তিটার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়।"

"তাহলে?" ফের ওরা ঝুঁকে পড়ল টেবিলে-রাখা মূর্তিটার উপর।

শুভমামা নিজেও এগিয়ে এল টেবিলটার দিকে। তারপর রহস্যময় গলায় বলল, "ব্রহ্মার চার হাতে চার রকমের জিনিস আছে, খেয়াল করছ তো? বাঁদিকের হাতদুটিতে পদ্মফুল আর রুদ্রাক্ষের জপমালা, ডানদিকের হাতদুটোয় বেদ আর কমণ্ডলু।"

ও! ওটা বেদ! ওরা ভাঁজ-করা কাগজ ভেবেছিল।

"এইবার ম্যাজিক দ্যাখো!"

ব্রহ্মার বাঁদিকের উপরের হাতটায় যে ভাঁজ-করা কাগজের মতো কিছু একটা আছে, ওরা ভেবেছিল মূর্তির বাকি সবকিছুর মতোই ওটাও ফিক্সড। এইবার শুভমামা খুব সাবধানে আঙুল দিয়ে সেই জিনিসটাকে আলতো একটা টান দিতেই ব্রহ্মার হাত থেকে খুলে বেরিয়ে এল জিনিসটা।

"আরে! এটা আলাদা!"

"রাইট! মাথাটা ভালো করে মুছতে গিয়ে হাত লেগে গেল অসাবধানে। অমনি দেখলাম, এটা আলগা হয়ে বেরিয়ে আসছে—তার মানে, এটা আলাদাভাবে বানিয়ে মূর্তির হাতে সেট করা হয়েছে। কিন্তু কেন?" বলে শুভমামা জিনিসটা কানের পাশে এনে দুটো টোকা দিল সাবধানে। অদ্ভুত একটা শব্দ হল। পাথরে টোকা দিলে সাধারণত যেমন শব্দ হয়, তেমন নয়।

"এটা ফাঁপা। মনে হচ্ছে, এটা খাপ—এর ভিতরে কিছু একটা আছে—" বলে জিনিসটা উপরের দিকে তুলে ভালো করে দেখতে গেল শুভমামা।

আর সঙ্গে সঙ্গে সড়াত করে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা শুকনো পাতার টুকরো। অন্তত ওদের প্রথমে তাই মনে হল। চমকে উঠে একে-অপরের দিকে তাকাল ওরা।

"এটাই আশা করছিলাম। তালপাতার উপরে লেখালিখি করা বাংলার মানুষের বহুকালের অভ্যেস।" বলে নিপুণ কৌশলে পাতাটার ভাঁজ খুলে শুভ সেটাকে মেলে ধরল টেবিলের উপর।

খুব আবছা হয়ে এসেছে; তবু বোঝা যায়, তালপাতার উপরে সুন্দর হাতের লেখায় কিছু একটা লেখা আছে।

অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। কী এমন লেখা, যে ব্রহ্মার হাতে রেখে দিতে হয়? আর এমনভাবে লেখা কেন? দুটো শব্দের মধ্যে গ্যাপ নেই, লাইনও আলাদা করা নেই, টানা লিখে গেছে কেউ!

টেবিলে প্রায় নাক ঠেকিয়ে কাগজটা পড়ছিল শুভমামা। প্রায় মিনিট পাঁচেক পর যখন চোখ তুলে তাকাল, তখন ওর টকটকে ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠেছে উত্তেজনায়। কাঁপা গলায় বলল, "অর্থ বুঝতে পারছি না, কিন্তু—আচ্ছা, আগে লিখে ফেলি বরং, ঠিক আছে?" বলে একটা কাগজের উপর দেখে দেখে টুকে নিতে লাগল কতগুলো অবোধ্য শব্দ।

প্রায় দশ মিনিট পরে কাগজটা হাতে নিয়ে ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল শুভমামা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। সেটা উত্তেজনার জন্য, না মানসিক পরিশ্রমের ফল—বলা মুশকিল।

"এইভাবেই লেখালেখি হত সেকালে। দুটো শব্দের মাঝে ফাঁক রাখার প্রথা তখনো চালু হয়নি। উদ্ধার করতে সামান্য বেশিই কষ্ট করতে হয় তাই।" বলল শুভব্রত, "এইবার আস্তে আস্তে পড়ে ফেলি বরং, হ্যাঁ?"

টানটান হয়ে দাঁড়াল ওরা। এ-সব কী হচ্ছে আজ?

শুভমামা পড়ল—

কান্ অভিসারক লহু লহু চলতহি
শুকক সন্ধানে যৈছে সারি।
তহি দরশন ভেল লোচনে লোচনে মেল
পরমমোহিনী বরনারী।।
কত চতুরানন পেখল অনিমিখে
শকুন আনন অনুসারি।
শ্যাম সাগরকূলে শ্যাম রহ মঝু ভুলে
সমুখক নীলমণি বারি।।
চন্দক সুবর্ণ ধনি অকামিক গরাসলি

রূপক তরঙ্গ দেঈ দোল।
ততহি ভেজল
নিসান জনু বিসরয়ে
অনুসর পূর্বজ বোল।।

টেবিলটা ঘিরে ওরা চারজন থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মানে কী এই অদ্ভুত কবিতার? আর সেটাকে ব্রহ্মামূর্তির হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখারই বা কারণ কী?

মিনিটখানেক পরে অরিত্র মৃদু গলায় বলল, "আর্য, ঋতম, তোরা বরং বাড়িতে ফোন করে বলে দে; আজ রাতে এখানেই থাকবি।"

৬

"বেশ। বোঝাই যাচ্ছে, এটা একটা বৈষ্ণব পদ। যিনি লিখেছেন, তিনি কবি নন; ছন্দের ভুল আছে বেশ কিছু জায়গায়—এর উদ্দেশ্য আলাদা। তাই তো?"

"হ্যাঁ, সে তো বটেই। কিন্তু খামোখা একটা বৈষ্ণব পদ ব্রহ্মার হাতের মধ্যে কেউ রেখে দেবে কেন?"

"সেটাই হল লাখ টাকার প্রশ্ন, আর্যবাবু! কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আগে কবিতাটার অর্থ উদ্ধার করতে হবে। অরু, টেবিলের উপর থেকে লাল-নীল পেনটা দে দেখি!"

এই বাড়িতে রাতের খাওয়াটা একটু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা হয়। দুপুরে নিমন্ত্রিতের ভিড়ে আর কারো সঙ্গে আলাপ হয়নি আর্য আর ঋতমের। রাতে শুভমামা অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অরিত্রর মামারা চার ভাই, দুই বোন। শুভমামা ছাড়া অন্য ভাইয়েরা সকলেই ব্যবসা দেখেন, ছোটো শুভব্রতই শুধু পড়াশুনো নিয়ে আছে, আর একটা বেসরকারি কলেজে পড়ায়। নিজেদের এত বড়ো ব্যবসা থাকতে শুভ যে 'অন্যের দোরে চাকরি করছে'—সেটা নিয়ে অন্যদের কিঞ্চিৎ আক্ষেপ আছে; কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা—কেন যে ছেলেটা এখনও বিয়ে-থা করে সংসারী হচ্ছে না...!

এই সমস্ত কথাবার্তাই খাওয়ার টেবিলে হচ্ছিল—শুধু শুভমামা দিব্যি হাসিহাসি মুখে খেয়েদেয়ে উঠে পড়ে বলল, "তোমরা এসব চালাতে থাকো। আমি গেলাম।"

আর্যরাও আর বসল না—কবিতাটা ভিতরে খচখচ করছে—শুভমামার বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব ওদের কেউ দেয়নি। চটপট দোতলায় উঠে ওরা শুভমামার ঘরে ঢুকে পড়ল। এবার খাটে উঠে গোল হয়ে বসল চারজন।

অরিত্র লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে পেন নিয়ে আসতে শুভ গোটা কবিতাটা আবার গোটা গোটা করে টুকল আর একটা কাগজে। এবার অবশ্য প্রতিটা শব্দের পাশে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা—তারপর পেনটা উলটে নিয়ে বলল, "এবার আননোন শব্দগুলোর মানেটা লিখে ফেলা যাক আগে।"

খুব লজ্জিত গলায় ঋতম বলল, "ইয়ে—এটা কোন ভাষা?"

শুভ একটু অবাক হয়ে বলল, "সে কী! তোমরা ব্রজবুলি ভাষা পড়নি এর আগে?"

সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে ইংরেজি অনার্স, এবং আপাতত এম. এ. পাঠরত তিন পণ্ডিত করুণ মুখে মাথা নেড়ে দিল। অধিকাংশ বৈষ্ণব পদাবলী যে ব্রজবুলি ভাষায় লেখা হত, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই ভাষার মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে 'ভানুসিংহের পদাবলী' লিখেছিলেন; এইরকম টুটাফুটা নলেজ নিয়ে শুভমামার সামনে মুখ না-খোলাই নিরাপদ।

তীক্ষ্ণ চোখে হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে শুভমামা বলল, "ষোড়শ শতকের বাংলায় ব্রজবুলি ছিল কবিতার ভাষা—বিদ্যাপতি, এবং তাঁর ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস এই ভাষায় প্রচুর পদ লিখেছেন; এটা সবাই জানে—অন্যেরাও কিন্তু কম লেখেননি এই ভাষায়! আচ্ছা, সে-সব কথা পরে হবে—দেখা যাক—এই পদটার মানে কী। 'কান্ অভিসারক, লহু লহু চলতহি, শুকক সন্ধানে যৈছে সারি।' এটা একদম ক্ল্যাসিক্যাল বৈষ্ণব পদাবলীর শুরুয়াত। কান্ হলেন কানু, শ্রীকৃষ্ণ। রাধা কৃষ্ণের অভিসারে ধীরে ধীরে চললেন; কার মতো, না—শুকের অভিসারে সারি যেমন করে যায়। বেশ। এটুকু লিখে ফেলি আগে—তারপর? দুজনের দেখা হল, লোচনে লোচনে মিলল—মানে চার চক্ষুর মিলন হল, রাধা পরমাসুন্দরী। আচ্ছা, প্রথম দু-লাইন বোঝা গেল।"

আর্য বলল, "মনে পড়েছে! সেই যে—এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর—"

"ঠিক তাই! একই ভাষা!" মাথা নেড়ে বলল শুভমামা, "তারপর বলছে—কত চতুরানন, চতুরানন মানে তো ব্রহ্মা, পেখল অনিমিখে; মানে একদৃষ্টিতে তাকাল—কোনদিকে? না, শকুন আনন অনুসারি! শকুনের মুখ অনুসারে? মানে? ব্রহ্মার সঙ্গে শকুনের সম্পর্ক কী? গোলমাল হয়ে গেল যে!"

খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে শুভমামা আবার পড়তে শুরু করল, "শ্যাম সাগরকূলে—মানে কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে গিয়ে—বেশ—আবার শ্যাম—শ্যাম রহু মঝু ভুলে; আমাকেই ভুলে রইল? এটা কেমন হল?"

অরিত্র ভয়ে ভয়ে বলল, "আমার কিন্তু অন্য একটা কথা মনে হচ্ছে।"

"বল্ তো, শুনি!"

"প্রথম শ্যাম মানে কৃষ্ণ না-হয়ে যদি রং বোঝায়? শ্যামল সাগরের পাড়ে? পরের শ্যাম হল কৃষ্ণ! তাহলে মানে দাঁড়াচ্ছে—শ্যামল সাগরের উপকূলে গিয়ে কৃষ্ণ আমাকে ভুলে গেল!"

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে শুভ বলল, "অ্যাবসোল্যুটলি রাইট। কাল গোলবাড়ির কষামাংস উইথ পরোটা।"

অরিত্র উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিছানায় একটা ঘুষি মেরে বলল, "ইয়েস!"

"সমু—ক মানে সামনের—নীল জল। আচ্ছা। তারপর? চন্দক সুবর্ণ ধনি—খেয়েছে—চাঁদের সোনার ধন? দাঁড়া, পরে দেখছি—অকামিক গরাসলি; মানে দাঁড়াচ্ছে, অকস্মাৎ গ্রাস করল! রূপক তরঙ্গ দেঈ দোল! রূপের তরঙ্গে দোলা দিয়ে! কী দাঁড়াল সবটা মিলিয়ে বলো দেখি?"

"রূপের তরঙ্গ দোলা দিল, ফলে চাঁদের সোনার ধন হঠাৎ গ্রাস করল।" ধরে ধরে বলল আর্য।

খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ওরা চারজন। এই লাইনটার কোনো মানে দাঁড়াচ্ছে না, অথবা ওরাই ধরতে পারছে না।

"দাঁড়াও, আগে শেষ করি। এরপরে আছে—ততহি ভেজল—অর্থাৎ সেইজন্যই পাঠানো হচ্ছে। নিশান মানে এখানে নির্ঘাত নিশানা বা চিহ্ন—বেশ। জনু—মানে—"

"যেন?" বলে উঠল আর্য।

—"উহুঁ! না-যেন। মানে—নিশান জনু বিসরয়ে; এর অর্থ হবে— নিশানা বা চিহ্ন যেন ভুলে যেও না। অনুসর পূর্বজ বোল—পূর্বপুরুষদের কথা অনুসরণ করো!"

কাগজটা ফেলে দিয়ে ছাতের দিকে তাকাল শুভমামা। ওরাও বসে রইল চুপ করে। এটা কবিতা, না ধাঁধা? কে, কেন এমন একটা ধাঁধা তৈরি করে ব্রহ্মামূর্তির হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছিল? কী লাভ?

গভীর রাত এখন। কলকাতা শহরের কোলাহল এই বাড়িটায় এমনিতেই ঢোকে না সেভাবে। এখন যেন আরো নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে চারপাশ!

হঠাৎ ওদের একেবারে চমকে দিয়ে ঋতম বলে উঠল, "ও হ্যাঁ! তাই তো!"

"কী? কী রে?" সবাই মিলে বলে উঠল ওরা।

সোজা হয়ে বসল ঋতম, ওর চোখ জ্বলজ্বল করছে, "চাঁদ নয়! চন্দ্র! চন্দ্রদ্বীপ!"

"মানে?"

"আরে এবার বুঝতে পারছিস না?" খিঁচিয়ে উঠল ঋতম, "রূপের কথাটা এমনিই বলা হল! আসল কথাটা হল—চন্দ্রদ্বীপের সম্পদ ঢেউ এসে গ্রাস করল।"

"কী!!" প্রায় ছিটকে উঠল আর্য!

শুভমামা বলল, "রূপের তরঙ্গ দোলা দিল, ফলে চাঁদের সোনার ধন হঠাৎ গ্রাস করল। ও! আচ্ছা, আচ্ছা! চাঁদের সোনার ধন—মানে চন্দ্রদ্বীপের সম্পদ, ঢেউ এসে গ্রাস করল! একদম ঠিক বলেছ তো, ঋতম! ব্রিলিয়ান্ট!!"

দারুণ ঝকঝকে একটা হাসি হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল ঋতম, "কিন্তু ওই যে বলল—পাঠানো হল, কাকে? কোথায়?"

আবার আগেরবারের মতো সন্তর্পণে অরিত্র বলল, "আমি আবার একটা ওয়াইল্ড গেস করতে চাই।"

"করে ফ্যাল।" বলল আর্য।

"শ্যাম শব্দটা যদি রং না-হয়ে জায়গা হয়?"

বেজার মুখে আর্য বলল, "এমনিতেই ঘেঁটে আছি, ভাই! আর ঘেঁটে দিস না!"

"এক মিনিট!" হাত তুলে বলল শুভমামা।

তিন জোড়া চোখ একসঙ্গে ঘুরে গেল।

প্রায় এক মিনিট চুপ করে থেকে শুভমামা বলল, "শ্যামদেশ।"

অরিত্র ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ, শ্যামদেশ। আজকে তার নাম—"

"থাইল্যান্ড!" মধ্যরাতের নৈঃশব্দ্য ভেঙে চেঁচিয়ে উঠল আর্য!

হাসপাতাল থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া লোককে দেখলে এমনিতেই একটু রুগ্ণ লাগে। গণেশকে দেখে কথাটা আরো পরিষ্কার করে বোঝা যাচ্ছে এখন।

অরিত্রর মামাবাড়ির একতলাটা ঠিক কেমন, সেটা ওরা বুঝতে পারেনি—এখন গণেশের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওরা বুঝল, এমন বাড়ি ওরা শুধু পুরনো সিনেমাতেই দেখেছে।

সামনের বিশাল হলটার পিছনে একটা করিডোর—তারপর চৌরস উঠোন। উঠোন ঘিরে সার সার ঘর, তারই একটায় থাকে গণেশ। সকালে হাসপাতাল থেকে ফিরে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল গণেশ। আপাতত কাজ করার প্রশ্ন ওঠে না, ডাক্তারবাবু অন্তত সাতদিন বিশ্রাম নিতে বলে দিয়েছেন। মানুষটা এমনিতেই রোগাপাতলা, আচমকা আঘাতে মানসিকভাবেও একটা ঝটকা খেয়েছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে চুপ করে শুয়ে ছিল একটা চৌকিতে। শুভমামাকে ঢুকতে দেখে তাড়াহুড়ো করে উঠে বসতে গিয়ে টাল খেয়ে ফের শুয়ে পড়ল। শুভমামাই উলটে আঁতকে উঠল, "আরে! শুয়েই থাক গণেশ, উঠতে হবে না! আবার লেগে যাবে কিন্তু!"

গণেশ আর উঠল না। বালিশে মাথা রেখেই ম্লান হাসল, "হঠাৎ কী হয়ে গেল বলো তো ছোড়দা? একেবারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে—"

"সেটাই বেশি চিন্তায় ফেলল রে!" বলল শুভমামা, "এখন তো আর আগের মতো পাহারা বসানো সম্ভব নয়! এত বড়ো বাড়ি, এতখানি জমি; এর সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা কি সম্ভব নাকি, বল তো?"

"আমি শুধু কাল থেকে ভাবছি, আমাকে খামোখা কে মারতে যাবে বলো! জন্মে বাড়ি থেকে বেরোলাম না, কেউ চেনে না আমায় কলকাতায়! কারো কোনো ক্ষতিও করিনি বাপু! শত্রুতা নেই কারো সঙ্গে! হঠাৎ আমায় কেন?"

আর্য আর ঋতম বাড়ি ফিরবে বলে রেডি হয়ে বেরোচ্ছিল, গণেশকে নিয়ে শুভমামার বড়দা যখন বাড়ি ফিরলেন। প্রায় ওদের সামনেই আহত হয়েছিল মানুষটা, একটা খোঁজখবর না নিয়ে চলে যাওয়াটা নিতান্ত অসভ্যতা হবে। কাজেই শুভমামার পিছন পিছন ওরাও এসে দাঁড়িয়েছিল গণেশের ঘরের দরজাটায়। এখন অরিত্র বলল, "তুমি কাউকে দেখতে পাওনি, গণেশদা?"

শুয়ে শুয়েই মাথা নাড়ল গণেশ, "না গো, ঠিকঠাক কিছু দেখিনি। আমি তো বারান্দার সিঁড়িতে বসে ছিলাম। ওখানে আলোও নেই। হঠাৎ পিছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকাতে গেলাম। আবছা আলোয়...কী জানি, ভুলও হতে পারে—"

"আহা! আবছা আলোয় দেখলিটা কী, সেটা তো বলবি!" অধৈর্য গলায় বলল শুভমামা।

খুব দ্বিধান্বিত চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে গণেশ বলল, "এক সেকেন্ডের জন্য মনে হল, একটা খুব বেঁটে লোক, আর একটা খুব লম্বা লোক, দুজনেই কেমন লম্বাটে পাঞ্জাবি পরা, বড়ো বড়ো দাড়ি-গোঁফ, অন্ধকারের মধ্যে লাফিয়ে উঠে এল বারান্দায়। আমাকে বোধহয় খেয়াল করেনি, মাটিতে বসেছিলাম

তো! আমি ওদের দেখে উঠে দাঁড়ালাম, আর অমনি লম্বা লোকটার হাতে একটা ছোটো লাঠি মতো ছিল, ওইটে দিয়ে— তারপর আর কিছু মনে নেই।"

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শুভমামা বলল, "এর থেকে কিছু বোঝা মুশকিল রে—পুলিশকে বলেছিস এসব?"

"বললাম তো। চুপচাপ লিখে নিয়ে চলে গেল।"

"স্বাভাবিক। এত এত অপরাধ ঘটে চলে রোজ কলকাতা শহরে, একজনের মাথায় কে একটা বাড়ি মেরেছে, ওরা পাত্তা দেবে না ন্যাচারালি।"

আর্য বলল, "তাছাড়া দাড়িগোঁফ যদি নকল হয়—"

"হওয়ারই কথা।" বলল শুভমামা,"খুলে ছুড়ে ফেলে দেবে গঙ্গায়, চুকে গেল। কিন্তু এই দু-জন লোক কারা, সেটা আইডেন্টিফাই করাটা পরের কথা—আমি ভাবছি, এই বিশাল উঁচু পাঁচিল টপকে ভর সন্ধেবেলায় আমাদের বাড়িতে কেউ ঢুকতে যাবে কেন? আর যদি ধরে নিই নিছক ছিঁচকে চোরের কাজ, তাহলে সে পুরনো বাড়িতে যাবে কেন? ওখানে আছেটা কী? দামি জিনিস কেউ ওরকম অনাদরে ফেলে রাখে? তেমন কিছু থাকলে স্বভাবতই সেটা থাকবে এই বাড়িতে। কাজেই ওই ভূতুড়ে বাড়িতে চোর ঢোকাটাও খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার।"

গণেশকে রেস্ট নিতে বলে ওরা বেরিয়ে এল। বাইরের বাগানটায় এখন রোদ ঝলমল করছে। চারজন হাঁটতে লাগল বিশাল গেটটার দিকে। একটা নীল অ্যাম্বাসেডর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে, ওদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য— এইরকম গাড়িও আজ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে—এদের সমস্ত ব্যাপারেই একটা পুরোনো গন্ধ আছে। নুড়ি-বিছানো পথ, সবুজ লন—সবটাতেই। একটা বিচিত্র ডিজাইনের সবুজ মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে আছে লনের পাশে। অরিত্র বলল, "উনিশশো বাষট্টির এনফিল্ড। খেয়াল কর—বাঁদিকে ব্রেক। আর্মির বাইক তো!"

বাঁদিকে ব্রেকের ব্যাপারটা ধরতে পারল না আর্য। কী একটা কথা বলতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় ঋতম নীচু গলায় বলল,"আমরা বোধহয় জানি, লোক দুটো কী খুঁজতে এসেছিল।"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা—ঋতমের ভুরুটা কুঁচকে আছে, ও বাইকটার দিকে তাকায়নি।

"কী রে?"

চোখ তুলে আর্যর দিকে তাকাল ঋতম, "ওই ব্রহ্মামূর্তি।"

শুভমামা চমকে উঠে বলল,"ওটা তো কবে থেকেই ওই বাড়িতে পড়ে আছে!"

"এবং ওদের ধারণা ছিল, কালও ওইভাবেই পড়ে থাকবে। ওরা এসে তুলে নিয়ে চলে যাবে। পুরোনো ক্ষয়াটে তালা, একটা মোচড় দিলে খুলে যাবে। ঠিক তখনই যে আমরাও গিয়ে উপস্থিত হব, এটা ওরা ভাবেনি।"

"আর তাই গণেশদাকে দেখে নার্ভাস হয়ে মেরে বসেছে!" বলল আর্য।

"ঠিক তাই। কলকাতা শহরের একেবারে মাঝখানে, এইরকম প্রকাণ্ড পাঁচিল টপকে লোকজনে ভরা বাড়িতে ঢুকে যারা কিছু দখল করার চেষ্টা করে, তারা ডেঞ্জারাস লোক। আমি শিওর, এরা হয় দেখেছে, আমরা মূর্তিটা নিয়েই বেরিয়ে এসেছি; নইলে পরেও ফিরে এসেছিল বা আসবে। যে কারণেই হোক, ব্রহ্মামূর্তিটা এদের খুব দরকার হয়ে পড়েছে।"

শুভমামা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ঋতমের দিকে। এবার বলল, "কিন্তু যদি তারা পরে আবার এসে থাকে—তাও তো বটে!"

ওরা তিনজনই বুঝতে পারল শুভমামা কী ভাবছে—সকাল থেকে ওরা কেউ পুরোনো বাড়ির দিকে যায়নি!

হঠাৎ শুভমামা চেঁচিয়ে উঠল, "এসো তো দেখি—!"

এবার আর বাড়ির ভিতর দিয়ে নয়, বাইরে দিয়ে, বিরাট উঁচু আর দু-হাত চওড়া পাঁচিলের পাশ দিয়ে ছুট দিল ওরা—গাছপালা পেরিয়ে পুরোনো বাড়িটার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভমামা।

এবারেও ঋতম ঠিক আন্দাজ করেছিল। উঁচু বারান্দাটায় ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই ওরা দেখতে পেল, প্রকাণ্ড দরজাটা হাট করে খোলা। তালাটা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে ধুলো-ভরা মেঝেতে।

বারান্দায় ওঠার আগেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শুভমামা। হাতদুটো ছড়িয়ে দিল দু-পাশে—এটা স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা, শুভমামা ওদেরও বারান্দায় উঠতে বারণ করছে কোনো কারণে। বারান্দায় না-উঠে ওরা চওড়া সিঁড়িটার শেষ ধাপটায় এসে দাঁড়াল পাশাপাশি।

ধুলোর উপরে সত্যিই খুব অস্পষ্টভাবে একটা গোটা গল্প লেখা আছে।

এলোমেলো পায়ের ছাপের ভাষা পড়তে জানলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, ওদের নিজেদের গড়পড়তা সাইজের পায়ের ছাপগুলো বাদ দিলে পড়ে থাকে দুটো আলাদা পায়ের ছাপ। তার একটা প্রকাণ্ড, অন্যটা বাচ্চাদের মতো ছোটো। ওরা কাল বারান্দায় উঠে সোজাসুজি ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ফলে ডানদিকে ছাপগুলো একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এরা সিঁড়ি দিয়ে ওঠেনি, কারণ সিঁড়িতে গণেশদা বসেছিল। এরা উঠেছে বারান্দার বাঁদিক দিয়ে, সটান লাফ দিয়ে। হাতের তালুর ছাপ দেখা যাচ্ছে। তারপর দুই সারি পায়ের ছাপ বারান্দা অবধি এসে ফিরে গেছে। গণেশ যেখানে পড়েছিল, সেখানে হিজিবিজি ছাপ, সেগুলো ওদেরই। কিন্তু আবার সেই দুই পায়ের ছাপের মালিকেরা যে ফিরে এসেছিল, তা বোঝা যাচ্ছে নতুন আর এক সারি পদচিহ্ন দেখে। এ-যাত্রায় ছাপগুলো দরজায় এসে মিলিয়ে গিয়েছে।

খুব সন্তর্পণে, ছাপগুলো বাঁচিয়ে ওরা এবার বারান্দায় উঠে পড়ল। দরজা খোলা, আজ আর চাবির দরকার নেই।

ভিতরে সমস্ত জিনিস নির্মমভাবে তছনছ করে গেছে অদৃশ্য চোরেরা। টেবিল উলটেছে, চেয়ার ফেলেছে, প্রতিটি আলমারি খোলার চেষ্টা করেছে, সম্ভব হলে আলমারির দরজা ভেঙেছে—বলা যায়—চেষ্টায় ত্রুটি রাখেনি আদৌ। কালকের সাজানো-গোছানো ঘরটাকে আজ আর চেনার উপায় নেই। গড়গড়াটাকে পর্যন্ত নিষ্ফল আক্রোশে আছড়ে ভাঙা হয়েছে। স্পষ্টত, যার খোঁজ হচ্ছিল, তা

পাওয়া যায়নি বলেই সেই রাগ ফলানো হয়েছে জিনিসপত্রের উপরে।

ফ্যাকাশে মুখে ঘরটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা চারজন। নিশ্চিতভাবে ওরা চলে যাওয়ার সময় সেই দুজন লক্ষ করেনি, ব্রহ্মামূর্তিটা অত টেনশনের মধ্যেও হাতছাড়া করেনি শুভমামা। সেই কারণেই পরে আবার ফিরে এসেছিল ওরা। সমস্ত ঘরটাকে তছনছ করে খুঁজেছে, এবং না-পেয়ে এই ভাঙচুর করে গিয়েছে। সাধারণ চুরির ঘটনা ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়ার শেষ আশাটুকুও উবে গেল এবার।

খুব মৃদুস্বরে শুভমামা বলল, "চিন্তায় পড়ে গেলাম রে অরু! এবার তো এই পোড়ো বাড়িতেও লোক রাখতে হবে দেখছি!"

আর্য এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, "একটা কথা কিন্তু স্পষ্ট। এই দুজন যারাই হোক, কোনো নির্দিষ্ট সূত্র থেকে নিশ্চিত খবর পেয়েই এসেছিল। এরাও জানে, ব্রহ্মামূর্তির মধ্যে কিছু একটা আছে। প্রশ্ন হল, তোমরা ব্যাপারটাকে কতটা সিরিয়াসলি নিচ্ছ। ঠিক কী বোঝা যাচ্ছে ওই লাইনগুলো থেকে?"

বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ওরা। বড়ো বড়ো গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের বিশাল বাড়িটার ছাতের বাহারি পাঁচিলে বসে আছে চিল।

মাথার ঘন চুলের মধ্যে দিয়ে হাত বুলিয়ে চিন্তিত গলায় শুভমামা বলল, "দ্যাখো আর্য, এটা পরিষ্কার—ব্রজবুলি কবিতাটা একটা সংকেত। সূত্র। সেটা স্পষ্টভাবে থাইল্যান্ডের দিকেই ইশারা করছে। বলছে—সেখানে কোথাও সম্ভবত আমাদের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত ধনরত্নের একটা অংশ লুকিয়ে রাখা আছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে, কবিতায় যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা বলা হচ্ছে, সেটা ঘটে গিয়েছে আজ থেকে বহু বহু বছর আগে। সেই সময়কার সুবর্ণদ্বীপ আর আজকের থাইল্যান্ডের মধ্যে আকাশপাতালের পার্থক্য। তাছাড়া দেশটা বিশাল, প্রায় দেড় লাখ বর্গ-কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ছিটেফোঁটা দ্বীপ। এই বিশাল খড়ের গাদায় ছোট্ট ছুঁচটা খুঁজে বের করা আজকের দিনে কতটুকু সম্ভব, আদৌ সম্ভব কিনা, সেটাও তো ভাবার বিষয়—তাই না?"

"সে তো বটেই," বলল আর্য, "তাছাড়া ধনরত্ন বলতে ঠিক কী বোঝানো হচ্ছে, সেটাও তো স্পষ্ট নয় কবিতাটায়।"

"আহা, তা কেন?" বলে উঠল অরিত্র, "সোনা-দানার কথা তো স্পষ্ট করেই বলা রয়েছে!"

"এটা কিন্তু ঠিক বলেছে অরিত্র।" ঋতম বলল, "'চান্দক সুবর্ণ ধনি' লাইনটার অন্য কোনো মানেই হতে পারে না।"

"আচ্ছা বেশ। তর্কের খাতিরে নাহয় মেনে নিলাম, এখানে চন্দ্রদ্বীপের সোনা বা গুপ্তধনের কথাই বলা হয়েছে।" মাথা নেড়ে বলল শুভমামা, "তাহলেও সেটাকে উদ্ধার করার মতো কোনো স্পষ্ট পথনির্দেশ কবিতাটায় রয়েছে কি?"

ঋতম ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলল, "সেটা অবশ্য গিয়ে না-পড়লে বোঝা মুশকিল। আমার আসলে দেশটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই।"

শুভমামা বলল, "আইডিয়া আমারও নেই। দেড় লাখ বর্গ-কিলোমিটারের কথা যেটা বললাম, সেটাও কাল রাত্রে উইকিপিডিয়া থেকে জানা। অবশ্য আমার এক বন্ধু থাকে ব্যাংককে, আদিত্য গুহঠাকুরতা। কোন একটা কোম্পানির যেন মাথায় বসে আছে। ওর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতেই পারে। কিন্তু যোগাযোগ করেই বা বলবটা কী? আজকালকার দিনে এইসব গুপ্তধনের কথা বললে নির্ঘাত হেসে উঠবে।"

"তেমন কোনো ব্যাপার না-থাকলে খোদ কলকাতা শহরে এই ম্যাসাকার ঘটানোর রিস্ক কেউ নিত বলে কিন্তু আমার মনে হয় না।" আর্য বলল বিধ্বস্ত ঘরটার দিকে তাকিয়ে।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে চার জোড়া চোখ আবার ঘুরে গেল ঘরটার দিকে। একটা ঝড় বয়ে গিয়েছে যেন ঘরটার ভিতরে। মরিয়া খোঁজাখুঁজির চিহ্ন এখনো দগদগে হয়ে আছে।

আগের মতোই দ্বিধান্বিত গলায় শুভমামা বলল, "বেশ! আদিত্যকে একটা ফোন করি, কী বলে শোনা যাক। তোমরা এগোও। তেমন কিছু পেলে আমি ফোন করে দেব। অরু, ওদের নম্বরগুলো আমার ফোনে সেভ করে দিস তো!"

ঋতম নেমে গেল শ্যামবাজারে। নীল অ্যাম্বাসেডর গাড়িতে চড়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আর্য ভাবছিল, ওর কপালটাই এরকম। এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। কোথা থেকে এক আদ্যিকালের পোড়োবাড়ি, তার মধ্যে ব্রহ্মামূর্তি, মূর্তির হাতে গুপ্তধনের সংকেত, অচেনা দুজন মানুষের ঢুকে পড়া—এসব ওর সঙ্গেই ঘটে।

বাড়ি পৌঁছে অবশ্য এসব আর মনে রইল না আর্যর। আজ আর ইউনিভার্সিটি যাওয়া হবে না। কিন্তু একগাদা লেখালেখির কাজ বাকি পড়ে আছে; এই সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে সি.জি. স্যারের কাছে, নইলে নম্বর কমে যাবে। এমনিতেই ইংরেজি নিয়ে পড়ার জন্য বাবা-মার হাহাকারের শেষ নেই, তার উপর রেজাল্ট খারাপ হলে আর দেখতে হবে না।

চট করে স্নান সেরে নিজের ঘরে গিয়ে কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে গেল আর্য। অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করে লাঞ্চ করবে। ততক্ষণে বাবাও হসপিটাল থেকে চলে আসবে, মা চেম্বার সেরে।

দুটো বাজার মিনিট পাঁচেক আগে ওর ফোনটা বেজে উঠল। আননোন নাম্বার। ফোনটা ধরতেই ওপাশ থেকে অরিত্র হড়বড় করে বলল, "শোন না! ছোটোমামা ব্যাংককে ফোন করেছিল। একটা অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল রে! থাইল্যান্ডে একটা ব্রহ্মামন্দির সত্যিই আছে! কয়েক বছর আগে নাকি একটা লোক সেই মন্দিরের মূর্তিটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলেছিল। কেন যে সে এই কাজটা করেছিল, তা জানা যায়নি, কারণ লোকজন ঘিরে ফেলে তাকে মারতে আরম্ভ করে। লোকটা মরে গিয়েছিল কিছু বলার আগেই।"

আর্যর সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। ভারত থেকে অতদূরে ব্রহ্মামন্দির গড়ে উঠল কী করে?

"আমি ছোটোমামার ফোন থেকে কথা বলছি।" বলল অরিত্র, "এই নে, কথা বল।"

একটু পরে ওপাশ থেকে শোনা গেল শুভমামার গলা, "হ্যালো, আর্য?"

একটা ঢোক গিলে আর্য বলল, "হ্যাঁ, বলছি।"

"মনে হচ্ছে একবার থাইল্যান্ড যাওয়াটা দরকার হয়ে পড়ছে। জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। অরু যাবে আমার সঙ্গে। তুমি আর ঋতম ইচ্ছে করলে যেতে পারো।"

আর্য বুঝতে পারল, ওর পা দুটো অল্প অল্প কাঁপছে। বাবাকে হাত করা তেমন কঠিন হবে না। মা রাজি হবে তো?

হঠাৎ ওর চোখে ভেসে উঠল ফিফি থেকে তোলা নীল সাগরের ছবি, প্রকাণ্ড শায়িত বুদ্ধের মূর্তির ছবি। ছেলেবেলা থেকে অসংখ্য সিনেমায় এই দৃশ্য দেখেছে ও। বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই ঘুরে এসেছে ব্যাংকক থেকে।

এবার কি ওদের পালা?

৮

এই শেষ রাতে ওদের রিসিভ করতে আদিত্য যে নিজেই গাড়ি চালিয়ে চলে আসবেন, এটা অবশ্য ভাবেনি আর্যরা। ব্যাংককের বিশাল এবং অসম্ভব আধুনিক 'সুবর্ণভূমি এয়ারপোর্ট' থেকে বেরিয়ে এসে তাই ওরা একটু হকচকিয়ে গেল।

হকচকিয়ে যাওয়ার অন্য একটা কারণ অবশ্য সামনেই দেখা যাচ্ছে। এক অসম্ভব আলোকোজ্জ্বল মহানগর এখন ওদের সামনে। এয়ারপোর্টের সামনের রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ওরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছে, অসংখ্য বহুতল মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও অজস্র গাড়ি বিদ্যুৎগতিতে দৌড়োচ্ছে নিজের নিজের গন্তব্যের দিকে। হাজারো রাজনৈতিক অশান্তি পার হয়ে এক প্রাচীন দ্বীপরাষ্ট্র উঠে দাঁড়াচ্ছে নিজের পায়ে ভর দিয়ে।

আদিত্য গুহঠাকুরতা নামের মানুষটি প্রায় ছ-ফুট লম্বা, টকটকে ফর্সা; এবং হাসিমুখটা দেখলেই বোঝা যায়—ইনি ওরা এসে পড়ায় বেজায় খুশি হয়েছেন। জানা গেল, এঁর বাড়ি বাগবাজারেই। এককালে শুভমামার সঙ্গে বিস্তর ফুটবল পিটিয়েছেন। আপাতত কাজের সূত্রে প্রবাসী হলেও মনেপ্রাণে বাঙালি এবং খাঁটি কলকাত্তাইয়া। এখন তাঁর স্ত্রী আছেন কলকাতাতেই, আদিত্য এখানে একা। একবারও জিজ্ঞেস না করেই দিব্যি বুঝে ফেললেন—ওদের মধ্যে কে আর্য, আর কে ঋতম। অরিত্রকে অবশ্য উনি ভালোভাবেই চেনেন ছোটোবেলা থেকে।

অফিস থেকে পাওয়া ফ্ল্যাটটায় ওদের নিয়ে গেলেন আদিত্য। ভোর হয়ে আসছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কফি খেতে খেতে ওরা এই প্রথম ভিনদেশের এক মহানগরীর জেগে ওঠার দৃশ্য দেখছিল। এমন সময় আদিত্য আর শুভব্রত এসে দাঁড়ালেন ওদের পাশে। আদিত্য বললেন,"আজকের দিনটা বরং রেস্ট নাও তোমরা। দেখেই বুঝতে পারছি, প্লেনে ঘুমোওনি মোটেই।"

আর্য তাড়াতাড়ি বলল, "না না, আমরা বেশ খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছি। একদম ফ্রেশ লাগছে।"

আদিত্য হেসে ফেললেন, "একটা মিনিটও নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না, তাই না? প্রথম প্রথম আমারও এরকম হয়েছিল। সত্যিই খুব প্রাণবন্ত শহর এই ব্যাংকক। তবে ন্যাচারাল বিউটি যদি দেখতে চাও, তাহলে কিন্তু যেতে হবে বাইরে, দ্বীপগুলোতে। গড়পড়তা বাঙালির মতো ব্যাংকক আর পাটায়া ঘুরে চলে গেলে বোকামো হবে।"

ওদের কথাবার্তার মাঝখানে মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো ঋতম বলে উঠল, "আচ্ছা, সেই ব্রহ্মামন্দিরটা এখান থেকে কত দূর?"

একটু থমকে গিয়ে আদিত্য বললেন, "এখান থেকে? খুব বেশি হলে আধঘণ্টা বা মিনিট চল্লিশেক লাগবে।"

"তাহলে তো এখনই একবার ঘুরে আসা যায়!" কফির কাপ হাতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল ঋতম।

"আরে বাবা, এত তাড়ার কিচ্ছু হয়নি!" হেসে উঠলেন আদিত্য, "আজ শনিবার। এমনিতেই রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকবে। খেয়েদেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে নাও। মন্দিরটা খোলার জন্যও সময় দেবে তো একটু, নাকি?"

কথাটা মিথ্যে নয়। জীবনের প্রথম বিদেশ-সফরটা গুপ্তধনের সন্ধানের উত্তেজনায় মাটি করে ফেলাটা ঠিক হবে না। কাজেই ওরা গেল ফ্রেশ হয়ে নিতে। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোনোই ভালো।

তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল এবার ঋতমের দিকে।

শুভমামা বসে পড়ল ড্রয়িংরুমে। বহুদিন পর দেখা হয়েছে ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে, গল্পগুজব হবে না?

স্যান্ডউইচ আর অমলেট দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারতে সারতেই আর্য খেয়াল করল, শুভমামার মুখটা একটু যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে। এটা অবশ্য ঘটনা, কাল রাতে ওরা কেউই ঘুমোয়নি এক ফোঁটাও। কিন্তু তাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ার মতো মানুষ বলে তো শুভমামাকে মনে হয়নি! অবশ্য কতটুকুই বা পরিচয় ঘটেছে মানুষটার সঙ্গে!

আর্য বুঝতে পেরেছিল, ওইসব গুপ্তধনের কথা বাড়িতে বললে থাইল্যান্ডে যাওয়ার পারমিশন পাওয়া যাবে না—এমনিতেই ওরা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না-হয়ে ইংরেজি নিয়ে পড়াশুনো করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাড়ির লোকজন চটেই থাকে সারাক্ষণ। তার উপর এইসব উড়নচণ্ডীপনার ইতিবৃত্ত শুনলে একেবারে ঘরে আটকে রেখে দেবে! কাজেই অরিত্রর মামার সঙ্গে খুব সামান্য খরচে ব্যাংকক ঘুরে আসার একটা সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে—এইসব বলে বহু কষ্টে জোগাড় করেছিল পারমিশন এবং খরচ। ঋতমেরও একই অবস্থা হয়েছিল। এ-যাত্রায় বরং অরিত্রই দিব্যি নিজের মামার দৌলতে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনের প্রথম বিদেশযাত্রা করে ফেলল।

কাজেই যে কারণে এখানে আসা, তার পাশাপাশি ঘোরাঘুরির সুযোগটাও ওরা কেউই ছাড়তে রাজি হয়নি। শুভমামাও কখনও থাইল্যান্ডে আসেনি। আদিত্যকে বলে আগে থেকেই নাকি কোথায় কোথায় যাওয়ার ব্যবস্থা করেই রেখেছে শুভমামা।

ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে অরিত্রই জিজ্ঞেস করল, "ছোটোমামা, তোমার কি শরীরটা খারাপ লাগছে?"

একটু অবাক হয়ে শুভব্রত জিজ্ঞেস করল, "না! কেন বল তো?"

"না—একদম চুপচাপ হয়ে গেলে—!"

শুভমামা সত্যিই গম্ভীর হয়ে গেল। কাচের জানলা দিয়ে ব্যাংককের আকাশরেখার দিকে তাকিয়ে বলল, "আসলে কী জানিস, আমরা এসেছি প্রায় সাড়ে চারশো বছরের পুরনো একটা ঘটনার রেশ ধরে যদি কিছু পাওয়া যায়—তার খোঁজে। এখানে এসে যেটুকু যা বুঝলাম, সেই অতীতের সুবর্ণভূমির সঙ্গে আজকের থাইল্যান্ডের প্রায় কোনো সম্পর্কই নেই! তুইই বল্, এই অত্যাধুনিক শহরে সেই পুরনো সূত্র টিকে থাকার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে কি? এখন মনে হচ্ছে, ঝোঁকের মাথায় এভাবে দৌড়ে না-এলেই বোধহয় ভালো হত রে!"

আদিত্য বললেন, "কথাটা একেবারে মিথ্যে বলিসনি। সিয়াম—মানে শ্যামদেশের স্বর্ণযুগের নিদর্শন এখন আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। তোরা যে সময়ের কথা বলছিস—মানে ধর সাড়ে চারশো বছরের পুরনো—সেই সময়টাকেই সিয়ামের স্বর্ণযুগ বলে বটে। আয়ুথায়া রাজ্য তখন পৃথিবীর সবচাইতে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোর অন্যতম; ইনফ্যাক্ট কেউ কেউ বলেন, সতেরোশো সাল নাগাদ আয়ুথায়া ছিল দুনিয়ার সেরা শহর। সেই আমলেও এখানে দশ লাখ লোক বাস করত, ভাবতে পারিস?"

আর্য মন দিয়ে শুনছিল—এবার ভুরু কুঁচকে বলল, "আয়ুথায়া শব্দটা কেমন শোনা শোনা লাগছে না?"

"তা তো লাগবেই!" হেসে উঠলেন আদিত্য, "অযোধ্যার থাই সংস্করণ কিনা!"

"ওহো! এইজন্যই—!" বলে বড়ো বড়ো চোখে ঋতম আর অরিত্রর দিকে তাকাল আর্য—

"গোটা সাউথ-ইস্ট এশিয়াতেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব পড়েছিল...ছিল বলছি কেন—আছে এখনও। মুশকিল হল, সতেরোশো সাতষট্টিতে বার্মিজরা আয়ুথায়া শহরটাকে ধ্বংস করে দিল, মানে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই পুড়িয়ে ছাই করে দিল। এখন সেই ধ্বংসস্তূপ বেড়ানোর জায়গা হয়ে গিয়েছে ন্যাচারালি। সেখানে অজস্র মুণ্ডহীন মূর্তি আছে, কিছু পুরনো মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই বৌদ্ধধর্ম-রিলেটেড। ব্রহ্মামূর্তির প্রশ্ন ওঠে না।"

"আরো একটা সমস্যা আছে।" বলল শুভমামা, "আয়ুথায়া একেবারেই ল্যান্ডলকড্ জায়গা। ধারেকাছেও কোথাও সমুদ্র নেই।"

অরিত্র একটু নড়ে বসে বলল, "তাতে কী সমস্যা হল?"

শুভমামা ফিকে হাসল, "কবিতাটা ভুলে গেলি? চতুরানন শ্যামল সাগরের কূলে আছেন না?"

"ও, হ্যাঁ!" বলে অরিত্র ছাতের দিকে তাকিয়ে রইল।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল শুভমামা। মুখটা গম্ভীর। বলল, "বুঝলি আদি, এই ছেলেগুলোকে এভাবে হুড়ো দিয়ে নিয়ে এসে মনে হয় ভালো করলাম না। আসলে পুরনো একটা মূর্তির হাতে একটা ধাঁধা পেলাম। সেটা ডিকোড করে ফেললাম সবাই মিলে। মনে হল, এটা একটা গুপ্তধনের কথা বলছে; ব্যস! মাথায় পোকা নড়ে উঠল! আর এরাও তেমনি! উঠল বাই তো ব্যাংকক যাই! এবার? এত বড়ো একটা দেশ, সাড়ে চোদ্দশো দ্বীপ আছে! খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজে বেড়াব চারজন মিলে? ধুত!"

আর্য বুঝতে পারছিল, আসলে এই বিশাল শহরটাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েই শুভমামা নার্ভাস হয়ে গেছে। ও বলল, "কী জ্বালা! আমরা কি শুধু একটা গুপ্তধনের সন্ধানেই এসেছি? এত সুন্দর একটা দেশ, কত কী দেখার আছে—সেগুলো কি কিছুই নয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, একটা ব্রহ্মামূর্তি তো রয়েছে আমাদের হাতের কাছেই! সেটা দেখে আসা যাক আগে! তারপর না হয় ভাবা যাবে, কী করা যায়!"

এতক্ষণে নড়েচড়ে বসে ঋতম বলল, "সেটাই তো! আপাতত এটা তো দেখে আসি! যদি কিছু চোখে পড়ে যায়?"

কিছুক্ষণ দুই বন্ধুর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে হাত দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিল শুভমামা। ঘন চুলের ভিতর দিয়ে আঙুল চালিয়ে নিয়ে হেসে বলল, "চলো তবে, দেখেই আসি। আসলে তোমাদের এতটা সময় নষ্ট হল, একগাদা টাকা—"

"টাকা তো অরিত্র দিয়ে দেবে বলেছে!" বলে উঠল আর্য।

"এই খেলে যা!" লাফিয়ে উঠল অরিত্র, "আমি আবার এসব কখন বললুম!"

"ওই দ্যাখ, ঋতম! যেই টাকার কথা বলেছি, অমনি ব্যাটার আসল ভাষা বেরিয়ে গেছে! 'বললুম', অ্যাঁ?"

অনেকক্ষণ পর হো হো করে হেসে উঠল শুভব্রত। তারপর বলল, "চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি! আদি, তুই যাবি তো আমাদের সঙ্গে, নাকি?"

আদিত্যও অরিত্রর লম্ফঝম্প দেখে হাসছিলেন। বললেন, "যাব বইকি! দাঁড়া, টুক করে চেঞ্জ করে নিই।"

প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের জার্নির পুরোটাই ওরা হাঁ করে দেখল একটা অসম্ভব শক্তিশালী মহানগরীর চালচিত্র। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, শপিংমল, মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেনলাইন, ফুটপাথে অজস্র ফুলগাছ; সবকিছুই দেশটার চমৎকার স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত দিচ্ছে—মাঝেমাঝেই রাস্তার পাশে খানিকটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে স্ট্রিটসাইড রেস্টুরেন্ট, তার খাবারদাবার দেখলে পেটরোগা মানুষেরও মরিয়া হয়ে উঠতে ইচ্ছে হবে। সব মিলিয়ে, যাকে বলে জমজমাট প্রাণবন্ত শহর।

কিন্তু ব্রহ্মামন্দিরে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল নৈরাশ্য।

রেলিং-ঘেরা মন্দিরটা খুবই যত্নে আছে। চত্বরের মাঝখানে উঁচু বেদির উপর চতুরানন ব্রহ্মার সোনালি মূর্তিটা ফুলে ফুলে ঢাকা। লোকজনের ভিড়। সবকিছুই একেবারে নতুন। তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনো সূত্র, বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত খুঁজে পেল না চার জোড়া উৎসুক চোখের সন্ধানী দৃষ্টি। উলটে বেরিয়ে এসে পুলিশের খপ্পরে পড়ল ওরা; এতক্ষণ ধরে মূর্তিটাকে এইভাবে দেখার ব্যাপারটা তাদেরও চোখ এড়ায়নি। 'থাই সংস্কৃতিতে হিন্দু প্রভাব' বিষয়ে গবেষণার অজুহাতে ব্যাপারটা অবশ্য মিটে গেল দ্রুতই—বরং আবারও শুনতে হল, কীভাবে বছর পনেরো আগে একজন হাতুড়ির আঘাতে আসল মূর্তিটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। জনগণের রোষে সেই লোকটি মারা যায়। এই মূর্তিটা তারও পরে তৈরি।

এত আধুনিক মূর্তি থেকে কীই বা সূত্র পেতে পারত ওরা?

সম্ভবত ওদের ভেঙে-পড়া চেহারা দেখেই আদিত্য বললেন, "শোন্ শুভ! এখানে সমস্ত শপিংমলেই ফুডকোর্ট থাকে। কিন্তু আমি বলি কী; আজ আমার সঙ্গে স্ট্রিটফুড খাবি চল্। সারাদিন মুখে লেগে থাকবে স্বাদ।"

থাই-ফুডের খ্যাতি এমনিতেই বিশ্বজোড়া। তার উপর ব্যাংককের স্ট্রিট-ফুড এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা—ওরা মলিন হেসে গাড়িতে উঠে পড়ল। ব্যাপারটা নাকের বদলে নরুণের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

খেতে খেতে অবশ্য ওদের ভেঙে-পড়া মন আপনিই চাঙ্গা হয়ে গেল। অক্টোপাস, স্কুইড, এক ধরনের প্রকাণ্ড তেলাপিয়া-জাতীয় লালচে মাছ, আরো যা যা পাওয়া যায়—সব নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল ওরা। দুই সারি বাড়ির মাঝখানের জায়গাটুকু সামিয়ানা দিয়ে ঢেকে নিয়ে চলছে রান্নাবান্না, তারই একপাশে চেয়ার-টেবিল পেতে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা। অসম্ভব সস্তা সমস্ত খাবার। টেবিল ভর্তি করে ফেলল ওরা। অরিত্র সাহস করে এক প্লেট করে ঝিনুক আর শামুকও নিয়ে এল। কেমন অদ্ভুত একটা স্বাদ; আর্য খেতেই পারল না, ঋতম ওয়াক তুলে মুখ ধুয়ে এল উঠে গিয়ে।

খেতে খেতেই আর্য বলল, "এখন আমরা কোথায় যাব?"

মাথা নীচু করে খাচ্ছিল শুভমামা। হঠাৎ বলল, "আমাদের আরো ভেবে, খোঁজখবর নিয়ে রওনা দেওয়া উচিত ছিল।"

আদিত্য কথাটা না-শোনার ভান করে বললেন, "আরো বেশ কয়েকটি মন্দির আছে ব্যাংককে। অধিকাংশই বুদ্ধের। দেখে নাও সেগুলো আগে। সন্ধ্যায় সিয়াম 'প্যারাগন' নামের একটা বিশাল মল-এ নিয়ে যাব, সেখানে অপূর্ব একটা মেরিন-অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। মাথার উপর দিয়ে হাঙর সাঁতরে যাচ্ছে; দেখতে পাবে!"

"আমরাই কি জলের নীচে থাকব নাকি?" চোখ বড়ো বড়ো করে বলল ঋতম, "আমি কিন্তু সাঁতার জানি না!"

"আরে না না! তোমাদের জলে নামতে হবে না! এমনভাবেই তৈরি অ্যাকোয়ারিয়ামটা, যাতে তোমার চারপাশেই জল থাকবে, মাছ থাকবে—মাঝে তুমি।"

"আচ্ছা, কাল যদি একটা বাস ধরে ফুকেত চলে যাই?" হঠাৎ বলে উঠল শুভমামা।

"আজ ব্যাংককে পৌঁছে কালই ফুকেত?" বললেন আদিত্য, "দুটো দিন ঘুরে দ্যাখ সবকিছু! আয়ুথায়া দেখবি না?"

"এক কাজ করি, শোন্ আদি।" মনে হল, এইবার শুভমামার মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গিয়েছে, "আমরা আগে সমুদ্রের দিকটা একটু ঘুরে আসি। ফুকেত থেকে অনেক দ্বীপে যাওয়া যায়, ক্রাবি, ফিফি—"

আর্যর বুঝতে অসুবিধে হল না, শুভব্রতর মাথায় নীল জলের কথাটাই ঘুরছে। স্বাভাবিক। 'সমুখক নীলমণি বারি!'

"দ্বীপগুলো ঘুরে আমরা তোর ফ্ল্যাটে এসে উঠব আবার, বুঝলি!" বলে চলল শুভমামা, "তারপর ভালো করে ঘুরে দেখব ব্যাংকক শহরটা। কেনাকাটাও তো করতে হবে, নাকি? নইলে বউদিরা আর দিদিরাই আমাকে পিস পিস করে কেটে ফেলবে। যা একখানা ফ্যামিলি আমার!"

অরিত্র গম্ভীর হয়ে বলল, "কথাটা ফিরে গিয়ে মার কানে তুলতে হবে রে আর্য, মনে রাখিস!"

চট করে ওর দিকে ঘুরে বসে শুভব্রত বলল, "পারবি তুই, অরু? পারবি এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে? বেশ, ফুকেতে তোকে আমি ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে খাওয়াব!"

অরিত্র অবাক হয়ে বলল, "আছে নাকি ওখানে? কবে থেকে আমার নাপোলেতানা পিজ্জা আর রিসত্তো খাওয়ার শখ!"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে শুভমামা বলল, "আমি কী করে জানব? আমি কি ফুকেতে গেছি এর আগে কখনও?"

"যাচ্চলে! তাহলে লোভ দেখাচ্ছ কেন?" বলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে চোখ গোল্লা করে বলল, "ওরে আর্য, দেখে নে! ল্যাম্বার্গিনি!!"

সত্যিই একটা ল্যাম্বার্গিনি এসে দাঁড়িয়েছে ফুটপাথে। এখানকার লোক বোধহয় হামেশাই এসব দ্যাখে। কেউ বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না।

গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আর্য কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল।

ফুটপাথে পার্ক করা জেল্লাদার গাড়িটার পাশ দিয়ে খুব আস্তে আস্তে, এদিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে দুজন মানুষ। তাদের পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট, পিঠে ব্যাকপ্যাক। দেখলেই বোঝা যায়, তারা স্থানীয় মানুষ নয়। তামাটে গায়ের রং। খুব সম্ভবত ভারতীয়।

তাদের একজন অন্তত সাত ফুট লম্বা। অন্যজন মেরেকেটে পাঁচও হবে না।

আর্য চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেল।

চোখের পলক ফেলতে ভুলে যাওয়ার অন্য কারণটা অবশ্য ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল। সেই অকল্পনীয় দৃশ্য যখন বাস্তবেই সামনে এল, তখন আক্ষরিক অর্থেই তিন বন্ধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

জলের রং এমন হয় নাকি?

গত বছর আন্দামানে গিয়ে যে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটাই ওদের স্মৃতিতে বেশি ছাপ ফেলে গিয়েছে—এবার সুদূর থাইল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে, ফুকেতের সোনালি সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে ওদের মনে পড়ল, নীল আইল্যান্ডের সীতাপুর বিচ থেকে সমুদ্রের জলের রং দেখে অরিত্র বলেছিল, "এ যা জলের রং, বুঝলি আর্য, পেনে ভরে নিলে দিব্যি লেখা যাবে।" আর্য আর ঋতম, দুজনেই মাথা নেড়ে স্বীকার করে নিয়েছিল, এর চাইতে লাগসই তুলনা আর হয় না।

এখানে ব্যাপারটা আরো মারাত্মক, কারণ প্রকৃতি এমনিতেই সব সাজিয়ে রেখেছিল, মানুষ তাকে সযত্নে আরো সুন্দর করে তুলেছে। সমুদ্রের কূল বরাবর এঁকেবেঁকে চলে গেছে ঝকঝকে রাস্তা। তার ডানপাশে পরপর ঝাঁ-চকচকে সব আলিশান হোটেল আর রেস্টুরেন্ট। কয়েক পা হেঁটেই ওরা বুঝতে পারল, দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নেই, যেখানকার কুইজিন এখানে মিলবে না। থাই কুইজিন এমনিতেই জগৎ বিখ্যাত। এখানে তাছাড়াও রয়েছে ইউরোপের তাবৎ দেশের খানাপিনার বাদশাহি আয়োজন। এক পলকেই বুঝে ফেলা যায়, সারা দুনিয়ার পর্যটক এই শহরে আসেন, এবং আপন আপন দেশের স্বাদগন্ধে মজে থাকেন ইচ্ছামতো।

অরিত্র একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "নিতান্ত গাধা ছাড়া এখানে কেউ আমাদের মতো দু-দিনের জন্য আসে না রে! এক মাস থাকে, সবকটা রেস্টুরেন্টে খায়, তারপর বাড়ি গিয়ে আবার জিম করতে আরম্ভ করে ওজন কমানোর জন্য।"

আর্যও দস্তুরমতো ভড়কে গিয়েছিল। এরকম হোটেল বা রেস্টুরেন্ট, কোনোটাই ব্যাংককে চোখে পড়েনি ওদের—তবু মনে জোর এনে বলল, "অরিত্র, একজন ট্যুরিস্টও তোর মতো হাঁ করে রেস্টুরেন্টের দিকে তাকিয়ে নেই রে! সব্বাই সমুদ্র দেখছে। জলের রং দেখেছিস?"

"তুই ওই সাইনবোর্ডটা দেখেছিস? ইজরায়েলি ফুড! ভাবা যায়?" চোখ গোল গোল করে বলল অরিত্র।

ঋতমও অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিল। এবার বলল, "আর্য, অরিত্রকে একটু সামলে চলিস—ফস করে কোথায় না কোথায় ঢুকে খেতে বসে যাবে, তারপর আমাদের বাসন মেজে মরতে হবে—ওর হাত ছাড়িস না খবরদার!"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশের বিচিত্র জনতার মিছিল দেখে নিচ্ছিল শুভব্রত। এইবার ওদের কাছে এসে বলল, "কী হে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, কেমন দেখছ ফুকেত?"

আর্য বলল, "শুভমামা, একটু লক্ষ করলে বোধহয় সারা পৃথিবীর লোক দেখতে পাওয়া যাবে এই রাস্তাটুকুর মধ্যে, তাই না?"

"আর লক্ষ না-করেও সারা পৃথিবীর কুইজিন এমনিতেই দেখা যাচ্ছে, তাই না?" বলল অরিত্র।

"হুঁ, এটাও নেহাৎ মিথ্যে নয়।" রাস্তার পাশের সাইনবোর্ডগুলোর উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল শুভমামা।

"কিন্তু এখানে অন্তত সাড়ে চারশো বছরের পুরনো কিস্যু মিলবে না, এই কথাটা গ্যারান্টি সহকারে বলা যায়।" ঋতম বলল।

অরিত্র রেগেমেগে ঘুরে দাঁড়াল ওর দিকে, "আরে এ ছোঁড়া তো বর্তমানে এসেই পৌঁছোচ্ছে না রে বাবা! ওরে পাগল, স্বয়ং স্বামীজি বলে গিয়েছেন—জিভে প্রেম করে যেইজন—"

"তবে রাস্তার এইপাশটাও নেহাৎ মন্দ নয়, কী বলো তোমরা? গুপ্তধন না-পেলেও খুব ক্ষতি কিছু হবে বলে তো মনে হচ্ছে না!"

এতক্ষণে ওরা সত্যিই মন দিল অন্যদিকে। সোনালি সমুদ্রসৈকতে অচেনা সব গাছপালা, যদিও শিকড়-বেরিয়ে-থাকা গাছগুলো যে আদতে ম্যানগ্রোভ, সে আর বলে দিতে হয় না। আন্দামানে বা সুন্দরবনে এই গাছ বিস্তর দেখেছে ওরা। ঝকঝকে নীল আকাশ যেন উপুড় হয়ে পড়েছে ঘন নীল সমুদ্রের উপর; কার রং বেশি নীল—হলফ করে বলাই মুশকিল। দূরে দেখা যাচ্ছে; পাহাড়ের সারি অনধিকারীর মতো ঢুকে পড়েছে সমুদ্রের মধ্যে, যেন এই প্রথম সে সুযোগ পেয়েছে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে নেওয়ার! ঝকঝকে সাদা ইয়ট রাজহাঁসের মতো ভেসে আছে জলে। আর সেই জলের রং... আহা! আরো দূরে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে অন্য সব দ্বীপের সবুজ রেখা।

বেশ খানিকক্ষণ পরে প্রথম মুখ খুলল অরিত্রই, "নাঃ! মেনে নিতেই হচ্ছে, আন্দামানকে টেক্কা দিতে পারে থাইল্যান্ড।"

আর্য সামান্য রেগেমেগে বলল, "অমনি! দেশের বাইরে এলেই সব যেন বেশি সুন্দর লাগে, তাই না?"

অরিত্র অবিচল গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "ওখানে ওই ইয়টটা ছিল না।"

রাগতে গিয়েও হেসে ফেলল আর্য, "যত্তসব! চল, জলের কাছে যাই। খবরদার অরিত্র, জলে নামার ধান্দা করলে কিন্তু আজ আমি শিওর তোকে এখানে রেখে দিয়ে ওই ইয়ে...নামটা পড়তে পারছি না...ওই ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টে ঢুকে খেতে বসে যাব।"

জল দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা সাংঘাতিক প্রবণতা আছে অরিত্রর—আপাতত অবশ্য হেসে উঠল ও, "ধুর! ঢেউ না-থাকলে সমুদ্রে স্নান করে মজা নেই। শুনলে অবিশ্যি তোরা মারতে আসবি; স্নানের ব্যাপারে এর চেয়ে আমাদের পুরী ভালো!"

ঋতম বলল, "এই একটা খাঁটি কথা বলেছিস—অনেক জায়গাতেই দেখেছি, ইউরোপ-আমেরিকার মানুষেরা জাস্ট সমুদ্রে গলা অবধি ডুব দিয়ে বসে থাকে—কী যে আনন্দ পায় এতে—ভগবান জানে!"

শুভমামা ওদের পিছনে পিছনে হাঁটছিল সব কথা শুনতে শুনতে। এখন বলল, "ভারতীয়রা ডাঙায় ঝিমোয়, জলে লম্ফঝম্প করে—ওরা জলে নামে ঝিমোতে, ডাঙায়—হেঁ হেঁ, তবেই না বারো আনা দুনিয়া দখল করে বসে আছে আজও!"

"এইটে একেবারে খাঁটি কথা বলেছ।" ঘাড় নেড়ে আর্য বলল, "আমি শুধু কেমিস্ট্রি ক্লাসে ঝিমোতাম। এখন সেরে গেছি।"

বিশাল লম্বা বিচ, যেন বা সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকে আসা অজস্র মানুষের পাশ কাটিয়ে হাঁটছিল ওরা। প্রকৃতির রূপ যেন ঝলসে উঠছে চারিদিকে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে অরিত্র খুব মিহি সুরে বলল, "আমি একটা কথা বলতে চাই।"

শুভব্রত একটু অবাক হয়েই বলল, "এ ছোঁড়ার হল কী? কথা বলার আগে অনুমতি নিচ্ছে!"

অরিত্র অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, "না, মানে—সত্যিই খুব সুন্দর জায়গা, বুঝলে। কিন্তু—আবার যদি আমরা ইয়ে—রাস্তাটার ওই পাশ বরাবর ফিরি?"

আর্য হো হো করে হেসে উঠল, "চলো শুভমামা, বিচ থেকে রাস্তায় গিয়ে উঠি। না-ই বা ঢুকলাম, অন্তত সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও অরিত্র একটু ঠান্ডা থাকবে।"

ওরা ততক্ষণে রাস্তাটা থেকে বিচ পেরিয়ে জলের কাছাকাছি চলে এসেছিল। যেখান থেকে এই রাস্তাটা সমুদ্রের পাড়ে এসে পড়েছে, সেখান থেকেও অনেকটা সরে এসেছে ওরা। শুভমামা বলল, "এমনিতেও কথাটা অরু খারাপ কিছু বলেনি, বুঝলে—বেলা আড়াইটে বাজে। খিদেও পেয়ে গেছে। তাছাড়া এইবার খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা প্ল্যান সাজাতে হবে—প্রাচীন থাইল্যান্ডের চিহ্ন এদিকে কিছু আছে কিনা, থাকলে কীভাবে যাওয়া যায়, কাছে-পিঠে মন্দির—মানে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির কোথায় আছে—এগুলোও খোঁজ নিতে হবে। কাজেই চলো, যাওয়া যাক, কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েই বসি।"

ঋতম বলল, "আমার ধারণা, প্রাচীন থাইল্যান্ডের কোনো চিহ্ন এ-সব দিকে মিলবে না। ট্যুরিজম জমে ওঠার পর থেকে এইসব জায়গাগুলো ঝড়ের বেগে বদলে গেছে—কাজেই আমাদের যেতে হবে সেইসব জায়গায়, যেখানে বহুকাল থেকেই স্থানীয় মানুষেরা বসবাস করে আসছেন।"

"আর ওই হিন্দুমন্দির-বৌদ্ধমন্দির—ওসব না-ভাবাই ভালো", বলল শুভমামা, "যে যখন বলবান হয়, সে-ই অন্যের মন্দির দখল করে নেয়। কাজেই পুরনো কোনো বৌদ্ধমন্দির খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে যদি সেখানে আরো পুরনো কোনো হিন্দুমন্দিরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অবাক হওয়ার কিচ্ছু নেই। আবার উলটোটাও হামেশাই দেখা যায়।"

কথা বলতে বলতে বালি পেরিয়ে ওরা উঠে এল রাস্তায়। মূলত হাঁটাহাঁটি করারই জায়গা এটা, যদিও প্রচুর জমকালো গাড়ি পার্ক করা আছে বিচের পাঁচিল ঘেঁষে। সারা বিশ্বের ধনী পর্যটকদের কাছে ফুকেত একটা অসম্ভব জনপ্রিয় ডেস্টিনেশন, প্রতি পদক্ষেপে গোটা এলাকাটা যেন তারই বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে।

রাস্তায় ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে আর্য বুঝতে পারল, ওর হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। বোধহয় জুতোর মধ্যে কাঁকর ঢুকে গিয়েছে। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ও জুতোটা খুলল। উলটো করে ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে ফের চোখ তুলল ও। শুভমামা, অরিত্র আর ঋতম ইতিমধ্যে এগিয়ে গিয়েছে বেশ খানিকটা। ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামল ওরা। ওদের ধরবে বলে পা বাড়াতে গেল ও, আর তখনই আর্যর চোখে পড়ল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

বিচের পাঁচিলের পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলোর মধ্যে একটা কালো গাড়ি, কাচ তোলা, ধীরগতিতে উঠে এল রাস্তায়। পরক্ষণেই গর্জন করে উঠল শক্তিশালী ইঞ্জিন, থরথর করে কেঁপে উঠল গাড়িটা—তারপর বিদ্যুদ্বেগে ধেয়ে গেল পথচারীদের ভিড়ের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না-করে সামনের দিকে। চমকে উঠে লাফ দিয়ে সামনে থেকে সরে যাচ্ছেন নানা দেশ থেকে আসা পর্যটকরা। কিন্তু আর্য যেটা দেখে ভয় হিম হয়ে গেল সেটা হল, গাড়িটা সোজাসুজি উল্কার বেগে ধেয়ে যাচ্ছে অরিত্রদের দিকেই! কথা বলতে বলতে হালকা পায়ে রাস্তাটা পেরোচ্ছে ওরা।

অপরিসীম আতঙ্কে এক মুহূর্তের জন্য আর্যর ইচ্ছে হল চোখ বন্ধ করে ফেলতে, কিন্তু সেটা করে উঠতে পারল না ও। সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে রইল রাস্তাটার দিকে।

সম্ভবত পথচারীদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে শেষ মুহূর্তে সংবিৎ ফিরল ওদের। ততক্ষণে গাড়িটা ওদের প্রায় ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে। প্রচণ্ড লাফে ধাবমান গাড়িটার সামনে থেকে ছিটকে গেল ওরা তিনজন, হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল ফুটপাথের উপর; আর প্রায় ওদের ছুঁয়ে দিয়ে যেন উড়ে বেরিয়ে গেল গাড়িটা!

গোটা ব্যাপারটা এমন চোখের পলকে ঘটে গেল যে, আর্য নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। পরমুহূর্তেই ওর চোখে পড়ল, তখনো ফুটপাতের ওপর পড়ে আছে ওরা তিনজন। ঝড়ের বেগে ছুটে গেল আর্য। ততক্ষণে গাড়ি-চলাচল, লোকের হাঁটাহাঁটি—সব থেমে গিয়েছে। এক দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে ফুটপাতে এসে চিৎকার করে উঠল আর্য, "শুভমামা, তুমি ঠিক আছ? অরিত্র—ঋতম! আর ইউ ওকে? লেগেছে কোথাও?"

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ওরা তিনজন। না, চোট লাগেনি কারো। প্রাণ বেঁচে গেছে কোনোক্রমে। শুধু অরিত্রর প্যান্টের নীচের দিকটা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। তখনো হাঁপাচ্ছে ওরা তিনজন, চোখেমুখে লেগে আছে নিশ্চিত মৃত্যুভয়।

ততক্ষণে একটা ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে ওদের কেন্দ্র করে। নানা ভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করে চলেছে সকলে। অধিকাংশেরই মত, গাড়িটা ব্রেক-ফেল করেছে। কালচে-খয়েরি রঙের পোশাক পরা স্মার্ট চেহারার ট্রাফিক পুলিশ এসে পড়ল। এইবার বোঝা গেল, গাড়ির নম্বর কেউ লক্ষ করেনি। তবুও কী সব লিখে-টিখে নিয়ে চলে গেলেন পুলিশ ভদ্রলোক।

সবচাইতে কাছের রেস্টুরেন্টে ঢুকে, একটা চারজনের টেবিলে গিয়ে বসে পড়ল ওরা ধপ করে। তার আগে অবশ্য হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হল ভালো করে। জামাকাপড়ে এখনও ধুলো লেগে আছে। সেসব হোটেলে গিয়ে দেখতে হবে।

আর্যর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে শুভমামা হাসল, "আরে ইয়ং ম্যান! এত অল্পেই ঘাবড়ে গেলে হবে? রাস্তাঘাটে হাঁটতে গেলে ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে, কী বলিস, অরু?"

গ্লাসের পরোয়া না-করে বোতল থেকেই ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল আর্য। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, "এটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না শুভমামা।"

এইবার ওরা তিনজনেই চমকে উঠে তাকাল ওর দিকে,"মানে?"

ওইরকমই খসখসে গলায় আর্য বলল, "আমি তো উল্টোদিক থেকে দেখেছি সবটা। গাড়িটা চালাচ্ছিল একটা প্রকাণ্ড লম্বা লোক, আর তার পাশের সিটে বসে ছিল যে, তার হাইট পাঁচ ফুট হবে না।"

"বুঝলাম, কিন্তু তাতে কী হল? মানে...একটা গাড়িতে একটা বেঁটে আর একটা লম্বা লোক থাকলে তাদের গাড়ি ব্রেক-ফেল করতে পারে না, এমন তো কোনো নিয়ম নেই! তুই এত ঘাবড়ে গেলি কেন?" বলল অরিত্র।

"কারণ এই লোক দুটোকে আমি ব্যাংককেও দেখেছি!"

"তাতেই বা কী হল? একটা লম্বা লোকের কি একটা বেঁটে বন্ধু থাকতে নেই? কী মুশকিল! অরিত্রই তো আমার চাইতে এক বিঘত লম্বা। তাতে কী?" কথাটা বলে ঋতম জোর করে একটু হাসি টেনে আনল মুখে।

আর্য হাসল না। কয়েক সেকেন্ড ফাঁকা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "কলকাতায় গণেশদাকে অ্যাটাক করেছিল যে লোক দুটো, তাদের কথা মনে নেই তোদের? পরদিন সকালে গণেশদা কী বলেছিল, ভুলে গেলি এত তাড়াতাড়ি?"

এতক্ষণে এই অদ্ভুত জুটিটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে চমকে উঠল ওরা—"কী বলছ আর্য! আর ইউ শিওর?" আর্যর মতোই ফিসফিস করে বলল শুভমামা।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল আর্য—বলল, "আমি শিওর; এরা কলকাতা থেকেই আমাদের পিছু নিয়েছে।"

ঋতম আর অরিত্রর মুখ থেকে এইবার মুছে গেল হাসির রেখা। অবিশ্বাসের চোখে আর্যর দিকে তাকিয়ে থেকে ঋতম বলল, "এরা—মানে কারা?"

উত্তর না-দিয়ে চুপ করে থাকল আর্য। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকাল সমুদ্রের দিকে, "কিছু একটা মস্ত ব্যাপার ঘটতে চলেছে, শুভমামা। আমরা অজান্তেই কোনো বড়ো ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি।"

একটা অস্বাভাবিক নীরবতা নেমে এল ওদের টেবিলে—একটা সংকেতের পিছু নিয়ে থাইল্যান্ডে এসে পড়েছিল ওরা—খানিকটা ঝোঁকের বশেই। এসে মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা বুনো হাঁসের পিছনে দৌড়োনোর মতো হয়ে গেছে। মনটা তখন ঘুরে গিয়েছিল বেড়ানোর দিকে। সুন্দর দেশ, নীল সমুদ্র, সবুজ পাহাড়! বেশ তো, ঘুরেফিরে দেখে-টেখে ফিরে যাব!

কিন্তু এবার আর ব্যাপারটা শুধু বেড়ানোর পর্যায়ে থাকছে না—আর্য যা বলল, তা যদি সত্যি হয়—

শুভমামাই প্রথম নীরবতা ভেঙে বলল, "শোনো আর্য। যদি ব্যাপারটা সত্যিই এমন হয়, তাহলে মেনে নিতে হচ্ছে, দুজন অত্যন্ত বেপরোয়া ধরনের মানুষ আমাদের পিছনে লেগেছে, এবং সেটা কলকাতা থেকেই—ওই পিছনের বাড়ি থেকে ওরা বোধহয় ব্রহ্মামূর্তিটাই চুরি করতে চেয়েছিল। ঘটনাচক্রে সেদিনই আমরা গেলাম ওই বাড়িতে, এবং হঠাৎ করে গণেশের মুখোমুখি হয়ে গিয়ে তারা নার্ভাস হয়ে গেল। গণেশের মাথায় বাড়ি মেরে তারা পালাল! এদিকে আমরা কিছু না-জেনেই ব্রহ্মামূর্তিটা নতুন বাড়িতে নিয়ে চলে এলাম, তার থেকে একটা সঙ্কেতও পাওয়া গেল। সেই সঙ্কেতের পিছু নিয়ে থাইল্যান্ডে চলে এলাম আমরা। এই তো দাঁড়াচ্ছে গল্পটা?"

ফ্যাকাশে মুখে মাথা নাড়ল আর্য। হ্যাঁ, এমন একটা কিছুই ঘটে থাকবে—

ঋতম খুব ঠান্ডা গলায় বলল, "একটা প্রকাণ্ড প্রশ্ন কিছু থেকেই যাচ্ছে।"

তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল এবার ঋতমের দিকে। ওর ভুরু কুঁচকে আছে, মুখটা থমথমে। "আমরা যে মূর্তির মধ্যে থেকে একটা কবিতা পেয়েছি, কবিতাটার পাঠোদ্ধার করতে পেরেছি, একটা যাহোক নিশানাও উদ্ধার করেছি...মানে অন্তত কিছুটা, সেটা এরা জানবে কী করে? আমরা তো কাউকে ঢাক পিটিয়ে বলতেও যাইনি, আর ফেসবুকে প্লেনের ছবি সাঁটিয়ে 'গোইং টু থাইল্যান্ড উইথ কিউটি প্রিয়া অ্যান্ড নাইনটি নাইন আদার্স' বলে বিজ্ঞাপনও দিইনি!"

"আহা, আমরা তো আর লুকিয়ে থাইল্যান্ডে আসিনি রে বাবা! আমাদের ফলো করলেই—" বলল অরিত্র।

ঋতম ঘাড় নাড়ল, "তাই কি? তিন বন্ধু, আর তাদেরই একজনের ব্যাচেলর মামা—চারজনে মিলে থাইল্যান্ডে যাচ্ছে ঘুরতে। এতে ফলো করার মতো কিছু আছে কি? প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই দেশে বেড়াতে আসে! মূর্তির উদ্ধার এবং আমাদের থাইল্যান্ডে আসা—এই দুটোর মধ্যে যে কোনো যোগাযোগ আছে, সেটা এরা ভাবতে যাবে কেন? একমাত্র উপায় হতে পারে—"

"যদি বাড়ির মধ্যেই এমন কেউ থাকে, যে এই খবরগুলো বাইরে পাচার করে থাকে!" নীচু গলায় বলল আর্য।

শুভমামার কপালে এবার ভাঁজ পড়ে গেল তিনটে, "দ্যাখো, আমাদের বাড়িতে কাজের লোক অন্তত দশজন। বেশিই হবে বোধহয়, আমি ঠিক জানি না—কিন্তু তারা সকলেই বহু বছর ধরে আছে, বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গেছে—তবু—পরচিত্ত অন্ধকার; কার মনে কী আছে, কে একশোটা টাকা হাতে ধরিয়ে দিলে টুকিটাকি কথা বলে দেবে—এ কি আর শিওর হয়ে বলা যায়? আফটার অল, লোভ সবারই আছে!"

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল আবার। স্পষ্টত, শুভমামা কথা বাইরে যাওয়ার ব্যাপারটা মানতে চাইছে না, আবার অস্বীকার করতেও পারছে না।

অরিত্র এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার হঠাৎ ডান হাতের দুটো আঙুল তুলে ধরে বলল, "দুটো কথা।"

আর্য বলল, "বলে ফ্যাল।"

"এক—এটা মেনে নেওয়া যাক, আমরা যে জাস্ট ঘুরতে যাচ্ছি না, সে সম্বন্ধে একেবারে শিওর হয়েই এরা আমাদের পিছু নিয়েছে; নইলে কেউ এত দূর পর্যন্ত তাড়া করতে পারে না, একেবারে থাইল্যান্ড অবধি। আর দুই—খুব সম্ভবত এরা বাকি সঙ্কেতটার অর্থ উদ্ধার করে ফেলেছে।"

শুভমামা বলল, "প্রথমটা আমারও মনে হল। কিন্তু এই দু-নম্বরটা—"

"নইলে এরা আজ আমাদের গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করত না।"

"রাইট!" বলে এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠল আর্য যে, পাশের টেবিলে খেতে বসা মানুষেরাও চমকে উঠলেন। "ওদের আর আমাদের ফলো করার দরকার নেই। সেইজন্যই আমাদের রাস্তা থেকে হটানোর জন্য আজকে এরা এত বড়ো ঝুঁকি নিল—একেবারে যাকে বলে প্রকাশ্য দিবালোকে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল! গুড, অরিত্র, টু গুড!"

"তাহলে স্প্যাগেত্তির দামটা তুই দিচ্ছিস?" গম্ভীর হয়ে বলল অরিত্র।

এতক্ষণে হাসল ওরা। "ডান!" বলে বুড়ো আঙুল দেখাল আর্য।

খাওয়া সেরে বেরিয়ে এল ওরা। একটু আগে যে রাস্তা দিয়ে নিশ্চিন্তে হাঁটছিল, এখন সেখানেই বারবার এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে ওরা, যেন সবাই ওদেরই পিছু নিয়েছে।

সোজা সমুদ্রের তীর বরাবর পাঁচশো মিটার মতো এগিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে রাস্তাটা। ওদিকেই ওদের হোটেল। আরো একবার ভালো করে চারদিক দেখে নিয়ে সতর্কভাবে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে লাগল ওরা।

হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আর্য। এমন আচমকা যে, ঠিক পিছনে হেঁটে আসছিল ঋতম, ওর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে "দুচ্ছাই! সাবধানে হাঁটবি তো! এমনিতেই পায়ে লেগেছে একটু আগে—" বলতে বলতে থেমে গেল।

ফুটপাথে অজস্র পথচারীর ভিড়ের মধ্যে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা, কারণ ততক্ষণে ওরা বুঝতে পেরেছে—কী দেখে আর্য অমন স্তম্ভিত হয়ে গেছে!

দুটো দোকানের মাঝের ফাঁকে একটা মন্দির। একেবারে ক্ষুদে, নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন, না-জানলে কারো চোখে পড়ার কথাই নয়! সেই ছোট্ট মন্দিরে আরো ছোট্ট একটা বিগ্রহ। বড়োজোর এক হাত উঁচু।

এটা পদ্মাসনে বসা ব্রহ্মার মূর্তি। তার তিনটে মাথা সাদা—একটা সোনালি।

বিস্ফারিত চোখে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল ওরা, যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না!

আর ঠিক সেই সময় বেজে উঠল শুভমামার মোবাইলটা। আর্যদের মোবাইলগুলো অবশ্য থাইল্যান্ডে আসার পর থেকে মূলত ক্যামেরা হিসেবেই কাজ করছে। এখানে কয়েকদিনের কাজ চালানোর মতো ট্যুরিস্ট সিমকার্ড পাওয়া যায়। শুভমামা সেই সিমই নিয়েছে একখানা, তাই দিয়েই ওরাও বাড়িতে একটা করে ফোন করে দেয় দিনান্তে।

ফোনটা তুলে নিয়ে শুভমামা বলল, "আদিত্য। কী হল আবার?" তারপর ধরল ফোনটা, "বল্।"

এটা পদ্মাসনে বসা ব্রহ্মার মূর্তি। তার তিনটে মাথা সাদা—একটা সোনালি।

ওপাশ থেকে আদিত্য যা বললেন, সেটা শুনতে অবশ্য ওদেরও অসুবিধা হল না।

"একটা কথা হঠাৎ করে মাথায় এল, বুঝলি! তোরা চিকেন আইল্যান্ডের নাম শুনেছিস?"

১০

"এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় এত দূরে এসে পড়াটাই আমাদের প্রথম অপরাধ।" বলল শুভব্রত। ওর মুখে এসে পড়েছে দোকানের মৃদু আলো, কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে মুখটা।

"আর দ্বিতীয়?" জিজ্ঞেস করল অরিত্র—

"আমাদের দ্বিতীয় অপরাধ—সারাদিন ধরে ক্রাবি আইল্যান্ডের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেও এই দোকানটার কথা জানতে না-পারা। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ঘটে যেত রে অরু, এখানে যদি খেতে না-আসতাম!"

বলে শুভমামা আর একটা অক্টোপাস মুখে পুরে চোখটা বন্ধ করল। বুঝদারের মতো মাথা নাড়ল ওরাও। কথাটা অতিশয় সত্য।

এটা অবশ্য ঠিক সে-অর্থে একটা 'দোকান' নয়—একটা ফুড কমপ্লেক্স বলে যেতে পারে। সমুদ্রের উঁচু পাড়ের উপর একটা চমৎকার স্ট্যাচু আছে মার্লিন ফিশের—সবাই যাকে ঠোঁটের উপরের মস্ত ধারালো অংশটার জন্য 'সোর্ড ফিশ' বলে। সেখানেই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা সূর্যাস্ত দেখছিল। অপূর্ব রঙের খেলা দেখিয়ে পশ্চিম দিগন্তে দেব দিবাকর সমুদ্দুরে গা ধুতে গেলেন সমুদ্রকেও রাঙা করে! ওদের হাত দুই দূরে দাঁড়িয়েছিল নারং নামের ছেলেটা। কাল ওদের নৌকো ও-ই চালাবে। তো সেই ছেলেটিই ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল,"বড়ো রেস্টুরেন্টে না-গিয়ে যদি লোকাল ফুড খেতে চান, তাহলে কিন্তু এখানে খাসা একটা জায়গা আছে, নিয়ে যেতে পারি! অবশ্য মোড়ের একেবারে মুখটাতেই পাঞ্জাবি খাবারও পাওয়া যায়। আপনারা ইন্ডিয়ান, ভালো লাগবে হয়তো আরো—"

সেই কথার সূত্রেই ওরা ডাইনে বাঁক নিয়ে এসে পড়ল এখানে—ছোটোখাটো একটা মেলা বসে গেছে যেন রাস্তার পাশের একটা জায়গায়! ফুড ফেস্টিভ্যাল! পরপর ছোটো ছোটো দোকান। কোনোটায় জ্যান্ত মাছ বা কাঁকড়া রাখা আছে জলের মধ্যে, পছন্দসই জিনিসটা তুলে নাও, ওরাই রান্না করে দেবে—কোনোটায় চিকেন বা পর্কের বিবিধ পদ। অধিকাংশই ভাজাভুজি। তবে আসল স্পেশালিটি সি-ফুড; চিংড়ি, অক্টোপাস, স্কুইড—কী নেই এখানে! খাবারের গন্ধে পুরো জায়গাটা একেবারে ম-ম করছে—দোকান থেকে খাবার নাও, পাশেই চেয়ার-টেবিল পাতা আছে, বসে পড়ো, খাও! ছিমছাম বন্দোবস্ত, আর তেমনি সুস্বাদু সব খাবার—কাজেই শুভমামার বক্তব্যের দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে ওরা তিনজন একেবারে বিনা-তর্কে একমত হয়ে গেল।

অরিত্র একটা আস্ত মাছ গ্রিল করিয়ে নিয়ে এসেছে নিজের জন্য। এখন সেইটে খেতে খেতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে কিছু বলার নেই। প্রথম ভাগের ব্যাখ্যা দাও।"

"দোবো। খেয়ে নিই। এখন আমি কথা বলার মুডে নেই।" ওরকমই চোখ বুজে খেতে খেতে উত্তর দিল শুভমামা।

খাওয়াদাওয়া সেরে ওরা আবার এসে বসল বিচে। সাগরের উপর এখন চাঁদ উঠে আসছে। এই জায়গাটায় সমুদ্র বাঁক নিয়েছে একটা, তারপর পাহাড়ের একটা শিরা যেন ঢুকে পড়েছে সমুদ্রের মধ্যে। সেই পাহাড়টার মাথার উপর এবার দেখা দিচ্ছে চাঁদ—ওরা চারজন আইসক্রিম খেতে খেতে সেই দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ শুভব্রত বলে উঠল, "দ্যাখো, আমরা ইন্টারনেট জমানার মানুষ। সঙ্কেত ডিসাইফার করে পেলাম থাইল্যান্ড, আর অমনি ছুটে এলাম ব্যাংককে। কিচ্ছু খবর নিলাম না, পড়াশুনো করলাম না, নেট ঘাঁটাঘাঁটি করলাম না। একজন অধ্যাপক হিসেবে—আচ্ছা, সে বাদ দাও, একজন আধুনিক মানুষ হিসেবেই যদি বলি—তাতেও কাজটা কি অত্যন্ত বোকার মতো হল না?"

এই কথাটাও যে নিতান্তই সরল সত্য, তা বুঝে আর্য মাথা নীচু করল। আদৌ রেডি হয়ে আসেনি ওরা, এর চেয়ে নির্মম সত্য আর হয় না। শুভমামাই যা নিজের থেকে বলেছে ওদের—প্রাচীন ভারতের সঙ্গে, বিশেষত বাংলার সঙ্গে শ্যামদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ইতিহাস—বাংলার সেই গৌরবময় দিনগুলোর কথা—যখন বাংলায় তৈরি, বাঙালির হাতে তৈরি জাহাজ বঙ্গোপসাগরের নীল জল তোলপাড় করে, সাগর সেঁচে তুলে আনত ধন! তখনো সওদাগরকে মানুষ 'সাধু' বলে সম্বোধন করত, ব্যবসা বা ব্যবসায়ী সম্পর্কে এমন অদ্ভুত বিরাগ ছিল না বাঙালির; কালাপানি পেরোলে জাত যেত না। আর তাদের সঙ্গেই দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ত ভারতের ধর্ম, ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের কৃষ্টি। দূর সব দ্বীপের নাম ছিল সুবর্ণভূমি, সিংহপুর, শ্যামদেশ, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ। ভারতের বাইরে আর এক ভারতবর্ষ!

সেই দূর অতীতেই এক বাঙালি রাজা তাঁর বংশকে রক্ষা করার জন্য তিনভাগে ভাগ করে, তারই একটি ভাগকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এই দেশে। সঙ্গে ছিল বিশাল ধনরত্ন। বোঝাই যায়, এই দেশেও তাঁর এমনই প্রভাব ছিল, এমনই ভরসাযোগ্য বন্ধু ছিল—যার উপর নির্ভর করা যায় এমন ভয়াবহ অবস্থাতেও!

আর সেখানেই ওরা চলে এল শুধু একটা ধাঁধার সমাধান করা গেছে—এই উত্তেজনায়। বিন্দুমাত্র মাথা খাটাল না, পড়াশুনো করল না—এমনিই চলে এল!

তা নাহলে আদিত্য গুহঠাকুরতাকে কেন ওদের জানাতে হবে—ক্রাবির কাছেই একটা দ্বীপ আছে, যার নাম 'চিকেন আইল্যান্ড'? আর কেনই বা তখনই ওরা খেয়াল করবে, গুগল ম্যাপ অনুযায়ী সেই দ্বীপটার যেদিকে অবস্থান, ঠিক সেদিকেই নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছে ব্রহ্মার সোনালি মাথাটা! 'কত চতুরানন পেখল অনিমিখে শকুন আনন অনুসারি।'

ফুকেতের সেই রেস্টুরেন্টেই দ্রুত ফিরে গিয়েছিল ওরা আবার। অর্ডার করেছিল কোল্ডড্রিংকস, যাতে আরো খানিকক্ষণ বসা যায়। তারপর দ্রুত নেটে সার্চ করেছিল অরিত্র। ফুটে উঠেছিল একটা অদ্ভুত ছবি। এখানে আন্দামান সি-তে শরীর ডুবিয়ে আছে অজস্র পাহাড়। ছোটো-বড়ো নৌকোয় করে মাঝিরা সেই পাহাড় দেখিয়ে বেড়ায় পর্যটকদের। অবর্ণনীয় সৌন্দর্য তাদের। তারই মধ্যে একটা অত্যন্ত বিখ্যাত দ্বীপসমষ্টির নাম কোহ্ কাই! তার একটি দ্বীপ বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হাওয়া আর জলের মার খেয়ে খেয়ে দ্বীপগুলো আর আধডোবা পাহাড়গুলো আজব সব চেহারা ধরেছে। এই দ্বীপে একটা অদ্ভুত পাহাড় আছে। বিচিত্র ক্ষয়কার্যের ফলে এই দ্বীপের একটা অংশকে দূর থেকে দেখলে মনে হয়, যেন একটা মুরগি বসে আছে, গলা তুলে মুখ বাড়িয়ে সমুদ্দুরের রূপ দেখছে। এই কারণেই এর নাম 'চিকেন আইল্যান্ড'।

কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। যে সঙ্কেত এতবার দেখেও ওরা পুরোপুরি উদ্ধার করতে পারেনি, সেটা একবার মাত্র পড়েছিলেন আদিত্য, যেদিন ওরা এই দেশে এসে পৌঁছল। আর কী আশ্চর্য, এতকাল ঘরছাড়া সেই মানুষটাই আসল জায়গাটা লক্ষ করলেন সবার আগে, যার নাকি এতদিনে বাংলা ভাষাটা অবধি ভুলে যাওয়ার কথা!

ফুকেতের বিচের পাশের ফুটপাথে ব্রহ্মার মূর্তি দেখতে পেয়ে ওরা যখন থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখনই এসেছিল আদিত্যর

ফোন—দ্রুত পায়ে ওরা আবার ফিরে গিয়েছিল সেই রেস্টুরেন্টে, যাতে রাস্তার কোলাহল থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

"তুই আর একবার ওই ছড়াটা পড়ে শোনাতে পারিস, শুভ?"

"কোন ছড়া? ওহো, ওই ইয়ে—ব্রজবুলিতে লেখা সঙ্কেতটা?"

"ইয়েস! দ্যাখ তো, যদি মনে থাকে...বা লেখাটা যদি হাতের কাছে—"

আদিত্যর গলায় যে একটা অপ্রত্যাশিত ব্যগ্রতার সুর ফুটে উঠছে ক্রমশ, সেটা ওদের কান এড়ায়নি মোটেই। কাচে ঘেরা রেস্টুরেন্ট প্রায় নিঃশব্দ। শোনা যাচ্ছে সবই। ফুকেতের ব্যস্ত সৈকতের কোলাহলের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

শুভব্রত দ্রুত মনে করার চেষ্টা করল কবিতাটা—পুরো মনে আছে কি? থেমে থেমে, ধীরে ধীরে বলতে লাগল সতর্কভাবে—'কান অভিসারক, লহু লহু চলতহি—'

ওপাশে আদিত্য যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছেন, তা বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট, "বেশ—তারপর?"

বলে চলল শুভমামা, "কত চতুরানন, পেখল অনিমিখে, শকুন আনন অনুসারি।"

"এক সেকেন্ড! এক সেকেন্ড! আর একবার বল!" প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন আদিত্য।

শুভমামা এই উগ্রতার সামনে সামান্য থমকে গিয়ে বলল, "কোন লাইনটা? এই লাস্ট যেটা বললাম? কত চতুরানন পেখল অনিমিখে—এটা তো বোঝাই যাচ্ছে—"

"উহুঁ! তার পরেরটুকু বল আর একবার!"

"শকুন আনন আনুসারি?"

"এগজ্যাক্টলি! এটার মানে কী হল রে?"

"কই আর হল? শকুনের মুখের অনুসরণ করে—এটাই তো বুঝে উঠতে পারিনি আমরা!"

"বুঝিসনি? সে কী রে! শকুন! শকুন্ত!"

"অ্যাঁ!"

"ইয়েস শুভ! শকুন শব্দের মানে শুধু ওই যাকে ইংরেজিতে ভালচার বলে—সেটা নয়! সংস্কৃত ভাষায় শকুন্ত বা শকুন শব্দের মানে হল পাখি! পাখি! যেকোনো পাখি! বুঝেছিস?"

"ও হ্যাঁ, তাই তো বটে! শকুন্তলা নামটা যেখান থেকে এসেছে!"

"রাইট!" প্রায় গর্জন করে উঠলেন ঠান্ডা মানুষটি, "এইবার বল, কিছু আইডিয়া পেলি?"

এই প্রথম শুভমামা স্পষ্টত বিব্রত হয়ে পড়ল, "মানে—তুই কী বলতে চাইছিস, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না রে!"

"আমিও শিওর হয়ে কিছু বুঝিনি।" আদিত্যর গলায় এবার দ্বিধার ছোঁয়া লাগল, "চিকেন আইল্যান্ডটা একবার দেখে আয় তোরা। ক্রাবি আইল্যান্ডের কাছেই একটা অদ্ভুত দ্বীপ ওটা। দেখে, তারপর ঠিক কর কী করবি। পারলে আমিও ক্রাবি আইল্যান্ডে চলে আসতাম। কিন্তু কালই আবার আমাকে ছুটতে হচ্ছে সিঙ্গাপুর, কাজেই—"

ফোনটা কেটে দিয়ে থম মেরে আরো খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল শুভমামা। তারপর থেমে থেমে বলল, "কী বলতে চাইল বল দেখি আদিত্য! আমার কেমন মনে হচ্ছে, পাখির মুখ যেদিকে, সেই দিকটাকেই অনুসরণ করার কথা বলতে যাচ্ছিল। কবিতাটাতেও তো স্পষ্ট করে সেটাই বলছে, না? শ্যাম দেশের সাগরকূলের কথাটাও তার পরেই এল—'শ্যাম সাগরকূলে, শ্যাম রহু মঝু ভুলে, সমুখক নীলমণি বারি।' কাজেই—হুঁ, কিন্তু দ্বীপে তো পাখপাখালি থাকবেই!"

এই সময় অধৈর্য হয়ে অরিত্র বলে উঠেছিল, "দেখি ছোটোমামা, তোমার ফোনটা এক মিনিট দাও তো!"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাঁপা হাতে ফোনটা ওদের দিকে ঘুরিয়ে ধরল অরিত্র—একটা দ্বীপের ছবি এখন ফুটে উঠেছে তার স্ক্রিনে। ঘন নীল সমুদ্রের বুকে জেগে থাকা একটা দ্বীপ। তার এক পাশে অদ্ভুতদর্শন এক পাহাড় মাথা তুলেছে আকাশে। লম্বাটে পাহাড়টার চূড়ার কাছটা চওড়া হয়ে গেছে হঠাৎ করে। সব মিলিয়ে প্রায় হুবহু একটা পাখির দেহ যেন!

এই তাহলে চিকেন আইল্যান্ড! হ্যাঁ, এখান থেকে পাখির মুখটা আদৌ কল্পনা করতে হচ্ছে না, দিব্যি বোঝা যাচ্ছে! সেটাকে অনুসরণ করাও খুবই সম্ভব, যদি নিজেদের নৌকো থাকে!

তারপরেই গুগল ম্যাপে সার্চ করেছিল ওরা। ব্রহ্মার সোনালি মাথাটা যে সরাসরি এই দ্বীপটার দিকেই ইঙ্গিত করছে, তা বুঝতে আর অসুবিধে হয়নি এবার। ধাঁধাটাও বোঝা গেল পুরোপুরি। চতুরানন ব্রহ্মা পাখি-দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই পাখি-দ্বীপে পৌঁছে, তারপর এগিয়ে যেতে হবে পাখির মুখ যেদিকে, সেইদিক অনুসরণ করে।

কাজেই পরদিন সকালের প্রথম ফেরিতেই ওরা পৌঁছে গেল ক্রাবি আইল্যান্ডে, এই চাঁদের রাতে যেখানে বসে আপাতত ওরা আইসক্রিম খাচ্ছে। মুশকিল হয়েছিল নৌকো জোগাড় করতেই, যেটা বাঁধা পথের বাইরে ওদের নিয়ে যাবে পছন্দ অনুযায়ী গন্তব্যে—শেষমেশ সেই আদিত্যই একজন চেনা ট্যুর অপারেটরকে বলে সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কাল নারং নামের অল্পবয়সি ছেলেটা ওদের নিয়ে যাবে সারাদিনের জন্য যেখানে ওরা যেতে চায়—সেখানেই। মজার ব্যাপার হল, নারং-এর দাদার নাম অরুণ, ও অবশ্য উচ্চারণ করল 'আরুন'। এখানে নাকি অধিকাংশ নামই এইরকম।

আইসক্রিম শেষ করে, সযত্নে কাপটা ডাস্টবিনে ফেলে এসে আর্য বলল, "চলো, আজ শুয়ে পড়ি। কাল—এটা কী হল?"

ততক্ষণে ওরা সকলেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে বিচের পাশের পাঁচিল থেকে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে নার্ভাস ভঙ্গিতে। রাত হয়ে গেছে। রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। যে ক-জন মানুষকে দেখা যাচ্ছে ইতি-উতি, তাঁরাও কেন যেন চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

আর্য টের পেল, ওর পায়ের নীচের মাটি যেন কী এক গভীর, গূঢ় কম্পনকে বয়ে নিয়ে আসছে কোন অতল থেকে! শরীরটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য সামান্য শিউরে উঠল, মাথাটা যেন ঘুরে গেল একবার পলকের জন্য—পরক্ষণেই সব ঠিক হয়ে গেল।

বোকাটে চোখে বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল আর্য। ওরাও কেমন একটা অপ্রস্তুত মুখে তাকিয়ে আছে—

একটু পরে অরিত্র ফিকে হাসল, "ও কিছু না, বুঝলি। খাওয়াটা মনে হয় বেশি হয়ে গেছে। চ, শুয়ে পড়ি হোটেলে ফিরে।"

মাথা নেড়ে হোটেলের দিকে পা বাড়াল আর্য। কাল সারাদিন পরিশ্রম আছে। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়াই ভালো।

১১

গুপ্তধন, পাখি-দ্বীপ, ফুকেতের রাস্তায় মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া এবং ব্রহ্মামূর্তি আবিষ্কার—এই সবকিছু ভুলে যেতে ওদের লাগল বড়োজোর পাঁচ মিনিট।

ক্রাবির সমুদ্রতীর থেকে ওরা যখন রওনা দিল, তখন সকাল ন-টা—ছিমছাম একটা লং-টেইল বোট নিয়ে এসেছে নারং। নৌকোর পিছনে লম্বা একটা হাল বেরিয়ে আছে, তার শেষ মাথায় ঘুরন্ত প্রপেলার। এই লম্বা লেজটার জন্যই নির্ঘাত এমন বিচিত্র নাম নৌকোর।

ওরা অপেক্ষা করছিল একটা দুর্দান্ত ঝাউবনের ছায়ায়। সামনে হলুদ সৈকত, সেটা কয়েক পা এগিয়ে ডুবে গিয়েছে ফিরোজা-রঙা জলে—আশ্চর্য স্বচ্ছ সেই জল কয়েক মিটার পরেই আত্মসমর্পণ করেছে দিগন্ত-বিস্তৃত ঘন নীলের মধ্যে। সেই অনন্তবিস্তার জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিচিত্রদর্শন সব পাহাড়—তাদের চূড়ার উপরে উড়ছে সিন্ধুসারসের দল।

হে ঈশ্বর! পৃথিবীতে এত সুন্দর জায়গাও আছে!

নৌকো ছাড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে এর ফলে ওরা যেন ভুলেই গেল, আদৌ কেন ওরা আজ একটা অনিশ্চিত পথে রওনা দিয়েছে। সামনে শুধু গাঢ় নীল জল, উপরে ততটাই নীল আকাশ, সোনালি রোদ্দুর, আর আধো ডোবা পাহাড়; এ এক আশ্চর্য দিন যেন!

যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকুও খানিক পরেই পূর্ণ করে দিল নারং। বারমুডা আর টিশার্ট পরা ছেলেটির ইংরেজির ভাণ্ডারে সামান্য দারিদ্র থাকতে পারে, ঝকঝকে হাসিতে কুবেরের ঐশ্বর্য। এক জায়গায় পৌঁছে ও বোটের গতি কমিয়ে আনল খুব হিসেব করে। তারপর বন্ধই করে দিল ইঞ্জিন। সমুদ্র প্রায় নিস্তরঙ্গ, উড়ন্ত সিগালের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই এখানে—কিন্তু নৌকো হঠাৎ থেমে গেল কেন?

নারং এবার লম্বাটে যান্ত্রিক হালটাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। তারপর সামান্য রহস্যময় গলায় বলল, "এবার জলের নীচে একবার তাকিয়ে দেখুন।"

ওরা ঝুঁকে পড়ল জলের উপর। তারপর থ হয়ে বসেই রইল।

এমনই স্বচ্ছ জল যে, সমুদ্রের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত সব দেখা যাচ্ছে। অগভীর জলের নীচে অজস্র রংবেরঙের প্রবাল। এমন কোনো রং নেই, যা এখানে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। আর তার ফাঁকে ফাঁকে খেলে বেড়াচ্ছে হাজারে হাজারে রঙিন মাছের ঝাঁক!

প্রায় দশ মিনিট পরে আবার বোটটা চলতে আরম্ভ করল। ওরা চুপ করে বসে রইল। বাকরুদ্ধ হয়ে যাওয়া বোধহয় একেই বলে। শুধু নারং মিটমিট করে হাসতে লাগল—বোধহয় এরকম প্রতিক্রিয়া দেখার অভ্যেস আছে ওর।

চারিদিকেই অদ্ভুত গড়নের পাহাড় জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। তাদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলল বোটটা। ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

প্রায় আধঘণ্টা পরে হঠাৎ সোজা হয়ে বসল আর্য। ক্রমে ওর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠল, যেন যা দেখছে, তা ও বিশ্বাস করতে পারছে না।

বোটের ডানদিকে, প্রায় এক কিলোমিটার দূরে, জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাহাড়। এরকম পাহাড় ও জীবনে দেখেনি। দ্বীপটা আদ্যন্ত পাথুরে। নীচের দিকে কিছু গাছপালা গজিয়েছে বটে, উপরের দিকটা একেবারে ন্যাড়া। তার একপ্রান্ত সরু আর লম্বা হয়ে উঠে গেছে অনেকখানি, তারপর হঠাৎ ফের চওড়া হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে সত্যিই প্রায় হুবহু একটা বসে থাকা পাখি—আর হ্যাঁ, চলতি নাম চিকেন আইল্যান্ড হলেও পাহাড়টাকে দেখতে মোটেই মোরগের মতো নয়—

এর লম্বা মাংসহীন গলা আর তীক্ষ্ণ ঠোঁট দেখলে একটি পাখির কথাই মাথায় আসে। শকুন!

ইতিমধ্যে অরিত্রও দেখতে পেয়েছে পাহাড়টাকে, কারণ ও বসে আছে আর্যর ঠিক পাশেই। ওর বিস্ফারিত চোখ অনুসরণ করে এবার ঘুরে তাকাল শুভমামা আর ঋতমও। শুভমামাই প্রথম কথা বলল, আর বলে উঠল ঠিক সেই লাইনটাই, যেটা আর্য মনে মনে ভাবছিল।

"শকুন আনন অনুসারি!"

"এগজ্যাক্টলি!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আর্য, "এই সেই শকুন, আর ওই হল মুখ! সত্যিই আছে এসব! মাই গড!"

নারং ওদের কথোপকথন কিছুই বোঝেনি স্বভাবতই। এবার একগাল হেসে বলল, "স্যর! দিস ইজ চিকেন আইল্যান্ড।"

নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল প্রকাণ্ড পাথুরে পাখিটার দিকে। এইবার কাঠের তৈরি বাহারি ছইয়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল আর্য—তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল পাখিটার মুখের দিকে। তারপর হাত তুলে ইশারা করল সেই দিকেই, যেদিকে তাকিয়ে আছে সেই বিপুল পাখিটা, "নারং! দ্যাট ওয়ে।"

নারংকে শুধু এইটুকুই বলা হয়েছিল, ওরা প্রথমে চিকেন আইল্যান্ড পর্যন্ত যাবে, তারপর ওকে বলা হবে, কোনদিকে যেতে হবে। কাজেই মাথা নেড়ে ও ইঞ্জিন চালু করল ফের।

পাথুরে দ্বীপটার গা ঘেঁষে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁক নিল নৌকোটা। ওদিকেই তাকিয়ে আছে পাখি নিষ্পলক চোখে, বহু যুগ ধরে। শত শত বছর ধরে ও দেখেছে সারা পৃথিবীর বণিকদের আসা-যাওয়া! বহুকাল আগে কি সত্যিই একটা পাল-তোলা জাহাজ এই পথেই ভেসে গিয়েছিল সুদূর চন্দ্রদ্বীপ থেকে আসা কয়েকজন মানুষ আর তাদের বয়ে আনা বিপুল ধনভাণ্ডার নিয়ে!

আর্য হঠাৎ খেয়াল করল, ওর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হচ্ছে। অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে ওরা এসে পড়েছে গন্তব্যের খুব কাছাকাছি। এমন অভিজ্ঞতা ওদের এর আগে কখনও হয়নি—কাঁপা হাতে অরিত্রর ডানহাতটা চেপে ধরল ও।

নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে বাঁদিকে। পিছন ফিরে দ্রুত মিলিয়ে নিল আর্য। না, শকুনের মুখ এদিকে নয়—এই দ্বীপটা হতে পারে না। এগোতে হবে আরো।

এইবার ওরা এসে পড়েছে খোলা সমুদ্রে—ধু ধু নীল জলের ফেনিল উচ্ছ্বাস এখানে, নৌকোর গতিতে যেটুকু ঢেউ উঠছে, তার উপরে ঝলসে উঠছে রোদের কণা—চুপ করে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল ওরা—

ওই দূরে দেখা দিল আর একটা দ্বীপ। ন্যাড়া, পাথুরে—এতদূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, পাহাড় থেকে সরাসরি আকাশের দিকে উঠে গেছে থামের মতো। এখানে কিছু লুকোনোর জায়গা কোথায়? এ যে নিরেট পাথর শুধু! গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার সিনেমায় যে দেখায় সবুজ জঙ্গল...বালি খুঁড়ে খুঁজে পাওয়া লোহার প্রকাণ্ড বাক্স!

ক্রমে কাছে আসছে দ্বীপটা। উত্তেজনায় আবার ছইয়ের তলা থেকে বেরিয়ে এল আর্য—তখনই শোনা গেল ঋতমের গলা, "হ্যাঁ রে, এটা দ্বীপ, না পাথরের গম্বুজ?"

অরিত্র বলল, "এইটা একদম ঠিকঠাক বলেছিস। গম্বুজই বটে, শুধু ঢোকার রাস্তা নেই—দড়ি বেয়ে—"

কথাটা শেষ করতে পারল না অরিত্র, কারণ ঠিক এই সময় শুভমামা বলে উঠল, "আছে! ঢোকার রাস্তাও আছে!"

চোখের উপর হাত তুলে ভালো করে তাকাল আবার আর্য—রোদের জন্যই কি দেখতে পাচ্ছে না ও?

হ্যাঁ, তাই। ছইয়ের বাইরে আছে বলে ওর চোখে রোদ পড়ছে সরাসরি, তাই এতক্ষণ চোখে পড়েনি ব্যাপারটা। দ্বীপটাও কাছে এসে পড়েছে অনেকটা। এখন দেখা যাচ্ছে, নিরেট পাথুরে দেওয়ালের একটা অংশ খোলা, যেন পাহাড়ের গায়ে গুহা তৈরি হয়েছে যুগযুগান্তর ধরে জলের ধাক্কা লেগে লেগে।

আবার গুহা! সেই ঋক্ষবিলের পর থেকেই গুহা দেখলে কেমন একটা টেনশন হয় যে ওর!

এখন অবশ্য এসব ভেবে লাভ নেই। শুভমামার ইশারা বুঝতে পেরে নারং নৌকোটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেই গুহাটার দিকেই; আর যতই নৌকোটা গম্বুজের মতো পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে গুহাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই সেটা বড়ো হচ্ছে।

গুহা নয় ওটা! রীতিমতো বড়োসড় একটা ফাঁক নিরেট পাহাড়ের গায়ে—ওদের ক্ষুদে লং-টেল বোট তো বটেই, বেশ বড়ো নৌকোও দিব্যি ঢুকে যাবে ফাঁকটা দিয়ে—

ওদের নৌকোটাও কি ঢুকে যাবে নাকি? নারং তো সেই চেষ্টাই করছে—দেখাই যাচ্ছে! এখানে অবশ্য জল একেবারেই অগভীর, আবার সেই নীচের রংবেরং প্রবাল দেখা যাচ্ছে।

এই ঢুকে পড়ল নৌকো সেই ফাঁক দিয়ে। আর চারদিকে তাকিয়ে রইল ওরা, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে!

এবার ওদের চারদিকেই খাড়া উঠে গেছে পাথরের তৈরি দেওয়াল। তার ঠিক মাঝখানে একটা গোল পুকুর—টলটলে নীল জল! আকাশ দেখতে হলে তাকাতে হচ্ছে সোজা উপরের দিকে। পুকুরটার পাড় ঘেঁষে সংকীর্ণ এক ফালি বালুচর। এখন দুপুর, তাই সেই জল আর বালি ঝলমল করছে রোদ্দুরে! অনেক উপরে গোল হয়ে উড়ছে অজস্র সিগাল!

সাক্ষাৎ স্বর্গ! এইসব জায়গায় তো হলিউডি ফিল্মের শুটিং হওয়ার কথা! এটা তাদের চোখ এড়িয়ে গেল কী করে?

"এটা একটা লুকোনো লেগুন।" বলতে বলতে লাফ দিয়ে বোট থেকে নেমে পড়ল শুভমামা। বদ্ধ জায়গায় গলাটা গমগম করে উঠল, আর ছপাত করে শব্দ হল একটা—কারণ শুভমামা যেখানে নেমেছে, সেখানে হাঁটুজল।

ওরাও নেমে এল চটপট। নারং নিজেও বেশ অবাক হয়ে গেছে, ওর চোখমুখ দেখে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এরা বেশির ভাগ ট্যুরিস্ট নিয়ে বাঁধা পথে যাতায়াত করে। বোধহয় কখনও আসেনি এদিকে। একটু ভয়ে ভয়ে বলল, "বি কেয়ারফুল, স্যর! এইসব জায়গায় নানান ধরনের বিপদ থাকে।" বলে ইশারা করল ছোট্ট লেকটার পাড়ের দিকে।

যেদিক দিয়ে ওরা ঢুকেছে, তার ঠিক উল্টোদিকে পাহাড়ের পায়ের কাছে সারি সারি গুহার মতো হয়ে আছে। অরিত্র চাপা গলায় বলল, "জলের ক্ষয়কার্য!"

আর্য বুঝতে পারল, ওর বুক কাঁপছে থরথর করে। হ্যাঁ, ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখার পক্ষে এর চাইতে আদর্শ জায়গা আর কিছু হতেই পারে না! যাঁরা এই প্রকাণ্ড পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তাঁরা এই সাগরটিকে চিনতেন হাতের তালুর মতো। এমন আইডিয়া আজকের ঘরকুনো বাঙালির মাথা থেকে বেরোবেই না! এ হল বাণিজ্যপথের দামাল সওদাগরদের তৈরি পরিকল্পনা। অকূল সমুদ্রের মধ্যে একটা লুকিয়ে-থাকা লেগুনের পাড়ের গুহা!

"জল কমে গেলে বোটটা আটকে যাবে, স্যর! আমি বাইরে আছি।" বলল নারং।

খাঁটি কথা। এমনিতেই লেগুনে জল বেশি নেই।

এবার ওরা শুধু চারজন। শুভমামা বলল, "পাড় বরাবর ঘুরে ওদিকে যাওয়া যাক! যদি সত্যিই কিছু থাকে, তাহলে ওই গুহাগুলোতেই থাকবে।"

মিনিট তিনেক লাগল ওদের লেকটাকে বেড় দিয়ে উল্টো-দিকটায় পৌঁছোতে—আর তখনই আর্য বুঝতে পারল, অরিত্র অভ্যাস অনুযায়ী চেপে ধরেছে ওর কাঁধ—হাতটা কাঁপছে অল্প অল্প, এবং কেন—সেটা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন নেই—

দু-সারি পায়ের ছাপ চলে গেছে ভিজে বালির ওপর দিয়ে একটা গুহার দিকে।

ওদের থমকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখে শুভমামা আর ঋতমও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এবার ওদেরও চোখে পড়েছে ছাপগুলো। পাশে এসে দাঁড়াল ওরাও।

ঠিক তখনই, সামনের একটা গুহা থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল দুজন মানুষ। তাদের একজন অন্তত সাত ফুট লম্বা, অসম্ভব বলিষ্ঠ চেহারা; অন্যজন তার থেকে নিদেনপক্ষে দু-ফুট বেঁটে!

বেঁটে লোকটাই সামনে এসে দাঁড়াল। পিছনে সোজা হয়ে দাঁড়ানো লম্বা লোকটাকে এবার প্রেক্ষাপট বলে মনে হচ্ছে—

অস্বাভাবিক সরু গলায় বেঁটে লোকটা বলল, "ওয়েলকাম,

মিস্টার বাসু! মাইসেল্ফ অতনু সেন। এ আমার ছোটো ভাই—সুতনু। আমাদের আসল নাম অবশ্য আলাদা, তবে পদবিটা আসল। এই নামটা আমার দেওয়া। কেন, সে তো আমাদের চেহারা দেখে বুঝতেই পারছেন।" বলে মজা করে হাসল লোকটা—

শুভমামা যে কতটা অবাক হয়েছে, সেটা ধরা পড়ল গলা শুনেই, "আপনি—আপনি আমাকে চেনেন? নামও জানেন? কীভাবে! মানে আমি তো আপনাকে—"

"না না! আপনি আমাকে চিনবেন কোত্থেকে?" একইরকম হাসিভরা গলায় বলল অতনু নামের লোকটা, "আপনি—আপনারা হলেন ভদ্রলোক। শুধু ভদ্রলোক বললে কিছুই বলা হয় না। আপনারা হলেন অভিজাত বংশের মানুষ, ধনী। আর আমরা হলাম ট্যিপিকাল লো-ক্লাস লোক। এই গত বছরই দু-বছর জেল খেটে বেরোলাম। মার্ডার চার্জ। প্রমাণ হয়নি অবিশ্যি—বেল পেয়ে গেলাম তাই।"

মার্ডার চার্জ! এইটুকু একটা লোক মার্ডার করবে কী—আর্য ভাবল।

যেন ওর মনের কথা বুঝে নিয়েই লোকটা বলল, "অফকোর্স মার্ডার আমি করি না। করে ভাই। ও খালি হাতে মানুষের মুন্ডু ছিঁড়ে নিতে পারে!"

"অন্যমনস্ক মানুষ রাস্তা পেরোনোর সময় তাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে!" তিক্ত গলায় বলল শুভব্রত।

"অবশ্যই পারে! আলবাত পারে!" এইবার রাগে গনগন করে উঠল লোকটার গলা, "যদি জগদানন্দ রায়ের বংশের লোক আজ সাড়ে চারশো বছর পর আবার আমাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা করে, তাহলে যেকোনো উপায়ে তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়াই উচিত। একবার যে ভুল হয়ে গেছে, তা তো বারবার করে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাই না অধ্যাপক মশাই?"

সত্যিকারের বিস্ময়ে আর্যর মুখটা হাঁ হয়ে গেল—জগদানন্দ রায়ের বংশ! সাড়ে চারশো বছর! এসব কথা এই লোকটা জানল কী করে?

প্রায় ওর মনের কথাটাই বেরিয়ে এল শুভমামার মুখ থেকে, "আ—আপনি কে? এসব কথা আপনি জানলেন কোত্থেকে?"

এইবার গুহার মুখ ছেড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল লোকটা। আর্য বুঝতে পারল, এইটুকু হাইট সত্ত্বেও একটা মারাত্মক ব্যক্তিত্ব আছে মানুষটার মুখেচোখে, হাবভাবে—'নো ননসেন্স' ধরনের তীব্র ব্যক্তিত্ব; যারা নিজেদের পথে কোনোরকম বাধাই বরদাস্ত করে না।

"শোনো হে বসুবাবু!" ধারালো গলায় বলল অতনু নামের লোকটা, "গোড়া থেকে বলি, নইলে তো তোমরা বুঝবে না! না তুমি, না তোমার অপদার্থ ভাগ্নে, না তার বন্ধুরা।"

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল ওরা। এর কাছে সব খবর আছে—

"আজ থেকে সাড়ে চারশো বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষ চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের অধীনে উঁচু পদে কাজ করতেন। এক ভয়ানক বন্যায় চন্দ্রদ্বীপ উজাড় হয়ে যায়। রাজা জগদানন্দ সব আগে থেকেই জানতেন; তিনি নিজের বংশের লোকদের সরিয়ে দিলেন, যাতে তারা প্রাণে বেঁচে যায়। কিন্তু রাজ্যের পুরোহিত আর প্রধানমন্ত্রীকে বন্দি করে রাখলেন, যাতে তারা পালাতে না-পারে।"

"মিথ্যে কথা!" এতক্ষণে যেন স্বর ফিরে এল শুভমামার, "কেউ কাউকে বন্দি করে রাখেননি! জগদানন্দের পুরোহিত বাসুদেব আচার্য এবং মহামন্ত্রী মুকুন্দ সেন মহাপ্রাণ মানুষ ছিলেন। সেই ভয়ংকর বিপদের মধ্যে তাঁরা বৃদ্ধ রাজাকে ছেড়ে যেতে রাজি হননি।"

তীব্র ব্যঙ্গের সুরে অতনু বলল, "বটে! অথচ সেই বৃদ্ধ রাজা দিব্যি নিজের গোটা পরিবারকে সরিয়ে নিল নিরাপদ জায়গায়! সমস্ত ধনসম্পদ লুকিয়ে ফেলল অজানা সব জায়গায়! বেশ তো!"

"এও মিথ্যা! লুকিয়ে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না! রাজবংশের একটি শাখা চলে যায় উত্তরে, আমাদের শাখাটি। মুর্শিদাবাদ হয়ে তারা চলে আসে কলকাতায়—"

"তাই নাকি? তাহলে এখানে আমরা কীসের খোঁজে এসে সমবেত হয়েছি, মিস্টার বসু? মুরগির মতো পাহাড় সত্যিই হয় কিনা, তাই দেখতে?" বিশ্রীভাবে হাসল লোকটা, "শুনুন ভালো করে। সাড়ে চারশো বছর ধরে অকারণ নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে চলেছি আমরা! সেই বন্যায় যারা সমূলে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল, পথের ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে মুকুন্দ সেনের পরিবারও ছিল। রাজবাড়ি থেকে এই খবর গোপন করে যাওয়া হয়েছিল—এক ভয়াবহ বন্যা আসছে! মন্ত্রী মারা যান, পুরোহিত মারা যান; তাঁদের পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। বেঁচে যান শুধু মুকুন্দ সেনের পরিবারের দুই সদস্য। তাঁর দুই ছেলে। একজন অদ্ভুত ঢ্যাঙা, একজন বেঁটে... অতনু আর সুতনু। সেন। বুঝলেন—সেন!"

আর্যর আবার কালকের রাতের সেই অনুভূতিটা ফিরে এল—মনে হল, ওর পায়ের তলার মাটি কাঁপছে, মাথাটা ঘুরে গেল যেন ফের! এরা সেই মৃত মন্ত্রীর বংশধর!

"সেই থেকে পুরুষানুক্রমে আমরা—সুতনু আর অতনুর বংশধরেরা, দারিদ্র আর দুর্দশা ভোগ করে চলেছি অকারণে। বরিশালের এক হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়ে ছোটোবেলা থেকে শুনে এসেছি সেই বীভৎস বন্যার গল্প, আমাদের সর্বনাশের গল্প। দেখেছি মাটির কুলুঙ্গিতে রাখা ধুলো-পড়া ব্রহ্মামূর্তি আর অজস্র পুরনো পুথি। অদ্ভুত চেহারার জন্য ভালো করে স্কুলে অবধি যেতে পারিনি আমি, কিন্তু বাড়িতে বসে লাইব্রেরির পর লাইব্রেরি গুলে খেয়েছি জন্মাবধি। জানতে পেরেছি, কয়েক প্রজন্ম পরে পরে একবার করে সেই দুই হতভাগ্যের চেহারা ফিরে আসে আমাদের ফ্যামিলিতে—একজন অত্যধিক লম্বা, অন্যজন বামন। বাড়ি থেকে বেরোলেই লোকে হাসে! কিন্তু আমার পড়াশুনো কখনও থামেনি। কাজেই পনেরো বছর বয়েসেই আমি পড়ে ফেললাম এইসব ইতিহাস। পেয়ে গেলাম ব্রহ্মার হাতে লুকিয়ে রাখা কাগজ! যা বুঝতে তোমাদের এত কাণ্ড করতে হল, আমি বরিশালের অজ পাড়াগাঁয়ে বসে তা কোনকালে ধরে ফেলেছিলাম! মূর্খের দল!" ঝনঝন করে উঠল তীক্ষ্ণ গলাটা!

"আমরা দুই ভাই তাই বড়ো হয়ে ঠিক করলাম, সেই বিশ্বাসঘাতক রাজার বংশধরদের খুঁজে বের করব। সেদিনের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব আমরাই। সেই জন্যই আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে ইন্ডিয়ায় আসি, নইলে এই গুপ্তধন আমরা সরাসরি এখানে এসেও উদ্ধার করতে পারতাম। আর তুমি, হেঁ হেঁ, অধ্যাপকবাবু, তুমিই নিজের
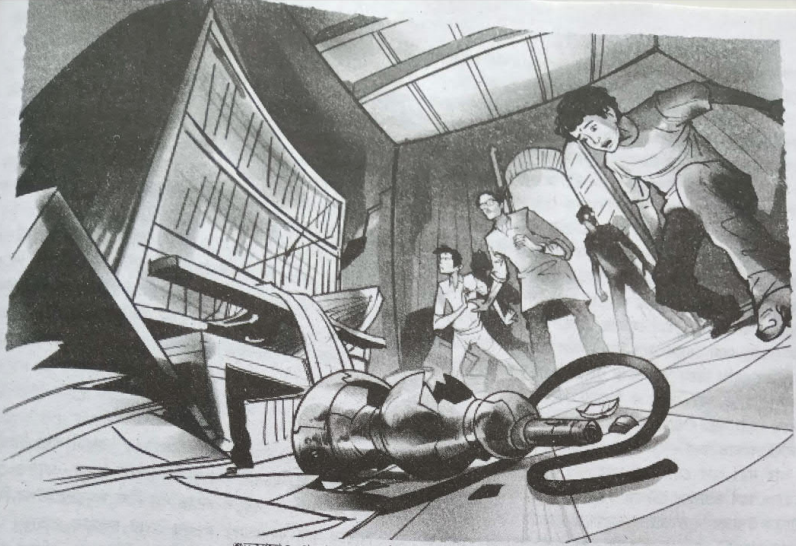
শুভমামাও থরথর করে কাঁপছে এখন। কথা বলতে পারছে না।

বংশের গৌরব প্রচার করতে গিয়ে ধরিয়ে দিলে নিজেদের।" ছোট্ট হাতটা তুলে লোকটা আঙুল দিয়ে ইশারা করল শুভব্রতর দিকে।

"আমি!"

"ইয়েস! ইউ!" হাসল লোকটা, "সব পেপারেই তো লিখে চলেছ বাপু—আমাদের বংশ এই, আমাদের বংশ ওই!"

দাঁতে দাঁত চাপল শুভব্রত। প্রাচীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে লেখা তার প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে প্রায় সমস্ত পেপার আর ম্যাগাজিনে। তার কোথাও কোথাও নিজের পরিবারের প্রসঙ্গও এসেছে বইকি!

"ততদিনে কলকাতার আন্ডারওয়ার্ল্ড আমাদের চিনে গেছে। ব্যাংক ডাকাতি আর মার্ডার কেসে জেল খেটে নাম হয়ে গেছে আমাদের। টাকার দরকার ছিল, যাতে এতদূর আসতে পারি!" সগর্বে বলে চলল লোকটা, "কাজেই তোমাদের বাড়িটা খুঁজে বের করা, চাকরদের ভয় দেখিয়ে, নইলে টাকা দিয়ে হাত করা—এসব তো—"; বলে একটা তুড়ি দিল লোকটা।

"এভাবেই জানলাম তোমাদের পিছনের বাড়িতেও এমনই একটা ব্রহ্মামূর্তি আছে—সেটা নষ্ট করে দিতেই ঢুকেছিলাম সেদিন আমরা দুজন। আনফরচুনেটলি, তোমাদের চাকর মাঝখানে পড়ে গেল। সুতনু ওকে খুব সহজে মেরেও ফেলতে পারত! কিন্তু গরিব মানুষ, জানে না কিছু—ছেড়ে দিল তাই। পরদিনই তোমরা ঠিক করলে থাইল্যান্ড যাবে—খবর এল। বুঝে গেলাম, কবিতার মানে বুঝে ফেলেছ তোমরাও। কাজেই আমরাও চলে এলাম এখানে!"

আর্য এবার কপালে হাত দিয়ে রগ দুটো চেপে ধরল। ওর শরীরটা আবার খারাপ লাগছে। কেন এমন হচ্ছে কাল থেকে? এই কাঁপুনিটা—

"এবার বুঝেছ, ইডিয়ট? এই সেই দ্বীপ, যেখানে জগদানন্দের সোনা লুকোনো আছে।" বলল অতনু, "কবিতার লাইনটা মনে করো—'চান্দক সুবর্ণ ধনি।' এইখানে আছে চন্দ্রদ্বীপের সেই গুপ্তধন। তোমাদের ভাগ তো তোমরা তখনই বুঝে নিয়েছ! সেই সম্পদ ভাঙিয়েই আজ তোমরা বেজায় অভিজাত, বেজায় বড়োলোক! কলকাতার বিশাল প্রাসাদে থাকো। আর আমরা? বরিশালের অজ পাড়াগাঁ, ভাঙা বাড়ি, খাওয়া জোটে না! মা আজও কাঠের জ্বালে রাঁধে!"

ডানহাতটা তুলে ধরে শুভমামা বলল, "দেখুন ভাই, আমি একটা কথা বলি! এখানে যদি কিছু সম্পদ থেকেও থাকে, তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম! কাজেই তা আমাদেরও নয়, আপনাদেরও নয়—"

"ওসব লেকচার কলকাতায় ফিরে গিয়ে, নিজের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সামনে দিস!" কর্কশ স্বরে বলল ছোট্ট লোকটা, "আপাতত বিদেয় হ, নইলে চারটে মানুষকে মারতে ভাইয়ার চার মিনিট পুরো লাগবে না! যা যা!" বলে পাহাড়ের ফাঁকটার দিকে হাত তুলে ইশারা করল লোকটা।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্যর চোখদুটো ঘুরে গেল সেদিকেই...আর আস্তে আস্তে ওর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে উঠতে লাগল।

লেগুন থেকে সড়সড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে জল। বাইরের

অগভীর জল এখন আর নেই। শুকিয়ে গিয়েছে কোন মন্ত্রবলে! পিছিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র!

ঝিমঝিম করছে আবার মাথাটা। বেঁটে লোকটা এখনও সরু গলায় কী যেন বলে যাচ্ছে। কানে ঢুকছে না আর্যর।

হঠাৎ অরিত্র চেঁচিয়ে উঠল, "শুনুন দাদা! এখানে কী আছে, না আছে—তা আপনি একাই দেখবেন না, ওকে? পুলিশ আসবে, যদি কিছু পাওয়া যায়, তা হিস্টোরিয়ানরা চেক করবেন—"

এই অবধি শুনেই লোকটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ভাইয়া!"

এক মুহূর্তের জন্য বাইরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকাল আর্য। এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা আর বিশাল চেহারার লোকটা এবার এগিয়ে আসছে। কখন যেন ওর হাতে উঠে এসেছে একটা মোটা বেঁটে লোহার ডান্ডা। পলকের জন্য আর্যর মনে পড়ল, এমন কোনো অস্ত্র দিয়েই মারা হয়েছিল গণেশদাকে।

অরিত্র রোজ জিমে যায়, শক্তি ওর কিছু কম নয়—কিন্তু বড়ো লোকটার হাতে অস্ত্র দেখে ও ঘাবড়ে গেছে। এদিকেই পিছিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। গায়ে জোর থাকা এক ব্যাপার, আর কাউকে বাস্তবেই আঘাত করা—

আর নয়! আর দেরি করা যাবে না! এক মুহূর্ত নয়!

হঠাৎ আর্য প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "অরিত্র, ঋতম! শিগগির পাহাড়ের উপরের দিকে ওঠ! শুভমামা, তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!!"

এক মুহূর্তের জন্য হকচকিয়ে গেল ওরা তিনজন। আর্যকে ওরকম পাগলের মতো চিৎকার করতে ওরা দেখেনি কখনও। কিন্তু ততক্ষণে ও হাঁচোড়-পাঁচোড় করে পাথরের খাঁজ আঁকড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে পিছনের পাহাড়টায়, আর উন্মাদের মতো চিৎকার করে চলেছে ক্রমাগত, "উঠে পড়, ঋতম! অরিত্র, কুইক! প্লিজ, শুভমামা, প্লিজ উঠে এসো এদিকে!"

ততক্ষণে ওদেরও সাহস ফুরিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিশাল চেহারার লোকটা একটাই ব্যাপার বোঝে। ভাইয়ের হুকুম তামিল করতে হয়; ব্যস—তিনজন 'ভদ্রলোক' ওর কাছে কিচ্ছু না। তিনটে বাড়ি মেরে শুইয়ে দেবে ও—

রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছন ফিরে দৌড় দিল অরিত্ররা। দানবটা অবশ্য তাড়া করল না। দাঁড়িয়ে পড়ে দাঁত বের করে হাসল। তারপর উপরে তাকাল। অজস্র সিগাল উড়তে আরম্ভ করেছে হঠাৎ। পাখির চেঁচামেচির চোটে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে!

ঝড়ের বেগে উপরে উঠে চলল আর্য। কাজটা সহজ নয়। তবু, পাথরে বুক চেপে, খাঁজে আঙুল বসিয়ে উঠতে লাগল ও পাগলের মতো।

বেশ খানিকটা ওঠার পর একটা ছোটো অপরিসর চাতালের মতো জায়গা পেয়ে হেঁচড়ে নিজেকে সেটায় টেনে তুলল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে এল বাকিরাও, হাত বাড়িয়ে ওদের টেনে নিল আর্য। তারপর আঙুল বাড়িয়ে দিল ফাঁকটার দিকে। আর সেদিকে তাকিয়ে ওরাও ঠিক আর্যর মতোই কাঠ হয়ে গেল!

হু হু হাওয়া ছুটে আসছে সেদিক থেকে। উড়ে যাচ্ছে ভীত পাখির ঝাঁক। আর তার ঠিক পিছনে—

একটা জলের দেওয়াল যেন কোনোভাবে প্রাণ পেয়ে গেছে। জল অনেকখানি পিছিয়ে গেছে এখন। তার ওপাশ থেকে, সমস্ত পৃথিবীকে মথিত করে ভৈরব গর্জনে ছুটে আসছে এক মহাতরঙ্গ! অন্তত কুড়ি ফুট উঁচু এক জলের তৈরি দেওয়াল! এল! ওই এল! ভীমরবে আছড়ে পড়ল সংকীর্ণ ফাঁকটায়, একটা ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ হল যেন! পরক্ষণেই কোটি কোটি গ্যালন জল আছড়ে পড়ল মত্তমাতঙ্গের মতো লেগুনটার উপরে!

এক মুহূর্তের জন্য ওরা দেখতে পেল দুটো ভয়ার্ত মুখ, আর তাদের খড়কুটোর মতো ভেসে যাওয়া! দুটো আর্ত চিৎকার ঢেকে গেল উন্মত্ত জলের ভৈরব কল্লোলের নীচে!

খাড়া পাহাড়ের মাথার কাছে একটা সংক্ষিপ্ত চাতালের উপর দাঁড়িয়ে রইল ওরা। খুব বেশি হলে দশ ফুট নীচে ছোবল দিতে লাগল জল, সেই জল যেন টগবগ করে ফুটছে, আর নিষ্ফল আক্রোশে ওদের আছড়ে ফেলার চেষ্টা করছে ওই নীচে!

পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওরা চারজন।

১২

"এর নাম প্রকৃতির মার—বুঝলি অরিত্র!" একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল আর্য। ঘটনার পর দু-দিন কেটে গেছে, এখনও যেন চোখ বন্ধ করলেই ও দেখতে পাচ্ছে ঘন নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটে আসছে এক মহাতরঙ্গ! জলের তৈরি চলমান পাহাড়!

এখন ভোর। আদিত্যদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল ওরা। এখনও যেন এই সৌভাগ্যটুকুই বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি—ওরা বেঁচে আছে। ফিরে এসেছে ব্যাংককে! আজই বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে যাবে কলকাতায়!

এবারও সিঙ্গাপুর থেকে মাঝরাতে ছুটে যেতে হয়েছিল আদিত্যদাকেই, ওদের ফুকেত থেকে উদ্ধার করে আনতে—ঝলমলে স্বপ্নের মতো জায়গাটা তছনছ হয়ে গিয়েছে। প্লেনে জায়গা পাওয়া যেন স্বর্গের চাবি পেয়ে যাওয়ার শামিল। কীভাবে যে আদিত্যদা এসব ম্যানেজ করল, ঈশ্বর জানেন! কিন্তু সেই নরকের দুঃস্বপ্ন থেকে ওদের তুলে এনেছে এই মানুষটাই—ফেরার পথে শুধু বারবার বলছিল, "আমিই তোমাদের ওই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম— ভেবে পাগলের মতো লাগছিল। তোমাদের কারো কিছু হয়ে গেলে আমি জীবনে আর আয়নার সামনে দাঁড়াতে পারতাম না।"

বোধহয় সেই ধাক্কাতেই ডাকটা রাতারাতি আপনি থেকে তুমিতে নেমে গিয়েছে।

আর্য বলল, "জল নামতে আরম্ভ করল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে। বিশ্বাস করতে পারো আদিত্যদা, পাঁচ ঘণ্টা আমরা একটা হাত চারেক লম্বা-চওড়া এক টুকরো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম! বসারও সাহস পাচ্ছিলাম না, বেশি নড়াচড়া করতে গিয়ে যদি পড়ে যাই!"

একবার শিউরে উঠল আদিত্য, যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা।

"সন্ধের সময় একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ পেলাম আমরা। সার্চ পার্টির লঞ্চ! ঘনঘন সাইরেন বাজাচ্ছিল, ইংরেজিতে অ্যানাউন্স

করছিল। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, আমাদের ওরা খুঁজে পাবে না—দেখতেই পাবে না!"

মাথা নাড়ল আদিত্য, "ন্যাচারালি! তোমরা তো তখন পাহাড়ের ভিতরে!"

"তার উপর ভয়ের চোটে এটাও মাথায় ছিল না—জল নেমে গিয়েছে। তা আমরা তো প্রাণপণে চেঁচিয়ে ওদের ডাকার চেষ্টা করলাম। আশ্চর্য ব্যাপার হল, সেই চিৎকার ওদের কানে পৌঁছোলও বটে—তারপর ছোটো একটা বোট ঢুকল সেই লেগুনটায়। যখন প্রাণের ভয়ে উঠেছিলাম, তখন দিব্যি সড়সড় করে উঠে গিয়েছিলাম। নামার সময় দেখি, টিকটিকি ছাড়া কেউ ওই পাথর বেয়ে নামতে পারবে না। শেষমেশ ওই উদ্ধারকারী দলের লোকেরাই দড়ি ছুড়ে দিল বহু কষ্টে, তাই ধরে কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলাম। ওরা ফুকেতে নিয়ে এল। তারপর তো তুমি সব জানোই।"

শুভমামা বলল, "ক্রাবির অবস্থাও সাংঘাতিক। আমাদেরও কিছু জিনিসপত্র গেল। জামাপ্যান্ট, আরো কিছু টুকিটাকি। ভাগ্যিস সব জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দিইনি! কাগজপত্র ভেসে গেলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যেত!"

"একটা সুনামির মধ্যে থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিস রে!" হালকা গলায় বলল আদিত্যদা, "এর চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য আর কী আশা করিস? আর্য সময়মতো লক্ষ না-করলে ওই লোকদুটোর দশা হত তোদেরও, সে খেয়াল আছে?"

শুভমামা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কী আশ্চর্য ব্যাপার, না? বহুকাল আগে ওদের পূর্বপুরুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন কর্তব্যের খাতিরে—প্রাণ নিয়েছিল সুনামি। আজ আবার সেই সুনামিই এদেরও প্রাণ নিল—আমাদের তো কোনো অপরাধ ছিল না, যার প্রতিশোধ এরা নিতে চাইছিল! হয়তো সেই কারণে প্রকৃতি নিজেই—! শুধু নারং—"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। এই ঘটনার ধাক্কা সামলাতে সময় লাগবে আরো—বোঝাই যাচ্ছে।

বোধহয় এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যই আদিত্যদা বলল, "তোমরা কলকাতা থেকে এলে এতদূরে, আমি ছাই কোনো আদরযত্নই করতে পারলাম না। একা মানুষের এই এক সমস্যা, বুঝলে। চলো, তোমাদের একটা দোকানে নিয়ে যাই। পুরনো রেস্টুরেন্ট, খাঁটি থাই ফুড পাবে ওখানে। ব্রেকফাস্টের আদর্শ জায়গা। একটু পরে তো চলেই যাবে! বাই দ্য ওয়ে, তোমাদের খুব টায়ার্ড লাগছে না তো?"

ক্লান্ত লাগারই কথা অবশ্য। সারারাত জেগেছে ওরা। আদিত্যদাও। কিন্তু ওই কথাটাও মিথ্যে নয়। কয়েক ঘণ্টা পর তো চলেই যাবে! এসেছিল গুপ্তধনের সন্ধানে—তা সে তো পাওয়া গেল না! সার্চ পার্টির কাছ থেকে কয়েক মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে লেগুনের পাড়ের গুহাগুলো একবার ছুটোছুটি করে দেখে নিয়েছিল ওরা। ফাঁকা। কিচ্ছু নেই।

একটু হতাশ লেগেছিল বইকি! তারপরেই মাথায় এসেছিল, প্রকৃতি যে রুদ্ররূপ দেখালেন, তার পাশে কোনো গুপ্তধনেরই দাঁড়ানোর সাধ্যি নেই। হাতে ধরে যেন শিখিয়ে দিলেন—বেঁচে থাকার চাইতে বড়ো উৎসব আর নেই, আয়ুর চাইতে বড়ো গুপ্তধন!

গাড়িতে চেপে যেতে যেতে ওরা বুঝতে পারছিল, এটা ট্যুরিস্ট চত্বর নয়। পুরনো পাড়া—এদিকটায় বহুতল কম, পুরনো ধাঁচের বাড়িঘরই বেশি। কাঠের তৈরি চুড়োওয়ালা বাড়িও আছে বেশ কিছু। রাস্তার দু-পাশে প্রচুর গাড়ি পার্ক করা আছে, নইলে দিব্যি হিস্টরিকাল সিনেমার শুটিং করা যেত।

আদিত্যদা গাড়িটা একটা গাছের তলায় পার্ক করতে করতে বলল, "ব্যাংককের বাগবাজার, বুঝলি শুভ—এখানে বলে ওল্ড টাউন। আদ্যিকালের বাড়িঘর, তোদের বাড়িটার মতো।"

শুভমামাও অবাক হয়ে দেখছিল। নেমে দাঁড়িয়ে বলল, "দারুণ জায়গা রে!"

ওরাও নেমে এল। রেস্টুরেন্টটাও কাঠের তৈরি। সেখানে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ এক লাফে পিছিয়ে এল শুভমামা; তারপর লোকজন গাড়ি-ঘোড়া না-দেখে দৌড়ে পেরিয়ে গেল রাস্তাটা। ওদিকের ফুটপাথে উঠে দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে!

ওরা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর একছুটে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল শুভমামার পাশে, তারপর দাঁড়িয়েই রইল স্তব্ধ হয়ে।

একটা বিশাল এবং পুরনো বাড়ির খোলা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে শুভমামা। ভিতরে একটা যত্নের বাগান, ফুলগাছে ভরা। বাড়ির বারান্দায় ওঠার জন্য চওড়া সিঁড়িটা সাংঘাতিক জমকালো। গেট থেকে সেই সিঁড়ি পর্যন্ত একটা নুড়ি-বিছানো রাস্তা। এই রাস্তাটার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট্ট সাদামাটা মন্দির, তার চারপাশে ছোটো ছোটো মোমবাতি জ্বলছে। এখান থেকে সেটার দূরত্ব অন্তত পনেরো ফুট। তবু, এত দূর থেকেও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না—সেই মন্দিরের ছোট্ট বেদির উপর বসানো আছে চতুরানন ব্রহ্মার একটা হাত-খানেক উঁচু মূর্তি—

সম্মোহিতের মতো কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে বাড়িটায় ঢুকে পড়ল শুভমামা। অনুমতি নেওয়ার তোয়াক্কা না-করেই। পিছন পিছন ওরাও। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়াল মন্দিরটার সামনে।

আর সন্দেহ নেই। ব্রহ্মার যে মুখটা সরাসরি দক্ষিণদিকে তাকিয়ে আছে, সেটার রঙ সোনালি, বাকিগুলো সাদা। সদ্য সূর্য উঠছে, সেই নতুন রোদ্দুর মেখে মূর্তিটা যেন ঝলমল করছে।

এই মূর্তি এখানে কেন? এখানে তো ধারেকাছে সমুদ্র নেই! অবশ্য এখান থেকে সরাসরি দক্ষিণেই সমুদ্র! কিন্তু এই মূর্তি এখানে কেন?

ঠিক এই সময় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির উপরের ধাপে—সাধারণ থাই চেহারায় প্রবল অভিজাত্যের ছাপ, পরনে স্যুট; সম্ভবত অফিসে বেরোচ্ছেন। পাঁচজন ভিনদেশি মানুষকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক অত্যন্ত অবাক হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। দ্রুত পায়ে নেমে এসে বললেন, "ইয়েস জেন্টলমেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ? আই'ম সরি, বাট ইউ নো—ইট'স আ প্রাইভেট প্রপার্টি—আই হোপ ইউ ওন'ট মাইন্ড!"

এর চেয়ে ভদ্রভাবে অনধিকার প্রবেশকারীকে বারণ করা

অসম্ভব। কিন্তু শুভমামার যে আর ভদ্রতারক্ষার মতো মনোবল অবশিষ্ট নেই, তা বোঝা গেল প্রথম কথাটাতেই, "এই—এই মূর্তিটা আপনারা কোথায় পেলেন?"

দৃশ্যতই অসন্তুষ্ট হলেন ভদ্রলোক। গম্ভীর হয়ে বললেন, "ইনি আমাদের কুলদেবতা। বংশানুক্রমিকভাবে এঁর পুজো করি আমরা বহু বছর ধরে। কিন্তু আপনার এই কৌতূহলের কারণ জানতে পারি, স্যর? আমারই বাড়িতে এসে—"

ভদ্রলোক যে রেগে যাচ্ছেন, সেটা তাঁর কণ্ঠস্বর থেকেই দিব্যি আঁচ করা যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময় একটা ঘণ্টার শব্দ হতে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এক্সকিউজ মি! আমাদের সকালের উপাসনা শুরু হচ্ছে। আই মাস্ট গো। আপনারা চাইলে অপেক্ষা করতে পারেন—"

ওদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেই দ্রুত পায়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক। দরজাটা অবশ্য খোলাই রয়ে গেল তাড়াহুড়োয়—

আদিত্যদা নীচু গলায় বলল, "চল্, বেরোই—কোনো কিউরিও শপ থেকে কিনে এনে—এরা তো স্থানীয় মানুষ! বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে তো মনে হল না!"

আর্য কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ভিতর থেকে ভেসে এল একটা অদ্ভুত ধ্বনি। সমবেত মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনি। বেশ কয়েকজন নানা বয়সের নারীপুরুষ একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে চলেছেন মন্ত্র—আর তার কথাগুলো ওদের খুব চেনা হয়ে গিয়েছে গত কয়েকদিনের মধ্যে।

'কান্ অভিসারক লহু লহু চলতহি
শুকক সন্ধানে যৈছে সারি।
তহি দরশন ভেল লোচনে লোচনে মেল
পরমমোহিনী বরনারী।।'

স্তম্ভিত হয়ে নুড়ি-বিছানো রাস্তাটার উপরে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। ভিতরে চলছে মন্ত্রোচ্চারণ—

'কত চতুরানন পেখল অনমিখে
শকুন আনন অনুসারি।
শ্যাম সাগরকূলে শ্যাম রহু মঝু ভুলে
সমুখক নীলমণি বারি।।'

আর শিষ্টাচার দেখানোর সময় নেই। ঝড়ের বেগে এক একবারে তিনটে করে সিঁড়ি পার হয়ে ওরা উঠে এল বারান্দায়। দরজার ওপাশে প্রকাণ্ড একটা হলঘর। পুজোর ঘর। তার একপ্রান্তে ঝলমলে কাঠের কাজ করা সিংহাসন, বুদ্ধমূর্তি, কাগজের শেকল, থাংকা! তারই সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে মন্ত্রপাঠ করে চলেছে একটি খাঁটি থাই পরিবার! থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা।

ওদের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে এঁরাও যে আঁতকে উঠলেন, সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। ভদ্রলোক বোধহয় বুঝতে পারলেন কিছু। বাকিদের অনুচ্চ স্বরে কিছু বলে তিনি ফিরে এলেন এদের কাছে, "ইয়েস জেন্টলমেন। নাউ টেল মি, হোয়াটস দ্য প্রবলেম!"

কোনোক্রমে ঢোক গিলে শুভমামা বলল, "এই মন্ত্র আপনারা কোথায় শিখলেন?"

ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "আমি শিখেছি আমার বাবার কাছ থেকে। তিনি শিখেছিলেন তাঁর বাবার কাছে। বললাম যে, এসব আমাদের পরিবারের প্রথা!"

"আপনি এই মন্ত্রের অর্থ জানেন?"

মুহূর্তের জন্য সামান্য অপ্রতিভ দেখাল ভদ্রলোককে মুখ, "নো! বাট উই মাস্ট রিড ইট আউট এভরি মর্নিং উইদাউট মিস! দ্যাটস আওয়ার ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন ফর সেঞ্চুরিজ! কিন্তু আপনি এত এক্সাইটেড হয়ে পড়ছেন কেন?"

এইবার প্রত্যেককে স্তম্ভিত করে দিয়ে শুভমামা আবৃত্তি করে চলল, "চন্দক সুবর্ণ ধনি/অকামিক গরাসলি/রূপক তরঙ্গ দেঙ্গ দোল।/ততহি ভেজল/নিসান জনু বিসরয়ে/অনুসর পূর্বজ বোল।।"

কোনো মানুষের মুখভঙ্গি যে এইটুকু সময়ের মধ্যে এভাবে পালটাতে পারে, না-দেখলে বিশ্বাস হত না ওদের। দু-হাত দিয়ে শুভমামার হাত চেপে ধরলেন ভদ্রলোক। থরথর করে কাঁপছে সেই হাত, "হাউ ক্যান ইউ নো দিস! হু আর ইউ? হোয়্যার আর ইউ ফ্রম?"

শুভমামাও থরথর করে কাঁপছে এখন। কথা বলতে পারছে না। চোখে জল—অবিশ্বাস্য! পরিবারের অন্যেরা এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে তাকে—

খুব সাবধানে পিছিয়ে এসে বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা—এই সময় ওরাই কথা বলুক। বুঝে নিক একে অপরকে।

"বুঝতে পারলে, আর্য?" আদিত্য বলল ধরা গলায়, "সাড়ে চারশো বছরের ব্যবধান পার হয়ে চন্দ্রদ্বীপের হারিয়ে যাওয়া দুই শাখা আজ মিলে গেল আবার। ভাবা যায়?"

আর্য হাসল নিঃশব্দে। সত্যিই অবিশ্বাস্য, কিন্তু—ওই যে, শোনা যাচ্ছে উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা! পুনর্মিলন চলছে!

এঁরা ধনরত্ন লুকিয়ে রাখেননি মোটেই। ব্যবসা এঁদের রক্তে। এখানে এসেও এঁরা সেই কাজই করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেননি আর, সে-যুগে তা হয়তো সম্ভবও ছিল না। ধীরে ধীরে মিশে গেছেন সুবর্ণভূমির জীবনযাত্রার সঙ্গে, সমাজের মধ্যে। ক্রমে ভুলে গেছেন নিজেদের ভারতীয় শিকড়ের ইতিহাস। মনেপ্রাণে থাই হয়ে গেছেন আস্তে আস্তে।

শুধু একটা মূর্তি, আর একটা মন্ত্র রয়ে গেছে প্রথার রূপ ধরে। তার অর্থ একদিন বিলীন হয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলে; কিন্তু মন্ত্র কখনও লুপ্ত হয় না—অর্থ না-বুঝেই আজও কি এমনই শত শত মন্ত্র আউড়ে চলি না আমরা পুজোয় বা বিয়েতে? মন্ত্রের যে মরণ নেই!

এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে, উচ্ছ্বসিত গলায় সমস্ত ইতিহাস বলে চলেছে শুভমামা। চন্দ্রদ্বীপের আসল গুপ্তধন অবশেষে উদ্ধার হল। তার হারিয়ে যাওয়া স্বজন।

গুপ্তধন মানে কি শুধুই সোনা? ❖

অ্যাকোয়্যারিয়াম

দেবযানী বসু কুমার

ছবি : নচিকেতা মাহাত

৯ জুলাই ২০২০। প্রাচ্য নাচের পাঠশালার দশ বছরের জন্মদিন। হই-হই ব্যাপার। সবে শেষ হয়েছে বার্ষিক অনুষ্ঠান উত্তম মঞ্চে। কলাকুশলীরা অত্যন্ত ভালো নাচ করেছে। দর্শকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খুব ভালো লেখালেখি হয়েছে। তাই নাচের স্কুলের কর্ণধার বা অধ্যক্ষা মনে মনে খুব খুশি। ওনার বহিঃপ্রকাশ খুব কম। তাই এবার খুব বড়ো করে জন্মদিন পালন হবে। অন্যান্য নাচের দিদিমণিরাও এক সপ্তাহ ধরে খুব ব্যস্ত। নানা রকমের পরিকল্পনা। এদিন সবাই নিজেদের খুশি মতো রঙিন পোশাক পরে আসবে। যত খুশি আনন্দ করবে। এই একটা দিন নাচের ক্লাসে হিন্দি অথবা ইংরিজি গানের সুরে পা মিলিয়ে হলিউডি বা বলিউডি নাচের অনুমতি আছে। এই দিনটাতে কোনো বাধানিষেধ নেই কোনো ব্যাপারে। অভিভাবকরা হা-পিত্যেশ করে রাস্তায় বসে থাকে কিন্তু ছাত্রীরা বাড়ি যেতে চায় না। ওদের মনমতো নৈশভোজের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু ওরা আনন্দ করতে এতটাই মত্ত থাকে যে কাউকে খেতে বসানো যায় না। ঘড়ির কাঁটা দশটা-এগারোটা পেরিয়ে যায়।

এবার দশ বছর বলে আর একটু বিশেষ ব্যবস্থা। সকাল থেকে সাজ সাজ রব। নাচের স্কুলটাকে রঙিন বেলুন, কাগজের শিকলি, নানা রঙের ছোটো ছোটো বল আর তারা দিয়ে দারুণ সাজানো হয়েছে। দিদিমণি থেকে বাচ্চারা সবাই আজ নতুন পোশাক পরেছে। কুকিজার থেকে ঢাউস এক চকলেটে কেক এসেছে। আজ বাচ্চাদের সঙ্গে মা-বাবারা নেই। তাই সবাই স্বাধীন। নিজেদের খুশিমতো সময় কাটাবে। কোল্ড ড্রিংকস আর আইসক্রিম খাবে অঢেল। নৈশভোজেও বাচ্চাদের পছন্দের খাবার-দাবার।

প্রতিবছর জন্মদিনে নাচের স্কুলের জন্য একটা কিছু কেনা হয়। এবারে যখন দিদিমণিরা ভাবছে কী কেনা যায়...কী কেনা যায়! একদম ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা জানাল নাচের স্কুল নাকি ওদের কানে কানে বলেছে—এবার আমার জন্য তোমরা লাল-নীল-হলদে- সবুজ-কালো মাছ ভর্তি অ্যাকোয়্যারিয়াম চাইবে। তোমরা তো শুধু শনিবার আসো। সারা সপ্তাহটা আমার কাটতেই চায় না। বোবা হয়ে থাকতে হয়। মাছেরা থাকলে তবু ওদের সঙ্গে কথা বলে একটু বাঁচব। তা ছাড়া আলো জ্বলবে, গাছ লাগানো হবে অ্যাকোয়্যারিয়াম সাজাবার জন্য, ছোট্ট ফোয়ারা লাগানো হবে, মাছেরা খেলে বেড়াবে। তখন আমাকে কী সুন্দর দেখতে লাগবে বল তো! তোমরা ক্লাসের দিনে মাছেদের সঙ্গে মজা করে সময় কাটাবে। ওদের খাবার দেবে। ওদের দেখভাল করবে। মাছেরাও তোমাদের পেয়ে খুশি হবে।

বাচ্চাদের আবদার। তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব পাস। জন্মদিনের দিন সকালেই এসে হাজির হয়েছে এক বিরাট রঙিন মাছভর্তি অ্যাকোয়্যারিয়াম। নাচের স্কুলটা যেন ঝলমল করছে। সন্ধেবেলা জন্মদিনের পার্টির সময় গানের তালে তালে বাচ্চাদের নাচের সঙ্গে মাছেরাও তালে তালে ল্যাজ নাড়াচ্ছে, ডুব সাঁতার দিচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে।

মাছেরাও আজ দারুণ খুশি। রাত এগারোটা নাগাদ পার্টি শেষ। সবার খুব মন খারাপ। আবার এক বছর অপেক্ষা করতে হবে জন্মদিনের পার্টির জন্য। বাচ্চারা যখন এক এক করে হাত নেড়ে মাছেদের বিদায় জানিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড। মাছেরা বুঝতে পেরে গেছে আজকের মতো পার্টি শেষ। ব্যাস ওদের কী মন খারাপ! সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। একটা কোনায় গিয়ে সবাই মিলে মন খারাপ করে জটলা শুরু করেছে। একটা বাচ্চা আবার যাবার সময় বলে গেল—যাও এবার সব লক্ষ্মী সোনা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়ে গেছে।

আবার পরের শনিবার ক্লাসে এসেছে সবাই। কিছুক্ষণ মাছেদের খেলা দেখে দিদিমণিরা আসলে সবাই নাচ শুরু করেছে। নতুন ক্লাস তাই নতুন নাচ। প্রথম দিন তাই সবাই একটু হালকা মেজাজে। আজ সবাই ইউনিফর্ম পরে এসেছে। টুকটাক নাচ আর গল্প চলছে। অধ্যক্ষা একটু তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়েছেন সেদিন।

প্রথমে লাইন করে একদম ছোটোরা বেরোচ্ছে। মাছগুলো এতক্ষণ বেশ খেলা করছিল। বাচ্চাদের বেরোতে দেখেই সব সার সার মাছ কাচের ভেতর দাঁড়িয়ে গেল। তাই দেখে বাচ্চারাও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর একটা বাচ্চা বলে—

মাছেরা বলছে প্লিজ, আর একটু থাকো। আর একটু নাচ করো দেখি। এদিকে দিদিমণিদের দেরি হয়ে যাচ্ছে। এক দিদিমণি বিরাট ধমক দিয়ে বলল—কী আজেবাজে কথা বলছ? মাছ কখনো কথা বলে? যাও সব বাড়ি যাও। বাড়িতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নাচ করবে। পরের শনিবার যেন কারো কোনো ভুল না দেখি। আবার বাচ্চাদের মন খারাপ। আবার মাছেদের মন খারাপ।

পরের শনিবার আবার নাচের ক্লাস। বড়োদিদিমণি ক্লাস নিচ্ছেন। খুব রাশভারী। নাচ ভুল করলে ছাত্রীদের বেদম বকেন, শাস্তি দেন। হঠাৎ সবাই দেখে বাচ্চারা দাঁড়িয়ে পড়েছে নাচ করতে করতে। কী ব্যাপার? না মাছেরা নাকি ওদের শাস্তি পাওয়া, বকাবকি শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সেই দেখে ছোটোদের নাকি খুব লজ্জা করছে। সেই শুনে তো আর একপ্রস্থ বকাবকি। বড়ো ছাত্রীরা যখন নাচে দিদিমণিদের দেখে দেখে, ছোটো ছাত্রীরা অ্যাকোয়্যারিয়ামের সামনে গিয়ে কী সব বকবক করে মাছেদের সঙ্গে।

এর কয়েক সপ্তাহ পর থেকে দিদিমণিরা খেয়াল করে ছোটো ছাত্রীদের নাচ একদম ভুল হচ্ছে না। একমনে ওরা নেচে যায়। মাঝে মাঝে অ্যাকোয়্যারিয়ামের দিকে তাকায়। আবার নাচে। দুষ্টুমি করে ক্লাসে, কিন্তু নাচে কোনো ভুল নেই। নাচ করতে ওদের বিরাট উৎসাহ। মাঝে মাঝে দিদিমণিরা হাঁপিয়ে পড়ে। নতুন নাচ টকটক তুলে ফেলে কোনো ভুল না করেই। বড়ো ছাত্রীরা প্রচুর বকুনি খায় কিন্তু ছোটোরা কোনো বকা খায় না।

কী ব্যাপার? সবার মনে অনেক জিজ্ঞাসা। অনেক কৌতূহল। ছোটোদের জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর নেই। শেষে একদিন হালকা ধমক দিতে রহস্য জানা গেল।

মাছেরা নাকি বলেছে—আমাদের কথা বড়োরা শুনতে পাবে না কিন্তু তোমরা পাবে। যদি আমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাও, অনেক গল্প করো তাহলে ভুল করার আগেই আমরা সাবধান করে দেব। কানটা কিন্তু সজাগ রাখবে। তাহলে আর তোমাদের নাচে ভুল হবে না। আর বকুনিও খেতে হবে না। রোজ দেখে দেখে আমরা খুব ভালো নাচ শিখে গেছি। সব গানের নাচ আমাদের মুখস্থ। তাল, বোল, মুদ্রা সব জানি। তোমাদের জিজ্ঞেস করলেই আমরা বলে দেব আর তোমরা ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। আর একদিনও তোমাদের বকা খেতে হবে না।

তাই বাচ্চারা এখন নাচের ক্লাসে আসতে খুব ভালোবাসে। ওদের নাকি সপ্তাহে রোজ আসতে ইচ্ছে করে। সারা সপ্তাহ মাছেদের জন্য ওদের নাকি মন কেমন করে। কী মজার না? ❖

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভয়নিচের অজানা দেশে

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

১

১৮ এপ্রিল

দিন ঠিক কত ঘণ্টায় হয়? একটা মাসে ঠিক কত দিন থাকে? উত্তরটা ব্যক্তিবিশেষের উপ
নির্ভর করে আলাদা হওয়া উচিত।

ঠিক যেমন আজকাল আমার মনে হয় দিন যেন শেষই হয় না।

একটা বালিঘড়ির বালি পড়া যেন মাঝপথে থেমে গেছে। সময়কে একটা খাঁচার পাখির ম
বন্দি করে রাখলে যেরকম হয়, ঠিক তেমনই। সব কিছু থেমে গেছে।

আর তখন প্রত্যেকটা থেমে থাকা মুহূর্ত আমাকে মনে করিয়ে দেয়, আমি ব্যর্থ, অ
সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

আগে এরকম মনে হত না।
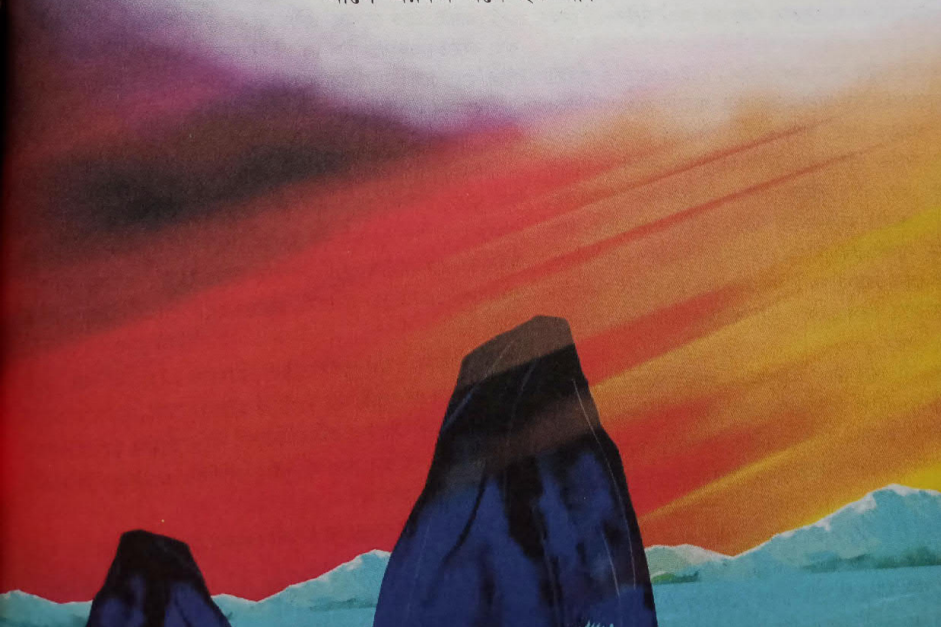
আমি কোনোদিন পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলাম না। বলা যায় অতি সাধারণ। সেরকম হলে যা হয়, গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরির অপেক্ষায় বসে আছি। প্রতি বছর নানান পরীক্ষা দিই। কিন্তু সাফল্য আর আসে না।

আগে প্রত্যেকবার রেজাল্ট বেরোনোর পরে বাবা খুব আশা করে জিজ্ঞেস করত। এখন দেখি আমি উত্তর দিতে যতটা লজ্জা পাই, বাবা তার থেকে বেশি লজ্জা পায় এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে।

তবে আমি আশা না হারিয়ে আবার চেষ্টা করি। যেরকম আরও অনেকে করে। বাবার ম্রিয়মাণ মুদির দোকানে আরও ম্রিয়মাণ আশা নিয়ে আবার পরের বছরের জন্য পড়াশোনা শুরু করি।

মনে হয় এই বারবার ব্যর্থতা এখন যেন আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। লটারির টিকিট কাটার পরে যেমন না পাওয়াটাই অভ্যেস হয়ে দাঁড়ায়।

বন্ধু আমার সেভাবে কেউ নেই। ছোটোবেলা থেকেই আমি একা একা থাকতে ভালোবাসতাম। একজনই বন্ধু ছিল। খুব বন্ধু। কিন্তু সেও হারিয়ে গেল হঠাৎ করে। রাজু। রাজুর কথা তো তোমাদের আগেই বলেছি।

ছোটোবেলা থেকে আমরা দুজনে একসঙ্গে সব জায়গায় যেতাম। ও ছিল ঠিক আমার মতো। আমার মতো একা। আমার মতো চুপচাপ। স্কুলের পরে আমরা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পুকুরধারে গিয়ে বসতাম। কোনোদিন বা যেতাম বটতলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে।

ওর একটা অদ্ভুত অন্য জগৎ ছিল। সেই জগতে ও হারিয়ে যেত। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালিকে যেভাবে ও দেখতে পেত, আমি কখনো সেভাবে দেখতে পেতাম না। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ্দুরের নকশা ও অবাক হয়ে দেখত। ওর চোখে গাছের পাতায় বিছিয়ে রাখা মাকড়সার জালে জলের ফোঁটা মুক্তো হয়ে উঠত। বাতাসে তিরতির করে কাঁপতে থাকা পাতাগুলো মোৎজারটের মতো সুরকার হয়ে উঠত। মনে হত ও যেন কোনো ম্যাজিশিয়ানের শো মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে। ওর সঙ্গে থাকলে ওর চোখেই অন্য অজানা জগৎটাকে দেখতে পেতাম।

ওর বাবা-মা ছিল না। কিছু দূরে একটা অনাথ আশ্রমে থাকত। অন্যদের মুখে শুনেছিলাম ওর যখন দিনদশেক বয়স, কে যেন ওকে গ্রামের চার্চের বাইরে কাপড়ে মুড়ে রেখে গিয়েছিল। ওখানকার ফাদার মোজেস ওকে কুড়িয়ে এনে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেন।

ওখানে কাছাকাছি স্কুল না থাকায় আমাদের স্কুলে অনেকটা পথ হেঁটে পড়তে আসত। সব সময় যেন এক অজানা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকত। মাঝে-মধ্যে কী যেন দেখে নিজের মনে বিড়বিড় করে হেসে বলে উঠত, ভারী মজা। মনে হত ও যেন পাখিদের মধ্যে কথাও বোঝে। শুনতে পায় চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে মিশে থাকা সে সব শব্দ, যা আমরা কেউ শুনতে পাই না।

ও বলত, আমার একটাই ঈশ্বর। সেটা হল প্রকৃতি, সেজন্য তাকে বোঝা এত শক্ত। কিন্তু জরুরিও। দেখ যারা ওঁর কথা আর গান শুনতে চায়, তাদের জন্য উনি যেন সব সুরের আয়োজন চারদিকে করে রেখেছেন। সামনের দুটো গাছ দেখিয়ে বলে উঠত—কে বলতে পারে ওই যে দুই গাছের মধ্যে দিয়ে যে পথ চলে গেছে সেটাই হয়তো গিয়ে পৌঁছেছে অন্য কোনো ছায়াপথে।

বলে বিভোর হয়ে আবার শুনত।

এ ছাড়া ওর আরেক আসামান্য ক্ষমতা ছিল। ও যে কোনো সংকেত উদ্ধার করতে পারত। ওর কাছ থেকেই শিখেছিলাম সাংকেতিক বার্তায় নিজেদের মধ্যে কথা বলতে। আমাদের মধ্যের সে কথা আমি আর ও ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।

ও বলেছিল ওর আর আমার মধ্যে এই সংকেতের ভাষা হবে শান্তির ভাষা। যদি কোনো দিন খারাপ দিন আসে, ভালো লোকেদের উপর অন্যায় অত্যাচার হয়, তখন আমাদের এই ভাষার দরকার হবে।

এভাবেই একদিন ও উদ্ধার করতে পারল ভয়নিচের ম্যানাসক্রিপটের থেকে এক অজানা ভাষা। এটা নাকি ইংল্যান্ডের এক জিনিয়াস রজার বেকন লিখেছিলেন ১২০০ সাল নাগাদ। এত বছর ধরে সেই সাংকেতিক ভাষায় লেখা বই-এর অর্থ কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু ও পেরেছিল।

পেরেছিল সেই বই-এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভাষা উদ্ধার করতে। সেই ভাষাই ওকে শেখাল পিঁপড়েদের কথা বুঝতে, ওদের সঙ্গে কথা বলতে। ওই বলেছিল যে এই ভাষায় এক পিঁপড়ে আরেকটার সঙ্গে কথা বলে। এই ভাষা লক্ষ লক্ষ পিঁপড়েদের সংঘবদ্ধ করতে শেখায়। শুধু পিঁপড়ে কেন মৌমাছি, ভীমরুল এদেরও ভাষা নাকি একই রকম।

কিন্তু এসব করতে গিয়ে ও পড়াশোনা ছেড়ে দিল। অথচ ও ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। বরাবর ফার্স্ট হত। কিন্তু সেসব ছেড়ে হারিয়ে গেল সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে। তারপরে একদিন হঠাৎ করে আমাদের গ্রাম ছেড়ে দূরে কোথায় চলে গেল। অনেক খুঁজেছি তারপরে, ওর অনাথ আশ্রমে, আশেপাশের গ্রামে, কোথাও খুঁজে পাইনি।

ও জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল আমাকে। সেজন্য ওর চলে যাওয়ার পরে সে স্বপ্নই আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল। বুঝলাম আমার চারদিকের বাস্তব অনেক কঠিন। বিশেষ করে আমার মতো একজন প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য যার পা দুর্বল, পোলিও আক্রান্ত। যে সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারে না।

তারপর থেকে রাজুর সঙ্গে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। মাঝে দশ বছর কেটে গেছে।

জানি না রাজুর কোনো বিপদ হয়েছে কিনা। ও কী করে যে আমাকে ভুলে গেল এটা আমার খুব অবাক লাগে, রাগও হয়।

এই বিপদের সময়ে ও যদি আমার পাশে থাকত, তাহলে আমার এতটা অসহায় লাগত না। এত ভয়ও লাগত না।

২

১৫ মে

এবারে গরম আরও বেশি পড়েছে। তবে আমাদের গ্রামে তার জন্য খুব অসুবিধে হয় না। চারদিকে বড়ো বড়ো গাছ। গাছের ছাওয়ায় গিয়ে বসলেই তখন আর গরম লাগে না। সেরকমই আজ বাসুদার পুকুরের ধারে একটা গাছের তলায় অনেকক্ষণ বসে ছিলাম। ঠিক যেমন আমি আর রাজু বসে থাকতাম। চোখ বন্ধ করে পাতার গানের সুর শুনলাম। কত অজানা-অচেনা শব্দ ধরা পড়ল। কত পাখির ডাক। বেশ খানিকক্ষণ বসার পড়ে মনটা একটু স্থির হল।

আসলে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। এত কিছুর চাপ নেওয়া খুব শক্ত।

কিছুদিন হল বাবার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে মাঝে-মধ্যে জ্বর আসত। দু-সপ্তাহ আগে জানা গেছে ব্লাড ক্যান্সার। লিউকোমিয়া। তবে শুরুর দিক। ভালো চিকিৎসা হলে ঠিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কী করব কিচ্ছু বুঝছি না। কোনো একটা ভালো হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হবে। কিন্তু আমাদের অত টাকা কোথায়? মা বহু বছর আগে মারা গেছে। যখন আমি স্কুলে পড়তাম। এসব আমাকেই করতে হবে শহরের হাসপাতালে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে। বাবা অবশ্য যেতে চায় না। জানে চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার। সে টাকা আমাদের নেই।

আমাদের ছোটো মুদির দোকান থেকে খুবই কম আয় হয়। আগে যা হত এখন আরও কমে গেছে। আসলে এখানে এখন দুটো বড়ো বড়ো স্টোর হয়েছে। তাদের স্টক অনেক বেশি। আমাদের দোকানে অনেক কিছুই থাকে না। তার মধ্যে এক নতুন সমস্যা শুরু হয়েছে। সমস্যা শুরু হয়েছিল গত বেশ কয়েক বছর ধরেই। তবে এখন সেটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে।

আমাদের এই গ্রাম বাংলাদেশের থেকে বেশি দূরে নয়। অনেক নতুন নতুন লোক তাই মাঝে-মধ্যেই দেখা যায় যারা ওপার থেকে আসে। থেকেও যায়। বেশ কয়েক বছর ধরেই বেশ কিছু খারাপ লোক আস্তানা গেড়েছিল এই গ্রামে। রাজনৈতিক মদতে তারা এখন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

আমাদের গ্রামে একটা শিশুদের শিক্ষা ও বিকাশ কেন্দ্র ছিল। বহু বছরের। হঠাৎ করে সেটা ভেঙে এখন ওখানে একটা মদের দোকান হয়েছে। বাবার মতো কয়েকজন সেটা নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল এখানকার পঞ্চায়েতে। তারপর থেকে ওরা আমাদের উপরে খেপে গেছে।

বাবা এমনিতে বেশ নিরীহ গোবেচারা মানুষ। কিন্তু একই সঙ্গে সততার প্রতি এমন একটা গভীর টান আছে যে কোনোরকম অন্যায় সহ্য করে না। প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করে না। সে প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন!

তবে এদের বিরুদ্ধে আমাদের মতো সাধারণ লোকেদের কিছুই করার থাকে না। উল্টে এখন আমাদের এখানে থাকাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরপরে ওরা দু-দিন দোকানে এসেও ভয় দেখিয়ে অপমান করে গেছে। আজও এসেছিল কয়েকজন মিলে। আমাদের দোকানে রাখা বিস্কুটের বাক্সটা টেনে নিয়ে বেশ কয়েকটা খেয়ে বাকি বিস্কুটগুলো সামনের রাস্তায় ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

বাবা দেখি চুপ করে বসে আছে। চলে যাওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল না। তারপরে বলে উঠল—এখন আর সৎ লোকদের বাঁচার কোনো উপায় নেই। আমরা মনে হয় না এই গ্রামে বেশিদিন থাকতে পারব।

৩

২২ মে

সামনে এখন অনেক জল। আমার দিকে আরও এগিয়ে আসছে। একটু একটু করে কোমরের উপরে উঠছে। জোয়ার আসছে। আমি সাঁতার ভালো জানি না বলে আমার যে ভয়টা চিরকাল ছিল, সেটা এখন আর নেই।

যখন কেউ সব কিছু হারিয়ে ফেলে, তখন তার নতুন করে হারানোর কোনো ভয় থাকে না। আমার এখন ঠিক সেরকম অবস্থা।

এর জন্য আমি কাউকে দায়ী করি না। এর জন্য আমিই দায়ী। এর জন্যে দায়ী আমার দুর্বল পা, স্বাভাবিক বুদ্ধি—কমনসেন্সের অভাব।

বাবার শরীর গত কয়েকদিনে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সেটা নিয়েই গত পরশু পাশের শহরের হাসপাতালে এসেছিলাম বাবার সব টেস্ট রিপোর্ট আর ডাক্তারের চিঠি নিয়ে। কিন্তু ওরা ভর্তি নিল না। কারণ ওরা জানে আমরা চিকিৎসার টাকা দিতে পারব না।

কিন্তু চিকিৎসা কিছু একটা করতেই হবে। বাড়িতে, ব্যাংকে সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা জোগাড় হল। সেটা নিয়েই আজ এসেছিলাম। কিন্তু ওরা দু-লক্ষ টাকার কম ডিপোজিট নিয়ে ভর্তি করবে না। অনেক অনুরোধেও রাজি হল না।

বেরিয়ে আসব, গেটের কাছে দেখি হাসপাতালের পোশাকে দুজন কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাঁদোকাঁদো মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা হয়তো আমার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরেছে।

আমার সব কথা ওরা ধৈর্য ধরে শুনল। তারপরে একজন বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, কেন হবে না! এত বড়ো অন্যায়। সবার ঠিক চিকিৎসার অধিকার আছে। ভর্তি করতেই হবে।

ঠিক এটাই আমি বলতে চাইছিলাম।

বলল হাসপাতালের প্রধানের সঙ্গে কথা বলবে যাতে আমার বাবাকে ভর্তি করা যায়। বলে আমার থেকে পুরো টাকাটা চেয়ে নিয়ে নিল। তারপরে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে ওরা দুজনে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকল।

কিন্তু সেই যে ঢুকল, দুজনেই দেখি আর ফেরে না। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরে আবার রিসেপশনে গিয়ে কথা বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম পুরোটাই লোক ঠকানো। এরকম ঘটনা আগেও হয়েছে। কিন্তু তাহলে কী করে এরা হাসপাতালের মধ্যেই হাসপাতালের কর্মচারীদের পোশাকে ঘুরছিল, বুঝলাম না। চেহারা,

মুখের বর্ণনা দেওয়ার পরেও ওরা কেউ চিনতে পারল না। অথচ ওরা তো এখানেই ছিল। বুঝলাম কিছুই করা যাবে না।

আমার শরীর খুব খারাপ লাগছিল। তাহলে কি আমার বোকামিতে বাবাকে ভর্তি করার যে সামান্য সম্ভাবনা ছিল, তাও আর সম্ভব হবে না? তাছাড়া দোকান চালানোর জন্য এর পরে ধার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর আমি বা আমার বাবা—আমরা কেউ কোনোদিন লোকের কাছে ধার চাওয়ার কথা ভাবতেও পারি না। এখন ঠিক করে নিয়েছি কী করতে হবে। আমি আর বাড়ি ফিরতে পারব না। সেজন্যে এখানে এসেছে। পাশের নদীতে।

জল বাড়ছে। আমার দিকে এগিয়ে আসছে একটা বড়ো জলস্রোত, বড়ো ঢেউ এগিয়ে আসছে আমার দিকে। হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই মনে হল পায়ের তলার মাটি যেন হারিয়ে গেছে। দূর থেকে কিছু লোকের চিৎকার কানে এল। আমি বুঝলাম আমি জলের তলায় একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছি। হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার খানিকক্ষণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু জলের স্রোত আমাকে তখন আরও গভীর জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আরও দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন বুঝছি এটা আমি চাইনি। বাবা কী করবে আমার মৃত্যুর খবর পেলে। মুহূর্তের ভুলে এরকম ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করলাম হাত-পা ছুড়ে ঘাটের দিকে ফেরার। কিন্তু যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছি ঘাটের থেকে। একই সঙ্গে আমার পুরো শরীর এখন জলের তলায়। মাথা ডুবে যাওয়ায় নাকে-মুখে জল ঢুকছে। একটু একটু করে যেন জ্ঞান হারাচ্ছি আমি। সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে আমার চেতনা, আমার চেনা-জানা পৃথিবী। মুছে যাচ্ছে জীবন আর মৃত্যুর মাঝের রেখাগুলো।

মনে হল আমি যেন মারা যাচ্ছি। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। যেন আমার মতো সুখী মানুষ আর কেউ নেই। কোনো চিন্তা নেই, কোনো ভাবনা নেই। কী অপূর্ব এক অপার্থিব শান্তি। মনে হল একটা অন্ধকার টানেল দিয়ে কোথায় যেন ভেসে যাচ্ছি। তারপরে হঠাৎ মুখের উপরে পড়ল উজ্জ্বল এক আলো। এত উষ্ণতামাখা সে উজ্জ্বল আলো যে মনে হল এ আলোয় আমি চিরকাল থাকতে পারি।

৪

তারিখ জানি না

এটা কোথায়? আমি একটা সমুদ্রের ধারে বসে আছি। পায়ের কাছে হালকা সামান্য উষ্ণ জলের ঢেউ এসে মিশছে। চারদিকে মিহি সাদা বালি। আমি কোনোদিন সমুদ্র দেখিনি। একেই কি সমুদ্রতট বলে?

এরকম দেখেছি শুধু সিনেমায়। অনেক ভিডিয়োতে। অভাবের সংসারে কখনো কোনোদিন যাওয়া হয়নি।

মনে আছে একবার বাবা পুরী যাওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু শেষে কী কারণে যেন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এখানে আমি এলাম কী করে?

জলে ভেসে কি আমি নদীর অন্য ধারে গিয়ে উঠেছি? কিন্তু সামনে এটা তো নদী নয়। তাহলে অন্য দিক দেখা যেত। সামনে যদ্দূর দেখা যাচ্ছে শুধু জল আর জল। এতো সমুদ্র।

চেনা কোনো জায়গার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পেলাম না।

মাথার উপরের আকাশ ঘন নীল। শুধু ছেঁড়া কিছু সাদা মেঘ ভাসছে।

উঠে দাঁড়ালাম। পা যেন মিহি বালির মধ্যে ডুবে আছে। কী আরাম! আমাদের গ্রামের মতো এখানে গরম নেই। মিষ্টি হাওয়া বইছে।

এটা কি কোনো দ্বীপ? সমুদ্রতট দিয়ে কিছুটা হাঁটার পর দ্বীপের ভিতরদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। কিছুটা হাঁটার পর দেখতে পেলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে পর পর কিছু বাড়ি। সব এক ধরনের। কিন্তু বাড়ির রংগুলো আলাদা আলাদা, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ—কত রঙের। কী সুন্দর সুন্দর দোতলা বাড়ি। আমাদের গ্রামের পল্টুদার বাগানবাড়ি যেরকম, সেরকম!

প্রত্যেকটা বাড়ি ঘিরে পাইনের বন। তাছাড়া বট, অশ্বত্থ, নারকেল, খেজুর গাছও আছে। কিন্তু আশেপাশে কোনো লোক দেখতে পেলাম না।

একটা বাড়ির দরজা দেখি খোলা। কেউ আছে কি বাড়িতে! জিজ্ঞেস করতে এগিয়ে গেলাম। অবাক হলাম। বাড়ির দরজা হাট খোলা। কিন্তু ভেতরে কোনো লোক নেই।

ঢুকেই সামনে একটা বড়ো ঘর পড়ল।

দেখি একটা টেবিলের উপরে নানান খাবার সাজানো। তার মধ্যে অনেকগুলোই আমার বেশ পছন্দের খাবার। লুচি, মাংস, কাটলেট।

খুব খিদে পেয়েছিল। সারাদিন শহরে ঘুরেছি। কিছু খাওয়া হয়নি। সকালে শুধু মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিলাম।

তাছাড়া এরকম চমৎকার চিংড়ির কাটলেট আগে কোনোদিন খাইনি। এমন লুচি আর কষা মাংসও খাইনি। কিছুক্ষণ আগেই যেন করা হয়েছে। গরম লুচি। ক-টা লুচি খেলাম কে জানে! শেষ লুচিটা খাচ্ছি, চোখে একটা সাদা কাগজ পড়ল। দূরে টেবিলের উপরে রাখা আছে। হাতে নিয়ে উল্টে দেখি তাতে একটা কবিতার কয়েকটা লাইন। সেটা পড়ার পরেই কী হল জানি না, ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাতে লেখা ছিল—

রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনেকো কারা সে—
কালকে যা হয়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাটলেট লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরও কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুগনি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ খেপে গেছি—আর কত পারব?
এতদিন সয়ে সয়ে এইবারে মারব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁশিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা ।

পালিয়ে আসার আগে খেয়াল হল, আরে এতো সুকুমার রায়ের সেই 'চোর ধরা' কবিতা। মনে পড়তেই ছুটতে ছুটতে বেশ হাসি পেল। এখানে আবার কে লিখল, সেই কবিতা! কোনো পাগল লোক থাকে ওই বাড়িতে! আমি আবার ঠিক তারই খাবার খেয়ে ফেলেছি। পরে দেখে কী করবে কে জানে! নিজের মনে খানিক হেসে নিলাম।

এই কবিতাটা আমার খুব প্রিয় ছিল। পুরো কবিতাটা এখনও মুখস্থ আছে সুকুমার রায়ের অন্য অনেক কবিতার মতোই।

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা! না, কেউ আসছে না।

আমি কোথায় এসে পড়েছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিন্তু সবই যেন আমার পছন্দের। যেন আমার স্বপ্নরাজ্যে এসেছি। কী সুন্দর ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা। দু-ধার দিয়ে নানান রঙের গাছ। তাতে আবার সব বিভিন্ন ধরনের ফুল।

বেশ কিছু হাঁস, হাঁসের বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত পাখি এখানে! কোকিল, দোয়েল, তিতির, কাঠঠোকরা, বসন্তবৌরি, টিয়া। দূরে গাছে একটা বিশাল রাজধনেশ পাখি বসে আছে। কিছু দূরে একটা ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এত সুন্দরও কোনো জায়গা হয়!

কিন্তু কোনো লোক নেই কেন! হঠাৎ খেয়াল হল দূরে একটা বেঞ্চিতে একটা লোক কালো পাঞ্জাবি পরে বসে আছে। লোকটা হাতে একটা খাতা আর পেন নিয়ে বসে কী যেন ভাবছে। কবি বা লেখক হবে হয়তো।

লোকটার সামনে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কী? এটা বারাসত থেকে কতদূরে? এখান থেকে বারাসতের বাস পাওয়া যাবে?

কিন্তু লোকটা মুখ তুলে তাকাতেই ভয়ে আর প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করলাম না—

লোকটার চোখে-মুখে বিরক্তি।

কী আশ্চর্য, এরকমও মিল হতে পারে! অবিকল সুকুমার রায়ের সেই 'গোঁফ চুরি' কবিতার বড়োবাবুর মতো দেখতে। মাথা ভরা টাক। শুধু দু-কানের পাশে কিছু চুল। কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছে আমাকে দেখে। খ্যাংড়া কাঠির মতো বিশাল গোঁফ। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে।

হেড আফিসের বড়োবাবু লোকটি বড়োই শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জান্‌ত?

আমার মনে এই দুটো লাইন যেন সঙ্গে সঙ্গে চলে এল। আর জিজ্ঞেস না করে সরে এলাম। লোকটা কীসব বিড়বিড় করে বলে আবার কীসব লিখতে শুরু করল।

আর তখনই চোখে পড়ল কিছু দূরের হালকা হলুদ রঙের বাড়িটা। তার দরজায় দেখলাম বড়ো বড়ো করে লেখা আমার আরেক প্রিয় কবিতার কয়েকটা লাইন যা দেখলেই আমার সবার আগে আমার বন্ধু রাজুর কথা মনে পড়ে।

একটা অঙ্কের উত্তরে ঠিক এই কবিতাটা লেখার জন্য স্কুলে রাজু অঙ্কের শিক্ষক সৌজন্যবাবুর কাছে খুব বকুনি খেয়েছিল। ওর ধাঁধার মাধ্যমে হেঁয়ালি করে সব কিছু বলার বা উত্তর দেওয়ার একটা প্রবণতা ছিল। একটা অঙ্কের উত্তর ২১ আসায় ও তার বদলে লিখেছিল এই কবিতা।
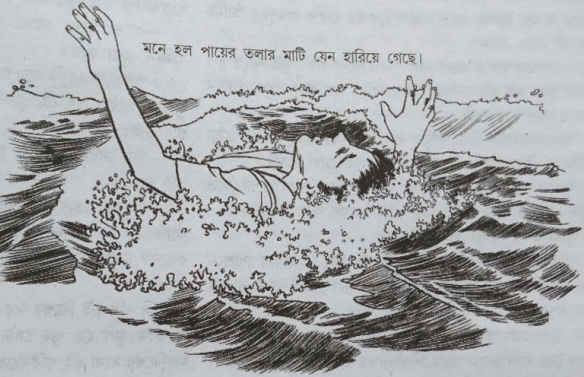
মনে হল পায়ের তলার মাটি যেন হারিয়ে গেছে।

যে সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে,
কানের কাছে নানান্ সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদির খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

একুশে আইন—কবিতার কয়েকটা লাইন লিখে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে অঙ্কের উত্তর 'একুশ'। প্রথমে না বুঝে সৌজন্যবাবু খুব রেগে গিয়েছিলেন রাজুর উপরে।

কিন্তু কোনো জায়গায় বাড়ির দেওয়ালে এরকম কবিতা লেখা থাকতে আমি কখনো দেখিনি।

তাছাড়া এখানে সব কিছুর সঙ্গে সুকুমার রায়ের ছড়ার এরকম যোগাযোগ কেন? রাজু থাকলে দেখে খুব মজা পেত। আপনমনে 'রাজু' বলে উঠলাম।

দেখি ইতিমধ্যে দরজা দিয়ে কে একজন বেরিয়ে আসছে। একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপরেই সেই অতিপরিচিত হাঁটা, মাথা

ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, আর মুখের হাসিটা দেখে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলাম না।

তারপরে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম—রাজু!

রাজু আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একটু যেন মোটা হয়েছে।

৫

—রাজু! তুই এখানে? ছুটে গেলাম ওর দিকে।

ওর মুখে সেই চেনা হাসি। ওর সেই সারল্য।

—আমি তো এখানেই থাকি। তুই এসেছিস শুনে ছুটে এলাম।

—মানে? তুই এখানে থাকিস? এই জায়গার নাম কী? এরকম কোনো জায়গা আছে, সেটাই জানতাম না। কী সুন্দর! সব কিছু যেন আমার ইচ্ছের মতো। এটা বারাসত থেকে কতদূর? আমিই বা কী করে এলাম?

—আরে দাঁড়া। ওয়েট কর। এতগুলো প্রশ্ন। তুই আগে চুপ করে বস। চল ওই বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। গল্প করা যাক। কতদিন তোর সঙ্গে গল্প হয়নি।

বলে আমাকে নিয়ে বাড়ির সামনে একটা ভারী সুন্দর কাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

মাথার উপর দিয়ে দুটো কাক ক্যা ক্যা করে উড়ে গেল। তাদের যেতে দেখে ও হেসে বলে উঠল, এই দুটো সারাক্ষণ ঝগড়া করে যায়।

বুঝলাম ও কিছুই পাল্টায়নি।

বলে উঠলাম, কতদিন তোকে খুঁজেছি। তুই যে হাবড়া স্টেশনে বসে ছবি আঁকতিস, সেখানেও গেছি কতদিন। কেউই জানে না তুই এখন কোথায়।

—হ্যাঁ, আসলে এই ভাষা শেখাটা অনেকটা নেশার মতো। তোকে তো বলেছিলাম আমি পিঁপড়েদের ভাষা শিখে নিয়েছিলাম। ওরা সবাই ভালো। ওদের থেকে অনেক কিছু শিখেছিলাম। এখনও আমার সঙ্গে ওদের নিয়মিত কথা হয়। আমি ইচ্ছেমতো ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি।

কিন্তু ওই যে 'ভয়নিচ ম্যানাস্ক্রিপ্ট', সেখানে আরেকটা ভাষার কথাও ছিল। তবে সে ভাষাটা উদ্ধার করতে আরও সময় লাগল। রজার বেকন লোকটা সত্যি জিনিয়াস ছিল।

—সেটা আবার কীসের ভাষা?

—বলছি। একটু বাদে। সেটা উনি যে পুরোটা জানতেন তা নয়। কিন্তু শুরুটা উনি করেছিলেন। পুরোটা বুঝে উঠতে পারেননি। আমি তার পরের অংশটা আবিষ্কার করি। সেটা আবিষ্কার, হ্যাঁ, আবিষ্কারই বলা চলে। সেজন্যেই আমাকে গ্রাম ছাড়তে হয়। এই ভাষাটা আরও অনেক বেশি শক্তিশালী। কীজন্য ব্যবহার করা হয় সেটা আমি প্রথমে বুঝিনি। কিন্তু ব্যবহার শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম। আর সে ভাষা শিখেছিলাম বলেই তো তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম। এখন আর ভয় নেই তোর, আমি সঙ্গে আছি। ওরাও সঙ্গে থাকবে।

—ওরা মানে?

—বলছি। তার আগে এই জায়গাটা ভালো করে দেখাই। সবার আগে আমার বাড়িতে চল।

৬

দুপুরে রাজুর বাড়িতে কাটালাম। ওর বাগানটা বেশ বড়ো। নানান ধরনের গাছ। চেনা-অচেনা নানান পাখির কূজনে বাগান যেন মুখর হয়ে আছে। ওর পড়ার ঘরে দেখলাম বই-এর স্তূপ। তার মধ্যে অনেক বই সংকেতের উপরে। বুঝলাম এই বিষয়ে আমার বন্ধুর উৎসাহ সামান্যতম কমেনি।

বলে উঠলাম, তোর কি এখনও সব সাংকেতিক বার্তার অর্থ খুঁজে বার করতে ভালো লাগে?

—হ্যাঁ, ওটাই তো আমার নেশা, আমার জীবন। আমাদের চারদিকে অজস্র সংকেত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কিছু সংকেত উদ্ধার করা খুব শক্ত। প্রকৃতি চায় না যে তার সব রহস্য আমরা কোনোদিন জেনে যাই। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমার সব কথা তো এরকম সাংকেতিক ভাষাতেই হয়।

—কাদের সঙ্গে? আচ্ছা, তুই যে সমানে 'ওরা', 'ওদের' বলে যাচ্ছিস, ওরা কারা?

—আচ্ছা, তোর কি মনে হয় এই মহাবিশ্বে শুধু আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী? শুধু এই পৃথিবী ছাড়া এই মহাবিশ্বে অন্য কোথাও প্রাণ নেই?

—হ্যাঁ, সেরকম কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই না?

—আচ্ছা, তোর কি ধারণা সত্যিকারের বুদ্ধিমান কোনো অ্যালিয়েন কোনোদিন সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে? সেটা না করাই তো ওদের বুদ্ধিমত্তার সবথেকে বড়ো প্রমাণ।

যদি বলি এই বিশ্বের সব খেতে শুধু একরকম ফসল হয়, শুধু একরকম ফুল হয়, তুই সেটা বিশ্বাস করবি! নিশ্চয়ই করবি না! মহাবিশ্বের মধ্যে এই পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান জীব, এটা ভাবাও ঠিক সেরকমই।

অ্যালিয়েন আছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেও পেরেছি। যদি এবার বলি এই অ্যালিয়েনরা এমন একটা উন্নততম সাংকেতিক ভাষা তৈরি করেছে, যা শুধু অত্যন্ত বুদ্ধিমান হলেই বোঝা সম্ভব, সেটা জানলেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, তাহলে?

এই ভাষা জানলে শুধু ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নয়, আরও অনেক কিছু করা যায়, যেমন তোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম।

—কী বলছিস? আর সে ভাষা তুই জেনে গেছিস? ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছিস?

—হ্যাঁ, এখন জেনে গেছি। সে বিষয়ে পরে আরও বলব। তবে তার আগে তোকে আরেকটু দেখাই এই জায়গাটা। তুই বাড়ির কথা বল। গ্রামের কথা বল।

এবারে আমাদের মধ্যে অন্য অনেক কথা হল। অনেক গল্প। অনেক দিনের জমে থাকা গল্প। গ্রামে এখন কী হয়েছে, কীভাবে কিছু খারাপ লোক আমাদের গ্রামের সবার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, সে সব নানান কথা। একই সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার

আমরা বাগানে বসে একসঙ্গে পাখির ডাক, গাছ, ফুল, পাতার গল্পও শুনলাম।

—আমার এই জগৎটা খুব ভালো লাগে। কারণ কী জানিস?

—সে তো লাগবেই। এমন সুন্দর পরিবেশ, এমন সুন্দর সমুদ্র, বাড়ি, সব কিছুই খুব সুন্দর এখানে।

ও হেসে বলে উঠল,—আরে না, না, সেজন্য নয়। এ জগতে চারদিকে ছড়িয়ে আছে ধাঁধা, সংকেত। ঠিক যেজন্য তুই ওই কবিতা দেখে আমার কথা ভাবতে পারলি, আমাকে খুঁজে বার করতে পারলি, এখানে ঠিকভাবে ডিকোড করতে পারলে সব কিছু খুঁজে পাওয়া যায়।

—সেরকম আবার হয় নাকি!

ও হেসে বলে উঠল।—হ্যাঁ, এখানে তো হয়। আচ্ছা, চারদিকে কত সংকেত ছড়িয়ে থাকে, তা জানিস? আমাদের বিশ্বেই ধর। আমরা খবর রাখি না বলে জানি না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলও নির্ধারণ করেছিল সংকেত উদ্ধারের ক্ষমতা, সেটা নিশ্চয়ই জানিস। তুই জোহানেস ট্রিথেমিয়াসের নাম শুনেছিস?

ঘাড় নাড়িয়ে না বলতে ও বলে উঠল, ট্রিথেমিয়াস ছিলেন খুব প্রতিভাবান একজন ম্যাথামেটিশিয়ান, যিনি ক্রিপ্টোগ্রাফির উপরে প্রথম বই লেখেন। নাম ছিল 'স্টেগ্যানোগ্রাফিয়া'। ভ্যাটিকান অর্থাৎ চার্চ থেকে নিষিদ্ধ বই-এর তালিকায় ওই বইটাকে ঘোষণা করলেও বইটা খুব জনপ্রিয় হয় ওঠে। কোনো সাংকেতিক বার্তা কীভাবে গোপনভাবে পাঠানো যায়, সে বিষয়ে নানান পদ্ধতি বলা হয়েছিল বইটাতে।

ভয়নিচের ম্যানাসক্রিপ্টের বাইরে এরকম অনেক সংকেত রহস্য আমাদের চারদিকে লুকিয়ে আছে আর নানান কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে গোপনে কিছু খবর পাঠানো যায়। সে বার্তা অন্যরা পেলেও কিছু বুঝতে পারবে না।

—কিন্তু তুই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কী কথা বলছিলি?

—হ্যাঁ, বলছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একদিকে তখন ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স, অন্যদিকে জার্মানি। দু-দিকেই প্রচুর হতাহত। দীর্ঘ যুদ্ধ চলছে, তো চলছেই। এত সেনা মারা যাচ্ছে যে যার দিকে কমবয়সি সেনা বেশি পড়ে থাকবে, সেই জিতবে। আমেরিকা যদি কোনো একটা দিকে যোগ দেয়, তাহলে একটা নির্ণায়ক ফলাফল হবে। কিন্তু আমেরিকা দু-দিক থেকেই সমদূরত্ব রেখে নিউট্রাল থাকতে চাইছিল। ইউরোপে যুদ্ধ যত বেশিদিন চলে, তাতে আমেরিকার লাভও তত বেশি। দু-তরফেই অস্ত্রের সাপ্লাই আসে ওদের থেকে। তাতে ওদের ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠছিল।

ঠিক সেই সময় একটা সাংকেতিক বার্তা উদ্ধার হল, আর তার জন্য পাল্টে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যৎ। ওই সাংকেতিক বার্তার আড়ালে লুকোনো তথ্য জানার পরেই আমারিকা আর নিরপেক্ষ না থেকে ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের দিকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

—কী ছিল সেই সংকেতে?

—জার্মানি একটা এনক্রিপটেড মেসেজ পাঠিয়েছিল মেক্সিকোর কাছে যে মেক্সিকো সাহায্য করলে জার্মানি মেক্সিকোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমেরিকা আক্রমণ করবে। প্রতিদানে টেক্সাস, নিউমেক্সিকো, অ্যারিজোনা আরও কিছু জায়গা মেক্সিকোকে আমেরিকার থেকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল জার্মানি।

এসব সাংকেতিক মেসেজ পাঠানো হত জার্মানির এক বিশেষ কোডবুকের সাহায্য নিয়ে, যার নাম ছিল '০০৭৫'। কিন্তু জার্মানি থেকে মেক্সিকো টেলিগ্রাফের মাধ্যমে পাঠানো সেই মেসেজ দুই ক্রিপ্টোগ্রাফার উইলিয়াম মন্টগোমারি ও নাইজেল ডি গ্রে উদ্ধার করে ফেলেন। সে খবর আমেরিকার কাছে যায়। তখনই আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের দিকে যোগ দেয়। ওরা যুদ্ধ জেতে।

দেখ সামান্য একটা সাংকেতিক বার্তা এভাবে একটা যুদ্ধের ফলাফল পাল্টে দিল।

—বাপস রে! সত্যি তাই, তুই এখন ওখানে না থাকায় এসব কথা জানতেই পারি না।

—এরকম কত যে উদাহরণ আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সব বড়ো ঘটনার পিছনেই খোঁজ নিলে দেখবি, এরকম কোনো সাংকেতিক বার্তা আছে। অনেকক্ষেত্রে আমরা জানিই না।

বলে ফের বলে উঠল—এই যে ধর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার যোগদান তার মূলেও কী ছিল বল তো?

—জাপানের পার্ল হারবারে অ্যাটাক?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। কিন্তু সেখানেও কিন্তু ব্রিটিশ কোডব্রেকাররা আগে থেকেই জাপানের কোডব্রেক করে জানতে পেরেছিল যে এরকম হবে। কিন্তু ইচ্ছে করে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বা জানায়নি, যাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্ক রুজভেল্ট এর জন্য যুদ্ধে যোগ দেয় ও জাপান আক্রমণ করে। ওই ঘটনায় ২৪০০ আমেরিকার সেনা মারা যায়। সেজন্য আমেরিকার জাপান আক্রমণ না করে কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আগে থেকে ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

বলতে পারিস ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, অনেক রাজা-রাজড়ার, সেনাপতি বা রাজনীতির লোকের থেকেও এসব ক্রিপ্টোলজিস্টদের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারাই ইতিহাস পাল্টেছে বারবার।

—কীরকম? সে আবার কী করে হয়? যুদ্ধ তো হয় রাজাদের মধ্যে, সেনার মধ্যে।

—ধর এডওয়ার্ড ওয়াইলস-এর কথা। অসম্ভব প্রতিভাবান ক্রিপ্টোলজিস্ট। আমি যখন ওর কাজ দেখি, ওর প্রতিভা দেখে খুব অবাক হই। সেই সময়ে সুইডেনের একটা পরিকল্পনা ছিল ইংল্যান্ডে বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধ শুরু করার। সেজন্য আড়ালে থেকে বিভিন্ন ঘটনা ঘটাচ্ছিল। একটা ৩০০ পাতার জটিল সংকেত উদ্ধার করে সেটা এডওয়ার্ড ওয়াইলস বুঝতে পেরে যায় ও সেটা যাতে না হয় সে ব্যাপারে রাজাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলে।

এভাবে একের পর এক সংকেত উদ্ধার করে এডওয়ার্ড ক্ষমতার কেন্দ্রে উঠে আসে। ও এই সংকেত উদ্ধারের কাজটাকে প্রায় ফ্যাক্টরির পর্যায়ে নিয়ে যায়। ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান, পর্তুগিজ, জার্মান, ইতালিয়ান, গ্রিক, ডাচ, সুইডিশ—পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই

সাংকেতিক বার্তা থাকুক না কেন, সেটা থেকে সহজ সরল ইংরাজিতে সেই সংকেতের আসল অর্থ ও একদিনের মধ্যে বার করে নিতে পারত। সেজন্যে সেই সময়ে ইংল্যান্ড সারা বিশ্বের মধ্যে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সংকেত উদ্ধারের ক্ষমতা এতটাই দরকারি ছিল, আজও আছে।

একটা উদাহরণ দিই। ১৭৬১-তে স্পেনের দূতেদের মধ্যে এক গোপন সাংকেতিক বার্তা উদ্ধার করে এডওয়ার্ড বুঝতে পারে যে ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধে স্পেন ফ্রান্সের দিকে যোগ দেবে। বুঝতেই পারছিস, এরকম খবরের তাৎপর্য কত?

কিন্তু সেই এডওয়ার্ডও সারা জীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছে এই ইউনিভারসাল ল্যাঙ্গোয়েজ বা ভাষা উদ্ধারের জন্য, যার কথা আমি আগেই বললাম। পারেনি শেষে।

পরে সাংকেতিক বার্তা আদান-প্রদানের কাজ করেছে অনেক ক্রিপ্টোলজিস্ট স্পাই, বা গুপ্তচর যাদের জন্য অনেক দেশের ভবিষ্যৎ, এই বিশ্বরাজনীতি, ক্ষমতার চালচিত্র—সব পাল্টে গেছে।

—ক্রিপ্টোলজিস্ট স্পাই?

—হ্যাঁ, ঠিক এরকম একজন স্পাই-এর কথা বলি, যাকে এখনও এত বছর পরেও চিহ্নিত করা যায়নি। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছি সে কে ছিল। বলতে পারিস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বা জার্মানির হারের মূলেও সে ছিল। তার কোড নেম ছিল 'ওয়েরদার'। এই কোড নেমের আড়ালে আসলে কে ছিল, সেটা কেউ আজও বুঝতে পারেনি।

কিন্তু তার মাধ্যমেই জার্মানির সব খবর চলে যেত রাশিয়ার কাছে, স্ট্যালিনের কাছে, অনেক আগে থেকে। এমনকী জার্মান আর্মি তুরস্কে কবে আসবে, সঙ্গে কটা ট্যাঙ্ক থাকবে, কত সেনা থাকবে, এসব আগে থেকেই এভাবে জেনে যেত রাশিয়ান আর্মি। জার্মানির যুদ্ধের সব কলাকৌশল, প্রস্তুতি—সব ডিটেলস এভাবেই পৌঁছে যেত রাশিয়ার মিলিটারির কাছে। পুরো এই তথ্য আদান-প্রদান হত জটিল সাংকেতিক বার্তায়। আমি সে সব উদ্ধার করে পরে বুঝতে পারি যে 'ওয়েরদার' আর কেউ নয়, ছিল স্বয়ং মারটিন বোরম্যান, হিটলারের ডেপুটি, কিন্তু আসলে ছিল রাশিয়ার স্পাই, যার খোঁজ নাৎসিরা পায়নি। শুধু ভেবে দেখ, সরকারের কেন্দ্রে বসে আছে একজন অন্যদেশের গুপ্তচর, তাও আবার জার্মানির মতো এক দেশে হিটলারের চোখের সামনে—যে হিটলার নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করত না। এর পরে আর কেউ জিততে পারে! সেই অসাধারণ প্রতিভাবান গুপ্তচর মারটিন বোরম্যানও এই মহাবিশ্বের গোপন সাংকেতিক ভাষা খুঁজতে খুঁজতে শেষে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ২৭ বছর পরে রাশিয়ায় আত্মহত্যা করে।

আমি সেসব তথ্য জানতে পেরেছি, যদিও সারা বিশ্বের সামনে এটা এখনও রহস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে উনি কোথায় ছিলেন, কোথায় গেলেন তা আজও কেউ জানে না। আমি কিন্তু সব জানতে পেরেছি। সাংকেতিক বার্তা উদ্ধারের ক্ষমতা থাকলে এই সুবিধে, তুই সব কিছুর পিছনের আসল সত্যটা জানতে পারবি।

—কিন্তু আমাকে আজ হঠাৎ করে এসব বলছিস কেন?

ও মুচকি হেসে পাশের কৃষ্ণকমল ফুলটাতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—এর থেকেই বুঝতে পারছিস, যদি কোনো শক্তি সত্যিকারের শক্তিশালী হয়, তাহলে তারা এমন সাংকেতিক বার্তায় কথা বলবে যা আর কেউ বুঝতে পারবে না। যার সাংকেতিক বার্তা যত উন্নত হবে, সে তত শক্তিশালী হবে। সেজন্যই ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গোয়েজ বোঝা এত শক্ত। এটা কোনো জীবের বুদ্ধিমত্তা বিচার করার এক মাপকাঠিও বলতে পারিস।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম।

একটু থেমে রাজু ফের বলে উঠল, আমি আসলে এ সব বিষয় নিয়ে সবসময় মেতে থাকি বলে তোকেও অনেক কথা বলে ফেললাম। অন্য প্রসঙ্গে যাই। তোর কার কথা সব থেকে বেশি মনে পড়ে?

আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম—হঠাৎ করে? কে জানে! আমি নিজেই ঠিক জানি না।

ও মুচকি হেসে বলে উঠল, তোর বলার দরকার নেই। আমি জানি। তাহলে চল, বাইরে ঘুরে আসি। তুই একটা সারপ্রাইজের জন্য রেডি থাক।

৭

আমরা এবারে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে এই দ্বীপটা যেন সত্যি সেরা সব কিছু দিয়ে সাজানো হয়েছে। কী নেই এখানে! কী মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া বইছে। দূরে সামান্য পাহাড়-উপত্যকা-জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। মাথার উপরে নীল আকাশ। বাতাসে জুঁই আর গোলাপের মিষ্টি গন্ধ মিশে আছে।

আমরা রাস্তা দিয়ে এগোতে থাকলাম। এখানে কিন্তু কোনো লোকের দেখা পেলাম না। কিছুটা এগোনোর পরে যে জায়গায় এসে পৌঁছোলাম, সেখানে আমাদের গ্রামের মতোই চেনা নানান গাছ। একটা বড়ো পুকুর, পুকুরের ঘাট। পুকুরের জল কাচের মতো এত স্বচ্ছ পরিষ্কার যে একদম নীচ অব্দি দেখা যাচ্ছে।

উলটো দিকে একটা নীল রঙের বাড়ি। নীল রং আমার মার খুব পছন্দ ছিল। সে বাড়ির কিছু ঘরে আলো জ্বলছে।

রাজু বলে উঠল, চল, ওই বাড়িটাতে যাওয়া যাক। দেখা যাক কে থাকে!

আমি বলে উঠলাম, ধুর, ওরকম যার-তার বাড়িতে ঢুকে যাওয়া যায় নাকি! কী বলছিস!

রাজু শুনে মুচকি হাসল। বলে উঠল, হতেও পারে তো যে তুই তাকে চিনিস!

আমি ওর সঙ্গে বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজা বন্ধ।

আমাকে বলে উঠল, এখানে এটাই নিয়ম—সব বাড়ির দরজা খুলবে তখনই, যখন তুই বাড়ির জন্যে ঠিক কোড বলবি। বা বাড়িতে যে থাকে তাকে ঠিকভাবে ডাকবি। ঠিক যেমন আমার সময়ে তুই প্রায় খেয়াল না করেই আমার নাম বলেছিলি। ওটা শুনেই আমি এগিয়ে এসেছিলাম।

—তা তুই বলে দে না। তুই নিশ্চয়ই জানিস। আমি কী করে জানব!

রাজু ঘাড় নাড়ল, উঁহু, আমি বললে চলবে না। তুই কী করে এ বাড়িতে ঢুকবি। আমাকে তো সবাই চেনেই। ভেবে বল।

আমি চুপ করে ছিলাম খানিকক্ষণ। কিছুই মাথায় আসছিল না। কিন্তু বাড়ির বাইরের বাগান, সূর্যমুখী আর জুঁইফুলের গাছটা দেখে আপনা থেকে কেন জানি বলে উঠলাম—মা। মার খুব পছন্দ ছিল এই দুই ফুল।

বলতেই দরজা খুলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে রাজু আমাক নিয়ে ঢুকল। কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে একটা ঘরে ঢুকতেই বুঝলাম এটা রান্নাঘর। এ ঘরে আলো একটু কম।

সেই ঘরে ঢুকেই পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরের অন্য প্রান্তে মা দাঁড়িয়ে আছে। রান্না করছে। মার বেশি শাড়ি ছিল না। সেই যে হালকা নীল শাড়িটা পরে রান্না করত, সেই শাড়িটাই পরে আছে।

আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মা কী করে এখানে আসবে মৃত্যুর এত বছর পরে! কিন্তু এ তো সত্যি মা। হ্যাঁ, স্পষ্ট, আমার মা আমার থেকে দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। চোখে জল। চোখ ছলছল করছে।

—বাবুন!

—মা তুমি?—ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম মাকে।—তুমি এখানে কী করে?

মার চোখে জল, একসঙ্গে হাসি।

কত কত দিন বাদে দেখলাম মাকে।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার অবিশ্বাসের চোখে তাকালাম। এ কী করে হয়! মা তো মারা গিয়েছিল যখন আমি ক্লাস সিক্সে। হঠাৎ করে ক-দিনের জ্বরে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

তারপরে কত দিন রাত মাকে খুঁজেছি। মার জন্য কত রাত একা কেঁদেছি। এক সময় পড়াশোনাও ছেড়ে দিয়েছিলাম এজন্য। রাজু বলার পরেই আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিলাম। সেই মা, আমার সামনে! মাকে আমি স্পর্শ করতে পারছি। রাজুকে জিজ্ঞেস করে উঠলাম—এ কী করে সম্ভব!

রাজুর চোখেও জল। শুধু বলে উঠল, না। সেসব কথা পরে বলব। এখন বলা যাবে না।

আমিও আর কিছু বললাম না। আজ অনেককিছুই হচ্ছে যাকে লজিক দিয়ে বোঝানো যায় না। কিছু সময় হৃদয়ের কাছে বুদ্ধির হার মানা ভালো।

সেই দিন, সেই সারা রাত শুধু মার আর রাজুর সঙ্গে কথা হল। কত কথা। মার সেই সরল প্রশ্নগুলো, ঠিক করে খাস তো?

—মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো?

বললাম যে সে সব পর্যায় আমি অনেকদিন আগে পেরিয়ে এসেছি। এখন চাকরি খুঁজছি।

—বড্ড রোগা হয়ে গেছিস। ঠিক সময়মতো খাচ্ছিস তো? বলেছি না সকালে খালি পেটে একদম বেশিক্ষণ থাকবি না।

—মা, আমি আগের থেকে অনেক মোটা হয়েছি, সবাই বলে। তুমি সব সময় আমাকে রোগাই দেখো।

আমাদের মধ্যে কথা চলতেই থাকে। কত বছরের জমে থাকা কথা। কত বছরের অপ্রাপ্তি, কত বছরের স্বপ্ন। মা ঠিক আগের মতোই আছে।

ভোর যখন হয়ে এল, তখনো বুঝিনি যে অনেক কথাই বলা হয়নি। আমরা তখনো ওই কিচেনে বসে গল্প করে যাচ্ছি। মায়ের হাত ধরে

ও মুচকি হেসে বলে উঠল, তোর বলার দরকার নেই।

কথা বলে যাচ্ছি তখনো। এই হাত আমি কখনো ছাড়ব না।

রাজু হঠাৎ বলে উঠল, এবারে যেতে হবে। আর সময় নেই।

—কোথায় যেতে হবে? আমি এখানেই থাকতে চাই। বাবাকেও এখানে নিয়ে আসব।

—তা তো হয় না। তোকে এবারে সব বোঝাই। এবারে তুই আবার ভালো করে চারদিকে চেয়ে দেখ। কেউ কোথাও নেই।

চারদিকে তাকালাম।

মুহূর্তের মধ্যে যেন সব কিছু হারিয়ে গেল ফের। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম—মা—মা কোথায়?

দেখি শুধু রাজু দাঁড়িয়ে আছে, আমি সেই সমুদ্রের ধারে বসে আছি।

রাজু বলে উঠল, ওরা চাইলে তোর পছন্দের জগৎ তৈরি করে দিতে পারে। যা দেখছিলি—যা শুনছিলি, সব ওরা তোর জন্যেই

করেছিল। এটা তোর তৈরি করা জগৎ, তুই যা চাইছিলি মনের গভীর থেকে, সেটা বুঝেই ওরা ঠিক সেরকম তৈরি করে দিচ্ছিল।

আমার কথাতেই ওরা অনুরোধ রেখেছে। ওদের তৈরি মেটাভার্স শুধু তোর জন্য, যার আসল কোনো অস্তিত্ব নেই। ওরা এটা পারে। এটা না করলে তুই ফিরে আসতেও পারতিস না।

—কারা ওরা? আমি কোথায় ফিরে আসব?

—ওরা অন্য জগতের লোক। বহু ছায়াপথ দূরের এক গ্রহে ওরা থাকে। কিন্তু আমার ভাষার মাধ্যমে আমার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ থাকে। তোকে বলছিলাম না, এ এক ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গোয়েজ—সাংকেতিক ভাষা। যা বিশ্বের সেরা ক্রিপ্টোগ্রাফাররা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উদ্ধার করার চেষ্টা করে গেছে। কিন্তু পারে নি। আমাকে 'ভয়নিচ ম্যানাসক্রিপ্ট' কিছুটা সাহায্য করেছিল। রজার বেকন এ নিয়ে বেশ ভালো কাজ করেছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত এই ভাষা নিজে উদ্ধার করতে পারেনি। একই ভাবে যাদের সবার কথা বললাম, এরা সবাই একটু একটু করে এগিয়েছিল, কিন্তু কেউ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি। মজার কথা কী জানিস, আমাদের শ্রুতিবেদ-এও এর উল্লেখ আছে। হয়তো সে সময়ে কোনো সাধু বা ঋষি এটা হয়তো জানতেন। কিন্তু পরে এই জ্ঞান হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাজে সে সব সাহায্য করেছে।

সে ভাষা জানি বলেই তোকে বাঁচাতে পেরেছি।

—মানে? আমার কী হয়েছিল?

—তুই মারা গিয়েছিলি জলে ডুবে। তখনই আমি আসি। তোর সঙ্গে যোগাযোগ করি। আচ্ছা, তোর খেয়াল হল না এতক্ষণ তোর সঙ্গে ক্র্যাচ নেই। তুই দিব্যি হেঁটে-চলে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছিস। এবারে তোর জেগে ওঠার সময়। ভালো থাকিস। মনে রাখবি। সঙ্গে আছি। তুই ভয় পাস না।

ভালো লোকেরা চুপ করে থাকলে শুধু অন্যায়ের কথাই শোনা যায়। আমি তোর সঙ্গেই এবারে যাব আমাদের গ্রামে। ওরাও সঙ্গে থাকবে, সামনে না এলেও। তবে বহু আলোকবর্ষ দূরে থাকলেও ওরা পারে না, এমন কিছু হয় না।

—কিন্তু তুই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলি কী করে? আমি এখন তাহলে কোথায়?

—তুই ছিলিস সীমান্ত অঞ্চলে। জীবন-মৃত্যুর সীমান্ত অঞ্চলে। আমি সে সময় তোর কথা শুনে সেখান থেকে তোকে উদ্ধার করি। এসবই সম্ভব হয়েছে আমি ওই ভাষা জানি বলে। মৃত্যুর পরে কিছুক্ষণ সবাইকে ওই ভাষায় যোগাযোগ করা যায়। সেজন্যেই সম্ভব হল।

—কিন্তু মা?

রাজু আমার হাতটা জড়িয়ে ধরল। বলে উঠল, যারা চলে যায়, তাদের আর ফেরানো যায় না। এটা মৃত্যুর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুধু সম্ভব। যতক্ষণ মানুষ সীমান্ত অঞ্চলে থাকে।

—তুই বারবার আমি মরে গেছিস বলছিস। কিন্তু আমি তো দিব্যি বেঁচে আছি।

উত্তরটা রাজুর থেকে এল না। রাজু চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেছে। মনে হল দূর থেকে কিছু লোকের গলা শুনতে পাচ্ছি। একটু একটু করে যেন সে সব অচেনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

—ছেলেটার জ্ঞান ফিরে আসছে।

—হ্যাঁ, আবার হার্টবিট চালু হয়েছে।

—কী আশ্চর্য! আমি তো ভেবেছিলাম ছেলেটা মারাই গেছে। এতক্ষণ নাড়ি পাচ্ছিলাম না।

—ওই, ওই তো চোখের পাতা নড়ছে।

—কী আশ্চর্য! একেই বলে রাখে হরি, মারে কে!—আরেকটা গলা।

চোখ খুলে দেখি অনেকগুলো মুখ আমার কাছে ঝুঁকে দেখছে।

—বেঁচে গেছে। বেঁচে গেছে।—কে যেন চিৎকার করে উঠল।

—দূরে দূরে। ওকে একটু ভালো করে নিশ্বাস নিতে দাও। ভিড় করো না—কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল।

৮

২৫ মে

দু-দিন হল গ্রামে ফিরে এসেছি। নদী আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আমি জলের তলায় ডুবে গিয়েছিলাম। একদম শেষ মুহূর্তে কিছু লোক আমাকে সাঁতরে গিয়ে উদ্ধার করে। তবে তারাই আশা করেনি যে আমি প্রাণ ফিরে পাব। নাকি প্রায় মিনিট পাঁচেক আমার কোনো হার্টবিট ছিল না। মৃত বলে ধরে নিয়েছিল।

ভাগ্যিস তাদের মধ্যে কেউ চেনাজানা ছিল না। তা না হলে এই খবর বাবার কাছে গেলে যে কী খারাপ লাগত বাবার!

বাকিটা হয়তো স্বপ্ন ছিল। ঠিক যেরকম হয় শুনেছি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যাকে 'নিয়ার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স' বলে।

শুনেছি মানুষ মৃত্যুর পরমুহূর্তে তার প্রিয়জনদের দেখে, সবথেকে প্রিয় মুহূর্তগুলোকে দেখে। সেরকমই হয়েছিল হয়তো। তবে এত জীবন্ত স্বপ্ন আমি আগে কোনোদিন দেখিনি। মনে হচ্ছে যেন সে সব সত্যি ছিল।

তবে একটা জিনিস হয়েছে। আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি জীবন কত মূল্যবান। এত সহজে জীবন সংগ্রামে হার স্বীকার করতে নেই। সে কথা বোঝাতেই হয়তো আমার স্বপ্নজগতে রাজু এসেছিল। মা এসেছিল।

একটা জিনিস তবে অবাক লেগেছে। যে কথাগুলো রাজু আমাকে বলেছিল, সেই কথাগুলো? এখনও কিছু নাম মনে আছে। কী করে সেগুলো জানলাম?

আমি গতকাল গ্রামের লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা বই পেলাম, নাম 'ক্যান ইউ ক্র্যাক দ্য এনিগমা কোড'। তাতে রাজুর সব কথা না পেলেও 'ওয়েরদার'-এর কথাটা দেখলাম। যদিও মারটিন বোরম্যান যে ওয়েরদার—এরকম কোনো কথা সেখানে লেখা নেই। ভেবে দেখলাম সব কিছুতে লজিক খোঁজার দরকার নেই। কিছু জিনিস রহস্যই থাকুক।

বলতে নেই, সেই স্বপ্ন আমি বারবার দেখতে চাই। আমার মা-কে যদি এরকম ভাবে আরও কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পাই। এরকম একটা স্বপ্ন জীবনের অর্থ পাল্টে দিতে পারে।

ও হ্যাঁ, বাস্তবের জীবনটা তবে অবশ্য এত সহজ—সোজা নয়। কিন্তু মনে হল যেন তার মোকাবিলা করার জন্যে মনের জোর পেয়ে গেছি।

আজ সকালে পাড়ার হেবোদা তার দুই শাগরেদকে নিয়ে এসেছিল। আমি আর বাবা দুজনেই ছিলাম দোকানে। হুমকি দিয়ে গেল। বলেছে আমাদের একমাস সময় দিচ্ছে। তার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। পরিবর্তে ও দু-লাখ টাকা দেবে।

আমাদের বাড়ির জমির দামই তার থেকে অনেক বেশি। আসলে আমার বাবা-ঠাকুরদা, ঠাকুরদার বাবা এখানেই থাকত। সেজন্য বাড়িটা গ্রামের প্রায় কেন্দ্রে বলা যায়। আমাদের অবস্থা খারাপ হলেও বাড়িটা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে।

শুনেছি আমাদের জায়গায় ও আরও আশেপাশের বেশ কিছু জমি নিয়ে একটা বড়ো শপিংমল হবে। এখানকার ও আরও আশেপাশের সব এলাকার মধ্যে সব থেকে বড়ো শপিংমল।

সেজন্যই এত হুমকি। তার সঙ্গে তো আগের ঘটনাটা আছেই।

বাবার শরীর এমনিতেই খারাপ। এসব দেখার পরে আরও খারাপ হয়ে পড়েছিল।

ভাবছি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। এদের সঙ্গে ঝগড়া মারপিট করে তো আর এখানে থাকা যাবে না। দু-লাখ টাকা দিলে সেটা দিয়ে অন্তত বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসি আছে কলকাতায়। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকা যাবে। তার পরে দেখা যাবে।

বাড়ি ফিরে বাবার পাশে বেশ খানিকক্ষণ বসেছিলাম। বাবার বেশ ভালোই জ্বর আছে। আর একটানা কাশি। তার মধ্যেই আস্তে আস্তে বলে উঠল, জানিস, আমি তেমন পড়াশোনার সুযোগ পাইনি। সারা জীবন কেটে গেছে ওই একটা ছোটো দোকান দিয়ে। আর এই বাড়ির আশ্রয়ে। তুই যাতে পড়াশোনা করে মানুষ হোস, সেটাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। তবে কোনোদিন কোনো ব্যাপারে জোর করতেও চাইনি। যেটা তোর পক্ষে সম্ভব, সেটাই হবি সৎ পথে থেকে। কিন্তু কোনো অন্যায় সহজে মেনে নিলে পাপ হয়।

অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে। ওদের ভয়ে এ বাড়ি ছেড়ে দিস না।

—কিন্তু কী আর করব বাবা! ওরা কত শক্তিশালী, তা তো তুমি জানো। যদি আমাদের গ্রামে কোনো সাহসী লোক থাকত যে আমাদের সাপোর্ট করত, তাহলেও হত। সবাই ওদের ভয়ে বেঁচে মরে পড়ে আছে। ওরা সব রাজনীতি করে, ওদের সঙ্গে বড়ো বড়ো নেতাদের যোগাযোগ আছে। তাদের সরাসরি সাপোর্ট আছে। আমাদের কথা কে শুনবে!

বাবা আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল—তবু কাল একবার পুলিশ থানায় গিয়ে জানাস। কমপ্লেন করে আসিস। আইন-আদালত বলে একটা জিনিস আছে তো! নাকি সব জঙ্গলের রাজত্ব! ওদের উপরে ভরসা রাখতেই হবে। এটা আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটে। তাদের আশীর্বাদ মিশে আছে এ মাটিতে। এই বয়সে আমি আর কোথায় যাব!

বাবাকে কথা দিলাম কাল থানায় যাব। বাড়ি কোনোভাবে বিক্রি করব না।

৯

২৬ মে

থানায় গিয়ে কোনো লাভ হল না। বেশ খানিকক্ষণ বাইরে বসে অপেক্ষা করতে হল। তারপরে দেখি ওসি দিগম্বরবাবুর ঘর থেকে বেশ কয়েকজন বেরিয়ে আসছে। তার মধ্যে হেবো ও হেবোর দলের কয়েকজন আছে। বেরোনোর সময় বেশ হালকা চালের হাসির কিছু কথা ভেসে এল ঘরের ভেতর থেকে।

বুঝলাম অফিসারের সঙ্গে বেশ ভালোই আলাপ আছে এদের। আমার দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল।

শুনলাম হেবো আমাকে শুনিয়ে ওর দলের আরেকজনকে আমাকে উদ্দেশ করে বলছে—দরকার হলে ল্যাংড়ার হাতদুটোও ভেঙে দিতে হবে।

আরও প্রায় একঘণ্টা বাদে ওসির দেখা পেলাম। বেশ জাঁদরেল চেহারার রাশভারী ভদ্রলোক। গম্ভীর গলায় না শুনেই বলে উঠলেন, কী ব্যাপার! সব ব্যাপারে থানায় ছুটে এলেই কী কাজ হবে! আমার আর কোনো কাজ নেই!

আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটা বলার চেষ্টা করলাম।

আমাকে কথার মাঝে থামিয়ে দিয়ে উনি বলে উঠলেন, কী দরকার এদের সঙ্গে ঝামেলা করার! ধরো তোমাকে মেরে ফেলল, কী করবে! জলে নেমে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে নেই। যা বলছে, শুনে নাও। না হয় আরও দশ হাজার বেশি যাতে বাড়ির জন্য দেয়, সেটা আমি বলে দিতে পারি। এটাই যে দিচ্ছে, তাই বড়ো ভাগ্য। বাড়িটা কেড়ে নিলেই বা কী করতে!

ওসির মুখে এ কথা শুনে অবাক লাগল।

আমি বললাম, সেজন্যই তো তো থানায় জানাতে আসা!

সেটা শুনে উল্টে আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, বাড়ির কাগজপত্র ঠিক নেই, আমাদের বাড়ি, আমাদের বাড়ি বলা।

আমি বলে উঠলাম, আমরা এখানে তিন পুরুষ ধরে আছি।

—সে তোমরা তিন পুরুষ আছ না কি বর্ডার পার করে দু-দিন আগে বাসা গেড়েছ, সে সব হিসেব তো বেঁচে থাকলে হবে, তাই না! যা বললাম, সেটা করো।

গলা একটু নরম করে ফের বলে উঠলেন—আরে ওরকম ভালো শপিংমল হলে তুমিও বাবাকে নিয়ে সিনেমা দেখতে পারবে। যাও, আমার আর সময় নষ্ট করো না।

বুঝলাম আর কিছু বলে লাভ হবে না। উনিও ওদের দলে। বাড়ি চলে এলাম।

সকাল থেকে থানায় যাওয়ার জন্য দোকান বন্ধ। বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা যাবে না। এমনিতেও খদ্দের কমে এসেছে। দোকান নিয়মিত খোলা না থাকলে আরও কমে যাবে। খানিকক্ষণ বাবার সঙ্গে বাড়িতে থেকে আবার দোকানে এসে বসলাম। এরকম সময়ে যদি সেই স্বপ্নের মতো রাজুকে পাশে পাওয়া যেত।

ও ভয় না পেয়ে ঠিক আমার পাশে থাকত।

বিকেলের দিকে দেখি আমার দোকানের দিকে ছ-জন গুন্ডা টাইপের লোক এগিয়ে আসছে। তাদের মধ্যে দুজনকে চিনি। হেবোর

দলের লোক। সব ক-জনেরই বেশ তাগড়াই চেহারা। সঙ্গে পাশের পাড়ার মাধবকাকু। আমাদের দোকানের নিয়মিত খদ্দের।

লোকগুলো দেখি দোকানের সামনে মাধবকাকুকে এনে জিজ্ঞেস করছে, আপনি এখান থেকেই কোল্ডড্রিংক্সটা নিয়েছিলেন? সিওর?

মাধবকাকু দেখি কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—হ্যাঁ, এখান থেকেই নিয়েছিলাম।

সত্যি তাই, সকালে মাধবকাকু নিয়েছিল কোকের বোতলটা।

হঠাৎ দেখি একটা মড়া টিকটিকি হাতে ঝুলিয়ে পেচো বলছে, এই টিকটিকিটা এর মধ্যে ছিল। মাধবকাকুর ছেলে এখন এজন্যে হাসপাতালে।

এটা যে হতে পারেই না, তা আমি জানি।

পাশ থেকে একজন বলে উঠল—এসব নকল কোলা। ফাঁকা বোতলে ভরার সময় টিকটিকিটা এসে পড়েছিল। বলি এসব ব্যবসা কতদিন করা হচ্ছে!

এরপরে কেউ আমাকে বলার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। দোকান থেকে জিনিসপত্রগুলো ছুড়ে ছুড়ে রাস্তায় ফেলে দিল। পেচো এগিয়ে এসে দোকান থেকে আমাকে টেনে বার করে আমার গালে এক রামথাপ্পড় মেরে, তারপরে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল।

তার পরের দশ মিনিট কী হল বলা মুশকিল। কেউ পা দিয়ে লাথি মারছে তো কেউ আবার মুখে ঘুষি। একটা লোক আবার হাতে একটা লাঠি দিয়ে আমার পায়ে দুবার সজোরে মারল। চারদিকে লোক জমায়েত হলেও কেউই আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না।

প্রায় আধমরা অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে যাওয়ার সময় বলে উঠল, দশ দিনের মধ্যে বাড়ি খালি করে বেরিয়ে না গেলে লাশ পড়ে থাকবে।

বুঝলাম পুরোটাই সাজানো। তবে কিছু বলার শক্তি আমার ছিল না। ওরা চলে যাওয়ার প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে গ্রামের পরিচিত কিছু লোক এগিয়ে এল। আমাকে টেনে তুলে ক্র্যাচটা এগিয়ে দিল। বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিল। সারা শরীর আমার তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কেউ কেউ আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল, কিন্তু আমি নিজেই যেতে চাইলাম না।

এরা সবাই নিরীহ মানুষ। এদের কারোরই এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সৎসাহস নেই। সবাই জানে এটা সাজানো ঘটনা। তবুও।

বাড়িতে ঢুকে লুকিয়ে অন্য ঘরে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বাবার অসহায় দৃষ্টির সামনে পড়ে গেলাম। বাবা ঘরে তক্তার উপরে শুয়ে আছে আর জ্বরের বিকারের মধ্যে তখনো বলে যাচ্ছে—

অন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে—তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

আমি জানি আমাকে কী করতে হবে। আমি এ অন্যায় মেনে নেব না। আমি পঙ্গু হতে পারি, কিন্তু দুর্বল নই।

তবু আমি অন্য ঘরে গিয়ে কেঁদে ফেললাম। এত অসহায় কোনোদিন বোধ করিনি। কী করব একা! সঙ্গে অসুস্থ বাবা। অর্থবল নেই, লোকবলও নেই যে কোনো আদালতে যাব।

ঠিক তখনই চোখে পড়ল, পড়ার টেবিলের উপরে রাখা সাদা কাগজটা। এটা কোথা থেকে এল?

একটা সাদা কাগজে, একটা পরিচিত সুকুমার রায়ের কবিতা।

অভয় দিচ্ছি শুনছ না যে? ধরব নাকি ঠ্যাং দুটা?
বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা!
আমি আছি, গিন্নী আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে
সবাই মিলে কামড়ে দেব মিথ্যে অমন ভয় পেলে।

কাগজটার উল্টোদিকে কয়েকটা অর্থহীন অক্ষর টাইপ করা। 'ছি ব চ ল মু রে ন স ঙ্গে মা কা কে হ রু কে আ'

এ রাজু ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না।

আনন্দে সব ব্যথা মুহূর্তে ভুলে গেলাম। রাজু কি তাহলে সত্যি আছে?

অর্থাৎ ও আমাকে জানাতে চাইছে 'ভয় পেয়ো না'। ঠিক সেই নামের সুকুমার রায়ের ছড়ার থেকে এই অংশটা নেওয়া হয়েছে।

হঠাৎ যেন সব সাহস খুঁজে পেলাম। চারদিকে তাকালাম—রাজু কি এখানেই আছে?

তবে উল্টোদিকের কাগজে লেখা অক্ষরগুলোর কোনো মানে খুঁজে পেলাম না।

'ছি ব চ ল মু রে ন স ঙ্গে মা কা কে হ রু কে আ'

কিন্তু তখনই হঠাৎ খেয়াল হল। কীভাবে আমরা দুজনের মধ্যে দরকারি কোনো কথা সাংকেতিকভাবে একজন আরেকজনকে পাঠাব সে ব্যাপারে বহু বছর আগে ও আমাকে বলে গিয়েছিল। তারপরে দুবার এরকম সাংকেতিক বার্তা আদানপ্রদানও করেছি ওর সঙ্গে। তবে সে সব দশ বছরের আগের কথা।

কিন্তু এর জন্যে লাগবে একটা দেশলাই বাক্স। অন্য ঘর থেকে একটা দেশলাই বাক্স নিয়ে এলাম।

ও বলেছিল 'ব' অক্ষরটা আমার আর ওর মধ্যে 'কী-ওয়ার্ড'। আমরা যখন একজন আরেকজনকে সেই বার্তা পাঠাব সংকেতের মাধ্যমে, সেটা ঠিকভাবে বোঝার জন্য লাগবে শুধু একটা দেশলাই বাক্স। 'ব' অক্ষরটা যেখানে থাকবে, সেখান থেকে শুরু করতে হবে।

দেশলাই-এর চারদিকে ওই অক্ষরলেখা কাগজ জড়িয়ে নেওয়ার সময় 'ব' অক্ষরটা যাতে উপরের একদম বাঁদিকের শুরুর অক্ষর হয়। সেটা করার পরে দেশলাই-এর দুই পাশের দিকে অর্থাৎ বারুদ লাগানো অংশে যে অক্ষরগুলো থাকবে শুধু সেটুকু পড়তে হবে, বাকিটা বাদ দিয়ে।

ঠিক সেটাই করলাম।

এবারে সেই লেখার অর্থ খুঁজে পেলাম 'সঙ্গে আছি'।

চোটের যন্ত্রণা সত্ত্বেও হেসে উঠলাম। ও যে বেঁচে আছে,

এখানেই কোথাও আছে, এর থেকে বড়ো প্রমাণ আর কিছু হয় না। শুধু দুটো ছোটো শব্দ আমার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু ও আছে কোথায়? সামনে আসছে না কেন?

২৭ মে

১০

পরের দিন সকালে হেবোর সঙ্গে দশজন লোক এল আমাদের বাড়িতে। সব ক-জনকে দেখলেই ভয় লাগে। এরা যে গুন্ডামি ছাড়া কিছু করে না, খেলাচ্ছলে লোক খতম করতে পারে, এদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়।

হেবো ব্যাগ থেকে টাকার একটা বড়ো বান্ডিল বার করে বাবার গায়ে ছুড়ে দিয়ে বলে উঠল, দু-লাখ দশ হাজার আছে।

বলে সামনে একটা চেয়ার টেনে হেবো বসে বলে উঠল, এই কাগজগুলোতে সাইন করতে হবে কাকু। ব্যাপারটা আমি ক্লিন রাখতে চাই।

বলে বেশ কয়েকটা আইনি কাগজ এগিয়ে দিল বাবার দিকে।

বাবা একবার কাগজে চোখ বুলিয়ে শান্ত গলায় বলে উঠল, কিন্তু আমি তো বাড়ি বিক্রি করব না।

—মানে? বাড়ি বিক্রি করবেন না মানে? কাল ছেলের কী অবস্থা করেছি, দেখেছেন তো? ওটা শুধু সিনেমার বিজ্ঞাপন ছিল। পুরো সিনেমাটা দেখাব নাকি!—হেবো গর্জে উঠল হিংস্রভাবে।

আমি বলে উঠলাম—বাবা যেটা বলছেন, সেটা বোঝা তো খুব সহজ। আমরা বাড়ি বিক্রি করব না। আমরা এখানেই থাকব।

হেবোর চোখ জ্বলে উঠল।

—হুম, বাপ-ব্যাটায় খুব সাহস বেড়ে গেছে দেখছি। ঠিক আছে আড়াই লাখে রফা। এবারে না রাজি হলে একটা টাকাও দেব না। জবর দখল করব। যেরকম আমরা অনেক করি। দেখি ল্যাংড়া কী করে! আর তোর তো যা অবস্থা আজ নয়তো কাল এমনিতেই টেঁসে যাবি। বাবাকে লক্ষ করে নোংরা ভাবে বলে উঠল কথাটা।

—না, আমরা বাড়ি বিক্রি করব না। আড়াই লাখেও নয়। আমরা এখন কোনোভাবেই এ বাড়ি বিক্রি করব না।—আমি আবার বলে উঠলাম।

—আচ্ছা, দেখা যাবে। আমাকে তো চিনিস না চাঁদু। কালকের মধ্যে তোদের কী করে তাড়াই দেখবি! তোরা এই গ্রামে কী করে থাকিস দেখে নেব।

আমি শান্তভাবে বলে উঠলাম—আমরা থাকব। শুধু থাকব, তাই নয়। এখানে, আমাদের এই গ্রামে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেব না। বেআইনি বোমা তৈরির যে কটা কারখানা হয়েছে, সেটা বন্ধ করব। সীমান্ত থেকে মেয়ে, ড্রাগ, সোনা পাচার সব বন্ধ করব।

বাবা অবাক দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। বেশ বুঝতে পারলাম সে দৃষ্টিতে একটা বিস্ময় আর প্রশংসা একই সঙ্গে মিশে আছে। যেন বলছে কী করে তোর এত সাহস হল বল তো! সাবাশ।

আমার কথা শুনে অট্টহাসি করে উঠল হেবো আর তার সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল ওর পোষা গুন্ডার দল।

ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, বাড়ির কাগজপত্র ঠিক নেই,
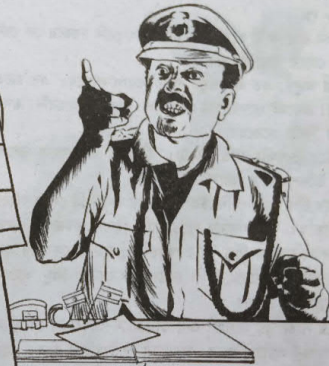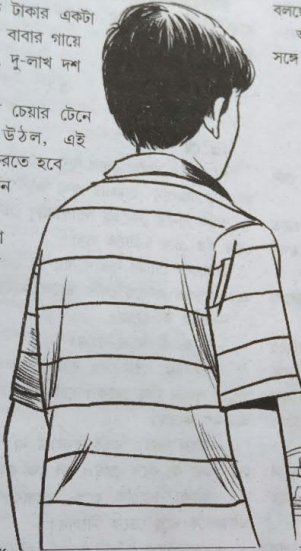
হাসতে হাসতে বলে উঠল, ল্যাংড়ার তো ভারী সাহস।—বলে উঠে দাঁড়িয়ে কদর্যভাবে আমার হাঁটার ভঙ্গি দেখিয়ে বলে উঠল— একা হাঁটতে পারে না। আর আমাদের বোমা তৈরির কারখানা বন্ধ করবে!

'হা হা' করে সঙ্গে হাসতে লাগল হেবোর দল।

হেবো ফের লাল চোখ করে ওর ভারী গলায় বলে উঠল—

—আচ্ছা, কী করে এর পরে আর এখানে একদিনও থাকিস দেখে নেব। আমার একটা এথিক্স আছে। আমি সক্কাল সক্কাল খুন- জখম করে হাত ময়লা করতে চাই না। ছয় ঘন্টা সময় দিলাম ভাবার।

ওরা সব দুমদাম করে বেরিয়ে গেল।

বাবা দেখি উত্তেজনায় কাঁপছে। চোখে জল। অশক্ত দু-হাত দিয়ে আমার বাঁ-হাত চেপে ধরেছে।

শুধু শান্ত গলায় বলে উঠল—যত কম ক্ষমতাই থাকুক না কেন, আমাদের সত্যের পথে থাকতে হবে। আমরা আমাদের পথ তৈরি করি। সেখানে একটা ছোটো ইটেরও অনেক গুরুত্ব আছে। না হয় আমরা প্রথম ইটটা পেতে দিয়ে যাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। খুব ভালো কাজ করেছিস বাবুন।

আমার বাবা মাধ্যমিকের পরে পড়ার সুযোগ পায়নি। তবু এত ভালো শিক্ষক আমি আর কোনোদিন দেখিনি।

কিছুক্ষণ বাদে আবার আরেকটা সরু কাগজ পেলাম টেবিলের উপরে, কোথা থেকে কখন এল বুঝতে পারলাম না। আগেরবারের থেকেও ছোটো হরফে বেশ কিছু টাইপ করা অক্ষর। দেশলাই-এর গায়ে কাগজটা জড়াতে, আসল অর্থ খুঁজে পেলাম। দেখলাম তাতে লেখা—

'পিপীলিকা বাহিনী প্রস্তুত।'

১১

২৮ মে

তখন রাত ক-টা হবে জানি না। হঠাৎ দেখি দরজায় কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে।

বাবা অসুস্থ। এত আওয়াজে শরীর খারাপ লাগবে। এত রাতে কে এল! প্রথমেই ওদের কথা মনে এল। সারাদিন আসেনি। এখন কি ওরা ফিরে এসেছে?

ঘড়িতে দেখলাম রাত দেড়টা। নিশ্চয়ই এত রাতে ভালো কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।

বাইরে উঁকি মেরে দেখি ঠিক তাই। প্রায় জনা কুড়ি লোক বাইরে জড়ো হয়েছে। কয়েকজনের হাতে লাঠি, ছোরা। একজনের হাতে একটা মশাল জাতীয় কিছু তাতে আগুন জ্বলছে। সঙ্গে মনে হল কয়েকটা ক্যান। ওগুলোতে কি কেরোসিন জাতীয় কিছু আছে? আগুন লাগানোর জন্য?

এবারে সত্যি ভয় লাগল। ওরা তার মানে আমরা না বেরোলে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেবে। আমাদের পুড়ে মরতে হবে। আর বেরোলে পিটিয়ে মারবে।

আমি অবলম্বন ছাড়া হাঁটিতেও পারি না। এসব দেখে আশেপাশের কেউ যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না, সে বিষয়েও নিশ্চিত।

আর রাতে করছে অর্থাৎ কেউ দেখে ফেললে, তাকেও ওরা জ্যান্ত রাখবে না। এমনিতেও আজ সরু কাস্তের মতো একফালি চাঁদ, সেটাও মেঘের আড়ালে।

দরজা খুলব কি খুলব না, ভাবতে না ভাবতেই দেখি দরজা ভেঙে দুদ্দাড় করে কয়েকজন ঘরে ঢুকে পড়েছে।

এসে ঘরের এক একটা জিনিস বাইরে ছুড়ে ফেলতে শুরু করল।

কিন্তু তার ঠিক পরমুহূর্তে যা হল, তা বুঝিয়ে বলা মুশকিল।

দেখি লোকগুলো নাচতে শুরু করেছে। শুধু যারা ঘরের ভেতরে ছিল, তারাই নয়। বাইরে যারা আছে, তারাও।

বেশ অন্যধরনের নাচ। আমি খুব কম সিনেমাই দেখেছি। তবে আমার দেখা কোনো হিন্দি বা বাংলা সিনেমার নাচের মতো নয়। আর সঙ্গে 'উরিবাবা' 'উরিবাবা' করে গানও জুড়েছে। হয়তো কোনো সাম্প্রতিক সিনেমার গান।

নাচতে নাচতে দেখি হাতের লাঠি, ছোরা ছুড়ে ফেলে জামা-প্যান্ট খুলতে শুরু করল।

সে দৃশ্য ঠিক কহতব্য নয়।

তার পরে বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে মশালের আলোর বাইরে অন্ধকার থাকার জন্য ভালো করে বুঝিনি। মনে হল ওদের গায়ের মধ্যে অজস্র পিঁপড়ে যেন চলেফিরে বেড়াচ্ছে। আর তাদের কামড়ের জন্যই ওরা অমন নাচতে শুরু করেছে।

ব্যাপারটা বেশিক্ষণ চলল না। মিনিট দশেকের মধ্যে সামনের রাস্তা একেবারে পরিষ্কার শুনশান। শুধু কিছু লাঠি, ক্যান, ছোরা রাস্তায় পড়ে আছে।

১২

২৯ মে

পরের দিন সকাল সকাল থানা থেকে ডাক এল। তবে এমনিতেই যাব ভেবেছিলাম। হামলার কথা জানাতে।

আমি থানায় ঢুকতেই দিগম্বরবাবু যেন হুংকার করে উঠলেন। দেখি ওঁর চোখ টকটকে লাল।

আমাদের গ্রামের যাত্রাপালায় যে লোকটা রাবণের পার্ট করে, তার থেকেও এনাকে বেশি ভালো মানাত ওই রোলে।

—এসব কী হচ্ছে?

—স্যার, কী হচ্ছে মানে?

—শুনলাম, তোমাদের বাড়িতে কথা বলতে, বোঝাতে এই গ্রামের সজ্জন কিছু লোক গিয়েছিল। তাদের উপরে তোমরা নাকি আক্রমণ করেছ?

—মানে স্যার? কিছুই বুঝলাম না। আমাদের বাড়িতে হামলা হল। ওরা কী করে চোট পেল কে জানে!

—আচ্ছা, চালাকি হচ্ছে, দেখাব?—বলে দেখি দিগম্বরবাবু একজনকে ঘরে ডেকে নিলেন।

এ লোকটাকে দেখিনি আগে। তবে কাল রাতে নির্ঘাৎ ওই দলে ছিল।

লোকটা দেখি কাঁদোকাঁদো মুখে জামা খুলে দাঁড়াল। সারা গা লাল হয়ে ফুলে গেছে। সত্যি এরকম কখনো আগে দেখিনি।

—কী করে হল? কী করেছিলে? স্বীকার না করলে কীভাবে সব কথা আদায় করতে হয় সে আমি জানি।

—জানি না। মনে হচ্ছে তো কাঠপিঁপড়ের কামড়।

লোকটা হাউমাউ করে বলে উঠল, উফফ সে কী যন্ত্রণা, কী বোঝাব। একশোটা একসঙ্গে। নির্ঘাৎ এরাই কিছু করেছে। আমাদের গায়ে ছেড়ে দিয়েছে।

বলে উঠলাম, স্যার, আপনি কোনোদিন শুনেছেন কাঠপিঁপড়ে পোষ মানে?

—হ্যাঁ, তা ঠিক। তা হয় না। সেরকম ঠিক শুনিনি।

—তাহলে আমি কী করে ওদের পোষ মানাব বলুন। আর আমিও তো সেখানেই ছিলাম যখন ওরা সব শান্তভাবে এসে বোঝাচ্ছিল। আমাকে কেন কামড়াল না বলুন? কাঠপিঁপড়ে কি লোক দেখে কামড়ায়? আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না যে ওরা কাল মাঝরাতে এসে বোঝাতে গিয়ে তারপরে ওরকম নাচ শুরু করল কেন!

—হুম। যাক গে, আমি কিন্তু আমার এখানে অন্যায় কিছু বরদাস্ত করি না। যদি দেখি এর পিছনে তোমার কোনো হাত আছে, তাহলে ছেড়ে দেব না। চামড়া খুলে নেব।

বুঝলাম এবারে সরাসরি সত্যিটা বলার সময় এসেছে।

বলে উঠলাম—কিন্তু আপনি তো অন্যায়ের সমর্থনই সমানে করছেন। আমাদের ভয় দেখিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে, বাড়িতে আগুন লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে, সেটা জেনেও সে বিষয়ে আপনি তো কোনো কিছুই করছেন না। এরা কারা, এরা কাদের দলের লোক, এরা কী ধরনের কাজ করে, তা আপনি ভালোই জানেন। এটাও জানেন যে গত কয়েকবছর ধরে এখানে যেসব নানান অসামাজিক কাজ হচ্ছে, তাতে এরাই যুক্ত আছে। কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন এদের বিরুদ্ধে?

—চোওওওপ, চোওওওপ—দিগম্বরবাবু দেখি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন।

সেই চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে বলে উঠলাম—এখানে যে বর্ডারের ওধার থেকে অন্যায়ভাবে ড্রাগ, সোনা, মেয়ে চালান আসে, এখানে বেআইনিভাবে বোমা তৈরি হয়, এগুলো তো কোনোদিন থামানোর চেষ্টা করেননি। সবাই আপনার কাছে জানিয়েও পুলিশের কাছে কোনো সাহায্য পায়নি।

দিগম্বরবাবু যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না রাগে। চোখ আরও লাল হয়ে উঠল। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে উঠলেন—খুব বাড় বেড়েছে দেখছি। আমাকে চেনো না। কাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, ভাবতেও পারবে না। এমনভাবে পা ভেঙে দেব যে ক্র্যাচ নিয়েও হাঁটতে পারবে না। এখানে অনেকে বীরত্ব দেখাতে এসে রাতারাতি হারিয়ে গেছে, তা জানো তো!

—হ্যাঁ, সে জানি। রহিমকাকা, বাসুদেবদার মতো লোকেরা যারাই এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে, তাদের কিছুদিন পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আপনাদের দায়িত্ব তো আমাদের রক্ষা করা। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে আপনাদের মতো অসৎ পুলিশের জন্যই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়।

দিগম্বরবাবু মনে হয় রাগে কী করবেন বুঝে না পেয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। যে কোনো সময়ে মনে হল ফেটে পড়তে পারেন রাগে।

আমিও আর দাঁড়ালাম না।

ক্র্যাচ নিয়ে সোজা থানা থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রথম বার মনে হল আমি যেন কোনো কিছুর ভরসা ছাড়াই হাঁটতে শিখে গেছি।

১৩

৩ জুন

যতই মুখে বলি না কেন, আর এ গ্রামে থাকার ইচ্ছে ছিল না। এভাবে ভয়ে ভয়ে এদের বিরোধিতা করে কতদিন থাকা যায়। বাবাও এখন পুরোপুরি শয্যাশায়ী। কবে চলে যাবে কে জানে!

লোকে অনেক কথা মনে রাখে না। দশ বছর আগে রাজু আমাকে দিয়ে গিয়েছিল পালবংশের গুপ্তধনের হদিশ।

এই গ্রামেই লুকোনো ছিল রাজা রামপালের সম্পদ। দুটো মোহর ভর্তি ঘড়া। এই সব খারাপ লোক যখন এখানে প্রথম আসতে শুরু করল, তখন তারা এসেছিল এসব গুপ্তধনের সন্ধানেই।
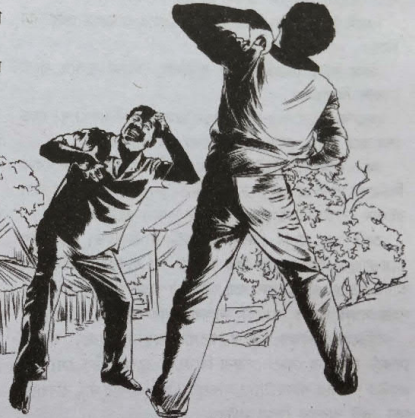
আর সঙ্গে 'উরিবাবা' 'উরিবাবা' করে গানও জুড়েছে।

ওদের কাছে ছিল এই গুপ্তধনের হদিশ, যা সাংকেতিক ভাষায় লেখা ছিল।

রাজুকে ওরা ধরে নিয়ে যায়। ওরা খবর পেয়েছিল যে রাজু যেকোনো সংকেত উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু রাজু কখনো অন্যায়কে সমর্থন করে না। সেজন্য ওর উপরে অনেক অত্যাচার করলেও ওদেরকে এই সংকেত-এর অর্থ উদ্ধার করে দেয়নি। শেষে ওরা ভাবে যে ও বোধহয় এই সংকেত উদ্ধার করতে পারবে না। অনেক মারধরের পরে ছেড়ে দেয়।

ও কিন্তু জানত সেই গুপ্তধন কোথায় আছে। ও সেটা উদ্ধার করতে পেরেছিল। আমাকে সেটা জানিয়ে যায়। আমি সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে সরকারের হাতে তুলে দিই। সেই টাকাতে এখান থেকে

কিছু দূরে একটা হাসপাতাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোথায় কী! দশ বছরেও সে হাসপাতালের কাজ শেষ হয়নি। সে টাকার একটা বড়ো অংশ খারাপ লোকেদের হাতেই শেষে চলে গেছে। যেজন্য এত কষ্ট স্বীকার করে রাজু ওদের বলেনি, সেই উদ্দেশ্যই শেষে সফল হয়নি।

সেটা হলে বা তার থেকে কিছু মোহর রেখে দিলে, আজ আমার বাবাকে কোথায় কীভাবে চিকিৎসা করাব, সেটা নিয়ে এত ভাবতে হত না।

এসব ভেবে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। এক একটা দিন বাবা আরও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার বলেছিল ঠিক চিকিৎসা হলে সুস্থ করে তোলা সম্ভব। কিন্তু কোথায় পাব এত টাকা!

আমার মন খারাপ হলে পুকুরধারে গিয়ে বসি।

সেটাই করলাম আজও। পুকুরধারে বসে ছিলাম। হঠাৎ দেখি মোহনকাকু খুব জোর পায়ে আমার দিকে আসছে। চোখে-মুখে ভয়।

আমাকে দূর থেকে ডেকে বলে উঠল—শিগগির দোকানে যা। ওরা তোদের দোকানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে যতটা পারলাম জোরে এগোলাম দোকানের দিকে।

কিন্তু কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। আগুন জ্বলছে পুরো দোকান ঘিরে।

অনেক চেষ্টার পরে যখন আগুন থামল, তখন সব শেষ। পুড়ে শেষ হয়ে গেছে দোকান। দোকানের সব জিনিসপত্রও।

আর আমাদের কিছুই রইল না। জানি না এসব ধারে কেনা জিনিসের দামই বা শোধ দেব কী করে। চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলাম দোকানের সামনে। শুধু যেন কঙ্কাল পড়ে আছে।

আমি আর থানায় গেলাম না। জানিয়ে কী লাভ। অনেকক্ষণ পরে বাড়ি পৌঁছে বাবাকে কিছু বললাম না। এ খবর জানলে বাবা আরও ভেঙে পড়বে। বলা যায় আমাদের আজ থেকে আর কোনো সহায়-সম্বল থাকল না। আগামীকালও এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। বাবা হয়তো ভাববে দোকান যাচ্ছি না কেন। সেজন্য বিকেলে বেরোব, ঠিক সে সময় একটার পর এক কানফাটানো আওয়াজ। শুধু একবার নয়, বারবার। যেন কেউ বারবার বোমা ফাটাচ্ছে।

আওয়াজটা আসছিল গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। বোমা তৈরির ফ্যাক্টরিতে কীভাবে জানি আগুন লেগে গেছে। একই সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে যেসব বোমা মজুত ছিল সেগুলো ফাটতে শুরু করেছে। লোক ছুটোছুটি করছে।

দেড় ঘণ্টার পরে সব শান্ত হল। দেখলাম ওদিকের আকাশ যেন ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে।

রাতের দিকে পুরো খবরটা পেলাম। কীভাবে আগুন লাগল, এতগুলো বোমা বিস্ফোরণ হল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এর মধ্যেই এক বিশেষ উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন সরকারি তদন্ত দল আমাদের গ্রামে এসে পৌঁছেছে।

তারা আমাদের গ্রামের হেবো, হেবোর দলের অনেক লোকজন ও আরও এসবের পিছনে থাকা বড়ো বড়ো পান্ডাদের অ্যারেস্ট করেছে। দুজন বড়ো মাপের নেতাকেও নাকি এসবের জন্য কলকাতা ও বর্ধমান থেকে অ্যারেস্ট করেছে। সরকারি তদন্তকারী সংস্থার কাছে নাকি এদের সব অপরাধের তথ্য প্রমাণও আছে।

শুনলাম এই গ্রাম থেকেই কোনো একজন এই সরকারি তদন্তকারী সংস্থার কাছে এসব জানিয়েছিল। শুধু জানিয়েছিল তাই নয়, এদের সব কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রমাণও তুলে দিয়েছে। আর এই বেআইনি বোমা ফ্রাক্টরিতে বিস্ফোরণের জন্য সেটা আরও সবার কাছে, এমনকী মিডিয়ায় কাছেও পৌঁছে গেছে।

অনেকের ধারণা সেই ব্যক্তি হলাম আমি। আমার জন্যই সরকারি তদন্তকারী সংস্থা খবর পেয়েছে।

আমি নিজে অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না যে রাজু এত তাড়াতাড়ি এসব কী করে করল।

আমরা এখন এই গ্রামেই থাকতে পারব। তবে সব কিছু আবার করে শুরু করতে হবে। আমাকে পারতেই হবে।

আকাশের দিকে তাকালাম। রাত হয়ে আসছে। কিন্তু তবু যেন আজ অনেক বেশি আলো।

১৪

৪ জুন

পুকুরধারে বসেছিলাম। গোধূলির কমলা আলো এসে পড়েছে সামনের গাছের মাথায়। এতদিন বাদে শান্তি। একই সঙ্গে এত আনন্দ আগে কখনো পাইনি।

এসবই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি কিছু দূরে কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। রাজু?

চেঁচিয়ে ডেকে উঠলাম।

—রাজু? কোথায় ছিলিস এতদিন? আগে দেখা করিসনি কেন?

ও দেখি চুপ করে পাশে এসে বসল। ওর হাতে একটা ডায়েরি।

আস্তে আস্তে বলে উঠল—খুব ভালো লাগছে, তাই না! দেখলি কত সহজে সব ক-জন ধরা পড়ল। একটা ফুটো-নৌকো ডোবানোর জন্য বড়ো ঝড়ের দরকার হয় না। আপনা থেকেই ডোবে।

সায় দিয়ে বলে উঠলাম, কী যে আনন্দ হচ্ছে! এসব খারাপ কাজ যে বন্ধ করা গেছে, এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে!

—শোন, যেজন্যে এলাম। তোকে শুধু একটা জিনিস দিয়ে যেতে চাই। এটা আমার লেখা ডায়েরি। এতে তোর আর আমার অনেক ছোটোবেলার কথাই লেখা আছে। আর এর মধ্যে সাংকেতিক ভাবে লুকিয়ে রাখা আছে একটা খুব বড়ো গুপ্তধনের হদিশ। আসলে পালবংশের প্রায় সব ধনরত্নই কিছু দূরের একটা গ্রামে লুকিয়ে রাখা আছে। আগেরবারে যা পেয়েছিলাম, সেটা এর তুলনায় কিছুই নয়। তবে এটা সাংকেতিক ভাষায় লিখেছি। শুধু তুই এটা উদ্ধার করতে পারবি। অন্য কেউ পারবে না।

হেসে ফের বলে উঠল, ভাবছিস, সরাসরি জানাতেই তো পারতাম, তাই না! কিন্তু আমি চাই তুই এই সংকেতের জগৎকে একটু একটু করে বুঝতে শিখিস। তাহলে আমার সঙ্গেও সহজে যোগাযোগ করতে পারবি। পড়ে দেখ।

হাতে নিয়ে খাতাটা পড়তে শুরু করলাম। রাজুর মুক্তোর মতো হাতের লেখা। কিছুটা পড়ে বলে উঠলাম—

—এসব সংকেত আমি উদ্ধার করতে পারব না।

—আহা, চেষ্টা করেই দেখ না। এত সহজে ছেড়ে দিলে হয়।

আবার কিছুটা পড়লাম। মিনিট পাঁচেক। এবারে মনে হল কিছুটা বুঝলাম।

—এর মধ্যে কিছু বানান ভুল আছে। তুই তো কখনো বানান ভুল করিস না। অবাক হয়ে বলে উঠলাম।

—ঠিক বলেছিস। আর কিছু লক্ষ করলি?

—আর মনে হচ্ছে কিছু জায়গায় যা লিখেছিস, যেমন ধর ওই একসঙ্গে কালীপুজোর সময়ে চকলেট বোমা ফাটানোর কথা, সেরকম কিছু তো আমরা কখনো করতাম না। আমরা দুজনেই শব্দবাজি পছন্দ করতাম না। তুই এরকম লিখলি কেন? নিশ্চয়ই এর মধ্যেও কিছু সংকেত আছে, তাই না!

—এই তো গোপনীয় কোড বা সাইফার বুঝতে শিখে গেছিস। ঠিক বলেছিস। দেখ এটা অন্য কারোর পক্ষে বোঝা বা জানা সম্ভব নয়। শুধু আমি বা তুই এটা জানি। যে সব শব্দে দেখবি এরকম বানান ভুল আছে, আর যে সব জায়গায় আমার আর তোর ছোটোবেলার কথা ভুল লেখা আছে, সে সব শব্দের মধ্যেই এই গুপ্তধনের সন্ধান আছে। আরও কী কী করতে হবে তা তুই জানিসই। তুই এটা রাখ। আমি জানি তুই এটা উদ্ধার করতে পারবি। তোর কাছে এই গুপ্তধন থাকলে, আমি নিশ্চিত যে সেটা সবার ভালো কাজে লাগবে।

—কিন্তু আমার আর নিজের টাকার কী দরকার আছে!

ও হেসে উঠল। বলে উঠল—তোর যে দরকার নেই, কোনোদিন দরকার হবে না, তা আমি জানি। তুই এটা দিয়ে এই গ্রামে একটা ভালো স্কুল করিস। একটা কেন, আমার ধারণা বেশ কয়েকটা ভালো স্কুল হতে পারে এর টাকায়। ভালো পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার থেকে বড়ো শক্তিশালী আর কিছু হয় না।

আর তোর নিজের দরকার না হলেও মেসোমশাইকে তুই আবার ওই হাসপাতালে নিয়ে যাস। ওখানে এবারে আর তোর ভর্তি করতে অসুবিধে হবে না। আমি সে সব ব্যবস্থা করে এসেছি। শুধু তোকে গিয়ে এবারে তোর আর মেসোমশাই-এর পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

—মানে? সেটা আবার কীভাবে করলি?

—কেন আমার কি টাকা নেই!—বলে একটু থেমে ফের বলে উঠল, আমাকে চলে যেতে হবে। তুই কিন্তু নিজের উপরে সবসময় ভরসা রাখবি। প্রকৃতির যে কোনো সুন্দর কিছুই কিন্তু তোর মতো পারফেক্ট নয়। সেটা খেয়াল করেছিস? আমরা কোনো গাছ দেখে যখন খুব সুন্দর বলি, তখন দেখবি সে গাছটা অন্য সব গাছের থেকে অন্যরকম, ঠিক তোর মতোই অন্যরকম, সবার থেকে আলাদা। আর চিন্তা করিস না। মেসোমশাই ঠিক সুস্থ হয়ে যাবেন। কালকেই ভর্তি করে দিস।

আমার গলা অবরুদ্ধ হয়ে এল। যাক, এবারে তাহলে বাবার চিকিৎসা করা যাবে। কী চিন্তার মধ্যে ছিলাম। কী করে ও জানল এত কিছু!

—কিন্তু তুই কবে ফিরে আসবি এখানে?

ও দেখি একটু উদাস হয়ে গেল। তারপরে বলে উঠল—আমি আসলে যেখানে আছি, সেখান থেকে ইচ্ছেমতো ফিরে আসা যায় না। কিন্তু মনে রাখবি আমি তোর সঙ্গে আছি। আজ আসি। তোকে ওই ডায়েরিটা দিতেই এসেছিলাম।

একটু থেমে ও আস্তে আস্তে ফের বলে উঠল—

জানিস সব সংকেত আমি উদ্ধার করতে পারি। কিন্তু এখনও আমার মায়ের রাখা সেই রুমাল-এর নকশা উদ্ধার করতে পারিনি। ফাদার যখন আমাকে পেয়েছিল, আমার পাশে যে রুমালটা পাওয়া গিয়েছিল, সেই রুমালের নকশা। আজও কিন্তু আশা ছাড়িনি। যখন ওই সংকেত উদ্ধার করতে পারব, তখনই হয়তো খুঁজে নিতে পারব আমার মাকে। পারতেই হবে। ভালো থাকিস। আর পারলে একবার ওসির সঙ্গে দেখা করিস।

—কেন? উনি তো একেবারে খেপে আগুন হয়ে আছেন আমার উপরে। সব সাঙ্গোপাঙ্গ ধরা পড়ে গেছে। সব বাড়তি রোজগারের উপায় বন্ধ হয়ে গেছে।

—আহা, গিয়েই দেখ না। বলেছিলাম না আমার বন্ধু ওসব অ্যালিয়েনরা সবাই খুব শান্ত। সম্পূর্ণ ননভায়োলেন্সে বিশ্বাস করে। তবে ওরা চাইলে অনেক কিছুই করতে পারে। ঠিক যেমন তোর জন্য তোর পছন্দমতো জগৎ তৈরি করেছিল। গত পরশু বোমার ফ্যাক্টরির লোকেদের জন্য কালীপুজোর পরিবেশ তৈরি করেছিল, যাতে ওদের মনে হয় ওই সব মারাত্মক বোমা হল সামান্য শব্দবাজি। এখন ওরা ওই দিগম্বরবাবুর জন্য আবোলতাবোলের জগৎ তৈরি করে দিয়েছে, যেখানে উনি পড়ে থাকবেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

—মানে?

—গিয়েই দেখ না। যাই। আবার কোনোদিন দেখা হবে। আমার টাইম ফুরিয়ে এসেছে।—বলে রাজু উঠে দাঁড়াল। তারপরে দ্রুত পায়ে পুকুরের পাশ দিয়ে আবার কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমাকে থানা অব্দি যেতে হল না। পথেই দিগম্বরবাবুর সঙ্গে দেখা হল। দেখি আমাকে প্রায় লক্ষ না করেই পাশ দিয়ে হাত তুলে বলতে বলতে চলেছেন—

আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা
স্বপনদোলা নাচিয়ে আয়
আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।

তারপরে একটু থেমে আবার হাত তুলে নাচতে নাচতে বলে উঠলেন—

আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।

নাচতে নাচতে কোথায় যেন চলে গেলেন। ❖

ফিচার

সপ্তসিন্ধু জয়ী এক বাঙালি জলকন্যা

মানস ভাণ্ডারী

বৃষ্টি পড়ছে ঝমঝমিয়ে। ছোট্ট একটি পুকুর। ধারে-কাছে লোকজন দেখা যাচ্ছে না। ছোট্ট পুকুরটিতে বৃষ্টিবিন্দুর মিষ্টি আলোড়ন। গাছগাছালি ও নির্জনতায় ঘিরে থাকা স্বল্পজলের এই পুকুরটিতে অবলীলায় সাঁতার কেটে চলেছে ছোট্ট একটি মেয়ে। বয়স তার মাত্র ২ বছর। পুকুরটির কাছেই তার বাড়ি।

সাঁতারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ লক্ষ করে মেয়েটির বাবা তার ৫ বছর বয়সে শ্রীরামপুর সুইমিং ক্লাবে তাকে ভর্তি করে দেন। বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে ট্রেন ও বাসে চেপে সেখানে যেতে হত। উঠতে হত ভোরবেলায়। তবুও মেয়েটির উৎসাহ আর আনন্দের সীমা ছিল না। নিষ্ঠা এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়েই এরপর একদিন বাংলার এই মেয়েটি **সপ্তসিন্ধু জয়** করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাতটি সমুদ্রের নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা ছাড়াও নানান সাঁতার প্রতিযোগিতায় তিনি অজস্র রেকর্ড গড়েন এবং পুরস্কৃত হন। বাংলা তথা ভারতের গর্ব এই বাঙালি সাঁতারুর নাম **বুলা চৌধুরী**।

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় ২ জানুয়ারি ১৯৭০ সালে বুলা চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। সাঁতারের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আকর্ষণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন "একজন তরুণী সাঁতারু হিসাবে আমি এমন অনেক রেকর্ড ভেঙেছি বা প্রতিষ্ঠা করেছি যেগুলি বহু বছর ধরে ভাঙেনি। চ্যাম্পিয়নশিপে আমার অংশগ্রহণ করা—যেমন কমনওয়েলথ গেমস বা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ ইত্যাদি—শুধুমাত্র কিছু করে দেখানোর জেদ ছিল না, ছিল জলের প্রতি আমার আন্তরিক ভালোবাসার ফলশ্রুতি।" এই জন্যই সরস্বতী পুজোর সময় পড়ুয়ারা যেমন বইখাতা ঠাকুরের সামনে রাখে, বুলা সেখানে রাখতেন তাঁর কস্টিউম, সুইমিং ক্যাপ, গগল্‌স ইত্যাদি।

মাত্র ৯ বছর বয়স থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন, পুরস্কৃত হয়েছেন। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাটারফ্লাই এবং লং ডিসট্যান্স সাঁতারে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, রেকর্ড গড়েছেন। ১৯৯৬ সালে মুর্শিদাবাদে **লং ডিসট্যান্স সাঁতার** প্রতিযোগিতায় (৫০ মাইল) তিনি বিজয়ী হন। ১৯৮৯ এবং ১৯৯৯ সালে (১৯ এবং ২৯ বছর বয়সে) **ইংলিশ চ্যানেল** অতিক্রম করেছেন। সমুদ্র-সাঁতারের নানান সমস্যা ও বিপদ থাকে। অনেকেই ব্যর্থ হন। একাধিক বার চেষ্টাও করতে হয়। **এই দুরন্ত ইংলিশ চ্যানেল এক বাঙালি মহিলার দু'বার অতিক্রম করা অবশ্যই এক অনন্য নজির**। ২০০৪ সালে তিনি **পক প্রণালীও** অতিক্রম করেন। **পাঁচটি মহাদেশে সাতটি সমুদ্র** অতিক্রমকারী **প্রথম মহিলা** সাঁতারুর গৌরব অর্জন করে তিনি শুধু বাংলা ও বাঙালিরই নয়, সারা দেশের সম্মানও বৃদ্ধি করেছেন।

তাঁর এই সাধনা ও যাত্রাপথ কিন্তু সহজ ছিল না। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি হার মানেননি। সমস্ত প্রতিকূলতাকে দৃঢ় মনোবলে জয় করেছেন।

বুলা সম্মানিত হয়েছেন নানা পুরস্কারে। পেয়েছেন **পদ্মশ্রী পুরস্কার, অর্জুন পুরস্কার, তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার পুরস্কার** প্রভৃতি। ২০০৬-২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি **পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য** ছিলেন।

দুঃসাহসী এই বঙ্গনারীর কৃতিত্ব ও গৌরবে আলোকিত হয়ে তাঁরই মতো আরও সাঁতারুর জন্ম হোক এই বাংলায়। বিশ্বদরবারে তাঁরা উজ্জ্বল করে তুলুন বাংলা ও বাঙালির মুখ।

[তথ্যসূত্র : উইকিপিডিয়া]

সাত বন্ধুর স্বপ্ন এখন

শ্যামল চক্রবর্তী

বড়োরা একটা কথা ইংরেজিতে খুব বলেন। Necessity is the mother of invention. প্রয়োজনই মানুষের নানা আবিষ্কারের চাবিকাঠি। আবিষ্কারের ভান্ডার থেকে আমরা একজনকে নিয়ে আসব। তিনি একজন ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর নাম উইলিস হ্যাভিল্যান্ড ক্যারিয়ের। ১৮৭৬ সালের ২৬ নভেম্বর নিউ ইয়র্কের এক গ্রাম অ্যাঙ্গোলায় তাঁর জন্ম। অ্যাঙ্গোলা একাডেমিতে তাঁর লেখাপড়া শুরু। তারপর বাফেলো হাইস্কুল থেকে পাশ করে ১৮৯৭ সালে কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ভর্তি হন। প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০১ সালে পঁচিশ বছর বয়সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯০১ সালে পঁচিশ বছর বয়সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়। ১৯০২ সালে বাফেলো শহরের এক বড়ো কারখানায় কাজ নেন।

বইপত্তরের বড়ো এক প্রকাশক ছাপাখানায় রঙিন ছবি বা লেখা ছাপতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েন। কাগজে রঙিন কিছু ছাপতে চাইলে একবার ছাপ দিলে চলে না। বহুবর্ণের ছবি হলে চারবার ছাপ দিতে হয়। অথচ একবার ছাপানোর পর রঙের জলে ভেজা কাগজ শুকোতে চায় না কিছুতেই। ঘরের ভেতর আর্দ্রতা খুব। আর্দ্রতা থাকলে কোনো কিছু শুকোতে চায় না সহজে। বর্ষাকালে দেখেছ তোমরা নিশ্চয়ই, ভেজা জামাকাপড় শুকোতে অনেক সময় লাগে। শীতকালে আর্দ্রতা কম থাকে। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় শুকিয়ে যায়।

ছাপাখানার এই অসুবিধে দূর করতে ঘরের আর্দ্রতা না কমালে চলবে না। ক্যারিয়ের সেকথা বুঝতে পারেন। তিনি তখন একখানা যন্ত্রের নকশা তৈরি করতে শুরু করেন। যন্ত্রের থাকবে চারটে ভাগ। চারটে ভাগ চাররকমের কাজ করবে। এক ভাগ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবে। এক ভাগ আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করবে। এক ভাগ বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে। এক ভাগ বায়ুকে পরিষ্কার রাখবে। তোমরা অনেকেই যন্ত্রটাকে এবার চিনতে পারছ। হ্যাঁ, আমরা এই যন্ত্রকেই ইংরেজিতে এয়ার কন্ডিশনার বলি। চলতি কথায় বলি এসি মেশিন। বাংলা নাম একটু খটমট হলেও মনে রাখতে হবে। তার নাম 'শীতাতপ যন্ত্র'। ভুল করে 'শীততাপ যন্ত্র' লিখে ফেল না কিন্তু। যেদিন যন্ত্রের এই নকশা তৈরি করে পৃথিবীতে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন ক্যারিয়ের, সেই দিনটি ছিল ১৭ জুলাই ১৯০২। কত আর তাঁর বয়স তখন? মাত্র ছাব্বিশ বছর। একখানা ভাগ কাজ করবে, বাকি ভাগেরা মুখ ফিরিয়ে থাকবে, এমন যন্ত্র হলে তো চলবে না। যন্ত্রটা একবার চালু করলে চারটে ভাগকেই একসঙ্গে ঠিকমতো কাজ করতে হবে। দিনের পর দিন তিনি এই যন্ত্র নিয়ে পড়ে রইলেন। গরমকালে মানুষ একটু আরামবোধ করবে এই মন্ত্র চালিয়ে, এমনটা ভেবে কিন্তু এই যন্ত্রের কাজ শুরু হয়নি। ছাপাখানার ঘর ও ছাপার কাগজকে কেমন করে ভেজা ভেজা ভাব থেকে শুকনো করে তোলা যায়, সেদিকেই তাঁর নজর ছিল। ক্যারিয়ের বুঝতে পারেন, এই যন্ত্রের চাহিদা আগামীদিনে বাড়বে বই কমবে না। চাহিদা বাড়তে বাড়তে আজ কোথায় পৌঁছেছে, সেকথা তোমাদের কাছে লিখে বলতে হবে না। তো ক্যারিয়ের এই যন্ত্রের পেটেন্ট নেবেন বলে পেটেন্ট অফিসে দরখাস্ত করলেন। যে ভাগগুলো তৈরি করেছেন তিনি, তার নকশা সেখানে জমা দিলেন। ১৯০৬ সালের ২ জানুয়ারি, বছরের শুরুতেই খবর এল, তিনি এই যন্ত্রের পেটেন্ট পেয়েছেন। লেখায় নকশার একটা ছবি দিয়েছি আমরা। দেখে সকলে হয়তো বুঝতে পারব না। ক্ষতি কী। এমন একটা ঐতিহাসিক দলিল, দেখতেই

তো আমাদের ভালো লাগে। যন্ত্রকে আমরা ইংরেজিতে বলি 'Apparatus'। যে যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছিলেন ক্যারিয়ের, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন, 'Apparatus for treating air'। নকশার উপরে তাকাও। কথাটা সেখানে লেখা রয়েছে।

যন্ত্রটা কাজ করত কেমন করে? ঘরের আর্দ্রতা কমাতে হবে। তখন সেই ভাগ চালু করা হল। ঘরের আর্দ্রতা বাড়াতে হবে। তখন আবার সেই ভাগকে উলটোদিকে চালানো হল। তাপমাত্রার বেলাতেও একই কথা। বাড়াতে হলে বাড়িয়ে নাও। আবার কমাতে হলে উলটোদিকে ঘুরিয়ে কমিয়ে নাও। দিনরাত ওই যন্ত্রের পাশে একজনকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেওয়ার মতো। এর হাত থেকে রেহাই পেতে ক্যারিয়ের অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কথা

ভাবছিলেন। গবেষণা করে সুফল পেলেন তিনি। অটোমেটিক যন্ত্র তৈরি করা গিয়েছে। আর দু-চোখের ঘুম তাড়িয়ে যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আবার চলে গেলেন ক্যারিয়ের পেটেন্ট অফিসে। অটোমেটিক যন্ত্রের পেটেন্ট চাইলেন। ১৯০৭ সালের ১৭ মে পেটেন্টের দরখাস্ত জমা দিয়েছিলেন। এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তার শিরোপা পেতে তাঁর সাত বছর লাগল। ১৯১৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তিনি এই নতুন যন্ত্রের পেটেন্ট পেলেন। তার আগে বিজ্ঞান সমাজে নিজের আবিষ্কার নিয়ে তাঁকে অনেক বক্তৃতা দিতে হয়েছে। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে। আমেরিকায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সোসাইটি ছিল। আমেরিকান সোসাইটি ফর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স। ১৯১১ সালের ৩ ডিসেম্বর এই সোসাইটির বার্ষিক সভায় নিজের আবিষ্কৃত অটোমেটিক যন্ত্র নিয়ে বক্তৃতা করেন। গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন সকলে। তিনি যে দাবি করছেন এই যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে, তার পেছনে বিজ্ঞানের কী রহস্য রয়েছে, জানতে চাইলেন সকলে। বিজ্ঞানের সেসব কথা, বিশেষ করে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও চূড়ান্ত আর্দ্রতা, শিশির বিন্দু, তাপমাত্রা এসবের সম্পর্ক কোথায়, বুঝিয়ে বললেন সবাইকে। আরও বললেন, কোনো ম্যাজিক বা ভোজবাজি নয়, বিজ্ঞানের এ-সকল সত্য প্রকৃতিতে লুকিয়ে ছিল। তিনি এ-সকল সত্য উদ্ধার করেছেন। এটুকুই তাঁর কৃতিত্ব। প্রকৃত পণ্ডিতেরা বিনয়ী হন। তাঁকে আবিষ্কর্তা হিসেবে মেনে নিতে কারও আর আপত্তি রইল না। কোনো সন্দেহ রইল না কারও মনে। বিজ্ঞানে আজকাল 'সাইক্রোমেট্রিকস' বলে একটা কথা আছে। সেখানে বায়ু ও জলকণার বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেন। গরমকালে কোনোদিন যদি তাপমাত্রা কম থাকে কিন্তু বাতাসে জলকণার পরিমাণ বেশি হয় তবে অস্বস্তি হয় বেশি। আবার যদি জলকণার পরিমাণ কম হয় মানে আর্দ্রতা কম হয় তবে তাপমাত্রা খানিকটা বেশি হলেও গরমে হাঁসফাঁস করতে হয় না। ১৯১১ সালে ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের বুঝিয়েছিলেন তিনি—কেমন করে কাজ করে স্বয়ংক্রিয় এই যন্ত্র, সেই বক্তৃতাটিকে অনেকে 'সাইক্রোমেট্রিকস'- এর সূচনা বলে মনে করেন।

বাফেলো ফোর্জ কোম্পানিতে কাজ করতেন ক্যারিয়ের। তাঁর বয়স যখন দু-বছর, ১৮৭৮ সালে এই কোম্পানি তৈরি হয়েছিল। ১৯০২ সালে এই কোম্পানিতে চাকরি করার সময় তিনি যন্ত্রের নকশা তৈরি করেছিলেন। এই কোম্পানির অনেকবার হাত বদল হয়েছে। নতুন নাম হয়েছে। সেই ইতিহাসে আমরা যাচ্ছি না।

১৯১৪ সালে পৃথিবীতে নেমে এল বিশ্বযুদ্ধ। মানুষের জনজীবন নানা বিপদের মুখে পড়ল। কোনো কোনো কলকারখানা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কারও কারও বেলায় কারখানার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। ক্যারিয়ের ভাবলেন, বারো বছর বাফেলো ফোর্জ কোম্পানিতে চাকরি করা হয়ে গিয়েছে। এবার তিনি এই কারখানার চাকরি ছেড়ে নিজে কারখানা খুলবেন। কারখানা খুলতে হলে টাকা চাই। সাতজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু একসাথে জড়ো হলেন। ক্যারিয়ের যে যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়েছেন, বন্ধুরা মিলে তাঁদের নতুন কারখানায় সেই যন্ত্র তৈরি করবেন। সকলে মিলে টাকা দিলেন। বত্রিশ হাজার ছশো ডলার জোগাড় হল। ১৯১৫ সালের ২৬ জুন নিউ ইয়র্কে তৈরি হল এক নতুন কারখানা, নাম তার 'ক্যারিয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন'। তখন পৃথিবীতে যুদ্ধ চলছে। পরে কারখানাটি নিউ জার্সিতে চলে গিয়েছিল। খুব দূরে যায়নি, আগের কারখানার কাছাকাছিই ছিল।

সাত বন্ধু মিলে প্রচার করছিলেন, এ এমন যন্ত্র, প্রবল গরমে মানুষের কষ্ট হবে না। বিশ্বাস করতে খানিকটা সময় লাগল বটে। চোখের সামনে প্রমাণ পেয়ে অনেকে যন্ত্র কেনার কথা ভাবলেন। কিনেও ফেললেন কেউ কেউ। কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালে আমেরিকার বুকে নেমে এল এক ভয়ংকর মহামন্দা। দলে দলে মানুষ কাজ হারাতে লাগলেন। একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে থাকল। যে স্বপ্ন নিয়ে কারখানা গড়েছিলেন সাত বন্ধুতে মিলে, তা চোখের সামনে বিপদের মুখে পড়ল। একা দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। আরও দুটি কারখানার সঙ্গে মিলে গেল 'ক্যারিয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন'। নতুন নাম হল 'ক্যারিয়ের কর্পোরেশন'। এই কোম্পানির জন্মসাল বলতে ১৯১৫ সালই বলা হয়। পরে না হয় তিন কারখানার মিলন হয়েছে, একা সাত বন্ধুতে মিলে ওঁরা তো পথ চলতে শুরু করেছিলেন ১৯১৫ সালেই।

১৯৫০-এর দশক থেকে এঁদের তৈরি 'এসি মেশিন' মানুষ নিজেদের ঘরবাড়িতে নিতে শুরু করেছেন। মেশিন কেনাবেচার ছোটো বাজার তখন অনেকটাই বড়ো হয়েছে। মাঝপথে কখনো অন্য কোনো বড়ো কোম্পানি এই ক্যারিয়ের কর্পোরেশনকে কিনে ফেলেছে। কলকারখানার বাজারে পৃথিবীর সব দেশেই এরকম দেখা যায়। আমরা দেখছিলাম, ২০০১ সালে ক্যারিয়ের কোম্পানি পৃথিবীতে সবথেকে বেশি গরম করার যন্ত্র, ঠান্ডা করার যন্ত্র এবং এসি মেশিন তৈরি করেছে। সাত বন্ধু যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তা বিফলে যায়নি। ২০০১ সালে এই কোম্পানিতে কাজ করতেন ৪২,৬০০ জন মানুষ। ওই এক বছরে লাভ হয়েছে ৮.৯ বিলিয়ন ডলার। সত্যি বলতে কি, ১৯৫০-এর দশকের আগে থেকেই এই কোম্পানি মানুষকে বোঝাতে পেরেছিল, কী যন্ত্র তারা মানুষের জন্য বাজারে আনছে। ১৯৩৯ সালে নিউ ইয়র্ক শহরে 'বিশ্ব বাণিজ্যমেলা' হয়েছে। ইগলুর আদলে মণ্ডপ করেছিল ক্যারিয়ের কর্পোরেশন। ওই মণ্ডপ লোকে লোকারণ্য। সচ্ছল মানুষেরা এই কোম্পানির এসি মেশিন ঘরে নিয়ে যেতে চাইছেন। তখনই নেমে এল আবার এক মহাযুদ্ধ। আবার বিধ্বস্ত হল মানুষের জীবন। যুদ্ধের কাল পার হল। একটু একটু করে ক্যারিয়ের কর্পোরেশন তার ডালপালা মেলেছে। আমেরিকার মাটি ছাড়িয়ে নানা দেশে কারখানা খুলেছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় এদের শাখা রয়েছে। ২০১৮ সালের একটা হিসেব দেখছিলাম আমরা। ওইবছর এই কোম্পানির কর্মীসংখ্যা ৫৩০০০। বছরটিতে লাভ হয়েছে ১৮.৬ বিলিয়ন ডলার।

একশো কুড়ি বছর আগে ১৯০২ সালে ব্রুকলিন শহরের মর্গান অ্যাভিনিউ-র ১০১৩ গ্র্যান্ড স্ট্রিট ঠিকানায় যে বহুতল বাড়ি ছিল সেখানে প্রথম বসেছিল ক্যারিয়ের এসি মেশিন। আজ দেখতে গেলে দেখা যায়, বাড়ির বেসমেন্টে যেসব যন্ত্রপাতি লাগানো ছিল, এদের কোনো হদিশ নেই। তবে উপরের নানা তলায় বায়ু ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে যে ইটের সুড়ঙ্গ ছাদ পর্যন্ত গিয়েছে তা দেখতে পাওয়া যায়। অনেক প্রযুক্তির মতো এসি মেশিনের প্রযুক্তিও প্রচুর বদলে গিয়েছে। কলকাতার নানা বাড়িতে আমরা দেখতে পেতাম, জানালার নীচে দেওয়াল কেটে এসি মেশিন বসানো হত। অর্ধেকখানা তার বাইরে বেরিয়ে আছে। অর্ধেকখানা ঘরের ভেতর। এখন এমন মেশিন পাওয়া যায়, ঘরে বসিয়ে দিলেই হয়। দেওয়াল কাটতে হয় না।

সবশেষে একটা কথা আমাদের বলতেই হবে। যে কোনো প্রযুক্তি তৈরি হয়, আমাদের জীবন একটু বেশি আরামদায়ক যেন হয় তার জন্যে। প্রযুক্তি যদি পরিবেশের সর্বনাশ ডেকে আনে, আমাদের সেই প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। আজ আমাদের জীবন এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, এসি মেশিন বর্জন করার কথা আমরা ভাবতে পারি না। পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বাড়ছে। বাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। আমেরিকায় বছরে যে বিদ্যুৎ খরচ হয় তার শতকরা ৬ ভাগ এসি মেশিন চালাতে কাজে লাগে। এর খরচ ২৯ বিলিয়ন ডলার। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, বছরে এর জন্য আমেরিকায় ১১৭ মিলিয়ন ম্যাট্রিক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়। যাদের বাড়িতে এসি মেশিন রয়েছে, আমরা তো ভাবতেই পারি, যদি সিলিং পাখার হাওয়ায় কাজ চলে যায়, আমরা এসি মেশিন চালাব না। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ কোনো এক জায়গা থেকে তো শুরু করতে হয়। তোমরা আমাদের এই ভাবনার সঙ্গে একমত হবে তো? ❖

নিবন্ধ

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারিদের উৎস সন্ধানে

সমুদ্র বসু

মাসের হিসেব ছোটো থেকে বড়ো সবার জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার হিসেব, গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, বড়োদিনের ছুটি, বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণ এসব কিছুর সঙ্গেই লুকিয়ে রয়েছে নানা ধরনের পরিকল্পনা। সবকিছুই যেন এই মাসের ছক মেনেই চলে। গুটি গুটি পায়ে এক একটি মাস শেষ হয় আর আমরা যেন ততই নতুন আরেকটি বছরের দিকে এগোতে থাকি। জানুয়ারি মাস থেকে বছরের শুরু করে ধাপে ধাপে এগারোটি মাস পেরিয়ে যখন বারো মাসে বা ডিসেম্বর মাসে পৌঁছায় তখন আশায় বুক বেঁধে একটি আগামী রঙিন বছরের স্বপ্ন দেখে যে কেউ। কিন্তু এই ইংরেজি মাসের নামকরণ কীভাবে শুরু হল তা কি জানা আছে?

যুগ যুগ ধরে যে মাসের নামগুলো আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সে সব নামের পাশে আছে এক একটি ইতিহাস বা কারণ। বিভিন্ন ঘটনা বা উল্লেখযোগ্য রোমান দেব-দেবী অথবা বিভিন্ন সংখ্যাধারা থেকে এসেছে এক একটি ইংরেজি মাসের নাম। প্রথমে আমরা যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করি তার উৎপত্তি সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া যাক। এখন যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হয় তার নাম মূলত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার বা খ্রিস্টান ক্যালেন্ডার। ১৫৮২ সালে প্রথম এই ক্যালেন্ডার ব্যবহার শুরু করেন পোপ দ্বাদশ গ্রেগরি।

এর আগে যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা হত সেটি ছিল 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার'। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার এই ক্যালেন্ডারের প্রচলন শুরু করেন। দিনের হিসেবে সামান্য ফারাক থাকলেও মাসের নামগুলো কিন্তু দুটো ক্যালেন্ডারেই এক। তবে এখানে জেনে রাখা ভালো, জুলিয়ান ক্যালেন্ডার-এর পূর্বসূরি 'রোমান ক্যালেন্ডার'-এ মাসের নামগুলো ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। এই ক্যালেন্ডারে বছর শুরু হত মার্চ মাস থেকে। এখন যে-যে নামে আমরা মাস চিনি, তার নামকরণ হয় জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের সময় থেকেই। এবার এক এক মাসের পেছনের গল্পগুলো জানা যাক।

১। জানুয়ারি ভারতীয় পুরাণে দেবতাদের একাধিক মুখ নতুন কিছু নয়। চতুরানন ব্রহ্মা বা পঞ্চানন মহাদেবের কথা আমরা সকলেই জানি। গীতায় শ্রীবিষ্ণুর যে পরম রূপের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে তাঁরও অজস্র মুখের কথা জানা যায়। দেব-দানব থেকে মানুষ, পশুপাখি সবই না কি মিলিয়ে যায় সেই সহস্র মুখের অন্ধকারে। অসংখ্য মুখ না হলেও, রোমান দেবতা জানুসের ছিল দু-দুটো মুখ।

নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন জাগছে কে এই জানুস? প্রাচীন রোমান পুরাণ অনুসারে জানুস ছিলেন শুরু আর শেষের দেবতা। নানা বিষয়ে আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এই জানুস। সময়, দিক, গতি পথের দেবতাও ছিলেন তিনি। সে সময়কার রোমদেশের যেকোনো স্থাপত্যের প্রবেশপথের দরজার উপরেই রাখা হত জানুসের মূর্তি। কেন? বাহ্ রে! সৃষ্টির গোড়া থেকেই তিনিই যে দাঁড়িয়ে আছেন স্বর্গের দরজা পাহারার দায়িত্বে! রোমানরা মনে করতেন স্বর্গের পথে প্রথমেই যাঁর মুখোমুখি হতে হবে তিনিই দেব জানুস। তাই তাঁকে খুশি করতে না পারলে দরজা থেকেই ফিরতে হবে খালি হাতে...প্রবেশাধিকার মিলবে না।

চেহারার দিক থেকে দু-মুখো দেবতা জানুস যেন এক শান্ত সমাহিত যোগীপুরুষ। পুরোনো স্থাপত্যের গায়ে কিংবা প্রাচীন রোমান মুদ্রায় জানুসের যেসব ছবি পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় তাঁর একমাথা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ঋজু টিকোলো নাক, অন্তর্ভেদী চোখ আর একগাল সযত্নলালিত দাড়ি। ঘাড়ের উপর দু-দিকে বসানো দুই মুখ। কোনো কোনো স্থাপত্যে আবার এই দুই মুখের একটি মুখ যুবকের, অন্যটি বৃদ্ধের। বৃদ্ধের মাথায় মেষের মতো পাকানো শিং। দুটি মুখের একটি সামনে, অন্যটি পেছনে। একটি মুখ তাকিয়ে আছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, অন্যটি বিদায়ী অতীত পানে।

পুরোনো পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলোতে দেখা যায় দেবতা জানুস তাঁর
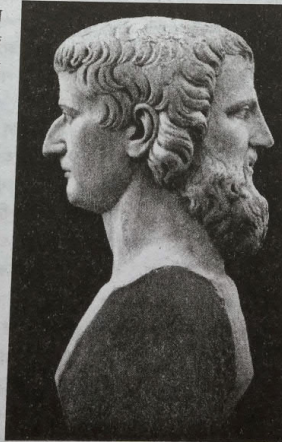
ডানহাতে ধরে আছেন একটা বেশ বড়ো চাবি বা চাবির গোছা। স্বর্গের দরজা ও ধনসম্পত্তির রক্ষক যিনি, তাঁর হাতে চাবি থাকবে, এ আর আশ্চর্য কী! কিন্তু প্রাচীন রোমে 'চাবি' একটা রূপক, যা দিয়ে অনেকসময় ভ্রাম্যমাণ বণিকদেরও বোঝানো হত। নিরাপদ বন্দর বা পণ্যের সন্ধানে দূরদেশ থেকে আসা বণিকেরা সেসময় চাবির প্রতীক ব্যবহার করতেন। সেদিক দিয়ে ভাবতে গেলে রোমের সঙ্গে অন্যান্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক লেনদেনের দেবতাও ছিলেন সম্ভবত এই দু-মুখো আদিদেব জানুসই।

প্রায় ৩৩ কোটি দেবদেবীর পুজো করতেন প্রাচীন রোমের মানুষ। সমুদ্রের দেবতা পসেডিওন, প্রেম আর সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস, সূর্যের দেবতা অ্যাপেলো তো ছিলেনই, এছাড়াও ছিলেন মার্কারি, মার্স, জুনো, নেপচুনের মতো সুপরিচিত দেবতারা। এঁদের তুলনায় জানুস কিছুটা কম পরিচিত হলেও গুরুত্বের দিক থেকে তাঁর দাবি কোনো অংশে কম তো নয়ই বরং বেশ উপরে। তাছাড়া রোমান শাস্ত্র অনুসারে জানুস ছিলেন পথ, দরজা এবং দিশানির্ণয়কারী দেবতা। দু-দিকে দুটো মুখ থাকার জন্যই সম্ভবত তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমস্ত পরস্পরবিরোধী শক্তির দেবতা। বাস্তব আর অবাস্তব, সত্যি আর কল্পনার ঠিক মাঝখানে যেন দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। জীবন-মৃত্যু, যৌবন-বার্ধক্য, শুরু-শেষ, যুদ্ধ-শান্তি, বর্বরতা-সভ্যতা, এই সমস্ত কিছুই ছিল জানুসের অধিকারে। মরজীবন থেকে অমরলোকে যাওয়ার পথের দিশা দেখাতেন তিনিই।

শুধু তাই নয়, প্রাচীন রোমের লোকজন বিশ্বাস করতেন যেকোনো শুভকাজের আগে জানুসের পুজো করতে হয়। যেকোনো শুভকাজ, তা বিয়ে হোক, বা শিশুর জন্ম, চাষের বীজ রোপণ, ঋতু পরিবর্তন বা নতুন বছরের শুরু—যেকোনো কিছুর আগেই তুষ্ট করতে হত দু-মুখো দেবতা জানুসকে। এই জন্যেই প্রাচীন রোমের যেকোনো ধর্ম অনুষ্ঠানে সবার আগে জানুসকে আহ্বান করা হত। দেবতাদের মধ্যে প্রথম পুজো পাওয়ার অধিকারীও ছিলেন তিনি। অন্যান্য দেবতার পুজো করার আগে জানুসের নামে নৈবেদ্য দিতে হত। প্রথম বলিও উৎসর্গ করা হত তাঁকে। নতুন বছরের প্রথম মাসটির অধিকারী দেবতাও তিনি। জানুসের মাস, তাই তাঁর নাম অনুসারেই সেই মাসের নাম হয় জানুয়ারি।

২। ফেব্রুয়ারি অনেক কাল আগে থেকে পাশ্চাত্যে বসন্তকালের শুরুর দিকে এক ধরনের উৎসব পালন করা হত যার নাম ছিল 'ফেব্রুয়া'। 'ফেব্রুয়া' মানে পবিত্র। রোমানরা তাই এই মাসটিকে পবিত্র মনে করে। এই উৎসবে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট সব পরিষ্কার করা হত। এই শোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের আত্মা এবং মনেরও এক ধরনের শুদ্ধিকরণ হত। আর এই উৎসবের নাম থেকেই মাসটির নামকরণ করা হয় 'ফেব্রুয়ারি'।

৩। মার্চ যুদ্ধের দেবতা মার্স এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন রোমান দেবতা। রোমান যোদ্ধারা যুদ্ধে যাওয়ার আগে ও যুদ্ধ জয় করে ফেরার পরে মার্স দেবতার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করত। এছাড়া মার্স ছিলেন রোমের অন্যতম রক্ষাকর্তা দেবতা। আবার প্রাচীন রোমে তিনি পূজিত হতেন কৃষি ও সুফলনের দেবতা হিসেবেও। তিনি ফসল ও গবাদি পশুদের বিভিন্ন রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা করতেন বলে বিশ্বাস। ইতালির প্রাচীন শহর 'অ্যালবা লংগা'র রাজা নিউমিটরের মেয়ে ছিলেন পরম রূপসি রাজকন্যা রিয়া সিলভিয়া। রোমান দেবতা মার্স ছিলেন প্রচণ্ড শক্তিমান যোদ্ধা। মার্সের সঙ্গে বিয়ে হয় রাজকন্যা রিয়া সিলভিয়ার। রোমিউলাস ও রেমাস নামে তাঁদের দুই যমজ ছেলে জন্মায়। কিন্তু তাদের জন্মের সময়ই দৈববাণী হয় যে এই দুই ভাই এক রাজার মৃত্যুর কারণ হবে। সে সময়ে নিউমিটরের ভাই আমুলিউস দাদাকে সরিয়ে সিংহাসন দখলের চেষ্টায় ছিলেন। এই দৈববাণী শুনে তিনি ভয় পেয়ে যান। নিজের পথের কাঁটা দূর করতে তিনি চাকরদের আদেশ দেন সদ্যোজাত রোমিউলাস আর রেমাসকে কেটে দু-টুকরো করে টাইবার নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু অত ছোটো অসহায় দুটো বাচ্চাকে কাটতে গিয়ে হাত কেঁপে যায় রাজভৃত্যদের। প্রাণে ধরে মেরে ফেলতে না পেরে তারা টাইবার নদীর কিনারে ফেলে আসে দুই দুধের শিশুকে। এক নেকড়ে মা সেসময় জল খেতে গেছিল নদীতে।

বাচ্চাদের কান্না শুনে খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে সে আবিষ্কার করে দুই সদ্যোজাতকে। সেখান থেকে তাদের নিয়ে যায় নিজের গুহায় আর সন্তানস্নেহে মানুষ করতে থাকে। সভ্যতা থেকে দূরে লুপারকাল নামের একটা গুহায় নেকড়ে মায়ের আদরে বড়ো হতে থাকে দেবতার সন্তান রোমিউলাস আর রেমাস। শেষমেশ দৈববাণীর কথাই ফলে যায়। বড়ো হয়ে রোমিউলাস আর রেমাস দুই ভাই উৎখাত করে অত্যাচারী শাসক আমুলিউসকে। নতুন এক নগরসভ্যতা তৈরি করতে চায় দুই ভাই। আর তাই নিয়েই বাধে ঝগড়া-অশান্তি। মনোমালিন্য বাড়তে বাড়তে হাতাহাতির চেহারা নেয়। মারামারির এক পর্যায়ে এসে রোমিউলাস হত্যা করে নিজেরই যমজ ভাই রেমাসকে আর গোড়াপত্তন করে আধুনিক রোমের।

মার্চ মাসের নামকরণের পেছনে দুটো তত্ত্ব আছে। আর দুটোই গড়ে উঠেছে রোমান যুদ্ধদেবতা মার্স-কে ঘিরে। এই মাস থেকেই প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে বলে এর হিংস্রতা বা প্রচণ্ডতাকে তুলনা করা হত 'মার্স'-এর সাথে। আবার আরেক মত অনুসারে, আগে মার্চ মাস দিয়ে শুরু হত রোমানদের বছর। তাই এই সময়ে সব যুদ্ধের অবসান ঘটত। সেই সূত্র ধরে যুদ্ধদেবতা মার্সের নামানুসারে নামকরণ করা হয় মাসটির।

৪। এপ্রিল এই মাসের নামকরণ নিয়েও আছে ভিন্ন ভিন্ন মত। কেউ কেউ মনে করেন 'দ্বিতীয়' কথাটির লাতিন শব্দ থেকে এসেছে নামটি। আবার অনেকে মনে করেন লাতিন শব্দ 'আপেরিবে' যার অর্থ খোলা বা ফোটা, এর থেকে এসেছে নামটি। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয় এপ্রিল মাসে সবকিছু নতুন করে ফোটে। প্রকৃতি সাজে এক নতুন রূপে আর সেই বিচারেই এর নামকরণ। আরেক মতে এই নামকরণের পেছনে আছেন গ্রিক দেবী 'আফ্রোদিতি'।

আফ্রোদিতি হল ভালোবাসা, সৌন্দর্য, চিরযৌবনের দেবী। হেসিয়ডের THEOGONY অনুসারে তার জন্ম সাইপ্রাস দ্বীপের পেফোসের জলের ফেনা থেকে। কল্পনা করা হয় তার জন্ম জলের ফেনা থেকে হয়েছে, যখন দানব ক্রোনাস তার পিতা ইউরেনাসকে হত্যা করে এবং জননতন্ত্র কেটে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। আবার হোমারের 'ইলিয়াড' অনুসারে আফ্রোদিতি জিউস এবং ডিয়নের কন্যা। এমন অনেক গ্রিক দেবদেবী আছে যাদের উৎপত্তির বহু গল্প পাওয়া যায়। অনেক দেবতারা বিশ্বাস করত আফ্রোদিতির সৌন্দর্য এতই মোহনীয় ছিল যে দেবতারা নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়ে পড়ত তাকে নিয়ে। তার সৌন্দর্যের আভা দেবতাদের মধ্যে যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ তৈরি করত। ঠিক এই কারণেই জিউস আফ্রোদিতিকে বিয়ে দিয়েছিলেন হেপাইসটাসের সঙ্গে, কারণ হেপাইসটাসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না তার কুৎসিত মুখাবয়ব ও বিকলাঙ্গতার জন্য।

এদিকে আফ্রোদিতি ভালোবেসেছিল এডোনিসকে। সে তাকে দেখেছিল যখন তার জন্ম হয় এবং মনে মনে বাসনা রেখেছিল যে এডোনিস তার স্বামী হবে। সে পারসিফোনিকে এডোনিসের দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিল কিন্তু পারসিফোনি নিজেও এডোনিসের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এবং তাকে ফেরত দিতে চাইছিল না। এই অবস্থায়, জিউস মধ্যস্থতায় এগিয়ে এলেন এবং দরবার করে রায় দিলেন এডোনিস দুইজনের সঙ্গেই থাকবে, বছরের অর্ধেক সময় অতিবাহিত করবে একজনের সঙ্গে, বাকি অর্ধেক সময় আরেকজনের সঙ্গে। আফ্রোদিতি রাজহাঁস অঙ্কিত এক ধরনের বাহন ব্যবহার করত যেটা হাওয়ায় ভেসে চলে। আফ্রোদিতি, হেরা, এথেনা এই তিনজন শীর্ষ প্রতিযোগী ছিল একটি সোনার আপেলের জন্যে— যেটিতে খোদাই করে লেখা ছিল 'সবচেয়ে সুন্দরীর জন্য'। জিউসকে বলল এই প্রতিযোগিতার বিচারকার্য পরিচালনা করতে কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করলেন। তারপর ট্রয় নগরের রাজার পুত্র প্যারিস এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব নিলেন। প্রত্যেক দেবীই তাঁকে প্রতিদানে অনেক কিছু দেবার অঙ্গীকার করলেন, কিন্তু প্যারিস আফ্রোদিতির পক্ষে রায় দিলেন। প্যারিসের এই বিচারকার্যের গল্পকে বিবেচনা করা হয় ট্রোজান যুদ্ধের পিছনে প্রধান কারণ হিসেবে। আফ্রোদিতি প্যারিসকে রক্ষা করেছিল মেনেলাউসের কাছ থেকে, সে মেঘ দিয়ে তাকে ঢেকে ফেলেছিল এবং ট্রয় নগরীতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আফ্রোদিতি কোমরে বাঁধা এক জাদুর পেটি অর্জন করেছিল, এক সময়ে হেরা সেটা ধার নিয়েছিল জিউসকে প্রলুব্ধ করতে যাতে সে ট্রোজান যুদ্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই আফ্রোদিতির নাম থেকেই এপ্রিল মাসের উৎপত্তি বলে অনেকেই মনে করে।

৫। মে রোমানদের এক দেবী ছিলেন। তাঁর নাম ছিল 'মেইয়া'। তিনি দেবতা অ্যাটলাসের মেয়ে এবং মারকিউর তাঁর

ছেলে। কথিত আছে এই দেবীই ছিলেন সমস্ত শস্যের রক্ষাকর্ত্রী। তাই এই শস্য ফলনের মাসটিকে তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়।

৬। জুন রোমান নারীদের রক্ষাকর্ত্রী দেবী জুনো, নানা নামে তাঁর উপাসনা করা হত। জুনো প্রোনুবা নামে তিনি বিয়ের দিকটা দেখতেন, জুনো লুসিনা নামে সাহায্য করতেন মেয়েদেরকে সন্তান হওয়ার সময়। তাছাড়া রোমান রাজসভার বিশেষ পরামর্শদাতা এবং রক্ষাকারী হিসেবে তাঁর নাম ছিল জুনো রেজিনা। তিনি ছিলেন রোমের দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী। এই জুপিটার ছিলেন আকাশ, আলো ও বজ্রের দেবতা। মার্চের সময়, যখন প্রকৃতিতে নতুনের ছোঁয়া লাগে আবার, জুনোর সম্মানে তখন রোমানরা পালন করত "ম্যাট্রোনালিয়া" অনুষ্ঠান। তা অনুষ্ঠানটি মার্চে হলেও, জুনোর নামানুসারে রাখা হয়েছে 'জুন' মাসের নাম। আজও বিশ্বের অনেক দম্পতি মনে করে যে বিয়ে করতে হলে এই মাসেই করা উচিত। রোমের ক্যাপিটোলাইন পাহাড়ে ছিল জুনোর মন্দির, সেখানে তিনি পরিচিত ছিলেন জুনো মোনেটা (পরামর্শদাতা) নামে।

৭। জুলাই খ্রিস্টপূর্ব ৪৫ সালে রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার যে ক্যালেন্ডার-এর প্রচলন করেছিলেন তার নাম ছিল 'জুলিয়ান ক্যালেন্ডার'। আর এই ক্যালেন্ডার-এর প্রবর্তক জুলিয়াস সিজারের নামানুসারেই 'জুলাই' মাসের নামকরণ করা হয়।

বিখ্যাত রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের জন্ম হয় একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। বলা হয় যে, জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমান পুরাণে উল্লেখিত প্রেমের দেবী ভেনাস ও ইউলাস-এর পুত্র ট্রজান রাজকুমার ইনিয়াস (Aeneas)-এর পুত্র ইয়োলাস (lulus)-এর বংশধর। রোম থেকে ২০ মাইল দক্ষিণে অ্যালবা লংগা নামক স্থানে সিজার পরিবারের বাসস্থান ছিল। জুলিয়াস সিজারের জন্ম হয় ১২ জুলাই (মতান্তরে ১৩ জুলাই), খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দে। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া জুলিয়াস সিজারের পিতার নাম ছিল গ্যাইয়াস জুলিয়াস সিজার (Gaius Julius Caesar) এবং তিনি ছিলেন প্রাচীন রোমের একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও এশিয়া অঞ্চলের শাসক। তাঁর মায়ের নাম ছিল অউরেলিয়া কোট্টা (Aureliya Cotta) এবং তিনি একটি প্রতাপশালী পরিবার থেকে এসেছিলেন। এছাড়া জুলিয়াস সিজারের শৈশব সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

জুলিয়াস সিজারের বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর তখন হঠাৎ তাঁর বাবা মারা যান। এর পর তিনিই হয়ে ওঠেন পরিবারের কর্তা। ওই সময় জুলিয়াস সিজারের পিসেমশাই গ্যাইয়াস মারিয়াস, যিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্রের একজন প্রভাবশালী শাসক, তিনি ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী লুসিয়াস কর্নেলিয়াস সুলা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। মারিয়াস ও তাঁর মিত্র লুসিয়াস সিনা যখন শহরটি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হন, তাঁরা জুলিয়াস সিজারকে জুপিটার-এর প্রধান যাজক হিসেবে নিয়োগ দেন। পরিবারের সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করে সিজারও রাজি হয়। কিন্তু যাজক হতে হলে নিজে সম্ভ্রান্ত পরিবারের হওয়ার পাশাপাশি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মেয়েকে বিয়েও করতে হত। তাই লুসিয়াস সিনার কন্যা কর্নেলিয়ার সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সুলা জয়লাভ করে এবং মারিয়াস ও সিনার সাথে আত্মীয়তা সূত্রে জুলিয়াস সিজার সুলার নতুন টার্গেট-এ পরিণত হন। তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকে স্ত্রীর নিকট হতে পাওয়া সম্পত্তি থেকে এবং যাজকবৃত্তি থেকে জোরপূর্বক বঞ্চিত করা হয়। এমনকী তাঁকে স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যও চাপ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে তিনি পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সিজারের মায়ের পরিবার ছিল সুলার সমর্থক এবং তাদের হস্তক্ষেপে সুলা তাঁর উপর থেকে হুমকি প্রত্যাহার করেন কিন্তু তিনি বলেন যে জুলিয়াস সিজার একাই অনেকগুলো মারিয়াস-এর সমান।

প্রখ্যাত রোমান সেনাপতি ও শাসক জুলিয়াস সিজার রোমান রিপাবলিক নামক ছোটো নগর রাষ্ট্র থেকে গড়ে তুলেছিলেন বিশাল রোমান প্রজাতন্ত্র। শক্তি, সাহস আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে জয় করে নিয়েছিলেন আশেপাশের বহু অঞ্চল আর সামরিক শক্তিতে হয়ে ওঠেন অদ্বিতীয়। তিনিই ছিলেন একমাত্র রোমান জেনারেল যিনি রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন ইংলিশ চ্যানেল ও রাইন নদী পর্যন্ত এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডেও অনুপ্রবেশ করেন। তবে এত সাফল্য আর শক্তির অধিকারী হয়েও তাঁকে ষড়যন্ত্রের শিকার

হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় তাঁরই সিনেটরদের হাতে।

৮। অগস্ট রোমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যখন বছর শুরু হত মার্চ থেকে তখন অগস্ট বছরের ষষ্ঠ মাস। আগে এই ষষ্ঠ মাসটিকে 'সেক্সটিলিয়া' (লাতিন ভাষায় ছয়) বলা হত। পরবর্তীতে এই নাম পরিবর্তন করা হয় অগস্ট নামে। জুলিয়াস সিজারের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন অগাস্টাস সিজার। তাঁর পর তিনিই সিংহাসনে বসেছিলেন। মনে করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম সাল নাগাদ অগস্টাসের নাম অনুসারে এই মাসের নামকরণ হয় অগস্ট।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৭ অব্দের গল্প। তৎকালীন পৃথিবী শাসন করতেন রোমান সম্রাটরা। তখন রোমের সিংহাসনে আসীন ছিলেন দিগ্বিজয়ী সম্রাট জুলিয়াস সিজার। যুদ্ধবাজ সম্রাট হিসেবে বেশ খ্যাতি ছিল তার। সেবছরও তিনি হিস্পানিয়া অঞ্চলে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সিজারের সেনাবাহিনী তখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী। তাদের সামনে পৃথিবীর বহু পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ধুলায় লুটিয়ে পড়েছে। অনেকে নিশ্চিত পরাজয় জেনে যুদ্ধের আগেই আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু হিস্পানিয়ানরা সিজারের নিকট নতিস্বীকার করতে চাইল না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিস্পানিয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রোমান বহরের উপর। নৌপথে অগ্রগামী রোমানরা হিস্পানিয়ার আক্রমণের তোপে প্রাথমিকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হল। কিন্তু ততক্ষণে বহু নৌবহর ধ্বংস হয়ে সাগরতলে সলিল সমাধিস্থ হয়ে গেছে। দুঃখের বিষয়, ডুবে যাওয়া রোমানদের মাঝে সিজারের বহু ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিজন ছিলেন। আবার অনেকে শত্রুসীমানায় বন্দি হয়েছেন।

শত্রুশিবির থেকে খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে সিজার তাঁর সৈন্যবহর নিয়ে আশ্রয় নিলেন। শত্রুসীমানায় আটকে পড়া কেউ ফিরে আসবে, সে আশা ত্যাগ করে তিনি নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা করতে থাকেন। ঠিক তখন রোমান শিবিরে সৈন্যরা হর্ষধ্বনি করতে থাকে। সিজার তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন এই চিৎকারের কারণ জানার জন্য। তারপর দেখলেন, হাজার সৈনিকের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন তার ভাগ্নিপুত্র গাইয়াস অক্টাভিয়াস। মাত্র ১৬ বছর বয়সি এই রোমান যুবক শত্রুপক্ষের জলসীমানায় আটক ছিলেন। কিন্তু অসীম সাহসিকতায় শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে পুরোটা পথ সাঁতার কেটে ফিরে এসেছেন সিজারের পক্ষে যুদ্ধ করতে। জুলিয়াস সিজার এই বালকের সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। হিস্পানিয়া যুদ্ধ শেষে তিনি রোমে ফিরেই জানিয়ে দিলেন তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম। আর তা হচ্ছে গাইয়াস অক্টাভিয়াস, যাকে ইতিহাসের পাতায় 'অগাস্টাস সিজার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অগাস্টাসের নাম অনুসারে জুলিয়াস সিজারের নামাঙ্কিত মাস "জুলাই"-এর পরবর্তী বা উত্তরসূরি হিসেবে মাসটির নাম করা হয় অগস্ট।

৯। সেপ্টেম্বর লাতিন ভাষায় 'সেপ্টেম' মানে সাত। সেখান থেকেই এসেছে এই নামটি। গ্রেগরিয়ান এবং জুলিয়ান ক্যালেন্ডারে এটি নবম মাস হলেও দশমাস বিশিষ্ট রোমান ক্যালেন্ডারে এটি ছিল সপ্তম মাস। অপরিবর্তিত ভাবে সেই নামটিকেই ধরে রাখা হয়েছে পরবর্তী ক্যালেন্ডারগুলোতেও।

১০। অক্টোবর অক্টোবরের ক্ষেত্রেও অনেকটা একই যুক্তি খাটে। ল্যাটিনে 'অক্টো' মানে বোঝায় আট। রোমান ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস পরবর্তীতে অন্যান্য ক্যালেন্ডারে হয়ে গেল দশম মাস। কিন্তু উৎস একই বলে অক্টোবর মাসটিই পরবর্তীতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

১১। নভেম্বর নভেম্বর এসেছে লাতিন ভাষার 'নবম' থেকে। লাতিন ভাষায় 'নোভেম' মানে—নয়। কিন্তু লাতিন ভাষার এই মাস পরবর্তীতে এগারো নম্বর মাসে রূপান্তরিত হয়।

১২। ডিসেম্বর ডিসেম্বর এসেছে লাতিন ভাষার "দশ" থেকে। লাতিন ভাষায় 'ডিসেম' মানে দশ। কিন্তু লাতিন ভাষার এই মাস পরবর্তীতে বারো নম্বর মাসে রূপান্তরিত হয়।

এইভাবে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের মাসগুলো প্রধানত উঠে এসেছে গ্রিক-রোমানদের জীবনধারা, দেব-দেবীর প্রতি মান্যতা, সম্রাটদের প্রতি ভক্তি এবং পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। ইংরেজি মাসের নামগুলো এখন আমাদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনো কখনো হয়তো মনের মাঝে উঁকি দিয়েছে কী করে এল এই মাসগুলো? ভাবতে মাঝে মাঝে অবাকও লাগে কত আগে থেকেই এই দিন-মাসের গণনা শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আজকের এই ইংরেজি ক্যালেন্ডার। কিন্তু নামগুলো আজও হাতছানি দিচ্ছে গ্রিক-রোমান দেব-দেবী বা সম্রাটদের উদ্দেশে। ❖

কৃতজ্ঞতা শাশ্বতী সান্যাল, পাপিয়া দেবী।

বড়ো গল্প

সবুজের ঘ্রাণ

অভিজিৎ তরফদার

ছবি : সৌজন্য চক্রবর্তী

(১)

পরপর তিনবার।

বলটা পেয়েছিলাম বক্স-এর মাথায়। সামনে তাকিয়ে দেখলাম ওদের রাইট ব্যাক ডানপাশের পোস্টটা কভার করে রেখেছে। গোলকিপার দাঁড়িয়ে আছে মাঝামাঝি, কিন্তু দেখাচ্ছে বাঁদিকের পোস্ট ফাঁকা। ইংগিতটা স্পষ্ট ওদিকেই মারো। ওর শরীরটাও ঝুঁকে আছে বাঁদিকে। ওই পোস্টে বল রাখলে হাসতে হাসতে আটকে দেবে। মারতে হবে ডান পোস্টেই। কিন্তু এখান থেকে শট নিতে গেলে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে আর এক স্টেপ এগিয়ে ইনসুইং করালে বলটা ডান দিক দিয়ে জালে জড়িয়ে যাবে। সেইমতো বলটা সামান্য গড়িয়ে দিয়ে শট নিতে গেলাম। এক মুহূর্ত। তার মধ্যেই কোথা থেকে উড়ে এল ওদের লেফ্‌ট্ ব্যাক। ছোট্ট টোকায় বলটা সরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

পরের বার শ্যামল। শ্যামল বলটা পেয়ে গেয়েছিল একদম ফাঁকায়। সামনে গোলকিপার ছাড়া কেউ নেই। ফাইনাল চার্জ করার জন্য গোলকিপার ছুটে আসছে শ্যামলের পা লক্ষ্য করে। শ্যামল আর রিস্ক নিল না। ওখান থেকেই টিপ করল। আমাদের সাপোর্টাররা উঠে দাঁড়িয়েছে। 'গোল' শব্দটা গ্যালারি থেকে শোনা যেতে শুরু করেছে। হঠাৎ কেউ এসে মাথাটা বাড়িয়ে দিল। মাথায় লেগে বল চলে গেল গোল লাইনের বাইরে।....সেই লেফ্‌ট্ ব্যাক।

তৃতীয়বার আবার আমি। ওদের গোলকিপার আর রাইট ব্যাকের ভুল বোঝাবুঝিতে কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে বলটা যখন পেলাম, চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম গোলকিপার তখনো নিজের জায়গায় ফিরে যায়নি। ওদিক থেকে তরতর করে উঠে আসছে শ্যামল। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে বলটা কোথায় রাখতে হবে। শট নিতে যাচ্ছি, হঠাৎ পাশে কারো ছায়া পড়ল। তারপরই একটা পরিচ্ছন্ন স্লাইডিং ট্যাক্‌ল। পড়ে যেতে যেতে দেখলাম বলটা নিয়ে ধীরে-সুস্থে চলে গেল ওদের লেফ্‌ট্ ব্যাক।

হাফটাইমে সবার মুখ শুকনো। সামনে লেবু-চিনির জল, অথচ কারোর ইচ্ছে করছে না গলায় ঢালতে। এটুকু সময়ের মধ্যেই বুঝে গিয়েছি ওই লেফ্‌ট্ ব্যাক থাকতে আজ আমাদের কোনো আশা নেই।

স্বপন বলল, 'ওর নাম হাঁসদা। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। খেলাই ওর ধ্যানজ্ঞান।'

তা তো বোঝা গেল। কিন্তু ওই হাঁসদাই যে আমরা আর ফাইনালে ওঠা—এর মধ্যে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কী করা যায়? মিশন স্কুল চিরকালই আমাদের গেরো। গতবছর ওদের কাছে হেরেই আমাদের টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল। এবার, আমাদের বিশ্বাস, এই সেমি-ফাইনালের গাঁটটা যদি পার হতে পারি, ফাইনালে আমাদের কেউ আটকাতে পারবে না। ইনটার-স্কুল টুর্নামেন্টে অবধারিত আমরাই চ্যাম্পিয়ন।

কানু চুপচাপ ঘাস ছিঁড়ছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল, 'ওই হাঁসদা না রামদা ওকে ম্যানেজ করতে পারলেই আমরা জিতছি তাই তো?'

—মোটামুটি তাই।

—ঠিক আছে। দেখি কী করতে পারি!

সেকেন্ড হাফের শুরুতেই কানু আমার কাছে এসে বলল, 'তুই ডিফেন্সে নেমে যা। কিছুক্ষণ আমার কাজটা সামলা। আমি হাঁসদাকে সাইজ করছি।'

কথামতো আমরা পজিশন এক্সচেঞ্জ করে নিলাম। কানু উঠে গেল রাইট আউটে, হাঁসদার মুখোমুখি।

বলটা গোলকিপারের কাছ থেকে নিয়ে সাইডলাইন বরাবর উঠে আসছিল হাঁসদা। কানু গেল ওকে চ্যালেঞ্জ করতে। কী হল এতদূর থেকে ঠিক বোঝা গেল না। তবে দেখা গেল হাঁসদা ছিটকে পড়ে ডান পায়ের হাঁটু ধরে কাতরাচ্ছে। কানুও দুবার ডিগবাজি খেয়ে সাইডলাইনের বাইরে শুয়ে যন্ত্রণার ভান করছে।

রেফারি ছুটে এলেন। ফ্রি-কিক। হলুদ-কার্ড। কার্ড খেয়ে মুখ ব্যাজার করে কানু আবার ডিফেন্সে নেমে এল। পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে কানে বলে গেল, 'রামদা আজ আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।'

হলও তাই। কিছুক্ষণ খেলার চেষ্টা করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সাইডলাইনের ধারে চলে গেল ওদের লেফ্‌ট্ ব্যাক। সাবস্টিটিউশন। হাঁসদার জায়গায় যে নামল তার স্কিল হাঁসদার সিকির সিকিও নয়।

হাসতে হাসতে দু-খানা গোল করে এল শ্যামল।

আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল কানু।

খেলা শেষ।

দু-গোলে জিতে আমরা ফাইনালে উঠে গেলাম।

(২)

লম্বা হুইস্‌ল্।

দেখা গেল হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসছে ভুটিদা।

কী ব্যাপার?

—ফাউল থ্রো।

বলটা ছুঁড়ে দিয়ে গজগজ করতে করতে ফিরে এল কানু।

ভুটিদা পাশ করা রেফারি। কিন্তু ভুটিদা যে অ্যাকাডেমিতে রেফারিং পড়েছিল সেখানে ফাউল থ্রো ছাড়া অন্য কিছু শেখানো হয়নি। থ্রো করার সময় এক পা উঠে গেলে ফাউল থ্রো। পা সাইডলাইন টাচ করলেও ফাউল থ্রো। আর কী কী কারণে ফাউল থ্রো হয় তা ভুটিদাই শুধু বলতে পারবে।

ভুটিদা!

এক অনন্ত রেফারি।

ভুটিদা ছাড়া অন্য কোনো রেফারি আমরা কল্পনাই করতে পারি না। মানুষটার তিন কুলে কেউ নেই। কাজ করে মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে যেখানে বাড়ির প্ল্যান সাংশন হয়। সকাল থেকে সবাই হাত গুটিয়ে বসে থাকে। সাড়ে তিনটে বাজলেই ভুটিদা জিনিসপত্র গুছিয়ে খেলার মাঠের দিকে রওনা দেয়। নীতিবাগীশ ভুটিদা চলে গেলে তবে অফিসের আসল কাজ শুরু হয়।

ঘেরা মাঠে বড়ো খেলা থাকলে দেখতে ভুটিদা যাবেই। আর খেলা দেখে ফিরে খেলার গল্প নয়, রেফারি কোথায় কখন কী ভুল করল সেটাই সাতকাহন করে আমাদের শোনাত।

ভুটিদার রেফারিংও অন্য সবার থেকে আলাদা। অফসাইড মাফ। ফাউল মাফ। পেনাল্টি দেখেও না দেখার ভান। কিন্তু ফাউল থ্রো? কদাপি নয়। সঙ্গে সঙ্গে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে ছুটে আসবে।

খেলা শেষে গজগজ করছিল কানু।

শ্যামল বলল, 'আমাদের বলে কী হবে? ভুটিদাকে শুনিয়ে দিলেই তো পারতিস।'

—বলেছি তো।

—কী বলেছিস?

—বলেছি, ফাউল থ্রো ছাড়া বোঝোটা কী?

—শুনে কী বলল?

—খেলা শেষ হলে বলল, 'এখন হচ্ছে স্পেশালাইজেশনের যুগ। দেখিসনি চোখের ডাক্তার কানের চিকিৎসা করতে পারে না! আমিও তাই। ফাউল থ্রোটাই আমার এরিয়া অব স্পেশালাইজেশন।'

—ঠিকই তো বলেছে, হেসে ফেলল শ্যামল।

—হাসিস না তো, রেগে গেল কানু,—তোর হাসি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে।

এবারে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

উঠতে উঠতে বললাম, 'আলো জ্বলে গেছে। এবার না ফিরলে মার হাতে ঠেঙানি আছে।'

কানু গলা তুলল,—'যা। আমরা তো আর ভালো ছেলে নই। যখন হোক ফিরলেই হল।'

বোঝা গেল, কানুর রাগ এখনও পড়েনি।

(৩)

ক্লাসে সামনের রোয়ে বসে 'ভালো ছেলেরা'। ওরা বছর বছর ফার্স্ট-সেকেন্ড হয়। মাস্টারমশাইরা ওদের দিকে তাকিয়েই পড়ান। বোর্ডের পরীক্ষায় কিংবা জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এ ভালো রেজাল্ট করে ওরাই স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আর আমরা?

লাস্ট বেঞ্চ।

আমার ডানপাশে কানু। তার পাশে স্বপন। তারও পরে শ্যামল।

কেন এই শ্রেণিবিভাগ?

সামনের রোয়ে বসা 'ভালো' ছেলেগুলোর পৃথিবী বইয়ের গণ্ডির মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ওরা জানে না মেসি বাঁ-পায়ের খেলোয়াড় না ডান পায়ের। পেপ গুয়ার্দিওলা নামক ব্যক্তিটি নাচে না সাঁতার কাটে। পেটে বোমা মারলেও ওদের কাছ থেকে বের করা যাবে না।

ওই ভালো ছেলেগুলোর মতো হিংসুটে পৃথিবী ঢুঁড়লেও কেউ খুঁজে পাবে না। অথচ স্যারেরা ওদেরই মাথায় তুলে নাচানাচি করেন।

আর আমরা কী করি?

এই যে এখন, সন্তোষবাবু বাংলা পড়াচ্ছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

আমার কোলের ওপর রোনাল্ডোর একটা পোস্টার, শ্যামলের কোলে মেসি। মাঝখানে বসে কানু আর স্বপন পোস্টার দুটো শেয়ার করছে।

ভালোই চলছিল। হঠাৎ সন্তোষবাবুর নজর পড়ল, স্যার সন্দেহ করলেন আমরা এমন কিছুর চর্চা করছি যা ঠিক বাংলা সাহিত্যের আওতায় পড়ে না।

আমার দিকে তাকালেন।

—কী দেখছিস? হাতে কী?

—কিছু না তো!

—কিছু না? ঠিক আছে, উঠে দাঁড়া।

পড়লাম মহা ফ্যাসাদে। দাঁড়াতে গেলেই কোলের কাগজ মাটিতে পড়বে। তারপর কী ঘটবে ভাবতে গেলেই হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল। স্যার-এর ছড়িটা যা মোটা আর শক্ত!

কী করব ভাবছি, তার মধ্যেই স্যার আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকলেন। অর্ধেক রাস্তা এসেছেন, একটা হাত আমার কোলের ওপর থেকে পোস্টারটা চুপচাপ সরিয়ে নিল। স্বপন। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সন্তোষবাবু থেমে গেলেন। চোখে অবিশ্বাস। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন বমাল কোথায় পাচার করেছি। বুঝতে না পেরে অ্যাবাউট টার্ন করে যেই না দু-পা বাড়িয়েছেন, খুক খুক করে হেসে উঠল স্বপন।

—কে রে? কে হাসল?

এবার স্যার একেবারে মুখোমুখি। হাতের ছড়িটা সপাং সপাং করে দু-বার বাতাসে নাচিয়ে হুঙ্কার দিলেন, —'কী হল? জবাব দিচ্ছিস না কেন? বল্, হাসির শব্দ পেলাম, তা আওয়াজটা কার মুখ থেকে বেরোল?'

মাথা নীচু করে আমরা সবাই চুপ। অন্যদের সাহস নেই হাসির উৎস ধরিয়ে দেয়। হাতের ছড়ি নাচাতে নাচাতে স্যার ফিরে গেলেন চেয়ারে।

ক্লাস শেষ হতেই স্বপনকে চেপে ধরা হল। কারণটা অবশ্য অন্য। মাথা নীচু করে স্যার-এর চোখ থেকে দৃষ্টি আড়াল করতে গিয়ে স্বপনের পায়ের দিকে চোখ গেছে। আর তখনই স্বপনের পায়ের নতুন ভূষণের দিকে সবার নজর পড়েছে।

একজোড়া চকচকে নতুন জুতো।

আমরা কেউই জুতো পরি না। চটি, হাওয়াই চপ্পল। খালি পায়েও আসে কেউ কেউ। মফস্‌সল শহরের সরকারি স্কুলে তাই নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায় না। স্বপন জুতো পেল কোথায়?

চেপে ধরতে রহস্যময় হাসি উপহার দিল স্বপন,—'ক্রমশ প্রকাশ্য।'

—ক্রমশটা কবে?

—আজই। স্কুল ছুটি হবার পর।

ক-টা তো ঘণ্টা। তাও যেন কাটতে চায় না। যাইহোক, ছুটি হল। ক্লাস ফাঁকা হলে স্বপন ডাকল—'আমার সঙ্গে আয়। বেশি আওয়াজ করিস না।'

তিনতলায় ছাদে ওঠার সিঁড়ির মুখে একটা ঘর চিরকাল তালাবন্ধ অবস্থায় দেখেছি। সেখানে গিয়ে স্বপন দাঁড়াল। পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে বলল, 'দাঁড়া, তালা খোলার আগে গল্পটা বলে নিই।'

স্কুল ফাঁকা। ছাত্ররা সবাই বেরিয়ে গিয়েছে। মাস্টারমশাইরাও একে একে গেট পেরিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিচ্ছেন। মাঠে ছায়া পড়েছে। একটু পরেই ছায়া লম্বা হতে হতে মাঠখানা পুরোপুরি ঢেকে ফেলবে।

—গত শনিবার চটির স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেফটিপিন দিয়ে লাগিয়ে বেরোতে বেরোতে হঠাৎ দেখি এইখানে এই বন্ধ দরজার সামনে মুখ শুকনো করে বিনোদবাবু দাঁড়িয়ে। বিনোদবাবু খেলার মাস্টারমশাই। খেলার সাজ-সরঞ্জাম ওনার জিম্মাতেই থাকে।
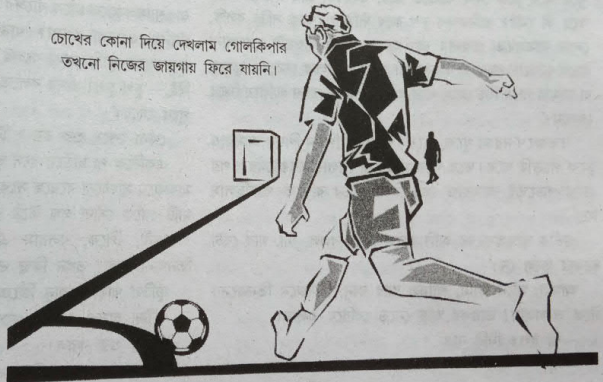
চোখের কোনা দিয়ে দেখলাম গোলকিপার তখনো নিজের জায়গায় ফিরে যায়নি।

স্বপন তালায় চাবি ঢোকাতে ঢোকাতে বলে চলল।

'স্যারকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে স্যার?

স্যার বললেন, পুরোনো তালাটায় মরচে ধরে গিয়েছিল। খুলতে গিয়ে ভেঙে গেল। এখন কী করি বল তো? এত সব খেলার সরঞ্জাম, তালা না দিয়ে ঘরটা খুলেও রাখা যায় না।

আমি বললাম, কোনো চিন্তা নেই। কাছেই দোকান, কিনে এনে দিচ্ছি। যাব আর আসব। স্যার টাকা দিলেন, আমি গেলাম তালা কিনতে।

তালা কিনে ফিরতে ফিরতে কী মনে হল, সঙ্গে দু-খানা চাবি

দেয় তো, একখানা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম। স্যারকে দিতে স্যার তালা লাগিয়ে চাবি পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, আর এক সেট চাবি?

অবাক হবার ভান করলাম,—কিছু বললেন স্যার?

—হ্যাঁ, বিনোদবাবু বললেন—চাবি তো দু-খানা দেবার কথা। আর একটা কোথায়?

—আমাকে তো একটাই চাবি দিল দোকানদার।

—ঠিক আছে। কাল গিয়ে খোঁজ করিস।

সোমবার স্যারকে বললাম, দোকানদার বলছে চাবি নাকি দুটোই দিয়েছিল। স্যার বললেন, হতে পারে আর একটা চাবি হাত থেকে পড়ে গেছে। চাবির গল্প ওখানেই মিটে গেল।

দুটো দিন অপেক্ষা করলাম। তারপর বুধবার এইরকম সময়ে ছুটির পর স্কুল যখন ফাঁকা, চুপিচুপি এসে অন্য চাবিটা দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখি ঘরভর্তি ব্যাট, উইকেট, গ্লাভস থেকে শুরু করে কী নেই? খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যি বলছি, লোভ সামলাতে পারলাম না। আমার ছেঁড়া হাওয়াই চপ্পলখানা ব্যাগে ঢুকিয়ে পছন্দসই একজোড়া ফুটবল খেলার চামড়ার জুতো, যা আমার পায়ে ফিট করে, পরে আবার দরজায় তালা লাগিয়ে ফিরে গেলাম।'

ততক্ষণে দরজা খুলে গেছে। স্বপনের পিছন পিছন আমরাও ঢুকে পড়েছি ঘরে। থরে থরে সাজানো খেলার সরঞ্জামের ওপর চোখ পড়তেই আমরাও যেন বিস্ময় ধরে রাখতে পারছিলাম না।

গভীর আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে স্বপন বলল, 'যা, যার যেটা দরকার তুলে নে।'

আমরা, মানে আমি, শ্যামল আর কানু, তিনজনে তিনজনের দিকে তাকালাম। তারপর ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলাম।

—কী হল? নিবি না?

—না।

দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে ব্যঙ্গের হাসি হাসল স্বপন। বলল, 'জানতাম, পারবি না। সবকিছু সবার দ্বারা হয় না।'

(৪)

সবুজ স্পোর্টিং।

আমাদের ক্লাব-এর নাম।

ক্লাব মানে অবশ্য কোনো রেজিস্টার্ড ক্লাব, যাদের ঘরবাড়ি আছে, নিজস্ব খেলার মাঠ আছে, ব্যায়াম করার জিম আছে, তা নয়। এই ক্লাব চলমান। আজ এখানে তো কাল ওখানে।

সে আবার কেমন ব্যাপার?

খোলসা করছি।

আমাদের থাকবার মধ্যে একখানা ফুটবল। সেটাও ভুটিদার দান। খেলতে খেলতে ফুটবলখানার যখন এমন অবস্থা হয় যেকোনো দিন কেটে গিয়ে চামড়াখানা খুলে পড়ে যাবে, তখন ভুটিদা আর একটা ফুটবল কিনে দেয়। সেটাই আমাদের একমাত্র সম্বল।

যেহেতু নিজেদের মাঠ নেই, যেখানেই ফাঁকা জায়গা পাই, খেলতে শুরু করে দিই। স্কুলের মাঠ, স্কুল ছুটি হলেই গেটে তালা পড়ে যায়, যাবার উপায় নেই। তখন যেকোনো মাঠই আমাদের হয়ে যায়। ঘাসগুলো আমাদের ডাকে। স্বপন ছাড়া আমাদের কারো খেলার জুতো নেই। খালি পায়ে যখন মাঠে নামি, নরম ঘাস পায়ের নীচে সুড়সুড়ি দেয়। পায়ের পাতায় বলখানা ছোঁয়ালে তার যে স্পর্শ, পৃথিবীর যেকোনো সোহাগের স্পর্শ তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। আর দু-পায়ের ফাঁকে বল নিয়ে যখন বিপক্ষের গোলের দিকে দৌড়তে থাকি, একটা সুতীব্র ইচ্ছা ভেতরে জমা হয়, যার প্রভাবে এক টোকায় বলখানা গোলের মধ্যে ঠেলে দিতে ইচ্ছা হয়।

এই সমস্ত কিছু, যে না খেলেছে, যে না ফুটবল পায়ে ঘাসের মাঠে দাপাদাপি করেছে, সে কোনোদিনই অনুভব করতে পারবে না। শ্যামল মাঝে মাঝে ব্যঙ্গের সুরে বলে,—'ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস ওগুলো খেলা? ধাক্কাধাক্কি নেই, বডি-কনট্যাক্ট শূন্য, ওগুলোকে আমি খেলা বলেই মনে করি না।' শ্যামলকে থামিয়ে দিই,—'চুপ চুপ! ওসব বলতে নেই, কেউ শুনে ফেললে জেলে পুরে দেবে।'

খেলা শেষে শুরু হয় ভুটিদার ক্লাস।

একদিকে পা ছড়িয়ে বসে ভুটিদা, মুখোমুখি গোল হয়ে আমরা, মাঝখানে সাজানো রয়েছে সবেধন সম্পত্তি একখানা ফুটবল, ভেজা মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ উঠে আসছে, ভুটিদা বলে চলেছে।

'চুনী, পিকে, বলরাম এই তিনজন ছিল ইন্ডিয়া টিমের তিনখানা ফলা। তখন কিন্তু ভারতকে সকলেই সমঝে চলত।'

ভুটিদা থামল। কানু জিজ্ঞেস করল, 'থামলে কেন?'

ভুটিদা হাসল, 'একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল।'

ভুটিদা শুরু করল।

—একবার হয়েছে কী, একটা জুতো কম্পানি এসেছে পায়ের মাপ নিতে।

জুতোর কথা শুনে আমরা নড়েচড়ে বসলাম, আমাদের সকলের খালি পা। ব্যতিক্রম স্বপন। তবে স্বপন গোলকিপার। ওর জুতোর সঙ্গে আমাদের জুতোহীন পায়ের সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা কম।

—তা কী করল জুতো কোম্পানি? স্বপনই জিজ্ঞেস করল।

—রহিম সাহেব তখন কোচ। রহিম সাহেবের নাম শুনেছিস? ওনার মতো বড়ো কোচ ভারতের মাটিতে আর জন্মায়নি।

ভুটিদার এই এক দোষ। কোথায় ছিল জুতো, সেখান থেকে চলে গেল রহিম সাহেব।

শ্যামল জানতে চাইল, 'রহিম সাহেব জুতো কোম্পানির লোক?'

রেগে গেল ভুটিদা,—'তা কেন হতে যাবেন? ওইরকম নমস্য ব্যক্তি, খবরদার কোনো খারাপ কথা বলবি না। রহিম সাহেব বলে দিলেন—চুনীর ডান পায়ের জুতোখানা যেন নিখুঁত হয়, বলরামের বাঁ-পায়ের জুতো, আর পিকের দুটো পায়েরই।...কিছু বোঝা গেল?'

চারজনে ঘাড় নাড়লাম,—'না।'

—আরে, এ তো সোজা ব্যাপার। চুনী ডান পায়ের প্লেয়ার, বলরামের চলত বাঁ-পা, একমাত্র পিকেই দু-পা সমান ব্যবহার করতে পারত।

—তার মানে আমাদের দুটো পাকেই তৈরি করতে বলছ?

—শুধু দু-খানা পা-ই নয়, মাথাও। তবেই কোনো ফুটবলারকে কমপ্লিট প্লেয়ার বলা হয়।

—রোনাল্ডো?

—না, পেলে।

—পেলের খেলা দেখেছ তুমি?

—সামনাসামনি দেখিনি। তখন তো টিভি ছিল না। অমল দত্ত পর্দা টাঙিয়ে খেলা দেখাতেন। সেখানেই পেলেকে দেখেছি।

—কেমন খেলত পেলে?

—অবিশ্বাস্য।

—কেন বলছ?

—ছেষট্টির বিশ্বকাপ ইংল্যান্ড জিতেছিল। জিততে পেরেছিল পেলেকে মেরে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে। সত্তরের বিশ্বকাপ মেক্সিকোতে। পেলেকে আর রোখা গেল না। তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জিতে জুলে-রিমে কাপ বরাবরের জন্য নিজেদের জিম্মায় নিয়ে গেল ব্রাজিল।

ব্যাং ডাকতে শুরু করল। মাঠের পাশে জল জমেছে। সেইখানে এতক্ষণ ঘাপটি মেরে বসেছিল ব্যাঙের বংশ। এখনো উঠছি না দেখে এটাই তাদের সমবেত প্রতিবাদ।

অন্ধকার হয়ে গেছে। উঠতেই হল।

(৫)

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সবাই বসে। সকলেরই মুখ শুকনো।

অবশ্য সবাই নয়, স্বপন বাদ। আর সবার যে মুখ শুকনো, তার কারণটা ওই স্বপন। স্বপনের শরীর খারাপ।

এমনিতেই আমাদের সময়টা খারাপ যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের কোনো মাঠ নেই। সব জায়গা থেকেই আমরা বিতাড়িত। অনাথ শিশুদের মতো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোনো কাজ নেই। অথচ তারই মধ্যে 'মিলন স্মৃতি টুর্নামেন্ট'-এর ফাইনাল। মিলন বাগ, যাকে আমরা চোখে দেখিনি, ফুটবল-পাগল সেই বালকের স্মৃতিতে টুর্নামেন্ট। সেই টুর্নামেন্টের ফাইনাল কাল এবং আমাদের মুখোমুখি কল্পতরু ক্লাব।

সেভেন-সাইড ম্যাচ। অর্থাৎ প্রতি দলে সাতজন করে প্লেয়ার। গোলে স্বপন, ডিফেন্সে কানু, হাফ-এ শ্যামল আর ফরোয়ার্ডে আমি—এই চারজন মোটামুটি ফিক্সড। বাকি কে কে কোথায় খেলবে সেটা ফর্ম-এর ওপর নির্ভর করবে।

কল্পতরু ক্লাবটার দম আছে। তেঁতুলতলা বাজারে ওদের ক্লাবঘর। বাজারের মাথারা পয়সা ঢালে, এদিক-ওদিক থেকে হায়ার করে খেলোয়াড় আনে কল্পতরু। ওদের হারাতে গেলে পুরো শক্তি নিয়ে নামা দরকার।

—স্বপনটা এইভাবে ডোবাল?

কানুর গল্পটা হাহাকারের মতো শোনাল।

—শরীর খারাপ মানে কি সর্দি-কাশি-জ্বর?

শ্যামল জানতে চাইল।

—পেট খারাপ। শোনা যাচ্ছে এখন-তখন অবস্থা।

কানু গলা চড়াল,—হবে না? ওপরের তিন ইঞ্চি বাদ দিলে স্বপনের পুরোটাই তো পেট। সরস্বতী পুজোয় কী হয়েছিল মনে নেই?

—কী হয়েছিল? শ্যামল জিজ্ঞেস করল।

কানু আমাকে ঠেলল,—বল না কী হয়েছিল?

সবার চোখ আমার ওপর।

গলা নামিয়ে বললাম, 'পুজোর পরের দিন পঙ্‌ক্তিভোজ হচ্ছে। আমি সার্ভ করছি, খিচুড়ি। শালপাতায় এক হাতা করে খিচুড়ি ঢেলে দিচ্ছি। তা স্বপনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হাসল। বলল, তোকে আর কষ্ট করে হাতায় তুলে ঢালতে হবে না। বালতিটাই নামিয়ে দিয়ে যা।

—খেল? এক বালতি খিচুড়ি?

—এক বালতি নয়। আধ বালতির ওপর ততক্ষণে খরচ হয়ে গেছে। তাও যতটা ছিল তিনজনে খেয়ে শেষ করতে পারবে না। সেটাই বালতি কাত করে ঢেলে ঢেলে পুরোটা সাবড়ে দিল স্বপন।

কানু গলা তুলল, 'পছন্দের জিনিস দেখলে ও আর সামলাতে পারে না।'

—এবারে কী খেয়েছিল?

—কাঁঠাল। বাজি রেখে শ-দুয়েক কোয়া কাঁঠাল খেয়েছিল। রাত থেকে দাস্ত। ভোরের দিকে তো নাড়ি ছেড়ে দেবার জোগাড়। হাসপাতালে নিয়ে যাবার কথা হয়েছিল। ও-ই জোর করে বাড়িতে থেকে গেছে। তবে ওআরএস গুলে গুলে খাওয়ানো হচ্ছে শুনেছি।

শ্যামল উঠল,—চল্ দেখে আসি।

গিয়ে দেখা গেল পরিস্থিতি সত্যিই গুরুতর। চোখ কোটরে ঢুকে গিয়েছে, পেট-পিঠ এক হবার মতো পরিস্থিতি। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। ওই অবস্থাতেও উঠে বসার চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি চেপেচুপে শুইয়ে দেওয়া হল। একটাই আশার কথা সকাল থেকে আর হয়নি।

—তোদের ডুবিয়ে দিলাম রে।

বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল স্বপনের।

কানু বলল,—ছাড় ওসব কথা। আগে তুই সুস্থ হয়ে ওঠ। তবে আমার যেটুকু ধারণা, তোর হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই উচিত ছিল।

স্বপন কানুর কথাগুলো না-শোনার ভান করল। তারপর শ্যামলের হাত চেপে ধরল।

—একটা সাজেশন দেব?

—কী সাজেশন?

—আমার জায়গায় শান্তনুকে নিয়ে যা। ও ঠিক সামলে দেবে।

—শান্তনু?

—শান্তনু পাল। ও-ও গোলকিপার। এই টুর্নামেন্টে কোনো

ক্লাবের হয়েই খেলেনি। আমার নাম করে বল। ও ঠিক রাজি হয়ে যাবে।

—হায়ার করব? এটা তো ক্লাবের নীতির বাইরে।

শ্যামলের গলার স্বর গম্ভীর শোনাল।

কানু বলল, 'রাখ তোর নীতি। ক্লাব হেরে যাচ্ছে। নাহলে ওয়াকওভার দিতে হচ্ছে। এই সময় নীতি নিয়ে বসে থাকলে হবে?'

শ্যামল ক্যাপ্টেন। সিদ্ধান্ত ওকেই নিতে হবে। সবাই মিলে জোরজার করে শ্যামলকে রাজি করানো হল। স্বপন শুধু বেরোবার সময় বলল, 'শান্তনু কিন্তু টাকা ছাড়া এক পাও নড়ে না। টাকা চাইলে বলিস আমি একটু সুস্থ হলে ওর বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসব। আমাকে ও চেনে। জানে কথার নড়চড় হবে না।'

শান্তনুদের আটাকলের ব্যবসা। শান্তনুরা থাকে দোতলায়। ডাকতে নীচে নেমে এল। আটাকলের আওয়াজে কথা শোনা যাচ্ছিল না। একপাশে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল।

শান্তনু কিন্তু এক কথায় রাজি হল। শুধু টাকাপয়সার ব্যাপারটা প্রথমেই পরিষ্কার করে নিতে চাইল।

কানু বলল, 'স্বপন বলে দিয়েছে চিন্তা না করতে। পরে ও সব মিটিয়ে দেবে।'

ভুরু কোঁচকাল শান্তনু,—পরে মানে?

—স্বপন অসুস্থ। সুস্থ থাকলে ও-ই গোলে খেলত। কথা দিচ্ছি, টাকাপয়সার ব্যাপারে কোনো সমস্যা হবে না।

—খেলাটা কাদের সঙ্গে?

—কল্পতরু।

—তেঁতুলতলা বাজার?

—হ্যাঁ।

কথা ফাইনাল করে আমরা বেরিয়ে এলাম। শান্তনু বলল, মিলন সঙ্ঘের মাঠ ও চেনে। নিজেই চলে যেতে পারবে।

গিয়ে দেখা গেল মাঠটা আজ জমকালো করে সাজানো হয়েছে। দু-দিকে বাগান, গাছপালায় ছয়লাপ। মাঠটা সাইজে বড়ো নয়, কিন্তু ঘাসের বিছানায় মোড়া। মাঠের যে পাশে রাস্তা সেখানেই কাপ-মেডেল টেবিলের ওপর সাজানো। চ্যাম্পিয়ন, রানার-আপের ট্রফির পাশাপাশি বেস্ট প্লেয়ারের রুপোর মেডেল। মাইকের আওয়াজে মাঠ গমগম করছে। ধারাবিবরণী দিচ্ছে একজন। দর্শকরা সাইডলাইনের ধারে ভিড় করে আছে।

যে দুটো দল ফাইনালে খেলছে তারা কেউই স্থানীয় নয়। স্বভাবতই দর্শকরা নিরপেক্ষ হবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখা গেল, যেহেতু আমরা সেমি-ফাইনালে মিলন সঙ্ঘকে হারিয়েছি, মিলন সঙ্ঘের সাপোর্টাররা সবাই কল্পতরুকে সাপোর্ট করা শুরু করে দিল। তার মানে কল্পতরু তো বটেই, আজ মাঠ-বোঝাই মিলন সঙ্ঘের সাপোর্টারদের বিরুদ্ধেও আমাদের খেলতে হবে।

টস করতে গেল শ্যামল। ততক্ষণে কল্পতরুর প্লেয়ারগুলোকে দেখছিলাম। ওদের ক্যাপ্টেন নাদুকে চিনি, ডিফেন্সে খেলে। বাকিরা সবাই অচেনা। বেশির ভাগই কলকাতার বি-ডিভিশনের প্লেয়ার। ওখানে খেলা না থাকলে এরকম ছোটোখাটো খেপ মারতে আসে। কল্পতরু জেতা-হারায় ওদের কিছু যায়-আসে না। আমাদের তা নয়। ক্লাব আমাদের প্রাণ, বুকের পাঁজরা। হেরে গেলে তিনদিন চোখের পাতা এক করতে পারব না।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের খেলা। কুড়ি-কুড়ি-পাঁচ। প্রথম দিকে দু-পক্ষই ডিফেনসিভ খেলে। অন্যপক্ষকে মাপতে থাকে। প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গাগুলো বুঝে গেলে তখন জেতার জন্য ঝাঁপায়।

খেলা শুরু হতেই ধারাবিবরণী শুরু হয়ে গেল। ধারাবিবরণী দিচ্ছে দুজন। একজন হয়েছে অজয়, অন্যজন তার কমলদা। দুই বিখ্যাত ধারাভাষ্যকারকে নকল করে দুজন খেলার বর্ণনা দিয়ে চলেছে।

তবে দর্শকদের চিৎকারে মাঝে মাঝেই তাদের গলা ডুবে যাচ্ছে। বিশেষ করে কল্পতরুর ফরোয়ার্ডরা যখন আমাদের ডিফেন্সে উঠে আসছে। তবে বাঘের মতো খেলছে কানু। কেউই ওকে পেরিয়ে যেতে পারছে না। কানুর পায়ে বল জমা করে ফিরে যাচ্ছে। আর তখনই একটা হতাশার শব্দ সমবেত দর্শকমণ্ডলীর গলায় বেজে উঠছে।

মিনিট পনেরো খেলা গড়িয়েছে, আমরা একটা কর্নার পেলাম। বল বসাচ্ছি, তাকিয়ে দেখলাম কানু উঠে এসেছে হেড দেবে বলে। ওদের দুজন ডিফেন্ডারই লম্বা। শ্যামল মাথায় ওদের টপকাতে পারবে না। গোলকিপার সেকেন্ড পোস্টে জায়গা নিয়েছে।

বলটা অনেকখানি সুইং করেছিল। ওদের গোলকিপার ভাবতেও পারেনি আমি সরাসরি গোলে মারব। নীচু শট, সুইং করে সোজা ফার্স্ট পোস্ট দিয়ে গোলে ঢুকে গেল। গোলকিপার জাল থেকে বল কুড়োতে কুড়োতে আমার মুখের দিকে তাকাল। সরাসরি কর্নার কিক থেকে গোল, ওর অভিজ্ঞতায় বোধহয় এই প্রথম।

'গোল!' ধারাভাষ্যকারের গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনাল। মাঠে পিন পড়লেও বোধহয় শব্দ পাওয়া যাবে। বল বসানো হল সেন্টার পয়েন্টে।

সেন্টার হল। ওদের হাফ বল পেয়েই সোজা মারল আমাদের গোল লক্ষ্য করে। নির্বিষ শট। কানু রিসিভ না করে ছেড়ে দিল গোলকিপারকে। ওদের দুজন ফরোয়ার্ড বল চেজ করে আসছিল। কানু বল ধরলে ওদের দুজন একসঙ্গে কানুকে চার্জ করত। এসব ক্ষেত্রে গোলকিপারকে ছেড়ে দেওয়াই নিয়ম।

বলটা গড়াতে গড়াতে গেল গোলকিপারের দিকে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম শান্তনু বলটা না ধরে ছুটে এসে শট নিতে গেল। আর শট নিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। বলটাও আরামসে গোললাইন পার হয়ে জালে জড়িয়ে গেল।

'গোল!'

আমরা হতভম্ব। মাঠে উন্মাদনা। ধারাভাষ্যকাররা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে চলেছে, 'এইমাত্র কল্পতরু গোল শোধ করল। খেলার ফল এখন এক-এক। যে কেউ জিততে পারে। এখন দেখার, পরবর্তী গোল কে করে!'

কল্পতরুর সমর্থকরা, অর্থাৎ মিলন সঙ্ঘের সাপোর্টাররা পাগলের

ঝাঁপিয়ে পড়ে বল আটকাল স্বপন।

মতো নাচানাচি করছে। তাদের গলার আওয়াজে ধারাভাষ্যও চাপা পড়ে যাচ্ছে।

কানু একবার কাছে এল। গলা নামিয়ে বলল, 'খেলা চালিয়ে গিয়ে লাভ নেই রে! আমাদের গোলকিপার কল্পতরুর হয়ে খেলছে। গোলকিপারই যদি...!'

কানুকে বললাম, 'আর পেছনে বল ছাড়িস না।'

—চেষ্টা করব। তবে কতটা পারব জানি না।

কানু নেমে গেল।

আর তখনই লম্বা বাঁশি বেজে উঠল।

হাফ-টাইম।

(৬)

যেদিকে পুরস্কার সাজানো, যেখান থেকে ধারাভাষ্য দেওয়া হচ্ছে, সেখানেই কল্পতরুর প্লেয়াররা বসেছে। পাশ থেকে কেউ হাওয়া করছে, কেউ পা ম্যাসাজ করে দিচ্ছে। হাতে হাতে ঘুরছে লেমনেড-এর বোতল। গলায় ঢেলে আরামের শব্দ করছে কল্পতরুর প্লেয়াররা। সমর্থকদের কেউ কেউ খেলোয়াড়দের ছবি তুলছে।

আমরা বসেছি উল্টোদিকে। সাইডলাইনের ধারে, গাছের ছায়ায়। জার্সি খুলে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি। ভুটিদা জেরিকেন বোঝাই নুন-চিনি-লেবুর শরবত নিয়ে এসেছে। সেটাই গ্লাসে ঢেলে ঢেলে খাচ্ছি। কেউই কারোর দিকে তাকাচ্ছি না। খেলার রেজাল্ট কী হবে জানা হয়ে গেছে। ভুটিদা যে ভুটিদা—তারও দেখা গেল মুখে কুলুপ।

শান্তনু একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলার চেষ্টা করেছিল, 'কী করে যে বলটা গলে গেল...!'

কানু গম্ভীর গলায় জবাব দিয়েছিল, 'কী আর করা যাবে! মার্বেলের মতো ছোটো জিনিস তো! গলে যেতেই পারে!'

আমাদের মুখ দেখে যে কেউ বুঝতে পারত, সেকেন্ড হাফ খেলা যে অর্থহীন তা বুঝতে আমাদের বাকি নেই। নেহাত খেলা ছেড়ে উঠে আসা খারাপ দেখায় তাই বাকিটুকুও খেলে দিতে হবে।

হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম।

স্বপন!

—তুই?

—এলাম তোরা কেমন খেলছিস দেখতে।

—তাই বলে এই শরীর নিয়ে?

—শরীর? শরীর তো একদম ফিট। চাইলে একশো মিটার স্প্রিন্ট টেনে দেখিয়ে দিতে পারি।

স্বপনকে বিশ্বাস নেই। সত্যিই ও একশো মিটার স্প্রিন্ট টেনে দিতে পারে।

কানু জিজ্ঞেস করল, 'কখন এসেছিস?'

—এসেছি, তা অনেকক্ষণ হল।

—গোলদুটো?

—দেখেছি।

কানু মুখ ঘুরিয়ে নিল। গোলকিপার স্বপনেরই রিক্রুট। তবে উপায় ছিল না। গোলে তো কারোকে নামাতে হবে।

রেফারির হুইস্‌ল্। হাফটাইম শেষ। আবার খেলা শুরু হবে। অবাক হয়ে দেখলাম স্বপন শার্ট খুলছে।

—কী করছিস?

—দেখতে পাচ্ছিস না কী করছি?

—জার্সি পরে তুই কী করবি?

—জার্সি পরে লোকে কী করে?

—তুই কি পাগল হয়েছিস? এই শরীর নিয়ে কেউ মাঠে নামে?

—না তো কী? বসে বসে দেখব আমাদের টিম গপাগপ গোল খাচ্ছে?

অনেক বোঝানো হল। কোনো কিছুতেই লাভ হল না। স্বপনের মাথায় একবার ভূত চাপলে তা নামানো অসম্ভব। শ্যামল রেফারিকে গিয়ে বলল, 'একটা সাবস্টিটিউশন হয়েছে।' রেফারি জিজ্ঞেস করলেন, কে? শ্যামল জবাব দিল,—গোলকিপার। রেফারি কাগজে টুকে নিলেন।

হুইস্‌ল বাজল।

খেলা শুরু হল।

শ্যামল-কানু ফাটিয়ে দিচ্ছে। কল্পতরু হালে পানি পাচ্ছে না। একটার পর একটা আক্রমণ ওদের ডিফেন্সে গিয়ে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে। যে-কোনো মুহূর্তে গোল খেয়ে যাবে। দর্শকরাও বুঝতে পারছে, যে উৎসাহ, যে উন্মাদনা একটু আগেও তাদের মধ্যে ছিল, সব যেন কেউ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিয়েছে। ধারাভাষ্যকারদের গলার স্বরও মিয়ানো পাঁউরুটির মতো ন্যাতানো, স্বপন গোলে দাঁড়িয়ে আছে সিংহের মতো। ওর কাছে বল যেতে দিচ্ছে না কানু। কিন্তু গেলেও যে সেটা গোললাইন পার হবে না, ওর শরীরের ভাষাই তা বলে দিচ্ছে।

সেকেন্ড হাফ-এর খেলা মিনিট আটেক গড়িয়েছে, ওদের ডিফেন্ডারদের একটা মিসকিক আমার পায়ে পড়ল। সামনে তাকালাম, ওদের ডিফেনডার দুজন এক লাইনে দাঁড়ানো, পেছনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। আড়চোখে দেখলাম সাপের মতো নিঃশব্দে শ্যামল এগোচ্ছে ফাঁকা জায়গাটার দিকে।

বলটা পাঁচ সেকেন্ড হোল্ড করে রাখলাম। তারপরেই দুজন ডিফেন্ডারদের মাঝখান দিয়ে উড়িয়ে দিলাম ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে। শ্যামল বাঁ-পায়ের থাইতে বলটা রিসিভ করল। তারপর মাটিতে না নামিয়েই ছোট্ট টোকায় গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিল জালে। একটা অসাধারণ শিল্পকর্ম!

গোল!

মাঠে যেন বজ্রপাত হল।

কোনো আওয়াজ নেই।

ধারাভাষ্য বন্ধ।

কল্পতরুর সাপোর্টাররা নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছে বল সেন্টার-মাঠে বসানো হচ্ছে। স্বপন পর্যন্ত গোল থেকে ছুটে এসে শ্যামলকে 'সাবাশ' জানিয়ে গেল।

ভুটিদা সাইডলাইনের ধারে দাঁড়িয়ে আঙুল দেখিয়ে ইশারা করছে খেলা শেষ হতে ক-মিনিট বাকি। পাঁচ মিনিট, চার মিনিট, দু-মিনিট, বুকের ভেতরের ধক-ধক শব্দটা কানে আসছে। আর দুটো মিনিট পার করতে পারলেই আমরা চ্যাম্পিয়ন।

হঠাৎ লম্বা হুইস্‌ল্।

কী হল? খেলা কি শেষ হয়ে গেল? ভুটিদা কি সময় হিসাব করতে ভুল করেছিল? আমরা তাহলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলাম?

চোখ কচলে দেখি রেফারি পেনাল্টি স্পটের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। পেনাল্টি পেয়েছে কল্পতরু।

পেনাল্টি? কীভাবে?

ওদের একজন ফরোয়ার্ড আমাদের বক্স-এর মধ্যে পায়ে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি আমাদের কোনো ডিফেন্ডারই ছিল না। এমনকী বলও ছিল না এই ফরোয়ার্ড-এর পায়ে। তা সত্ত্বেও পেনাল্টি।

কানু কাছে এল। গজগজ করতে করতে বলে গেল, 'আর কোনো চান্স নেই। রেফারিও যদি অপোনেন্ট-এর হয়ে খেলতে শুরু করে...!'

বল বসানো হল পেনাল্টি স্পটে।

গোললাইনে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে স্বপন।

ওদের স্ট্রাইকার এল শট নিতে।

সমস্ত মাঠ গর্জন করছে। বাজি ফাটছে। হাততালি বাজছে তালে তালে। ধারাভাষ্য আবার শুরু হয়েছে। গোল যেন হয়েই গেছে।

রেফারির হুইস্‌ল্। পেনাল্টি কিক। স্বপন বাঁদিকে ঝুঁকে ছিল। তাই দেখে ডান দিকে শট নিল স্ট্রাইকার। ঝাঁপিয়ে পড়ে বল আটকাল স্বপন। তারপর বলখানা বুকে জড়িয়ে খানিকক্ষণ মাটিতে পড়ে থেকে নকশা করল। ইচ্ছে করে সময় নষ্ট করছে বলে রেফারি ছুটে এসে হলুদ-কার্ড দেখালেন স্বপনকে। স্বপন হেলতে দুলতে উঠে বলে শট নিল। লম্বা শট। ওদের গোলকিপারের হাত এড়িয়ে বল চলে গেল গোললাইনের বাইরে। গোলকিপার তড়িঘড়ি বল বসিয়ে শট নিতে না নিতেই লম্বা হুইস্‌ল্। খেলা শেষ। আমরা চ্যাম্পিয়ন।

একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস দর্শকদের কাছ থেকে এসে বাগান পার হয়ে উড়ে গেল। বেশির ভাগ দর্শকই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান পর্যন্ত থাকল না। ভুটিদা গোললাইনের পাশে দাড়িয়ে ভাংরা নাচ শুরু করে দিল। কল্পতরুর প্লেয়াররাও রানার-আপ ট্রফি নেবার জন্য থাকল না। ক্লাবের একজনকে রেখে ওরা চলে গেল মাঠ ফাঁকা করে।

নমোনমো করে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হল। ট্রফি নেবার জন্য শ্যামল যখন উঠল, খই ফোটার মতো একটা-দুটো হাততালির আওয়াজ শোনা গেল। ম্যান অব দ্য ম্যাচ হিসেবেও যখন আবার শ্যামলের নামই ঘোষণা হল, ও উঠে গিয়ে উদ্যোক্তাদের জানাল কতখানি অসুস্থতা নিয়েও স্বপন আজ খেলতে নেমেছে। শেষ অবধি ম্যান অব দ্য ম্যাচের মেডেলটা স্বপনই পেল। ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হল শ্যামল।

হইহই করে বাড়ি ফিরছি, স্বপনের কাছে গিয়ে কানে কানে বললাম, 'ওদের ফরোয়ার্ড অত বাজে শট নিল কেন রে?'

দাঁত দেখিয়ে হাসল স্বপন,—'আর বলিস না, আমার মাথাটা তো অনেকক্ষণ থেকেই ঘুরছিল। শটটা যখন নিতে এল আমি তখন টাল খেয়ে বাঁদিকে পড়ে যাচ্ছি। তাই দেখে ও বলটা আমার ডান দিকে রাখল। ততক্ষণে আমি সামলে নিয়ে ডান দিকে ঝুঁকেছি। সোজা আমার হাতে এসে গেল বল। ভাবলাম এই সুযোগ। এবার মাটিতে শুয়ে খানিকটা রেস্ট নিয়ে নিই। তাই বল বগলে করে মাটিতে শুয়ে পড়লাম লম্বা হয়ে। সবাই ভাবল নকশা করছি।'

—আর হলুদ-কার্ড খেয়ে গেলি, কানু বলল।

—খেলা শেষ হয়ে গেলে হলুদ-কার্ড লাল-কার্ড সব সমান। আজ আমাদের হিরো একজনই,—স্বপন।

বলতে বলতে স্বপনকে কাঁধে তুলে নিল ভুটিদা। ❖

পুপাই
রঞ্জন দত্ত

পাড়ার নতুন পিজ্জা হাবের জিনিসগুলো টেস্ট করে দেখা হয়নি...

এই সুযোগে একটু টেস্ট করে দেখা যাক।
PIZZA

আহা! গন্ধে তো বেশ তোফা হবে বলেই মনে হচ্ছে।

নতুন শুকতারাটা পড়তে পড়তে খাওয়াটা বেড়ে জমবে...

কিন্তু...
হাত বদল...
এই!
PIZZA

দাও বলছি টুবুদা!
যা যা, গন্ধেই আদ্ধেক খেয়ে ফেলেছিস, বাকিটা আর খাস না ওই লিকপিকে চেহারায়।

অসহ্য!! গায়ের জোরে টুবুদার সাথে পেরে ওঠা মুশকিল তাই আগে দরকার শক্তি বৃদ্ধি।

একটু পরেই...
GYM
আর এই হল শক্তিবৃদ্ধির ঠিকানা।

ওফ
আফ
ইইইই

ওরে, কেউ তো একটু হেল্প কর আমাকে।
এইযে...

ব্যায়াম ছাড়া তুই চটপট শক্তিশালী হতে পারবি না আর পিজ্জাও হজম করতে পারবি না। তাই...
কিন্তু টুবুদা...

...তুই বরং এই নতুন ধরনের বারবেলটা দিয়ে শুরু কর।

বারবেল ধরতেই...
এই এই আমি আকাশে উড়ে যাচ্ছি যে...
হাঃ হাঃ

পাজিটা ভারি বলের বদলে গ্যাস বেলুন বেঁধে দিয়েছে।

উড়ে উড়ে কোথায় যাচ্ছি কে জানে...
টুবুদার বাড়ির ছাদের ওপর এসে পড়লাম দেখছি।

পকেটের এই পেনটা দিয়ে একটা খোঁচা দিলেই ছাদে নেমে পড়া যাবে।
ফটাস!

বাবাগো বাঁচাও, গুলি ছুঁড়ো না আর!!
?

চোর !!
বেশি কিছু নিতাম না বাপু, হালকা কিছু হাতানোর তাল করছিলাম।

হ্যান্ডস আপ!
হ্যান্ডস তো আপ করেই রেখেছি বাপ... কিন্তু এটা বন্দুকের নলের বদলে লাঠির খোঁচাই মালুম হচ্ছে!
!
তবেরে...
ফটাস!
বাবাগো
এবং...

একি? পুপাই... এটা কে? এসব কী?
চোর এবং সামান্য লাঠির আঘাত।
চোর!!
সামান্য!

সাবাস পুপাই। তোর জন্যই ছাদের ঘরের সব দামী জিনিস বেঁচে গেল।

এই নে, এটাই তোর বাহাদুরির পুরস্কার।
ওয়াও!
PIZZA

গররর...
হিঃ হিঃ, অবশেষে।

ভ্যাবলাই হিরো

তমাল ভট্টাচার্য

ওরে বাবা, সামনে ষাঁড় পিছনে পুলিশ। এখন কী করি? বাঁচার একটাই উপায়, একবার ট্রাই করে দেখি।
ভ্যাবলা পিছন দিকে লাফ মারে
ইয়া-ও-ও-ও
পরমুহূর্তেই ষাঁড়ের পিঠে বসে পড়ে
ঝপাস...
বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে ষাঁড় উঠে দাঁড়ায়
আরিব্বাস, শিবজি কা বাহনকা পিঠমে অসুরজি? নমস্তে অসুরজি, হাম দোনোকো আশীর্বাদ দিজিয়ে।
ভ্যাবলা সাহস ফিরে পায়
কল্যাণমস্তু ভব, আয়ুষ্মান ভব অউর প্রমোশন ভব। আভি তুম দোনো বডিগার্ড হোকর মেরে সাথ চলো।
মাননীয় পল্লিবাসীগণ, আমাদের প্রায়োন্মাদ সংঘের অভিনব দুর্গা প্রতিমা দর্শন করে জীবন সার্থক করুন।
ওই হেব্বি অসুরটা আসলে কে রে, ক্যাবলা?
কে আবার, আমাদের গ্রেট হিরো ভ্যাবলা।

সম্পূর্ণ উপন্যাস
রাইমণি
আবার বেনারসে
শিশির বিশ্বাস

১
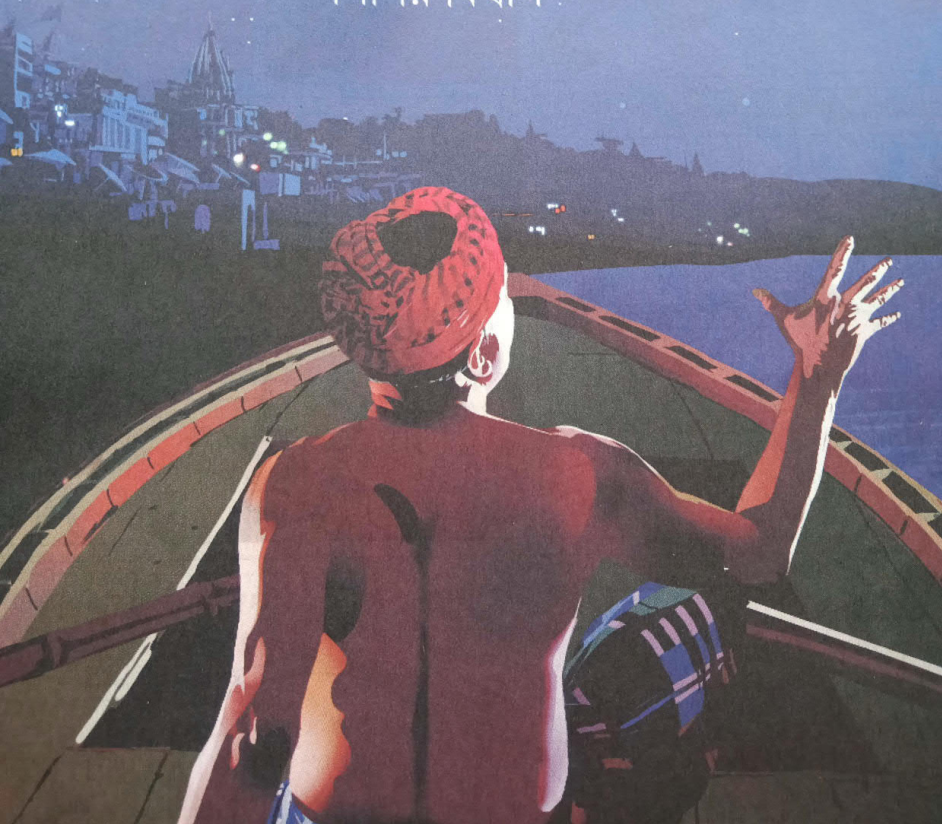
রাত বেশি নয়। দুন এক্সপ্রেস তখন বর্ধমান পার হয়েছে। রাতের খাওয়া শেষ করে যাত্রীরা বার্থ রেডি করে শুয়ে পড়তে শুরু করেছেন। রমাকান্তবাবুও তাঁদের বার্থ রেডি করে নীচের বার্থে স্ত্রী প্রতিমাদেবীর শোবার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন টয়লেটের দিকে।

দরজার কাছেই বার্থ। পা বাড়ালেই টয়লেট। হঠাৎ চোখ পড়ল দরজার পাশে গুটিসুটি হয়ে বসে এক দেহাতি মহিলা। এদেশের রিজার্ভ কামরাতে হরদম উটকো যাত্রী উঠে পড়ে। কখনো এরাই রাতে ঘুমন্ত যাত্রীর মালপত্র নিয়ে সরে পড়ে। ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রী টেরও পান না। দুর্ভাগ্য, তাঁদের বার্থ দরজার কাছে। অল্প আগে টিটি এদিকে একবার এসেছিলেন। ব্যাপারটা জানাবার জন্য রমাকান্তবাবু তাঁর খোঁজে আশপাশে তাকাচ্ছেন, হঠাৎই খেয়াল করলেন অদূরে দরজার পাশে সেই মহিলা খরখরে চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দুই চোখে আগুন ছুটছে যেন। গালের দুই পাশে দুটো কষদাঁতের ডগা বের হয়ে পড়েছে। মহিলার সেই ভয়ানক মুখের

দিকে তাকিয়ে রমাকান্তবাবু আতঙ্কে প্রায় হিম হবার জোগাড়। চোখ সরিয়ে নেবেন, সেই ক্ষমতাটুকুও অবশিষ্ট নেই। কোনো মহিলার চোখের দৃষ্টি এমন ভয়ানক হয়!

কতক্ষণ ওইভাবে তাকিয়ে ছিলেন, হুঁশ নেই। তবে বুঝতে পারছিলেন, মহিলার খরখরে চোখের দৃষ্টি ক্রমেই যেন আরো হিংস্র হয়ে উঠছে। গালের দুই পাশে তীক্ষ্ণ দাঁত ক্রমেই লম্বা হচ্ছে আরো। মহিলা যে মানুষ নয়, কোনো প্রেত, বুঝতে বাকি রইল না তাঁর। কাগজে, টিভিতে রাইমণির কথা শুনেছেন। রাইমণি নাকি মানুষরূপী ভ্যাম্পায়ার। দরকারে রূপও বদল করতে পারে। সুযোগ পেলেই গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে খায়। উদরপূর্তির জন্য মানুষের রক্তই তার বেশি পছন্দ। মহিলা সেই রাইমণি নয়তো!

দারুণ আতঙ্কে রমাকান্তবাবুর মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। অথচ ছুটে স্থান ত্যাগ করবেন, শরীরে সেই শক্তিও অবশিষ্ট নেই। হঠাৎ গুরুমন্ত্র মনে পড়ল। ধর্মভীরু মানুষ। দীক্ষা নিয়েছেন। জপ করতে যাবেন, হঠাৎই ট্রেনটা ট্রাক চেঞ্জ শুরু করতে ভয়ানক দুলতে শুরু করল। অল্প আগে শরীরে সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। হঠাৎ সেই ঝাঁকুনিতে যেন সাড় ফিরে পেলেন। টাল সামলাতে হাত বাড়িয়ে পাশে হ্যান্ডল ধরতে যাবেন, অবাক হয়ে দেখলেন, অদূরে সেই মহিলার সারা শরীর ঢেউয়ের মতো দুলতে শুরু করেছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে খানখান হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল।

শরীরে সাড় ফিরে এসেছিল আগেই। মুহূর্তে যেন আগের শক্তি ফিরে এল। গা, ঝাড়া দিয়ে স্থান ত্যাগের জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, কাছেই নারী কণ্ঠে আর্ত চিৎকার, 'হেই, এ—এটা কী গো! বাঁচাও বাঁচাও—'

আচমকা সেই চিৎকারে রমাকান্তবাবুর ফের চমকে ওঠার পালা। আর্ত চিৎকার আর কারো নয়, স্ত্রী প্রতিমাদেবীর। একটু আগে নীচের বার্থে স্ত্রী শুয়ে পড়তেই পা বাড়িয়েছিলেন টয়লেটের দিকে। ওই ভয়ানক দৃশ্য দেখার পরে যদি বা সামান্য স্বাভাবিক হচ্ছিলেন, আচমকা দ্বিগুণ উদ্বেগ নিয়ে ছুটলেন বার্থের দিকে।

রমাকান্ত চক্রবর্তী দু-এক বছর অন্তর সস্ত্রীক বেড়াতে বের হন। কিন্তু রওনা হবার প্রথম দিনেই এমন ভয়ানক অবস্থায় কখনো পড়েননি। একসময় বাইরে বেড়াতে যাবার বাতিক ছিল। তারপর সংসারের চাপে ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেলেও দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর অনেকটাই পুরনো মেজাজে। তারপর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঝাড়া হাত-পা। সরকারি দপ্তরে ভালো পোস্টে চাকরি করতেন। যথেষ্টই পেনসন। নেশা বলতে এখন চুটিয়ে বই পড়া। এছাড়া এক-দুবছর অন্তর কোথাও ঘুরে আসা। মূলত তীর্থ ভ্রমণ। এবারেও স্ত্রী প্রতিমাদেবীর কাছে সেই প্রস্তাব করতে তিনি বেনারসের কথা তুলেছিলেন।

বেড়াতে যাবার ব্যাপারে বরাবর দু'জন মিলেই স্থান ঠিক করেন। সলাপরামর্শ হয় অনেক। সহজে স্থান ঠিক হতে চায় না। এবার কিন্তু স্ত্রীর পরামর্শ মনে ধরে গিয়েছিল। রমাকান্তবাবু বেনারসে গেছেন একবার। তবে বিয়ের আগে। সেই আশির দশকের গোড়ায়। সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। অফিসের কয়েকজন ব্যাচেলার বন্ধু মিলে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। সেই প্রথম বেনারস যাওয়া। তারপর নানা স্থানে গেলেও বেনারসের দিকে আর যাওয়া হয়নি। স্ত্রীর প্রস্তাব মনে ধরার পিছনে সেটাই বড়ো কারণ। অগত্যা শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুতি।

হাওড়া থেকে যে কয়টি ট্রেনে বেনারস যেতে সুবিধে তার মধ্যে দুন এক্সপ্রেসেই সুবিধে। সন্ধে রাতে ছেড়ে পরের দিন সকালেই বেনারস। নির্দিষ্ট দিনে স্ত্রীকে নিয়ে সেই দুন এক্সপ্রেসেই চেপে বসেছিলেন। তারপর ঘণ্টাদুয়েক পার হয়েছে সবে। তার মধ্যে হঠাৎ এই ব্যাপার।

দরজার পাশে প্রথম বার্থটাই ওদের। রমাকান্তবাবু যথাস্থানে হাজির হবার আগেই আশপাশের কয়েকজন জড়ো হয়ে গেছেন সেখানে। নীচের বার্থে আধশোয়া হয়ে প্রতিমাদেবী কাঁপছেন তখনো। উলটো দিকের সদ্য পরিচিত এক মহিলা তাকে দুই হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছেন, 'কী, কী হয়েছে দিদি? অমন করছেন কেন?'

প্রতিমাদেবীর কাঁপুনি তখনো থামেনি। তবে পাশে স্বামীকে দেখে কিছুটা যেন স্বাভাবিক হতে পারলেন। সামান্য থম হয়ে থেকে যা জানালেন, তা এক কথায় অদ্ভুত। বার্থে শুয়ে পড়তে সামান্য ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ গাড়ি বেজায় দুলে উঠতে চোখ মেলে দেখেন, মুখের উপর দুটো খরখরে চোখ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। এমন ভয়ানক দৃষ্টি মানুষের হতে পারে না, হিংস্র কোনো প্রাণী। তারপরেই যখন খেয়াল হল তিনি ট্রেনের কামরায় শুয়ে আছেন, তখন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বুঝলেন, একেবারেই স্বপ্ন নয়, জেগেই রয়েছেন। আর হিংস্র চোখ দুটো কোনো প্রাণী নয়, মাঝ বয়সী এক মহিলার।

দেখে কিছুটা হলেও সাহস ফিরে আসছিল। কিন্তু মুহূর্তে ফের আঁতকে উঠলেন আবার। মহিলার গালের দুই কষ দিয়ে দুটো তীক্ষ্ণ দাঁত বের হয়ে আসছে। লম্বা হচ্ছে ক্রমে। ওই সময় মহিলা একটা হাত তাঁর গলার উপর রাখতে প্রায় শিউরে উঠলেন। কী ভয়ানক ঠান্ডা সেই হাত! বরফের ছ্যাঁকা পড়ল যেন। এরপর আর স্থির থাকতে পারেননি। আতঙ্কে দুই চোখ বুজে পরিত্রাহি চিৎকার।

এমন অদ্ভুত ব্যাপার বিশ্বাস করা মুশকিল। রাইমণির ব্যাপারটা অনেকেরই জানা অবশ্য। কিন্তু তেমন কোনো মহিলাকে যখন দেখা গেল না, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। স্রেফ রাইমণি আতঙ্ক। উপস্থিত সবাই মন্তব্য করে ফিরে গেলেও একমাত্র রমাকান্তবাবুই তেমন পারলেন না। একটু আগে ঠিক এমনই এক মহিলাকে নিজের চোখেই দেখেছেন। ভয়ানক সেই দৃশ্য যত অদ্ভুতই হোক স্বপ্ন নয়। জেগেই ছিলেন তখন। আতঙ্কিত স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'এবার শুয়ে পড় তুমি। আমি জেগে থাকছি বরং।'

সারা রাত এরপর শুধু জেগে থাকা নয়, অন্য যাত্রীর অসুবিধা হচ্ছে জেনেও বার্থের আলো পর্যন্ত নেভাননি। তবে রাতে অন্য কিছু কিন্তু ঘটেনি তারপর।

পরের দিন ট্রেন যথাসময়ে গন্তব্যস্থল। বেনারসে ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে দশটার ঘর পার হয়েছে। মনোরম পরিবেশ। কলকাতা থেকে থাকার জায়গা ঠিক করা হয়নি। তবে বেনারস শহরে হোটেলের অভাব নেই। রয়েছে বাঙালি ভাতের হোটেলও। অসংখ্য

লজ, ধর্মশালা কিংবা সাময়িক বাসাবাড়ি। সেখানে ইচ্ছে মতো রান্না করেও খাওয়া যায়। নিজের বাড়ির সুবিধে। তবে বেড়াতে এসে রান্নাবান্নার ঝামেলায় যাবার ইচ্ছে ছিল না। স্টেশনের বাইরে অটোর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে কোথায় উঠবেন, সেই কথাই ভাবছেন, স্ত্রী প্রতিমাদেবী হঠাৎ বললেন, 'একটা কথা মনে পড়ল, বলব?'

'কী?'

'দিন কয়েক আগে অটোয় যেতে পাশের এক মহিলা অন্য একজনের কাছে বেনারসের বাঙালিটোলায় এক বাসাবাড়ির খুব প্রশংসা করছিলেন। থাকার জন্য খুব ভালো ব্যবস্থা আছে নাকি। গঙ্গার ঘাটের কাছেই। ভাড়াও কম। সেখানে একবার খোঁজ নেবে?'

স্ত্রী আগে বেনারসে যায়নি। এমনিতে হয়তো কান দিতেন না। কিন্তু বাঙালিটোলার কথায় নড়ে উঠলেন। বেনারসে সবচেয়ে পুরনো স্থান ওই বাঙালিটোলা। বলা যায় তিন হাজার বছরের পুরোনো এই শহরের প্রাণকেন্দ্র গঙ্গার চুরাশিটি ঘাটের পিছনে যে বিস্তৃত এলাকা তারই পোশাকি নাম বাঙালিটোলা। বিশ্বনাথের মন্দিরও এই বাঙালিটোলায়। শোনা যায় নাটোরের রানি ভবানী পূণ্যার্জনের জন্য ৩৬০ জন ব্রাহ্মণকে গঙ্গার ঘাট বরাবর বাড়ি দান করেছিলেন। দক্ষিণা বাবদ নগদ টাকা। গড়ে উঠেছিল বাঙালিটোলা। সময়ের ব্যবধানে অনেক পরিবর্তন, ক্রমে ঘিঞ্জি হয়ে এলেও তীর্থ যাত্রীদের জন্য এখনও সবচেয়ে পছন্দের স্থান। তিনি আগে যেবার বেনারস এসেছিলেন, ছিলেন বাঙালিটোলারই এক ধর্মশালায়। নামে ধর্মশালা হলেও আধুনিক মানের লজ। পছন্দ হয়েছিল সবার। মিনিট কয়েক হাঁটলেই দশাশ্বমেধ ঘাট। সব মিলিয়ে দারুণ। বললেন, 'ভালো করে শুনেছিলে তো? ঠিকানা মনে আছে?'

উত্তরে প্রতিমাদেবী মাথা নাড়লেন। এবার বেনারসে যাওয়া ঠিক হয়েছিল বলেই, কান পেতে শুনেছিলেন। মনে আছে ঠিকানা।

অগত্যা অটোওয়ালাকে সেই ঠিকানাই জানিয়েছিলেন। দেখাই যাক। যদি পছন্দ না হয় যাওয়া যাবে অন্য কোথাও।

ঘর দেখে পুরনো স্মৃতির সঙ্গে মেলাতে গিয়ে রমাকান্তবাবুর পছন্দই হল বাড়িটা। বাঙালিটোলার গলিগুলো আগের থেকে অনেকটাই যেন ব্যস্ত এখন। দোকানপাট বেড়েছে। পথে মানুষের সংখ্যাও বেশি। পুরোনো দিনের হলেও বাড়িটা মন্দ নয়। দু'তলার উপর তলায় বাড়িওয়ালা নিজে থাকেন। ডাকতেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। যথেষ্ট বয়স হলেও মজবুত শরীর। স্ত্রীর কাছে বাড়িওয়ালার নাম বৃন্দাবন দাস শুনে মানুষটিকে বাঙালি বলেই মনে হয়েছিল। বৃদ্ধের মুখে নির্ভেজাল বাংলা শুনে বুঝলেন অনুমান মিথ্যে নয়।

ভাড়ার জন্য পার্টি এসেছে শুনে বৃদ্ধ যতটা ব্যস্ত হয়ে নেমে এসেছিলেন, ওদের দেখে সামান্য নিরাশই হলেন যেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, 'মাত্র দুজন মানুষ আপনারা!'

বৃদ্ধের কথায় কিছু অবাক হয়ে রমাকান্তবাবু বললেন, 'তাতে কী, ঘর দেখে যদি পছন্দ হয়, আপনার ঘরের যা ভাড়া তাই নেবেন।'

বৃদ্ধ আর বলেননি কিছু। ঘর দেখে স্ত্রী প্রতিমাদেবীরও পছন্দ। পুরনো হলেও যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই শুধু নয়, আকারেও বেশ বড়ো। দেড়খানা খোলামেলা ঘর। বড়ো জানলা। লাগোয়া বাথরুম, রান্নার জায়গা। দিন সাতেক থাকবেন। স্ত্রীর আগ্রহ দেখে পুরো ভাড়াই অ্যাডভানস করে দিলেন।

বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ বৃন্দাবন দাসের অবশ্য ভাড়ার টাকায় দিন চলে এমন নয়। দুই ছেলের একজন এলাহাবাদ, অন্যজন দিল্লিতে চাকরি করে। বাবা,মাকে অনেকবার নিজেদের কাছে নিয়ে যেতেও চেয়েছে। কিন্তু পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে যেতে মন চায়নি। সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে রেনু আছে। চলে যায়। ভাড়াটে এলে রেনু তাদের কাজও সামাল দেয়।

ঘরে মালপত্র তুলে সামান্য বিশ্রাম সেরে দুজন বের হয়ে পড়েছিলেন এরপর। বেনারসে এসে প্রথম দিন গঙ্গায় স্নান সারবেন, সেই ইচ্ছে। ফেরার পথে কোনো হোটেলে খেয়ে নেবেন। ঘরে ফিরে দুপুরের ঘুম। গত রাতে ট্রেনে ওই ঝামেলায় একেবারেই ঘুম হয়নি। সেটা পুষিয়ে নেবেন।

বেনারস তথা বারাণসী বা কাশীর ইতিহাস আজকের নয়। বহু পুরনো। পুরাণে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথাই নেই। নেই মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোক অথবা আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের কথাও। হয়তো এসব পুরাণকারদের মনে তেমন দাগ কাটেনি। কিন্তু বেনারস তথা বারাণসীর কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। কাশীখণ্ডে বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় স্কন্দ

হিংস্র চোখ দুটো কোনো প্রাণী নয়, মাঝ বয়সী এক মহিলার।
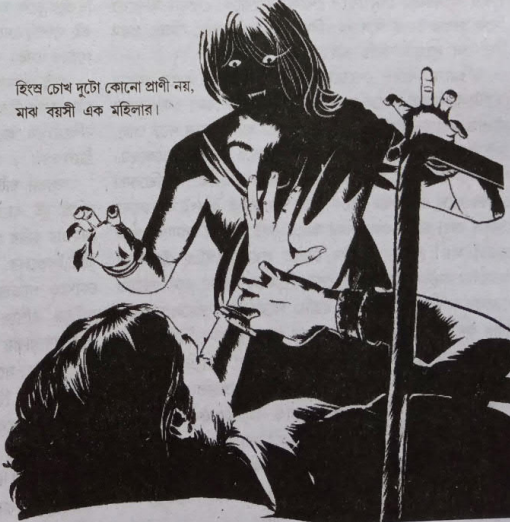
পুরাণে। শুধু বিশ্বনাথ মন্দির নয়, নগরে তখন ছিল আরো একাধিক সুবৃহৎ মন্দির। বেনারসের সেই মন্দিরগুলির উপর প্রথম দুর্যোগ নেমে আসে মুসলমান আক্রমণ শুরু হবার পর। সারা দেশে কত মন্দির যে তারপর ধ্বংস হয়েছে হিসেব নেই।

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের সামান্য ইতিহাস পাওয়া যায় তবু। দিল্লির দাস বংশের পতনের পর কাশীতে নতুন যে মন্দির নির্মিত হয়েছিল সেটিও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। কয়েকশো বছর পরে সেই ভগ্ন মন্দির পুনর্নির্মাণ হয় আকবরের রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের উদ্যগে। দুর্ভাগ্য, পরের একশো বছরের মধ্যেই সেই মন্দির ধ্বংস হয় ফের। শুধু ধ্বংসই নয়, ভগ্ন মন্দিরের মালমশলা দিয়ে নির্মাণ করা হয় মসজিদ।

বস্তুত বেনারসের বর্তমান বিশ্বনাথ মন্দির এই সেদিন, ১৭৮০ সালের। ভক্তদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে ইন্দোরের মহারানি অহল্যা বাই হোলকার মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। ১৮৩৫ সালে পাঞ্জাবের শিখ সম্রাট রঞ্জিত সিংহ তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে মন্দিরের চূড়াটি ১০০০ কিলোগ্রাম সোনা দিয়ে মুড়ে দেন। মহারানী অহল্যাবাইয়ের নির্মাণ করা সর্বশেষ এই মন্দিরটিই টিকে আছে আজও। প্রসঙ্গত বলা যায়, মহারানি অহল্যাবাই নির্মিত মন্দিরটি আকারে যথেষ্টই ছোটো। টোডরমল নির্মিত আগের মন্দিরটি আকারে ছিল অনেক বড়ো। শোনা যায়, রাতে সেই মন্দিরের গগনচুম্বী চূড়ায় যে আলো দেওয়া হত, দেখা যেত সুদূর দিল্লি থেকেও।

সে যাই হোক, সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে যথেষ্টই ভিড় তখন। তারই মধ্যে সোপানে বসে দুজন স্নান সেরে নিলেন। রাতের সেই ঘটনার পর প্রতিমাদেবী স্বভাবতই বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন। স্নান সেরে অনেকটাই যেন ফিরে পেলেন নিজেকে। গোড়ায় মন্দিরের দিকে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু হঠাৎই বললেন, 'আজ, প্রথম দিন, চল পুজোটা দিয়ে যাই।'

ইতিমধ্যে খিদেও পেয়েছে। ভেবেছিলেন, স্নান সেরে কোনো হোটেলে খাওয়া সেরে ঘরে ফিরে গড়িয়ে নেবেন। রমাকান্তবাবু আপত্তি করতেন হয়তো। কিন্তু স্ত্রীর কথায় হঠাৎই মনে পড়ে গেল, সেই প্রথমবার বেনারস বেড়াবার কথা। সবে চাকরিতে ঢুকেছেন। সমবয়সী কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু নৈনিতাল বেড়াতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে কাঠগুদাম থেকে ট্রেনে চেপেছেন, হঠাৎই একজনের খেয়াল হল, হাতে যখন সময় আছে ফেরার পথে বেনারস ঘুরে নেওয়া যায়। অগত্যা পরদিন ভোরে লখনউ পৌঁছে ট্রেন ধরে বিকেলের মধ্যেই বেনারস। সেই বিকেলে গঙ্গায় স্নান সারতে পারলেও মন্দিরে যাবার সময় হয়নি। পরের দিন সকালে সারনাথ যাবার কথা। ভেবেছিলেন ফিরে এসে পুজো দেবেন, কিন্তু সেটাও হয়নি। সারনাথ দেখে ফিরতে কিছু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। এদিকে বিকেলে ট্রেন। তার মধ্যে স্নান-খাওয়া সেরে প্রস্তুত হতে হবে। অন্যরা হোটেলের দিকে চলে গেলেও রমাকান্তবাবু পারেননি। বেনারসে এসে মন্দির দর্শন না করে ফিরে যেতে সায় দেয়নি মন। বাস থেকে নেমে রওনা হয়ে পড়েছিলেন মন্দিরের দিকে। গোধুলিয়া ধরে যখন মন্দিরে পৌঁছোলেন, দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। দুপুরে মন্দিরের ভিতর তখন ধুন্ধুমার কাণ্ড!

মন্দিরে নিত্যপূজার শেষে হাতে ফুল-বেলপাতার সাজি আর কলসি ভরতি গঙ্গাজল নিয়ে ভক্তর ঢল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাছে গিয়ে থমকে যেতে হল। মন্দিরের ছোটো গর্ভগৃহ তখন ভক্তের ভিড়ে ছয়লাপ। বাবার রুপোর চৌবাচ্চার উপর সবাই হুমড়ি খেয়ে ফুল-বেলপাতা আর গঙ্গাজলে অঞ্জলি দিতে ব্যস্ত। রুপোর চৌবাচ্চা অগত্যা ফুল-বেলপাতায় ঠাসা বলা যায়। ঘাড়েগর্দানে বিশাল চেহারার জনা তিনেক পান্ডা ঘেমে নেয়ে সেই চৌবাচ্চা থেকে দুই হাতে জমা ফুল,বেলপাতা তুলে সরিয়ে দিচ্ছে পাশের এক দরজা দিয়ে। হইহই কাণ্ড সেখানেও। এক ঝাঁক ছেলে-বুড়ো হুমড়ি খেয়ে সেই পাহাড় প্রমাণ ফুল-বেলপাতার স্তূপ হাঁটকে চলেছে। বাবার মাথায় শুধু ফুল-বেলপাতা নয়, অঞ্জলি পড়ে টাকা-পয়সাও। সোনা বা রুপোর বেলপাতাও দিয়ে থাকেন অনেকে। তাদের লক্ষ্য সেই দিকে। খুঁজে পেলেই পুরে ফেলছে ট্যাঁকে। শুধু তারাই নয়, হাজির গোটা পাঁচেক বিশাল চেহারার ষণ্ড বাবাজীও। স্তূপের ভিতর মুখ ডুবিয়ে দিব্যি ফুল-বেলপাতার সদ্গতি করে চলেছে। দরকারে ঢুঁ, মেরে সরিয়ে দিচ্ছে পয়সা খুঁজিয়েদের। তারাও অবশ্য কম যায় না। ভয় পাওয়া দূরের কথা, তেড়ে উঠে ঢাঁই-ঢাঁই করে ফিরতি কিল ছুঁড়ে দিচ্ছে। ষণ্ড বাবাজির দল অবশ্য নির্বিকার। দিব্যি খাওয়ার কাজে ব্যস্ত। শুধু দরজার বাইরেই নয়, তাদের কয়েকজন ভোজের টানে ঢুকে পড়েছে মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিতরেও। দিব্যি মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে ফুল-বেলপাতায় ঠাসা বাবা বিশ্বনাথের রুপোর চৌবাচ্চায়। বাধা দিচ্ছে না পান্ডারাও। বাবা বিশ্বনাথের ধামে ওদের যে অবারিত দ্বার। কাজে বিঘ্ন ঘটলে যথাসাধ্য ঠেলে সামান্য সরিয়ে দিচ্ছে শুধু।

ভক্তদের অনেকে তার মধ্যেই সঙ্গে আনা পান্ডার ভরসায় ভিতরে ঢুকে অঞ্জলি, পুজোর কাজ সারছেন। যথেষ্ট সতর্ক হয়েই। ওই ব্যাপার দেখে তাঁর অবশ্য ভিতরে ঢোকার সাহস হয়নি। সঙ্গে পান্ডাও নেই। বাইরে থেকে প্রণাম সেরেই বিদায় নিয়েছিলেন।

সেই প্রথমবার বেনারসে এসেও পুজো দেওয়া হয়নি। আজ হঠাৎ যখন স্ত্রীর ইচ্ছে হয়েছে, কাজটা সেরেই আসা যাক। সেবার মন্দিরে যে অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলেন, হয়তো দেখাতে পারবেন স্ত্রীকেও।

অগত্যা ঘাট থেকে পায়ে পায়ে সেই বিশ্বনাথের গলি। সরু গলির দুই ধারে দোকান,পসারের সারি। মনিহারি আর ঠাকুর, দেবতার ছবির দোকান। সুতো, মালা, আবির আর হরেক খেলনা। তামা,পিতলের পুজোর সরঞ্জাম। তারই মধ্যে সরু গলি জুড়ে কোথাও গজেন্দ্র গমনে চলা ষণ্ড বাবাজি। সযত্নে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেও শেষে গলির মাঝে উর্দিধারি পুলিশের বাধায় থামতেই হল। হাতে মালপত্র নিয়ে এগোবার হুকুম নেই এরপর। সঙ্গে ক্যামেরা, মোবাইল, এমনকী কলম থাকাও চলবে না। মন্দিরের ভিতর ভিড় এড়াতে তাই দীর্ঘ লাইন।

জঙ্গি তাণ্ডবের কারণে বেনারসে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে ঢোকা আজ যে আর আগের মতো সহজ নেই জানতেন, কিন্তু এত কড়াকড়ি জানা ছিল না। খোঁজ নিতে বুঝলেন, নতুন ব্যবস্থায় মন্দিরে গিয়ে পুজো সারতে সময় লাগবে অনেকটাই। গলির বাকি পথে চেকিং আরো কয়েক স্থানে। দাঁড়াতে হবে দীর্ঘ লাইনের পিছনে।

এদিকে সকাল থেকে পেটে কিছুই পড়েনি। খিদেও পেয়েছে। অগত্যা পুজো দেবার আসা ছাড়তে হল। ভেবেছিলেন, মন্দিরে ঢুকতে না পারলেও আশপাশ স্ত্রীকে একটু ঘুরে দেখাবেন। আগের বার সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে শুধু মন্দিরের অন্দর নয়, খুঁটিয়ে দেখেছিলেন চারপাশের আরো অনেক কিছু। সিঁড়ি ভেঙে পাশেই এক বাড়ির ছাদের উপর থেকে মন্দিরের সোনার চূড়া আর জ্ঞানবাপী কুয়ো।

মন্দির ধ্বংস করতে মুঘল সেনার দল তখন কাছে পৌঁছে গেছে। শোনা যায়, উপায় না দেখে একজন পূজারী বাবা বিশ্বনাথকে বুকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মন্দিরে জ্ঞানবাপী কুয়োয়। সেই থেকে সেখানেই তাঁর অবস্থান। সেই জ্ঞানবাপী কুয়োর কাছে বড়ো আকারের যে নন্দীমূর্তি রয়েছে, দেখাতে পারলেন না সেটিও। জঙ্গি ঠেকাতে কড়াকড়ির কারণে হরেক বিধিনিষেধ। তবে শুনে স্বস্তি পেলেন, এমন পরে আর থাকবে না। নতুন ব্যবস্থায় ললিতা ঘাট থেকে মন্দির পর্যন্ত প্রশস্ত নতুন পথের কাজ শুরু হবার পথে। কাজ শেষ হলে বেনারসের পুরোনো গলিপথে আর মন্দিরে আসার দরকার পড়বে না। মন্দিরের পুরো চৌহদ্দি নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত উঁচু প্রাচীরে ঘেরা থাকবে। চেকিংয়ের ব্যবস্থা তখন শুধুই প্রবেশ দ্বারে। দর্শনার্থী স্বস্তিতে ঘুরতে পারবেন।

অগত্যা পুজো দেবার ইচ্ছা মুলতুবি রেখে স্ত্রীকে নিয়ে রমাকান্তবাবু ফেরার পথ ধরলেন। ইচ্ছে, পথে কোথাও দুপুরের খাওয়া সেরে নেবেন। খোঁজ নিয়ে এক বাঙালি হোটেলের দিকে রওনা হয়েছিলেন, হঠাৎই চোখ পড়ল পথের পাশে এক মহিলার দিকে। শাড়িপরা মাঝবয়সি মহিলা পথের পাশে ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়ে খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। হঠাৎ চোখে চোখ না পড়লে হয়তো তেমন খেয়াল করতেন না। ভিড় পথে এমন কতজনই তো দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু মহিলার সেই খর চোখের দিকে তাকিয়ে রমাকান্তবাবু হঠাৎই চমকে উঠলেন। গত রাতে ট্রেনের কামরার সেই ভয়ানক চোখ দুটো! ট্রেনের হালকা আলোয় এই চোখ দুটোই প্রায় গিলে খাচ্ছিল তাঁকে। তারপর আচমকা ট্রেনে ঝাঁকুনি শুরু হতেই ঢেউয়ের মতো দুলতে দুলতে মিলিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা মনে পড়তেই মুহূর্তে সরিয়ে নিয়েছিলেন চোখ। তবে প্রাথমিক অবস্থা সামলে ফের যখন তাকালেন, আর দেখতে পেলেন না তাকে। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

৩

ঘরে ফিরে ক্লান্ত শরীরে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই দুজন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তারপর। সেই ঘুম যখন ভাঙল, সন্ধে পার হয়ে গেছে। অগত্যা কোথাও আর বের হওয়া যায়নি। সামান্য কেনাকাটার জন্য রমাকান্তবাবু একাই বাজারের দিকে গিয়েছিলেন। রাতে ঘরে রান্না গরম খিচুড়ির সঙ্গে অনেকটা ঘি আর পছন্দের আলুভাজা। আয়োজন সামান্য হলেও তৃপ্তি করেই খেয়েছিলেন।

তারপর এক ঘুমে রাত ভোর। আসবার পথে রাতের সেই ঘটনার রেশ মনের ভিতর থেকেই গিয়েছিল। গতকাল সারাদিনেও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। রমাকান্তবাবু এই প্রথম টের পেলেন, সেসবের কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। শরীর-মন অনেকটাই ঝরঝরে। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, আজ ঘরে স্নান করেই বের হবেন। তারপর মন্দিরে পুজো দিয়ে কোথাও সকালের খাওয়া সেরে অন্য কাজ।

সেইমতো অল্প বেলার দিকে স্নান সেরে বের হয়ে পড়েছিলেন। এই সকালে বেনারসের পথঘাট অনেকটাই অন্যরকম। পথে ভিড় অনেক কম। বাহন বলতে সাইকেল, বাইক ছাড়া দু'চারটে অটো আর রিক্সা। দোকানপাট বেশিরভাগই খোলেনি এখনো। যা খুলেছে, সবই প্রায় খাবারের দোকান। এই সকালে যথেষ্টই ভিড় সেখানে। শুধু খাবারের দোকানে নয়, ভিড় পাশে পান তথা তাম্বুলের দোকানেও। সকালের জলখাবারের পর হরেক কিসিমের মসলা সহযোগে পান রসিকেরা হাজির। অন্য দোকানপাট এখনো তেমন না খুললেও এই সকালে পথের পাশে পশার সাজিয়ে হকারের দল। অনেকে বন্ধ দোকানের সাটার ঘেঁসেও বসে পড়েছে। ক্রেতার ভিড় সেখানেও। গোধুলিয়ার কাছে হঠাৎ পথের পাশে একজনকে রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন রমাকান্তবাবু। তবে মিনিটখানের বেশি নয়। সামান্য তাকিয়ে বুঝতে পারলেন কোনোটাই আসল নয়। নিরাশ হয়ে পিছনে স্ত্রীর দিকে ঘাড় ফিরিয়েছেন, অবাক হয়ে দেখলেন স্ত্রী সমবয়সি এক অপরিচিত মহিলার সঙ্গে উৎসাহে কথা বলছেন।

কৌতূহলী হয়ে কাছে যেতেই প্রতিমাদেবী উৎসাহে বললেন, 'কী কাণ্ড দেখ, গতকাল স্টেশনে এনার কথাই বলেছিলাম তোমাকে। অটোয় যেতে এনার মুখেই বৃন্দাবনবাবুর ভাড়ার ঘরের কথা শুনেছিলাম। সেই ভদ্রমহিলা! উনিও গতকাল বেনারসে এসেছেন। সেই কথাই—'

প্রতিমাদেবীর কথা তখনো শেষ হয়নি। ছাপা শাড়ি পরা দোহারা চেহারার মহিলা কথার খেই ধরে বললেন, 'কী দাদা, ঘর ভালো হয়নি?'

'তা ঠিকই আছে।' রমাকান্তবাবু উত্তর দিলেন, 'তা আপনারা কোথায় উঠেছেন? ওখানে এবার গেলেন না যে!'

'সে এক ব্যাপার দাদা। বোধ হয় বাবা বিশ্বনাথই ইচ্ছে করেননি। স্টেশন থেকে যে অটোয় উঠেছিলাম, নিয়ে গেল অন্য এক বাসায়। চ্যাঁচামেচি করে আর কী হবে। থেকে গেলাম সেখানেই। জায়গাটা গোধুলিয়ার কাছেও। তা দিদির কাছে শুনলাম, আপনারাও নাকি মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন?'

উত্তরে মাথা নাড়লেন রমাকান্তবাবু। 'গতকাল মন্দিরে যাওয়া হয়নি। আজ সেই ইচ্ছে নিয়েই বের হয়েছি। মনে হচ্ছে, আপনিও মন্দিরের দিকেই যাচ্ছেন!'

'একদম।' খুশিতে উদ্বেল হয়ে মহিলা বললেন, 'একদম তাই দাদা। ইচ্ছে থাকলেও গতকাল আমারও যাওয়া হয়নি। আজ সকালেই বের হয়েছি তাই।'

বেনারস শহর যত ঘিঞ্জিই হোক, পথে নেমে কোন দিকে বিশ্বনাথের মন্দির নতুন দর্শনার্থীদেরও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। গোধুলিয়া মোড়ে উঁচু এক পিলারের উপরে মন্দিরের দিকে মুখ করে পাথরের নন্দী মূর্তি। সেই মূর্তির দিকে তাকালেই বোঝা যায়

কোনদিকে মন্দির। উঁচু পিলারের মাথায় এমন নন্দী মূর্তি শহরে রয়েছে আরো গোটা কয়েক। তাকালেই বোঝা যায় মন্দির কোন পথে।

মিনিট কয়েক হেঁটে ওরা যেখানে পৌঁছল, তার বাঁদিকেই সরু গলির মুখে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরদ্বার লেখা এক সুদৃশ্য তোরণ। মন্দির যে ওই গলিপথে বুঝতে অসুবিধা হয় না। রমাকান্তবাবু দেখলেন, সেদিকে না গিয়ে স্ত্রী সেই মহিলার সঙ্গে সোজা গঙ্গার দিকে চলেছেন। পিছন থেকে রমাকান্তবাবু সেই কথা জানাতে স্ত্রী চলতে চলতেই ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'স্নান সেরে এলেও এই সকালে মন্দিরে যাবার আগে গঙ্গায় হাত-পা একটু ধুয়ে যাই। গায়েও জলের ছিটে নেওয়া ভালো। উনিও সেই জন্যই গঙ্গার দিকে যাচ্ছেন। ঘাট এখান থেকে বেশি দূরেও নয়। একবার ঘুরেই আসি চলো।'

দ্বিরুক্তি না করে রমাকান্তবাবু অনুসরণ করলেন তাদের।

খানিক এগোতেই দশাশ্বমেধ ঘাট। বেনারসে সবচেয়ে জমজমাট গঙ্গাঘাট। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার দিকে। মাঝে দীর্ঘ সুপ্রশস্ত চাতাল। বড়ো বড়ো ছাতার তলায় পান্ডারা বসে। চাতাল পার হয়ে গঙ্গা পর্যন্ত ফের কয়েক ধাপ সিঁড়ি। এই সকালেও স্নানার্থীর ভিড় যথেষ্ট। কেউ স্নান সারছেন। কেউ স্নান সেরে মস্ত ছাতার তলায় পান্ডার ঠেকে ফোঁটা, তিলক কেটে মন্ত্র পড়তে ব্যস্ত। সব মিলিয়ে যথেষ্টই ভিড়।

রমাকান্তবাবু পিছনে ছিলেন। সেই ভিড়ে হঠাৎই হারিয়ে ফেললেন স্ত্রীকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন, হঠাৎই খানিক দূরে ভিড়ের ভিতর চিৎকার-চ্যাঁচামেচি।

অল্প আগে স্ত্রীকে ওখানে একবার দেখেছিলেন। সেকথা মনে পড়তেই রমাকান্তবাবু ভিড় ঠেলে ছুটলেন। যা অনুমান করেছেন, ঠিক তাই। প্রতিমাদেবী চিত হয়ে পড়ে আছেন চাতালের উপর। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে সমানে বকে যাচ্ছেন কিছু। মুখ দিয়ে গাঁজলা উঠছে। সঙ্গের সেই মহিলাকে অবশ্য দেখতে পেলেন না। দু'জন অন্য মহিলা প্রতিমাদেবীর ওই অবস্থা দেখে ধরে তোলার চেষ্টা করছেন। রমাকান্তবাবু তাঁদের বললেন, 'আমি ওঁর স্বামী। পিছনে ছিলাম। কী হয়েছে?'

উত্তরে একজন বললেন, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ভিড়ের ভিতর আমার সামনেই ছিলেন উনি। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। হঠাৎই অস্ফুট আঁ, আঁ শব্দে পড়ে গেলেন। মৃগীরোগ আছে নাকি? ভাগ্যিস ভিড় ছিল। নইলে পাথরের চাতালে বেকায়দায় পড়লে বড়ো বিপদ হতে পারত!'

প্রতিমাদেবীর মৃগীরোগ নেই। কখনো হয়নি এমন। তবু অসুস্থ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রমাকান্তবাবু প্রমাদ গণলেন। বেড়াতে এসে একের পর এক এ কী বিপদ শুরু হয়েছে এবার! কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অবস্থা দেখে পাশের ছাতার এক পান্ডা ইতিমধ্যে জলের বালতি নিয়ে এসেছেন। ভিড় সরিয়ে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিতে শুরু করেছেন। চলে এসেছেন আরো কয়েকজন।

খানিক সেবাশুশ্রূষা চলল বটে কিন্তু সুস্থ হবার তেমন লক্ষণই দেখা গেল না। বরং ক্রমেই যেভাবে প্রতিমাদেবীর চোখ উলটে আসছিল, অনেকেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন।

হাসপাতাল ছাড়া যে অন্য উপায় নেই, ততক্ষণে বুঝে ফেলেছেন রমাকান্তবাবুও। অটো ডাকতে যাবেন, সাহায্যে এগিয়ে আসা সেই পান্ডা বললেন, 'একটু দেরি করেন মহারাজ।'

'ক-কেন?'

'আমাদের সূরজরাজ এদিকেই আসছে দেখছি। এমন মৃগীরোগী উনি অনেক সময় ভালো করতে পারেন। একটু দেখেই যান বরং।'

প্রতিমাদেবীর মৃগীরোগ নেই। এমন হয়নি কখনো। তবু হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ খড়কুটোও আঁকড়ে ধরতে চায়। রমাকান্তবাবু বললেন, 'সূরজরাজ কে?'

মণিকর্ণিকা ঘাটের ডোম। মড়া পোড়াবার কাজ করলেও এসবও ভালো করতে পারে। হঠাৎ এদিকে দেখছি যখন একটু দেরি করেন বরং।' কথা শেষ করে লোকটা কাউকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল, 'সূরজরাজ হো—ও—ও—ও—'

সেই চিৎকারে অদূরে ঘাটের সিঁড়ির ওধার দিয়ে হেঁটে আসা একটা মানুষ কিছু ব্যস্ত হয়ে উঠল। লম্বা দোহারা শরীর। আধময়লা শার্ট-প্যান্টের সঙ্গে মাথায় প্যাঁচানো গামছা। লোকটা আনমনে গঙ্গার ধার ধরে এদিকেই আসছিল। ডাক শুনে দ্রুত পা চালিয়ে লাফিয়ে উঠল ঘাটের সিঁড়ির উপর। লম্বা পায়ে এগিয়ে এসে বলল, 'কা হুয়া মহারাজজি?'

সব শুনে লোকটা এরপর এগিয়ে এল চাতালে পড়ে থাকা প্রতিমাদেবীর কাছে। খানিক দেখে রমাকান্তবাবুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে হিন্দিতে বলল, 'কতক্ষণ হয়েছে সার? মৃগী রোগ আছে নাকি?'

উত্তরে মাথা নাড়লেন রমাকান্তবাবু। 'আগে তো এমন হয়নি ভাই। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

সেই উত্তরে লোকটা চিন্তিতভাবে সামান্য মাথা নাড়ল। 'আগে এমন হয়নি কখনো! দেখে কিন্তু মৃগীরোগই মনে হচ্ছে। তবে যা দেখছি, মনে হয়, কিছুক্ষণের মধ্যে ভালো হয়ে যাবেন।'

কথা শেষ করে লোকটা সামনে বালতি থেকে আঁজলায় জল নিয়ে সামান্য ছিটিয়ে দিল প্রতিমাদেবীর চোখে-মুখে।

লোকটার কথায় কিছুমাত্র ভরসা হয়নি রমাকান্তবাবুর। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, ওই সামান্য জলের ছিটে পেয়েই প্রতিমাদেবী মাথা ঝাড়া দিয়ে চোখ মেলে তাকালেন। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক দৃষ্টি। তারপর উঠে বসে পাশে রমাকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বললেন, 'ক, কী হয়েছিল আমার?'

রমাকান্তবাবুর বিস্ময় তখনো কাটেনি। হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। দেখে প্রতিমাদেবীই বললেন, 'মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল হঠাৎ। এখন কেটে গেছে একদম।'

৪

বিপদ থেকে এভাবে পরিত্রাণ মিলবে, ভাবতে পারেননি রমাকান্তবাবু। ওই সময় মানুষটার আগমন, কতকটা দৈব বলেই মনে হচ্ছিল। দু'জনে খানিক কথাও হয়েছিল তারপর। সূরজরাজ মণিকর্ণিকা ঘাটের ডোম। ওরা বংশপরম্পরায় এখানে মৃতদেহ দাহ করার কাজ করে। তবে বর্তমানে শ্মশানে মৃতদেহ দাহকারীদের সংখ্যা এতই

বেড়ে গেছে যে, মাসের অর্ধেক দিনও কাজ থাকে না। আজ শ্মশানে কাজ পড়েনি। সকালে অন্য এক ঠেকে কাজের খোঁজে বের হয়েছে। সেদিকেই যাচ্ছিল। রমাকান্তবাবু এরপর কাছের দোকানে চা খাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সূরজরাজ একেবারেই রাজি হয়নি। সবে বাড়ি থেকে খাওয়া সেরে বের হয়েছে। কিছুই খাবে না এখন।

অগত্যা রমাকান্তবাবুও জোর করেননি। হঠাৎ এই কাণ্ডের পর ফের কী ঘটে যায়, সেই ভয়ে মন্দিরের দিকে না গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে সোজা ঘরের দিকে। এমনকী হোটেলে খেতেও যাননি। সারাদিন ঘর থেকেও বের হননি। প্রতিমাদেবীর কিন্তু কোনো সমস্যা আর হয়নি।

পরের ব্যাপার ঘটল সেই রাতেই। রান্না হয়েছিল ঘরেই। খাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলেন দু'জন। অনেক রাতে রমাকান্তবাবুর ঘুম হঠাৎই ভেঙে গেল। বালিশের পাশেই ঘড়ি। কয়টা বাজে দেখার জন্য পাশ ফিরেছেন, যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে কেঁপে উঠল সারা শরীর। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। শাড়ি পরা এক মহিলা সেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অন্ধকারে চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলছে।

দারুণ আতঙ্কে সারা শরীর কেঁপে উঠলেও সামলে নিয়ে রমাকান্তবাবু মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কে—কে, কে ওখানে?'

সেই চিৎকারে মহিলা নিমেষে সচল হয়ে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে গেল বাইরে। দেখে রমাকান্তবাবুর সাহস অনেকটাই ফিরে এসেছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দরজার কাছে। গলিপথের আবছা আলোয় দেখতে পেলেন, শাড়িপরা সেই মহিলা ততক্ষণে বারান্দা পার হয়ে পথের উপর। দ্রুত পায়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ইতিমধ্যে রমাকান্তবাবুর চিৎকারে প্রতিমাদেবী উঠে বসেছেন। সারা মুখ আতঙ্কে প্রায় নীল। রমাকান্তবাবু ঘরে ঢুকতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'কী, কী হয়েছে গো? বাইরে গিয়েছিলে কেন?'

স্ত্রীর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রমাকান্তবাবু কিছু আর ভাঙলেন না। শুধু বললেন, 'তেমন কিছু নয়। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতে বাইরে একটা শব্দ শুনে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। কী ব্যাপার দেখতে দরজা খুলেছিলাম তারপর। শেষে বুঝলাম মনের ভুল। কিচ্ছু না।'

'ত, তাই?' রমাকান্তবাবুর কথায় প্রতিমাদেবী খুব যে স্বস্তি পেলেন, এমন নয়। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি, আমি কিন্তু একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। তোমার চিৎকারে জেগে না উঠলে ঘুমের মধ্যে নিজেই হয়তো ভয়ে চিৎকার করে উঠতাম।'

'কী, কী স্বপ্ন?' স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে রমাকান্তবাবু বললেন।

'ঘুমের ভিতর হঠাৎ দেখি এক রাক্ষসী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভাঁটার মতো দুই চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে যেন। হঠাৎ ওই দেখে ভয়ে সিটিয়ে গেছি তখন। তারই মধ্যে সেই রাক্ষসী আমাকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। রাক্ষসীর দুই হাতে রক্ত-মাংসের ছিটেফোঁটাও নেই। শুধুই হাড়। আঙুলের ডগায় লম্বা ধারাল নখ। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতে যাব, হঠাৎ তোমার চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল।'

স্ত্রীর কথায় ঘাবড়ে গেলেও রমাকান্তবাবু মুখে প্রকাশ করলেন না কিছু। প্রতিমাদেবীই বরং বললেন, 'কীসের শব্দ শুনেছিলে গো?'

'বললাম না, মনের ভুল। অযথা ভয় না পেয়ে শুয়ে পড় বরং।'

মুখে বললেও রমাকান্তবাবুর মাথায় তখন ঝড় শুরু হয়েছে। স্ত্রীর অদ্ভুত স্বপ্নের কথা ছেড়ে দিলেও তিনি নিজের চোখে যা
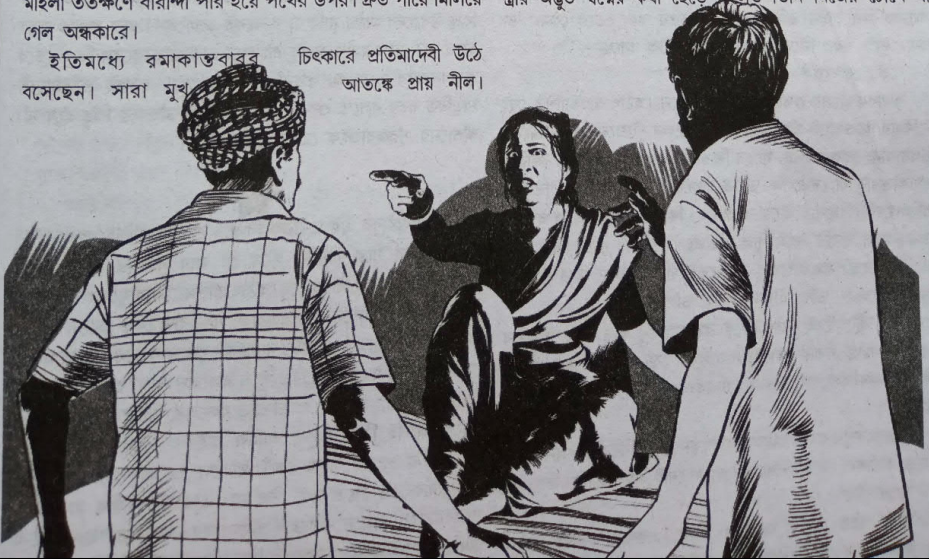
দেখেছেন, সেটা তো উড়িয়ে দেবার উপায় নেই! যদিও তর্কের খাতিরে চোখের ভুল হয়, তাহলে দরজা খুলল কে? শোবার আগে তিনি নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে খিল দিয়েছিলেন। অনেক ভেবেও কিনারা করতে পারলেন না।

স্ত্রী ফের ঘুমিয়ে পড়লেও সেই রাতে চোখে আর ঘুম আসেনি রমাকান্তবাবুর। ভোরের দিকে চোখে একটু ঝিমুনিভাব এসেছে। দরজায় খটখট শব্দে তড়িঘড়ি উঠে বসে বুঝলেন, বাইরে ভোরের আলো অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দরজার ওধারে বাড়িওয়ালা বৃন্দাবন দাসের আওয়াজ।

'দাদা, দাদা কী জেগে আছেন?'

এভাবে ভোর সকালে মানুষটির ছুটে আসা যে অকারণে নয়, বুঝতে অসুবিধা হয়নি রমাকান্তবাবুর। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতেই বৃদ্ধ মানুষটি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'রাতে, রাতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো দাদা?'

'কেন? কিছু হয়েছে নাকি?' রাতের কথা না ভেঙে প্রশ্ন করলেন রমাকান্তবাবু।

'না, রাতে নীচে আপনাদের ঘর থেকে একটা আওয়াজ কানে এসেছিল, তার উপর সকালে এমন এক ঘটনা যে, থাকতে না পেরে ছুটে এলাম। সব ঠিক আছে তো?'

বৃন্দাবন দাসের সেই কথার উত্তর না দিয়ে রমাকান্তবাবু হঠাৎই ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ক, কী ঘটনা দাদা?'

'আমাদের, আমাদের এই গলিতে একজন খুন হয়েছে। লাস পড়ে আছে। সকাল থেকে তাই নিয়ে হইচই। সবাই বলছে, রাইমণি নাকি রাতে তার রক্ত চুষে খেয়েছে। গলায় দুটো দাঁতের দাগ। এমন অনেক দিন হয়নি এদিকে। শুনে রাতের কথা ভেবে কেমন ভয় হল। ছুটে খবর নিতে এলাম। সবাই ঠিক আছেন—'

'কেঁ, কেঁ রেঁ? এঁত কঁথা কিঁসের?'

বৃন্দাবন দাসের কথা শেষ হয়নি তখনো। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত সেই নাকিসুর আওয়াজে প্রায় চমকে উঠেছিলেন দুইজনেই। আওয়াজের উৎস অন্য কোথাও নয়, ঘরের ভিতর থেকে। নিমেষে ঘাড় ফিরিয়ে রমাকান্তবাবু যা দেখলেন, তাতে ঘাবড়ে গেলেন ভীষণ। ইতিমধ্যে প্রতিমাদেবী বিছানায় উঠে বসেছেন। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তার! মাথা ভরতি এলো চুল। বিস্রস্ত বেশবাস। চোখ দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। রমাকান্তবাবু তাকাতেই দাঁত কড়মড় করে চিৎকার করে উঠলেন, 'ভাঁগ, এঁখান থেঁকে ভাঁগ শিঁগগির।'

হঠাৎ স্ত্রীর সেই রূপ দেখে রমাকান্তবাবু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন। কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছেন। পাশ থেকে বৃন্দাবন দাস বললেন, 'ওনার, ওনার এমন আগেও হয়েছে নাকি দাদা?'

বৃন্দাবনবাবুর কথায় রমাকান্তবাবু যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ন, না দাদা, আগে কখনোই এমন হয়নি। তবে—'

'তবে কী?'

'গত পরশু ট্রেনে আসবার সময়, একবার হঠাৎই এমন হয়েছিল। তবে সে বেশিক্ষণ নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল আবার। এছাড়া, গত কাল মন্দির যাবার সময়ের কথা তো জানেনই। কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কী যে বিপদ!'

বাড়িওয়ালা বৃন্দাবন দাস প্রাচীন মানুষ। জন্ম থেকেই এই বাড়িতে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে যান গঙ্গার দিকে। খানিক হেঁটে আসেন। কখনো গঙ্গায় স্নান সেরেও ঘরে ফেরেন। আজও ভোর হতেই বের হয়েছিলেন। তারপর খানিক এগোতেই গলির মুখে ভিড় দেখে কিছু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। এগিয়ে ব্যাপার কী দেখতে যাবেন, আর আগেই যখন শুনলেন, গলির মুখে এক ভদ্রলোক মরে পড়ে আছে। মানুষটি এদিকের নয়, বাইরের কোনো টুরিস্ট। রাতের অন্ধকারে গলায় দাঁত বসিয়ে কেউ রক্ত চুষে খেয়ে গেছে। মমির মতো শুকনো দেহ।

খবরটা শুনে, আর এগোতে সাহস পাননি। ছুটে এসেছিলেন বাড়িতে নতুন ভাড়াটেদের খবর নিতে। গত রাতে নীচ থেকে সামান্য চিৎকার কানে এসেছিল।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসার কারণ সেটাই। ঘাবড়েও গিয়েছিলেন বেজায়। তারপর রমাকান্তবাবুকে স্বয়ং দরজা খুলতে দেখে কেটে গিয়েছিল সেই উদ্বেগ। কিন্তু সাত হাত জলে তলিয়ে গেলেন আবার। এমন ব্যাপার একেবারেই আশা করেননি। রমাকান্তবাবুকে ভরসা দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎই ওদিকে থেকে প্রতিমাদেবী ফের দাঁত কড়মড় করে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'ভাঁগ, ভাঁগ এঁখান থেঁকে।'

আরো ঘাবড়ে গিয়ে বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'আমি, আমি স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে আসছি'।

বৃন্দাবনবাবু খুব বেশি সময় নষ্ট করেননি তারপর। উপর থেকে শুধু স্ত্রী নয়, কাজের মেয়ে রেনুকেও নিয়ে এসেছেন। সবাই মিলে চেষ্টা শুরু হল এরপর। মাথায় জল, হরেক টোটকা। প্রতিমাদেবী কিন্তু উন্মাদের মতো নাকি সুরে বকেই চলেছেন। ধরে রাখাও সম্ভব হচ্ছে না। দেখে রমাকান্তবাবু একসময় ডাক্তার ডাকবেন কিনা ভেবে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন, হঠাৎই প্রতিমাদেবী বিড়বিড় করে বলতে শুরু করলেন, 'ওঁসব ডাঁক্তারে কিঁছু হঁবে নাঁ। শ্মঁশানের সূঁরজরাজকে ডেঁকে নিঁয়ে আঁয়।'

৫

রমাকান্তবাবুর এই ভয়ানক বিপদে বাড়ির মালিক বৃন্দাবন দাস আর নিজের ঘরে যাননি। সঙ্গে স্ত্রী আর কাজের মেয়ে রেনুও রয়েছে। যথাসাধ্য চেষ্টা চলছে। হঠাৎ প্রতিমাদেবীর মুখের ওই কথায় রমাকান্তবাবুকে বললেন, 'সূরজরাজ, সূরজরাজ কে? চেনেন নাকি?'

গতকাল দশাশ্বমেধ ঘাটের ব্যাপারটা বৃদ্ধকে বললেও, সংক্ষেপেই সেরেছিলেন। এবার বিস্তারিত খুলে বললেন সব। শুনে বৃদ্ধ আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলেন যেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'তাহলে সূরজরাজকে ডেকে আনাই ঠিক। চলুন, আমিও যাই।'

অচেনা শহর। সঙ্গে কেউ থাকলে ভালোই হয়। তবু বৃদ্ধ মানুষটিকে কষ্ট দিতে সায় দিল না। তার উপর স্ত্রীর যা অবস্থা, বৃন্দাবনবাবুর এখানে থাকলেই ভালো হয়। বললেন, 'দরকার নেই দাদা। আপনি এখানে থাকলেই কিছু ভরসা পাই বরং। আমি একাই যাচ্ছি।'

'একা পারবেন?' বৃন্দাবন দাস তবু কিছু দ্বিধান্বিত। 'বেনারসের

শ্মশানে দাহকাজের ডোম কিন্তু দু-পাঁচজন নয়। হাজারের কাছে। পালা করে মাসে কয়েকদিন মাত্র শ্মশানের কাজ। বাকি সময় অন্য কোথাও। আপনি নতুন মানুষ। খুঁজে পাওয়া মুশকিল।'

ব্যাপারটা রমাকান্তবাবুও জানতেন। সূরজরাজ শ্মশানে মৃতদেহ দাহর কাজ করে। তবু সেদিন তার নাম শুনে কিছু কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। পরে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করে যা শুনেছেন, রীতিমতো কৌতূহলদ্দীপক।

পুরাণ কাহিনি অনুসারে হরিশ্চন্দ্র রাজা হয়েও সত্য রক্ষার্থে বেনারসের শ্মশানে ডোমের কাজ করেছিলেন। সেই থেকে এখানের শ্মশানে দাহকাজের ডোম নিজেদের রাজা বলে পরিচয় দেয়। নামের সঙ্গেও জুড়ে নিয়েছে রাজা। বেশ কয়েক বছর আগে, কী দরকারে ওদের কয়েকজন রাজবাড়ি গিয়েছিল। সেখানে রাজবাড়ির দরজায় প্রমাণ আকারের বাঘের মূর্তি দেখে সাধ হয়েছিল, তারাও যখন রাজা, বাড়ির দরজায় এমন বাঘের মূর্তি তারাও স্থাপন করবে। মূল উদ্যোক্তা ছিল সূরজরাজের দাদু শঙ্কররাজ। তিনি তখন শ্মশানে ডোমদের প্রধান। গোড়ায় চাঁদা তুলেই শুরু হয়েছিল কাজ। কিন্তু কী করে খবরটা চলে যায় রাজার কাছে। বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি পেয়াদা পাঠিয়ে সব বন্ধ করে দেন। তাই নিয়ে শুরু হয় বিবাদ। খোদ রাজার সঙ্গে বিবাদ হলেও শঙ্কররাজ পিছিয়ে যায়নি। বিবাদ গড়িয়েছিল আদালত পর্যন্ত। ফয়সালা হতে লেগে গিয়েছিল কয়েক বছর। শেষ পর্যন্ত রায় গিয়েছিল শঙ্কররাজের পক্ষেই।

মামলায় জয় হলেও বাঘের মূর্তি সবাই বসাতে পারেনি অবশ্য। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, ঘরের সামনে বাঘের মূর্তি বসাবার সামর্থ্য কোথায়? এদিকে চাঁদা তুলে যে বাঘের মূর্তি শঙ্কররাজ তৈরি করেছিল, পেয়াদার দল তুলে নিয়ে গেছে। রায় পক্ষে গেলেও সেই মূর্তি ফেরত মেলেনি। এদিকে বছরের পর বছর মামলা চালিয়ে পকেটেও টান। তবু দারুণ উৎসাহে কয়েকজন ফের ধারদেনা করে দরজার সামনে বাঘের মূর্তি বসিয়েছিল। সেসব ভেঙে উপে গেছে অনেক দিন। নতুন করে বসাবার কথা কেউ আর ভাবেনি। মুখে মুখে গল্পটাই রয়ে গেছে।

প্রচুর বইপত্র পড়ার কারণে এসব ব্যাপারে রমাকান্তবাবুর আগ্রহ যথেষ্ট। কৌতূহলের কারণে শুধু সেই গল্পই নয়, শুনেছেন আরো অনেক কিছু। তাতে মনে হয়েছিল, সূরজরাজকে নিজেই হয়তো খুঁজে বের করতে পারবেন। বললেন, 'দাদা, জায়গাটা খুব দূরে যখন নয়। চেষ্টা করে দেখি একবার। না হলে আপনি তো রয়েছেন।'

রমাকান্তবাবু নিজেই তারপর ছুটেছিলেন সূরজরাজের খোঁজে। অনুমান মিথ্যে হয়নি। বেনারস শহর খুব ছোটো না হলেও জানতেন ডোমদের বাস শ্মশানের কাছেই। মানুষটা মণিকর্ণিকা ঘাটের শ্মশানে কাজ করে যখন, আস্তানা খুঁজে বের করতে খুব সমস্যা হবে না। সমস্যা, সূরজরাজের আজ যদি শ্মশানের কাজ না থাকে তাহলেই। কাজের খোঁজে বের হয়ে পড়লে খুঁজবেন কোথায়? ভাবনা কিছু ছিলই। কিন্তু সব ভাবনার অবসান ঘটিয়ে সহজেই সমাধান হয়ে গেল। মণিকর্ণিকা ঘাটের কাছে এক পানের দোকানে খোঁজ করতেই সূরজরাজের বিস্তারিত খবর পেয়ে গেলেন। এতটা আশা করেননি। তার বাসস্থানের হদিশ তো বটেই, খবর পেলেন সূরজরাজের আজ শ্মশানে কাজ না থাকলেও বের হয়নি এখনো। সম্ভবত ঘরেই আছে। বস্তির গলির মুখেই পানের দোকান, বের হলে দেখতে পাওয়া যেত।

খবরটা পেয়ে রমাকান্তবাবু আর দেরি করেননি। পানের দোকানের পাশেই গলির মুখ। ঢুকে পড়েছিলেন ভিতর। তবু খানিক এগিয়ে ফের জিজ্ঞাসা করতে হল। তাতে বুঝলেন, গলির ভিতর সূরজরাজদের বস্তি হলেও এই পথে বাইরের মানুষের পক্ষে চলা মুশকিল। অনেকের ঘর-বারান্দার উপর দিয়ে পথ। অগত্যা যেতে হল সেই শ্মশানের ঘাটেই। তারপর নদীর দিক থেকে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হল অনেকটা। সিঁড়ির মাথায় কাঠের এক দরজা। দরজা পার হতেই সরু গলি। পাশাপাশি দু'জনের চলা মুশকিল। উলটো দিক থেকে কেউ এসে পড়লে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই। সেই গলির মাঝেই প্রমাণ আকারের এক চুন,বালির বাঘের মূর্তি বসানো। রোদ-জলে খসে পড়েছে কয়েক স্থান। বিবর্ণ রং। তবে বাঘের কপালে সিঁদুরের টাটকা ফোঁটা দেখে বোঝা যায়, নিয়মিত ভক্তি নিবেদন হয়।

– মূর্তির পাশেই আরো সরু এক গলি। হদিশ নিয়েই এসেছিলেন। ভিতরে ঢুকতেই সূরজরাজের সন্ধান পাওয়া গেল। এই সকালে নিজেই রান্নার কাজে লেগেছে। খোলা চিলতে বারান্দায় ছোটো এক কড়াইতে কেটে রাখা কিছু সবজি। এখনো উনুনে চাপানো হয়নি। ছোটো অন্য এক গামলায় আটা মাখার কাজ চলছে। বারান্দার একধারে কাঠের উনুন। পাশেই ঢাঁই করা কতকগুলো আধপোড়া কাঠ। রমাকান্তবাবুর গোড়ায় মনে হয়েছিল, সেগুলো সম্ভবত আগের দফায় রান্নার আধপোড়া কাঠ। কিন্তু ঢাঁই করা আধপোড়া কাঠের পরিমাণ দেখে বুঝতে অসুবিধা হল না, সেগুলো কুড়িয়ে আনা হয়েছে শ্মশানের চিতা থেকে। শবদাহ অন্তে চিতায় কিছু আধপোড়া কাঠ থেকে যায়। রান্নার জ্বালানি হিসেবে সেগুলো কুড়িয়ে আনে সূরজরাজ। সম্ভবত শুধু সূরজরাজই নয়, এদিকে শ্মশানের শবদাহকারী প্রত্যেকেই চিতার আধপোড়া কাঠ দিয়ে ঘরে রান্নার কাজ সারে। জ্বালানীর জন্য কাঠ কেনার প্রয়োজন হয় না।

ততক্ষণে সূরজরাজ চিনতে পেরে হাতের কাজ থামিয়ে ব্যস্ত হয়ে বলল, 'কী খবর সার? হঠাৎ যে!'

'খবর ভালো নয় ভাই।' মাত্র আগের দিনই স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার পর সূরজরাজের সঙ্গে পরিচয়। সামান্য ইতস্তত করে রমাকান্তবাবু বললেন। 'ফের সমস্যায় পড়ে ছুটে আসতে হল। আপনাকে যে বাড়িতে পেয়ে যাব ভাবিনি।'

'তা ঠিক। শ্মশানে কাজ নেই আজ। এতক্ষণে অন্য কাজে বের হয়ে পড়তাম হয়তো। কিন্তু হঠাৎ এক সমস্যায় পড়ে সকালে নিজেকেই রান্নার কাজে লাগতে হয়েছে। তা যাক সেকথা। কী হয়েছে হঠাৎ?'

সামান্য ইতস্তত করে রমাকান্তবাবু একে একে খুলে বললেন ব্যাপারটা। কাছেই বাসা। একবার গেলে ভালো হয়।

সূরজরাজ রাজি হবে কিনা, আশঙ্কা ছিল রমাকান্তবাবুর। কিন্তু সব শুনে সূরজরাজ যেভাবে তার দিকে তাকাল, তাতে একটু অবাকই হলেন। মনে হল, লোকটা এমন কিছু একটাই যেন আঁচ করেছিল। মাথা নেড়ে বলল, 'সার, ঠিক শুনেছেন তো? আমার নাম বলছিল!'

'হ্যাঁ ভাই। তাই তো ছুটে এলাম। বেড়াতে এসে কী বিপদে যে পড়েছি!'

'তাহলে চলুন সার। রান্না পরে এসেই সারব। যে ঠিকানা বললেন, এখান থেকে দূরে নয়। দেখেই আসি।'

রমাকান্তবাবু এতটা আসা করেননি। সূরজরাজ রাজি হবে কিনা সেই আশঙ্কা ভিতরে আগে থাকতেই ছিল। বড়ো একটা স্বস্তি পেলেও মাথা নেড়ে বললেন, 'তা হয় না ভাই। আপনি হাতের কাজ আগে সেরেই নিন বরং। আমি অপেক্ষা করছি

'সে দেরি হয়ে যাবে সার। আপনার ওখান থেকে ঘুরেই আসি আগে।'

সূরজরাজের কথায় কিন্তু রমাকান্তবাবু রাজি হলেন না। সম্ভবত সকালে খাওয়া হয়নি মানুষটার। এই সকালে নিজেই রান্নায় বসেছে যখন, সমস্যা কিছু হয়েছে নিশ্চয়। মাথা নেড়ে বললেন, 'সে হয় না ভাই। আপনি রান্না সেরে খেয়ে নিন আগে। বেশি সময় তো লাগবে না। ততক্ষণ অপেক্ষা করছি।'

সূরজরাজ এরপর আর দ্বিরুক্তি করল না। ঘর থেকে ছোটো এক টুল এনে রমাকান্তবাবুকে বসতে দিয়ে বলল, 'তাহলে একটু বসুন সার। কাছেই দোকান, একটু চা নিয়ে আসি বরং।'

রমাকান্তবাবু অবশ্য রাজি হলেন না। হাত নেড়ে বললেন, 'দরকার নেই ভাই। আমি বসে আছি।'

আটা মাখার কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছিল। সূরজরাজ এবার উনুনে কাঠ দিয়ে সামান্য কেরোসিন ছড়িয়ে দেশলাই কাঠি গুঁজে দিল। চিতার আধপোড়া শুকনো কাঠ, নিমেষে জ্বলে উঠলে সবজির কড়াই চাপিয়ে রুটি বেলতে বসল।

ছোটো এক কড়াই সবজি আর গোটা কয়েক রুটি। কাঠের জোরাল আঁচে সব সারা হতে বেশি সময় লাগেনি তারপর। রান্নার পরে খাওয়া শেষ করে সূরজরাজ যখন প্রস্তুত হয়ে নিল, সব মিলিয়ে মিনিট চল্লিশ পার হয়েছে সবে।

সূরজরাজের বউয়ের রাত থেকে যে ধুম জ্বর, বিছানা থেকে ওঠার অবস্থায় নেই, এতক্ষণ বসে থেকেও রমাকান্তবাবু কিছুমাত্র টের পায়নি। তিনিও যেমন জানতে চাননি, সূরজরাজও বলেনি। বুঝতে পারলেন, বের হবার আগে পাশের ঘরের একজনকে ডেকে যখন ঘরে অসুস্থ বউয়ের দিকে একটু লক্ষ রাখতে বলল, তখনই।

লজ্জায় আধখানা হয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীর যে এমন অবস্থা, একবারও তো বলেননি ভাই! তাহলে আমি পরেই আসতাম বরং।'

উত্তরে সূরজরাজ হাসল। 'তাই হয় নাকি সার! আপনি দরকারে এসেছেন। তাছাড়া আমাদের অভ্যাস আছে এসব। এবার দেরি না করে চলুন।'

রমাকান্তবাবু রিকশা নিতে চেয়েছিলেন। অনেকক্ষণ বের হয়েছেন। ফিরবার তাড়া স্বাভাবিক। স্ত্রী কী অবস্থায় আছে ঠিক নেই। কিন্তু সূরজরাজই রাজি হল না। অগত্যা সময় লাগল। ভিতরে উৎকণ্ঠা একটা ছিলই। বাসার কাছে আসতে হঠাৎই বাড়ল আরো। ভিতর থেকে স্ত্রীর ক্রুদ্ধ আওয়াজ। কাজের মেয়ে রেনুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'একটু অপেক্ষা করো বউদিমণি। দাদাবাবু এখুনি চলে আসবেন।'

বাইরে বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে বৃদ্ধ বৃন্দাবন দাস বসে। তাঁকে দেখে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসে গেছেন।'

স্ত্রী যে একেবারেই ঠিক নেই, বুঝতে পারছিলেন রমাকান্তবাবু। বের হবার সময়, এতটা খারাপ ছিল না। তাহলে হয়তো এতটা সময় দিতেন না। সূরজরাজও সেই কথা বলেছিল। ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় উঠেছেন, ভিতর থেকে বৃন্দাবনবাবুর স্ত্রী বের হয়ে এলেন।

'দাদা, এসে গেছেন! দিদিকে আর যে ধরে রাখা যাচ্ছে না!'

উত্তরে রমাকান্তবাবু কিছু বলার আগেই সূরজরাজ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পিছনে রমাকান্তবাবুও।

ঘরের ভিতর পা দিয়েই রমাকান্তবাবু বুঝলেন কথা একবিন্দু মিথ্যে নয়। এলো চুলে স্ত্রী বিছানায় বসে। থেকে থেকেই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কাজের মেয়ে রেনু ধরে রাখতে পারছে না। দেখে রমাকান্তবাবু বললেন, 'প্রতিমা, যার কথা বলছিলে, সেই সূরজরাজকে নিয়ে এসেছি। এই দ্যা—'

রমাকান্তবাবুর কথা শেষ হয়নি তখনো। স্ত্রী প্রতিমাদেবী মুহূর্তে পিছন ফিরে তাকালেন। তারপর ধরে রাখা রেনুকে ঠেলে ফেলে লাফিয়ে উঠলেন বিছানার উপর। দুই চোখে আগুন ছুটছে যেন। অদূরে সূরজরাজের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'তোঁকে, তোঁকে এঁভাবে কেঁ আঁসতে বঁলেছে! ভাঁগ, ভাঁগ এঁখান থেঁকে। দূঁর হঁ।'

প্রতিমাদেবীর হঠাৎ সেই ভাবান্তরে শুধু রমাকান্তবাবু নয়, ঘাবড়ে গিয়েছিল সূরজরাজও। কিন্তু মুহূর্তে সেটা সামলে নিয়ে বলল, 'কেন, কেন রে?'

'তাঁমাশা, তাঁমাশা কঁরতে লেঁগেছিস আঁবার! ভাঁগ, ভাঁগ বঁলছি।'

বলতে বলতে মস্ত হাঁ করে প্রতিমাদেবী হঠাৎই দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। স্ত্রীর সেই ভীষণ রূপ দেখে রমাকান্তবাবু আতঙ্কে প্রায় কাঠ হবার জোগাড়। কাজের মেয়ে রেনু তাঁকে ধরতে গিয়েও ভয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। সূরজরাজ অবশ্য কিছুমাত্র না দমে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। তখনো বিছানার কাছে পৌঁছোতে পারেনি। হঠাৎই প্রতিমাদেবী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন বিছানার উপর।

দেখে রেনু বালতি করে জল নিয়ে এল। খানিক শুশ্রূষার পর প্রতিমাদেবী চোখ মেলে চাইলেন। একেবারে স্বাভাবিক দৃষ্টি। অস্বাভাবিকতার লেশ মাত্র নেই। খানিক দেখে সূরজরাজ বলল, 'আর চিন্তা নেই সার। এবার সুস্থ হয়ে উঠবেন উনি।'

হতভম্ব রমাকান্তবাবু হাঁ করে দেখছিলেন এতক্ষণ। কিছুই তাঁর বোধগম্য হচ্ছিল না। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'কী, কী ব্যাপার হল?'

সূরজরাজ সেকথার কোনো উত্তর না দিয়ে, পাশে বৃন্দাবনবাবুকে বললেন, 'আপনি এই ঘর ফের ভাড়া না দিলেই পারতেন চাচা।'

অপ্রস্তুত বৃন্দাবন দাস ঢোঁক গিলে বললেন, 'তা ঠিক ভাই। অনেক দিন ভাড়া দেইনিও। তারপর বছরখানেক ধরে ফের ভাড়া দেওয়া শুরু করলেও কোনো সমস্যা কিন্তু হয়নি আগে।'

ঘরটায় যে গোলমাল আছে ততক্ষণে কিছুটা হলেও টের পেয়েছেন রমাকান্তবাবু। তাড়াতাড়ি বললেন, 'ওঁর দোষ নেই ভাই। গোড়ায় উনিও ভাড়া দিতে চায়নি। আমার স্ত্রীই জোর করলেন। উনিও তারপর আপত্তি করেননি।'

উত্তরে সূরজরাজ অল্প মাথা নাড়ল। তারপর বৃন্দাবন দাসকে ডেকে নিয়ে বের হল গেল।

স্ত্রী ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃন্দাবনবাবুর স্ত্রী নিজের ঘরে ফিরে গেলেও রেনুকে রেখে গেছেন। তবু দু'জন কোথায় গেল ভেবে চিন্তিত ছিলেন রমাকান্তবাবু। বৃন্দাবনবাবু ফিরে এলেন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর। একাই। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'দাদা, এখানে আপনার থাকা আর ঠিক হবে না। আজই ঘর বদলানো দরকার।'

'কেন?'

'সব জেনে দরকার নেই দাদা। শুধু বলি, এই ঘরে আগে এক রাতের বেশি থাকতে পারত না কেউ। ভাড়া দেওয়াও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর বছর কয়েক আগে ঘটে যায় এক ভয়ানক ব্যাপার।'

'ক—কী রাইমণি?' বৃন্দাবনবাবু থামতেই রমাকান্তবাবুর রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন।

'ঠিকই ধরেছেন দাদা। সেবার পেশায় তান্ত্রিক জনার্দন ভট্ট ভাড়া নিয়েছিলেন এই ঘর। যে ঘরে এক রাতের বেশি কেউ থাকতে পারেননি সেই ঘরে দিব্যি বেশ কয়েক মাস ছিলেন। কোনো ঝামেলাই হয়নি। তারপর এক রাতে তাঁরই কিছু অবিমৃষ্যকারিতার কারণে হঠাৎই রাইমণির আবির্ভাব। তবে ঘটনাটা ভয়ানক হলেও তার বছর দেড়েক পর থেকে ঘর ফের ভাড়া দেওয়া শুরু করলেও, তেমন কিছু আর ঘটেনি কখনো। কেউ অভিযোগও করেনি। মনে হচ্ছে, সেই রাইমণি এখানে ফিরে এসেছে আবার। সূরজরাজেরও সেই মত। নইলে অনেক দিন পর রাতে গলির ভিতর ফের একজন খুন হবে কেন? গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে খেয়ে গেছে। সেই রাইমণির কাজ!'

ততক্ষণে ব্যাপার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে রমাকান্তবাবুর কাছে। আসার দিন ট্রেন থেকে শুরু করে একের পর এক ঘটনা যে রাইমণিরই কাজ, ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছিল। বৃন্দাবনবাবুর এই ঘরের সঙ্গে যোগ আছে রাইমণির। সন্দেহ নেই, সেই রাইমণিই মাঝেমধ্যে ভর করে স্ত্রীর উপর। কোনো উদ্দেশ্যে তাদের এই বাড়িতে এনে তুলেছে সেই। আরো শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'সূরজরাজ, আজই ঘর ছাড়তে বলেছে?'

'আজই। তবে সেজন্য ভাবতে হবে না আপনাকে। ঘর একটা ইতিমধ্যে ঠিকও হয়ে গেছে। বেশি দূরেও নয়। সব গুছিয়ে নিন। পৌঁছে দিয়ে আসছি।'

৬

বৃন্দাবন দাস তারপর রমাকান্ত চক্রবর্তীকে যেখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেটা পরমেশ ব্যানার্জীর বাসাবাড়ি। পরমেশ ব্যানার্জী তান্ত্রিক জ্যোতিষী। আদতে কলকাতার মানুষ হলেও পেশার তাগিদে বেনারসে আছেন বহুদিন। আগে স্ত্রী-পরিবার নিয়ে থাকতেন। তারপর স্ত্রীর মৃত্যু, মেয়েদের বিয়ে, ছেলে চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যাবার পর একেবারেই একা। একবার ভেবেওছিলেন, কলকাতায় ফিরে যাবেন। কিন্তু পেশার তাগিদে আর হয়নি। বেনারসেই রয়ে গেছেন। কাজের মানুষ আছে। চলে যায়। গোধুলিয়ায় রাস্তার উপর বড়ো এক বাড়ির পুরো একতলা নিয়ে থাকতেন। সব মিলিয়ে কিচেন, টয়লেট সহ বড়ো তিনটে ঘর। অত ঘরের এখন আর দরকার হয় না। ভালো ট্যুরিস্ট ফ্যামিলি পেলে একটা ঘর ভাড়াও দেন কখনো। বাকি দুটো ঘর নিয়ে নিজে থাকেন। একটায় চেম্বার। কাজের মানুষ আছে সর্বক্ষণের জন্য।

বৃন্দাবন দাস জানতেন সেটা। সূরজরাজকে সেই কথা বলতে লুফে নিয়েছিল সেও, 'ভালো কথা বলেছেন। পরমেশ ব্যানার্জী তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে ওস্তাদ মানুষ। দূর থেকেও অনেকে আসেন তাঁর কাছে। এমন বাড়িতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকলে অনেকটাই নিরাপদ থাকবেন ওঁরা। এর থেকে ভালো আর হয় না। চলুন আমিও যাই। কিছু পরিচয় আছে আমার সঙ্গেও। দরকার হলে বুঝিয়ে বলতে পারব। মনে হয়, অরাজি হবেন না।'

এরপর দু'জন সোজা গোধুলিয়ায় পরমেশ ব্যানার্জীর কাছে। একা মানুষ। ঘরের কাজে সর্বক্ষণের জন্য লোক আছে। সেই সামলায় সব। পরমেশবাবু, প্রায় সারাদিনই পড়ে থাকেন চেম্বারে। সূরজরাজকে দেখেই নড়ে উঠে বললেন, 'কী খবর সূরজরাজ? তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'হঠাৎ আমার কথা ভাবছিলেন ঠাকুর মহারাজ!' অবাক হয়ে সূরজরাজ বললেও পরমেশ ব্যানার্জি সেকথায় না গিয়ে বললেন, 'সে পরে হবে। আগে তোমাদের কথা বল। এই সকালে আগমনের হেতু?'

উত্তরে সূরজরাজ পাশে বৃন্দাবনবাবুকে ইঙ্গিত করতে তিনি একে একে সব কথা খুলে বললেন। স্ত্রীকে নিয়ে বেনারসে বেড়াতে এসে ভদ্রলোক হঠাৎই খুব বিপদে পড়েছেন। কিছু একটা বিহিতের জন্যই তাঁর কাছে আসা।

রাইমণির ব্যাপারটা জানা ছিল পরমেশবাবুর। গত রাতে তার শিকারও হয়েছে একজন। তাই নিয়ে শহর জুড়ে আলোচনার বিরাম নেই। রীতিমতো আতঙ্ক। অন্য কেউ হলে দু'বার ভাবতেন। কিন্তু কিছুমাত্র সময় নষ্ট না করে বললেন, 'পার্টির যদি পছন্দ হয়, আমার এখানে থাকতেই পারেন। যে কয়দিন ইচ্ছে। ঘরও খালি আছে।'

পরমেশ ব্যানার্জির কাছে আসা সেই কারণেই। বৃন্দাবনবাবু মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না। মানুষটি রাজি হবেন কিনা সেই আশঙ্কা ছিল। পরমেশবাবুর কথায় মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে বললেন, 'তাহলে নিয়ে আসি ওনাকে?'

'হ্যাঁ নিয়ে আসুন।' পরমেশবাবু বললেন, 'আর একটা কথা, যা শুনলাম, এখন দিন কয়েক আপনার ওই ঘর ভাড়া না দিলেই ভালো হয়।'

'সে তো অবশ্যই দাদা।' সময় নষ্ট না করে বৃন্দাবনবাবু মাথা নেড়ে বের হয়ে গেলেন এরপর।

বৃন্দাবনবাবু বের হয়ে যেতেই সূরজরাজ গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, 'ঠাকুর মহারাজ, কী কথা বলছিলেন যেন।'

'সূরজরাজ,' দরজার বাইরে অপস্রিয়মাণ বৃন্দাবনবাবুর দিকে তাকিয়ে পরমেশ ব্যানার্জি গলা নামিয়ে বললেন, 'একটা কথা বলে রাখি ভাই। দিন কয়েক কেউ যদি এসব ব্যাপারে তোমাকে ডাকতে আসে, হুট করে চলে যেও না।'

'ক, কেন?'

'সেটা এখনই বলতে পারছি না। তবে ভ্যাম্পায়ার মেয়ে রাইমণির কিছু অন্য ক্ষমতা যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বুঝতেই পারছ, রমাকান্তবাবুর স্ত্রীর উপর যখন সে ভর করে, তখনই তার আচরণ পালটে যায়। যা শুনলাম, তাতে আমার ধারণা, রাইমণি তোমাকে যে ডেকে পাঠিয়েছিল, তা কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই। কিন্তু যে-কারণেই হোক, আজ তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ফের সুযোগ নিতে পারে আবার।'

'ক, কী সুযোগ?'

উত্তরে পরমেশবাবু ঠোঁট ওলটালেন। 'সে বলতে পারছি না ভাই। সব শুনে তেমনই মনে হল। দিন কয়েক একটু সতর্ক থাকা দরকার। আর বৃন্দাবনবাবুর বাড়িতে এর মধ্যে না যাওয়াই ভালো। আমার ধারণা, রাইমণি বেনারসে ফিরে ঠাঁই নিয়েছে ওই বাড়িতে, মানে তার পুরনো আস্তানায়। একান্তই যদি যেতে হয়, যাওয়ার আগে আমার কাছে এসো একবার।'

উত্তরে সুরজরাজ নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। ভদ্রলোক বললেন, 'এবার কাজের কথা বলি, আমার এক ক্লায়েন্ট খানিক আগে কলকাতা থেকে ফোন করেছিলেন, কিছু সমস্যায় পড়েই তাঁর ফোন। একটা স্বস্ত্যয়নের জন্য বলেছি তাঁকে। উনি আগামী কালই বেনারস আসছেন। তোমাকে দরকার তাই। সময় দিতে পারবে?'

পরমেশ ব্যানার্জির স্বস্ত্যয়নের কাজ জানা আছে সুরজরাজের। মানুষটি জ্যোতিষ চর্চার সঙ্গে তন্ত্রচর্চা, তন্ত্রক্রিয়াও করে থাকেন। স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়ায় বসেন মাঝেমধ্যেই। সেজন্য বেনারসের অদূরে সরায়মোহন শ্মশানঘাটই পছন্দ। রাজা হরিশ্চন্দ্র বা মণিকর্ণিকা ঘাটের মতো ট্যুরিস্ট, তীর্থযাত্রী আর শ্মশানযাত্রীর ভিড়ে সরগরম নয় জায়গাটা। বেশ নিরিবিলি। অথচ তেমন দূরেও নয়। স্বস্ত্যয়ন কাজের জন্য বরাবর সেখানেই গিয়ে থাকেন। শ্মশানে কাজ না থাকলে সুরজরাজ কখনো বেনারসের ঘাটে ট্যুরিস্টদের নৌকায় ঘোরাবার কাজও করে। দরকার পড়লে তিনি সুরজরাজের নৌকোতেই সরায়মোহন শ্মশানঘাটে স্বস্ত্যয়নের কাজে যান। পরমেশ ব্যানার্জির কথায় ব্যস্ত হয়ে বলল, 'দিন কয়েক শ্মশানের কাজ নেই আমার। অন্য এক ঠেকে যাচ্ছিলাম। আপনি বললে, মালিকের কাছে নৌকোর জন্য বলতে পারি।'

'ক্লায়েন্টের আগামী কালই চলে আসার কথা। শ্মশানের কাজ যখন নেই, মালিকের কাছে গিয়ে নৌকো আজই নিয়ে নাও। উনি চলে এলেই জানিয়ে দেব।' ব্যস্ত হয়ে পরমেশবাবু বললেন।

সূরজরাজ চলে গিয়েছিল তারপর। তার ঘণ্টাখানের মধ্যেই বৃন্দাবনবাবু সস্ত্রীক রমাকান্ত চক্রবর্তীকে পৌঁছে দিয়েছিলেন পরমেশবাবুর বাসায়।

গোধুলিয়ার উপর পরমেশবাবুর চেম্বারের লাগোয়া ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো। স্থানটিও অনেক জমজমাট। সামনের রাস্তা বেনারসের গলির মতো সরু চিলতে নয়। দেখে পছন্দ হলেও রমাকান্তবাবু ভেবে রেখেছিলেন, আগামী কালই কলকাতায় ফিরে যাবেন। খুব হয়েছে বেনারসে। তবে সকালে ওই ঘটনার পর প্রতিমাদেবী তখন কিন্তু একেবারেই স্বাভাবিক। তবু ঘরে মালপত্র গুছিয়ে স্নান সেরে মন্দিরে পুজো দিতে বের হচ্ছিলেন। পুজোটা আজ সেরে ফেলতে পারলে আগামী কালই শহর ছাড়বেন। বের হতে গিয়ে দরজার পাশে পরমেশবাবুর চেম্বারের দিকে তাকাতে চোখাচোখি হতেই পরমেশবাবু হাত নেড়ে ডাকলেন।

স্ত্রী প্রতিমাদেবী ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে পথে নেমে পড়েছে। তাঁকে সামান্য অপেক্ষা করতে বলে রমাকান্তবাবু ঘরে ঢুকতে উনি বললেন, 'একটা কথা বলি সার, আপনার বিপদ কিন্তু কেটে গেছে, অযথা চিন্তা করবেন না। আমি নিজেই বলতে যেতাম। বেরুচ্ছেন দেখে ডাকলাম।'

'তা ঠিক দাদা।' উত্তরে রমাকান্তবাবু হাত কচলালেন। 'তবে পর পর যা ঘটে গেল, খুব ভরসা পাচ্ছি না।'

'দেখুন, জ্যোতিষ ছাড়া তন্ত্রচর্চাও করে থাকি আমি। আপনার সব কথাই শুনেছি। ওই বাড়িতে থাকলে আরো বিপদে পড়তেন হয়তো। এখানে তেমন সম্ভাবনা নেই। মনে হলে থেকেও যেতে পারেন।'

পরমেশবাবুর কথা রমাকান্তবাবু ইতিমধ্যে শুনেছেন। এসব ব্যাপারে নামডাক আছে মানুষটির। ঢোঁক গিলে বললেন, 'বলছেন সার।'

স্ত্রীর সেই ভীষণ রূপ দেখে রমাকান্তবাবু আতঙ্কে প্রায় কাঠ হবার জোগাড়।
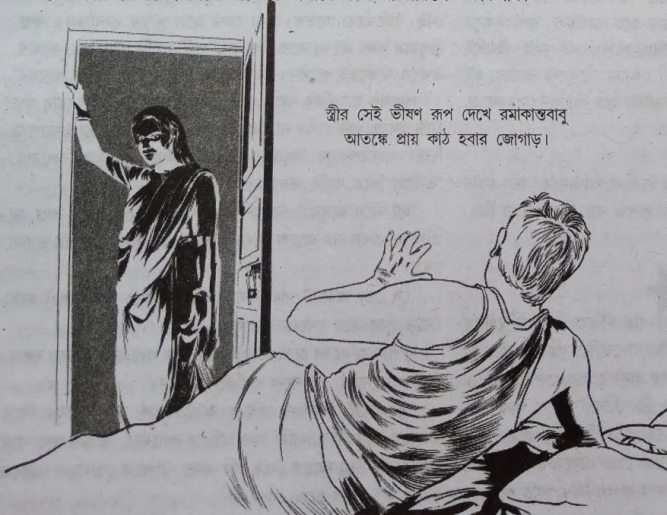
'আপনার স্ত্রী পথে দাঁড়িয়ে আছেন বোধ হয়। পরে আসতে পারেন একবার। তখন আলোচনা করা যাবে।'

অগত্যা আর কথা বাড়াননি রমাকান্তবাবু। বের হয়ে পড়েছিলেন।

৭

ভোর হবার পর বেনারস শহরের বিশ্রামের অবসর নেই। দিনভর মানুষের আনাগোনা। সাধারণ গৃহস্থ ছাড়াও ট্যুরিস্ট, তীর্থযাত্রী আর ধর্মপ্রাণ মানুষের ভিড়ে সরগরম। পরের ঘন্টা কয়েক সময় কোথা দিয়ে যে পার হয়ে গিয়েছে টেরও পাননি রমাকান্তবাবু। শুরু করেছিলেন বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে। স্নান সেরে নিয়েছিলেন ঘরেই। তারপর কাশীর গলির সদ্য ভাজা কচুরি, জিলিপির পর ভাঁড় ভরতি দারুণ স্বাদের কাশীর মালাই দিয়ে জলযোগ সেরে গিয়েছিলেন কালভৈরব মন্দিরের দিকে। ফিরতি পথে এক হোটেলে ভাতের পাট সেরে পান মুখে দশাশ্বমেধ ঘাট।

ইচ্ছে ছিল ঘাটে বসে কিছু সময় কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু ঘাটে পৌঁছে বদলে গেল ভাবনা। ঘাটে নৌকো নিয়ে বসে আছে আর কেউ নয়, খোদ সূরজরাজ। রমাকান্তবাবু তাকে দেখেই হইহই করে উঠলেন, 'আরে সূরজরাজ যে! নৌকোয়!'

আগেই বলেছি, শ্মশানে কাজ না থাকায় সূরজরাজের সেদিন অন্য এক কাজের ঠেকে যাবার কথা। আগের দিনও সেখানেই গিয়েছিল। কিন্তু সকালে পরমেশবাবুর কথায় চলে এসেছিল নৌকো ভাড়া খাটানো এক মহাজনের কাছে। এদিকে অনেক বোটওয়ালারই নিজের বোট নেই। মহাজনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে কাজ চালায়। হাজির হয়েছিল সূরজরাজও। পেয়ে যেতে নিয়েও নিয়েছিল একটা নৌকো। পরমেশবাবু যদিও আগামীকালের কথা বলেছেন, তবু ঝুঁকি নেয়নি। যদি আগামী কাল না মেলে সেই আশঙ্কায় একদিন আগেই নিয়ে নিয়েছিল নৌকো। তারপর সোজা দশাশ্বমেধ ঘাটে। তবে যাত্রী মেলেনি এখনো। আসলে এই সময় যাত্রী তেমন হয় না। চাহিদা বেশি বিকেলের দিকে। আরো বেশি সন্ধেয় আরতির সময়। তবে ওদের কাছে সেকথা আর ভাঙেনি সূরজরাজ। বলল, 'শ্মশানের কাজ না থাকলে এই কাজও করি কখনো। তা ঘুরবেন নাকি একটু?'

নৌকোয় চড়ার ইচ্ছে না থাকলেও মুখের উপর সূরজরাজকে না করতে পারলেন না। স্ত্রীর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'নৌকোয় ঘুরবে নাকি?'

সকালের সেই ভীষণ কাণ্ডের পর প্রতিমাদেবী তখন একেবারেই স্বাভাবিক। খুশি হয়ে সায় দিতেই ওরা উঠে পড়লেন নৌকোয়। সূরজরাজ দাঁড় হাতে তার নৌকো ছাড়তে যাচ্ছে, হঠাৎই হন্তদন্ত হয়ে ঘাটের কাছে মাঝ বয়সী এক মহিলা এসে হাজির। সিঁড়ি ভাঙতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল মহিলার। নৌকোর কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আমারও একটু নৌকোয় ঘাট দেখার ইচ্ছে। সঙ্গে নাও না ভাই।'

ছোটো নৌকো। তবু আরো দু-একজন সহজেই উঠতে পারে। রমাকান্তবাবুরও আপত্তি ছিল না। শেয়ারে হলে ভাড়াও কিছু কম হয়। কিন্তু সূরজরাজই রাজি হল না। বলল, 'এক পার্টি হলে নিয়ে নিতাম। কিন্তু এভাবে যাত্রী নেওয়া হয় না। ঘাটে আরো নৌকো আছে, তার একটা নিয়ে নিন।'

সূরজরাজের কথায় হতাশ হয়ে ঘাড় নাড়লেন মহিলা। নৌকো তখন ঘাট থেকে খানিক দূরে। রমাকান্তবাবু ভেবেছিলেন, মহিলা হয়তো অন্য নৌকো নেবেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন, মহিলা অন্য নৌকোর দিকে না গিয়ে, পা টেনে সিঁড়ি ভেঙে ফের উপরের দিকে চলেছেন।

নৌকোয় এক-দেড় ঘন্টার বেশি খুব একটা ঘোরে না কেউ। রমাকান্তবাবুও তেমনটাই ভেবে রেখেছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সূরজরাজের আন্তরিক ব্যবহারে এতটাই মুগ্ধ যে, শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে দিলেন সারা সময়টাই। বেনারসে নৌকো বিহার এমনিতেই আনন্দদায়ক। ঘাটে ঘাটে অগুনতি মানুষের ভিড়, হরেক দৃশ্য। নৌকোয় বসে দেখে বেড়াতে বেশ লাগে। তার উপর সূরজরাজ যখন একের পর এক ঘাট দেখানোর সঙ্গে তার পুরাণ মাহাত্ম্য বলে চলল, শুনে দু'জনেই মুগ্ধ। রমাকান্তবাবু ইতিহাস প্রেমী মানুষ। যথেষ্ট পড়াশুনাও আছে। বেনারসের এসব ঘাটের পুরাণ কথিত মাহাত্ম্যর অনেক কথাই জানা, তবু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে একেবারেই অন্য রকম লাগছিল। মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। অবাক হচ্ছিলেন সূরজরাজের জানার পরিধি দেখেও। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ যার কাজ, তার কাছে এমন একেবারেই আশা করেননি।

শুধু প্রধান ঘাটগুলোই নয়, সূরজরাজ ওদের নিয়ে গেল উত্তরে রাজঘাট সেতুর তলা দিয়ে ওধারে আদিকেশব ঘাটেও। দূরত্বের কারণে বোটওয়ালারা বিশেষ যায় না ওদিকে। অথচ পুরাণ অনুসারে আদিকেশব ঘাটই বেনারসের সবচেয়ে পুরনো ঘাট। ফেরার পথে সূরজরাজ ওদের নিয়ে হাজির গঙ্গার ওপারে রামনগরের দিকে বালির চরে।

মাইল কয়েক দীর্ঘ সুবিস্তৃত ঝকঝকে বালির চর। হঠাৎ দেখলে মরুভূমি বলেই মনে হয়। শুধু বালি আর বালি। নদীর দিকে অবশ্য অন্য দৃশ্য। উড়ে বেড়াচ্ছে ধূসর সাদা রঙের গাঙচিলের ঝাঁক। মাছ বা খাবারের সন্ধান পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলের উপর। কিছু ট্যুরিস্ট সেজন্য প্যাকেট ভরতি খাবার নিয়ে এসেছে। জলের দিকে ছুঁড়ে দিলেই গাঙচিলের ঝাঁক ঝাঁপিয়ে পড়েই ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে। কেউ খানিক সাঁতার কেটে ফের আকাশে। দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়। এদিকে ভিড়ও তেমন বেশি নয়। ফাঁকায় নদীতে নেমে হইহই করে স্নান সারছে অনেকে। উটের পিঠেও ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ। এক অন্য অভিজ্ঞতা।

বালির চরে অনেকটা সময় কাটিয়ে ওরা যখন ফের নৌকোয় বেনারসের ঘাটে, তখন আরতির আয়োজন চলছে। গঙ্গার ঘাট বরাবর তখন একেবারেই অন্য দৃশ্য। শুধু আলো আর আলো। নয়নাভিরাম রূপ। ওরা নৌকোতেই ঘাট থেকে ঘাটে গঙ্গার আরতি দেখা শেষ করে যখন ফের দশাশ্বমেধ ঘাটে নামল, কয়েক ঘন্টা সময় কোথা দিয়ে পার হয়ে গেছে হুঁশ নেই।

ফিরতে তাই একটু রাতই হয়ে গিয়েছিল রমাকান্তবাবুদের। ঘরে ঢুকতে যাবেন সামনে পরমেশবাবুর চেম্বারের পর্দার ফাঁকে চোখ পড়তে দেখলেন, ভিতরে বৃন্দাবনবাবুও বসে আছেন। চোখে চোখ

পড়তে বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'আপনাদের খবর নিতেই এসেছিলাম দাদা। জ্যোতিষী মশায়ের সঙ্গেও কথা ছিল। কেমন আছেন এখন?'

রমাকান্তবাবু অগত্যা আর ঘরে গেলেন না। স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিয়ে যোগ দিলেন তাঁদের সঙ্গে। খুশিতে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'বেনারসে এসে এই প্রথম সময়টা খুব ভালো কাটল দাদা। খুব ভালো সুরজরাজ মানুষটাও। এতক্ষণ ওর নৌকোতেই তো ঘোরা হল।'

'সুরজরাজ তাহলে বোট নিয়েছে আজ?' রমাকান্তবাবু থামতে পরমেশবাবু সামান্য নড়ে উঠলেন।

'একদম সার। এতক্ষণ তো ওর নৌকোতেই কাটালাম।'

'খুব ভালো।' অল্প থেমে পরমেশবাবু মুখ খুললেন আবার, 'যে কয়দিন ইচ্ছে, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন এখন। মনে হয়, সমস্যা হবে না। আর একটা কথা।' সামনে বৃন্দাবনবাবুর দিকে এক পলক তাকিয়ে পরমেশবাবু বললেন, 'বৃন্দাবনবাবু কিছু বলেছেন হয়তো। যে রাইমণিকে নিয়ে আজ শহর জুড়ে আলোচনা, বছর কয়েক আগে তার আবির্ভাব বলা যায় ওই ঘর থেকেই। তবে রাইমণি তারপর বেনারসে থাকেনি বেশিদিন। পাড়ি দিয়েছিল কলকাতার দিকে। ফের ফিরে এসেছে এখানে। আর যা শুনলাম, তাতে সন্দেহ নেই, রাইমণি বেনারস এসেছে আপনাদের সঙ্গেই। কিছু একটা মতলব রয়েছে নিশ্চয়।'

গত কয়েক ঘণ্টা বেশ আনন্দে কেটেছে। পুরনো কথা রমাকান্তবাবু ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়। মুহূর্তে মনের ভিতরের আতঙ্কটা ফের চেপে বসল। পরমেশবাবু ভেঙে না বললেও তখন বুঝতে বাকি নেই, ট্রেনের কামরায় সেই রাতে রাইমণিকেই দেখেছিলেন তিনি। হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেও ওদের কামরা ছেড়ে যায়নি। তারপর ওদের সঙ্গেই পুরনো ঘরে হাজির হয়েছে আবার। ভাবতে গিয়ে হঠাৎই প্রায় কেঁপে গেলেন যেন। কপালে করাঘাত করে বললেন, 'হায় হায়! এখন তো মনে হচ্ছে সেই ট্রেন থেকেই রাইমণি লেগে রয়েছে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কী উদ্দেশ্য? আমার স্ত্রী হঠাৎ যে অমন আচরণ শুরু করেন, সেই কি ওই কারণে! হায় ভগবান!'

পরমেশ ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন। 'বৃন্দাবনবাবুকে আজ সেই জন্যই ডেকেছিলাম। তবে আগেই বলেছি, ওই ঘর থেকে যখন চলে এসেছেন, আপাতত বিপদ নেই। আর একটা কথা, আপনাদের ক্ষতি করার ইচ্ছা রাইমণির থাকলে অনেক আগেই করতে পারত। তবু একটু সতর্ক থাকবেন। কয়েকটা দিন অপরিচিত কারো সঙ্গে আপনার স্ত্রীর বেশি মেলামেশা না করাই ভালো।'

বেচারা রমাকান্তবাবুর মনের অবস্থা তারপর কী হয়েছিল, বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘরে ফিরে স্ত্রীকেও বলতে পারেননি কিছু। পরের দিন স্ত্রীর তাগাদা সত্ত্বেও ঘর থেকেই বের হননি। ঘটনার অবশ্য বিরাম ছিল না তবু।

পরের দিন সকালে চেম্বার খুলে বসলেও পরমেশবাবুর মাথায় বৃন্দাবন দাসের ব্যাপারটাই পাক খাচ্ছিল সমানে। বছর কয়েক আগের কথা, হঠাৎই এক রাতে রাইমণির প্রথম শিকার হয়েছিল তান্ত্রিক জনার্দন ভট্টর শাগরেদ মধুসূদন ঘোষ। সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে জনার্দন ভট্টও বদ্ধ উন্মাদ। আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। তারপর দিন কয়েক রাইমণি বেনারস প্রায় তোলপাড় করে দিয়েছিল। শহরে সবার মুখে শুধুই রাইমণি। সন্ধের পরে রাইমণি আতঙ্কে পথঘাট সুনসান।

একই পেশার মানুষ। জনার্দন ভট্টর সঙ্গে সামান্য পরিচয় ছিল তাঁরও। কিন্তু কিছুই করতে পারেননি। সেই রাইমণি ফের হাজির হয়েছে বেনারসে। কী কারণে, সেটা এক প্রশ্ন হলেও তার থেকে বড়ো ব্যাপার বৃদ্ধ বৃন্দাবন দাস যখন তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন, কিছু একটা করা দরকার। কলকাতা অনেক বড়ো শহর। শিকারের অভাব নেই। সেই কলকাতা ছেড়ে রাইমণি ফের যে বেনারসে হাজির হয়েছে, পিছনে কিছু কারণ তো আছেই। কিন্তু কী সেই কারণ, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। জানতে পারলে কাজটা সহজ হত।

চেম্বারে অন্য কেউ নেই। একা বসে পরমেশবাবু সেই কথাই ভাবছিলেন, হঠাৎই দরজার বাইরে কারো ছায়া পড়তে নিমেষে নড়ে উঠলেন। কারণও আছে, কলকাতা থেকে আজ তাঁর পুরোনো ক্লায়েন্ট বিশাখা চৌধুরীর আসার কথা। কিছু সমস্যায় পড়েই আসছেন তিনি। গতকালই কথা হয়েছে ফোনে। যেটুকু বুঝেছেন, তাতে একটা স্বস্ত্যয়ন করতে হতে পারে। আজ অমাবস্যা বলেই তিনি আসতে বলেছেন। ট্রেনের সময় পারও হয়ে গেছে। হয়তো এসে পড়েছেন। গুছিয়ে বসে হাঁক দিলেন, 'কে? ভিতরে আসুন।'

কিন্তু উত্তর এল না। তাকিয়ে দেখলেন দরজার পর্দায় ছায়াটা তখনো নড়ছে। অগত্যা উঠে দাঁড়িয়ে এগুতে যাবেন, ছায়াটা নড়ে উঠেই মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে কাছে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়েছেন, পাশে সরু গলির মুখে সাদা কাপড়ের সামান্য প্রান্ত শুধু নজরে পড়ল। গলির ভিতর দ্রুত কেউ অদৃশ্য হয়ে গেল। নর্দমা থাকায় গলিতে কেউ চলাফেরা করে না। তেমন দীর্ঘও নয়। পরমেশবাবু তবু প্রায় ছুটেই এরপর গলির মুখে। কিন্তু দেখতে পেলেন না কাউকেই। একদম ফাঁকা।

বয়স হয়েছে ঠিকই। কিন্তু চোখের দৃষ্টি যথেষ্টই মজবুত। চশমাও ব্যবহার করেন না। ভুল দেখার কথা নয়, অবাক হয়ে চেম্বারের দিকে ফিরেছেন, একটা অটো বাড়ির সামনে এসে থামল। পাটভাঙা শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউজ পরা বিশাখা চৌধুরী নেমে এলেন ভিতর থেকে। চোখের রোদ চশমা মাথার উপর তুলে দিয়ে আঁচল গোছাতে গোছাতে অপ্রস্তুত মুখে বললেন, 'আসতে একটু দেরিই হয়ে গেল বড়দা। একে ট্রেন লেট। তারপর হোটেলেও কিছু সময় গেল।'

'সঙ্গে মি. চৌধুরীও এসেছেন বোধ হয়?'

'ন, না, উনি তো আসেননি!' পরমেশবাবুর কথায় একটু যেন অবাক হলেন বিশাখাদেবী। 'প্রেসে বেজায় কাজের চাপ, এদিকে আপনি আজই তারিখ দিয়েছেন, একাই চলে আসতে হল।'

বিশাখাদেবী বরাবর স্বামীকে নিয়েই আসেন। তাই অটো থেকে একা নামতে দেখে পরমেশবাবুর মনে হয়েছিল কোনো কারণে মি. চৌধুরী হয়তো আগেই এসে পড়েছেন। চেম্বারের দরজা পর্যন্ত এসে কোনো জরুরি দরকারে কাছেই গেছেন হয়তো। মি. চৌধুরীর কথা সেই কারণেই বলেছিলেন। কিন্তু বিশাখাদেবীর উত্তরে কিছু আর বললেন না।

বিশাখাদেবীর বয়স বছর পঞ্চাশের মতো। আঁটোসাঁটো গড়ন। স্বামীর বড়ো ছাপাখানার ব্যবসা। নিজেও বসেন সেখানে। চটপটে মহিলা এককথায় কাজের মানুষ। জ্যোতিষ এবং তন্ত্রের উপর অগাধ আস্থা। তবে অন্য কারো কাছে নয়, দরকার পড়লে ছুটে আসেন বেনারসে পরমেশ ব্যানার্জীর কাছেই। সমাধান তিনিই করবেন। অযথা সময় নষ্ট না করে চটপট খুলে বললেন সমস্যার কথা।

সব শুনে পরমেশবাবু বললেন, 'খুব বড়ো কিছু ব্যাপার নয়। চিন্তার কারণ নেই। ছোটোখাটো একটা স্বস্ত্যয়নেই কাজ হয়ে যাবে। আজ অমাবস্যা, ভালো দিন আছে বলেই আসতে বলেছিলাম। কাজটা কোনো শ্মশানে করতে পারলে আরো ভালো হয়। বলেন তো আয়োজন করতে পারি।'

বিশাখাদেবী পুরনো কাস্টমার। এসব ভালোই জানা আছে। সঠিক নিয়মে স্বস্ত্যয়ন বিঘ্ন-সমস্যা দূর করে ঠিকই, কিন্তু সেই স্বস্ত্যয়ন অমাবস্যার রাতে কোনো শ্মশানে সাঙ্গ হলে কাজ মেলে আরো ভালো। আর সেই স্বস্ত্যয়ন যদি বেনারসের মতো সুপ্রাচীন শ্মশানে, যেখানে দাহ কাজ চলছে কয়েক হাজার বছর ধরে, তবে তো কথাই নেই। আজ অমাবস্যা বলেই তিনি কাজ ফেলে রাতের ট্রেনেই ছুটে এসেছেন। স্বস্ত্যয়ন কাজের জন্য আগেও গেছেন। তবে বরাবর স্বামীর সঙ্গেই। সামান্য ভীত স্বরে বললেন, 'অনেক রাতে যেতে হবে?'

'একেবারেই নয়। যা কাজ, তাতে সন্ধে রাতই যথেষ্ট। বেশি সময়ও থাকতে হবে না।'

'তাহলে আয়োজন করুন বড়োদা। কখন আসতে হবে?'

'নৌকো বলা আছে। তবু খবর নিচ্ছি আবার। সাড়ে চারটে নাগাদ দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে আসুন।'

আরো দু-চার কথার পর চলে গেলেন বিশাখাদেবী।

আপদশান্তি, অভীষ্টলাভের কারণে স্বস্ত্যয়ন করার জন্য অমাবস্যার রাতে শ্মশানই প্রশস্ত স্থান। তবে অনেকেই কোনো গৃহ বেছে নেন। সেজন্য প্রতি শ্মশানেই একাধিক এমন যজ্ঞস্থান রয়েছে। চার দেওয়ালের ভিতর সহজেই সেরে ফেলা যায়। কিন্তু পরমেশবাবু অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, সব সময় তাতে কাজ হয় না। কাস্টমারও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। পরমেশ ব্যানার্জী তাই গৃহ নয়, শ্মশানের খোলা জায়গায় করে থাকেন। বেনারস শহরে দু-দুটি ভারত বিখ্যাত শ্মশান। একটি রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশান, অন্যটি মণিকর্ণিকা ঘাট। পুরাণে এই দুই শ্মশান ক্ষেত্রের কথা অনেকবার উল্লেখ আছে। কিন্তু দুই শ্মশানঘাট দিন, রাত এতটাই ব্যস্ত যে, নিরিবিলি তো দূরের কথা, সামান্য ফাঁকা জায়গাও মেলা ভার। পরমেশবাবু তাই কাছেই এক চমৎকার শ্মশানঘাট বেছে নিয়েছেন। জায়গাটা বেনারসের মূল স্থান থেকে প্রায় হাত বাড়ানো দূরত্বে। সড়কপথে যাওয়া গেলেও নৌকোতেই সুবিধে। আরামে একেবারে শ্মশানের নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত যাওয়া যায়। আগে নির্দিষ্ট ছিল না, ঘাটে যে নৌকো পেতেন, ভাড়া ঠিক করে উঠে পড়তেন। কিন্তু পরে এসব কাজে সূরজরাজের নৌকো ছাড়া অন্য কারো নৌকো নেন না। হয়তো কাকতালীয়, তবু খেয়াল করেছেন, স্বস্ত্যয়নের কাজে সূরজরাজের নৌকোয় গেলে ফল পাওয়া যায় আরো ভালো। খুশি কাস্টমারও।

সূরজরাজকে বলাই ছিল। বিকেল সাড়ে চারটের আগেই সে দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো নিয়ে হাজির থাকবে। সেইমত বিশাখাদেবীকেও বলে রাখা হয়েছে। প্রস্তুত হয়ে পরমেশবাবুও যথাসময়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। সূরজরাজও তার নৌকো নিয়ে প্রস্তুত। কিন্তু খোদ বিশাখাদেবীরই দেখা নেই। জিনিসপত্র নিয়ে নৌকোয় উঠে অতঃপর বিশাখাদেবীর জন্য অপেক্ষা।

কিন্তু একটু একটু করে সময় পার হয়ে গেল, প্রায় আধঘণ্টার উপর, তখনো দেখা নেই মহিলার। পরমেশবাবু মোবাইল খুব একটা ব্যবহার করেন না। সঙ্গেও রাখেন না। তবে বিশাখাদেবীর মোবাইল নম্বর জানা ছিল। নৌকো থেকে নেমে ঘাটের এক পরিচিত দোকান থেকে মোবাইল নিয়ে ফোন করলেন। কী আশ্চর্য, প্রতিবারেই নো রিপ্লাই। ওদিক থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না।

মহিলার কোনো সমস্যা হয়নি তো?
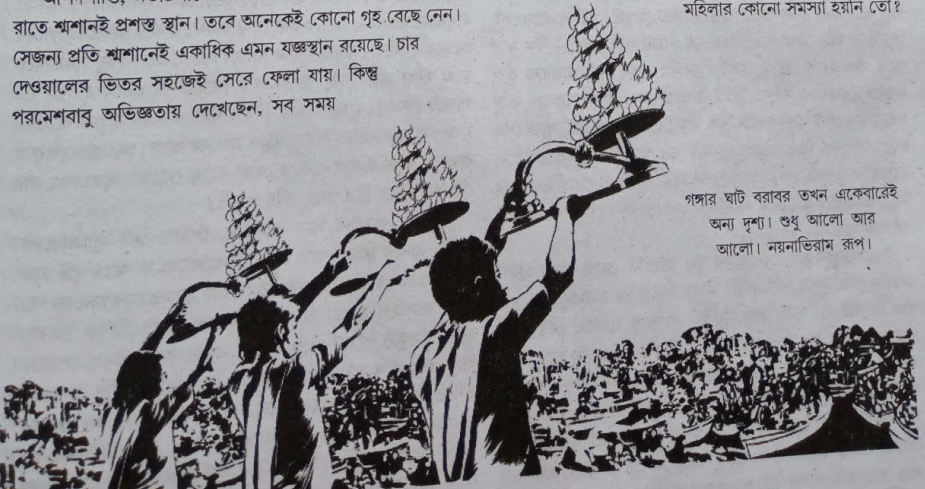
গঙ্গার ঘাট বরাবর তখন একেবারেই অন্য দৃশ্য। শুধু আলো আর আলো। নয়নাভিরাম রূপ।

স্বস্ত্যয়ন কর্মের আগে এমন অনেকবারই দেখেছেন তিনি। আচমকা কোনো এক বাধায় পড়ে ক্লায়েন্ট পৌঁছতে পারেনি। বিরুদ্ধ শক্তির বাধায় এমন হয়ে থাকে কখনো। কী করবেন ভাবছেন, হঠাৎই দেখেন খানিক দূরে ভিড়ের ভিতর হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন বিশাখাদেবী স্বয়ং। মহিলা কিছু খোঁড়াচ্ছেনও বটে।

কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'আসার পথে বড়ো এক ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম বড়দা। অনেক দেরি হয়ে গেল।'

ঝামেলা যে একটা হয়েছে, পরমেশবাবু দেখেই বুঝেছেন। মহিলার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে মোটা করে ব্যান্ডেজ বাঁধা। বললেন, 'কী হয়েছিল ম্যাম?'

'আর বলবেন না বড়দা। হোটেল থেকে বের হয়ে অটোর জন্য দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ এক বাইক গায়ের উপর এসে পড়ল। পায়ের আঙুল থেঁতলে তো গেছেই। মোবাইলটাও যে কোথায় ছিটকে পড়ল, খুঁজে পেলাম না।'

স্বস্ত্যয়ন কর্মের আগে এমন হওয়া কাজের কথা নয়। পরমেশবাবু বললেন, 'তাহলে আজ থাক ম্যাম। স্বস্ত্যয়ন পরের অমাবস্যা বা পাঁজিতে তার আগে তেমন দিন যদি পাই তো সেই দিন হবে।'

শুনে বিশাখাদেবী প্রায় হাঁ,হাঁ করে উঠলেন, 'কলকাতায় অনেক কাজ ফেলে এসেছি বড়দা। আগামী কালই ফিরে যাবার কথা। আজ সেরে ফেললেই ভালো হয়।'

বিশাখাদেবীর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে পরমেশবাবু আর না করতে পারলেন না। সূরজরাজকে নৌকো ছাড়তে বললেন।

বেনারস শহরের উত্তরে গঙ্গার উপর অতি ব্যস্ত রাজঘাট ব্রিজ। ব্রিজের দুটো অংশ। নীচের অংশে ট্রেন চলার রেললাইন। উপরের অংশ অন্য গাড়ির জন্য। বেনারসের ব্যস্ত ঘাটগুলো একে একে ছাড়িয়ে সূরজরাজ তার নৌকো সেই রাজঘাট ব্রিজের তলা দিয়ে পার হয়ে এল বেনারসের ব্যস্ত নদীঘাট অঞ্চল। খানিক এগোলেই খিড়কিয়া ঘাট। একসময় ভাঙাচোরা নির্জন ঘাট সারাদিন ঝিম ধরে পড়ে থাকত। আসত না কেউ। ইদানীং নতুন করে সাজানো শুরু হয়েছে। ঝকঝকে চওড়া সিঁড়ি, মস্ত চাতাল। বসার ব্যবস্থা। কাজ চলছে ফুডকোর্ট আর স্কেটিং রিঙ্ক নির্মাণের। সন্দেহ নেই, কাজ শেষ হলে এখানেও ভিড় বাড়বে। গঙ্গায় এর পরেও ঘাট আছে আরো কয়েকটি। তাদের একটি আদিকেশব ঘাট। গতকাল রমাকান্তবাবুদের নিয়ে সূরজরাজ এখানেও এসেছিল। এর পরেই যে ঘাট পড়ে সেটি সরায়মোহন।

সরায়মোহন ঘাট বেনারসের মূল ঘাটগুলি থেকে মাত্রই মাইল দেড়েক দূরে, অথচ একেবারেই নির্জন। সারাদিন জনমানুষের দেখা প্রায় মেলেই না। ঘাটে বাঁধানো সিঁড়ি বা অন্য ব্যবস্থাও নেই। পার বরাবর যত্রতত্র শুধু আধপোড়া কাঠ, মাটির ভাঙা কলসি আর ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো দেখে বোঝা যায় সরায়মোহন ঘাট আসলে শ্মশান, শুধুই মৃতদেহ দাহ করার জন্য। কাছে রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা মণিকর্ণিকা ঘাট থাকায় শবযাত্রীদের সংখ্যা যে খুব বেশি নয়, তা জনশূন্য স্থান দেখেই বোঝা যায়। যদিও শ্মশান ছেড়ে উপরে উঠলেই অল্প দূরে ব্যস্ত রাজপথ। দোকানপাট, শবদাহের কাঠের আড়ত, অফিস। কিন্তু নদীর দিকে শ্মশানঘাট একেবারেই নির্জন। শবযাত্রী ছাড়া তেমন একটা কেউ আসে না।

এই ঘাটে বড়ো এক নিমগাছের কাছে সূরজরাজ যখন তার নৌকো ভেড়াল তখন অন্ধকার ঘন হতে শুরু করেছে। আসলে ঘড়ির হিসেবে তখন সন্ধে পার হয়ে গেছে। তবে নদী আর খোলা জায়গার কারণে অন্ধকার তেমন ঘন হতে পারেনি।

সারা পথ একটি কথাও বলেনি কেউ। নৌকোয় বসে পরমেশবাবু সমানে ভাবছিলেন, এই অবস্থায় আজ স্বস্ত্যয়নের কাজে বসা ঠিক হচ্ছে কিনা। একটি কথা নেই বিশাখাদেবীর মুখেও। থম হয়ে রয়েছেন। পায়ের যন্ত্রণায় মাঝে মধ্যেই কুঁচকে উঠছে মুখ। সূরজরাজ নৌকো ভেড়াতে পরমেশবাবু বললেন, 'নামতে পারবেন ম্যাম?'

উত্তরে বিশাখাদেবী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'পারব বোধ হয়। না পারলে আপনারা তো আছেনই।'

নৌকো থামিয়ে সূরজরাজ ইতিমধ্যে জিনিসপত্র ভরতি বড়ো ব্যাগ দুটো নৌকো থেকে নামিয়ে ফেলেছে। পরমেশবাবুও নেমে নৌকোয় বিশাখাদেবীর দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন, যদি দরকার হয়, সেই কারণে। তবে মহিলা টালমাটাল পায়ে কারো সাহায্য ছাড়াই শেষ পর্যন্ত নেমে পড়তে পারলেন। ইতিমধ্যে সূরজরাজ নিমগাছের তলায় খানিকটা জায়গা সাফ করে ফেলেছে। পেতে ফেলা হয়েছে দুটো আসন। একটা পরমেশবাবুর জন্য, অন্যটা বিশাখাদেবীর। একটা ব্যাগে বালি আর চ্যালা করা বেলকাঠ আনা হয়েছিল। পরমেশবাবু দ্রুত হোমকুণ্ড সাজিয়ে ফেললেন। তারপর আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্রিয়ার পর শুরু হয়ে গেল স্বস্ত্যয়নের আসল কাজ।

এই সময় তেমন কাজ থাকে না সূরজরাজের। একবার ভেবেছিল বিরজুরাজের সঙ্গে দেখা করে আসবে। বিরজুরাজ সরায়মোহন শ্মশানে ডোমদের প্রধান। তার চেয়ে বড়ো কথা, সূরজরাজের কাছের মানুষদের একজন। অনেক দিন দেখা হয়নি। উপরে শ্মশানের কাঠের আড়তের দিকে গেলেই খোঁজ মিলবে। দেখা হলে কিছু সময় গল্পে মজে থাকা যায়। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও কী ভেবে হঠাৎই মত পালটে ফেলল। হাজার হোক, নির্জন ঘাটে একজন মহিলা রয়েছেন যখন। তাছাড়া সন্ধেয় পরিবেশটাও মন্দ নয় আজ। চমৎকার ফুরফুরে বাতাস! নদীর হালকা ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে নৌকো। সূরজরাজ তার নৌকোয় উঠে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।

তারপর কতক্ষণ সময় কেটেছে, খেয়াল নেই সূরজরাজের। ঘাটের এদিকে বিজলিবাতি নেই। তবে আলো যা আছে দৃষ্টি চলে। নৌকোয় চিত হয়ে শুয়ে ঢেউয়ের দোলায় সূরজরাজের চোখের পাতা বুজে আসছিল ক্রমে। জনমানবহীন শ্মশানঘাটে ঝিঁঝির কোরাস। নদীর কুলকুল শব্দের সঙ্গে দূরে দু-একটা কুকুর কিংবা শেয়ালের রব। এছাড়া অদূরে পরমেশবাবুর মন্ত্র পড়ার গম্ভীর আওয়াজ। শুনতে শুনতে সূরজরাজের চোখে ঘুম গাঢ় হতে শুরু করেছে। হঠাৎই নৌকো একটু অন্য রকম দুলে উঠল। নদীর ঢেউয়ে নৌকো আগে থেকেই দুলছিল। কিন্তু এটা ঢেউয়ের কারণে নয়। অন্য রকম। সতর্ক মগজের কোষে সেটা জানান দিতেই সূরজরাজের ঘুমটা চট করে ভেঙে গেল।

চোখ মেলতেই দেখল বিশাখাদেবী কখন নৌকোয় তার পাশে এসে বসে আছে। তবে কী স্বস্ত্যয়ন কর্ম শেষ হয়ে গেছে? মন্ত্র উচ্চারণও শোনা যাচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে বিশাখাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল সূরজরাজ। মুহূর্তে সারা শরীর কেঁপে উঠল। মহিলার দুই চোখ টকটকে লাল। আগুন ছুটছে। গালের দুই কশ দিয়ে দুটো দাঁত বেরিয়ে এসেছে। তীক্ষ্ণ ডগা অনেকটাই লম্বা। সূরজরাজ সেই দৃশ্য দেখে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে যাবে, টের পেল দেহে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই।

'র...রাইমণি!' অনেক চেষ্টায় সূরজরাজের গলা দিয়ে অস্ফুট একটু আওয়াজ বের হল মাত্র।

'ঠিঁক তাঁই রেঁ।' হিস-হিস করে উত্তর ওদিকে থেকে, 'সেঁদিন সঁকালে তোঁকে ডেঁকেও বাঁগে পাঁইনি। আঁজ আঁর পাঁর পাঁবিনে।' বলতে বলতে রাইমণি খিঁক-খিঁক শব্দে হিংস্র ভাবে হেসে উঠল।

সূরজরাজ মণিকর্ণিকা ঘাটের ডোম, মড়া পোড়ানই কাজ। মৃতদেহ বা প্রেতাত্মা নিয়ে তেমন অনুভূতি নেই। তবু হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখে গোড়ায় ভীষণ ঘাবড়ে গেলেও ভিতরে একটা শক্তি ক্রমেই যেন ফিরে আসছিল আবার। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। রাইমণি বলল, ইঁষ্টমন্ত্র জঁপছিস তোঁ? তাঁতে সুঁবিধা হঁবে নাঁ রেঁ আঁজ।

'ঠ-ঠাকুর মহারাজ? তিনি কোথায়?'

'তাঁর ব্যঁবস্থা কঁরেই তোঁ এঁলাম। এঁবার তোঁর তাঁজা রঁক্ত—'

বলতে বলতে রাইমণি ফস করে ঝুঁকে পড়ল তার গলার উপর। দেহের সব শক্তি একত্র করেও সূরজরাজ বিন্দুমাত্র নড়তে পারল না। টের পেল, পিশাচীর হিংস্র দুই ওষ্ঠ তার গলায় চেপে বসতে শুরু করেছে। কী ভয়ানক হিমশীতল স্পর্শ! বরফের ছ্যাঁকার মতো সেই স্পর্শে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। গায়ে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট না থাকলেও সূরজরাজের জ্ঞান লুপ্ত হয়নি তখনো। বুঝতে পারছিল, রাইমণি এখনই দাঁত বসিয়ে দেবে গলায়। মৃত্যু দোর গোড়ায়! অথচ বাধা দেবার বিন্দুমাত্র শক্তি শরীরে অবশিষ্ট নেই।

দারুণ আতঙ্কে সূরজরাজের চোখের পাতা তখন বুজে আসতে শুরু করেছে। হঠাৎই নদীর উঁচু পাড়ের দিকে গাছপালার ফাঁকে জোরাল একটা আলো নৌকোর উপর এসে পড়ল। সঙ্গে শববাহী দলের চিৎকার।

শ্রীরাম নাম সত্য হ্যায়, শ্রীরাম নাম সত্য হ্যায়।
সত্য হৈ, সত্য হৈ—

নির্জন নিস্তব্ধ শ্মশান মুহূর্তে প্রায় গমগম করে উঠল। বড়ো এক শববাহী দল মৃতদেহ নিয়ে নেমে এল নদীর কাছে। সূরজরাজ হঠাৎ খেয়াল করল শববাহী দলের আচমকা সেই চিৎকারে রাইমণি কেমন কেঁপে উঠতেই তার হারিয়ে যাওয়া শক্তি যেন ফিরে আসতে শুরু করেছে। মুহূর্তে শরীরের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে গলার উপর ঝুঁকে পড়া প্রেতিনীকে দুই হাতে ঠেলে লাফিয়ে উঠল।

'আঁহ্—'

কী আশ্চর্য! সূরজরাজের সেই আঘাতে চাপা আর্ত রবে রাইমণি নৌকো থেকে ছিটকে গেলেও জলে না পড়ে উড়ে গেল উপর দিকে। আবছা আলোয় উড়তে লাগল শাড়ির আঁচল। দেখতে দেখতে বাতাসে ভেসে হারিয়ে গেল দূরে রাজঘাট ব্রিজের দিকে।

অদ্ভুত ব্যাপারটা ততক্ষণে নজরে পড়েছে শববাহী দলেরও। হইহই করে ছুটে এসেছে কয়েকজন।

'কী ব্যাপার এখানে? কী উড়ে গেল?'

সূরজরাজ ততক্ষণে নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েছে। কোনো উত্তর না দিয়ে সোজা সেই নিমগাছের দিকে। সেখানে স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়ার ছড়ানো উপচারের মাঝে আসনের উপর বসে আছেন তান্ত্রিক পরমেশ ব্যানার্জী। দেহ পাথরের মতো স্থির।

রাইমণি বলল, ইঁষ্টমন্ত্র জঁপছিস তোঁ?
তাঁতে সুঁবিধা হঁবে নাঁ রেঁ আঁজ।

বিন্দুমাত্র সাড় নেই। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সূরজরাজ তাঁকে দুই হাতে ঝাঁকাতে শুরু করল।

'ঠাকুর মহারাজ, ও ঠাকুর মহারাজ—'

বার কয়েক ওইভাবে ঝাঁকাবার পর পরমেশ ব্যানার্জি হঠাৎই নড়ে উঠলেন। চোখ মেলে মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বাবা সূরজরাজ, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। ফিরতে হবে।'

উত্তরে সূরজরাজ অল্প হাসল, 'চিন্তা নেই ঠাকুর মহারাজ, এ যাত্রায় বিপদ কেটে গেছে। ভাববেন না।'

ওদের চারপাশে তখন শবযাত্রীদের অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে। কয়েকজন প্রশ্ন করল, 'কী বিপদ।'

'তেমন কিছু নয়।' পরমেশ ব্যানার্জী নয়, মুখ খুলল সূরজরাজ, 'ঠাকুর মহারাজ হোমের কাজ করছিলেন। বাতাস আটকাবার জন্য একটা কাপড় ধরেছিলাম। হঠাৎই দমকা বাতাসে উড়ে গেল কাপড়টা। চেষ্টা করেও ধরা গেল না। মহারাজের কাজটাই পণ্ড হয়ে গেল।'

৯

মূলত জ্যোতিষ চর্চা করলেও পরমেশ ব্যানার্জী তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম হামেশাই করে থাকেন। আর তার কোনোটাই ঘরের ভিতরে নয়। বেনারসের কোনো নির্জন শ্মশানে। ছোটোখাটো বিঘ্ন এলেও এমন ভয়ানক ব্যাপার কখনো হয়নি। সেদিন মনের ভিতর কিছু অস্বস্তি গোড়া থেকেই ছিল। হোমে বসলেও ভিতরে থেকেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। সেটাই যে কাল হয়ে উঠবে, ভাবতে পারেননি।

স্বস্ত্যয়নে প্রধান কাজ তান্ত্রিকেরই। যার জন্য স্বস্ত্যয়ন তিনি পাশে উপস্থিত থাকলেই চলে। প্রধান আহুতির সময় ছাড়া তেমন দরকার হয় না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেরে ফেলবেন সেই ইচ্ছেয় দ্রুত একের পর এক কাজ করে যাচ্ছিলেন পরমেশবাবু। কোনো দিকে নজর দেবার অবসর ছিল না। আচমকাই খেয়াল করলেন দীর্ঘ নখের এক নরকঙ্কাল হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে।

অভিজ্ঞ তান্ত্রিক হলেও হঠাৎ ওই দৃশ্য দেখে থমকে গিয়েছিলেন তিনি। সরায়মোহন ঘাট বহুদিনের পুরনো শ্মশান। দাহকাজ চলছে কয়েক হাজার বছর ধরে। তার উপর জনমানবহীন নির্জন। ভূত, প্রেতের বাস থাকতেই পারে। এসব কাজে অনেক সময়েই তারা বাধার সৃষ্টি করে। বিহিতও জানা আছে। তাই নিজের জন্য নয়, ভয় পেয়েছিলেন বিশাখাদেবীর কথা ভেবে। মুহূর্তে চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন তাঁর দিকে। যা দেখলেন তাতে তাঁর সারা শরীর মুহূর্তে কেঁপে উঠল। সামনের আসনে শাড়ী পরা যে মহিলা বসে সে বিশাখাদেবী নয়, প্রেতিনী। কোটরের ভিতর দুই চোখে আগুন ছুটছে। গালের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে তীক্ষ্ণ দুই কষের দাঁত।

আজ গোড়াতেই যে গোলমাল, পরমেশ ব্যানার্জীর তখন বুঝতে বাকি নেই। কোনো উপায়ে বিশাখাদেবীর বদলে তার রূপ ধরে হাজির হয়েছিল রাইমণি। অভিজ্ঞ তান্ত্রিক মানুষ হয়েও কিছুমাত্র অনুমান করতে পারেননি। তবে এসবের বিহিত ভালোই জানা আছে। আছে পুরনো অভিজ্ঞতাও। এই সরায়মোহন শ্মশান ঘাটেই এক রাতে ঘটেছিল ব্যাপারটা।

সেবার প্রবীণ এক তান্ত্রিকের সঙ্গে এই সরায়মোহন ঘাটেই স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়ায় বসেছেন, হঠাৎই পাশের অন্ধকার থেকে এমনই এক কংকালের হাত বের হয়ে হোমকুণ্ডের কাছে। স্বস্ত্যয়নে বাধা সৃষ্টি করতে এমন হয় কখনো। সঙ্গের অভিজ্ঞ তান্ত্রিক এক মুহূর্ত দেরি না করে হোম থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে ঠেসে দিয়েছিলেন সেই হাতের উপর। চাপা আর্তনাদে নিমেষে হাতটা মিলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারে। আর হয়নি কিছু। পরমেশবাবু তাই সামলে নিয়ে হোমকুণ্ড থেকে একটা জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ তুলে নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছেন মুহূর্তে সেই দীর্ঘ নখের রক্তমাংস হীন শুকনো খটখটে আঙুলগুলো তাঁর হাত চেপে ধরল। ভেসে এল চাপা ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর।

'বাঁড়াবাড়ি কঁরলে নিঁজেই মাঁরা পঁড়বেন। আঁজ এঁত ঝাঁমেলা কঁরে এঁখানে এঁসেছি শুঁধু সূঁরজরাজের রঁক্তের জঁন্য। দুঁর্বল শঁরীরটা মেঁরামতের জঁন্য খুঁব দঁরকার।'

সেই হিমশীতল স্পর্শ আর কণ্ঠস্বরে তান্ত্রিক পরমেশ ব্যানার্জির সারা শরীর মুহূর্তে প্রায় পাথর হয়ে গেল। লুপ্ত বাহ্যজ্ঞানও।

তাঁর সেই জ্ঞান তারপর ফিরে এসেছিল সূরজরাজের দুই হাতের ঝাঁকুনিতে।

ফেরার পথে দু-চার কথার বেশি দুজনের মধ্যে হয়নি তারপর। কৌতূহল থাকলেও সূরজরাজ নৌকোয় নিজের ঘটনা ছাড়া অন্য প্রশ্ন করেনি। থম হয়ে ছিলেন পরমেশবাবুও। শুধু ঘাটে এসে নামার পর সূরজরাজের হাত ধরে বলেছিলেন, 'আজ এই রাতে কোথাও আর বের হোসনে বাবা। ঘরে গিয়ে রাতের খাওয়া সেরে শুয়ে পড়িস। আর সকালে আমার চেম্বারে আসিস একবার। ওই সময় বৃন্দাবনবাবুকেও আসতে বলব।'

তান্ত্রিক পরমেশ ব্যানার্জী তারপর সারা রাত আর দুই চোখের পাতা এক করতে পারেননি। যাটের উপরে বয়স। এই কাজ করছেন বহুদিন। কিন্তু এমন ভয়ানক ব্যাপার ঘটেনি কখনো। ঘরে ফিরে টেলিফোনে হোটেলে খবর নিতেই বুঝেছেন, যা অনুমান করেছিলেন, ঠিক তাই। দশাশ্বমেধ ঘাটে শেষ সময়ে হন্তদন্ত হয়ে যিনি হাজির হয়েছিলেন তিনি বিশাখাদেবী নয়, ছদ্মবেশী রাইমণি।

বিশাখাদেবী তাঁর হোটেল থেকে যথাসময়েই বেরিয়েছিলেন। তারপর অটো ধরে যখন আসছিলেন হঠাৎ ব্রেকফেল করে অটো উলটে যেতে ছিটকে পড়েন পথের উপর। শুধু আহত নয়, দূরে ছিটকে যেতে হারিয়ে ফেলেন মোবাইলটাও। তাঁকে রিং করে পাওয়া যায়নি তাই। পরমেশবাবু মোবাইল ব্যবহার না করায় তিনিও যোগাযোগ করতে পারেননি।

বিশাখাদেবীর ছদ্মবেশে রাইমণি অবশ্য দুর্ঘটনার কথাই বলেছিলেন। শুনে ভিতরে কু গাইলেও পরমেশবাবু খুব গুরুত্ব দেননি। জোর করছিল বিশাখাদেবীর রূপ ধরে আসা রাইমণিও। মণিকর্ণিকা ঘাটের ডোম সূরজরাজের রক্ত পান করে ফের আগের মতো সুস্থ হয়ে ওঠাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। বেনারসে আগমন সেই জন্যই।

গত রাতে রাইমণি সফল হতে পারেনি, পরমেশবাবু চিন্তিত ছিলেন সেই কারণে। কিছু একটা বিহিত করা যায় কিনা সেই চিন্তায়

কাটিয়ে দিয়েছেন সারারাত। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছিলেন, তাঁর অনুমান মতো, বৃন্দাবন দাসের বাড়ির নিচতলার ঘরেই ঠাঁই নিয়েছে রাইমণি। পুরনো চেনা বাসস্থান। ঠাঁই নেওয়া সুবিধের। স্বস্ত্যয়ন ওখানে একটা করাই যায়, কিন্তু গত সন্ধেয় রাইমণির সামান্য যা পরিচয় পেয়েছেন, তাতে কাজ খুব সহজ হবে কিনা সন্দেহ। অভিজ্ঞ তান্ত্রিক মানুষ। তবু সেই কংকাল হাতের হিমশীতল স্পর্শে নিমেষে সারা শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল শরীর। কিছুমাত্র হুঁশ ছিল না তারপর। ভাবতে গিয়ে রাতভর বারে বারেই কেঁপে উঠেছেন। তবু চেষ্টা করতেই হবে একবার। যার কাছে তন্ত্রচর্চা শিখেছিলেন, সেই তারাপ্রবণ মহারাজ আজ বেঁচে নেই। থাকলে পরামর্শর জন্য যেতেন। কিন্তু মানুষটির আরো কয়েকজন শিষ্য এখনো রয়েছেন। তাঁদের পরামর্শও নেবেন।

পরের দিন একটু বেলার দিকে সূরজরাজ পরমেশবাবুর চেম্বারে পৌঁছে দেখে ইতিমধ্যে বৃন্দাবন দাসও পৌঁছে গেছে সেখানে। নীচু গলায় দু'জন কী পরামর্শ করছেন। ওকে ঢুকতে দেখেই মুখ তুলল দু'জন। বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'এক কাণ্ড হয়েছে সূরজরাজ। এর মধ্যে কাউকে আর বলতে পারিনি। তাছাড়া জানতাম, গতকাল পরমেশ দাদার বড়ো একটা কাজও আছে। আজ সকালেই তাই ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসে যা শুনছি তাতে তো হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার জোগাড়। মনে হচ্ছে, বাড়িটা ভেঙেই ফেলতে হবে এবার। বহুকালের পৈতৃক বাড়ি!'

'কেন কী হয়েছে বাড়িতে?'

সূরজরাজের প্রশ্নে বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'গত পরশু সেই যে রমাকান্তবাবুদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলাম, তারপর বিকেলের দিকে কাজের মেয়ে রেনুকে ঘর সাফ করাতে পাঠিয়েছিলাম। খানিক বাদে সে এসে জানাল, দরজা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ। শুনে ছুটে এসেছিলাম তৎক্ষণাৎ। কিন্তু অনেক ঠেলেও খুলতে পারিনি। তখন সন্ধে হয়ে গেছে দেখে আর চেষ্টা হয়নি। ভেবেছিলাম, ভিতরে দরজার খিল কোনো কারণে আটকে গেছে। পরের দিন তাই ফের চেষ্টা শুরু হয়েছিল। কিন্তু খানিক ঠেলাঠেলির পরেই হঠাৎ এক ভয়ানক ব্যাপার। ঘরের ভিতর থেকে আচমকাই হিস-হিস আওয়াজ। বড়ো সাপ বা কোনো হিংস্র শ্বাপদ ফুঁসছে যেন।

'হঠাৎ ওই ব্যাপারে এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে, সারাদিন কেউ আর ঘর থেকে বের হতে সাহস পাইনি। তার উপর পরমেশ দাদাও ব্যস্ত। আজ পরমেশ দাদার চেম্বারে আসব বলে বের হয়েছি, নীচে নামতেই দেখি যে ঘরের দরজা আগের দিন চেষ্টা করেও খুলতে পারিনি সেই ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ভিতর বিলকুল খালি। কেউ নেই।'

বৃন্দাবনবাবু থামতেই পরমেশবাবু বললেন, 'আর চিন্তা নেই বৃন্দাবনবাবু। রাইমণি গত রাতেই বিদায় হয়ে গেছে। তবু রাজি থাকেন তো দিন দেখে ঘরে একটা স্বস্ত্যয়ন করে দেব।'

'আর একটা ব্যাপার হয়েছে ঠাকুর মহারাজ?'

'কী?' সূরজরাজের কথায় পরমেশবাবু বললেন।

'আজ সকালেই খবরটা পেলাম। খারাপ হয়ে গেল মনটা। গতরাতে সরায়মোহন শ্মশানের ডোম বিরজুরাজ রাইমণির শিকার হয়েছে। পরিচিত কাছের মানুষ। গতকাল একবার ভেবেওছিলাম, দেখা করতে যাব। হল না আর। বেচারা রাতে কোনো কাজে বাইরে বের হয়েছিল হয়তো। রাইমণি সেই সময় তাকে কব্জা করে রক্ত চুষে খেয়ে গেছে। রক্তহীন দেহ বিলকুল অস্থিচর্মসার কাঠ! বিরজুরাজ সরায়মোহন শ্মশানে ডোমদের সর্দার। বেজায় ভালো মানুষ ছিল। তার এমন দশা ভাবতেই পারছি না!'

কথা শেষ করে সূরজরাজ আক্ষেপে কপাল চাপড়াল। পরমেশবাবু সামান্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'অনুমান তাহলে ঠিকই আছে আমার। রাইমণি এখান থেকে গত রাতেই বিদায় হয়ে গেছে। যে দরকারে ও বেনারসে এসেছিল, তা পূর্ণ হতে এখানে আর পড়ে থাকতে চায়নি।'

'কী দরকারে?' পরমেশবাবু থামতেই একসঙ্গে অন্য দু'জনের প্রশ্ন।

'সেটা জানা ছিল না বলেই গতকাল পর্যন্ত সবকিছু ধোঁয়াশা ছিল। গত রাতের ঘটনার পর আজ সকালে কলকাতায় কয়েকজনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলাম। তাতেই পরিষ্কার হল ব্যাপারটা। মাস কয়েক আগে রাইমণি হানা দিয়েছিল সুন্দরবনের এক ট্যুরিস্ট লঞ্চে। সেখানে এক বাউলের মন্ত্রপূত হেঁতালবাড়ির আঘাতে আহত হবার কারণে নিজের পুরনো ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিল। সেটা ফিরে পাবার জন্যই তার এই দফায় এখানে আগমন। জানত, বেনারসের সুপ্রাচীন শ্মশানে যারা বংশানুক্রমে দাহকাজ করে তাদের মধ্যে উপযুক্ত লক্ষণযুক্ত কারো তাজা রক্ত দিয়ে আকণ্ঠ উদরপূর্তি করতে পারলেই ফিরে পাবে আগের শক্তি। বেনারসে এসে সেই লক্ষণ খুঁজে পেয়েছিল সূরজরাজের মধ্যে। সেই ছিল তার প্রথম টার্গেট। তা যখন হল না, নজর, উপযুক্ত লক্ষণযুক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি সরায়মোহন শ্মশানের বিরজুরাজের দিকে। তারপর উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে বেনারস ছেড়ে বিদেয় হয়ে গেছে সেই রাতেই।'

কথা শেষ করে পরমেশবাবু থামলেন। হাঁ করে শুনছিল সূরজরাজ। দুই চোখে রীতিমতো ভয়ের ছায়া। তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠাকুর মহারাজ, সেই কারণেই কি সেদিন সকালে ডাক পড়েছিল আমার?'

'একদম তাই।' পরমেশবাবু বললেন, 'বুঝতেই পারছ, সেদিন বৃন্দাবনবাবুর স্ত্রীর শরীরে ভর করেছিল রাইমণি। যে মতলব করেছিল, তাতে সবার চোখের সামনেই তোমার শিকার হয়ে যাবার কথা। উপস্থিত কারো ক্ষমতা হত না বাধা দেবার। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'কিন্তু কপাল জোরে সেদিন চিতার কাঠের আগুনে সদ্য রান্না খেয়ে বের হবার কারণে রাইমণি পারেনি। তোমাকে দেখেই বুঝেছিল, সেই চেষ্টা করতে গেলে তোমার পালটা আঘাতে উলটে বিপদ হতে পারে তারই। তাই ক্ষেপে উঠে ভাগিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটাও পারেনি। বরং তোমাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে ভয়ে নিজেই সরে পড়েছিল। একই ঘটনা ঘটেছিল আগের দিন দশাশ্বমেধ ঘাটেও। সেদিনও তুমি বাড়ি থেকে সদ্য খেয়ে বের হয়েছিলে।' ❖

নিবন্ধ

খেলা চলুক

'জাদুকর' পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

ছাত্র হিসেবে স্বীকার করছি আমি ছিলাম প্রচণ্ড ফাঁকিবাজ। কিন্তু সেজন্য আমি কখনো নিজেকে দোষারোপ করি না। কারণ লেখাপড়া করতে মানে নতুন কিছু শিখতে আমি খুব ভালোবাসি। শুধু আমি কেন, আমার মনে হয় পৃথিবীর সবকটা মানুষই নতুন কিছু জানতে বা শিখতে খুবই আগ্রহী। তাহলে লেখাপড়ায় এত ফাঁকিবাজি হয় কেন? হবার তো কথা নয়! সেটাও তো এক জানার জিনিস।

আমার মনে হয় ধরে-বেঁধে, তারপর পরীক্ষা নিয়ে পাশ-ফেল করা বা লেখাপড়া বুঝিয়ে বলা ইত্যাদির মধ্যে একটা জোরজবরদস্তি আর বুদ্ধির বিচারের সম্মান-অসম্মান করার ব্যাপারটা জড়িয়ে থাকায়—সামাজিক কারণে আমরা ফাঁকি দিই। আগের থেকেই বলে রাখছি, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে অপমান করা বা কোনো নেতা, মাস্টারমশাইকে হেয় করার উদ্দেশ্য বা বাসনা বা ক্ষমতা আমার নেই। আমি আমার দেশকে ভালোবাসি, মানুষজনকে কোনো না কোনো ভাবে আত্মীয় বলেই মানি। কোনো ভারতীয় কোনো কিছুতে জিতলে আমার আনন্দে বুক ফুলে যায়। একইভাবে হেরে গেলে বা ক্ষতি হলে বেদনা অনুভব করি। সেজন্য আমার মতামতটা প্রকাশ করছি। হয়তো আমার মতটা সম্পূর্ণ ভুল বা অনর্থক কথা; তাহলে দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। এবং হাজারো আওয়াজের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বলে এটাকে এড়িয়ে যাবেন। আমার কল্পনাজাত রূপকথা, না হয় নাই বা শুনলেন। আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু আমার মনে হয়, এই রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই পরিস্থিতি পরিবর্তন বা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। রাজনীতি চলুক তার নিজের পথে। লেখাপড়া বা শিক্ষার ব্যাপারটা চলুক—তার নিজের পথ ধরে। এ যেন ওকে কাটাকুটি বা স্পর্শ না করে।

আমি নিজে মোটেই গণিতজ্ঞ নই। আমি জাদুকর। কিন্তু জাদুর অদৃশ্য হাত তো পৃথিবীর সব জিনিসের হাতের সঙ্গে বিভিন্নভাবে হ্যান্ডশেক করে আছে। সেজন্য ম্যাজিক করতে গিয়ে অনেক ধরনের বইও পড়তে হয়েছে। বিভিন্ন বইয়ের মধ্যে আমি মজার বা নতুন কিছু পেলেই সেগুলোকে একত্র করি।

আজ সময় বিশেষে নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ভেবে আপনাদের কাছে প্রকাশ করি। আমাদের কলেজের প্রিয় অধ্যাপক শ্রী জে. এন. দাশগুপ্তর কথা খুব মনে পড়ছে। আমার অঙ্কের আতঙ্ক তিনিই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। আর শুধু তা নয়—একটা বিরাট মানসিক জটও তিনি খুলে দিয়েছিলেন। আমি আশুতোষ কলেজের ছাত্র। বাবা নিজে এসে আমাকে এই কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন সব কলেজই এক, কিন্তু এখানে তুমি ঘরোয়া পরিবেশ পাবে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে পারবে। আর ছাত্ররা সবাই তোমার মতোই সমান ফাঁকিবাজ। সুতরাং নিঃসঙ্গ লাগবে না। সত্যিই তাই। কেমিস্ট্রির অধ্যাপক দেবতুল্য মানুষ। সুনীল সিদ্ধান্ত। আস্তে আস্তে কথা বলেন। তাড়াহুড়ো সেই। ভালো নাটক করেন। কবিতা লেখেন—এবং খুব গল্প করেন। গল্প করতে করতে কেমিস্ট্রির ক্লাস নিতেন। পড়ছি বলে মনেই হত না। ভয় পেতাম 'অঙ্ক' সাবজেক্টটাকে। উরি ব্বাপরে বাপ! এক্স-এর ভ্যালু জিরো হতে হতেও হয়নি। টেন্ডিং টুয়ার্ডস জিরো। আরে বাব্বা ঝেড়ে কাসুন। স্যারের চেহারা দেখলে মনে হবে—নিশ্চয়ই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার মেধাবী ছাত্র ছিলেন। আর সাবজেক্ট ছিল—বাংলায় এম.এ.। ধুতির ওপর ফতুয়া। পায়ে খয়েরি ক্যাম্বিসের জুতো। ছোটো ছোটো করে ছাঁটা চুল। হাইটে আমার থেকে ইঞ্চিখানেক কম হবেন। তিনি আমাদের ক্যালকুলাস
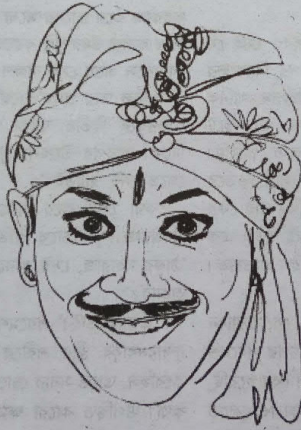
পড়াতেন। একদিন মনে আছে ক্লাসে একটু ফাঁক পেয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম—"এই সমস্ত জট পাকানো অঙ্ক কি ব্যক্তিগত জীবনে বা বেঁচে থাকতে গেলে কখনো কাজে লাগবে? এগুলো তো শুধু প্রফেসর হতে গেলে প্রয়োজন পড়ে। অঙ্কের বই লিখতে গেলে বা বৈজ্ঞানিক হতে গেলে লাগবে। আমাদের মতো সাধারণ ছাত্রদেরকে শুধু শুধু এই কঠিন ব্যাপারগুলোতে ডুবিয়ে প্রশ্ন করে আতঙ্কের সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কী? এ তো লেখাপড়া নয়, র‍্যাগিং।"

মনে আছে, উনি নির্বিকার হাসি হেসে বলেছিলেন—বাঃ, তোমার স্বাস্থ্য তো খুব সুন্দর! তুমি কি এক্সারসাইজ করো?

কী কথার কী উত্তর! আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। বলি, "হ্যাঁ সকালে উঠে আমি উঠ-বোস করি। আর বুক ডন দিই।"

স্যার নির্বিকার ভাবে বলেন—কতবার বুক ডন দ্যাও?

সবাই হেসে ওঠে। আমি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলি, "তা পঁচিশ-তিরিশবার।"

তখন স্যার একটু কাছে এসে বললেন—ক্লাসে আসবার সময় বাসে বা ট্রামে কি বুক ডন মারতে হয়? সারাদিনে কোথায় বুক ডনটা তোমার মারতে হয়। মারতে লাগে না। কিন্তু শরীরটা তোমার ফিট থাকে। সেজন্য যে কোনো ভিড়ে ভয় পাও না। ঠিক নিজের রাস্তা করে নিয়ে এগিয়ে যাও। শরীরের ব্যায়ামের মতোই এই অঙ্কগুলো সূক্ষ্মচিন্তার ব্যায়ামও বলতে পারো। মনগড়া কঠিন সমস্যাকে সমাধান করার ব্যাপারটা রপ্ত থাকলে জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান করতে বা সঠিক উত্তরটা বের করতে এই অভ্যাস সাহায্য করবে। অঙ্ক তো তর্কশাস্ত্রেরই চূড়ান্ত রূপ।"

সত্যি কথা বলতে কি, ওনার মুখে এই কথা শোনার পর থেকে অঙ্ক সাবজেক্টটার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেছে। স্যারকে যেন দেবতা মনে হতে শুরু হল। অনেককেই আমি প্রশ্নটা করেছিলাম, কিন্তু এত সহজভাবে কেউই আমায় বোঝাতে পারেননি।

আমার জীবনে যত ঘাটতি আছে, যে যে জিনিস আমার জানবার কথা, কিন্তু জানতে পারিনি—সেগুলোর জন্য আমি এখন খুব কষ্ট পাই। ইশ্ এটা আমি জানি না, কিন্তু ও জানে! না, না, লেখাপড়ার কোনো মুখস্থ-টুখস্থর কথা বলছি না। বলছি আরো দরকারি জিনিসের কথা। চলার পথে, জীবনে এগোবার পথে যা যা আমার জানা দরকার তার অ-নে-ক কিছুই আমি জানি না। বাবর কত সালে জন্মেছিলেন বা আকবরের কবে দাঁত ব্যথা হয়েছিল। সেই তারিখটা জানতে আমার বয়ে গেছে। কিন্তু বাবর একটা বাচ্চা ছেলের মতো বয়সে রাজা হয়ে কম সৈন্য নিয়ে আমাদের দেশ, ভারতবর্ষ ওরাই বলত, হিন্দুস্তানকে জয় করে ভারতের অধিশ্বর হয়ে বসলেন। কী কী ভুল ছিল কেন আমরা সেই যুদ্ধে জিততে পারলাম না, সেটা জানা দরকার। সেই ভুলটা আমাদের শোধরাতে হবে। আমাকে সেই ভুলগুলোর কথা বলেননি, বই-এ সে কাহিনি লেখা নেই। স্যারেরাও উল্লেখ করেননি। এইভাবে আমরা শুধু মুখস্থ করে করে পাশ করেছি কিন্তু আসল ব্যাপারটা জানিনি। দেশপ্রেম জাগেনি। যেন অন্যের কথা, নিজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই।

আচ্ছা, যদি এরকম হত। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি আরো কিছু সাবজেক্ট, বই-এ না পড়ে সিনেমায় গল্প করে বানিয়ে শেখানো হয়। তারপর হত সে সম্পর্কে আলোচনা। তাহলে কি কেউ আর ক্লাসে ফাঁক দিত? তারপর কোনো পরীক্ষা টরীক্ষা নেই। শুধু সিনেমাটা দেখো আর কী দেখলে সেটা বল। ব্যাস, গল্পটা বলতে পারলেই পাশ। তাহলে কি কেউ আর স্কুলে না এসে পারত? বাসন মাজা থেকে শুরু করে ক্লাসরুম ঝাঁট দেওয়া, বাথরুম পরিষ্কার রাখা, বাগানে নিজের দায়িত্বে কিছু গাছ যত্ন করা; জল সংরক্ষণের জন্য সঠিকভাবে জল নষ্ট না করে, বালতিতে জল নিয়ে স্নান করা—এরকম অনেক কিছুর ক্লাস যদি পড়াশোনায় থাকত, তাহলে বাড়ির অন্দরমহল থেকে, ঘরোয়া শান্তি, মনুষ্যত্ব-এ সবের উন্নতি ঘটত। বাড়িতে মায়েরা যে চোখের আড়ালে কতো কাজ করেন। সেটা না বুঝলে সংসার তৈরি করবে কীভাবে? এই জন্যই তো পারিবারিক বন্ধন একদম ঢিলে হয়ে গেছে। ভেঙে গেছে গুরুজনের কনসেপ্টটা।
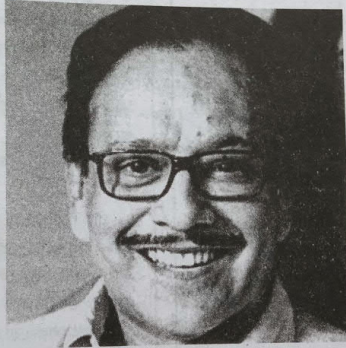
এভাবে ক্লাস নিলে প্রতিটি ছাত্র বা ছাত্রী, এক-একজন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি হত। চলন্ত ডিক্শনারি নয়। প্রতিটি সংসার সুখের সংসার হত। এই তো সেদিন, মানে আমি যখন স্কুলে পড়তাম। তখন দুর্গাপুজোর দশমীর পর পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে আমরা ছেলেরা দল বেঁধে অন্যের বাড়িতে প্রণাম করতে যেতাম। কোলাকুলি করতাম। তারপর কখন যেন রেওয়াজটা উঠে গেল।

আমরা কেমন পালটে গেলাম। বিকেল বলে কিছু নেই। দুপুর পেরিয়ে গেলেই রাত। না আছে কোনো খেলার সময়, না আছে কোনো অবসর।

আমাদের এই পূর্বালোকের পাড়াটা খুব নিরিবিলি। কোনো হইহট্টগোল নেই। সেদিন বিকেলে দেখি বাড়ির বাইরে খুব চেঁচামেচি হচ্ছে। না ঝগড়াঝাঁটি নয়। অতি উল্লাসের বহিঃপ্রকাশ। একটু পরে দেখি পাশের বাড়ির লোকেরা এসে তাদের খুব ধমকাচ্ছে। চিল্লামিল্লি বন্ধ করতে বলছে। দু-পক্ষের এই নিয়ে তর্ক চলছে।

ব্যাপারটা কী? শুনলাম অন্য পাড়ার ছেলেরা এসে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে। থান ইট সাজিয়ে হয়েছে উইকেট। আর এপাড়া-ওপাড়ার অচেনা ছেলেরা হচ্ছে দুটো দল। ওরাই চাঁদা তুলে ব্যাট আর ডিউজ বল কিনে খেলছে। কেউই বাচ্চা নয়, তবে বয়সটা হচ্ছে স্কুল ছেড়ে কলেজে সবে ঢোকার বয়স। ওরা এত জোরে চেঁচিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করছে, যে ঝগড়াঝাঁটির মতোই শোনাচ্ছে। একটা ছেলে বলছে—"এটা আমার পাড়া নয় মানে? এটা পাবলিকের রাস্তা। সব রাস্তাই পাবলিকের। আপনি তো আপনার বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মালিক। আমরা তো সেখানে ঢুকছি না।"...ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু।

আমি ওদের মধ্যে গিয়ে "জেনেশুনে বিষ করেছি পান।"

পাড়ার সবাইকে আমি হাতজোড় করে বলি—"খেলুক না ওরা। কিছুক্ষণের তো ব্যাপার। খুব বেশি হলে একঘণ্টা। এই একটা ঘণ্টা কিছু লোক আনন্দ করছে—খেলছে। খেলুক না। কোথাও খেলার মাঠ নেই। অনেকদিন পর ঝগড়াবিহীন উল্লাস দেখছি। আমার তো খুব ভালো লাগছে...।"

দুপক্ষই ঠান্ডা হয়। প্রতিবেশী একজন বলেন—"আপনি এদের উস্কানি দিচ্ছেন। পাড়ার শান্তি নষ্ট করছেন...।" আমি ভদ্রলোককে চিনি না, তবে ওনার মুখোশের ভেতর সত্যিকারের মানুষটাকে চিনি। বললাম—"ব্যাটিং করবেন না কি বোলিং?"

—তার মানে?

আমি ওই ছেলেদের হাত থেকে ব্যাটটা চেয়ে নিয়ে ওনাকে ধরিয়ে দিয়ে বলি, "আমি বোলিং করছি। দেখি আপনি ছক্কা মারতে পারেন কিনা!"

ভদ্রলোক হেসে ফেলেন। আমরা সব্বাই হেসে ফেলি। ছেলেরা হই হই করে হেসে হাততালি দিতে আরম্ভ করে। ভদ্রলোক বললেন—"কিছু বলার নেই! না খেলেই আমাকে একেবারে বোল্ড আউট করে দিলেন?" খেলা বন্ধ হয়ে গেল। সবাই না খেলেই জিতে গেলাম। ওরা আর কোনো দিনও খেলতে আসেনি, পাড়াটা খাঁ খাঁ করছে।❖

দানবীর

ঋতা বসু

ছবি : অমল ভট্টাচার্য

পিন্টুমামা আজ প্রথম থেকেই ভারী আড্ডার মুডে। এসেই সোফায় পা মুড়ে বসে কোনোরকম ভণিতা ছাড়াই বলল—এখন আর এইরকম লোকেদের দেখাই যায় না।

কীরকম লোক তারা ভালো না খারাপ জিজ্ঞেস করব কিনা বুঝতে পারলাম না। অনেক সময় আমাদের কৌতূহল মামার মুড খারাপ করে দেয়। আবার একেবারে চুপচাপ বসে থাকা ভালো হবে কিনা ভাবতে ভাবতেই মামা রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা মুছে বলল—বাপরে বাপ, সারা দুনিয়াটা যেন ভূতে তাড়া খাওয়া লোকের মতো ছুটে চলেছে। আমাদের ছোটোবেলাটা কিন্তু এমন ছিল না। সবাই বেশ দুলকি চালে চলত। আমাদের বাগবাজার পাড়াতে কিন্তু এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই একজন-দুজন এইরকম লোক থাকত যারা বিশেষ কিছু করে না। হাতে অঢেল সময়। আজ তারা কোথায়—পিন্টুমামা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

মা বলল—আমিও ছোটোবেলায় দু-চারজন ওরকম লোক দেখেছি। তারা সবার ফাইফরমাশ খেটে দিত।

—হ্যাঁ ঠিক বলেছ। তারা বাই ডিফল্ট সব বেকার হত কিন্তু তারা এক একজন যে কী গুণী ছিল বলে বোঝানো যায় না। আমার এক কাকার মার্বেলের এমন টিপ ছিল যে আজকের দিন হলে তার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে যেত। সারাদিন পকেট ভরতি মার্বেল নিয়ে ঘুরতেন। একটা ঠিকমতো জায়গা আর দর্শক পেলেই শুরু হয়ে যেত কেরামতি।

আর এক দাদা স্কুল পালিয়ে টো টো করে ঘুরত। এখন যেমন মিছিমিছি স্কুল কামাই করা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, তখন অবশ্য ততটা কড়াকড়ি ছিল না। বিশেষ করে যেখানে অনেক ভাই-বোন আর কর্তা-গিন্নিরা বিরাট সংসার সামলাতে হাবুডুবু খাচ্ছে সেখানে দাঁতব্যথা পেটব্যথা বলে হরদম স্কুল কামাই করার ঘটনা আকছার ঘটত। এখন তোদের পরীক্ষার যা ছিরি ফেল করাই শক্ত। তখন কিন্তু লোকেরা বেশ ফেল-টেল করত। আমাদের এক ভাই ছিল এই দলে। বকাবকি করলে বলত ক্লাসের পড়া অনেক চেষ্টা করেও কিছুই নাকি মনে রাখতে পারে না। এদিকে বিরাট অগোছালো বাড়ির কোন ঘরের কোন তাকে কোন বই নির্ভুল বলে দিত। আমরা পরীক্ষার খাতায় কবে কত নম্বর পেয়েছি তা-ও। হারিয়ে যাওয়া তাস, লুডোর পাটি সে সবও কোথায় থাকতে পারে আন্দাজ করে বার করে ফেলত। মা-জেঠিমারা নীলুকে হরদম ডাকাডাকি করত—দেখ তো বাবা কোথায় গেল আমার চাবির গোছাটা—

—বাঁ হাতে দশটাকার নোটটা যে কোথায় রাখলাম—ও নীলু—।

নীলু বলত—হুঁঃ যেন ডান হাতে রাখলেই মনে থাকত? তোমাদের বিদ্যে আমার জানা আছে।

লাঠি, চশমা এমনকী দাঁতের পাটি পর্যন্ত খুঁজে দিতে হত নীলুকে। এইরকম মুশকিল আসান লোকজন চাকরি করে কি না,

ইস্কুল যায় কিনা এইসব অদরকারি প্রশ্ন কেউ করত না। নীলু পরে নামকরা সমাজসেবী হয়েছিল।

কিন্তু হাঁদাবাবুর ব্যাপারটা ছিল একদম আলাদা। এইরকম একটা বেকার নিষ্কর্মা লোক তখনকার দিনেও খুব একটা দেখা যেত না। হাঁদাবাবুর ঠাকুরদা কাটা কাপড়ের ব্যাবসায় বেশ দু-পয়সা করেছিলেন। তারপর থেকে তাঁদের বংশে কাজ না করাটাই রেওয়াজ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ি আর ওঁদের বাড়ি একেবারে মুখোমুখি। হাঁদাবাবু সুন্দর সুপুরুষ মানুষ ছিলেন কিন্তু হাইটটা কত বুঝতে পারতাম না কারণ সবসময়ই হরিজন্টাল পোজে রাস্তা দেখে চলেছে। তোরা নাদা পেট মাথায় হাত দিয়ে এককাত শোয়া গণেশ দেখেছিস তো? একদম সেই পোজ। বাড়িটার সদর দরজা জুড়ে সারাক্ষণ আধশোয়া। পাড়ার আরও কটা বাড়িতে কাজ করা ক্ষান্তবুড়ি একতলার একখানি ঘরে থাকত। ঝাঁটপাট দিয়ে পাঁচবাড়ির কাজ সেরে ফিরে এসে সে-ই একটু ঝোলভাত রেঁধে দিত। হাঁদাবাবুর দিন কাটত নিষ্কর্মা সদরে শুয়ে বসে। কাজ ছিল শুধু বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যাওয়া লোকজনের সঙ্গে কখনও-সখনও একটু হাসি, একটা-দুটো শব্দ—ব্যাস তার বেশি না। বারোমাস ধুতিটা লুঙ্গির মতো করে পরা, শীতকালে একটা চেককাটা ফতুয়া নয়তো সবসময় খালি গা।

সবাই বলত হাঁদাবাবুর হাসিতেও কড়া হিসেব।

হিসেব তো করতেই হবে। কথায় বলে বসে খেলে কুবেরের ধনও ফুরোয়। দু-পুরুষ বেকার বসে থাকলে টাকাপয়সা আসবে কোত্থেকে? একতলার পড়ে থাকা ঘর ভাড়া নিতে চাইত কেউ। হাঁদাবাবু ঝামেলার ভয়ে তাতেও রাজি হয়নি। তখন আমাদের বাড়ির গলিটাও ছিল হাঁদাবাবুরই মতো। চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে পড়ে ঝিমোচ্ছে। এই গলিগুলোর একটা বিশেষ চরিত্র ছিল। সকালে-সন্ধেতে ফেরিওয়ালা ডেকে যেত। স্কুল ও অফিস টাইমে দু-চারটে চেনা মুখ হেলতে-দুলতে চলেছে। তাড়া নেই কারও। এবাড়ি-ওবাড়ির জানালা বা ছাদ থেকে গল্পগাছা চলত আর যে বাড়িতে রক থাকত সেখানে আড্ডা জমাত বুড়োর দল। বটগাছের শিকড়ের মতো ছড়ানো গোলোকধাঁধার মতো আমাদের গলিটার অনেকগুলো মুখ থাকার ফলে কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে চলে যাওয়া যেত। এর সঙ্গে তুলনা করা যায় একমাত্র কাশীর গলির।

এখন অবশ্য একটু বদলে গিয়েছে। অজস্র কেজো লোকের ভিড়ে রাস্তাটাও ব্যস্ত সবসময়।

ও কী ঝন্টে, হাই চাপছিস কেন? আমি তা হলে উঠি। সত্যিই তো শুরু হওয়া মাত্র গায়ে কাঁটা না দিলে আর গল্প কী?

পিন্টুমামা ব্যাগের দিকে হাত বাড়াতেই মা আর তুলি আমাকে এই মারে তো সেই মারে। মা বলল—ওর ভালো না লাগলে শুনবে না। তুমি আমাদের বল।

আমি বললাম—বা রে ভালো লাগছে বলেই তো ঝিমন্ত গলির সঙ্গে মিলিয়ে হাই উঠল।

যে কোনো কারণেই হোক পিন্টুমামার মুডটা ভালোই ছিল বলে গল্প আবার শুরু হল।

তারপর শোন কী হল। একদিন ওই নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট গলিতে এক কাণ্ড হল—সেই রহস্যের সমাধান কিন্তু আজও হয়নি। সেটা ছিল গরমের দুপুর। একটা ছেলে এক দৌড়ে গলিতে ঢুকে এল। সে কে, চেহারা, বয়স জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না কারণ ঘটনাটা আমরা কেউই দেখিনি। তাছাড়া আমি খুবই ছোটো ছিলাম। সবার মুখে শুনে শুনে যে ছবিটা পেয়েছি তোদের সেটাই বলছি।

সেদিন রাস্তায় কুকুর-বেড়াল পর্যন্ত নেই, হাঁদাবাবু যথারীতি গণেশ পোজে। হঠাৎ সামনে দিয়ে যে ছেলেটা দৌড়ে গেল, তার গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। বোঝা যাচ্ছে ভালোই আহত তবু সে এমনভাবে দৌড়চ্ছে যেন পেছনে যমদূত তাড়া করে আসছে।

ছেলেটা চলে যাবার পর দম ফেলতে না ফেলতে ধর ধর করে পেছনে দৌড়ে গেল আরও তিন-চারটে ছেলে। সিনেমার মতো হাঁদাবাবুর চোখের সামনেই ঘটে গেল সবটা। তবে হাঁদাবাবু সাধু-সন্ন্যাসীর মতোই নির্বিকার বলে তিনি নাকি শুধু আধশোয়া থেকে উঠে বসেছিলেন।

পেছনে দৌড়ে যাওয়া দলটা খানিকটা বাদে ফিরে এসে হাঁদাবাবুকে চেপে ধরেছিল। এদিকে হই-হট্টগোলে দু-চারটে কৌতূহলী লোকজনও বেরিয়ে এসেছে। জানা গেল একটা চোর তাদের কী একটা দামি জিনিস নিয়ে পালাচ্ছিল। বড়ো রাস্তায় গাড়ির ধাক্কায় চাপা পড়েছে। তাকে সার্চ করে কিছু পাওয়া যায়নি। পরে বড়োরা নাকি খবর এনেছে কেউ চাপা-টাপা পড়েনি। তবে একজন বলল একটা অজ্ঞান লোককে ট্যাক্সিতে তুলে কারা নাকি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

এদের কথা থেকে কোনটা সত্যি বোঝা গেল না। সে যাই হোক লোকগুলো পড়ল হাঁদাবাবুকে নিয়ে কারণ একমাত্র হাঁদাবাবু ছাড়া গলিতে আর লোক ছিল না। চাপা পড়ার বা অদৃশ্য হবার আগে ছেলেটির সঙ্গে হাঁদাবাবু ছাড়া আর কারোর দেখা হয়নি। সে হাঁদাবাবুকে কিছু বলেছে বা দিয়েছে নাকি সেটাই তারা নানাভাবে বার করার চেষ্টা করছিল। প্রথমে নরম করে অনুনয়-বিনয়, শেষটায় রীতিমতো শাসানি, ভয় দেখানো পর্যন্ত হল কিন্তু নতুন কথা কিছু জানা গেল না।

হাঁদাবাবু বেশি কথার মানুষ নয়। মাথাটাকেই কষ্ট করে নাড়িয়ে ক্রমাগত না বলে গেল। হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মতো করে লোকজন তাড়িয়ে সে আধশোয়া হবার জন্য অস্থির।

একটা ব্যাপারে সবাই আশ্চর্য হল—লোকগুলো এত কথা বলল কিন্তু কিছুতেই খোলসা করল না কী জিনিস চুরি হয়েছে, কেই বা সেটা করেছে। তারাও নাকি জানে না। শুধু জানে খুব দামি জিনিস। মালিকের হুকুমে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে।

সেদিনের নাটক তো শেষ হল কিন্তু এরপর থেকে আমাদের গলিতে নানা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল।

তুলি বলল—হাঁদাবাবুর বাড়িতে ডাকাতি হল?

পিন্টুমামা চুপ করে আছে দেখে হরিপদদা বলল—হাঁদাবাবু খুন হয়ে গেল তাই না মামাবাবু?

পিন্টুমামা ধীরেসুস্থে এক খিলি পান মুখে পুরে বলল—হঠাৎ একদিন সবাই দেখল হাঁদাবাবুর পাশে বেশ সুন্দরী এক মহিলা।

তিনিই বেশি কথা বলছেন। হাঁদাবাবু গণেশ পোজ ছেড়ে পাশে বসে। যথারীতি মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়ছে।

সবার কী কৌতূহল! এমন একখানা ব্যাপারের আদ্যোপান্ত না জানলেই নয়। বেশ সিনেমার মতো ঘটনাটা—ওই মহিলা নাকি হাঁদাবাবুর সামনেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। পা মচকে গিয়ে উঠতে আর পারে না। হাঁদাবাবু শুয়ে শুয়ে রগড়টা দেখছিল। শেষে মহিলা কঁকিয়ে কেঁদে যখন সাহায্যের জন্য হাত বাড়াল তখন বাধ্য হয়েই হাঁদাবাবু উঠে এসেছিল। হাত ধরে তুলে এনে বাধ্য হয়েছে পাশে বসার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে।

এরপর মহিলা প্রায়ই আসতে লাগলেন। নাকি পুরোনো পাড়ার বাড়িঘর নিয়ে পড়াশোনা কাজকর্ম। তিনি হাঁদাবাবুর মধ্যে যে কী দেখলেন! মেনকার নাচ দেখে বিশ্বামিত্র মুনিরও তপোভঙ্গ হয়েছিল। আর এ তো তুচ্ছ মানুষ।

আমরা দেখি মহিলা আসে-যায়। কিছুদিন পরে শুনলাম হাঁদাবাবুর সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে। মহিলার তরফে দু-তিনজন মেয়ে-পুরুষ এসে কথাও বলে গেল। হাঁদাবাবুকে সেদিন প্রথম সবাই পাঞ্জাবি পরতে দেখল। সবাই বেশ উত্তেজিত। কনে নিজে থেকে হেঁটে চলে এল এমন ঘটনা তো দেখা যায় না। হাঁদাবাবুর গায়ে ফতুয়া। সবসময় ভার্টিকাল। সমানে লোকজন আসছে যাচ্ছে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল হাঁদাবাবু খালি গায়ে সেই পুরোনো গণেশ পোজে। কী ব্যাপার না বিয়ে হচ্ছে না। তখন ছোটো বলেই বোধহয় নতুন বউয়ের ব্যাপারটা বেশ মজার লাগত। হাঁদাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—বিয়ে করলে না কেন? বেশ মজা হত। একটা বউ পেতে।

হাঁদাবাবু বলল—আমিও তো তাই ভেবেছিলাম। বলেছিল, ভালো ভালো রান্না করবে। ঘরদোর গুছিয়ে রাখবে। অসুখ হলে জলপটি দেবে। আরও অনেক কিছু।

—তাহলে? করলে না কেন?

—সব যখন ঠিকঠাক তখন বলে বিয়েতে খরচ কত করবে? গয়না, শাড়ি, প্রণামী, আরও হাবিজাবি একগাদা টাকার হিসেব দিল। আমি বললাম দামি শাড়ি-গয়নার দরকার কী? ও তো বাক্সেই বন্ধ থাকবে। আর ভূতভোজনের জন্য খরচ করার মতো টাকা নেই আমার। কিন্তু তারা শোনে না। টাকার জন্য ঝুলোঝুলি। দরকার কি ধারদেনা করে অত দামি বউ নিয়ে আসার? দিলাম বিয়ে ভেঙে। আমার ক্ষান্তবুড়িই ভালো। রান্নাটা যদিও জানে না তবু শুধু ভালোমন্দ খাওয়ার লোভে কি কাবলিওলার কাছে টাকা ধার নিয়ে বউ আনা উচিত তোমরাই বল?

সত্যিই তো অকাট্য যুক্তি। মা-জেঠিমারাও নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। অত কায়দার মেয়ে এ পাড়াতে মানাতও না—এটাই সবাই বলাবলি করল।

হঠাৎ একদিন এল ক্ষান্ত মাসির মরে যাওয়া বোনের ছেলে। সেই ছেলে মাসির কাছে এসে হাজির। কি না কলকাতায় থেকে কাজ খুঁজবে। হাঁদাবাবুর আপত্তি ছিল না কিন্তু বেঁকে বসল ক্ষান্ত নিজে। আমাদের বাড়ির সামনেই গজল্লা হত বলে সবই কানে আসত।

"ভোঁদাবাবু ইস্কুল...দিয়ে যেও"

ক্ষান্ত বলত—কবে সেই বোন মরে ভূত। তার মুখটাই মনে পড়ে না। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকল এখন এলেন তার ছেলে। না, না, আমি এসব ঝামেলা ঘাড়ে নেব না।

শেষমেশ সেই ছেলে পাড়ার মুরুব্বি মানে আমাদের বাপ-জ্যাঠাকে গিয়ে ধরল। তারা হাঁদাবাবুকে বলল—একতলায় অতগুলো ঘর পড়ে আছে। একটায় থেকে দু-মুঠো খেয়ে যদি একটা ছেলের হিল্লে হয়ে যায় মন্দ কী?

হাঁদাবাবু বেশি কথার মানুষ নয়। তবু বেশ খোলসা করেই বলল—আমিও সে কথা বলেছিলাম ক্ষান্তকে। সে কানে নেয় না তো কী করব? বোনপো তো ওর।

ক্ষান্ত দুপুরবেলা মায়েদের পানের আড্ডায় হাত-মুখ নেড়ে বলেছিল—অনেকদিন আগের কথা। তবু আবছা মনে হচ্ছে বোনের যেন মেয়ে হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। পরে কি আবার ছেলে হল? কী জানি মনে নেই। হতে পারে। কোনটি যেন মায়ের দয়া হয়ে মরেও গেল। বোনকেই মনে নেই তো তার ছেলে?

না, না, এসব বড়ো ঝামেলা। কী শাজোয়ান চেহারা দেখেছ? তাছাড়া হাত-পাগুলো শক্ত শক্ত, চোখগুলো নাকের থেকে দূরে, হাঁ-মুখটা এত বড়ো! আমার মন বলছে এ লোক সুবিধের নয়। মন খুঁতখুঁত নিয়ে বাবা বোনপো বলে ঘরে তুলতে পারব না সে তোমরা যতই বল।

বউয়ের পর বোনপোও গেল। হাঁদাবাবুর বাড়িতে কেউই এন্ট্রি পেল না। যে বাড়িটা আর তার মালিককে কেমন রংচটা ম্যাড়ম্যাড়ে মনে হত, কেউ ফিরেও দেখত না; হঠাৎ করে তাদের প্রতি সবাই একটু যেন কৌতূহলী হয়ে পড়ল।

আমার জ্যাঠাকে সবাই একটু মান্যগণ্য করত। তিনিও একদিন হাঁদাবাবুকে বললেন—বাড়িতে কিছু দামি জিনিস যদি থাকে তাহলে আরও সাবধান হওয়া দরকার। শেষে একটা বিপদ-আপদ ঘটে গেলে কী হবে?

হাঁদাবাবু বলল—আপনি পাগল হয়েছেন? আমার কাছে দামি জিনিস বলতে এই বাড়িটা। পারে যদি নিয়ে যাক দরজা-জানালা খুলে।

মোট কথা ক-দিন খুব চর্চা হবার পর কথাটা চাপা পড়ে গেল।

তুলি বলল—অতই যদি দামি জিনিস তাহলে সেই লোকগুলো রাত্রিবেলা এসে চুরি করল না কেন?

তাই শুনে পিন্টুমামার কী হাসি—একদিন গিয়ে দেখে আসিস —এখনও রাত নটার পর আমাদের গলিতে নতুন লোকের ছায়াটা পর্যন্ত পড়তে পায় না। রক্ষীবাহিনীর হাঁকডাকে তারা পাড়া ছেড়ে পালায়। বংশপরম্পরায় তারা একাজ করে চলেছে। তাদের চোখ এড়িয়ে মাছিটি গলবার পর্যন্ত উপায় নেই। আর রাত দশটা পর্যন্ত আমাদের উত্তরের লোকেরা রাস্তাতেই থাকে। তখন টি টাইম—তার সঙ্গে ক্যারম-দাবা-তাস-আড্ডা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কে কাকে কেন তাড়া করেছিল তোমরা জানতে পারনি?

—না । তবে কিছুদিন বাদে একটা ঘটনা ঘটল। আমাদের গলির মুখে বড়ো রাস্তার ওপারে ভারত সেবাশ্রমের একটা খুব ছোটো পুরোনো বাড়ি ছিল। কয়েকটা অনাথ ছেলে সেখানে থাকত। একটা ঘরের মধ্যেই ছিল তাদের ইস্কুল। এইসব ঘটনার পরপরই একদিন স্কুলে যাবার সময়—ওঃ তোদের বলতে ভুলে গিয়েছি আমি যেমন হাঁদাবাবুকে কাকা-মামা না বলে হাঁদাবাবু বলতাম, হাঁদাবাবুও আমাকে ভোদাবাবু বলত।

আমাদের পাড়া তো তোদের মতো সাহেবি নয়। কতরকম ফেরিওয়ালা এখনও আসে। তখন হাতিবাগান বাজার থেকে আসত এক পাখিওলা। হাঁদাবাবু তার থেকে এক কথা-বলা ময়না কিনে আমার হাতে ধরিয়ে বলল—ভোদাবাবু ইস্কুল যাবার পথে এটা সেবাশ্রমে দিয়ে যেও। ছেলেগুলো ভারী মজা পাবে।

আমাদের পাড়া থেকে পুজো দোল হালখাতা এসবের আগে চালডাল জামাকাপড় সংগ্রহ করে দেওয়া হত ওখানে। পাখি এই প্রথম। যাকগে আমি খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চললাম। বড়ো রাস্তায় একটা লোক 'বাঃ বেশ পাখি তো'—বলে খাঁচাটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। অনেক চেষ্টা করেও অবশ্য কথা বলাতে পারল না। বাটি ভর্তি দানাপানি খেতে ব্যস্ত ছিল পাখিটা।

পিন্টুমামা এক ঢোঁক জল খেয়ে মুখ মুছে বসে রইল যেন আর কিছু বলার নেই।

মা বলল—যাঃ রহস্যটার তো কোনো কিনারা হল না।

—হয়ে গেল তো। তখন অবশ্য আমরা কেউই বুঝিনি। হাঁদাবাবু মারা যাবার পর তার বাড়িটা একেবারে খোল-নলচে বদলে বিরাট করে অনাথ আশ্রম, স্কুল এসব হল। টাকার কথাটা জানলাম প্রতিষ্ঠার দিন। হাঁদাবাবু নাকি কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে গিয়েছে এসব করার জন্য।

কখন দিল, কী করে দিল—বাড়িটা ছাড়া তেমন ক্যাশ টাকাও তো ছিল না। তখন আবার সেই কয়েক বছর আগের ঘটনাটা নিয়ে বড়োরা একটু হইচই করল। তারপর ভুলেও গেল। কিন্তু আমাকে তো তোরা জানিস। কোনো কিছুর শেষ না দেখে ছাড়ি না। গেলাম আশ্রমে। খুঁজে বার করলাম সেই সাধুকে, যাঁর হাতে পাখির খাঁচা দিয়েছিলাম। অনেক বুড়ো হয়ে গিয়েছেন তবু আমাকে পরিষ্কার চিনতে পারলেন। বললেন, খুব মনে আছে—তুমি তো খুব বাহাদুর ছিলে। তাই তোমার হাতেই খগেন্দ্র পাখি পাঠিয়েছিল।

—পাখি তো বোমা নয় যে বাহাদুরি লাগবে। আসল ব্যাপারটা কী?

—আচমকা খগেন্দ্রের হাতে সাতরাজার ধন এসে গিয়েছিল। সে ঘটনা তোমরা জানো। আহত ছেলেটি হিরেভর্তি বটুয়া ছুড়ে দিয়ে বলেছিল ছ-মাসের মধ্যে না নিতে এলে যা খুশি করতে। এ জিনিস যে সৎ পথের আমদানি নয় তা তো দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। তারপর নানা উৎপাত—সে তো তোমরা জানো। গলির মধ্যে তারা ঢুকতে পারছিল না ঠিকই কিন্তু তীক্ষ্ম নজর রেখেছিল খগেন্দ্রের প্রতিটা কাজে। তার নিজের আসার তো উপায়ই ছিল না। বাড়িটা তার মৃত্যুর পর আশ্রমের পাওনা বটে কিন্তু সারাই-সুরাই করে কিছু করতে গেলে প্রচুর টাকার দরকার। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পাখির দানাপানির বাটিতে আঠা দিয়ে আটকে হিরেগুলো পাচার করে দিয়েছিল আমাদের কাছে। সেই টাকা দিয়েই হল এত কাজ।

বাবা কখন ঘরে ঢুকেছে খেয়াল করিনি। পিন্টুমামার গল্পের শেষটা শুনে বলল—বাগবাজারের খগেন্দ্র কুমার ধর তাঁর বাড়ি আর বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আশ্রমকে দিয়ে গিয়েছেন কাগজে পড়েছিলাম। এদিকে সারাজীবন নিজে নাকি খালি গায়ে মাটিতে শুয়ে কাটিয়েছেন। সমস্ত জমানো পয়সা দিয়ে গিয়েছেন অনাথ আশ্রমের জন্য। ইনিই তোমাদের হাঁদাবাবু?

—তাহলে আর বলছি কী?

আজ পিন্টুমামা ডালপুরি আলুর দমের তোয়াক্কা না করে ব্যাগ ছাতা গুছিয়ে উঠে পড়তে পড়তে বলল—আজ তাড়া আছে, চলি। বাগবাজার গভর্নমেন্ট স্কুলের সঙ্গে আশ্রমের ছেলেদের হাডুডু ম্যাচ। আমি জাজ। ওখানে আমার আলাদা কদর। পাখির খাঁচাটা আমার হাত ধরেই এসেছিল কি না। ❖

গল্প

ছুটি

সায়ন্তন ঠাকুর

ছবি : প্রণব হাজরা

১
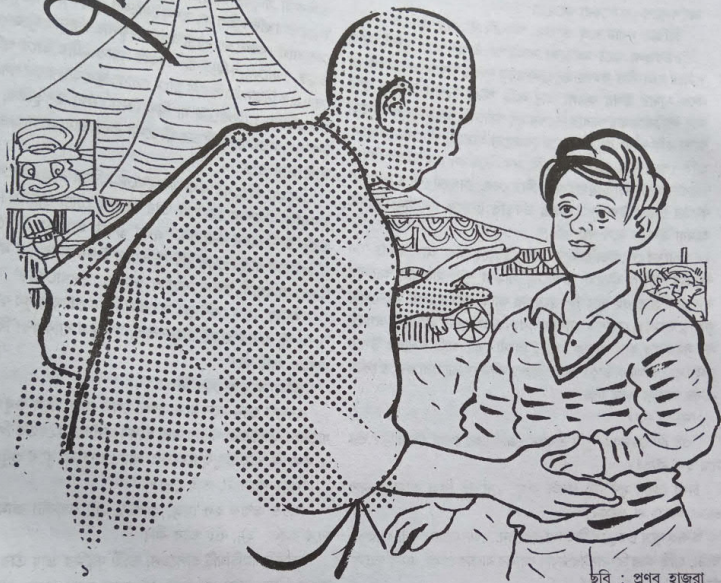
'তোমার নাম কী খোকা? এখন তো সার্কাসের সময় হয়নি, কী করছ এখানে?'

বিস্মিত কিশোরকে তাঁর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে জাদুকর ভবভূতি নরম গলায় আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমন করে কী দেখছ, খোকা?'

লাজুক হেসে বিস্মিত কণ্ঠে রাজু বলল, 'স্টেজে আর এখন আপনাকে তো একইরকম দেখতে!'

ভবভূতির চেহারা অতি সাধারণ, আর পাঁচজন মানুষের মতোই, আলাদা করে চোখে পড়ার কিছু নেই। পরনে ঢোলা পাজামা আর সাদা ফতুয়া, তার উপর একখানি কালো মুগার চাদর চাপিয়েছেন। ন্যাড়া মাথা, দীর্ঘকায় সবল দেহ, মুখে দাড়ি-গোঁফ কিচ্ছু নেই, গায়ের রং মিশিকালো, তবে চোখদুটি অত্যন্ত খর, যেন চৈত্র মাসের রোদ্দুর। চোখে কী যেন একটা আছে, বেশিক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকা যায় না। রাজুর কথায় হা হা শব্দে উঁচু গলায় হেসে উঠলেন জাদুকর, 'বা রে! আলাদা দেখাবে কেন? একটাই তো মানুষ আমি!'

'না, ওই যে সবাই ঝলমলে পোশাক পরে, মুখে রং মেখে জাদুর খেলা দেখায়, আপনি তো করেন না!'

কিশোরের কৌতূহল দেখে মজার গলায় ভবভূতি বললেন, 'তোমার নাম বললে না তো!'

'রাজু, রাজীব দাস। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

অবাক সুরে ভবভূতি শুধোলেন, 'কী কথা?'

'অন্ধকার স্টেজে আপনি যখন একা একা ভূতের খেলা দেখান, তখন ভয় করে না?'

'ভয় করবে কেন খোকা? খেলা দেখাতে যে আমি ভালোবাসি!'

'ওই যে টেবিলের উপর থেকে দেশলাই বাক্স, জলভর্তি কাচের গেলাস, ফুলদানি সব শূন্যে ভাসতে থাকে, তারপর সেই অদৃশ্য গম্ভীর গলা, আচ্ছা, ওটা কি সত্যি ভূতের খেলা? মানে ভূত কি সত্যিই আছে?'

জাদুকর ভবভূতি কিশোর ছেলেটির চোখে সরল বিশ্বাস দেখে মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি দেখেছ আমাদের শো? তা তোমার কী মনে হয়?'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করে রাজু, তারপর দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বলে, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। দু-দিন পরপর খেলা দেখেও তো বুঝতে পারলাম না। অবাক কাণ্ড!'

'আর সেজন্যই বুঝি তুমি এই দুপুর বেলায় সার্কাসের তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাফেরা করো?'

বিস্মিত গলায় রাজু শুধোল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

চড়কতলা মাঠে মহারাজা সার্কাসের তাঁবুটি ভারী সুন্দর, সারা শরীরে লাল-নীল-কমলা-হলুদ কাপড়ের নকশা, মাথার উপরে পতপত করে সাদার উপর কালো জাদু-লাঠি আঁকা নিশান উড়ছে, সেই জাদু-লাঠির মাথায় আবার সাপের মুখ বসানো! তাঁবুর চারপাশ বড়ো বড়ো ছবি-আঁকা কাঠের বোর্ডে সাজানো হয়েছে, কী নেই সেখানে, হাতি-ঘোড়া-বাঘ-জোকারের ছবি, সব মিলে সে এক হইহই বিষয়। চারধারে অনেকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা, সেখানে পেতে রাখা দুটি কাঠের চেয়ার ইশারায় দেখিয়ে ভবভূতি রাজুকে বললেন, 'এসো, আমরা এখানে বসে গল্প করি।'

পৌষের শেষে ভারী মিঠে রোদ্দুর উঠেছে আজ, আকাশ কার যেন বাতাসি শাড়ির আঁচলে সাজানো, সামনে শূন্য মাঠখানি আলোয় ঝলমলে আর ওই দূরে দিগন্তরেখার কাছে মনখারাপের মতন অল্প কুয়াশা জমেছে, সেদিকে তাকিয়ে ভবভূতি বললেন, 'আমাদের এখানে সব সময় খুব কড়া পাহারা থাকে, জানো তো, মাছি গলারও উপায় নেই। তা তোমাকে তাঁবুর আশেপাশে দু-দিন ঘোরাফেরা করতে দেখে নটবর আমায় খবর দিল!'

'নটবর কে?'

'ওই যে জোকার, তুমি এখানে জোকারের খেলা দেখোনি? ওর নাম হল নটবর।'

চাপা হেসে মুখ নীচু করল রাজু, 'দেখেছি কিন্তু আমার ওসব ভালো লাগে না তেমন!'

অবাক সুরে ভবভূতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জোকারের খেলা, তারপর ঘোড়া, হাতি আর রিংমাস্টার নবাব আলির বাঘের খেলা, এসব ভালো লাগে না?'

দু-পাশে ঘাড় নাড়ল রাজু, বছর বারো বয়স হবে, দু-খানি টলটলে চোখ দেখলে ভারী মায়া হয়। গায়ে ইস্কুলের পোশাক, কলার ফাটা সাদা জামা, খয়েরি ফুলহাতা সোয়েটার দু-এক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, ফুলপ্যান্টটিও ধুলোমলিন, ইস্কুল থেকে ফেরার পথেই এখানে এসেছে।

'তাহলে কী ভালো লাগে তোমার?'

দু-এক মুহূর্ত পর ভবভূতির চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট স্বরে রাজু বলল, 'আমার শুধু জাদু দেখতে ভালো লাগে।'

বাচ্চা ছেলেমেয়েদের জাদুর খেলা দেখতে ভালো লাগে, এ-কথা ভবভূতি তাঁর দীর্ঘদিনের জাদুকর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় অকপটে এমন কথা কোনো কিশোরের মুখে আগে কখনো শোনেননি। মনে মনে সামান্য বিস্মিত হলেন ভবভূতি, হাতি-ঘোড়ার খেলা, জোকারের মজাদার রং-ঢং, ছমছমে বাঘের খেলা, কিছুটা ভালো লাগে না এই কিশোরের, শুধু অলীক জাদুর খেলা দেখার জন্য এত কৌতূহল, আশ্চর্য! চকিতে তাঁর নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল, সেই আধা- মফস্‌সলে গরিব ঘরের ছেলেটি কমদিন জাদু শেখার আশায় পথে পথে ঘোরেনি, দেখাও হয়েছিল বহু জাদুকরের সঙ্গে, তবে বেশির ভাগই আনাড়ি, লোক-ঠকানোর খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। তবে তিনি হাল ছেড়ে দেননি, শেষে বহুদিন পর যুবক বয়সের গোড়ায় দেখা পেয়েছিলেন সেই অবিস্মরণীয় মানুষটির। সে আজকের কথা নয়, তিরিশ বছর আগে নির্জনে একাকী জীবনযাপন করতেন সেই মানুষ, ঠিক একজন সাধক, কিংবদন্তির মতন প্রবাদপ্রতিম জাদুক্ষমতার অধিকারী মানুষটির নাম গণপতি, জাদুকর গণপতি। তবে কারোর কাছে তাঁর হদিস ছিল না, তখন লোকের চোখে গণপতি হয় মৃত অথবা দেশত্যাগী। বহুজন্মের ভাগ্য আর গুরুকৃপায় ভবভূতি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁকে, অসমের কাছাড় উপত্যকায় বরাক নদীর তীরে গহিন অরণ্যে ঘেরা এক নির্জন আদিবাসী গ্রামে লোকচক্ষুর অন্তরালে গণপতির দেখা পেয়েছিলেন। সেখানেই যা কিছু বিদ্যা শেখা ভবভূতির, রহস্যময়ীর ইশারার মতন সেই বিচিত্র জীবনের কথা ভাবলে আজও তাঁর শরীর ভারী হয়ে ওঠে।

নিজের জীবনের কথা মন থেকে সরিয়ে রাজুর দিকে তাকালেন ভবভূতি, কিশোর ছেলেটি তাঁর দিকেই চেয়ে রয়েছে। অল্প হেসে ভবভূতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন একটা ম্যাজিক দেখবে?'

পলকে রাজুর চোখ দুটি শিশিরের উপর সূর্যকণার মতন ঝিকিয়ে উঠল, অবিশ্বাসী গলায় সাগ্রহে শুধোল, 'দেখাবেন?'

'আচ্ছা, বলো দেখি, ক্লাসে কোন বিষয় তোমার খুব কঠিন লাগে?'

একটু অবাক হয়েই রাজু বলল, 'সংস্কৃত ব্যাকরণ! কিছুতেই মনে রাখতে পারি না।'

'আজ সংস্কৃত ক্লাস ছিল?'

এ-কথা শুনে মনে মনে লজ্জা পেল রাজু, ছিল শুধু নয়, একটাও ধাতুরূপ লিখতে না পারার জন্য হরেন মাস্টারের বেতও পিঠে পড়েছে। এ-কথা কি আর জাদুকরকে বলা যায়! শুকনো মুখে শুধু ঘাড় নাড়ল।

'পড়া পারোনি, তাই তো?'

আরও অবাক হল রাজু, আশ্চর্য, এই লোকটা জানল কী করে! মুখে বলল, 'হ্যাঁ, ওই আর কী!'

ভবভূতি মিটিমিটি হাসছেন, ভারী দুষ্টুমির ভাব তাঁর চোখে-মুখে, রাজুর দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার ব্যাগ থেকে সংস্কৃত খাতাটা আমাকে দাও দেখি!'

বিনা প্রশ্নে ব্যাগ খুলে খাতাটি এগিয়ে দিল রাজু, ওইখানেই লাল কালি দিয়ে সব ভুল ধাতুরূপ কেটে দিয়েছেন মাস্টারমশাই।

খাতাটি হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইলেন ভবভূতি, চোখ বন্ধ, চারপাশে শীতদিনের ছোটোবেলা হলুদ হয়ে উঠেছে, চড়কতলার মাঠে দূর থেকে একটা ডাহুক পাখির ডাক ভেসে আসছে, রুণুঝুনু বাতাসের মিঠি বোলে শীতের ইশারা, কয়েক মুহূর্ত পর চোখ খুলে খাতাটি রাজুর হাতে ফেরত দিয়ে ছমছমে হাসি মুখে টেনে বললেন, 'দেখো, খাতা উল্টে দেখো!'

খাতার পাতা খুলে রাজু তো থ, যাকে বলে একগাল মাছি! এ কী করে সম্ভব! সবকটা ভুল ধাতুরূপ কোন আশ্চর্য উপায়ে ঠিক হয়ে গেছে আর মাস্টারমশাইয়ের লাল কালির দাগগুলিকেও কে যেন সবুজ করে দিয়েছে!

আরে, এ তো অসম্ভব! বিস্ফারিত চোখে ভবভূতির দিকে তাকিয়ে রাজু কোনোক্রমে শুধোল, 'এ কী! কীভাবে হল এসব?'

'ম্যাজিক!'

'কিন্তু কীভাবে?'

ভারী মায়াবী গলায় ভবভূতি বললেন, 'সে কথা তোমাকে বললেও এখন বুঝবে না বাবা!'

'কেন? বুঝব না কেন? আমাকে এই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দিন, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। আর কিচ্ছু শেখাতে হবে না, শুধু এইটা শিখিয়ে দিন।'

মৃদু হাসলেন ভবভূতি, 'তোমাদের এই আমোদপুর গ্রামটি ভারী সুন্দর! ঠিক যেন একটা আশ্চর্য জাদু।'

হঠাৎ অন্য কথা শুনে খানিকটা অভিমানের সুরে রাজু বলল, 'আমাকে শেখাবেন না, তাই তো?'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাজুর কাছে এগিয়ে এসে মাথায় নিজের ডানহাতখানি রেখে ভবভূতি নরম গলায় বললেন, 'কাল সন্ধের শেষ শো-য়ে সার্কাসে এসো। অনেকদিন পর শুধু তোমার জন্য একটা খেলা দেখাব, এসো তুমি। আসবে তো?'

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে রইল রাজু, বাবার কাছে সার্কাসের টিকিটের পয়সা চাইলে আর পাওয়া যাবে না, বাড়িতে খুব টানাটানি, কাল রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় মা-কে বলতে শুনেছে, বাড়িতে চাল বাড়ন্ত, তেল ফুরিয়ে এসেছে।

বাবা নীচু গলায় বলেছিল, 'কী করব বলো দেখি। জানো তো, এবছর মাঠে ধান হয়নি ভালো, ধান তোলার মজুর খেটে যা পেয়েছিলাম সব প্রায় শেষ।'

মায়ের ভয়ার্ত স্বর সারাদিন রাজুর কানে বেজেছে, মা বলেছিল, 'তাহলে এখন উপায়? কী হবে?'

'দেখি, মহাজনের কাছে তোমার ওই একজোড়া বাউটি বাঁধা দিয়ে...', বাবার অসহায় উত্তর ঘুমের ভান করে পড়ে থাকা রাজুর কাছে স্পষ্ট ভেসে এসেছিল।

রাজুর ইস্কুলের ধুলোমলিন পুরোনো জামাকাপড় দেখে সম্ভবত কিছু আঁচ করে ভবভূতি মৃদু হেসে বললেন, 'টিকিটের জন্য চিন্তা করো না, ও আমি বলে রাখব। তুমি এসে একেবারে সামনের আসনে বসে খেলা দেখবে। আমার বন্ধুর একটা সম্মান নেই! তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

২

মহারাজা সার্কাসের শেষ শো শুরু হয় ঠিক সন্ধ্যা ছ-টায়, শীতের দিনে তখনই আমোদপুর গঞ্জ শুনশান হয়ে আসে, আর রাত্রি ন-টায় শো ভাঙার পর গুটিকয় সার্কাস ফেরত মানুষ ছাড়া পথঘাটে আর কারোর দেখা পাওয়া যায় না। চড়কতলার মাঠ গঞ্জ থেকে মাইল দেড়েক দূরে, পথে বুড়ো সরকারদের গহিন বাঁশবন আর বউ-ডুবির দিঘি পার হয়ে যেতে হয়, এই দিঘি নিয়ে নানা কথা চালু রয়েছে এই অঞ্চলে, নিশুত রাতে দিঘির কালো জলের অতলে কাদের যেন কান্নার শব্দ শোনা যায়।

আজ বাঁশবনের ভেতর দিয়ে সার্কাস দেখতে যাওয়ার সময় রাজুর একটু গা শিরশির করছিল বটে কিন্তু সে ওসবে তেমন আমল দেয় না। মাকে অনেক বুঝিয়ে তবে আসার অনুমতি পেয়েছে, হাতে একখান চারকেচে লম্ফ দিয়েছে মা, সেই মৃদু অথচ থমথমে আলোয় চারপাশটা কেমন ছায়াছবির মতন দেখাচ্ছে। আজ ঠান্ডাও পড়েছে খুব, সন্ধ্যা কুয়াশায় চারধার থমথমে, বাঁশবাগানে খসখস শব্দের সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক মিলেমিশে কী এক বিচিত্র সুর তৈরি করেছে, মাঝে মাঝে একটা কুটুরে প্যাঁচার গম্ভীর স্বর ভেসে আসছে। ফুলহাতা জামা আর পাজামার উপর একখানি ধুসো চাদরে কান-মাথা-শরীর ভালো করে মুড়িয়ে নিয়েছে রাজু, দ্রুত পায়ে বাঁশের কোঁচ এড়িয়ে পথ চলছে, তার মনে পড়ে রয়েছে সার্কাসে, বা বলা ভালো ভবভূতির পানে, কী এক আশ্চর্য খেলা নাকি আজ দেখাবেন।

একেবারে সামনের সারির চেয়ারে সার্কাসের একজন কর্মচারী রাজুকে বসিয়ে দিয়ে গেছে, এখান থেকে সবকিছু আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল। আগের দু-দিন সে পেছনের সারির কম পয়সার সিট থেকে খেলা দেখেছিল, সেখান থেকেও বোঝা যায় কিন্তু আজ যেন সমস্ত সার্কাস দু-হাতের সামনে চলে এসেছে। রাজু মনে মনে ভাবল, ভবভূতি জাদুকরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হলে তো এমন সুযোগ আসত না, এও কি এক ধরনের জাদু নয়?

তবে খেলা দেখলেও সেদিকে তেমন মন নেই রাজুর, বারবার মন তাগাদা দিয়ে বলে চলেছে, আর কতক্ষণ, কখন শুরু হবে শেষ খেলা!

অবশেষে সেই সময় এল, বাঘের খেলা শেষ হতেই মাইকে একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ ঘোষণা করল, এবার আপনাদের সামনে আসবেন জাদুকর ভবভূতি, আপনারা কেউ কোনো কথা বলবেন না, এই জাদুখেলা আগে কখনো কেউ দেখেনি, আসছেন ভোজবাজির সম্রাট জাদুকর ভবভূতি।

ঘোষণা শেষ হতেই ধীরে ধীরে সব আলো নিভে এল, শুধু স্টেজের মাঝে একখানি ম্রিয়মাণ স্পটলাইট এখন ভেসে উঠেছে, সঙ্গতে শুরু হয়েছে বেহালার ভারী করুণ এক সুর। সেই সুর শুনলে বুকের ভিতর উথালিপাতালি ঢেউ ওঠে, মনে হয় বহুকাল ধরে কোনো বিরহী যেন আরেক বিরহিণীকে ডেকে চলেছে।

ধীর পায়ে মঞ্চে উঠে এলেন জাদুকর, পরনে একখানি কালো আলখাল্লা, খালি পা, গোলাকার আলোর নীচে দাঁড়িয়ে বেহালার সুর নিভে যেতেই গমগমে স্বরে বললেন, 'প্রথমে মঞ্চে আমি একজনকে আজ ডেকে নেব, তারপর শুরু হবে জাদুর খেলা।'

কেন জানে না কথাটি

অনেকদিন পর শুধু তোমার জন্য একটা খেলা দেখাব, এসো তুমি। আসবে তো?'

শুনেই রাজুর মনে হল, তাকেই বোধহয় ডাকবেন আজ ভবভূতি।

হলও তাই, হঠাৎ একটি জোরালো আলো জাদুকরের ইশারায় রাজুর মুখের উপর পড়তেই সকল দর্শক অবাক চোখে সেদিকে তাকালেন। ভবভূতি গম্ভীর অথচ সুরেলা গলায় বলে উঠলেন, 'ছেলেটির নাম রাজীব দাস, আপনাদেরই গ্রামের ছেলে, আজ আমি রাজীবকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি।'

রাজু মঞ্চে আসতেই খুব মৃদু হাসি ভবভূতির ঠোঁটে ক্ষণিকের জন্য ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। মঞ্চের একপাশে আরেকটি বৃত্তাকার আলোর নীচে রাজুকে দাঁড়াতে ইশারা করে ভবভূতি বললেন, 'রাজীব, আমি যখন আজ এই মঞ্চ থেকে বাতাসে মিলিয়ে যাব তখন তুমি ওখান থেকেই আমার সঙ্গে কথা বলবে। তোমার যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো, আমি অশরীরী কণ্ঠ হয়ে তার উত্তর দেব।'

এমন বিচিত্র জাদু এই গ্রামের কোনো মানুষ আগে দেখেনি, ভবভূতির কথায় ভ্রমরার গুঞ্জনের মতন চাপা শব্দ মুহূর্তে দর্শকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় হাত তুলে জাদুকর আবার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনারা কেউ কোনো কথা বলবেন না। শান্ত হয়ে বসুন।'

চোখ বন্ধ করে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ভবভূতি, সমস্ত জায়গাটি আঁধারে ডুবে রয়েছে, নিথর হয়েছে সমস্ত শব্দ, শুধু শীত-বাতাসের মতন ভেসে আসছে সেই করুণ বেহালার স্বর।

সকলের মনে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা, কী হয়, কী হয়! বিস্ময়াভিভূত রাজু যেন শ্বাস নিতেও ভুলে গেছে, বিস্ফারিত চোখে জাদুকরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, সহসা মঞ্চে একটি মৃদু কম্পন টের পেল রাজু, যেন পুকুরের অনেক গভীরে কেউ ঢেউ তুলেছে। কুয়াশার আঁশের মতন কী একটা ছায়া ঘনিয়ে উঠছে মঞ্চে, এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। পরমুহূর্তেই সকলে অবাক হয়ে দেখল ভবভূতির কোনো চিহ্নমাত্র নাই কোথাও, বিশাল মঞ্চে আলোর নীচে শুধু রাজু দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং ঠিক তখনই ভেসে এল জাদুকরের অশরীরী কণ্ঠ, 'রাজীব, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

কোনোক্রমে ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় রাজু উত্তর দিল, 'পাচ্ছি।'

'বেশ, এবার বলো তুমি কী জানতে চাও!'

কী বলবে বুঝতে না পেরে রাজুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি বাক্য, 'আপনি কোথায় এখন?'

'আমি এখানেই রয়েছি!'

'তাহলে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'কারণ আমি আছি অথচ নেই! এটি বস্তুবিদ্যার সামান্য প্রয়োগ, এই কৌশল তোমার পক্ষে, তোমাদের সবার পক্ষে বোঝা মুশকিল! শুধু জেনে রাখো, আমি আছি অথচ নেই!'

৩

শো শেষ হওয়ার পর নিজের তাঁবুর ভেতরে বসে বিস্ময়ে বিহ্বল রাজুর দিকে তাকিয়ে ভবভূতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, খুব অবাক হয়ে গেছ তো?'

'হ্যাঁ, মানে, এইটা কীভাবে সম্ভব! আপনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন?'

মৃদু হাসলেন জাদুকর, 'ওই যে বললাম, বস্তুবিদ্যা! এ জিনিস সকলের সামনে দেখানোর নয়, শুধু তোমার জন্য আজ প্রয়োগটুকু দেখালাম।'

দু-এক মুহূর্ত পর আকুল গলায় রাজু জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে আপনি জাদু শেখাবেন? যদি আমি আপনার কাছে চলে আসি, সব ছেড়ে, শেখাবেন আমাকে?'

তীক্ষ্ণ চোখে একমুহূর্ত রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে ভবভূতি দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পারবে আসতে? সব ছেড়ে? বাপ-মা- এই গ্রাম-ইস্কুল সব ছেড়ে পারবে আসতে? সারাজীবনের জন্য?'

নিজের অজান্তেই যেন রাজুর মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরিয়ে এল, 'পারব।'

'বেশ! তাহলে এই আমোদপুরের একেবারে দক্ষিণে শাল নদীর তীরে একটা বেদের দল আজ ক-দিন হল এসে আস্তানা নিয়েছে, ওই দলে এক বেদেনি রয়েছে, নাম হৈমবতী, তুমি আজ রাত্রেই তার কাছে চলে যাও। আমার নাম বললেই সে তোমাকে ওদের দলে ঠাঁই দেবে।'

বিস্ময়ে হতবাক রাজু শুধোল, 'বেদেনি? কেন, আপনার কাছে আমি আসব না?'

সামান্য হাসলেন ভবভূতি, 'আগে মন তৈরি করো। ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে দেশ দেখো, মানুষ দেখো, বেদের দলে বেদে হয়ে সারা দেশ ঘুরে বেড়াও, তারপর মনে জাদুক্ষেত্র প্রস্তুত হলে আমি নিজেই তোমাকে খুঁজে নেব।'

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজু, তার মনে একদিকে মায়ের মুখ, জামতলা, দিঘির জল, খেলাধুলা, ইস্কুলের পথ, বাঁশবাগানের শান্ত দুপুর ভেসে উঠছে, আর অন্যদিকে অশনির মতন তাকে ডেকে চলেছেন জাদুকর ভবভূতি।

কয়েক মুহূর্ত রাজুকে নিশ্চুপ দেখে ভবভূতি ভারী সুরেলা আদর সাজানো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী, ঘর ছাড়ার কথায় মনখারাপ হয়ে গেল?'

মুখ তুলে জাদুকরের চোখে চোখ রাখল রাজু, মুখখানি মায়াচ্ছন্ন, কিশোর মনের দ্বিধা সেখানে কনকচাঁপা ফুলের মতন ফুটে উঠেছে।

দু-পা এগিয়ে রাজুর মাথায় হাত রেখে ভবভূতি আলতো স্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে ছুটির নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম রাজু, এবার তোমাকে ঠিক করতে হবে, তুমি কী করবে!'

অবাক গলায় অল্পক্ষণ পর রাজু জিজ্ঞাসা করল, 'ছুটি?'

'হ্যাঁ, বাবা, ছুটি! আগল দেওয়া এই ঘর-বাড়ি, সংসারের ছোট্ট জগৎ থেকে ছুটি না নিলে যে বড়ো জগতে যাওয়া যায় না রাজু! সেই জগৎ কেমন জানো? আকাশের মতন বিশাল আর ফুলের রেণুর মতন সুন্দর! সেখানে দিবারাত্রি আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়, ওই আনন্দ-জলে স্নান না করলে অপরূপ জাদু ভুবনের সন্ধান তুমি পাবে না বাবা!'

এক আশ্চর্য জাদুকরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজীব দাস, আমোদপুরের হতদরিদ্র কিশোর, বাইরে নিথর পৌষ রাত্রির আকাশ তখন নক্ষত্র কুসুমে সেজে উঠেছে, কে এক বাঁধন-ছেড়া চিরকিশোর তার চিরকালের ধুলোমাখা একতারায় সুর তুলে রাজুর কানে মন্ত্রের মতন বলে চলেছে, 'ছুটি ছুটি ছুটি!' ❖

নুরচাজম

শীর্ষেন্দু মুখার্জি

ছবি : প্রণব হাজরা

চিহিল সাতুনের ছাদে নবাব আলীবর্দীর ছায়াসঙ্গিনী বাংলার বেগম শরফ-উন্-নিসা আনমনে পায়চারি করছেন। তাঁকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছে! আশমানের রক্তসূর্য তখন ধীরে ধীরে রহস্যময়ী ভাগীরথীর অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। এমন সময়ে বেগমের খাস জারিয়া নাজিয়া এসে বলল, 'বেগমসাহেবা, নীচে চলুন। নবাবজাদা মোতিঝিল থেকে ফিরে এসেছেন।' অমনি উদ্‌বিগ্ন বেগম বলে উঠলেন, 'তুই ঠিক জানিস নাজিয়া, ঘসেটি এখনও মোতিঝিলে নওয়াজেস মহম্মদের কাছেই রয়েছে?' উত্তরে জারিয়া জানাল, 'আপনার কথা মতো সেখানকার গোলাপ বাগিচা দেখাশোনার নামে আপনার মেয়ে ঘসেটি বেগমের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে আমি ইউসুফকে গত পরশু সকালেই ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই আমাকে খবর এনে দিয়েছে বেগমসাহেবা।' আবার আলীবর্দীর বেগম অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। জারিয়াকে এই ছাদেই নিজের জন্যে হুক্কার ব্যবস্থা করে দিতে বলে তিনি আবার নিজের দুর্ভাবনাগুলোর সঙ্গে একা হলেন। ঠিক তখন কাটরা মসজিদ থেকে মগরিবের আজান ভেসে আসতে লাগল।

সুজা উল-মুলক হুসাম আদ-দৌলা মুহাম্মাদ আলীবর্দী খান বাহাদুর মাহাবত জংয়ের বুদ্ধিমত্তা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু বছর বাদে এখন বাংলাদেশে শান্তি ফিরে এসেছে। রণক্লান্ত বর্গীদের সঙ্গে বৃদ্ধ নবাব তিনটি শর্তে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছেন। ফলত অত্যাচারী-লুঠেরা মারাঠাদের হাত থেকে অসহায় বাংলার মানুষ রক্ষা পেয়েছে। এদিকে দেশে শান্তি ফিরে এলেও ৭৬ বছর বয়সি নবাবের মনে শান্তি নেই। তিনি অসুখী। এই আগের মাসেই সিরাজ-উদ-দৌলার ছোটোভাই তাঁর আরেক কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র একরামুদ্দৌলা গুটি-বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আর তার থেকেও মর্মান্তিক বিষয় এটাই যে একরামের মৃত্যুশোকে নবাবের জামাই নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ একরকম উন্মাদ হয়ে উঠেছেন!

অশ্বপদাকৃতি মোতিঝিলের তীরে মনোরম প্রাসাদটি এই নওয়াজেস্ খানেরই অনুপম সৃষ্টি। আলীবর্দী কন্যা ঘসেটি বেগম এনারই ঘরনি। নওয়াজেস্ শান্তিপ্রিয়, নির্বিবাদী। অন্যদিকে নবাব কন্যা ঘসেটি বদমেজাজি, অহংকারী আর রুষ্ট স্বভাবের। আহা, অমন ভালোমানুষের এমন জীবনসঙ্গিনী একেবারেই বেমানান। এই ভাবনাই এতকাল নবাব ও শরফ-উন্-নিসা বেগমকে একদণ্ডও শান্তি দেয়নি। তা ছাড়া ঘসেটি নিঃসন্তান। অবশ্য এতে ঘসেটির কিছুই যায়-আসে না। কারণ তার জীবনে স্বামী-সন্তান-সংসার সুখের কোনোই মূল্য নেই। সে শুধু চেনে ক্ষমতা, সে শুধু জানে অধিকার। তার লোলুপ দৃষ্টি সদা-সর্বদা ওই মস্‌নদের প্রতি। দিনরাত সে নানান বিষয়ে নিজের নির্বিবাদী স্বামীটির ওপর চড়াও হয়। এরকমই অস্থির পরিবেশে ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজেস্ খাঁ, যিনি কিনা শাহামাত জং নামে বেশি পরিচিত, তিনি নিজের মতন করে নিজের জন্যে শান্তি খুঁজে নিলেন। সিরাজের কনিষ্ঠ ভাই একরামুদ্দৌলাকে তিনি নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। একরামকে মোতিঝিল প্রাসাদে নিয়ে এসে তিনি দিন-রাত এক করে নিজের অশান্ত পিতৃহৃদয়কে শান্ত করার কাজে ব্রতী হলেন। কিন্তু তাঁর মতন ভালো মানুষের কপালে বেশিদিন এ সুখ আর সহ্য হল না। ভয়ংকর বসন্তরোগে একরামুদ্দৌলার প্রাণবিয়োগ ঘটল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগা নওয়াজেস্ মহম্মদ খান জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ হারালেন। শোকগ্রস্ত শাহামাত জং শোথরোগে আক্রান্ত হলেন।

পারিবারিক এহেন বিপর্যয়েও ক্ষমতালোভী ঘসেটি বেগমের উগ্রস্বভাবের কোনোমাত্র পরিবর্তন ঘটল না। একরামের মৃত্যুর একমাস কাটতে না কাটতেই তিনি মুরাদউদ্দৌলার নামে মসনদ লাভের আশায় আত্মপক্ষ শক্তিশালী করার খেলায় মেতে উঠলেন, আর এই দাবি জানাতেই সে আজ মোতিঝিল থেকে এই চিহিল সাতুনে ছুটে এসেছে—শরফ-উন্-নিসা বেগম এ পরিস্থিতিতে নিজের মেয়ের আগমনে একরকম বিরক্তই হলেন। চরম বিরক্তিতে তিনি মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন, 'একরাম চলে গেল, নওয়াজেসের এখন এরকম ভয়াবহ অবস্থা, আর জানাই যে এই চার বছর আগেই আমরা সিরাজের আব্বাজান নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দিনকেও হারিয়েছি। এ পরিস্থিতিতে নবাবের অবস্থাটা কী, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ঘসেটি! এখন এসব কথা বলার সময়! তুমি বলো তো?'

আম্মিজানের কথায় সিরাজের প্রসঙ্গ শুনে ঘসেটি বেগম জ্বলে উঠলেন, উত্তেজনার পারদ চড়ল। তিনি বললেন, 'ওফ! সিরাজ, সিরাজ, সিরাজ! সর্বক্ষণ ওই নাম, আর যে সহ্য হয় না।'

—ঘসেটি, তোমার সিরাজের প্রতি এত রাগ কেন! তুমি তো ওর নিজের মাসি। তোমারই ছোটোবোন আমিনা ওর মা!

—তোমরা আমার ওপর অন্যায় জুলুম করবে, আর আমি চুপ করে থাকব ভেবেছ!

—জুলুম!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আব্বাজান সিরাজকে মসনদে বসাতে চান। কিন্তু আম্মিজান, একথা অস্বীকার করতে পারো কি আব্বা হুজুরের পরে আমার দ্বিতীয় বোনের ছেলে শওকৎজঙ্গই এ মসনদের যোগ্য উত্তরাধিকারী?

—এ সিদ্ধান্ত নবাবের। তা ছাড়া শওকৎ নয়, আমিনার ছেলে সিরাজউদ্দৌলাই নবাবের সকল কর্মযজ্ঞে এযাবৎকাল সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এসেছে, কাজেই সিংহাসনের প্রতি তার দাবিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া বাংলার নবাব তাকে যোগ্য মনে করেছেন।

—কিন্তু আমারও তো কিছু দাবি থাকতে পারে আম্মিজান!

—কিন্তু তুমি তো...

—আমি নিঃসন্তান, তাই তো! এ তো সকলেই জানে। কিন্তু আমি বলতে এসেছি যে নওয়াজেসের অবর্তমানে একরামুদ্দৌলার পুত্র মুরাদউদ্দৌলাকে এ মসনদের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হোক।

ঘসেটি বেগমের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বেগম এবারে বাঘিনির গর্জনে চিৎকার করে উঠলেন! তাঁর হুঙ্কারে এই চল্লিশ স্তম্ভের বাসগৃহ গমগম করে উঠল! আম্মিজানের এই ভয়াল রূপ দেখে দুর্বিনীত ঘসেটিও চমকে উঠলেন!

শরফ-উন্-নিসা বেগম বললেন, 'তুমি কি মানুষ ঘসেটি! পালিত পুত্রের মৃত্যুশোকে আজ তোমারই স্বামী শয্যাশায়ী। মৃত্যু তাঁর দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আর তুমি সে অসহায় মানুষটার এ দুরবস্থার বিষয়ে এতটুকু বিচলিত না হয়ে তাঁর মৃত্যুপরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছ!'

বাংলার বেগমের রোষ আর অসন্তোষের সামনে গলা নামিয়ে ঘসেটি তবুও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন, 'আমি আমার অধিকারের কথা বলছি আম্মিজান!'

—তোমার অধিকার! আগে নিজের বিষয়ে ভাবো, তারপরে তোমার অধিকারের কথা বলতে আসবে।

—এর মানে?

—রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? এর আগেও হোসেন কুলির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে তুমি নবাব-পরিবারে কলঙ্ক লেপেছিলে! তুমি কি সর্বশক্তিমান আল্লাহকেও ভয় পাও না!

—রাজবল্লভ কাজের সূত্রে মোতিঝিল প্রাসাদে আসে ঠিকই কিন্তু...

—চুপ, একদম চুপ! আর একটাও কথা আমি শুনতে চাই না, তুমি এবারে এসো, কারণ এতেই তোমার মঙ্গল হবে।

দুরাচারিণী ঘসেটি বেগম আর কথা না বাড়িয়ে বেগমের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর আলীবর্দীর বেগম তখন মুর্শিদাবাদের অন্ধকার আকাশে গোলাকার রূপালি তাজওয়ারটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

দুই

দেখতে দেখতে চার-চারটে বছর কেটে গেল। পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আর প্রিয়জন বিয়োগে বাংলার নবাব আলীবর্দী খান একেবারে মুষড়ে পড়লেন। এ যেন মৃত্যুমিছিল! বছরের শেষে সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে পালিত পুত্রের মৃত্যুশোকে নওয়াজেস্ সাহাব মৃত্যুবরণ করলেন। শেষজীবনে যখন তিনি একরামের সমাধির সামনে বসে কাঁদতেন, তখন তিনি বারবার একটাই কথা বলতেন, 'আমার ছেলের পাশে মোতিঝিলের এই মসনদ প্রাঙ্গণেই তোমরা আমাকে মাটি দিও।' তাই-ই করা হল। তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রিয়তম একরামুদ্দৌলার সমাধির পাশেই তাঁকে দাফন করা হল। ওদিকে স্বামীর অবর্তমানে কুচক্রী ঘসেটি বেগম তাঁর প্রিয়জনদের সঙ্গে মসনদ দখলের মন্ত্রণা আঁটতে লাগলেন। এমন পরিস্থিতিতে পরের বছরের দ্বিতীয় মাসেই আলীবর্দীর আরেক জামাতা সাওলাত জং নিজের ভাই শাহামাত জংয়ের অনুবর্তী হলে আলীবর্দীর শোক আরও মাত্রায় বেড়ে গেল। তিনি শয্যা নিলেন। ঘরোয়া চিকিৎ

অশ্বপদাকৃতি মোতিঝিলের তীরে মনোরম প্রাসাদটি এই নওয়াজেস্ খানেরই অনুপম সৃষ্টি। আলীবর্দী কন্যা ঘসেটি বেগম এনারই ঘরনি। নওয়াজেস্ শান্তিপ্রিয়, নির্বিবাদী। অন্যদিকে নবাব কন্যা ঘসেটি বদমেজাজি, অহংকারী আর রুক্ষ স্বভাবের। আহা, অমন ভালোমানুষের এমন জীবনসঙ্গিনী একেবারেই বেমানান। এই ভাবনাই এতকাল নবাব ও শরফ-উন্-নিসা বেগমকে একদণ্ডও শান্তি দেয়নি। তা ছাড়া ঘসেটি নিঃসন্তান। অবশ্য এতে ঘসেটির কিছুই যায়-আসে না। কারণ তার জীবনে স্বামী-সন্তান-সংসার সুখের কোনোই মূল্য নেই। সে শুধু চেনে ক্ষমতা, সে শুধু জানে অধিকার। তার লোলুপ দৃষ্টি সদা-সর্বদা ওই মস্নদের প্রতি। দিনরাত সে নানান বিষয়ে নিজের নির্বিবাদী স্বামীটির ওপর চড়াও হয়। এরকমই অস্থির পরিবেশে ঢাকার শাসনকর্তা নওয়াজেস্ খাঁ, যিনি কিনা শাহামাত জং নামে বেশি পরিচিত, তিনি নিজের মতন করে নিজের জন্যে শান্তি খুঁজে নিলেন। সিরাজের কনিষ্ঠ ভাই একরামুদ্দৌলাকে তিনি নিজের পুত্ররূপে গ্রহণ করলেন। একরামকে মোতিঝিল প্রাসাদে নিয়ে এসে তিনি দিন-রাত এক করে নিজের অশান্ত পিতৃহৃদয়কে শান্ত করার কাজে ব্রতী হলেন। কিন্তু তাঁর মতন ভালো মানুষের কপালে বেশিদিন এ সুখ আর সহ্য হল না। ভয়ংকর বসন্তরোগে একরামুদ্দৌলার প্রাণবিয়োগ ঘটল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগা নওয়াজেস্ মহম্মদ খান জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ হারালেন। শোকগ্রস্ত শাহামাত জং শোথরোগে আক্রান্ত হলেন।

পারিবারিক এহেন বিপর্যয়েও ক্ষমতালোভী ঘসেটি বেগমের উগ্রস্বভাবের কোনোমাত্র পরিবর্তন ঘটল না। একরামের মৃত্যুর একমাস কাটতে না কাটতেই তিনি মুরাদউদ্দৌলার নামে মসনদ লাভের আশায় আত্মপক্ষ শক্তিশালী করার খেলায় মেতে উঠলেন, আর এই দাবি জানাতেই সে আজ মোতিঝিল থেকে এই চিহিল সাতুনে ছুটে এসেছে—শরফ-উন্-নিসা বেগম এ পরিস্থিতিতে নিজের মেয়ের আগমনে একরকম বিরক্তই হলেন। চরম বিরক্তিতে তিনি মেয়েকে উদ্দেশ করে বললেন, 'একরাম চলে গেল, নওয়াজেসের এখন এরকম ভয়াবহ অবস্থা, আর জানাই যে এই চার বছর আগেই আমরা সিরাজের আব্বাজান নবাবের কনিষ্ঠ জামাতা জৈনুদ্দিনকেও হারিয়েছি। এ পরিস্থিতিতে নবাবের অবস্থাটা কী, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ঘসেটি! এখন এসব কথা বলার সময়! তুমি বলো তো?'

আম্মিজানের কথায় সিরাজের প্রসঙ্গ শুনে ঘসেটি বেগম জ্বলে উঠলেন, উত্তেজনার পারদ চড়ল। তিনি বললেন, 'ওফ! সিরাজ, সিরাজ, সিরাজ! সর্বক্ষণ ওই নাম, আর যে সহ্য হয় না।'

—ঘসেটি, তোমার সিরাজের প্রতি এত রাগ কেন! তুমি তো ওর নিজের মাসি। তোমারই ছোটোবোন আমিনা ওর মা!

—তোমরা আমার ওপর অন্যায় জুলুম করবে, আর আমি চুপ করে থাকব ভেবেছ!

—জুলুম!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আব্বাজান সিরাজকে মসনদে বসাতে চান। কিন্তু আম্মিজান, একথা অস্বীকার করতে পারো কি আব্বা হুজুরের পরে আমার দ্বিতীয় বোনের ছেলে শওকৎজঙ্গই এ মসনদের যোগ্য উত্তরাধিকারী?

—এ সিদ্ধান্ত নবাবের। তা ছাড়া শওকৎ নয়, আমিনার ছেলে সিরাজউদ্দৌলাই নবাবের সকল কর্মযজ্ঞে এযাবৎকাল সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে এসেছে, কাজেই সিংহাসনের প্রতি তার দাবিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া বাংলার নবাব তাকে যোগ্য মনে করেছেন।

—কিন্তু আমারও তো কিছু দাবি থাকতে পারে আম্মিজান!

—কিন্তু তুমি তো...

—আমি নিঃসন্তান, তাই তো! এ তো সকলেই জানে। কিন্তু আমি বলতে এসেছি যে নওয়াজেসের অবর্তমানে একরামুদ্দৌলার পুত্র মুরাদউদ্দৌলাকে এ মসনদের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হোক।

ঘসেটি বেগমের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার বেগম এবারে বাঘিনির গর্জনে চিৎকার করে উঠলেন! তাঁর হুঙ্কারে এই চল্লিশ স্তম্ভের বাসগৃহ গমগম করে উঠল! আম্মিজানের এই ভয়াল রূপ দেখে দুর্বিনীত ঘসেটিও চমকে উঠলেন!

শরফ-উন্-নিসা বেগম বললেন, 'তুমি কি মানুষ ঘসেটি! পালিত পুত্রের মৃত্যুশোকে আজ তোমারই স্বামী শয্যাশায়ী। মৃত্যু তাঁর দুয়ারে কড়া নাড়ছে। আর তুমি সে অসহায় মানুষটার এ দুরবস্থার বিষয়ে এতটুকু বিচলিত না হয়ে তাঁর মৃত্যুপরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা শুরু করে দিয়েছ!'

বাংলার বেগমের রোষ আর অসন্তোষের সামনে গলা নামিয়ে ঘসেটি তবুও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন, 'আমি আমার অধিকারের কথা বলছি আম্মিজান!'

—তোমার অধিকার! আগে নিজের বিষয়ে ভাবো, তারপরে তোমার অধিকারের কথা বলতে আসবে।

—এর মানে?

—রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক? এর আগেও হোসেন কুলির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে তুমি নবাব-পরিবারে কলঙ্ক লেপেছিলে! তুমি কি সর্বশক্তিমান আল্লাহকেও ভয় পাও না!

—রাজবল্লভ কাজের সূত্রে মোতিঝিল প্রাসাদে আসে ঠিকই কিন্তু...

—চুপ, একদম চুপ! আর একটাও কথা আমি শুনতে চাই না, তুমি এবারে এসো, কারণ এতেই তোমার মঙ্গল হবে।

দুরাচারিণী ঘসেটি বেগম আর কথা না বাড়িয়ে বেগমের কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর আলীবর্দীর বেগম তখন মুর্শিদাবাদের অন্ধকার আকাশে গোলাকার রূপালি তাজওয়ারটির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

দুই

দেখতে দেখতে চার-চারটে বছর কেটে গেল। পারিবারিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আর প্রিয়জন বিয়োগে বাংলার নবাব আলীবর্দী খান একেবারে মুষড়ে পড়লেন। এ যেন মৃত্যুমিছিল! বছরের শেষে সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে পালিত পুত্রের মৃত্যুশোকে নওয়াজেস্ সাহাব মৃত্যুবরণ করলেন। শেষজীবনে যখন তিনি একরামের সমাধির সামনে বসে কাঁদতেন, তখন তিনি বারবার একটাই কথা বলতেন, 'আমার ছেলের পাশে মোতিঝিলের এই মসনদ প্রাঙ্গণেই তোমরা আমাকে মাটি দিও।' তাই-ই করা হল। তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রিয়তম একরামুদ্দৌলার সমাধির পাশেই তাঁকে দাফন করা হল। ওদিকে স্বামীর অবর্তমানে কুচক্রী ঘসেটি বেগম তাঁর প্রিয়জনদের সঙ্গে মসনদ দখলের মন্ত্রণা আঁটতে লাগলেন। এমন পরিস্থিতিতে পরের বছরের দ্বিতীয় মাসেই আলীবর্দীর আরেক জামাতা সাওলাত জং নিজের ভাই শাহামাত জংয়ের অনুবর্তী হলে আলীবর্দীর শোক আরও মাত্রায় বেড়ে গেল। তিনি শয্যা নিলেন। ঘরোয়া চিকিৎসা

আর তারপরে প্রথাগত চিকিৎসাতেও নবাব স্বস্তি পেলেন না। হাকিম হাজি খান ও কাশিমবাজার কুঠির সার্জন ডাক্তার ফোর্থের চেষ্টাও বিফলে গেল। নবাব ওষুধ সেবন বন্ধ করে দিলেন।

মুর্শিদাবাদে সন্ধে নামছে। জারিয়ারা আজ বেগমের আদেশে কক্ষে নবাবের পছন্দের খাবারগুলো একে একে সাজিয়ে রেখে যাচ্ছে। বেগম সমগ্র বিষয়টি নিজে হাতে তদারকি করছেন। এমন সময় বিছানায় শুয়ে নবাব বললেন, 'কেন এসব পাগলামো করছ বেগম? আমি কি এখন এসব খেতে পারব বলো?'

বেগম এদিকে নবাবের কথায় কান না দিয়ে জারিয়াদের বলে চললেন, 'ওদিকটায় যা, আনারস পোলাও ওখানটায় রাখ। এটা শিরমাল, এটা শাবডেগ, খাসির মাংস দিয়ে এই তরিকাটা কিন্তু বেশ বানিয়েছে বাবুর্চিরা। এটা শামি কাবাব, এটা তন্দ্ নান, এটা রোগনি রোটি আর এটা সালোনি মেওয়া কা খিচড়ি। আর দেখো নবাব, এই নিরামিষ কাবুলি আমি নিজে হাতে রেঁধেছি। তোমার পছন্দের খুবানি, কাঠবাদাম আর ছোলা দিয়ে।

একটু উঠে বসার চেষ্টা করবে? ডাবের পানিটা আমি তোমাকে খাইয়ে দিই। বলো তো একটু কেওড়া আর গোলাপের জল মিশিয়ে দিই।'

নবাব এবারে দু-হাত বাড়িয়ে একান্ত আপন বন্ধুটিকে নিজের দিকে আসতে বললেন, জারিয়ারা তখন কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

—তুমি আমাকে খুব পেয়ার করো, তাই না বেগম?

—তুমি ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই নবাব। আজ নিজের চেষ্টায় তুমি এ জায়গায় এসেছ। এজন্য তোমাকে আমি খুব শ্রদ্ধাও করি, সত্যি বলছি।

—না, না, না, না, এ মসনদই আমার সর্বনাশ করল!

প্রথাগত চিকিৎসাতেও নবাব স্বস্তি পেলেন না।

'অয় হুব্বে জাহ্ ওয়ালোঁ,
জো আজ তাজওয়ার্ হ্যায়
কল উসকো দেখিয়ে তুম, ন তাজ হ্যায় ন সর হ্যায়।'

—এভাবে বোলো না নবাব! উচ্চাকাঙ্ক্ষা তো সবারই থাকতে পারে। তবে তুমি নিজেকে ক্ষমতালোলুপ বলে কষ্ট পাচ্ছ কেন!

—'গম্ বড়ে আতে হ্যয় কাতিল্ কি নিগাহোঁ কি তরহ
তুম্ ছুপালো মুঝে অয়্ দোস্ত গুনাহো কি তরহ।'

আমি পাপ করেছি বেগম! সেজন্য শেষজীবনে আমায় এত কষ্ট পেতে হচ্ছে। এ মসনদ আমাকে শুরু থেকে শান্তি দেয়নি! বর্গী হামলা, আফগান বিদ্রোহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারিবারিক অশান্তি, মৃত্যুমিছিল—ওফ, আমি আর পারছি না!

—আমি তো তোমাকে আগলে রেখেছি নবাব। কোনো চিন্তা নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না বেগম, না। আর কিছুই ঠিক হবে না।
সব ঝুট্। সব তারিখ্ হমেশা অপনে কো দুহ্রাতি হ্যয়।

—চুপ করো নবাব, চুপ করো। এসব কী বলছ তুমি?

—সত্যিটা স্বীকার করতে ভয় পেয়ো না বেগম। ইতিহাস তো বারবার ফিরে ফিরেই আসে।

—তবে কি তোমার কৃতকর্মের বোঝা তোমার উত্তরাধিকারীকে বইতে হবে! তবে কি...

সিরাজ, সে যে আমাদের বড়োই কাছের নবাব।

—চক্রান্ত করে সারফারাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে হত্যা করে আমি অন্যায়ভাবে এ মসনদ দখল করেছি। এ সিংহাসনে তো আমার কোনো অধিকার নেই বেগম। এ তো প্রজাদরদী নবাব সুজাউদ্দিনের মসনদ। এককালে আমি তো ছিলাম সেই মহাত্মারই সামান্য কর্মচারী মাত্র।

—ওসব ভেবে এ রোগশয্যায় আর কষ্ট দেও না জান।

—না, আমাকে বলতে দাও।

নবাব সুজা আমায় প্রবল বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে আমি তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই সন্তান সারফারাজকে মেরে ওনার এ সাধের মসনদে চেপে বসব! হায় আল্লাহ্, এ মসনদে নবাব সুজার দীর্ঘশ্বাস মিশে রয়েছে, এ মসনদে সারফারাজের রক্ত লেগে রয়েছে। এতে আমার কোনো অধিকার নেই, অধিকার নেই।

—তুমি তো তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলে নবাব! যুদ্ধশেষে মৃত সারফারাজের পরিবারের ব্যয়ভারসহ সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলে, নাফিসা বেগমকে সম্মান দেখিয়েছিলে, এমনকি আলাদা করে সারফারাজের অবৈধ সন্তান আকা বাবারও যত্ন নিয়েছিলে, সব দায়িত্ব নিয়েছিলে।

—কিন্তু আমার পাপের দায়িত্ব কে নেবে বেগম?

আমার পরে সিরাজ তো মসনদে বসবে। সে তো চঞ্চলমস্তিষ্ক, অপরিণামদর্শী, স্বেচ্ছাচারী! এ সুবে বাংলার সূক্ষ্ম রাজনীতি সে কি বুঝে উঠতে পারবে!

—নবাব!

—তুমি কি গিরিয়ার ময়দানে দেখা সেই নয় বছরের অসম সাহসী রাজপুত্র বালকটির কথা ভুলে গেলে!

—ভুলিনি নবাব!

সেদিন সেই বালকের চোখে যা আগুন দেখেছিলাম, তা আমি প্রিয় সিরাজের চোখেও দেখি না!

—এ পরিস্থিতিতে সেই তাকেই আমার চাই।
তাকে আমার কাছে এনে দাও বেগম!
এনে দাও! এনে দাও!

তিন

কাশিমবাজারের ওয়াটস্ সাহেবের সঙ্গে রাজবল্লভ মন্ত্রণা করছে। আর এতে মদত জোগাচ্ছে ঘসেটি বেগম। এরাই কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানিকে সুবে বাংলার নবাব মনসুর-উল- মুলক মির্জা মহম্মদ শাহ কুলী খান সিরাজউদ্দৌলা বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা প্রস্তুত করার ইন্ধন জুগিয়েছে। আর এদিকে চঞ্চলমস্তিষ্ক সিরাজের নির্দেশে ভাগীরথীর বুকে শয়ে শয়ে বজরা, ময়ূরপঙ্খী, পালুরারা, সেরিঙ্গা, পাঞ্চোয়ে রণসজ্জায় তৈরি হয়ে কলিকাতা আক্রমণের জন্যে প্রহর গুনছে। এমন ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে যখন রণদুন্দুভি বেজে উঠবে, ঠিক তখন তরুণ নবাব সিরাজউদৌলার ছায়াসঙ্গী জালিম সিংহ তাকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করার সুপরামর্শ দিয়েছে। সে দোস্ত সিরাজকে প্রাণপণে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে কলিকাতা আক্রমণে তার নিজেরই ক্ষতি হতে পারে! কারণ ইংরাজগণ অতিশয় ধূর্ত। গায়ের জোরে নয় বুদ্ধির বশে ঠান্ডা মাথায় তাদেরকে বাগে আনতে হবে। বরঞ্চ এখনই বুদ্ধিমানের কাজ এটাই হবে যে দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের ওপর গুপ্ত নজর রাখা হোক। প্রমাণ পেলেই তাদেরকে কারারুদ্ধ করা হোক। আর কাশিমবাজার কুঠির সদস্যদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে আনা হোক।

শেষমেশ সিরাজ প্রাণপ্রিয় দোস্ত রাজপুতবীর জালিম সিংহের কথা শুনেছে। সে এই হঠকারী অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ ঘোষণা করেছে। আর বন্ধুর বুদ্ধিতে বয়োজ্যেষ্ঠ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদা সদ্ভাব বজায় রেখে চলেছে। রাজদরবারে সে প্রবীণ অমাত্যজনদের পরামর্শ মেনে নবাবীকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করছে। কারণ জালিম সিংহই তাকে বুঝিয়েছে যে একমাত্র এই প্রবীণ রাজকর্মচারীদের যথাযোগ্য সম্মান দেখানোই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

কিন্তু এ অভাগা মুর্শিদাবাদ কারুরই ভালো দেখতে পারে না। এক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছে। সিরাজ আর জালিমের মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হয়েছে। কারণ জালিম নিখোঁজ হয়েছে! নিশ্চয়ই কোনো আততায়ী খাবারে বিষপ্রয়োগে জালিমকে হত্যা করেছে কিংবা শরীরে পাথর বেঁধে ওকে ভাগীরথীতে ডুবিয়ে মেরেছে! এবার সিরাজের কী হবে! তবে কি ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্প সিরাজকে এবারে দমবন্ধ করে মেরে ফেলবে! তবে কি সুযোগসন্ধানী ইংরাজ কোম্পানি এ সোনার বাংলার মানদণ্ড এবারে নিজেদের হাতে তুলে নেবে!

'জালিম! তুমি কোথায়! তোমার সিরাজের বড়ো বিপদ!'

বাংলার নবাব এই অসুস্থ শরীরেও এক ভয়ংকর সিংহ গর্জনে চিৎকার করে উঠলেন! নিদ্রাভঙ্গের পরে তিনি অত্যধিক পরিমাণে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন! আর তখনই শরফ-উন-নিসা বেগম ঘুম ভেঙে জেগে উঠে নবাবকে শান্ত করার এক আপ্রাণ চেষ্টায় ব্রতী হলেন।

—কী হয়েছে নবাব? খোয়াব দেখছিলে?

—সে এসেছিল বেগম! সে এসেছিল! সে নুরচাজম, নয়নের আলো! কিন্তু সে যে আমায় কথা দিয়েছিল যে সে সর্বক্ষণ আমার সিরাজের পাশে পাশে থাকবে! তাহলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যেত! কিন্তু হঠাৎ একী হল! তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই ওই ধূর্ত ইংরাজরা তার কোনো ক্ষতি করেছে! এবারে ওরা আমার প্রাণের সিরাজকেও...

—নবাব, তুমি শান্ত হও। এত রাতে কে আসবে বলো! আর তোমার সিরাজের কোনো ক্ষতি হয়নি। বলো তো, তাকে ডেকে পাঠাই?

এরপর সব শান্ত হল।

ভোর পাঁচটায় সকল ভাবনা, সকল দুঃখকে কাটিয়ে উঠে নবাব আলীবর্দী চিরশান্তির আশ্রয়ে নিজের শান্তি খুঁজে নিলেন।

দিনটা ১৭৫৬-এর ১০ এপ্রিল।

এর থেকে ঠিক ষোলো বছর আগে আজকের দিনেই গিরিয়ার প্রান্তরে সারফারাজ বাহিনীকে হারিয়ে বাংলার নবাবী ইতিহাসে আলীবর্দী অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল। ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে ছত্রিশ বছর বয়সি তরুণ নবাব সারফারাজ কূটনৈতিক ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ আলীবর্দীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। সেদিন প্রভুর মৃত্যুসংবাদ জেনেও রাজপুত অধিনায়ক বিজয় সিংহ অল্পকিছু অশ্বারোহী অনুচর নিয়ে আলীবর্দী বাহিনীর ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণই আত্মসম্মান আছে, এই মন্ত্রে সেই রাজপুতবীর অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুভয়কে পায়ের ভৃত্য বানিয়ে স্বয়ং আলীবর্দীর হাতিটিকে বর্শার আঘাতে জর্জরিত করে তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। কিন্তু আলীবর্দীর নির্দেশে গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ দাওর কুলীর এক অব্যর্থ গুলিতে রাজপুতবীর বিজয় সিং গিরিয়া প্রান্তরে নিজের বহুমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

তখন আলীবর্দীর আফগান সেনাদের বিজয়োল্লাসে গিরিয়ার প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল। মুর্শিদাবাদের মসনদ আলীবর্দীর ছোঁয়ায় শিহরিত হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গোনা শুরু করল। ঠিক এমন সময় সমরক্ষেত্রে উপস্থিত সকলের নজর কাড়ল এক নয় বছরের বালক!

হিন্দু পিতার মৃতদেহ যাতে মুসলমান সেনারা স্পর্শ না করে, সেজন্য সে একটা ক্ষুদ্র তরবারি হাতে ধরে শূন্যে আস্ফালন করতে করতে আফগান সেনাদের বাধা দেওয়ার উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়তে লাগল, 'খবরদার! খ-ব-র-দা-র! আমার বাবাকে ছোঁয়ার আগে তোমরা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো! ক্ষমতা থাকলে এগিয়ে এসো! কোনো মুসলমান আমার বাবার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করলেই তাকে আমার হাতে মরতে হবে।' রণবাদ্যের বিজয়ধ্বনিতে যখন দশদিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে এই ক্ষুদ্র বালকের দীর্ঘ কণ্ঠস্বর বাংলার হবু নবাবের কানে গিয়ে পৌঁছোল। তিনি বালকের এ অসম সাহসিকতা আর পিতৃভক্তি দেখে শিহরিত হয়ে উঠলেন! ফলত আলীবর্দীর নির্দেশেই তাঁর হিন্দু সেনানিদের সাহায্যে রাজপুত্র রীতি মেনেই মৃতদেহটির সৎকার করা হল। আর শত অবক্ষয়ের মাঝেও আলীবর্দী বোধহয় ঠিক এই প্রসঙ্গেই মহাত্মার সম্মানে উন্নীত হলেন।

কিন্তু এই বালকটি সুদীর্ঘ নবাবী ইতিহাসের কালান্তরে কোথায় যেন হারিয়ে গেল! জানি না, কোনো ইতিহাস গবেষক তাকে বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে কোনোদিন তুলে আনবেন কিনা!

রাজপুতবীর বিজয় সিংহের সন্তান এই সেই জালিম সিংহ। যাকে আজীবন মনে রেখে বাংলার নবাব আলীবর্দী খান বোধহয় বার বার এই এক কথাই বলতেন—

'জো তুফানো মেঁ খলতে জা রহে হ্যাঁয়
ওহি দুনিয়া বদলতে জা রহে হ্যাঁয়।'

হয়তো আজও খোশবাগের শীতল অন্ধকারে আলীবর্দী খান এই জালিম সিংহকেই খুঁজে চলেছেন! কারণ সে যে নবাবের চোখের আলো, নুরচাজম!❖

কমনওয়েলথের মঞ্চে চানু-জেরেমিকে ছাপিয়ে গেলেন বাংলার

অচিন্ত্য শিউলি

অগ্নি সান্যাল

বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ভারোত্তোলনে যেন মিজোদের আধিপত্য। ব্রিটেন, নাইজেরিয়ার ভারোত্তোলোকেরা যেন মিজোদের সামনে দাঁড়াতেই পারছেন না। গেমসের প্রথম দিনে মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে দেশকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছিলেন মীরাবাই চানু। পরপর তিনটি গেমসে তাঁর পদক। শেষ দুটিতে সোনা। ২০১৪ সালে জীবনের প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে জিতেছিলেন ব্রোঞ্জ। গত বছর অলিম্পিকসে রুপো পেয়েছিলেন। রুপো জেতার জন্য মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে দিয়েছিলেন দুই কোটি। কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছিল এক কোটি। কিন্তু ফোকাস হারাননি মীরাবাই। যিনি জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে হয়ে ওঠেন ভারোত্তোলক। কারণ তিনি এত কাঠ বয়ে আনতেন যে তা দেখে পরিবারের লোকজনদের মনে হয়েছিল এই মেয়েটির মধ্যে আলাদা শক্তি আছে। জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেতে তিনি ব্যবহার করতেন নিত্য প্রয়োজনীয় পরিবহনকারী একটি ট্রাককে। তাঁর সঙ্গে দারুণ ভাব জমে গিয়েছিল চানুর। অনেকটা বাবা-মেয়ের সম্পর্কের মতো। অলিম্পিক মেডেল পাওয়ার পর পাতানো বাবাকে বাড়িতে ডেকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন উপহারে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে ছবি পোস্ট করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। হিন্দিতে না হলেও চানুকে নিয়ে মিজো ভাষায় সিনেমা হয়েছে। এবার হয়তো হিন্দিতেও হবে চানুর জীবন কাহিনি।

মূল্যবোধের সংজ্ঞা পাল্টে দেওয়া চানুকে পাথেয় করে মিজোরাম থেকে উঠে এসেছেন জেরেমি লালরিঙ্গুন। ফেব্রুয়ারি মাসে মেরুদণ্ডের ব্যথায় যিনি ছিলেন কাবু। এক মাস ছিলেন প্র্যাকটিসের বাইরে। কিন্তু সময় মতো পেইন ম্যানেজমেন্ট তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনে ফ্লোরে। চানুর কোচ বিজয় শর্মা তাঁকে যত্ন নিয়ে তৈরি করছেন। তবে গেমসের তৃতীয় দিনে চানু-জেরেমিকে ছাপিয়ে গেলেন বাংলার অচিন্ত্য শিউলি। পুজো এলে বাণীকুমার রচিত মহিষাসুরমর্দিনীতে বাজে 'তব অচিন্ত্য' গানটি। বার্মিংহামে কমনওয়েলথ গেমসে অচিন্ত্যর সাফল্যে বাতাসে যেন পুজোর গন্ধ। ৩১ জুলাই ভোরে হাওড়ার দেউলপাড়ায় শিউলির আগাম গন্ধ।

রিকশাওয়ালার ছেলে অচিন্ত্য। অষ্টম দাসের তত্ত্বাবধানে হাওড়ার অন্নপূর্ণা ব্যায়ামাগারে তাঁর অনুশীলন শুরু। খেলো ইন্ডিয়ায় ৭৩ কেজি ক্যাটাগেরিতে সোনা পাওয়ায় পুণেতে সেনা স্পোর্টস স্কুলে ডাক পান। পারফরম্যান্স ভালো হওয়ায় সেনার চাকরিও পেয়েছিলেন। কিন্তু জওয়ানের কাজ করতে গিয়ে প্র্যাকটিসের সময় কম পড়ে যাচ্ছিল। তাই সেনার চাকরি ছেড়ে চলে আসেন হাওড়ায় অষ্টম স্যারের ব্যায়ামাগারে। সেই সময় সংসারে আর্থিক সাহায্য করতে ৫০০ টাকার মাহিনাতে কাজও করেছেন চায়ের দোকানে। এইভাবেই তিনি এশিয়ান জুনিয়র ওয়েট লিফটিংয়ে সোনা পেয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক স্তরে ভালো করতে তাঁকে ফিরে যেতে হয় পুণের স্পোর্টস স্কুলে। আসলে এটি এখন ভারতে শুট্যার ও ভারোত্তোলক তৈরির কারখানা। প্রধানমন্ত্রী এই স্কুলটিকে আরও আধুনিক করেছেন। ১৯ বছরের অচিন্ত্যর সাফল্যে তাঁর জীবন সংগ্রামের পাশে এই স্পোর্টস স্কুলের ভূমিকাও কম নয়। একটা সময়ে আধপেটা খেয়েও অচিন্ত্যর সোনালি সাফল্যকে কুর্নিশ করতেই হচ্ছে।

জেরেমির সংগ্রামও মনে রাখার মতো। মার্চে চোট সারিয়ে তিনি দেখেন বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসের মেডেল তাঁর সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। সেই পদক তিনি ডাউনলোড করে মোবাইলের ওয়েল পেপারে রেখে দেন। ৬৭ কেজি বিভাগে কমনওয়েলথ গেমসে রেকর্ড করে তিনি বলেছেন, 'গত চার মাস ওই পদক মোবাইলের ওয়েল পেপারে দেখে ঘুমোতে গিয়েছি। সকালে উঠে আবার দেখেছি। এইভাবে নিজেকে অনুপ্রাণিত করেছি। চোটের সময়ে যাঁরা আমার রি-হ্যাবের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। বাঁশ আর পাইপ দিয়ে আমার ভারোত্তোলোকের যাত্রা শুরু হয়েছিল। মিজোরামে তেমন পরিকাঠামো ছিল না। পুণেতে গিয়ে বিজয় শর্মাজির কাছে সব কিছু শিখেছিলাম। তখন মিজো ছাড়া কোনও ভাষা নেই। আস্তে আস্তে হিন্দি শিখেছিলাম। পাতিয়ালায় গিয়ে শিখেছিলাম পাঞ্জাবি। ২০১৯ সালে চোট পাওয়ায় ২০২০ সালে এশিয়া ও ২০২১ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নে মোটেই ভালো করতে পারিনি। তাই কমনওয়েলথ গেমস ছিল চ্যালেঞ্জের।'

পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয় জেরেমি। জেরেমির বাবা ছিলেন ভারোত্তোলক। সাব জুনিয়র পর্যায়ে তিনি ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। তাঁর দুটি সোনার পদক ছিল। পাঁচ ভাই সেটা নিয়েই খেলত। তার মধ্যে একটি সোনার পদক হারিয়ে যায়। বাড়িতে বাবার কাছে বকুনি খেয়েছিলেন জেরেমি। আসলে পদকটি নালায় পড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে ভারোত্তোলক হওয়াকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। স্বপ্ন সফল করতে আইজল ছাড়তে হয়েছিল। প্রথম দিকে অসুবধা হয়েছিল। পুণেতে সেনাবাহিনীর স্পোর্টস স্কুলে জেরেমি ছিলেন নেহাতই লাজুক। ২০১৭ সালে যুব বিশ্ব ভারোত্তোলনে সোনা পাওয়াটাই তাঁর জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। করোনা কালে ফোকাস হারাননি। ব্যস্ত ছিলেন চোট নিয়ে। কমনওয়েলথ গেমসে সোনা পাওয়ার পর আর পিছিয়ে থাকতে চান না। দুই বছর পর অলিম্পিক। ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমস। যেখানে চিন-জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বীরা থাকবেন। সেই চ্যালেঞ্জ জয় করাই তাঁর এখন মিশন।

সূর্যর "কেরিয়ার অপরাহ্নে" যেন মধ্যাহ্নের তেজ

কোনো সন্দেহ নেই বিরাট কোহলি অত্যন্ত বড়ো মাপের ক্রিকেটার। ব্যাটিং প্রতিভায় তাঁর আগে শুধু থাকবেন সুনীল গাভাস্কার, শচীন তেন্ডুলকার এবং রাহুল দ্রাবিড়।

ব্যাট করার সময় বিরাটের হাতে থাকে হাতলের উপরের অংশ। সম্প্রতি লারা বলেছেন, " যারা এই স্টাইলে ব্যাটিংয়ে রপ্ত তারা একবার ফর্ম হারালে ফিরে পাওয়া কঠিন। বিরাটের ক্ষেত্রে কথাটা ১০০ ভাগ। ৩২ বছর বয়সে সত্যি তাঁর কেরিয়ার যেন পদ্মপাতায় জল। টি-২০, বিশ্বকাপে তাঁর দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধরনের ক্রিকেটেই অনেকটা নেমে গিয়েছেন। টি-২০ ক্রিকেট এবং টেস্ট ম্যাচে একসময়ে শীর্ষে থাকা বিরাট এখন ১০ নম্বরে। একদিনের ম্যাচে চার নম্বরে।

বিরাট কোহলি নিঃসন্দেহে জাত খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ জয়ী অনূর্ধ্ব- ১৯ দলের অধিনায়ক। ২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত দাপিয়ে বেড়িয়েছেন বিশ্ব ক্রিকেটে। নিজে হাতে শাসন করেছেন প্রতিপক্ষ বোলারদের।

তাঁর সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন হার্টথ্রব সূর্য কুমার যাদবের তুলনা হয়তো চলে না। কিন্তু একটা কথা বলতেই হচ্ছে ৩২ বছরে বিরাটের কেরিয়ার যখন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে (বিশেযত ইংল্যান্ড সফরের পর ক্যারিবিয়ান সফরে না গিয়ে ইংল্যান্ডে এক মাসের ছুটি কাটানো নিয়ে বিতর্ক) তখন কেরিয়ার অপরাহ্নে সূর্য কুমার যাদবের ব্যাটে যেন মধ্যাহ্নের তেজ। গত চার বছর ধরে তিনি এই তেজ দেখিয়েছেন আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। সূর্য অত্যন্ত কার্যকরী ব্যাটসম্যান ওই দলের। মাহেলা জয়বর্ধনের কাছে ব্যাটিংয়ের টিপস-এ মুম্বাইকরের এই ব্যাটিং টেকনিক যেন আরও উন্নত হয়েছিল। সূর্য কুমার যাদব কিন্তু বিরাটের মতো এজ গ্রুপ টিম থেকে উঠে আসেননি। ট্যাটুপ্রেমী সূর্য কুমার যাদব আসলে মুম্বাইয়ের দিলীপ বেংসরকার ক্রিকেট প্রোডাক্ট। সূর্য কিন্তু এক অর্থে বিহারিবাবু। তাঁর জন্ম বিহারের গাজিপুরে। বাবা আকাশ যাদব চাকরি-সূত্রে চলে আসেন মুম্বাইয়ে। তখন সূর্যর বয়স মাত্র চার। মুম্বাই শহরতলিতে আস্তে

আস্তে বড়ো হতে থাকেন সূর্য কুমার যাদব। ক্রিকেট মুম্বাইবাসীদের রক্তে। বাড়ির সামনে ক্রিকেট খেলত বাচ্চারা। সূর্য আর দশটা ছেলের মতো সেখানেও খেলত। তার হাতে ছিল জোরালো হিট। আশেপাশে বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে যেত। নালিশ আসত সূর্যের পরিবারের কাছে। এইসব ঘটনা বিড়ম্বনায় পড়ে যেত যাদব পরিবার। তাই সূর্যের বাবা তাকে নিয়ে যান বেংসরকারের ক্রিকেট একাডেমিতে। রাস্তার ক্রিকেটে যদিও তার অপরিকল্পিতভাবে প্রাথমিক পাঠ হয়ে থাকে, তবে ওই একাডেমিতে তিনি স্নাতক হন।

মুম্বাইয়ের বিভিন্ন এজ গ্রুপ টুর্নামেন্ট খেলতে শুরু করেন। একটু নাম ডাক হয়। মুম্বাই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পান ২০১০ সালে। সেই সূত্রে 'লোকাল খেলোয়াড়দের কোটায়' ২০১২ সালে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স দলে ডাক পেয়েছিলেন। সূর্য কুমারকে সেবার ৩০ লাখে দলে নিয়েছিল মুম্বাই। সুযোগ পেয়েছিলেন মাত্র একটি ম্যাচ খেলার। ওই ম্যাচে ব্যর্থ হন সূর্য কুমার। মুম্বাই তাঁকে আর রাখেনি। ২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। এই সময় কোচের পরামর্শ তাঁর ব্যাটিং স্টান্ট বদলে দিয়েছিল।

ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি ব্রেক থ্রু পেয়ে যান ২০১৫ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-এর বিরুদ্ধে পুরনো জমে থাকা অভিমান কিংবা রাগ বাইশ গজে ঢেলে দিয়েছিলেন সূর্য। মাত্র কুড়ি বলে ৪৭ রান করে দলকে জিতিয়েছিলেন।

সেদিন ম্যাচের পর দর্শকদের সামনে সূর্য কুমারকে জড়িয়ে ধরে শাহরুখ খানের আলিঙ্গন এখনো অনেক ক্রিকেটপ্রেমীর চোখে ভাসে। সূর্যের খেলা সেদিন মুম্বাইয়ের মালকিন নীতা আম্বানির মনে ধরে যায়। কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে ২০১৫ সালে ২.৮ কোটি টাকা দেওয়ার অফার দিয়েছিল। ৪০ লাখ বাড়িয়ে তিন কোটি কুড়ি লাখ টাকায় কিনে নেয় মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। সেটা ২০১৬ সালের কথা। সেই থেকে নীতা আম্বানির দলই ঠিকানা কুমারের।

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো এবার অক্টোবরে হতে চলা অস্ট্রেলিয়া বিশ্বকাপে সূর্য কুমার ভারতের প্রধান ব্যাটসম্যান হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন। বিশেষত প্রাক্তন ক্রিকেটারদের প্রবল জনমতের চাপে বিরাট কোহলি আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আদৌ দলে থাকবেন কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। ফর্মের বিচারে সূর্য কুমার চার নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে বিরাট কোহলিকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রিপ্লেস করার জন্য যেন প্রহর গুনছেন।

বিদেশের মাটিতে আরো ভেলকি দেখাবেন সূর্য কুমার। তবে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাঁর তেজ নিশ্চয়ই দেখা যাবে। বিশ্বের সবার আগে সূর্য ওঠে জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া- নিউজিল্যান্ডে। ৩১ ডিসেম্বর আমরা যখন পার্ক স্ট্রিটে পুরনো বছরকে বিদায় জানাই তখন অস্ট্রেলিয়ায় নতুন বছর শুরু হয়ে যায়। উদিত সূর্যের দেশে সূর্যরথে যেন সফল হয় এই মুম্বইকর। এমনও কামনা করে ভারতীয় ক্রিকেটের সমর্থকরা।

করোনা পরবর্তী সময় যেন 'গোল্ডেন টাইম' হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে। নিয়মিত ছন্দে আছেন। ২০২১ সালের জুলাই মাসে একদিনের ক্রিকেটেও সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সাদা বলে ক্রিকেটে ভালো খেলে টেস্ট খেলার স্বপ্ন তাঁর। সেই সঙ্গে আগামী বছরের আইপিএলে মুম্বাইকে চ্যাম্পিয়ন করতে চান তিনি। চাইবেন—এটাই স্বাভাবিক।

আন্তর্জাতিক টেনিস সার্কিট-এর চোখ টানছেন

নিক কিরগিওস

চোটের জন্য গত দেড় বছর আন্তর্জাতিক টেনিস সার্কিটে সেই ভাবে খেলতে পারছেন না রজার ফেডেরার। চোট সারিয়ে এ বছরের মাঝামাঝি সময় দারুণ ভাবে ফিরে এসেছেন রাফায়েল নাদাল। ফ্রেঞ্চ ওপেনে তাঁর সাফল্যের কাহিনি যেন রূপকথা। এই দুজন মহারথীর পাশে আলাদা করে উল্লেখ করতে হবে জোকোভিচ-এর কথা। এই মুহূর্তে প্রথম দুজন উল্লেখিত টেনিস জগতে মহা তারকা। সম্প্রতি টানা ছ-বার অসাধারণ রেকর্ড করেছেন তিনি। রাফায়েল নাদাল কিংবা রজার ফেডেরার থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে জোকোভিচ।

কিন্তু এই তিন মহা তারকার পর কে? লিও মেসি কিংবা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর উত্তরসূরি হিসেবে ফিল ফডেন কিংবা ভিনিসিয়াস জুনিয়র অনেকটাই রেখাপাত করেছেন। টেনিস সার্কিট এই তিনজনের উত্তরসূরি হিসেবে একটা সময় অ্যান্ডি মারেকে দেখছিল। কিন্তু ব্রিটিশ এই তারকার ধারাবাহিকতার অভাব প্রচণ্ড। করোনার পর তিনি সেভাবে নিজের পারফরম্যান্স তুলে ধরতে পারেননি। করোনা আসার আগে গুটি গুটি পায়ে অ্যান্ডি মারেকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান টেনিস তারকা নিক কিগিওয়াস। আন্তর্জাতিক টেনিস র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁর সবচেয়ে ভালো অবস্থা ছিল ২০১৬ সালে। র‍্যাঙ্কিংয়ে তিনি ছিলেন তেরো নম্বর। তারপর নিজের ছন্দ কিছুটা ধরে রেখেছিলেন, কিন্তু করোনা কালে তাঁর পারফরম্যান্স সেই ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল না। সেখান থেকে অবাছাই খেলোয়াড় হিসেবে তিনি এবার উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের বিভাগের ফাইনালে উঠেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছেন সার্বিয়ার টেনিস তারকা জোকোভিচ-এর কাছে।

খুব বেশি খেলোয়াড় প্রথম সাক্ষাতেই উল্লেখিত তিন মহা

তারকাকে (নাদাল, ফেডেরার ও জোকোভিচ) হারাতে পারেননি। কিন্তু নিক প্রথম সাক্ষাৎকারেই রজার ফেদেরার, জোকোভিচ এবং রাফায়েল নাদালকে হারিয়েছেন। এই তারকা টেনিস কোর্টের সত্যিই 'সামথিং ডিফারেন্ট'।

ক্রিকেট টেস্টে রিকি পন্টিং, স্টিভ স্মিথ, স্টিভ ওয়া স্লেজিং কথাটি আমদানি করেছিলেন। টেনিস সার্কিটে এই ব্যাপারটি আমদানি করেছেন এই অস্ট্রেলিয়ান তারকা। স্লিজিংয়ের দ্বারা ক্রিকেটে মনসংযোগ নষ্ট করে দেওয়া হয় প্রতিপক্ষের। কোর্টে নিক কিরগিয়াস সেই পন্থা নিচ্ছেন।

এবার উইম্বলডন ফাইনালের আগে তিনি প্রতিপক্ষ জোকোভিচ-কে ইনস্টাগ্রামে শুভেচ্ছা জানান। তাঁর জন্য হার অপেক্ষা করছে এমন কথা জানাতে ভোলেননি। এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে ফাইনালে প্রথম সেটটি কিন্তু জিতে নিয়েছিলেন নিক কিরগিয়াস। বাকি তিনটি সেটে দারুণ লড়াই করে হার স্বীকার করেন। অস্ট্রেলিয়ায় ক্যানবেরাতে বাড়ি তাঁর। বয়স ২৭ বছর। উচ্চতার ছ ফুট চার ইঞ্চি, যার ফলে তাঁর সার্ভিসের প্রচণ্ড জোর এবং ভ্যারাইটি। প্রচণ্ড সক্রিয় ব্যাকহ্যান্ড এবং ফোরহ্যান্ডে।

আপাতত ছটি এটিপি সিরিজ জিতেছেন তিনি। গ্র্যান্ড স্লামের নাগাল এখনো পাননি। প্রথম সেটে এগিয়ে গিয়ে কেউ এবারে উইলম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি।

আগামী দিনে তিনি কেমন ফল করেন সেই দিকে তাকিয়ে সবাই।

এভারেস্ট জয়ী পিয়ালি

সুজন ঠাকুরতা

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন, "অসম্ভব বলে কোনো কিছু আমার অভিধানে নেই"—সেই কথার বাস্তব প্রতিফলন যেন ঘটালেন ২০২২ সালের ২২ মে, বাংলার গর্ব, চন্দননগরের শিক্ষিকা পিয়ালি বসাক, দুর্গম এভারেস্ট জয় করে। সমস্ত বাধা, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে, অসম্ভবকে সম্ভব করলেন হুগলির এই মেয়ে, গর্বিত করলেন সমগ্র দেশকে, আপামর বাংলার জনগণকে।

অদম্য জেদ, হার না-মানা মনোভাব, হিমালয় প্রমাণ আর্থিক বাধার সামনেও লড়াই করার মানসিক শক্তি। নিজের দক্ষতার উপর ভরসা, এর জোরেই রবিবার ২২ মে বিশ্বের উচ্চতম শৃঙ্গের শীর্ষ স্পর্শ করলেন চন্দননগরের তনয়া পিয়ালি বসাক। ওই দিন রবিবার স্থানীয় সময় সকাল দশটা নাগাদ ৩ জন শেরপাকে নিয়ে এভারেস্টের (৮৮৪৮ মিটার) সামিটে পৌঁছোন তিনি। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে শেষ পর্যন্ত শেষ সময়ে অক্সিজেন সিলিন্ডারের সাহায্য নিতে হয়েছে পিয়ালিকে। পিয়ালির সামিটের খবর দেন আয়োজক সংস্থা "পায়োনিয়ার অ্যাডভেঞ্চার"। সংস্থার তরফে পাগাং শেরপা কাঠমান্ডু থেকে জানান, 'পিয়ালি এবং তাঁর সঙ্গী দাওয়া শেরপা সামিট করে ফিরছেন। আবহাওয়া খুব খারাপ, তা সত্ত্বেও পিয়ালিরা সামিট করতে পেরেছেন, জয় করেছেন দুর্গম এভারেস্ট।" ২০০৫ সালে শিপ্রা মজুমদার, ২০১৩ সালে ছন্দা গায়েন ও টুসি দাসের পর আবার কোনো বাঙালি মহিলা এভারেস্ট-এ পা রাখলেন। বাঙালির এভারেস্ট জয় শুরু হয়েছিল ২০০৮ সালে সেনা অফিসার সত্যব্রত দামের হাত ধরে।

মনোবাঞ্ছা পূরণ হল, আবার হল না তীরে এসে তরী অবশ্য ডোবেনি। এভারেস্ট জয় তো তিনি করলেনই, শুধু শেষের প্রায় ৪০০ মিটারের জন্য অনন্য নজির হল না মাত্র ওইটুকু উচ্চতাই পিয়ালি বসাককে উঠতে হয়েছিল অতিরিক্ত অক্সিজেন-এর সাহায্য নিয়ে। এই ব্যাপারটা পিয়ালির কাছে স্বপ্নভঙ্গ, কিন্তু অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়া ৮৪৫০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত কতজন ভারতীয়ই বা পৌঁছতে পেরেছেন! আজ পর্যন্ত কোনো অসামরিক পর্বতারোহী অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টের ওই উচ্চতায় পৌঁছোতে পারেননি।

স্বাধীনতার ৭৫ তম বছরে এই অনন্য নজির গড়লেন ৩১ বছরের বাঙালি তরুণী, চন্দননগরের স্কুল শিক্ষিকা পিয়ালি বসাক। কাঠমান্ডুর এজেন্সি সূত্রে জানা যায়, ৮৪৫০ মিটার অর্থাৎ 'ব্যালকনি' (যাত্রাপথের ওই অংশের নাম) পর্যন্ত তিনি অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়াই আরোহণ করেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ খারাপ আবহাওয়ার জন্য তাঁকে অক্সিজেনের সাহায্য নিতে হয়। প্রায় ১৪ ঘণ্টা লেগেছে পিয়ালির এভারেস্ট শৃঙ্গে পৌঁছোতে। সামিট করার পর ফেরার সময় ক্যাম্পে পৌঁছোতে অনেক সময় লেগেছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে। মাত্র কয়েকমাস আগে অক্সিজেন ছাড়া অষ্টম উচ্চতম শৃঙ্গ "ধোলাগিরি" জয় করেছিলেন পিয়ালি। চতুর্থ বাঙালি মেয়ে হিসাবে এভারেস্ট জয় করলেন বাংলার কৃতী তনয়া পিয়ালি বসাক। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা বেশি উচ্চতাতেও বেশি থাকে। এটাই প্লাস পয়েন্ট ছিল চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দিরের (ইংরেজি বিভাগ) প্রাথমিক বিভাগের শিক্ষিকা পিয়ালির। তাই এইবারে তাঁর লক্ষ্য ছিল অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়া এভারেস্ট-লোৎসে আরোহণ। অর্থাভাব, সমস্যা কোনো কিছুই এবার আটকাতে পারেননি পিয়ালিকে, কারণ ২০১৯ সালে তাঁর স্বপ্ন যে পূরণ হয়নি।

এই বছর রাজ্য থেকে এভারেস্ট অভিযান করেছিলেন একমাত্র পিয়ালিই। সেই মতো এপ্রিলের শুরুতে কাঠমান্ডু গিয়ে মরশুমের প্রথম দিকে এভারেস্ট বেসক্যাম্পে পৌঁছোলেও অর্থাভাবে বার বার হোঁচট খেয়েছেন। ঋণের বোঝা ছিল প্রথম থেকেই। আর এই জোড়া অভিযানের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ মেলেনি। ক্রাউড ফান্ডি করে প্রয়োজনের ৩৫ লক্ষ টাকার কিছুটা জমা দিতে পারায়, প্রথমে লোৎসে যাওয়ার অনুমতি পান পিয়ালি কিন্তু তাঁর পাখির চোখ ছিল এভারেস্ট। লোৎসে ট্রাভার্স (অর্থাৎ প্রথমে এভারেস্ট সামিট করে সেখান থেকে লোৎসে)। তাই দিনের পর দিন ক্যাম্প-এ বসে অপেক্ষা করেছেন। খাওয়াদাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে টাকা জোগাড়ের চেষ্টা করেছেন। এক সময়ে বেসক্যাম্পে ফিরে আসতে হলেও হাল ছাড়েননি। শেষে অভিযানের খরচ বাবদ আরও ১২ লক্ষ টাকা বাকি থাকতেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত এভারেস্ট যাওয়ার পারমিট দেয়

আয়োজক সংস্থা। তারপর শুরু হয় ''ক্যাম্প ৪'' থেকে এই বঙ্গ তনয়ার এভারেস্ট যাত্রা। শেষ পর্যন্ত আসে সেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য।

পিয়ালির এই সাফল্যের খবরে খুশিতে ভাসছে তাঁর পরিবার, জেলা ও রাজ্য। গোয়া থেকে বোন তমালি বলেছেন, ''জানতাম দিদি ঠিক পারবে'' আর চন্দননগরের কাঁটাপুকুরের বাড়িতে বসে মা স্বপ্না বসাক বলেছেন, ''বিগত দু-তিন দিন সেইসময় টেনশনে শরীর খারাপ হয়ে গেছিল, দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মেয়ের জেদের জন্যই এই অসাধ্য কাজ সম্ভবপর হল।'' পিয়ালির পাশে দাঁড়িয়েছিল চন্দননগরের পর্বতারোহণ সংস্থা ''গিরিদূত''। গিরিদূতের কর্ণধার কল্যাণ চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত পিয়ালির সাফল্যে। গর্বিত চন্দননগরের মেয়ের জন্য। চন্দননগরের ''সবুজের অভিযান'' ক্লাবের তরফ থেকেই সাহায্য করা হয়েছিল পিয়ালিকে। তাদের কথায় শুধু চন্দননগর নয়, বাংলা আজ গর্বিত পিয়ালির জন্য।

তবে একটা ঘটনার কথা না বললে বোধহয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এই প্রতিবেদন। সাক্ষাৎকারের সময় চন্দননগরের কাঁটাপুকুরের বাড়িতে বসে অনেক কথা বলেছিলেন পিয়ালি। সেইসব ঘটনা শুনলে গায়ে যেন কাঁটা ফুটতে থাকে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। কথা প্রসঙ্গে পিয়ালি জানান, ''সামিট করে, লোৎসের ক্যাম্প-২ থেকে নামছি বেস ক্যাম্পের দিকে, আবহাওয়া খারাপ, জোরে হাওয়া চলছে। খুব আইসফল। এলাকা পর্যন্ত তখনও পৌঁছোইনি, হঠাৎ দেখলাম পায়ের নীচের ঝুরঝুরে বরফ সরে গিয়ে আমি নীচে নেমে যাচ্ছি। ক্রিভাসের (বড়ো ফাটল) মধ্যে খারাপ আবহাওয়া আর তুষারঝড়ের জন্য নতুন বরফ পড়ে ছোটো ছোটো ক্রিভাসগুলি ঢাকা পড়ে গেছিল। আর আমার পায়ের জুতোয় ক্র্যাম্প লাগানো ছিল না, ''রোপ তাগ' করাও ছিল না। আর সেই ভুলের চরম মাশুল দিতে যাচ্ছিলাম আমি। মুহূর্তে দেখলাম ক্রিভাসের মধ্যে ঝুলছি। তবে ভাগ্য ভালো ক্রিভাসের সরু এক জায়গায় একটা পা আটকে যায়, নইলে আজ আমায় খুঁজে পাওয়া যেত না।'' একনাগাড়ে বলে একটু থামলেন পিয়ালি।

পিয়ালি আরও বলে চলেন, ''সেইসময় ওই চত্বরে আমি আর দাওয়া শেরপাজি ছাড়া আর কেউ ছিল না। কেউ কোথাও নেই। শুধু বরফ আর প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া। দাওয়া শেরপার পক্ষে একা আমায় তোলা সম্ভবপর ছিল না। ওয়াকিটকির ব্যাটারির চার্জ শেষ। কাউকে খবর দিতে পারছি না। শেষে দাওয়া শেরপাজি ছুটলেন ক্যাম্প ২-এর দিকে সাহায্যের জন্যে। তখন আমি ক্রিভাসে একা আটকে ঝুলছি মা আর বোনের মুখ মনে পড়ছিল ভাবছিলাম আর বোধহয় বাড়ি ফেরা হল না। ঈশ্বরকে ডেকেছি, মনের জোর হারাইনি। মনকে বলেছি আমি পারব, আমায় পারতেই হবে। কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্প ২ থেকে বিশিষ্ট পর্বতারোহী নির্মল পুরজার সঙ্গী সিংমা ডেভিড শেরপা, সঙ্গে আরও পাঁচ-ছয়জন এলেন আমায় উদ্ধার করতে। ততক্ষণ ক্রিভাসের দেওয়াল আঁকড়ে কোনোমতে ঝুলেছিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক। দিনের বেলা ছিল বলে কিছুটা স্বস্তি ছিল, তখন বুঝেছি জীবন-মৃত্যুর রহস্য। বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছে। ছন্দাদির মতো হারিয়ে যেতে যেন না হয় পাহাড়ের কোলে। সেদিনের সেই ঘটনা যেন আমায় নতুন জীবন দান করেছে।''

প্রথম মহিলা হিসাবে এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করার কৃতিত্ব লাভ করেন জাপানের জুনকো তা সেই ১৯৭৫ সালে। প্রথম মহিলা ভারতীয় হিসাবে এভারেস্ট জয়ের নজির রয়েছে বাচেন্দ্রি পালের, ১৯৮৪ সালে আর ২০২২ সালে সেই কৃতিত্ব বা নজির স্পর্শ করেন বাংলার তনয়া পিয়ালি বসাক। বিপদ মাথায় করে ভয়ংকর তুষারঝড়ের মধ্যে সেদিন শুধু পিয়ালিরাই ''সামিট'' করেছিলেন। বাকিরা 'সামিট পুশ' করে ফিরে যান। পিয়ালি আরো বলেন, ''বিরতি পথে সেদিন শুধু আমরা দুইজন, তুষারঝড় ভয়ংকর আকার নিয়েছে। চারিদিকে হোয়াইট আউট, প্রচণ্ড ঠান্ডার দাপট, ঝাপটা মারছে চোখে-মুখে। 'স্নো গগলসের' উপরে বরফের আস্তরণ জমে যাচ্ছে। মরণ-বাঁচন পরিস্থিতি, দাওয়া দাজু ওয়াকিটাকি-তে নীচে যোগাযোগ করলেন। সামিটের খবর জানিয়ে বলেছিলেন, হয়তো বেঁচে ফিরব না। এদিকে তুষারঝড়ের ভয়ে সামিট ক্যাম্প থেকেও পর্বতারোহীরা নীচে নেমে গিয়েছেন। ফলে আমরা দুজন পথ হারালে বা বিপদ হলে সাহায্য পাবারও আশা নেই। ঝড়ের দাপট প্রচণ্ড বেশি, আমাদেরকে বারে বারে ফেলে দিতে চাইছে যেন। রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে সেদিন ফিরে এসেছিলাম। দুজন সামিট ক্যাম্পে ফিরেছিলাম। পেয়েছিলাম মৃত্যুভয়। কিন্তু মনকে যেন হারতে দিইনি, বারে বারে মনে পড়ছিল মায়ের কথা, কথা দিয়েছিলাম ফিরে আসব।'' ফিরে এসেছেন পিয়ালি, গর্বিত করেছেন চন্দননগর সহ সমগ্র রাজ্যকে। পিয়ালির অদম্য সাহস, জেদ, লড়াই করার, হার না-মানার মানসিকতাকে তাই কুর্নিশ না জানিয়ে কোনো উপায় নেই।

ওদের চোখে আশার আলো

বীরু বসু

কিয়ান নাসিরি গিরি (ফুটবল)

বাবা বিদেশি ফুটবলার। জামসেদ নাসিরি। তাঁকে অনুসরণ করেই ফুটবল জগতে বড়ো হতে চায় ছেলে কিয়ান নাসিরি গিরি। কিয়ান কলকাতার ছেলে। মা সুজান গিরি ভারতীয়। জন্মভিটে কলকাতা হওয়ায় বাংলার মাটি, বাংলার সংস্কৃতি সবই এখন কিয়ানের বাল্য জীবনকে বড়ো করে তুলেছে।

বাবার সাথে থাকতে থাকতে চেনা অবস্থাতেই গড়ের মাঠের সবুজ ঘাসকে চিনে ফেলেছে একুশ বছরের ছেলে কিয়ান।

ফুটবল তার রক্তে। তাই ফুটবল খেলাটাকেই ভালোবেসেছে। দুঃখিরাম ফুটবল কোচিং ক্যাম্প ছিল কিয়ানের ফুটবলের আঁতুড়ঘর। বাল্যকালেই কোচ মনোজিৎ দাস-এর কাছে তার ফুটবলে পায়েখড়ি।

তারপর থেকেই ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে কিয়ানের বাল্য জীবনের ফুটবল বোধ। অতীতে বাবা ইস্টবেঙ্গল-মহামেডানের জার্সি গায়ে মাঠে নামলেও সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে জামসেদ নাসিরি কখনো ফুটবল খেলেননি।

মোহনবাগান অ্যাকাডেমি, মোহনবাগান মাঠ, দর্শক এবং কর্মকর্তাদের প্রিয় ভালোবাসা কিয়ানকে ভালো খেলতে বরাবরই প্রেরণা যুগিয়ে গেছে। সেই প্রেরণার টানেই মোহনবাগান দলের হয়ে প্রচুর ম্যাচ খেলে আসা কিয়ান জ্বলে উঠেছিল গোয়ার মাঠে।

গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে খেলে আসা ফুটবল কিয়ানের সারা জীবন মনে থাকবে।

এই মাঠেই ঐতিহাসিক ডার্বি ম্যাচে সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে জীবনের প্রথম বড়ো ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল কিয়ান। সবে গড়ে ওঠা এক তরুণ ফুটবলারের তিনটি অসাধারণ গোল যেভাবে এস সি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে হার মানিয়েছে তা বিধাতার আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

দীপক সিংরির পরবর্তী খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে নেমে দুরন্ত হ্যাট্রিক করে পিছিয়ে পড়া মোহনবাগানকে শুধু ৩-১ গোলে জেতানোই নয়, বরং আই-এস-এল ফুটবল টুর্নামেন্টের টপ লিস্টে তুলে আনতে চোখের পলকে নায়ক হয়ে উঠেছিল বর্তমান প্রজন্মের এক তরুণ বালক কিয়ান নাসিরি। ফুটবল মাঠে কিয়ানের আত্মসম্মান বোধ অনেক। বয়সে তরুণ হলেও বড়োদের পাশে থেকে কমপ্লিট ফুটবল খেলতে শিখেছে কিয়ান। ম্যাচে নিজেকে না ভেবে দলকে জেতানোটাই ছিল তার লক্ষ্য। ডার্বি ম্যাচের দৌলতে তার দল এটিকে মোহনবাগান দলটিকে যে ভাবে সাফল্য এনে দিয়েছে তা বাংলার মানুষ চিরকাল মনে রাখবে।

অয়ন পাল (ব্যাডমিন্টন)

প্রচুর সাফল্য নিয়ে বাংলার ব্যাডমিন্টনে উঠে এসেছে উনিশ বছরের ছেলে অয়ন পাল। তেরো বছর ব্যাডমিন্টন খেলছে। তাতেই র‍্যাকেট হাতে সে পৌঁছে গেছে সাফল্যের শিখরে।

অতীতে রাজ্য ব্যাডমিন্টনে বয়সভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে সাফল্য পেয়ে থাকলেও সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত রাজ্য সিনিয়র ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় হুগলির ছেলে অনির্বাণ মণ্ডলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে অয়ন।

প্রশিক্ষক হিমাংশু গোস্বামীর হাতে গড়া ছাত্র অয়ন-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতার গ্রাফ এতটাই সরলরৈখিক যে এখনও পর্যন্ত খুব কম টুর্নামেন্টেই হারতে দেখা গেছে।

অয়ন উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ-এর ছেলে। বাড়ি সুভাষগঞ্জে। জেলা ব্যাডমিন্টন সংস্থার কোর্টেই ছ' বছর বয়সে ব্যাডমিন্টন খেলায় হাতেখড়ি। সর্ব বিষয়েই গুণী। লেখাপড়া, খেলাধুলা সবেতেই কৃতী ছাত্র। অয়ন শান্ত প্রকৃতির ছেলে এবং খেলার বিষয়ে অনন্যমনা। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে অনার্স নিয়ে প্রথম বর্ষে পড়ছে। তবুও থেমে থাকেনি। ব্যাডমিন্টন অন্ত-প্রাণ। বাবা উত্তম পাল এবং মা বীথি গুহ পাল। ছেলের খেলাটাকে এতটাই ভালোবেসে ফেলেছেন সেখানে এখনও ছেলেকে প্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন। দেখা যাবে প্রেরণার টানেই ছেলে অয়ন জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও সাফল্য পাবে। সেইদিন আসন্ন।

দেবজিৎ ঢেকি (সাঁতারু)

সাঁতারু গড়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন লক্ষ্মণ ঢেকি। হুগলি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েরা তাঁর প্রশিক্ষণেই সাঁতার শিখে জাতীয় স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেছে। বছরখানেক হল তিনি মারা গেছেন। স্ত্রী চৈতালি ঢেকি বহুবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বাংলাকে পদক এনে দিয়েছেন। কিন্তু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ছেলে দেবজিৎ-এর সাঁতার শেখার দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন জাতীয় কোচ তমাল দাস-এর হাতে। তমাল বহুকাল যাবৎ রিষড়া সুইমিং ক্লাব এর সঙ্গে যুক্ত।

মার ইচ্ছাপূরণে ছেলে দেবজিৎ এখন তমালের প্রিয় ছাত্র। খুব অল্প সময়েই তমালের প্রশিক্ষণে দ্রুতগতিতে উঠে এসেছে বাংলার অন্যতম সাঁতারু দেবজিৎ।

দুর্ভাগ্যবশত বাবার প্রশিক্ষণ না পেলেও মা চৈতালির প্রেরণাতেই বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে পদক জেতার সাহস পেয়েছে দেবজিৎ।

মাত্র ১২ বছরের ছেলে। অথচ গলায় ঝুলছে অসংখ্য মেডেল। বাবা লক্ষ্মণ ঢেকির কথা মনে পড়লে পদক জিততে আরো মরিয়া হয়ে ওঠে দেবজিৎ। প্রচণ্ড সাহসী ছেলে। আমি হারব না জিতব—এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী হয়েই পদক জেতার লক্ষ্যে জলে নামে।

সম্প্রতি তমালের প্রশিক্ষণে দেবজিৎ-এর দুটি বড়ো সাফল্য রাজ্য সাঁতারে ঢেউ তুলেছে। নেপথ্যে উঠে এসেছে বারোটি পদক। যা দেবজিৎ-এর সাঁতার জীবনকে অলংকৃত করে তুলেছে। গত বছর সালকিয়াতে অনুষ্ঠিত রাজ্য সাঁতারে অংশ নিয়ে ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ফ্রি-স্টাইল, ১০০ মিটার বাটারফ্লাই, ১০০ মিটার ব্রেক স্ট্রোক ছাড়াও ২০০ মিটার আই এম-এ তে জিতেছে সোনা। এমনকী এই সাফল্য গড়ার পরেই বাঙ্গালোরে জাতীয় সাবজুনিয়র সাঁতারে জিতেছে দুটি ব্রোঞ্জ পদক। ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ও ১০০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে। এবং বাকি রুপোটি জিতেছে ১০০ মিটার আই এম এ-তে।

চলতি মরশুমে বেহালাতে ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে জিতেছে সোনা, এবং ২০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল, ছাড়াও ৪০০ মিটার আই. এম. এ-তে জিতেছে রুপো। বাকিটি ৮০০ মিটার ফ্রি-স্টাইল ইভেন্টে জিতেছে ব্রোঞ্জ পদক।

একজন সাঁতারুর পক্ষে এই তরুণ বয়সে এতগুলো পদক অবশ্যই পিতৃহারা সন্তান দেবজিৎকে এগিয়ে চলার পথ দেখাবে।

অভিনব সাউ (শুটার)

গর্ব বাংলার, গর্ব দেশের। বিদেশের মাটিতে জুনিয়র বিশ্বকাপ শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিনিধিত্ব করে রুপো হাতে দেশে ফিরেছে আসানসোলের ছেলে অভিনব সাউ।

জার্মানির স্বল-এ অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে খেলতে নেমেছিল ভারতীয় দলের অন্যতম দুই প্রতিযোগী বঙ্গসন্তান অভিনব সাউ এবং মহারাষ্ট্রের ছেলে রুদ্রাংকাশ বালাসাহিব পাতিল।

কিন্তু খেতাবি লড়াইয়ে মুখোমুখি হয়েছিল ভারতেরই দুই তারকা রুদ্রাংকাশ এবং বাংলার ছেলে অভিনব। কিন্তু শুটিং রেঞ্জে দুরন্ত ফর্মে থাকা সত্ত্বেও প্রথম হতে ব্যর্থ হয়েছে অভিনব। ফলাফলের নিরিখে সোনা ও রুপো জিতেছে ভারত এবং ব্রোঞ্জ জার্মানি। তবে দেশের ছেলেরা পদক জিতেছে এতেই খুশি অভিনব।

জীবনে প্রথমবার বন্দুক হাতে কোনো বড়ো প্রতিযোগিতায় খেলতে নেমেছিল। চরম দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা তার কঠিন মনোবলকে ভেঙে দিয়েছিল শুধুমাত্র বাবা রূপেশ সাউ-এর নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্বকাপের মতো বড়ো আসরে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে পদক জিততে পেরেছে। একজন শুটার হিসেবে সেটাই তার বড়ো প্রাপ্তি।

ভারতীয় শুটিং জগতে সর্বকনিষ্ঠতম শুটার হচ্ছে অভিনব। আ
বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক আসরে সাফল্য পেয়ে থাকলেও মাত্র চো
বছর বয়সে রুপো পাওয়ার খবরটি শুটিং দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে। ত
খুশির জোয়ারে ভাসলে অভিনব ভুল করবে। সামনে অনেক বড়ো প
আসানসোলের রাইফেল ক্লাবকে পাথেয় করেই এগিয়ে যেতে হবে

বাবা রূপেশ সাউ পেশায় শিক্ষকতা চালিয়ে গেলে
খেলাধুলোর প্রতি তাঁর যথেষ্ট ভালোবাসা আছে।

সেই ভালোবাসার স্পর্শেই আসানসোল-এর সেন্ট ভিনসে
হাই অ্যান্ড টেকনিক্যাল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিনব ব
শুটার হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।